"বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রবন্ধের ছবি

বিদেহী আলেকজান্দ্রের সুগঠিত মূর্ত্তি (পৃঃ ২৯১)

মিডিয়ামের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে octoplasm নিঃসরণ (পৃঃ ২৯৩)
From Notzing's —Phænomena of materialisation (By Permission)

কার্ত্তিক—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ভক্তিবাদ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রায়-বাহাদুর

ভক্তিবাদ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমানে যে সকল ধর্মমতের প্রতি লোকের আস্থা দেখা যায়, তাহার সবগুলির মধ্যেই ভক্তিবাদ অল্লাধিক মিশ্রিত আছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন ভক্তিবাদ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছিল। ভগবদ্‌গীতায় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঃ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ ॥

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, তিনি পূর্বে এই অব্যয় যোগ সূর্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সূর্য তাঁহার পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে এই যোগ অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালবশে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আজ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগের কথা বলিতেছি।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ গীতা ৪র্থ অঃ

অর্জুনের মনে সংশয় হইল। তিনি বলিলেন, তুমি ত আধুনিক অর্থাৎ এখন বর্ত্তমান, বিবস্বান্ (সূর্য) প্রাচীন কালের লোক; তুমি কি প্র তাঁহাকে এই যোগ শিক্ষা দিলে?

তাহার উত্তরে ভগবান বলিলেন যে, আমি অজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমিও তাই। আমি সে সব রহস্য অবিদ্যার অধীন বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছ।

যাহা হউক, গীতারও বহু পূর্বে যে এই ভক্তিতত্ত্ব ভারতে সু ছিল, তাহা বুঝা যায়। গীতার রচনা কাল লইয়া পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জ্যাকোবি প্রভৃতির মতে মহাভারতের অংশ হইলেও উহাতে প্রথমে কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল গীতার যে সমস্ত শিক্ষা সভ্যজগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয় উহা নাকি পরবর্ত্তী কালের যোজনা! এরূপ মতবাদের সারবত্তা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ভক্তিবাদ যে খ্রীষ্ট জন্মেরও হইতে ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

ভক্তিবাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। মহাভার শান্তি পর্বে যে 'হরিগীতং পুরাতনম্' আছে, তাহা এই পাঞ্চর সম্প্রদায়েরই মত। শান্তিপর্ব এবং তদন্তর্গত মোক্ষধর্ম ও নারায়

পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অবশ্য সুদুষ্কর। কিন্তু দেখা যায় অনেক স্থলে এরূপ মতবাদের ভিত্তি নিতান্তই শিথিল। দক্ষিণ দেশের একজন আলওয়ার (তিরুমঙ্গই) বলিয়াছেন যে বিষ্ণু ভগবান্ নারদকে এই ভক্তিধর্ম প্রথমে অর্পণ করেন। পরে উহা নর ও নারায়ণ কর্তৃক জনসমাজে প্রচারিত হয়। নর ও নারায়ণ বিষ্ণুর পুত্র, তাঁহারা বদরিকাশ্রমে ঋষি ছিলেন।১

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
'জয়' অর্থ মহাভারত বা ধর্মশাস্ত্র

'পাঞ্চরাত্র' শব্দের সহজ অর্থে যাহা পাঁচ রাত্রি ধরিয়া উপদিষ্ট ছেল। কিন্তু এই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ মত যে ঐ আকস্মিক ঘটনা তে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম), পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত—এই পাঁচটি ত্ত্বের ব্যাখ্যা এই মতে আছে বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম পাঞ্চরাত্র হয়াছে। বেদে যে একায়ন শাখার উল্লেখ আছে, পাঞ্চরাত্র তাহারই র প্রতিষ্ঠিত। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সাত্বত ষ্কর ও জয়াখ্যসংহিতায় যে ধর্মমতগুলি পাওয়া যায় একায়ন বেদ হার ভিত্তি। এই একায়নবেদ সমস্ত বেদের সার বা মূল বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত পুরাণের সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে ইহা সমস্ত বেদ এবং ইতিহাসের সার (সর্ববেদেতিহাসানাং সারং তম্)।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে অপ্রকাশিত গ্রন্থের খ্যাও কম নহে। এই সকল গ্রন্থে প্রধানতঃ ভক্তিবাদই প্রচারিত য়াছে। 'পরম সংহিতা' নামক গ্রন্থের সহিত গীতোক্ত ভক্তিবাদের ষ্ট সাদৃশ্য আছে।২ রামানুজাচার্য এই পরম সংহিতার প্রমাণ তাঁহার ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে এরূপ বহু সংহিতার সন্ধান য়া যথা ঈশ্বর সংহিতা, পদ্ম সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ইত্যাদি। সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে ভগবদ্‌গীতা যে বিশিষ্ট দ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আকস্মিক নহে, ইহা এক বহু বিস্তৃত ও চীন ভক্তিবাদের চরম অভিব্যক্তি। ভক্তিবাদ যাঁহারা অনুসরণ রতেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম ছিল 'ভাগবত'। এই ভক্তিনিষ্ঠ গবতদের গ্রন্থই যে শ্রীমদ্‌ভাগবত সে কথা বলা বাহুল্য। শাণ্ডিল্য ই ভক্তিবাদীদের মধ্যে একজন প্রধান ঋষি ছিলেন। জয়াখ্যসংহিতায় ছে যে, একদিন বহু মুনিঋষি গন্ধমাদন পর্বতে শাণ্ডিল্য ঋষির নিকট পদেশ প্রার্থনা করেন। শাণ্ডিল্য বলেন যে, 'পরতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়; এই তত্ত্ব বিষ্ণু প্রথমে নারদকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষা যে সকল শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা গুরুর উপদেশ ব্যতীত জানা যায় না।' শাণ্ডিল্য ভাগবতধর্মের একজন অতি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ ভারত ভক্তিধর্মের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আলবার নামে এক শ্রেণীর ভক্ত বা ভাগবত দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে ভক্তিধর্মের যে প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়, তাহার তুলনা প্রাচীন যুগে আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। আলবার শব্দের অর্থ যাঁহারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা তামিল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতেও ইহাঁদের কিছু কিছু গ্রন্থ আছে। আলবাররা তাঁহাদের এই দেশীয় ভাষায় যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহা দেবভাষার সম্মান লাভ করিয়াছে। এখনও মন্দিরে মন্দিরে এই তামিল ভাষার পদাবলী স্তোত্ররূপে গীত হইয়া থাকে। ইহাঁদের মধ্যে যে ভক্তিবাদের প্রবাহ দেখা যায় তাহার একমাত্র তুলনা-স্থল বোধ হয় উত্তর ভারতের পদাবলী। এই সকল তামিল দেশীয় ভক্তকবি খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন বলিয়া জানা যায়। ইহাঁদের ভক্তিবাদ দ্রবিড়াম্নায় নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার এক অংশ দ্রবিড় সামবেদ নামে কথিত। শঠারি, শঠকোপ বা নম্মা আলবার এই সামবেদের রচয়িতা। নম্মা আলবার সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌন ছিলেন। এই সময়ে তিনি এক বকুল বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকিতেন এবং ভগবান অনেক সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। ষোল বৎসরের পর তিনি যখন লোকসমাজে প্রকাশ হইলেন তখন লোকে দেখিল যে তাঁহার দেহে নানা অলৌকিক ভাব প্রকটিত হয়। অশ্রুকম্পপুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ দেখা দিল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন। এই সমস্ত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নম্মাআলবারের শিষ্য মধুর কবি নামক আলবার বলিয়াছেন যে, ব্রজরমণীগণের যে ভাব ছিল শ্রীকৃষ্ণে, শঠারি মুনিরও সেই সকল ভাব দেখা যাইত।

ভাগবতেও আমরা অনুরূপ ভাবের বর্ণনা পাই:

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মত্তবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগবত ১১।২।৪০

তামিল দার্শনিক কবি বেদান্ত দেশিকাচার্য 'তাৎপর্য রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে শঠারি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রজরমণীগণের রীতি অবলম্বনে ভগবানকে আস্বাদন করিয়াছিলেন:

ব্রজযুবতীগণ খ্যাতনীত্যাংশ্বভুক্ত।

১ এই জন্যই ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যার পূর্বে ইহাঁদিগকে প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে:

২ Dr. Krishnaswami Aiyengar—Antiquity of Pancharatra

অর্থাৎ ব্রজযুবতীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইনি (শঠারি) সেই বিখ্যাত নীতিতে ভগবানকে উপভোগ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা মধুর ভাব বা কান্তাভাবের উপাসনাপদ্ধতির সর্বপ্রথম পরিচয় লাভ করিতেছি।

আলবারদিগের মধ্যে ১২ জন খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শেষ ব্যক্তি তিরুমঙ্গই আলবার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। অন্যান্য আলবাররা ইঁহার পূর্বে পাঁচ কি ছয় শত বৎসর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নম্মা আলবার এই দ্বাদশ জনের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ ভারতের এই ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ভাগবতধর্ম সারা ভারতবর্ষে কি অদ্‌ভুত প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ইহা হইতে, গ্রীক্ দূত কর্ত্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাসুদেবের নামে দাক্ষিণাত্যে বেসনগর স্তম্ভ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কবি ভাস শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া বালচরিতম্ লিখিলেন, মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে, শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যামরূপের উল্লেখ করিলেন—এ সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারা যায়। কুরল নামে দাক্ষিণাত্যের একজন কবি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি তামিল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দশশতকের মধ্যে।

ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থানের যে অদ্‌ভুত ইতিহাস আমরা দক্ষিণ ভারতে পাই অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। পরবর্ত্তীকালে বাংলায় যে প্রেমভক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল, পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিমে যে ভক্তিধর্মের ধারা নানকজি, মীরাবাই প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাই, তাহার মূল উৎস অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতেই যাইতে হইবে। পূর্বে যে আলবারদের কথা বলিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম আণ্ডাল। এই মহিলা আলবারের পিতা পেরি আলবারও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আণ্ডালের এই অভিমান ছিল যে শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার স্বামী। এই হেতু তাঁহার পিতা আণ্ডালের বিবাহ দেন নাই। আণ্ডালের বিগ্রহ এখনও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে পূজিত হয়। মীরাবাই আণ্ডালেরই যেন প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ মনে হইবে। এই দুই মহিলার চরিত্রে এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে, একই উৎস হইতে উভয়ের অনুপ্রাণনা আসিয়াছিল—এরূপ মনে না করিয়া উপায় নাই।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ একখানি ভক্তিগ্রন্থের রচনার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন তাহা দক্ষিণ ভারত ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কাব্য দর্শন ইতিহাস ও ধর্মের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় বিশিষ্ট গ্রন্থ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ঠিক কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কুলশেখর পেরুমাল নামে একজন আলবার ৮ম শতাব্দীতে তাঁহার মুকুন্দমালা নামক গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।* রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। রামানুজাচার্য দক্ষিণ ভারতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১০১৭-১১৩৭) এবং ভক্তিবাদের প্রথম দার্শনিক প্রবর্ত্তক তিনিই। নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যও দক্ষিণ ভারতের লোক। কাহারও কাহারও মতে নিম্বার্কই দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বপ্রথম বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ১ নিম্বার্ক সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং সনকাদি সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া কথিত হন। জয়দেব গীতগোবিন্দে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ রামানুজ তাঁহার পূর্বগামী। আনন্দতীর্থ স্বামী এবং মুগ্ধবোধ প্রণেতা বোপদেব ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্ত্তী নহেন। ইঁহারা উভয়েই দক্ষিণ ভারতের লোক এবং উভয়েই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, একা[দশ] শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত ক[রেন] নাই, আর দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় আচার্যগণ ভাগবত[কে] প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত আচার্যগণ কি[ন্তু] এমন কোনও আভাস দেন নাই যে তাঁহারা কোনও সাম্প্রতিক গ্রন্থ হই[তে] প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন।

রামানুজাচার্য ভাগবত হইতে কেন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তা[হা] অনুমান করা দুঃসাধ্য হইলেও এই মূল্যবান্ গ্রন্থ যে ভক্তিধর্মের মণিমঞ্জু[ষা] তাহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে ইহার রচনা এ[মন] কোনও সময়ে হইয়াছিল যখন ভক্তিধর্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। [এই] জন্যই মনে হয় যে যখনই ভাগবত রচিত হইয়া থাকুক, দক্ষিণ ভারতে[ই] উহা সম্ভব। কারণ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভার[তে] ভক্তিধর্মের সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোনও আন্দোলন দেখা যায় ন[া]। ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে বহু বিষ্ণুভক্ত দক্ষিণ দেশে আবিভূ[র্ত] হইবেন—

তাম্রপর্ণী নদীযত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥ ইত্যাদি

— ভাগবত ১১।৫।

এই বর্ণনার মধ্যে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই সকল [নদী] ও স্থান আলবারদের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাম্রপর্ণী ন[ম্মা] আলবারের দেশ, কৃতমালা রঙ্গনাথ-সেবিকা আণ্ডালের দেশ। পয়স্বি[নী] (পলর) অপর কয়েকজন আলবারের দেশ ; কাবেরীর তীরে তিরুমঙ্গ[ই] আলবার, এবং কুলশেখর পেরুমাল মহানদের দেশে আবির্ভূ[ত] হইয়াছিলেন। ২

---

* সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বলেন কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ছিলেন এবং তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

১ Hinduism—Monier Williams, Sir George Grierso[n] Encyclopaedia of Religion & Ethics-এ ভক্তিমার্গ নাম[ক] প্রবন্ধে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

২ History of Indian Philosophy vol III. Dr. S. N. Dasgupta.

'প্রপন্নামৃতে' আলবারদিগের বর্ণনায় যে ভক্তি-ভাবের ধারা আছে তাহার অনুরূপ ভক্তিভাবের ব্যাখ্যা উত্তর ভারতের কোনও গ্রন্থে বিরল। সেই জন্য পদ্মপুরাণান্তর্গত ভাগবত-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিদেবী দ্রবিড় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামে তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কর্ণাটকে গেলেন এবং সেখানে সমৃদ্ধিশালিনী হইলেন। পরে মহারাষ্ট্র ও গুর্জরে প্রবেশ করিয়া জর্জরিত হইলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও ঘোর কলির প্রভাবে পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইল। শেষে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া ভক্তিদেবী আবার নবীনতা প্রাপ্ত হইয়া সুদর্শনা হইলেন।

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে যে পরিবেশের চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়, তাহার অনুরূপ কোনও পরিবেশ আমরা সেই প্রাচীনকালে আর কুত্রাপি পাই না। সেইজন্য এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষিণ ভারত হইতেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। *

দক্ষিণ ভারতের এই অবদান স্বীকার করিলে উত্তর ভারতের গর্ব খর্ব হইবার আশঙ্কা অমূলক। কারণ উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বহু কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার মত দৈন্য যেন কখনও আমাদের মনে না আসে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব যে এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের বিপুল সাহিত্য। ভক্তিবাদের বহুগ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে দক্ষিণ দেশ হইতেই আমরা পাইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। দক্ষিণ ভারতেই রামানুজাচার্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, নিম্বার্কও দক্ষিণ ভারতের বেলারি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজের শ্রীবৈষ্ণব ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুদর্শন মত, বাংলার বৈষ্ণবেতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্বাচার্যও দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের পূর্বগামী বটে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়—যদিও শ্রীচৈতন্য যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত। এই মতে যে 'গোপবেশ বেণুকর নবকৈশোর নটবর' নন্দনন্দনের ভজন প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা দক্ষিণ ভারতে বিরল। দক্ষিণ ভারতের প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথস্বামী নারায়ণ; অতল শয়নে নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবায় রতা, অনন্ত তাঁহার শয্যা, অসংখ্য ফণা তাঁহার ছত্র—এই বিগ্রহই বেশীর ভাগ মন্দিরে। শ্রীরঙ্গম্, শ্রীরঙ্গপত্তন, মহাবলিপুরম্, চিদম্বরম্ প্রভৃতি বিখ্যাত মন্দিরগুলিতে ঐ নারায়ণ বা মহাবিষ্ণুমূর্ত্তিই দেখিয়াছি। সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যে নূতনত্ব আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই অবদান। কিন্তু এখানেও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য যে কান্তাভাবের ভজন প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতেরই কথা মনে হইবে। গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সংলাপের পূর্বে বঙ্গদেশে এই রাধা-ভাবের ভজনের কোনও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না একথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি।১ গীতার শরণাগতি বা প্রপত্তিও দক্ষিণ ভারতের তামিল গ্রন্থ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্ম-নিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

অহির্বুধ্ন্য সংহিতা

এই শরণাগতিরও পরের কথা হইল—প্রেম। ইহা শুধু ভগবানের কৃপাভিক্ষায় পর্যবসিত নহে। ভগবানকে আমাদের বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ভাবে উপাসনা, ইহাই হইল শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের সারকথা। তাঁহার অন্ত্যলীলায় যে দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি মহাভাবের বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা বাংলারই অমূল্য সম্পদ্, অন্য কোনও প্রদেশের নহে।

* আমার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় আমি বলিয়াছি... "আমার মনে হয় ভাগবত পুরাণ খুব সম্ভব দক্ষিণ ভারতেই রচিত হইয়াছিল।" ঐ পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় "দেশ" পত্রিকায় (৩০শে আষাঢ়, ১৩৫২) সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত যুক্তিসমূহ প্রণিধান করিলে সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের (মদ্ভাগবত নহে?) উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে সংশয়ের কিছু নিরসন হইতে পারে।—লেখক

১ বাংলার প্রেমধর্ম—উদয়ন, কার্ত্তিক, ১৩৪১

শশধরের নূতন দাঁত

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সুশীল সেন :

"ঐ যে মেয়েটি গেল হাসিতে হাসিতে
সঙ্গিনীর পানে চেয়ে—লোহিতে ও পীতে
একখানি অফুরন্ত গীতিকাব্যসম—
লাবণ্যে অপরিমেয়, বর্ণে নিরুপম !
দেখিলে তাহারে ? তন্বী হেসেছিল বেশ—
কুসুমিত করে' গেছে একটি নিমেষ !
দেখেছি ত' কত হাসি কতশত মুখে,
বিকচ প্রফুল্ল হাসি সুখে ও কৌতুকে···
এ-হাসি তেমন নয়, নহে সাধারণ,
সকল হাসিতে নাই অমৃতক্ষরণ ;
এ-হাসি হাসির যেন পরম প্রকাশ,
পরম রসের রূপ ! জন্মিল উল্লাস।
এখনি দেখা সে-হাসি অদৃশ্য এখন—
সূর্য্যাস্তের পর রক্ত-দীপ্তির মতন
ফুল্ল প্রতিচ্ছায়া তার অজস্র অক্ষয়
লেগে' আছে প্রাণে। কেন এমনটি হয় !
কোথায় ফুটিল হাসি ! সমগ্র আননে—
নয়নযুগলে, কিম্বা গণ্ডে কি দশনে !"

সুবোধ রায় :

"দেখেছি সে-হাসি ; হাসি অতীব মধুর—
উজ্জ্বল মানসরাগ ফুটেছে প্রচুর ;
কিন্তু যদি প্রশ্ন করো, ফুটেছে কোথায় ?
সরল উত্তর তবে দে'য়া হবে দায় ;
আমি মনে করি, হাসি তুলেছে উচ্ছ্বসি'
সমগ্র যৌবন তার—রূপসী ষোড়শী।
হেসেছে বয়স তার, হেসেছে তনুটি,
দাঁত নয়, ওষ্ঠ নয়, নহে চক্ষু দু'টি।
অদ্যাপি অনবগত কবি বৈজ্ঞানিক :
কি কারণে কোন্ স্থান হাসে সমধিক !
শিশুর উলঙ্গ মূর্ত্তি না হেসেও হাসে—
সর্ব্ব অঙ্গ ব্যেপে তার হাসিটি বিকাশে।
তবে এ স্বীকার করি, দাঁত নাই যার
তার হাসি স্বাদহীন ; দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
পাবে তা'তে ; কিন্তু নাই গভীরতা, আলো ;
নাই তার আবেদন ; মোটেই জোরালো
নহে তা' ; সে রূপহীন নিকৃষ্ট ব্যাপার—
সোহাগটা ফোটে খালি বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দার।
অন্ধের হাসিও দেখো, অসম্পূর্ণ হাসি—
বিকিরিত দীপ্তি চোখে ওঠে না বিকাশি'।
সে যা' হো'ক্, দাঁত আর ঠাকুর্দ্দার নামে
মনে প'লো ঘটনা যা' ঘটেছিল গ্রামে।
শোনো যদি বলি তবে অপূর্ব্ব আখ্যান :
দাঁত কেন মানুষের রহিল পরাণ"।

থামিল সুবোধ রায়, ছাড়িল নিঃশ্বাস—
কহিল : "মানুষ মাত্র নিয়তির দাস ;
অহরহ দৃষ্টান্তের পেতেছি সাক্ষাৎ :
আজিকার বনস্পতি কাল ধূলিসাৎ।
সে কি তার শক্তি, তার, সে কি কলেবর—
তখনো, যখন তার বয়স সত্তর।
নাম ছিল শশধর, শশধর ঘোষ,
ছ'ফুট দু'ইঞ্চি দেহ, নির্ব্যাধি নির্দ্দোষ ;
অতিশয় মিষ্টভাষী, প্রফুল্ল সর্ব্বদা···
আমাদের সকলের 'শশ ঠাকুরদা'।
বার্দ্ধক্যেও দেখে তার শক্তি অসম্ভব
দুষ্টজনে নাম দিল 'দ্বিতীয় পাণ্ডব' ;
উপরটা যত বড়ো তেম্নি ভিতর—
অনুপাতে ততখানি গভীর গহ্বর,
তিনটি লোকের খাদ্য খাইতে সক্ষম,
হজমশক্তিতে নহে কারো চেয়ে কম ;
দু'সের মাংসের সঙ্গে মাছ দুধ ভাত
সাপটি' নিঃশেষ করে না থামিয়ে হাত ;
চিবিয়ে পাঁঠার হাড় করে গুঁড়ো গুঁড়ো···
লোকে বলে : 'শশধর হ'ল নাকো বুড়ো'।

কিন্তু কথা টিকিল না ; ক্রমে গেল দাঁত ;
চর্ব্বণে ঘটিল বিঘ্ন, অস্বস্তি নেহাত্ ।
বার্দ্ধক্যের সে ক্ষতিটা করিতে পূরণ
নিতে হ'ল বৈজ্ঞানিক মিথ্যার শরণ ;
দু'পাটি সুন্দর দাঁত, ধবল মসৃণ,
মুখে নিয়ে শশধর এল একদিন ;
বাষট্টি টাকার দাঁত হাসে ঝিক্‌মিক্—
কিন্তু মূল কাজটাই হ'ল নাকো ঠিক্ ।
মাড়ি ত' নকল নয় ! রক্ত মাংস তার
নকল দাঁতেরে নিতে করি' অস্বীকার
বাধাইল ল্যাঠা ; মাড়ি কোমল জিনিস—
সেখানে জনমে দ্রুত যন্ত্রণার বিষ ;
রাখা যায় একটানা আধ ঘণ্টা জোর,
তা'পর অসহ্য হয় যন্ত্রণা প্রখর ।—
খুলে রেখে' দাঁত করে আহার্য্য ভক্ষণ…
অভ্যাস ক্রমশঃ হ'বে যন্ত্রণাদমন—
আশা করে' থাকে ; কিন্তু, দিন যায়—
টাকার সে-দাঁত তার হ'ল না সহায় ;
যন্ত্রণা চলিল বেড়ে' । কিছুদিন পর
'ক্লাইম্যাক্স্' দিল দেখা অতি ভয়ঙ্কর :
একদিন দন্তস্পর্শ সহিল না মাড়ি
এক মুহূর্ত্তও ; দাঁত খুলে' তাড়াতাড়ি
আর্ত্তনাদে তোলপাড় করিয়া সংসার
শশধর প্রকাশিল যন্ত্রণা তাহার…
অতিকায় লোকটার কাতর চীৎকার
শুনা'লো ভীষণ, যেন সীমা নাই তার…
ছুটিয়া আসিল লোক ; কহিল সকলে :
'বিষাক্ত এ দাঁত শীঘ্র ফেলে দাও জলে ;
বিষাক্ত পদার্থ দিয়া নির্ম্মিত এ-দাঁত
দিয়েছে তোমারে, ইহা কহিনু নির্ঘাত্ ;
হাজার হাজার লোক লাগাইয়া দাঁত
হাসিতেছে দিব্য—নাই কোনোই উৎপাত !
উল্টো কাণ্ড কেন হবে তোমার বেলায়,
দুনিয়া আঁধার দেখা দাঁতের জ্বালায় !
যাও তুমি কলিকাতা ; দন্তচিকিৎসকে—
ধাপ্পাবাজ সেই চোরে, ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকে,
শিক্ষা দিয়ে এস' । উহা শুনি শশধর
উপরন্তু অর্থশোকে বকিল বিস্তর…
ব্যাগে নিয়ে দাঁত, আর, দুধ খেয়ে খালি,
ক্ষুধার উত্তাপে স্ত্রীকে দিয়ে গালাগালি
গেল চলে' ।…সেখানে সে পাবে কি না ত্রাণ
করিল দেশের লোক বহু অনুমান ।

কি কহিল চিকিৎসকে, কি পেলে উত্তর,
জানি না বিশেষ ; তবে এসে শশধর
যা' কহিল তাহা শুনি' শত্রুমিত্রগণ,
নর আর নারী, হ'ল বিস্ময়ে মগন ।
হাসি' হাসি' শশধর কহিল খবর :
'আমার অদৃষ্ট দেখি তেজালো জবর !
যা' কখনো শুনি নাই, করিনি কল্পনা
ডাক্তারের মুখে সদ্য তা'ই গেল শোনা !
আমার নকল দাঁত বিষাক্ত ত'নয় ।
ডাক্তার কহিল দেখে, 'শুনুন্, ম'শয়,
বাঁচিনা অজ্ঞের এই ঘৃণ্য অবিচারে—
বেচিনা বিষাক্ত দাঁত, তুলে' দি' তাহারে ।
বেদে' কি সাপুড়ে' নই, জানিনে ম্যাজিক্,
দাঁতের ব্যাপার মহা কাণ্ড বৈজ্ঞানিক—
চালাকি কি ফাঁকি'নাই, পড়ে' শুনে' শেখা ;
দেহের রহস্য আজো বিস্তর অদেখা,
মানুষের ; আপনার আরও অজানা—
ক্রোধ প্রকাশিতে আমি করিতেছি মানা ।

দাঁতের কসুর নাই ! অদ্ভুত ব্যাপার
ঘটিতেছে ধীরে ধীরে হোথা আপনার ;
হেন অসাধারণত্ব দেখা গেছে কম—
হইতেছে আপনার নবদন্তোদ্গম'…
ডাক্তারের কথাগুলি কহি' শশধর
উদ্দাম-আনন্দভরে হাসিল বিস্তর ।
শুনি' কথা শশব্যস্তে লাফাইয়া উঠি'
'দেখি' 'দেখি' রব তুলি' এল লোক ছুটি'…
উৎসুকে নিরস্ত করি' বৃদ্ধ শশধর
সুখভরে পুনরায় হাসিল বিস্তর—
কহিল : 'দেয়নি' দেখা, আসেনি' বাহিরে,
আসিছে দাঁতের সারি অতি ধীরে ধীরে ;
সময়ে দেখিতে পা'বে, দেখাইব ডেকে'—
দিবস গণিতে থাকো সবে আজ থেকে' ।

হাসিল সে বটে ; কিন্তু দুই চার দিন
না যেতেই হ'ল তার হাসাও কঠিন।
শৈশবে যখন ওঠে দুধের সে দাঁত
শিশুরা অসুস্থ হয়, কাঁদে দিনরাত।
বিধাতার নিয়মটি বুঝি নাকো মোটে—
দাঁত কেন অনিবার্য্য ব্যথা দিয়ে ওঠে!
মা ষষ্ঠীর শিশু পায় অল্পেই রেহাই ;
কিন্তু যদি বুড়োকালে দাঁত ওঠে, ভাই,
সে কি কাণ্ড ঘটে! তার পোক্ত ঝুনো মাড়ি
ক্রমাগত ঠেলে', সেই দুর্ভেদ্য বিদারি',
পর পর এলে দাঁত কি কঠিন হয়
সে যন্ত্রণা! পরিমাণ বলিবার নয়।
অন্তর্হিত হ'ল তার উদ্দাম-উল্লাস—
দৌড়াইল শশধর গলে নিতে ফাঁস ;
চীৎকারে দাপটে যেন ক্রুদ্ধ ব্যোমকেশ,
নিকটে ঘেঁষে না কেহ—করে' দেবে শেষ!
যে কথা সে জানে বলে' কেহ জানিত না
সেই কথা তার মুখে গেল বহু শোনা—
সে কথা আসিলে কানে খাড়া হয় চুল ;
ভগবানে করিল সে সবংশে নির্ম্মূল
গা'ল দিয়া দিয়া।...তার পত্নী পতিব্রতা
কাঁদিয়া আকুল হ'ল শুনি' বিশ্রী কথা।

সে যা' হোক্, বহু কষ্ট দিয়া ক্রমে ক্রমে
দাঁত ওঠা শেষ হ'ল তিন চার দমে—
উঠে' এল সব ক'টি পাঁচ ছয় মাসে...
দেখা'য়ে দু'পাটি দাঁত শশধর হাসে ;
সুদৃশ্য সুদৃঢ় দাঁত পূর্ণ আয়তন—
আসল জিনিস, ঠিক্ আগের মতন ;
প্রকৃতির এ খেয়াল হ'ল জানাজানি—
লোকে তা' দেখিতে এল ; অনেক বাখানি'
কাগজে বেরলো বার্ত্তা ; ছবি হ'ল ছাপা ;
গৌরবে উদ্দাম-স্মৃতি পড়ে' গেল চাপা।

যদি করি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নির্ণয়
দেখা যাবে, দাঁত যায় হিতার্থে নিশ্চয় ;
যে শিশু মায়ের বুকে করে স্তন্যপান—
দেন্ নাই দাঁত কিন্তু তারে ভগবান্,
কারণ, দাঁতের তার নাহি প্রয়োজন—
সে শুধু চুষিয়া খায়, করে না চর্ব্বণ।
ঘুরিছে নিয়মচক্র অব্যর্থ গতিতে—
ব্যতিক্রম ঘটে যদি হবে দণ্ড নিতে।
দুধ ছেড়ে' যা' খায় তা' ক্ষুদ্র দাঁতে চলে...
কঠিন কঠিন বস্তু পিষিয়া সবলে
খেতে হ'বে বলে' ওঠে আরো শক্ত দাঁত...

তারপর বৃদ্ধকালে ঘটে দন্তপাত—
আর তা' ওঠে না ; তার উদ্দেশ্য ইহাই :
চর্ব্ব্য ছেড়ে' লেহ্য পেয় খেয়ে থাকো, ভাই ;
সহজে হজম হবে, সুস্থ রবে দেহ—
নিয়ম লঙ্ঘন কভু করো যদি কেহ
শাস্তি পাবে হাতে হাতে। কিন্তু শশধর
ভুলে' গেল, পায়নি' সে নূতন উদর ;
দাঁতই নূতন ; কিন্তু অতি পুরাতন
যন্ত্রপাতি, যারা করে শরীরে পোষণ ;
ভুলে' গেল, এ কালে যা' না-থাকা নিয়ম—
পেয়ে তাহা বিধির সে মহা ব্যতিক্রম...
লেগে' গেল দাঁতের সে শক্তি পরীক্ষায়—
নির্ব্বিচারে শক্ত বস্তু বেছে' বেছে' খায়
চিবায়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়ো করি' গেলে ;
বলে, 'খেতে পারি আমি হাতী মোষ পেলে'
মানে না নিষেধ কারো—নিষেধ করিলে
চটে গিয়ে যা' তা' বলে ঢোক গিলে' গিলে'

কিন্তু যেথা ঘুরিতেছে নিয়মের চাকা
সেখানে চলে না কভু জিদ্ ধরে' থাকা
তাহার বিরুদ্ধে ; কিন্তু হুঁশ তার কম—
ফুরাইল একদিন উত্তেজনা, দম্ ;
উদরে হ'ল না সহ্য, হ'ল আমাশয় ;
তিনদিনে শশ যেন সে-মানুষ নয়—
এমনি চেহারা হ'ল ; সে-দেহ বিরাট
নিল শয্যা ; শুকাইয়া হয়ে গেল কাঠ...
তারপর একদিন যবনিকাপাত—
কহিল সকলে : 'শশ নিয়ে গেল দাঁত ;
দাঁত তারে নিয়ে গেল। হিত ও অহিত
কিসে বটে, সে-বিচার করাই বিহিত'।"

চিত্রধর্মের গোড়ার কথা

শ্রীইন্দু রক্ষিত

২

নূতন করিয়া, চিত্রকলায় পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রচনা হইতে ভাবসংযোগের আদর্শকে প্রাধান্য দিয়া "নূতন পন্থার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এদেশে কিছুকাল আগে। ভারতের শিল্প যে কখনই বাস্তবিকতার আদর্শকে গ্রহণ করে নাই ইহাই বারংবার বহু বিশেষজ্ঞের মারফৎ আমরা জানিয়াছিলাম। তাহা নির্ণীত সত্য বলিয়া গ্রহণ করাও গিয়াছিল। কড়া সমালোচক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেবও ভারতীয় শিল্পে এই রকম কিছু বিশেষত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পারসিক শিল্প এদেশের ভাবধারার অনুপন্থী ছিল বলিয়া বেশ মিশিয়া যাইতে পারিলেও গান্ধারের হেলেনিক শিল্প এদেশের ধাতে সহে নাই। তাহাকে অচিরে বিদায় লইতে হইয়াছে।(১) ভারতের এই বিশেষত্বের দাবীকে অগ্রাহ্য করা বুঝি সম্ভব হয় নাই। সেই কারণে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে নজীর বা উদাহরণ সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায়।

মূলতঃ বাস্তবের অনুকৃতিই শিল্পসৃষ্টির গোড়ার ইতিহাস তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এই প্রবন্ধে একাধিকবার। বাস্তবের সাদৃশ্য রচনার অনুমোদন শাস্ত্রে মিলিবে তাহাও সত্য। অতএব বিচার্য হইবে অনুকৃতি ভিন্ন অপর কিছুরও অনুমোদন শাস্ত্র করে কিনা, অথবা তাহারও নির্দেশ দেয় কিনা। শিল্পশাস্ত্রে যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ আছে তাহাতে সাদৃশ্য ছাড়াও আরও পাঁচটি গুণের সমমর্যাদা স্পষ্ট করিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাকে ঠেলিয়া ভারতীয় শিল্পও বাস্তববাদী—এই যুক্তির প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে হইবার নহে। চিত্র এবং চিত্রকার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসভরা অনেক গল্পকথা, অনেক অলৌকিক গল্পগাথা এযুগেও বিরল নহে, সম্ভবতঃ সেযুগেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। রচনাকে সরস করিতে আখ্যান-ভাগকে জমকালো করিয়া তুলিবার আগ্রহে অনেক সময়ই একটু আধটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইত। নতুবা সেকালের চিত্রকলায় বাস্তব প্রতিচ্ছবির এমন কোনও নিদর্শন আমাদের চোখে পড়ে নাই বা বাস্তব সৃষ্টির এমন কোনও প্রচলিত পদ্ধতির সন্ধান আজও মিলে নাই যাহার বলে বুঝিয়া উঠিতে পারা চলে যে পটে অঙ্কিত শকুন্তলার সহিত যথার্থ আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার দৃষ্টিবিভ্রমকারী সাদৃশ্য সংঘটন সম্ভব ছিল এবং বিদূষকের নিকট সেই পটের শকুন্তলা—বিশেষ করিয়া দুষ্মন্তের মত অ্যামেচার আর্টিষ্টের অঙ্কিত শকুন্তলা আসল রক্তমাংসের শকুন্তলার হইয়া ঠিক মত proxy দিতে পারিয়াছিল। উত্তররামচরিতের উদাহরণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইবে। তথায় রামসীতার ভাবাভিভূত উক্তিই লক্ষ্মণ অঙ্কিত পটের বাস্তবিকতার যথেষ্ট প্রমাণ কি? সেই চিত্র কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর চিত্রিত প্রতিরূপ এবং তদ্দর্শনে দর্শকের মনে বাস্তবানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও সেই কারণেই সেই চিত্র যে বাস্তবের দৃষ্টিবিভ্রমকারী অনুকৃতি ছিল এমন মনে করিলে ভুল করাই হয়তো হইবে। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনের একটি অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন "apperceptive mass" বা বা চিন্তাসমষ্টি। কোনও বস্তু শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ, এ বলিতে যাহা আমাদের নিকট কোনও মূল্য দাবী করে না বা যাহার মধ্যে কোনও সম্পূর্ণতা নাই, অতীতের কোনও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাই আবার বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া বসে। ইহা ছোট্ট একটি সূত্র ধরিয়া অতীত জীবনের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া মনে নানা অনুভূতির সৃষ্টি করে। রামসীতার মনোরাজ্যে এই স্মৃতির আলোড়ন উপস্থিত করিতে উল্লিখিত পটে তুলির টানের সামান্য দু'একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। সেই ইঙ্গিতসূত্রাবলম্বনই অতীত ঘটনার সবটুকু স্মৃতি সর সর করিয়া নামাইয়া তাঁহাদের মানসপটে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিত। এই স্মৃতির সহযোগিতা না ঘটিয়া থাকিলে সে যুগের চিত্রকলায় বাস্তবানুকৃতির যতটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা দ্বারা এতটা বিভ্রমবিহ্বলতা ঘটাইতে পারিত না—কেবল যাহারই আবেশে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বসিতেন—"প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব মম জানকী বিপ্রযোগঃ॥"

অতএব সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য এ বিষয়ে প্রামাণিক নহে। আপাততঃ বলা চলিবে হয়তো যে উক্ত কাব্যোল্লিখিত চিত্র যথার্থ বাস্তবানুকৃতি না হউক বাস্তবিকতাই যে সেকালের আদর্শ ছিল উক্ত কাব্যাংশ তাহার কতক প্রমাণ সূচিত করে। কিন্তু আপাততঃ বলা চলিলেও তাহা শেষ অবধি গ্রাহ্য হইতে পারিবে না। এই কল্পিত আদর্শের অঙ্কিত নিদর্শন কোথায়? ভূরি ভূরি এমন নিদর্শন না হয় নাই মিলিল—যাহা আদর্শে পৌঁছিতে পারিয়াছিল কিন্তু এমন দু'একটি উদাহরণও ত পাওয়া দরকার যাহা অন্ততঃ আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছিল? অবশ্য সে চেষ্টাও হইয়াছে। অজন্তার উল্লেখ হইয়াছে, ওস্তাদ মনসুরের উল্লেখ হইয়াছে। মনসুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বেশি বলিবার প্রয়োজন হয় না। শুধু অজন্তা। বিশেষজ্ঞ সমাজে এই রকম একটি সুরের গুঞ্জরণ হালে

---

(১) "The Persian style of painting, being congenial to Indian taste, readily admitted of certain modifications which may be reasonably regarded as improvements, whereas the ultimate models of the Gandhara sculptors having been the masterpieces of Attic and Ionic art, alien in spirit to the art of India were usually susceptible of modifications by Indian craftsmen only in the direction of degradation...."—

—History of Fine Art in India & Ceylon—V. Smith.

প্রকাশ পাইতেছিল যে অজন্তার চিত্রশিল্প বাস্তবধর্মী এবং তাহাতে "লাইট এণ্ড শেড" রহিয়াছে। এই আধুনিকতম মন্তব্য সেই সুরেই তান লয় সহযোগে এককলি গাহনা। কিন্তু জুড়ির দল ঐক্যতান জুড়িবার আগে সুরটিকে যাচাই করিয়া দেখিতে চাহিবে তাহার তাল মাত্রা ঠিক আছে

'বৃষ'—পল পটার

কিনা। যদি অজন্তা বাস্তবধর্মীই হয় তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যে অজন্তাকে আমরা এতাবৎকাল গৌরবের সামগ্রী মনে করিয়া আসিয়াছি তাহার স্থান খুব উচ্চে নহে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দি হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক অবধি ধার্য হইয়াছে অজন্তার সৃষ্টিকাল। জগতের অন্যান্য অংশ

পম্পেই দেওয়াল চিত্র

এই সময়কালের মধ্যে শিল্পসৃষ্টি হইতে বিরত থাকে নাই। অধুনালুপ্ত পম্পেই নগরে প্রাপ্ত কিছু প্রাচীর চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পম্পেই নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকতার আদর্শে অজন্তা হইতে উচ্চে স্থানলাভ করিবার যোগ্য সন্দেহ

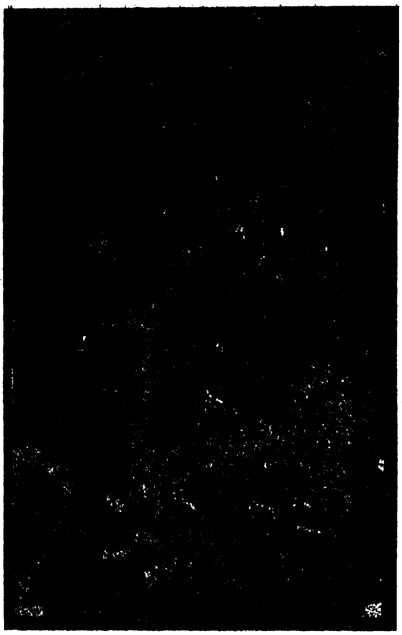

কাঠবিড়ালী শিকার—মনসুর

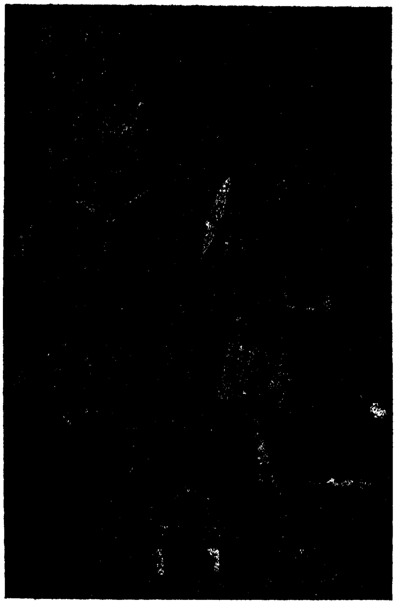

প্রসাধন—অজন্তা দেয়াল চিত্র

নাই। এমন কি খৃঃ পূঃ পঞ্চম (পোলেগ্নোতস্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের) ও প্রথম শতকের গ্রীক প্রাচীর-চিত্রও উচ্চতর আসন দাবী করিবে বাস্তবিকতার বিচারে। পোলিগ্‌নোতস্‌এর ছাত্র খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের মিকোন (Mikon) অঙ্কিত "হেরাক্লেস-এর বীরকীর্তি" (Exploits of Herakles) চিত্রে (মূলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা) অ্যানাটমি ড্রয়িং যেরূপ দেখা যায়, অজন্তা তাহা কল্পনা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দির পম্পেই, অষ্টিয়া (Ostia) চিত্র যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার light & shade ইঃ বাস্তবিকতার মাত্রা অজন্তার বহু উর্দ্ধে। অজন্তার মহিমা ওদিক দিয়া মিলিবে না। আমাদের দেশের সমালোচকের যদি Ruskinএর মত হাতে কলমে চিত্রবিদ্যার কিছু শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে কেবল "light & shade" (?) দেখিয়াই অজন্তা'কে বাস্তবধর্মী হইবে। দেখা যাইবে অজন্তার যে ড্রয়িং তাহা শিল্পীর সৃষ্টি যে বাস্তবিকতায় অনুগমনে প্রয়াসী তাহার বিন্দুমাত্রও নির্দেশ দেয় না। অজন্তার এই দোহাই বৃথাই পাড়া হইয়াছে। অজন্তার ১৯নং গুহার 'প্রসাধন' চিত্র কোন দিক দিয়া বাস্তবধর্মী? তাহার light & shadeএর প্রয়োগ হইতে কি তাহা সূচিত হয়? তাহার ড্রয়িংই কি বাস্তবধর্মী? বিশেষ করিয়া পদযুগলকে নিরীক্ষণ করিলে "পদবল্লব" না বলিয়া বাস্তবের যথাযথ প্রকাশ বলিবার কোনও অবকাশ পাওয়া যাইবে কি?

স্বভাবানুকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়া বা বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্র রচনার নীতি পশ্চিমে হালে দেখা দিলেও এদেশের মাটিতে উহা নূতন নহে। অনুকৃতিকে প্রধান অবলম্বন না করিয়া ভাব বা কতক পরিমানে কাল্পনিকতার অলঙ্কার সজ্জায় সজ্জিত করিয়া অনুভূত

ব্যাবিলনীয় ফলক

আসিরীয় দেবতা

বলিয়া গোল পাকাইয়া ফেলিতেন না। অজন্তা, সিগিরিয়া বাঘ প্রভৃতি চিত্রে যে তথাকথিত আলোছায়ার প্রয়োগ দেখা যায় তাহা পাশ্চাত্য শিল্পনীতিতে light & shade বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে। ইহা গঠনভঙ্গিমা, বিশেষ করিয়া দেহছন্দকে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া তোলার উপায় মাত্র। যদি বলা যায় light & shadeএর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করিয়া দেখানো—তবে ইহাও বুঝিবার দরকার হইবে যে যেখানে হুবহু বাস্তব সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য সেখানে আলোছায়ার প্রয়োগ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার প্রয়োজন। অজন্তার শিল্পী যে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন, কেবল পম্পেই শিল্পীর পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই এমন বলিলে অন্যায় প্রস্তাব করা

রসকে প্রকাশ করিবার রীতিই ছিল এদেশের। অন্ততঃ ধর্মবিদ্বেষ বহ্নিতে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিবার পূর্বপর্যন্ত তাহা বলবৎ ছিল। পশ্চিমে হালে যাহা দেখা দিয়াছে তাহার অনেকটাই যে দীর্ঘকালের বাস্তবোপাসনার প্রতিক্রিয়া এমন মনে করিলে ভুল করা হইবে না। অনেক এইরূপ "ism" বা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে মনের অরুচির ফলে, নূতন কিছু করিবার উন্মাদনায়। পশ্চিমের দেখাদেখি যাহা এদেশে চলিতে সুরু করিয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ভাবধারার কোনও যোগাযোগ নাই; তাহার পিছনে রহিয়াছে পশ্চিমকে অনুকরণ করিয়া অতি আধুনিক সাজিবার অধুনা পরিব্যাপ্ত অতি সাধারণ মনোবৃত্তি। শিল্পে এই অতি আধুনিকতার এদেশীয় অনুকরণকারিদের মধ্যে এমন অনেককে পাওয়া যাইবে যাঁহারা প্রাচ্যের এই বাস্তবাতিক্রমকারী ভাবপ্রবণতার রীতিকে বরাবর উপহাস ও কটূক্তিতে জর্জরিত করিয়া আসিয়াছিলেন; পরে

সাগর পারের হাওয়া গায়ে লাগিতে নিজেকে আধুনিক মনে করিতে পারায় আত্মপ্রসাদলাভের আশায় হঠাৎ বিদেশের এই বাস্তববর্জন নীতিকে নত হইয়া সেলাম ঠুকিয়াছেন; ফান্-গোথ্ (Van Gogh) গগাঁ (Gauguin) নাম গাহিয়া গগাইয়া উঠিয়াছেন। এতাবৎকালের পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকিতে হইলে অনুশীলনের শ্রম অনেকটা স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় বা নব্য ভারতীয় রীতিতেও যথার্থ শিল্প সৃষ্টি করিতে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় ততোধিক। কিন্তু এই অতি আধুনিকতার সৃষ্টিতে বা তাহার নামের আড়ালে অনেক অক্ষমতা সাফল্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিবার স্ফূর্তি পায়। সেই নামের গুণে অনেক 'অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়' এবং 'বধিরও শুনে'।

নব্য ভারতীয় রীতি কোনও প্রতিক্রিয়াপ্রসূত উন্মাদনা নহে। ইহা যথার্থ জাগরণ। তবে দীর্ঘকালের অচৈতন্য ইহার পূর্ণ সজীবতা প্রাপ্তিতে কিছু বিঘ্ন ঘটাইতেছে। এদিক দিয়া সন্দেহ কতকটা ঠিকই। অহেতুক নহে। নব্য ভারতীয় রীতির অনুকরণকারদের অনেকে সত্যই যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইহাও ঠিক যে এই নামেরও আড়ালে অনেক অকৃতকর্মা আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক (?) ভারতীয় এই ভাবপ্রবণতার নীতি কোন ক্রমেই নিন্দার্হ নহে। শিল্প সৃষ্টি মারফৎ তাহা রস প্রকাশের প্রকৃষ্টতর পন্থা। বিভিন্ন পরদেশী রীতি-নীতির সংস্পর্শে আসিয়া ইহার কিঞ্চিৎ রূপ বদল হইতে পারে, হইবে এবং হইয়াছেও, কিন্তু ইহার মর্মে প্রোথিত ধর্মের ভিত্তি পাকা হইয়া রহিয়াছে। এই ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজনের, তাহার ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য এত আবেদন নিবেদনের কোনও প্রয়োজন ঘটিয়াছে মনে হয় না।

আর একটি কথা বলিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। ক্রিটিকে ক্রিটিকে যে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার লইয়া তর্ক, তাহার মূল্যবোধ সাধারণ চিত্র দ্রষ্টার নিকট যেমন সামান্য, আসল চিত্রস্রষ্টার পক্ষেও তেমন সেই সূক্ষ্ম দার্শনিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার অবসর কম। স্রষ্টার কারবার মূলতঃ অনুভূতি লইয়া। অতএব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে তর্ক তাহা তাঁহাদের বিচার প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হইলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত রসসৃষ্টির সহায়তা সামান্যই হইয়া থাকে। নানা মুনির নানা মত। রসতত্ত্বকে ঘেরিয়া বহুবিধ যুক্তি জমা হইয়াছে। একটি স্বপক্ষীয় যুক্তি যাহা খুব সজীব মনে হইতেছে ঠিক তাহারই বিপরীত এমন যুক্তির অভাব হইবে না যাহা পূর্ব যুক্তিকে নির্জীব করিয়া দিবার শক্তি রাখে। এইরূপ তার্কিক আলোচনায় শুধু দেখা যায় আরও নূতন নূতন মত লইয়া নূতন নূতন মুনির আবির্ভাব হইতেছে। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী যুক্তি ও মত ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া এমন স্তূপ গড়িতে দেখা যাইতেছে যে তাহার অন্তরালে পড়িয়া প্রকৃত রসসৃষ্টির সৌন্দর্য সুষমার অরুণিমা বুঝি দৃষ্টির অগোচরেই থাকিয়া যায়। যদি শিল্পের উন্নতি সাধন কাম্য হয়, তবে বিশেষজ্ঞকে বিশেষজ্ঞীয় ভাষায় সহযোগী বিশেষজ্ঞের কানে কিছু না শোনাইয়া সহজ স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি আসল শিল্পীর সাথে মুকাবালা করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞরা ইহা বুঝিবেন কি না বলিতে পারি না যে যেখানে তাঁহারা রসতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া তর্কের ইন্দ্রজাল বুনিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি আদায় করিতে থাকেন সেইখানে সেই জালের জটিলতায় জড়াইয়া শিল্পীর শিল্প সজীবতা হারায়, জড়ত্বপ্রাপ্ত হইবার সামিল হয়। যে সকল সৃষ্টি (?) কেবল নূতন কিছু করিবার উন্মাদনা হইতে উদ্ভূত বেপরোয়া ভাব-বিলাস তাহাদের বিষয় কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বহুবিধ মতের অস্তিত্বের পরেও এইরূপ ঘন ঘন, নিত্য নূতন হইতে নূতনতর মতসৃষ্টির ফলে অনেক সুকুমার প্রতিভা সন্দেহ সংশয়ের দোলায় প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারে না। পরিণামে তাহার গতি প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসে। রূপগুণহীনা-পরুষপ্রকৃতি চপলা স্ত্রী আব্রুতা রক্ষায় সর্বদা সচেতন না হইতে পারে; কিন্তু লাবণ্যময়ী ব্রীড়ানম্রমূর্ত্তি পূর্ণনারীত্বগুণের অধিকারিণী উত্তমা সাধারণতই ভিরুস্বভাবা, স্বল্প কারণেই দ্বিধা সংকোচ তাহাকে ঘেরিবে; সরমভরে বারে বারেই সে অঞ্চল টানিয়া দিবে।

আস্ফালন কেঁদে মরে নিষ্ঠুর পাথরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আসছে ভাবনা ঠিক যেন আঁধারের ওপর
সরীসৃপের মত পদচারণা করে।
চোখে জল মোর,
কেমন করে চল্‌বে সংসার!
এসেছে দুর্দ্দিন,—মানুষের হাহাকার
যায়না ওরে!

বাঘের চোখের মত দিনগুলো আসতে থাকে,
পশুর মতই মনে হয় রাত্রিটাকে;
আস্ফালন কেঁদে মরে নিষ্ঠুর পাথরে।
শোণিতের স্রোত দোলে ধ্বংসের উতরোলে,
ধূসর ক্লান্তির-ছায়া সব দিকে,—ভাব্‌ছি অভাগার কথা

স্বপ্নের বীজ যা বোনা হয়েছিল, তার কোথায় ফসল!
সব শিখে মন বোবা। কে যে অসুর আর কে যে দেবতা
বুঝ্‌তে পারা গেল না, কিছুই হোলো না সফল।

এ সভ্যতা পাইথনের মত ক্রূর, চেয়ে আছে মোর পানে,
একটি নিমেষ বৃন্তে যে ফুল ফুটেও শাশ্বত হ'তে চায়
সেপেনো সৈনিকের সঙীনের খোঁচা,
আমাকে চল্‌তে হবে পৃথিবীর বেদনার গানে
তবুও চল্‌তে গিয়ে ভাব্‌তে হচ্ছে বিশ্রাম কোথায়!
কোন্ পথ সোজা!

দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, বন্যা, ঝড়, যুদ্ধ মহামারী
আর কত সহ্য হয়, বড় ক্ষুধা, ছিঁড়ে যায় নাড়ী।

জীবন-পূজারী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত গীতাঞ্জলি থেকে একটী মূল সুর উঠ্‌ছে: 'দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।' তোমাকে চাইছি কেন? 'আমার প্রিয়তম তুমি', কারণ, তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে', কারণ

জানি হে তুমি মম জীবনে প্রিয়তম,
এমনজন আর নাহি যে তোমাসম।

কারণ তোমাকে যে পেয়েছে—সে আর কিছু চাইবে না:

'না থাকে তা'র মান অপমান
লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্ব ভুবনময়।'

আমার জীবনে তুমি প্রেয়তম ব'লে তোমাকেই আমি চেয়ে আসছি:

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে,
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

তোমাকে—একমাত্র তোমাকেই যে আমি চাইছি—এই সত্যই জীবনের গভীরতম সত্য।

আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

একমাত্র তোমাকে আমি চাই ব'লেই যার মধ্যে তুমি নেই, তার মধ্যে আমার আনন্দও নেই:

কী ল'য়ে বা গর্ব্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।

আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ একমাত্র তোমার মধ্যে রয়েছে এবং সেই জন্যই সব কিছুর মধ্যে তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরছি—এই উপলব্ধি জীবনে যখন থেকে সত্য হয়ে উঠ্‌লো তখন থেকে ভগবানকে পাওয়ার জন্য অন্তরে জাগ্‌লো কান্না:

'এতদিন তো ছিল না মোর
কোন ব্যথা,
সর্ব্বঅঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিও না গো দিও না আর
ধূলায় শুতো॥"

আমার জীবনে তুমি প্রেয়তম, তোমার তুল্য সম্পদ আর নেই...এই উপলব্ধির সঙ্গে আরো একটা উপলব্ধি এসেছে কবির অন্তরে, আর এই দ্বিতীয় উপলব্ধি হ'চ্ছে: জগত থেকে দূরে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মধ্যে উদাসীন হ'য়ে তুমি নেই...সমস্ত মানুষকে, সমস্ত প্রকৃতিকে প্রেমে ব্যাপ্ত ক'রে তুমি আছো।

এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটীও
বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।

প্রতিটী মুহূর্ত্তের পরে অসীমের চরণ চিহ্ন, আমার সমস্ত দুঃখে তিনি, সমস্ত সুখেও তিনি।

দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে যে দেয়
পরশমণি।

এই জগৎ তো মায়া নয়। 'জলে স্থলে দাও হে ধরা, কত আকার ল'য়ে।' এই পৃথিবী বিশ্বরূপের খেলা ঘর। তাঁর আনন্দ থেকে এই সৃষ্টি। সমস্ত রূপেরলীলায় অরূপেরই অভিব্যক্তি।

'পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।'

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কোথাও অস্বীকার করেন নি, জগতকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেন নি। তাঁর কণ্ঠে জীবনের জয়গান।

যাবার দিনে এই কথাটি
ব'লে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।

আমি যে পৃথিবীতে এসেছি জন্মজন্মান্তরের খেয়া বেয়ে—তার কারণ আমার জীবনকে তুমি যে বাঁশি ক'রে বাজাতে চাও।

কত তীব্র তারে, তোমার
বীণা বাজাও হে।
শত ছিদ্র ক'রে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।

আমার জীবনকে তুমি তোমার সুরের লীলাতে ভরিয়ে তুলবে—তারই জন্য কোন্ আদি কাল হোতে আমাকে তুমি জীবনের স্রোতে ভাসিয়েছো।

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

আমার সঙ্গে তুমি যে মিলতে চাও!

আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌ছো কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।

আমাকে একদিকে যেমন তুমি চাইছো—আর একদিকে—তোমাকেও তেমনি আমি খুঁজে খুঁজে ফিরছি।

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আবার জনম হবে মোর।

তুমি যে রাজার রাজা হয়ে আমার জন্য কত মনোহরণ বেশে ফিরছো তার কারণ

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহে
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার দেবতা যে আমার জীবনপাত্রে এত রস নিমেষে নিমেষে ঢেলে দিচ্ছেন তার কারণ আমার দেহপ্রাণকে আশ্রয়ক'রে তিনি আনন্দের অমৃত পান করতে চান। আমার ভিতর দিয়েই স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে আস্বাদন করবার জন্য ব্যাকুল।

আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।' সেই জন্য আমার জীবনকে এমন করেই গড়তে হবে যেন আমার অনুভূতিতে তিনি সব সময়ের জন্যেই জেগে থাকেন, আমার এবং তাঁর মধ্যে এমন কোন আড়াল যেন না থাকে—যাতে আমার চেতনায় তাঁর অস্তিত্ব নিমেষের জন্যও বাধা পায়।

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তারধারার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি: ভগবানকে সত্য ব'লে মানতে গিয়ে জগতকে কোথাও মায়া ব'লে তিনি স্বীকার করেননি। ভগবানকে তিনি বারম্বার মানুষের মধ্যেই স্বীকার করেছেন।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনে তো তোমার সম্মুখে,
স'পিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে।

ভগবান সবহারাদের মাঝে 'রিক্ত ভূষণ দীন দরিদ্র সাজে' ফির্‌ছেন—এ সত্যকে একবার স্বীকার ক'রে নিলে আর্টের মধ্যে ডুবে থেকে কেবল কল্পনাকে নিয়ে বিলাস করা আর চলে না। তাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে:

এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর। ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।

কবির চেতনার আলো সেখানে ছড়িয়ে গেছে যেখানে

'স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।'

চেতনায় যেখানে শিলাইদহের পদ্মার নিভৃত চর তার চখাচখীর কাকলি-কল্লোল নিয়ে একান্ত সত্য হ'য়ে ছিলো সেখানে যখন ম্লান মুখে শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী নিয়ে নত শির সর্ব্বহারা মানুষ এসে দাঁড়ালো তখন রুদ্রবীণায় নূতন সুরে ঝঙ্কার উঠ্‌লো:

'কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন সে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হ'তে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

কণ্ঠ বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করেছে:

রাখোরে ধ্যান থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলা বালি।
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝ'রে॥

সমস্ত মানুষের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হওয়ার সত্যকে একবার স্বীকার করলে কর্ম্মযোগকে স্বীকার না ক'রে আর উপায় নেই। তখন ভগবান সাকার কি নিরাকার—এই তত্ত্ব নিয়ে আমরা ডুবে থাকতে পারি নে, কোনদিন বেগুন খেতে আছে এবং কোন দিন বেগুন খেতে নেই—এ সমস্যাও আমাদের মনকে বিচলিত করে না। চারিদিকের রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র মানুষগুলি তখন নিয়ত আমাদের চেতনায় অবস্থান করে। তখন আমরা শান্তি চাই নে—চাই জীবনের প্রাচুর্য্য, যার মধ্যে হাজার হাজার আধখানা মানুষ আস্ত মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন আমরা বলি :

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

তখন আমাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় :

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি'
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥
করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥ [নৈবেদ্য]

রক্তকরবীতে নন্দিনী বলেছে: 'শান্তি যদি পাই, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে।' একথা নন্দিনী বলতে পেরেছে—কারণ নন্দিনীর চিত্তকে বিচলিত করেছে যক্ষপুরীর আধমরা মানুষগুলি, যাদের মাংস-মজ্জা মন-প্রাণ ব'লে কিছু নেই—সব নিঃশেষ হয়েছে যক্ষপুরীর রাজার জন্য ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। প্রেম তো মানুষকে কখনো শান্তির মধ্যে ভাবের ললিত ক্রোড়ে ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেবে না—তাকে ধনুঃশর হাতে জীবনের কুরুক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবে শৃঙ্খলিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত জনসাধারণের অভিশপ্ত অস্তিত্বকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। সমস্ত রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে দুর্জ্জয় অভিমানের ডমরুধ্বনি রবীন্দ্র সাহিত্যের পর্ব্বে পর্ব্বে এর মূলে সেই দৃষ্টি যা ভগবানকে ডেকেছে—জগৎ থেকে দূরে নয়, এই জগতের 'সবার অধম দীনের হ'তে দীন-এর মধ্যে, বেণু বাজিয়ে তিনি আসছিলেন সে পথ সহসা যেথানে পরিসমাপ্ত হোলো সেখানে দেখলেন্

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।

প্রকৃতির বুক থেকে মানুষের মধ্যে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে, কল্পনা থেকে কঠিন নির্ম্মল সত্যে, ভাবের বিলাস থেকে কর্ম্মের জগতে এই যে নেমে আসা—এও এক রকমের জন্মান্তর।' এবার ফিরাও মোরে কবিতায় এই জন্মান্তরেরই কাহিনী। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় এই জন্মান্তরের ইতিহাস যেথানে ব্যক্ত হয়েছে সেখানে আছে :

সে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগতো কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্ম্মর,
বিরহী কোকিলের—
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হোতো মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগতো গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইসারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।
সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে—একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিলো
তারের পর নূতন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জন-সমুদ্রতীরে।
* * * * *
সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠ্‌লো সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো-বা নিতে হোলো ভেরী।

বলাকায় এই ভেরী নিনাদ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নবনব
আঘাত খেয়ে অচল রবো।

এই পৃথিবীরই তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। মানুষের মধ্যে কবির ডাক পড়েনি যতদিন, ততদিন হাতে তাঁর ছিলো একতারা। সেই একতারা বাজিয়ে

দিনগুলি তাঁর কেটে যেতো কোকিলের গান আর মৌমাছির গুঞ্জনের মধ্যে। মানুষের জগৎ তখনো অনেক দূরে। তার পরে এলো জীবনে আর এক অধ্যায়। পৃথিবীর যত দুঃখ, যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত অশ্রুজল—সমস্ত ভিড় করে এসে দাঁড়ালো কবির চেতনায়।

উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।

যেমন ভৃঙ্গের মতো কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরসপানে বিভোর ছিল—সে মন কোথায় হারিয়ে গেল। এলো নূতন মন, আর এই নূতন মনকে অধিকার ক'রে বসলো কঠিন বাস্তব। কোথায় গেল মুগ্ধ কোকিলের ডাক, আর কোথায় গেল আমের নবমুকুলের সৌগন্ধ্য! তৃণবিছানো সে পথ দিয়ে

বক্ষে আমার দুঃখে বাজে তোমার জয়-ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

রজনীগন্ধার পালা শেষ হোলো। কবির কাছে ডাক এলো কঠিন বাস্তবের রঙ্গভূমিতে ভীষণ সুন্দরের পূজায় রক্ত জবার মালা গাঁথবার জন্য। 'মুক্ত করোহে সবার সঙ্গে'—এ প্রার্থনা যার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, ভগবানকে যে স্বীকার করেছে সর্ব্বহারা হৃত আসন অপমানিত মানুষের মধ্যে—বিধাতার সুপ্তির পর্য্যঙ্কে কখনো তাকে শান্তিতে, আরামে জীবন-যাপন করতে দেবেন না, হাতে তরবারি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেবেন জীবনের রণক্ষেত্রে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য যে অন্যায় কোটী কোটী মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে···যে অন্যায় দুর্জ্জয় ঔদ্ধত্যের দ্বারা পৃথিবীকে নরকের সামিল ক'রে তুলেছে। তাই দেখি কবি ভগবানকে ভালোবেসে যা পেলেন তা মালা নয়, তা থালা নয়, তা গন্ধজলের ঝারিও নয়, তা ভীষণ তরবারি।

"অরুণ আলো জানলা বেয়ে পড়লো তোমার শয়নছেয়ে।
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে "কী পেলি তুই সারী।
এ নয় মালা- এ নয় থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি॥"

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

(১৪৪০—১৫৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ)

প্রথম পর্ব্ব

ক্ষুদ্রক চিত্রাঙ্কনে যে সকল শিল্পী কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয়ে তেমন কিছু জ্ঞাতব্য কথা প্রাচ্য লেখকদিগের উক্তি হইতে জানা যায় না। পাওয়া যায় শুধু গোটাকতক নাম আর অতিমাত্রায় প্রশংসার উচ্ছ্বাস। বায়জাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশংসাবাণী কিন্তু প্রতীচ্য দেশীয় সমঝদারদিগের মতের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইঁহাদেরই একজন বলিয়াছেন "পুঁথি-চিত্রণ ও পুঁথিপ্রসাধন (illustration and illumination of Mss.) শিল্পের অনুশীলন প্রসঙ্গে আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ (পারসীক) শিল্পীর হাতের কাজের শুধু টুকরা-টাকরা নমুনার সহিত পরিচিত, তাঁহাদের শিল্পোত্তম বায়জাদেই পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে (১)।

ইতিবৃত্তকার খোয়ান্দামীর—(Khwandamir) তাঁহার হবিব্-উস্-সিয়ার নামক পুস্তকে বলিয়াছেন "অদ্ভুতকর্ম্মা বায়জাদ সত্যসত্যই সে যুগে লোকের মনে বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। জগতের নরপতিগণের উপচিকীর্ষা তাঁহার উপর বর্ষিত হইত এবং ইস্‌লামীয় শাসকবর্গ তাঁহার প্রতি অসীম যত্নপ্রকাশে অবহিত হইতেন।" (২)

শিল্পীর বেলায় বংশানুক্রম অপেক্ষা গুরুপরম্পরার বিচারই অধিক প্রয়োজনীয়, কিন্তু বংশের দিকটাও একবার দেখিতে হয়। "মেনাকিব ই-পুনেরভেরণ" (চিত্রশিল্পীদিগের প্রশংসাবাদ) নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার আলি এফেন্দি লিখিয়াছেন যে বায়জাদ যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে পর পর বহু শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছিল। শিল্পীর বংশে শিল্পদক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া থাকে। বায়জাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা যে অনেকাংশে উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বায়জাদ ছিলেন তাব্রিজের বিখ্যাত ওস্তাদ পীর সৈয়দ আহাম্মদের শিষ্য। আরও দুইজন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম জানা গিয়াছে। একন পীর

(১) Col. V. Goloubiew, Cevânts propas to Ars Asiatica Vol XIII p. 6.

(২) সম্রাট বাবর বায়জাদের শিল্পের খবর রাখিতেন এবং তাঁহার চিত্রাদির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন মুখমণ্ডল অঙ্কনকালে বায়জাদ সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন নাই, কেবল শ্মশ্রুসমাবৃত মুখই তিনি ভাল করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন।"

সৈয়দ আহাম্মদের গুরু, ওস্তাদ জাহাঙ্গীর এবং অপর জন আচার্য্য জাহাঙ্গীরেরই পিতৃদেব ওস্তাদগুণ (১), যিনি ইরাণীয় শৈলীর প্রবর্ত্তক রূপে পরিচিত।

১৪৪২ খৃঃ অব্দে লিখিত (২) এবং এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত নিজামীর খামশা গ্রন্থের একখানি পুঁথিতে (Add. 25900) তদন্তর্গত অজ্ঞাতকুলশীল কয়েকখানি চিত্রের সহিত বায়জাদের নামাঙ্কিত চিত্রগুলির যে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়—তাহা নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণিত করে যে বায়জাদ একলাই একবারে বড় ওস্তাদ বনিয়া উঠেন নাই। গৌরীশঙ্কর মহাশৃঙ্গ হিমাচলের অন্যান্য শিখরগুলিকে উচ্চতায় সহজেই অতিক্রম করিয়াছে বটে কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ভৌগোলিক বৈজ্ঞানিকের নিকট নাম-না-জানা অপর শৈলগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির অনুশীলন নিতান্ত অপরিহার্য্য। শিল্পোত্তমের সার্থকতার দিক দিয়া শিল্পীর শ্রেয়স্কর পারিপার্শ্বিকের সন্ধান এই সকল চিত্র হইতেই অনুমান করা যায়।

১নং চিত্র

বায়জাদের হাত পাকিতে এবং ওস্তাদী কলমে চিত্র লিখিয়া তাঁহার শক্তিমান ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাইতে তাঁহার যৌবনসীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ণশক্তি যে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে প্রকাশমান হয় নাই—এইরূপই অনুমিত হইয়াছে।

বায়জাদের শিল্পীজীবন তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) হীরাট শিল্পকেন্দ্রে সুলতান হোসেন বাইকারার রাজত্বকালে—খৃঃ অঃ ১৪৬৮ হইতে ১৫০৬।

(২) উক্তকেন্দ্রেই হীরাটের সিংহাসনে বলপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত মহম্মদ খাঁ শৈবানির অধীনে—খৃঃ অঃ ১৫০৭ হইতে ১৫১০।

(৩) পশ্চিম পারস্যে তাব্রিজ কেন্দ্রে সাহ ইস্মাইল ও সাহ তামাস্পের শিল্পশালার প্রধান কর্ম্মচারী রূপে—খৃঃ ১৫২১ হইতে ১৫৩৪।

বায়জাদ কিছুকাল চিত্রকর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে সাহরুখ্‌ প্রতিষ্ঠিত পুস্তকপরিষদের (Academy of Booksএর) সহিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সাহরুখের মৃত্যু ঘটে ১৪৪৬, মতান্তরে ১৪৪৭ খৃঃ অব্দে। বায়জাদ তখন ছয় সাত বৎসরের বালকমাত্র।

২নং চিত্র

পুস্তক পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সুলতান হোসেন বাইকারার সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হোসেন বাইকারা (১৪৮৭-১৫০৬) ছিলেন তৈমুরলঙ্গের ওমান সেখ নামক এক পুত্রের প্রপৌত্র। মুদ্রাযন্ত্র তখন প্রচলিত হয় নাই। হস্তলিখিত পুঁথিগুলি চিত্রণের জন্য উৎকৃষ্ট শিল্পীই নিয়োজিত হইতেন—বিশেষ করিয়া এরূপ একটি সুবিখ্যাত রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে।

আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ অব্দে বায়জাদ সুলতান হোসেনের উজির, একাধারে কবি ও চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত, মীর আলিশীরকে পৃষ্ঠপোষক-রূপে প্রাপ্ত হন। সুলতান হোসেন নিজেও সাহিত্য-প্রেমিক ও রসজ্ঞ সমঝ্‌দার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহনামার নূতন সংস্করণ তাঁহারই উৎসাহে ও সহায়তায় সুসম্পূর্ণ হয়। এরূপ একজন প্রিয় চিকীর্ষু অন্নদাতা বায়জাদের ভাগ্যে পূর্ব্বে আর মিলে নাই। ইউসুফ জুলেখা

(১) কোনও কোনও গ্রন্থে এ নামটি মূকার্থবাচক 'গুঙ্গ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু ম'সিয়ে সাকিসিয়ান সযত্নে এ ভ্রমের নিরসন করিয়াছেন।

(২) ১৪৪২ খৃঃ অব্দে লিখিত হইলেও পুঁথিখানির চিত্রগুলি যে পরে আঁকা হইয়াছিল এইরূপই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কাব্যরচয়িতা স্বনামধন্য কবি জামি বায়জাদের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ে যে পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

মেশেদ নগরের বিখ্যাত লিপিকার সুলতান আলি লিখিত একখানি পুঁথিতে বায়জাদ যে চিত্র সংযোগ করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সমসাময়িক চিত্রিত পুঁথির যে সকল ক্ষুদ্রক চিত্র ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বায়জাদের শিল্পরীতি আলোচিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই যে সন্দেহের বহির্ভূত একথা বলা চলে না। এমন কি তাঁহার নামাঙ্কিত ক্ষুদ্রক চিত্রগুলিও তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত কিনা তাহা লইয়া কয়েক ক্ষেত্রেই সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছে। ১৪৪২ খৃঃ অব্দের "খাম্‌সা" পুঁথি ব্যতীত আরও যে কয়খানি পুঁথির চিত্র বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) চেষ্টার বিয়েটী (Chester Beatty) সংগ্রহের অন্তর্গত সেখ সাদী বিরচিত একখানি "বোস্তাঁ" পুঁথির সকল চিত্রগুলিই বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(২) কায়রোর রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি বোস্তাঁ পুঁথির চিত্রও তাঁহারই তুলিকাপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত। এ উক্তি শুধু পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের(১) মতানুযায়ী নয়, আধুনিক সুপণ্ডিত জনৈক পারসীক লেখকেরও(২) ইহাই অভিমত।

(৩) নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম নামক গ্রন্থাগারের সচিত্র "হফ্‌ত পাইকার" পুঁথির চিত্রগুলি বায়জাদের প্রথম বয়সের চিত্র শিল্পের নমুনা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

(৪) বষ্টন মিউজিয়মে রক্ষিত সারফদ্দিন আলি ইয়েজ্‌দি রচিত "জাফর নামা" নামক তৈমুরলঙ্গের সচিত্র জীবনচরিত বিষয়ক পুঁথিখানিতে যে দ্বাদশসংখ্যক চিত্র আছে তাহার সবকয়খানিই যে বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত এ মত একজন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য কোবিদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে(৩)। পূর্ব্বোক্ত পারসীক সমালোচক মোহসিন্ মোঘদামও ইহারই সহিত একমত(৪)।

আমরা যেভাবে পুঁথিগুলির উল্লেখ করিয়াছি সেই পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াই তদন্তর্গত চিত্রগুলির আলোচনা করিব।

পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের "খামশা পুঁথির (Add. 25900) সব কয়খানি চিত্রেই চিত্রকরের নাম লেখা আছে, আর যদি নাও থাকিত তাহা হইলে ওস্তাদ শিল্পীর "কলম" চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইত না। চিত্রগুলির মধ্যে যে তিনখানি বায়জাদের নামাঙ্কিত তাহার মধ্যে একখানি লয়লা মজ্‌নুন্ কাহিনীর(১)। নায়ক ও নায়িকার আপন আপন গোষ্ঠী-ভুক্ত দুই উষ্ট্রারোহীদলের যুদ্ধ-সংঘাতের ইহা একখানি অপূর্ব্ব চিত্র। উভয়পক্ষের বিবদমান যোদ্ধ্‌গণই যে শুধু পরস্পরের প্রতি নির্ম্মমভাবে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত তাহা নহে, তাহাদের বাহন উষ্ট্রগুলিও রোষ-কষায়িত লোচনে প্রতিপক্ষের উষ্ট্রদিগের প্রতি চাহিয়া সবেগে দন্তঘর্ষণ করিতেছে। ক্রুদ্ধ চাহনির চটক বাড়িয়াছে উষ্ট্রগুলির নয়নমণি বেষ্টন করিয়া সোণালী রঙের ব্যবহারে। চিত্রপটের বর্ণাভাস বেশ নয়ন স্নিগ্ধকর, কোথাও চোখে বাধে না। মজ্‌নুন্ এই নির্ম্মম যুদ্ধ ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী নরহত্যা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া

৩নং চিত্র

দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, জীবিতাশানিরপেক্ষ, ব্যর্থমনোরথ নায়কের আননে দুঃসহ দুঃখ দেদীপ্যমান—যেন উভয়পক্ষের এই নিরর্থক বিপৎপাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

চিত্র পরিচয়ের জন্য লয়লা মজ্‌নুন্ আখ্যায়িকার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। ইহা নিজামীর কাব্য-পঞ্চকের (খাম্‌সা গ্রন্থের) অন্যতম। নায়ক ও নায়িকা বেদুইন আরবদিগের বিভিন্ন কৌমে (tribeএ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় কৌমে সদ্ভাব ছিল না। ইহাই যে মিলনের একমাত্র অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহা নহে। কবি বলিয়াছেন প্রকৃত প্রণয়ের পথ বিঘ্নসঙ্কুল না হইয়া যায় না। এক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই। যে প্রেমের সূচনা হয় বাল্যাবস্থায়, বিদ্যালয় গৃহে, মজ্‌নুনের প্রণয়াতিরেকে উন্মত্ততার জন্য পরিণয়ে তাহার পরিসমাপ্তি হইল না। প্রণয়ীর চোখ ছাড়া করার জন্য লায়লীকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে লুকাইয়া রাখা হইল। মজ্‌নুন্ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন বটে

(১) M. Charles Huart, Les calligraphes et les miniaturistes Mussalman, p. 326 et seq.

(২) M. Mohsin Moghadam in Cahior Person, Messages d'orient, p. 125.

(৩) V. Goloubiew in Ars Asiatica, Vol XIII, p. 7.

(৪) Cahior Persan, loe. cit.

(১) এই তিনখানি চিত্রই বায়জাদের প্রথম বয়সের অঙ্কন পদ্ধতির নমুনা স্বরূপ।

কিন্তু তাঁহাকে সত্বর সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। মজ্‌নুন্ দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা সালিম আমিরী ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত দাম্ভিক ব্যক্তি। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি লায়লীর পিতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সে দম্ভপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। লায়লীর পিতা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে এরূপ এক উন্মাদের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথা তিনি বিবেচনা করিতে অক্ষম, যদি কায়েস্ আরোগ্য লাভ করে তবেই ইহা উত্থাপন করা যাইতে পারে। বলিয়া রাখি, মজ্‌নুনের প্রকৃত নাম কায়েস্। প্রেমোন্মাদ বলিয়া উন্মাদবাচক মজ্‌নুন শব্দ তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পর অনেক কিছু ঘটিল, মজ্‌নুন জনহীন প্রদেশে পলায়ন করিলেন। অবশেষে, অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে পাওয়া গেল নিতান্ত অবসন্ন অবস্থায়। এবার তিনি তীর্থ-যাত্রীরূপে মক্কাসরীফে প্রেরিত হইলেন কিন্তু সেখানে গিয়া যে প্রণয় এখন তাঁহার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা না করিয়া বর চাহিলেন যে তাঁহার এ অপার্থিব চিরন্তন প্রণয় যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যেন উহা কদাচ ক্ষুণ্ণ না হয়। বিস্তারিতরূপে এ কাহিনী বিবৃত করা এ স্থানে সম্ভব নয়। মজ্‌নুন লোকালয় ছাড়িয়া মরু মধ্যে চলিয়া গেলেন। চিত্রী আঁকিয়াছেন বন্যজন্তুপরিবৃত তাঁহার এ মরুবাসের চিত্র। এ চিত্রের কথা পরে বলিতেছি। এই মরু মধ্যেই তিনি প্রত্যাশিতভাবে মিত্রলাভ করিলেন, এখানেই সেখ নওফল নামক একজন হিতার্থীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এক লায়লী ব্যতীত মজ্‌নুনের প্রার্থনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বন্ধুকে জানাইলেন লায়লীকে লাভ না করিতে পারিলে তিনি আর বাঁচিবেন না। ইহার ফল হইল উল্টা রকমের। নওফল বলপ্রয়োগ করিয়া লায়লীর পিতাকে কন্যাদান করিতে বাধ্য করিবেন স্থির করিলেন। চিত্রকর দেখাইয়াছেন এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া ব্যর্থকাম হতাশাচ্ছন্ন মজ্‌নুন্ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। যুদ্ধে নওফল জয়লাভ করিলেন বটে কিন্তু লায়লীর পিতা বরং কন্যার প্রাণনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন তথাপি এ বিবাহে মত দিলেন না। লয়লার ইবন্ সালাম্ নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইল কিন্তু একনিষ্ঠ লায়লী পবিত্র প্রণয়ের ব্যভিচার ঘটিতে দিলেন না ; ইবন্ সালাম্ আয়ানের ন্যায় নামেই স্বামী হইয়া রহিলেন। স্বামী বর্ত্তমানে লায়লীর সহিত মজনুনের আর চাক্ষুষ হয় নাই। তিনি একবার এক দরবেশের কৃপায় সঙ্কেত স্থলে উপনীত হইয়া দূর হইতে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন মাত্র। ইবন্ সালামের মৃত্যু ঘটিলে উভয়ের একবার মিলন হইয়াছিল কিন্তু এ মিলনানন্দের তীব্রতা মজ্‌নুন্ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। এক সময়ে যে মজ্‌নুন্ শুধু প্রণয়িণীর দর্শনলাভ মানসে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ছল অবলম্বন করিয়া এক বৃদ্ধার উন্মাদ পুত্র পরিচয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় লায়লীর বস্ত্রাবাসের দ্বারদেশে নীত হইয়াছিলেন (১) আজ তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ক্ষণেকের তরে লয়লাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আবার পরক্ষণেই প্রণয়ের সে হেমশৃঙ্খলের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং উন্মাদের ন্যায় বিকট চিৎকার করিয়া মরু মধ্যে পলায়ন করিলেন। ইহার পর আশাহত লয়লা দেহত্যাগ করিলে উপবাসক্লিষ্ট ক্লিন্ন দেহ, শোকে মুহ্যমান মজ্‌নুন্ প্রিয়ার সমাধিক্ষেত্রেই মৃত্যু বরণ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন (২)।

(১) পারসিক চিত্রে এ ঘটনার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে।

(২) The poems of Nizami, Laurence Binyon p 13 ff

(ক্রমশঃ)

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) জড়-দেহে বিদেহীর আবির্ভাব

পৃথিবীর পরপারে মানবের দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম-জগৎ হ'তে বিদেহী বারংবার এখানে প্রকাশ হ'য়েছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল বহুরূপে। সূক্ষ্ম অর্থাৎ ছায়া-দেহে, তাঁদের আবির্ভাব বহুজন-বিদিত। স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকাশ তত সাধারণ না হ'লেও, সংখ্যায় নগণ্য নয়। আমাদের পূর্ব্বগামী পিতৃগণ আপন-আপন পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ স্থূল-দেহে,—রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় সাময়িক পুনর্গঠিত শরীর অবলম্বন ক'রে, সজীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ক'রে—আবার কিছুক্ষণের জন্য এ পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠ হতে অতীতের সেই পরিচিত স্বর বাহির হ'য়েছে ; পরিত্যক্ত আত্মজনের প্রতি পুরাতন দিনেরই মত স্নেহ-প্রীতি-অনুরাগ প্রকাশ ক'রে, আশীর্ব্বাণী বিতরণ ক'রে তাঁরা এখান হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি ও স্থূলমূর্ত্তি উভয়ের প্রকাশ মধ্যে প্রভেদ এই যে—সাধারণতঃ ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হয় অনাহূতভাবে। আমরা তাঁদের স্মরণ করি বা না করি, ছায়াময় বিদেহী-মূর্ত্তি আপনিই প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। কিন্তু স্থূল-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হবার জন্য তাঁদের কোন না কোন প্রকারে আবাহন করা অপরিহার্য্য। আবাহনের অনুষ্ঠান অবশ্য সর্ব্ব দেশে একই প্রকার নয়।

ভারতে সাধু ও সন্ন্যাসীরা যোগ-শক্তি প্রভাবে আমাদের পরলোকগত পরিজনকে আহ্বান ক'রে এনে স্থূলদেহে এখানে উপস্থিত করেছেন। পৌরাণিক বা প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করবার প্রয়োজন নাই।

'অতি' আধুনিক ও একান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ দু-টি ঘটনা মাত্র এখানে বর্ণনা ক'রব।

(১) ভারতের বহু-শ্রদ্ধাষ্পদ যোগীপুরুষ স্বামীজি ভোলানন্দ গিরি তাঁর আশ্রিত সন্তান সুপ্রসিদ্ধ গণিত-বিদ্যা-বিশারদ সোমেশচন্দ্র বসুকে দীক্ষা দানের সময় বসু মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁর স্বর্গতা পত্নীকে দীক্ষা-গৃহে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত স্থূল-দেহে উপস্থিত ক'রে উভয়কে একত্রে দীক্ষা-দান করেছিলেন—এ কথা স্বামীজির সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনীতে তাঁর এক সন্ন্যাসী-শিষ্য প্রকাশ করেছেন।১

(২) জ্যাকোলিও ছিলেন এক আধুনিক ফরাসী বিচারক। দাক্ষিণাত্যবাসী এক সন্ন্যাসী শুধু মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রার্থনা ক'রে জ্যাকোলিওর আপন বাস-গৃহে ধূমায়মান অঙ্গারের সন্নিকটে এক পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত বিদেহী ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—মূর্ত্তির ললাটে ছিল তিলক, কণ্ঠে উপবীত। বিচারপতি জ্যাকোলিও সেই মূর্ত্তির অনুমতি গ্রহণ ক'রে তার করস্পর্শে জীবিত দেহেরই উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপও করেছিলেন।২

পাশ্চাত্যেও বিদেহীর স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য কিছু অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন যোগী বা সাধুর সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, মার্কিন আদি নানা স্থানে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক—কেহ কেহ আপনার নিজস্ব গবেষণা-গৃহেই,—বিদেহীকে স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য আবাহন ক'রেছেন এবং শক্তিশালী মিডিয়ামের সহায়তায় অনেক স্থলেই আত্মীয় ও অনাত্মীয় বহু বিদেহীজনের স্থূল-মূর্ত্তিতে আবির্ভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ গেলে দীর্ঘ দিন গবেষণা ও পরীক্ষার পর এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—যখন তাঁরা এই ভাবে আবির্ভূত হন তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় মুখে প্রকাশ পায় জীবিত জনের সকল লক্ষণ। শান্ত ও অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যে তাঁরা পরীক্ষকদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন; এ সকল পরীক্ষার গুরুত্ব যে কত, তাও যেন তাঁরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন।৩

সুধী-সমাজে ও বিজ্ঞান-রাজ্যে যাঁদের নাম জগতে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেছে, এমনি কয়েকজনের এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ ক'রব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ান্ পণ্ডিত সীজার্‌লম্‌ব্রোসে চক্রে তাঁর বিদেহী জননীর স্থূল-দেহে আবির্ভাব দর্শন ক'রে বলেছেন,—আমার লোকান্তরিতা জননীর অনুরূপ একটি নীতি-দীর্ঘ মূর্ত্তি, অবগুণ্ঠিত মুখে যবনিকার নিকট হ'তে অগ্রসর হ'য়ে এসে ক্ষীণ স্বরে আমায় কয়েকটি কথা বলেছিল। কথাগুলি বেশ শুনতে না পেয়ে আকুল আগ্রহে তার পুনরুক্তি চেয়েছিলাম। মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত ক'রে, "সীজার্, পুত্র আমার,"—এই কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি আমার মুখ-চুম্বন করলেন।

তারপর মিডিয়াম ইউসেপিয়ার পরবর্ত্তী বিভিন্ন চক্রে অন্ততঃ বিংশতি বার জননীর মূর্ত্তি প্রকাশ হ'তে দেখেছি; তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'য়েছে—"পুত্র আমার, রত্ন আমার" (My son, my treasure). প্রত্যেকবারই তিনি আমার ললাট ও ওষ্ঠ চুম্বন করেছিলেন।৪

(২) জগৎ-বিখ্যাত সুধী কনান্ ডয়েল বলেছেন,—মিডিয়াম্ কুমারী রেসিনেট্ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সম্মুখে আমি আমার স্বর্গতা মাতৃদেবী ও বিদেহী ভাগিনেয় অস্‌কার্ হর্‌নাংকে সম্পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'তে দেখেছি; মূর্ত্তিগুলি এত স্পষ্ট যে আমার জননী-মূর্ত্তির ললাটে বলি-রেখা ও অস্‌কারের মুখে প্রত্যেকটি চিহ্ন গণনা করা যায়। মিডিয়াম্ ইভান্ পাউয়েলের উপস্থিতিতে আমার পরলোকগত পুত্র প্রকাশ হ'য়ে তার চির-পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রেছে। আমার বিদেহী ভ্রাতা সেনাপতি ডয়েল্ এই মিডিয়াম্‌কে অবলম্বন করেই প্রকাশ হয়েছিলেন এবং তাঁর অসুস্থা পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে এক ডেনীশ্ চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভ্রাতা অবশেষে বলেছিলেন—"সত্যই আমি ইন্‌স বিদেহী ইন্‌স, তোমার সহোদর।"৫

(৩) জার্ম্মানীর বিশিষ্ট সুধী ব্যারণ্ নট্‌জিং তাঁর আপন গবেষণা-গৃহে বিভিন্ন মিডিয়ামের সহায়তায় এই ব্যাপারে কয়েক বৎসর অশ্রান্ত সাধনা করেছেন। আধুনিকতম কয়েকটি ক্যামেরা অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সেই গৃহে স্থাপিত হয়েছিল,—যেন পরীক্ষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। ফ্রান্সের এক বিদুষী মহিলা—শ্রীমতী বিশন্ এই গবেষণায় নট্‌জিং-এর সহকর্ম্মী ছিলেন।

এই সকল গবেষণা পরিচালনার মধ্যভাগে শ্রীমতী বিশনের স্বামী, ফরাসী নাট্যকার আলেক্‌জান্দ্রে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তের কয়েক মাস মধ্যেই আলেক্‌জান্দ্রে একদিন পূর্ণ সুগঠিত দেহে সেই গবেষণা-গৃহে প্রকাশ হন। নট্‌জিং ও শ্রীমতী বিশন্ উভয়েই সেই মূর্ত্তিকে অভ্রান্তভাবে চিনেছিলেন। নট্‌জিং আপন হাতে পাঁচটি পৃথক্ ক্যামেরায় সেই মূর্ত্তির নয়খানি আলোক চিত্র গ্রহণ করেন। বিশন্ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এই সকল আলোক চিত্র যে আলেকজান্দ্রের, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হন।৬

বিদেহী আলেকজান্দ্রের সুঠিত মূর্ত্তি

কত আকুলতা, কত ঐকান্তিকতা নিয়ে বিদেহী কখনো কখনো প্রিয় সুহৃদ্‌গণের কাছে এইভাবে উপস্থিত হন, সে সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

---

১. ধ্রুবানন্দ গিরি—শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত। পৃঃ ১৩৯-১৪০

২. Jaccoliot-Cocault Science in India. p. 266-270

৩. *Lombroso*—After Death—What. p. 68-69.

৪. Not infrequently the faces were self-luminous. The faces were alive; they looked keenly and fixedly at the experimenters. Their looks were grave, calm and dignified. They seemed conscious of the importance of the matter.

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 252.

৫. *Sir Wm Merchant*—Survival. p. 104-105.

৬. *Notzing*—Phenomena of Materialization. p. 167

(৪) সার্ভিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজদূত—এস, সি, মিয়াটোভিচ্ (যিনি বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ড, রুমেনিয়া, তুর্ক প্রভৃতি রাজ-সকাশে আপন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন) তাঁর একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণন ক'রে পরম বিস্ময়ে বলেছেন—(মিডিয়াম শ্রীমতী রীটের চক্রে সেদিন) যে মূর্ত্তিটি প্রকাশ হয়েছিল সে কোন ছায়া-দেহ বা অপরিস্ফুট মূর্ত্তি নয়; সে আমার পরলোকগত বন্ধু ষ্টেড্ (W. T. Stead) স্বয়ং—অভিন্ন ও পরিপূর্ণ ভাবেও সাধারণ পরিচ্ছদে প্রকাশিত। ("...Not the spirit, but the very person of my friend William T. Stead...in his usual walking costume)। আমার সাথী, ক্রোশিয়ার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার ডাঃ হিঙ্কোভিচ্, বন্ধু ষ্টেডের মাত্র আলোক চিত্রের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনিও সেই মূর্ত্তি প্রকাশ হতেই বল্লেন—"এ যে মিষ্টার্ ষ্টেড্।"

তারপর আমরা তিনজনেই এই কথাগুলি সুস্পষ্ট শুনেছিলাম,—"হাঁ, আমি ষ্টেড্, উইলিয়াম্ টি, ষ্টেড্। বন্ধু মিয়াটোভিচ্! মৃত্যুর পরেও যে মানবের অস্তিত্ব থাকে, তার অবিসম্বাদী প্রমাণস্বরূপ আজ নিজেই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। যখন পৃথিবীতে ছিলাম, এ সম্বন্ধে আপনার পূর্ণ বিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম হই নি। আজ আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; আজ আমায় দর্শন ক'রে আপনি অসংশয়ে পরিজ্ঞাত হ'ন—মৃত্যুর পরেও মানবের জীবন একান্ত সত্য"।৭

ছায়া মূর্ত্তিতেই হোক্, অথবা সাময়িক পুনর্গঠিত স্থূল-দেহেই হোক্, পৃথিবীতে বিদেহীর আত্মপ্রকাশ তার আপন ইচ্ছাধীন। কখনো শত আবাহনেও আমরা তাঁদের দর্শন পাই না, কখনো বা স্মরণ মাত্রে বা অল্পক্ষণ মধ্যেই যাঁকে স্মরণ করি তাঁর (অথবা অপর কোন বিদেহী জনের) প্রকাশ হ'তে দেখা যায়।

ইহলোকে এসে প্রকাশমান হবার জন্য বিদেহীর কিছু অনুশীলন আবশ্যক। বিনায়াসে তাঁদের পক্ষে এখানে প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় না।৮

আমাদের এ পৃথিবীর উপাদান হ'ল স্থূলবস্তু। পর্ব্বত, নদী, বায়ু সকলই স্থূল-বস্তু ভিন্ন সূক্ষ্ম নয়; প্রত্যেকেরই উপাদান স্থূল মিশ্রিত পদার্থ।

এ পৃথিবীর বহির্ভাগে বিদেহী যেখানে নিবাস করেন—সে এক সূক্ষ্ম জগৎ; তাই সে স্থান আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। সেই সূক্ষ্ম জগতের উপাদান কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-বস্তু, যাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান নাম দিয়েছে—ইথার্। এই ইথার্ আমাদের এ পৃথিবীতেও পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, সকল স্থূল বস্তুকে বেষ্টন ক'রে এবং তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান সংগ্রহ ক'রে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে।

পৃথিবীর অতীত পারলৌকিক জগৎ, অন্ততঃ তার বিস্তৃত এক অংশ গঠিত হ'য়েছে শুধু ইথার্ বস্তু দিয়ে, যার সঙ্গে স্থূলের কোন সম্বন্ধ নাই। সে জগতের অধিবাসীর দেহের উপাদানও এই ইথার্।৯ সেই সূক্ষ্ম দেহে ঐ সূক্ষ্ম জগতের নব আবেষ্টনে বিদেহী পূর্ণজ্ঞানে বিচরণ করেন।১০ তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রকৃতি ও স্মৃতি সবই সেখানে অব্যাহত থাকে।১১ পরিত্যক্ত স্বজনের প্রতি প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে; তাই এ জগতে তাঁদের মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয়।১২

যে ইথার্ বস্তু এই বিরাট বিশ্বের সুদূরতম নক্ষত্রেও বিস্তৃত হ'য়ে আছে,১৩ যে ইথার্ ইহ ও পর-জগৎ উভয় স্থানেই সমভাবে পরিব্যাপ্ত১৪ তারই প্রসাদে বিদেহীর আবার এ জগতে সাময়িক প্রকাশ কার্যতঃ সম্ভব হয়।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বলেছেন—মানবের পারলৌকিক দেহ তার পার্থিব দেহেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ-দর্শন।১৫ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।১৬

কিন্তু বিদেহীর শরীর সূক্ষ্মবস্তু নির্ম্মিত, তাই সচরাচর আমাদের দৃষ্টির গোচর নয়। যদি বিদেহী তাঁর সেই সূক্ষ্মদেহে পার্থিব পরমাণুর

৭. Usb. *Moore*—The voices. p. 5-6.

৮. There is a certain effort and a certain shyness in manifesting. *Stead*—After Death p. 133.

৯. These bodies must be made either of ether, or something equally as intangible to us in our present condition.

Lodge—Raymond, p. 319.

১০. We continue to exist as seperate thinking units in the etheric world as much as we do to-day, but with new surroundings.

Findlay—On the Edge of the Etheric.

১১. We find that personality and charactar and memory do survive.

১২. *Lodge*—Phantom Walls. p. 99.

১৩. This ether is what interpenetrates all matter; it extends to the farthest star, there is no break in its continuity.

Lodge—Phantom Walls. p. 51.

১৪. The ether of space can now be taken as the one great unifying link between the world of matter and that of spiris.

Findley—On the Edge of the Etperic. p. 39.

১৫. যাদৃশ তস্য মানুষং রূপং আসীৎ পুরাতন।
কিঞ্চিৎ তস্য তু সাদৃশ্যং তত্রাপি প্রতিপদ্যতে॥

গরুড় পুরাণ—প্রেতখণ্ড

১৬. Our etheric body is in every respect a duplicate of our physical body.

Findley—On the Edge of the Etheric. p. 168.

একটা ক্ষীণ আচ্ছাদন সাময়িক আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, তবে এ জগতে ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তিতে তাঁর প্রকাশ সহজেই সংঘটিত হয়।১৭

বিদেহীর স্থুল-দেহে পৃথিবীতে প্রকাশের প্রক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ। জীবিত সকল প্রাণী-দেহের মূলবস্তু হ'ল প্রটোপ্লাস্‌ম্ (protoplasm) যাকে বাংলা ভাষায় বলা হয়—জীবনমূল বা জৈবসামগ্রী। জীবের জীবনী-শক্তি, কর্ম্মতৎপরতা দেহের গঠন—সকলেরই ভিত্তি হ'ল—প্রটোপ্লাস্‌ম্। এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণী-দেহে সুরক্ষিত থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, এমন কোন কোন মানুষ আছেন যাঁকে চক্রকক্ষে মোহিস্কু (hypnotiza) করা হ'লে, তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থান (নাসিকা, মুখ, অঙ্গুলিপ্রান্ত প্রভৃতি) হ'তে এই জৈব-সামগ্রী ধূমের মত বা মেঘের মত নানা অদ্ভুদ আকারে নির্গত হ'তে আরম্ভ হয়। এই বস্তুর নাম-করণ হয়েছে—এক্‌টোপ্লাস্‌ম১৮ extraded protoplasm)

মিডিয়ামের দেহ হ'তে নিঃসৃত হবার পর অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই গঠনহীন ধূম-সদৃশ পদার্থটি ঘনীভূত হ'তে আরম্ভ হয় এবং তা হ'তে প্রায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হয়ে ওঠে একটি পূর্ণ নরদেহ বা নরদেহের কোন অংশ—হাত, পা, মুখ ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ গেলে বলেছেন—এই সকল সদ্য-গঠিত মূর্ত্তির উদ্ভব হয় প্রধানতঃ মিডিয়ামের দেহ হ'তে নিঃসারিত মূল-পদার্থ হ'তে।১৯ প্রকাশ হবার পর এই সকল মূর্ত্তি জীবিত মানবের মতই ক্রিয়াশীল হয়। কোন প্রভেদ থাকে না। আবার অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি কোনও অপূর্ব্ব উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।২০

এগুলি যে সত্যই বাহিক মূর্ত্তি—কল্পনা বা অবাস্তব নয়, ভ্রান্ত-দৃষ্টি প্রসূত নয়, তার প্রমাণ এই যে বহু জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক,—ক্রুক্‌স্ জজ্, রীচে, মর্শেলী, নট্‌জিং, ক্রফোর্ড, ওকোরউইজ্, গেলে প্রভৃতি,—পরীক্ষা গৃহে এগুলি স্বচক্ষে গঠিত হ'তে দেখেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল মূর্ত্তির আলোক-চিত্রও গ্রহণ করেছেন।২১ অনেকেই এই সকল মূর্ত্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, তাদের স্পর্শও লাভ করেছেন এবং অন্যের অজ্ঞাত অতীতের অনেক ঘনিষ্ঠ বার্ত্তাও তাঁদের মুখ হ'তে শুনেছেন।

জীব তার স্থুল দেহের প্রত্যেকটি কণা এ পৃথিবীর পঞ্চভূতকে প্রত্যর্পণ করে পরপারে যাত্রা করে। কি ভাবে আবার সেই দেহকেই পুনর্গঠন করে তার এখানে আবির্ভাব সম্ভব, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক চার্লস রীচে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—এই ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কিন্তু তা হ'লেও যে বস্তু সত্য তাকে ত অস্বীকার করবার উপায় কিছু নাই।২২

১৭. When he coats the surface of his body with a film of etheric matter just dense enough to reflect light and become visible, he appears with the same features as when living in his physical body. *Cooper*—Methods of Psychic Development, p. 32.

১৮. Ectoplasm or extruded protoplasm—a temporarily extraneous portion of the organism...It is claimed that by means of this strange material actual materialisation may occur so as to display and bring into the region of matter forms which had previously in the ether.

Lodge—Why I Believe in Personal Immortality. p. 58-59.

১৯. The genesis of materialisation is now well-known : the materialised organs and tissues are produced from a primary substance which proceeds mainly from the medium...

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 213.

২০. The disappearance of materialized forms is as curious as their formation.

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 189.

২১. The objective reality of these forms is proved by photographs taken by flashlight.

Geley—Ditto. p. 176.

২২. We are dealing with facts as yet inexplicable, and await further elucidation. But there is no reason to deny a fact because it is inexplicable.

Richet—Thirty Years of Psychical Research. p. 476.

(ক্রমশঃ)

বিজয়া

রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রাণের পরশ যেথায় পেয়েছি, সেথায় ছুটিয়া যাই,—
কেহ আসে কাছে, দূরে যায় কত—তোমারে ত ভুলি নাই !
প্রেম-চন্দন মাখিয়া অঙ্গে হস্তে বাঁধিব রাখী
মিলিত-হিয়ার গীতি-অনুভব—আঁখিতে মিলায়ে আঁখি।
সারা বরষের গ্লানি মুছে যাক 'বিজয়ার' মধুছন্দে
বাধা-বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটী মিলনের বাহু বন্ধে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

চতুর্থ প্রকরণ—অমাত্যোৎপত্তি

অষ্টম অধ্যায়

মূল :—সহাধ্যায়িগণকে (রাজা) অমাত্য করিবেন, যেহেতু (তাঁহাদিগের) শুচিতা ও সামর্থ্য (তাঁহার পূর্ব্ব) দৃষ্ট—ইহাই ভারদ্বাজ (বলিয়া থাকেন)। তাঁহারা ইহার বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :···অমাত্য—রাজ-সহায় ; তাঁহাদিগের উৎপত্তি—করণ, স্থাপন, নিয়োগ—এই প্রকরণের বর্ণনীয় বিষয়। বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী রাজাও সহায় ব্যতিরিক্ত রাজ্য-পালনে অসমর্থ—এই কারণে সহায়-নিয়োগের প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে (গঃ শাঃ)।

অমাত্যপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য কাঁহারা—এ সম্বন্ধে ভরদ্বাজাদি সপ্ত আচার্য্যের সপ্তপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমে ভারদ্বাজ-সিদ্ধান্ত। দৃষ্টশৌচসামর্থ্যত্বাৎ (মূল) শৌচ—হৃদয়শুদ্ধি (গঃ শাঃ)। ভাবশুদ্ধি **honesty (SH)** ; **purity of the mind**, সামর্থ্য—কার্য্য-নৈপুণ্য (গঃ শাঃ) ; **capacity** (SH)। একসঙ্গে অধ্যয়নকালে সহাধ্যায়ীর মানসিক শুচিতা ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ ভ্রমাত্মক না হইলেও মূলানুগ নহে।—'as (their) purity (of mind) and ability is known......since they become the object of his confidence'—এরূপ হওয়া উচিত। 'Bhardvaja is perhaps identical with the Kaninka Bharadvaja (i.e., Kaninka, the son of Bharadvaja) who is quoted as an anthority further on (v. 5). Kaninka occurs in the Mahabharata (I. 140) as Kanika, the learned minister of king Dhritarashtra and reputed author of certain maxims on the subject of Polity, which agrees closely with the teachings of Kautilya'—Jolly.

মূল :—না—ইহাই বিশালাক্ষ (বলেন)। একসঙ্গে ক্রীড়া করার ফলে ইহাকে (তাঁহারা) অবজ্ঞা করেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা ইহার সহিত গোপনীয় সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাঁহাদিগকে অমাত্য করিবেন—যেহেতু (তাঁহাদিগের) শীল ব্যসন সমান; (রাজা আমাদিগের) মর্ম্মজ্ঞ এই ভয়ে তাঁহারা উঁহার (প্রতি) অপরাধ করেন না।

সঙ্কেত :—বিশালাক্ষ :—'The large-eyed', i.e., the god Shiva, is in the Mahabharata (XII. 59) mentioned as the author of the Vaishalaksham, in which the original treatise of Brahman on the three objects of man, etc., was reduced to 10000 chapters'—Jolly. গুহ্যসধর্ম্মাণঃ—গোপন ধর্ম্ম যাঁহাদিগের সমান। গণপতিশাস্ত্রী এস্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে 'শীলচ্যুতি' (দুষ্কর্ম্ম—পরদার-গ্রহণাদি) বুঝিয়াছেন ; **"whose secrets, possessed of in common, are well known to him" (SH)**—শেষ অংশটুকু (**are well known** ইত্যাদি) নিষ্প্রয়োজন। সমানশীলব্যসনত্বাৎ—শীল হইতে ব্যসন (চ্যুতি)—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর সম্মত অর্থ। শ্যামশাস্ত্রীর মতে —শীল ও ব্যসন সমান—এই অর্থ—"possessed of habits and defects in common with the king." মর্ম্মজ্ঞভয়াৎ—মর্ম্মজ্ঞ-ভয় হেতু ; রাজা আমাদিগের মর্ম্ম (গুপ্ত দোষ) জানেন—এই ভয় আছে বলিয়া—out of fear that (the king) knows (our) secrets ; "lest he would letray their secrets" (SH)—ইহা অনুবাদই নহে। অপরাধ-রাজবিরোধিতা ; never hurt him (SH) —ইহাও অনুবাদ-পদ-বাচ্য নহে ; do not offend him— বলাই উচিত।

মূল :—এই দোষ সাধারণ—ইহাই পরাশর (বলেন)। তাঁহাদিগেরও মর্ম্মজ্ঞতা ভয়ে (রাজা) কৃত ও অকৃতের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন।

সঙ্কেত :—দোষ—দুঃশীলত্ব (গঃ শাঃ) ; কিন্তু দোষ অর্থে এখানে দুঃশীলতা বুঝিলে চলিবে না। বিশালাক্ষ বলিয়াছেন—রাজা গুহ্যসধর্ম্ম-বিশিষ্টগণের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া তাঁহারা রাজার নিকট অপরাধ করিতে চাহিবেন না। ইহার উত্তরে পরাশর বলিলেন—না, এ দোষ অপর পক্ষেও দেওয়া যায়। রাজাও জানেন যে এই অমাত্যগণ আমার মর্ম্মজ্ঞ—অতএব তিনি তাঁহাদিগের সুষ্ঠু কৃত ও অসুষ্ঠু কৃত সকল প্রকার কর্ম্মেরই সমভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন, Fear (SH) ; flaw বলাই উচিত। তেষাং মর্ম্মজ্ঞভয়াৎ—তাঁহারা আমার (রাজার) গোপনীয় মর্ম্মকথা জানেন—এই ভয়ে। কৃতাকৃতানি—অসুষ্ঠুকৃতানি (গঃ শাঃ) ; কিন্তু কৃতাকৃত অর্থে কেবল অসুষ্ঠুকৃত নহে ; কৃত—সুষ্ঠুকৃত ; অকৃত—অসুষ্ঠুকৃত ; good and bad acts (SH)। অনুবর্ত্তেত—অনুবর্ত্তন (অনুমোদন) করার সম্ভাবনা (রাজার পক্ষে)—সম্ভাবনায় লিঙ্। May follow (SH) ; may approve বলা উচিত।

মূল :—নরাধিপ যতগুলি লোকের নিকট গোপনীয় (কথা)

বলিয়া থাকেন, সেই কর্ম্ম দ্বারা অবশভাবে ততগুলি (লোকের) বশীভূত হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—এটি সংগ্রহ-শ্লোক। গুহ্য—গোপনীয় কথা—নিজের শীল-ভ্রংশ (গঃ শাঃ); secrets (SH)। বলিয়া থাকেন—প্রকাশ করেন—discloses. অবশ :—অধীর: (গঃ শাঃ); in all humility (SH); 'অবশ'—অর্থে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও যেন দৈবপ্রেরিত হইয়া অবশভাবে ("করিষ্যস্যবশো হি তৎ"—গীতা)। অতএব, পরাশর-মতে গুপ্ত-সধর্ম্মাকে মন্ত্রী করা উচিত নহে।

মূল :—যাঁহারা ইঁহার প্রাণঘাতী আপৎসমূহে উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অমাত্য করিবেন। যেহেতু (তাঁহাদিগের) অনুরাগ-দৃষ্ট-(পূর্ব্ব)।

সঙ্কেত :—এ সম্বন্ধে পরাশরের সিদ্ধান্ত এইবার বলা হইতেছে। অনুগৃহ্নীয়ুঃ—এ স্থলে সম্ভাবনায় লিঙ্, নহে—অতীতকালের অর্থ—অনুগ্রহ প্রদর্শন (উপকার) করিয়াছেন। প্রাণাবাধযুক্তাসু—প্রাণের বাধা (অর্থাৎ প্রাণহানি) ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনাযুক্ত।

মূল :—না—ইহাই (বলেন) পিশুন। ইহা ভক্তি—বুদ্ধির গুণ নহে। গণনা-বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত যাঁহারা যথাদিষ্ট অর্থ অথবা ততোধিক করিতে পারেন, তাহাদিগকে অমাত্য করিবেন। কারণ, (তাঁহাদিগের) গুণ দৃষ্ট (পূর্ব্ব)।

সঙ্কেত :—পিশুন—নারদ (গঃ শাঃ)। প্রাণহানিকর বিপদে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া রাজাকে রক্ষা করায় প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—উহাতে বুদ্ধিনৈপুণ্যের পরিচয় কোথায়? অথচ অমাত্য হইতে হইলে বুদ্ধিগুণের একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যাতার্থেষু কর্ম্মসু—যে সকল কর্ম্মে পরিগণিত দ্রব্য-সংগ্রহ হয় (গঃ শাঃ); financial matters। কেবল রাজস্ব-বিষয়ক কর্ম্ম নহে—ধরুন যে সকল কর্ম্মে পূর্ব্ব হইতে একটা আনুমানিক হিসাব (estimate) করা হয়—এত টাকা আয় হইতে পারে—কিংবা এতসংখ্যক অমুক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। যথাদিষ্টং সবিশেষং বা কুর্য্যুঃ—"ক্লৃপ্তসংখ্যানূনং ক্লৃপ্তসংখ্যাধিকসংখ্যং বা ভাবয়েয়ুঃ" (গঃ শাঃ)—খুব সম্ভবতঃ শাস্ত্রী মহাশয় 'অন্যূন' বুঝাইতে চাহিয়াছেন—অন্যথা কোন অর্থ হয় না। যতসংখ্যক অর্থ বা দ্রব্য আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া estimate করা হইয়াছিল, ঠিক ততসংখ্যক অর্থ-দ্রব্যাদি বা তাহার অধিক আয় যাঁহারা দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই অমাত্য-পদলাভের যোগ্য—ইহাই পিশুনের মত; "Show as much as or more than the fixed revenue" (SH); estimated বলিলে ভাল হইত। "Parashara and Pishuna, 'the informer' i,e., Narada, are also well-known sages of the great epic, and two renowned law-books are attributed to them"—Jolly.

মূল :—না—ইহাই কৌণপদন্ত (বলেন)। যেহেতু ইঁহারা অন্য অমাত্যগুণ-দ্বারা যুক্ত নহেন। পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত (মন্ত্রিবংশধর) গণকেই অমাত্য করিবেন। যেহেতু (তাঁহাদিগের) অপদান দৃষ্ট-(পূর্ব্ব): ইনি অপকার করিলেও তাঁহারা ইঁহাকে ত্যাগ করেন না—যেহেতু (তাঁহারা ইঁহার) সগন্ধ। এমন কি—অমানুষদিগের মধ্যেও ইহা দৃষ্ট হয় যে গোগণ অসগন্ধ গোগণকে অতিক্রম করিয়া সগন্ধগণমধ্যে অবস্থান করে।

সঙ্কেত :—অন্য গুণ—বিশ্বাস্যত্ব, অনুরক্তত্ব ইত্যাদি (গঃ শাঃ)। পিতৃপৈতামহান্ (মূল)—যে সকল অমাত্যের পিতা-পিতামহ ইত্যাদিও অমাত্য ছিলেন—মন্ত্রিবংশসম্ভূত। অপদান—পূর্ব্ববৃত্ত (গঃ শাঃ); যাঁহাদিগের অপদান (অর্থাৎ পূর্ব্ববৃত্ত) প্রত্যক্ষীকৃত—অর্থাৎ যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের গুণাবলী পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও যে নিশ্চয়ই গুণবান্ হইবেন—এরূপ অনুমান করা বিশেষ অনুচিত হয় না।—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর মত। শ্যামশাস্ত্রী অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—"such persons, in virtue of their knowledge of past events."...অপদান—পরিশুদ্ধাচরণ (আপ্তে); আপ্তে মহোদয়ের মতে—অপদান ও অবদান প্রায় সমার্থক। অবদান—কর্ম্ম, বৃত্ত (আচরণ)—অমরকোষ। দৃষ্টাপদানত্বাৎ—যাঁহাদিগের পরিশুদ্ধাচরণ দৃষ্টপূর্ব্ব। পিতৃ-পিতামহগণের পরিশুদ্ধ আচরণ দৃষ্টপূর্ব্ব হইলে তাঁহাদিগের বংশধরগণও যে শুদ্ধাচরণ করিবেন—এরূপ আশা করা অসঙ্গত হয় না; এই কারণে পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত মন্ত্রিবংশধরগণকেই মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করা উচিত। অপচরৎসু—অপকার করিতেছেন যিনি তাঁহাকে—অপকারী রাজাকে। সগন্ধ—সজাতীয়, আত্মীয়, সম্বন্ধী (গঃ শাঃ)—সর্ব্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি—শাকুন্তলে পঞ্চমঅঙ্ক। অমানুষ—মানুষ-ভিন্ন, পশু প্রভৃতি, dumb animals (S H)—মূলানুগ নহে।

মূল :—না—ইহাই (বলেন) বাতব্যাধি। যেহেতু তাঁহারা ইঁহার সকল সম্যগ্‌রূপে গ্রহণপূর্ব্বক স্বামিবৎ প্রচরণ করিয়া থাকেন। অতএব নীতিবিদ্ নবীনগণকে অমাত্য করিবেন; আর নবীনগণ তাঁহাকে যমস্থানীয় দণ্ডধর মনে করিয়া অপরাধ করেন না।

সঙ্কেত :—বাতব্যাধি—উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রী (গঃ শাঃ); শুধু মন্ত্রী নহেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্তও ছিলেন উদ্ধব। "Vatavyadhi is another nickname of unknown meaning (wind-disease ?)"—Jolly. Wind-disease নহে—Rheumatism, gout—বলা ভাল। হয়ত উদ্ধব বাতরোগগ্রস্ত ছিলেন। সর্ব্বমবগৃহ্য—সকল বিভব আয়ত্ত করিয়া (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—"having acquired complete dominion over the king ;" having controlled his all—বলা উচিত। প্রচরন্তি—প্রচার করিয়া থাকেন—স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেন—play themselves as the king (SH)—অনুবাদ নহে। এই সকল স্থানের অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী মূলের কোন মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়া চলেন নাই—অত্যন্ত স্বাধীনভাবে চলিয়াছেন। নবীনগণ—বয়সে নবীন না হইতেও পারেন—নবপরিচিত; পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-

রহিত (গঃ শাঃ)। যমস্থানে দণ্ডধরং মন্যমানাঃ—রাজাকে যমস্থানীয় (যমতুল্য) উগ্রদণ্ডধারী মনে করিয়া ; শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ যথেচ্ছ—who will regard the king as the real sceptre-b arer.

মূল :—না—ইহাই (বলেন) বাহুদন্তী-পুত্র। শাস্ত্রবিৎ (অথচ) অদৃষ্টকর্ম্মার (পক্ষে) কর্ম্মসমূহে অবসাদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অভিজন প্রজ্ঞা শৌচ শৌর্য্য-অনুরাগ যুক্ত জনগণকে অমাত্য করিবেন—যেহেতু গুণেরই প্রাধান্য।

সঙ্কেত :—বাহুদন্তীপুত্র—"Indra, whose shastra called Bahudantakam, is in the Mahabharata declared to have been on abridgment in 5000 chapters, from the above mentioned composition of Vishalaksha"—Jolly. শাস্ত্রবিৎ—নীতি-শাস্ত্রগ্রন্থে নিষ্ণাত (গঃ শাঃ), possessed of only theoretical knowledge (S H)? অদৃষ্টকর্ম্মা—অধীত বিষয়ের অনুষ্ঠান পরিচয় বিহীন (গঃ শাঃ); having no experience of practical politics (S H)। বিষাদং গচ্ছেৎ—অমাত্য-কর্ম্মসমূহে অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—অর্থাৎ অমাত্যকর্ম্মসমূহের নির্ব্বাহে সমর্থ হন না (গঃ শাঃ); is likely to commit serious blunders (S H); cuts a sorry figure—বলিলেও চলিত। অভিজন—বংশশুদ্ধি (গঃ শাঃ); উচ্চবংশে জন্ম; high family (S H)। প্রজ্ঞা—বুদ্ধির আতিশয্য (গঃ শাঃ); wisdom (S H)। শৌচ—উপধাশুদ্ধি (গঃ শাঃ); purity of purpose (S H)। শৌর্য্য—উৎসাহশক্তি (গঃ শাঃ); bravery (S H)। অনুরাগ—স্বামিভক্তি (গঃ শাঃ); loyal feelings (S H)—devotion বলা চলিত। মন্ত্রি-নিয়োগে গুণের প্রাধান্যই বিবেচনীয়।

মূল :—সবই যুক্তিযুক্ত—ইহাই (বলেন স্বয়ং) কৌটিল্য। যেহেতু কার্য্যসামর্থ্য হেতু পুরুষসামর্থ্য কল্পিত হইয়া থাকে। আর সামর্থ্যবশতঃ—

সঙ্কেত :—এই অংশের ছেদ-সন্নিবেশের পার্থক্য-নিবন্ধন অর্থের বিশেষ পার্থক্য ঘটিতে পারে। গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—"সর্ব্বমুপপন্নমিতি কৌটিল্যঃ, কার্য্যসামর্থ্যাদ্ধি পুরুষসামর্থ্যং কল্প্যতে সামর্থ্যতশ্চ"।—তাঁহার মতানুযায়ী ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সর্ব্ব—শৌচ-সামর্থ্যাদি গুণ, সহাধ্যায়িগণের প্রভুকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দোষ। উপপন্ন স্থায্য। পুরুষসামর্থ্য—পুরুষের সেই সেই পদযোগ্যতা। কার্য্যসামর্থ্য হেতু—'কার্য্য' বলিতে বুঝাইতেছে সহাধ্যয়ন সহক্রীড়া ইত্যাদি ক্রিয়া; তত্তৎ ক্রিয়ার শক্তিবশতঃ। সামর্থ্যতশ্চ—সামর্থ্যহেতু—প্রজ্ঞা শাস্ত্রসংস্কার শৌর্য্যাদি গুণের তারতম্য-রূপ সামর্থ্যহেতু। কার্য্যসামর্থ্যহেতু (সহাধ্যয়নাদিক্রিয়ার সামর্থ্যবশতঃ) ও সামর্থ্যবশতঃ (নিজ গুণসামর্থ্য-বশতঃ) পুরুষের সামর্থ্য কল্পিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। গুণ-দোষ—উভয়ই উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত)—ইহা বলায় এই কথাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে—সহাধ্যায়ী প্রভৃতি হেয় নহেন—কারণ, বিশ্বাস্যত্ব ইত্যাদি গুণ তাঁহাদিগের আছে; আবার মন্ত্রিপদে নিয়োগের যোগ্যও তাঁহারা নহেন—যেহেতু তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রভুর পরিভবাদি দোষোৎপত্তিরও সম্ভাবনা আছে। অতএব, পারিশেষ্য-ন্যায়ানুসারে—এ সকল ব্যক্তিকে কর্ম্মসচিবপদে নিয়োগ কর্ত্তব্য। দেশ-কালানুসারে তাঁহাদিগের গুণোপযোগী বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োগ করণীয়।

পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ—"সর্ব্বমুপপন্নমিতি কৌটিল্যঃ—কার্য্য-সামর্থ্যাদ্ধি পুরুষসামর্থ্যং কল্প্যতে। সামর্থ্যতশ্চ—(পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে)। ইহার অর্থ অতি সরল বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছি। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

সর্ব্ব—পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার মত—ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি ও বাহুদন্তীপুত্র—এই সাতজন অর্থশাস্ত্রকারের প্রত্যেকের মতই যুক্তিযুক্ত—যে দেশে যে কালে যে কার্য্যে যে মতটি লাগে—সেখানে তাহাই প্রযোজ্য। কারণ, পুরুষের সামর্থ্য কার্য্যের সামর্থ্য দ্বারা কল্পিত (অনুমিত অর্থাৎ নিরূপিত) হইয়া থাকে। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজী অনুবাদ সর্ব্বাংশে অনুমোদনযোগ্য নহে—"This" says Kautilya, "is satisfactory in all respects. ইহা হইতে বুঝায় যেন কেবল পূর্ব্ব মতটিই কৌটিল্যের অনুমোদিত। বস্তুতঃ তাহা নহে—তিনি দেশ-কাল-ক্রিয়া-বিশেষানুসারে সকল মতেরই (যথায় যাহা প্রযোজ্য তাহার) সমর্থন করিয়াছেন—ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ—"for a man's ability is inferred from his capacity shown in work" (S H).

এইবার 'সামর্থ্যতশ্চ' এই অংশের সহিত অন্তিম সংগ্রহ শ্লোকটির অন্বয় করা যাউক—

মূল :—আর সামর্থ্যানুসারে—অমাত্য-বিভব ও দেশ-কাল আর কর্ম্ম বিভাগপূর্ব্বক ইঁহারা সকলেই অমাত্য (রূপে) নিয়োজ্য—কিন্তু মন্ত্রি-(রূপে) নহেন॥

সঙ্কেত :—সামর্থ্যানুসারে—পুরুষসামর্থ্যানুযায়ী; "And in accordance with the difference in the working capcity" (S H); difference—অংশটি না বলিলেই অনুবাদ সুষ্ঠু হইত।

অমাত্যবিভব (মূল)—বিশ্বাস্যত্বাদি অমাত্যগুণ-সম্পদ্ (গঃ শাঃ)। বিভাগ-পূর্ব্বক—যে দেশে, যে কালে, যে কর্ম্মে সুনিষ্পত্তির জন্য যে যে গুণের অপেক্ষা, সেই সেই গুণসম্পদের কথা সম্যগ্‌রূপে বিবেচনা করিয়া (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ চলনসই—"Having divided the spheres of their powers and having definitely taken into consideration the place and time where and when they have to work"—ইহা অনেকটা ব্যাখ্যার মত—যথাযথ অনুবাদ নহে। Having alloted the qualifications of executive officers according to place, time and acts—এইরূপ বলা উচিত। ইঁহারা সকলেই—বিশ্বাস্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট সহাধ্যায়ী প্রভৃতি সকলেই। অমাত্য—কর্ম্মসচিব (গঃ শাঃ), ministerial officers (S H)—executive officers বলিলে আরও ভাল হইত। মন্ত্রী—মন্ত্রণাদাতা—councillors (S H); ministers.

ইতি শ্রীকৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক নামক প্রথম অধিকরণে চতুর্থ প্রকরণে অমাত্যোৎপত্তি-নামক অষ্টম অধ্যায়॥

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

২৭শে সেপ্টেম্বর, '৪৪

শুক্লা একাদশী। বিজয়ার আনন্দোৎসবের রেশ তখনও বাংলার আকাশ বাতাস জুড়ে রয়েছে। রাত্রির অন্ধকার না কাটতেই বন্ধুবর বেঙ্গল কেমিক্যালের মানেজার সত্যপ্রসন্ন সেনের মোটরকার সশব্দে আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত জানালে। আমরা বাড়ীর সকলেই প্রস্তুত, ৫ মিনিটের মধ্যেই "গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের" দিকে যাত্রা করলুম। বি-ও-এ-সি (ব্রিটীশ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশন) তাদের যাত্রীবাহী মোটরে গ্রেট্ ইষ্টার্ণ থেকে আমাদের তুলে নিলে। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় সমস্ত যাত্রী মোটরের প্রতীক্ষায় বি-ও-এ-সির প্রতীক্ষাগৃহে বসে আছেন। আমাদের যৎসামান্য ৪৪ পাউণ্ড ল্যাগেজ নিয়ে ভারবাহী মোটরলরী এগিয়ে চলল। তারপর আমাদের যাত্রা সুরু! ১১ জন যাত্রী প্রত্যেকেই অপরিচিত। অন্ধকারের অন্তরালে চলেছে আমাদের অতি সুন্দর শব্দবিহীন মোটর। পাশে অভিনন্দন ও বিদায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—বহু আত্মীয়-আত্মীয়া—সকলের মুখেই আশঙ্কার অস্পষ্ট ছায়া। হয়তো বিদায়ের প্রাক্কালে আশঙ্কার আভাস আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। বোধহয় যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে অন্ধকারের আবরণ মনকে দৃঢ় করবার জন্য অধিকতর সুযোগ দিয়েছিল। হয়তো বা কারো কারো চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। অপরিচিত মিশরদেশ, অনাত্মীয় নির্ব্বান্ধব দেশ, ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলেছি দূরে—অতি দূরে, কোন অলক্ষ্য দেবতার ইঙ্গিতে—কে জানে! চলা যখন সুরু হয়েছে, পশ্চাৎ তখন সম্মুখে।

ছয়টায় আমাদের যাত্রীবাহী মোটর বালীর সেতু পার হয়ে বি-ও-এ-সির "Marine Airbase এ" প্রবেশ করল। নিঃশব্দ নির্জ্জন পথে কোন মানুষ পশু অথবা যানবাহন কিছুরই সাক্ষাৎ পাই নি। বোধহয়, ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গতার অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। মোটর থেকে নেমে দেখলাম আমার সঙ্গে রয়েছে আর দশজন যাত্রী। সকলেই শ্বেতাঙ্গ, আমরা তিনজন অসামরিক যাত্রী। একটি সস্ত্রীক যুবক। তিনজন ক্যানাডিয়ান সামরিক, চারজন ব্রিটীশ, আর একজন কে ঠিক চিনলাম না। আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল মোটর লঞ্চের দিকে। ভারী সুন্দর লঞ্চ। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। মনে হয় যেন এইমাত্র কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বসবার জায়গায় পাশাপাশি কুশন দেওয়া দুগ্ধশুভ্র গদি। দুই শ্রেণী, মাঝে পথ। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছলুম সী-প্লেন (Seaplane) এর পাশে। মাঝিরা আমাদের জন্য সিঁড়ি নামিয়ে দিল। আমরা উঠলাম প্লেনের ভিতরে।

সী-প্লেন এরোপ্লেনের চেয়ে সাধারণতঃ আকৃতিতে বড়। সামনে দুটি ঘর, একটি ক্যাপ্টেনের অপরটি ড্রাইভারের। পেছনে বাথ্‌রুম, ল্যাভেটারি এবং পান্‌ট্রি (খাবার ঘর)। মাঝখানে পাসেঞ্জারদের জন্য তিনটি প্রকোষ্ঠ। সামনের প্রকোষ্ঠে ৬টি বসবার জায়গা। খুব মোটা পুরু গদি, পেছনে হেলান ইজিচেয়ারের মত। আমরা ঢুকলাম তার পরের কেবিনে। ৮টি বসবার জায়গা। বাম পাশে লম্বা প্রায় শোবার মতন গদি, আসনগুলোর সামনে ছেলেদের পড়ার ডেস্কের মতন সাজান, তার উপরে রয়েছে এক খানা করে Statesman খবরের কাগজ। একটি বড় কাগজের বাক্স। উপরে লেখা B. O. A. C. ব্রেক্‌ফাষ্ট বক্স। শেষের কেবিন ধূমপান প্রকোষ্ঠ—এখানেই শুধু ধূমপান করা যায়, অন্য জায়গায় নয়। সেখানে মাত্র ৪টি বসবার জায়গা। প্রত্যেকটি আসন আলাদা, পাশে কাঁচের জানালা। বাইরের সব দেখা যায়—আকাশ, মাটি ও দিগন্ত।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন এসে দেখিয়ে দিল, কেমন করে বিপদের সময় প্যারাশুট দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। আমাদের লাইফ-বেল্ট পরা শিখিয়ে দিল, প্রত্যেক জানালার কাছে এমন বন্দোবস্ত রয়েছে যে প্লেন-এর যে কোন জায়গা থেকে বিপদের সময় প্যারাশুট অথবা লাইফ বেল্ট পরে লাফিয়ে পড়া যায়। এই সমস্ত কাজ শেষ করতে এক মিনিটের বেশী সময় দরকার হয় না। কিন্তু সত্যি যখন এরোপ্লেনে বিপদ আসে তখন সেই এক মিনিট ও সময় পাওয়া যায় না।

দেখতে দেখতে আমাদের প্লেন বিরাট দৈত্যের মতন গর্জ্জন করতে করতে জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। সে কি বিরাট বিকট! ষ্টীমারের সবচেয়ে জোরে চলার সময় চাকার আলোড়ন যেমন আর্ত্তনাদ করে, তার চেয়েও সহস্রগুণ! প্রায় ২ মিনিট পরে আমাদের প্লেন উপরে উঠছিল বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমি বাইরের দিকে অস্পষ্ট আলোকে বেলুড়ের মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রণাম ক'রে যাত্রা আরম্ভ করলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে আমার সামনের সিভিলিয়ান ভদ্রলোক ডেস্কে মাথা এলিয়ে দিলেন। বুঝলাম এয়ার সিকনেস্ হয়েছে। আমার ভয় হলো—আমারও তাই হবে। আমি কিছু না ভেবে একটু নেবু মুখে দিয়ে দু'পাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম খানিকটা অনুসন্ধিৎসা, খানিকটা নূতনের মোহ। প্লেন খুব উপর দিয়ে যাচ্ছিল না; বোধ হয় অনভ্যস্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য। ৫ মিনিটের ভিতর আমরা বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গেলাম, তারপর প্লেন ধাপে ধাপে উপরে উঠছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম উপরেই উঠছি—ধাপে ধাপে যেমন লিফ্‌টে উপরে উঠে। আমার সিক্‌নেস্ হলো না। ক্রমে আধঘণ্টা চলার পরে বুঝলাম—

বীরভূম জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি—কারণ ঘরবাড়ীগুলি খড়ের চালা পুরণো ধরণের, অট্টালিকা বিরল ; মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ, অসংলগ্ন। আমি শিশুর আনন্দে ও কৌতূহলে নিবিড় করে দু'পাশের বনানী ও সূর্য্যের আলোর খেলা দেখছি। হঠাৎ শব্দ হতেই দেখি পাশের ভদ্রলোক প্রাতরাশের জন্য ব্রেকফাষ্ট বক্স খুলেছেন। অন্যকে খেতে দেখে আমারও ক্ষিদে হলো। এবার ব্রেক্‌ফাষ্ট আরম্ভ হলো।

বাক্স খুললাম। প্রথমেই কাগজে মোড়া কাঠের কাঁটা ছুরি, তারপর একটি নেবু, একটি কলা, কয়েকখানি স্যাণ্ডউইচ্, খেতে বেশ। কয়েকখানা বিস্কুট, পেসষ্ট্রী, রুটির রোল···খুব পুরু মাখন মাখান। মন্দ ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না। পান্ট্রিতে রয়েছে বিভিন্ন রেফ্রিজোরেটারে চা, কফি, লেমন, স্কোয়াস ; কাগজের গ্লাসও রয়েছে। নিষেধ নেই, যার যত ইচ্ছা খেলেই হলো। তার পাশে রয়েছে একটা বড় বাক্স। উপরে লেখা "লাঞ্চ"। কেউ সে বাক্স খুলল না। দুপুরের অপেক্ষা করতে হবে।

কেবিনে ফিরে এসে সবাই **Statesman** পড়তে আরম্ভ করল। আমি কাগজ পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারণ প্লেন ধাপে ধাপে নীচে নামছিল। পাশে চেয়ে দেখলাম, বিরাট সহর এলাহাবাদ। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে প্লেন নামল। এলাহাবাদ আমার চেনা সহর। ত্রিবেণী সঙ্গম আমার পরিচিত তীর্থ। বিরাট শব্দে প্লেন জলে নামল। মোটর লঞ্চ এগিয়ে এল। তিন জন যাত্রী নেমে গেল, ছয় জন উঠল, পাঁচ জন আর্ম্মি অফিসার একজন সিভিলিয়ান—B. O. A. C.র পোষাক পরা। দশ মিনিট ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশ্রাম করে প্লেন আবার গর্জ্জন করে উঠলো। এবার খুব উপরে উঠছি বুঝতে পারলাম। নীচের সমস্ত জিনিষ—ঘর বাড়ী গাছপালা সব একাকার। মনে হল যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেটে গেছে। আমার বেশ ভালোই লাগ্‌ছিল। আর্ম্মি অফিসাররা কেউ কেউ গা এলিয়ে দিল, বোধ হয় এয়ার সিক্‌নেস্। আবার কাগজ পড়তে লাগলাম। শরীরটা একটু নিঝুম মনে হচ্ছিল। বোধ হয় মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। যখন একটা বাজে, অনুভব করলাম প্লেন নেমে আসছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম পাশে কালো পাথরের স্তূপ, নীচে নীল জলরাশি। কিছু কল্পনা করবার আগেই ক্যাপটেন্ এসে বললে গোয়ালিয়র। যারা দিল্লীর যাত্রী তারা বামদিকে, যারা করাচীর যাত্রী তারা ডানদিকে।

আমরা মাত্র ছয় জন যাত্রী ডানদিকের লঞ্চে চড়লাম। ক্যাপটেন আমাদের সঙ্গে। বললেন এবার লেক্ ক্রুইস অর্থাৎ শরীরকে একটু সবল করবার জন্য জলবিহার। দশ মিনিট হ্রদের জলে লঞ্চ ঘুরে ফিরে আমাদের তীরে নিয়ে এল। সামনে বিরাট অক্ষরে লেখা রয়েছে—রেষ্ট্ হাউস, গোয়ালিয়ার এয়ার পোর্ট—জনমানববিহীন প্রকৃতির একান্তে রচিত অত্যন্ত বিস্ময়কর স্থান। যেন মানুষের হাতে প্রকৃতি তার অপরূপ সৃষ্টিসম্ভার সঁপে দিয়েছে, মানুষ তাকে কাজে লাগাবে। আমরা উপরে উঠে রেষ্ট হাউসে আশ্রয় নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসলাম। সম্মুখে অবারিত মাঠ। দিকচক্রবাল রেখার মতো দেখাচ্ছিল। পশ্চাতে নীল জল, উর্দ্ধে নীল আকাশ। শান্ত-সমাহিত নীরব শূন্যতা। কি বিরাট আরাম। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবার জন্য এই বিশ্রামাগার, বিমান-বিহারী যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের আয়োজন। আমরা একটু শীতল জল, লেমন স্কোয়াস পান করে আবার চললাম প্লেনের দিকে।

এবার প্লেনে উঠেই বিদ্যুৎগতিতে আকাশের দিকে চলেছি। উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে, মেঘের পর মেঘ ছাড়িয়ে মেঘের দেশে চলেছি দশ মিনিট। নীচে সীমাহীন বালুকা-রাশি, শূন্যে মেঘ, মধ্যে আমাদের আকাশ-যান চলেছে পশ্চিমের পানে। শরীর ক্রমশঃ ভার বোধ হচ্ছিল, নিশ্বাস ঘন হয়ে আসছিল। শীত, সমস্ত শরীর শীতে আড়ষ্ট। ক্যানাডিয়ান সৈন্যরা তিন জনেই মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। একজন পারাস্যুট পরে নিল। আর একজন পায়ের গালিচা গায়ে তুলে নিল। বেচারি। অতি সামান্য মাত্র আভরণ ও আবরণ। ক্যাপটেন্ প্রত্যেক যাত্রীকে একখানা করে খুব পুরু কম্বল দিয়ে গেল, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমার মাথা যেন খালি, অথচ ভারী বোধ করলাম। প্রায় পনের হাজার ফিট উপর দিয়ে চলেছি। মনে হল এয়ার সিক্‌নেস্ হবে। আমি পান্ট্রিতে গিয়ে লাঞ্চ্ খেয়ে নিলাম। শুনেছিলাম, শূন্য উদর সী-সিক্‌নেস্ ও এয়ার-সিক্‌নেস্ এর সহায়ক। রেফ্রিজারেটারে রয়েছে পানীয়ের তালিকা, লাঞ্চ্ বক্সে রয়েছে খাদ্যের তালিকা—মাংস, রুটি, কেক্, বিস্কুট, মাখন, ফল। আমি খুব পরিপূর্ণ উদর নিয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলাম। সোয়েটার, কোট, তার উপরে জার্ম্মান ওভারকোট জড়ালাম, তবু শীত। তার উপরে কম্বল। সামনে ডেস্কে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। নীচে কি হচ্ছে দেখবার অবসর নেই, শক্তিও নেই, তবু চেষ্টা করলাম। রাজপুতানার মরুভূমির সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ পরিচয় করে নিই। চারিদিকে বাতাস ভারি। আমাদের সামনে কেবিনে মহিলাটি বার বার বমি করছেন। বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু গিয়ে দেখব কি হচ্ছে, সে শক্তিও ছিল না। ক্রমশঃ অবসন্ন দেহে তন্দ্রার আবেশে চোখ বুজে রইলাম। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্যাপটেন এসে বললে, করাচী এসেছি।

নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম আকাশচুম্বী অট্টালিকা, পাশে নীল জল, উপরে নীল আকাশ। দূরে নগরের পথ, জলে জাহাজ, পথ জন-বিরল। স্বপ্নোত্থিতের মতন ঠাকুরমার ঝুলির অশোককুমারের রাজপুরীর কথা মনে হল। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা লঞ্চে নেমে এলাম। করাচি হোয়ার্ফ পার হয়ে জাহাজের পথ ধরে এলাম তীরে। সেখান থেকে B. O. A. C.-এর মোটর আমাদের নিয়ে এল এয়ার-বেসে, ঠিক যেমন বালীর এয়ার-বেসের দ্বিতীয় সংস্করণ। একজন এয়ার অফিসার বললেন, আপনারা রেষ্ট হাউসে বিশ্রাম করুন। পরে যাত্রার সময় বলা হবে। রেষ্ট হাউসে বসে একটু বিশ্রাম করতেই একজন B. O. A. C.র officer এসে বল্লেন,—"আপনাদের জিনিষ নিন। কাল করাচী থেকে কোনো প্লেন পশ্চিমে যাবে না। আপনাদের হোটেলে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হচ্ছে।"—একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। বিমানযাত্রার অনিশ্চয়তা। পাঁচ মিনিট পরেই আবার তিনি বল্লেন—অধ্যাপক চৌধুরী নর্থ

ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে খাবেন, আপনার কার এসেছে। অন্য আর এক কারএ আপনার জিনিষ হোটেলে পাঠান হল।" আমি কারএ উঠছি, পেছন থেকে ডাক্‌ছে—মাখনদা! আশ্চর্য্য! এই অপরিচিত স্থানে নাম নিয়ে কে ডাক্‌বে। পেছন ফিরে দেখি, নোয়াখালীর ক্ষিতীশ সেন, বর্ম্মা প্রত্যাগত, অধুনা করাচী B. O. A. Cর অফিসার। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বল্লেন, "কাল ১১টায় নর্থ ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে পাঁচ নম্বর কামরায় দেখা করব। আপনার আগমন সংবাদ কল্‌কাতা থেকে সরকারী পত্রে-এ পেয়েছি।"

ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হোটেলে এলাম। সঙ্গে B. O. A. Cর লোক। হোটেলের কেরাণী আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। B. O. A. Cর লোক বল্লে, আপনার পুর্নযাত্রার সংবাদ যথাসময় আপনাকে দেওয়া হবে।

হোটেলে ৫ নম্বর ঘর। ঘর অর্থাৎ তিনটী কক্ষ। প্রথম বসবার সেলুন, তারপর শোবার ঘর, তার পাশে ড্রেসিং রুম। পশ্চাতে বাথ রুম। সেলুনে রয়েছে ১খানি বড় টেবিল, ৪খানি চেয়ার, ২খানি ঈজি চেয়ার, টানাপাখা, নীচে গালিচা। শোবার ঘরে রয়েছে একখানা ছোট টেবিল, দুইখানি চেয়ার, একখানি ঈজি চেয়ার, একটী ড্রেসিং আলমারা, স্প্রিংএর খাট, ঝকঝকে বিছানা—বেশ নরম। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। বেয়ারা গরম জল দিয়ে গেল। খুব ভাল করে স্নান করলাম। সারা-দিনের ক্লান্তি—বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাড়ে দশটার সময় উঠে দেখলাম সব নীরব, নিস্তব্ধ, দরজার সামনে লম্বা গোঁফ-দাড়ীওয়ালা 'বয়'। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমার ডিনার? সে বল্লে—এখানে ডিনার তো দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবলাম, সে ঠাট্টা করছে। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম, সত্যিই বেয়ারা বেচারা আমাকে ডেকে গেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করে নি। ঘুমন্ত সাহেবকে জাগানো গুরুতর অপরাধ। হয়তো সেজন্য তার চাকুরীও যেতে পারে। বেয়ারা সে অপরাধই যদি করত, তাহলে যে আশীর্ব্বাদ করতাম। সাহেব সাজার প্রথম শাস্তি উপবাস। জানিনা এটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কি-না। যাক্, অনেক খুঁজে গৃহিণীর দেওয়া কয়েকটি নারকোলের লাড়ু, বিজয়ার সন্দেশ আর জল খেলাম। সমস্তটা নিঃশেষ করলাম না। কারণ, হয়ত পথে আবার লাগতে পারে।

(ক্রমশঃ)

তার পর ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তার পর ?—
এই প্রশ্ন অহরহ জাগিতেছে মনে
জাগিয়াছে সর্ব্বকালে আমারি মতন
একই প্রশ্ন সকলেরি মনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল
বিফল হইয়া গেছে প্রত্যক্ষ জগতে।
বিশ্বমানবের কাছে
ধর্ম্ম ব্যাখ্যা নাচারের,
নিরুপায়ে তাই
ধর্ম্মের দোহাই পাড়ি
বক ধার্ম্মিকের পাঠশালায়
অথবা আকাশ পানে যুড়ি দুই পানি
দ্বিধা-দিগ্ধ অবসন্ন মনে,
ফুট বা অস্ফুট কণ্ঠে বলি সকাতরে
সকলই তাঁহার ইচ্ছা
ইচ্ছাময় ভগবান তিনি।
যত বলি, তার পর ?
উত্তর মিলে না তার কিছু।
শাস্ত্র তার বেড়া জালে ঘিরি
একই কেন্দ্র হ'তে বারবার
নিয়ে যায় পরিধি অবধি
সেই তার সীমাবদ্ধ গতি
তাইত অনধিগম্য শাস্ত্রের বিচার
যুক্তি তর্ক দ্বন্দ্ব সমাহার
অপূর্ব্ব জ্ঞানের সৃষ্টি
নির্ব্বন্ধ যে বিধাতার
মুখরক্ষা, লজ্জা নিবারণ।
তার পর ?—কে দিবে উত্তর তার ?
এ প্রশ্নের নাহি সমাধান
তাইত গীতার ব্যাখ্যা—
সব্যসাচী দেখে বিশ্বরূপ
ধর্ম্ম ক্ষেত্রে কুরু ক্ষেত্রে
সমবেত যুযুৎসু মণ্ডলী
মানুষ নিমিত্ত মাত্র
কালচক্র ঘর্ঘরিয়া চলে
অবিরাম গুঁড়া হয়ে যায়
জন্মমৃত্যু আসে যায় বাঁধাধরা পথে
সুখ দুঃখ সন্তাপ বেদনা
মনের বিকার মাত্র
কাল সিন্ধু নীরে ভাসে
বিন্দু বিন্দু বুদ্‌বুদ্ জীবন।
কী মূল্য সে জীবনের ?
কিবা মূল্য হাসি ও অশ্রুর ?
উষ্ণ রক্তে স্নান করি শুচিশুদ্ধ মন
কুরুক্ষেত্রে কবন্ধে শুধাই—
কিবা আছে অতঃপুরে ?
নিয়ত আঁধার নামে চোখের সম্মুখেই
সাড়া নাই, শব্দ নাই নিস্পন্দ নিথর।
হায়রে কালের গতি মাহাত্ম্য ধর্ম্মের
দেবতার অপূর্ব্ব মহিমা,
মানুষ নিমিত্ত মাত্র
পাপক্ষয় সুলভ মৃত্যুতে,
ধর্ম্মতত্ত্ব চিরকাল গুহায় নিহিত,
মহাজন পদচিহ্ন চিনিয়া চিনিয়া
দীর্ঘ পথ অতিক্রমি দেখি অবশেষে
যেথানে আরম্ভ যাত্রা সেথানেই শেষ—
তার পর ?—কে দিবে উত্তর ?

হিসেব নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

বিশ ত্রিশ ঘর রোগীদের দেখে, তাদের ব্যবস্থাদি করে ডাক্তার যখন ফিরলেন, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। বিনোদী জল জল, আর ছটফট্ করছে। বৃদ্ধা মা—রামজি রামজি করছে।

ডাক্তার এসেই কোট খুলে, কামিজের আস্তিন গুটিয়ে হাঁটু গেড়ে ইন্‌জেকসন্ দিতে বসে গেলেন। মাণিককে বললেন "steady, আমার হাত কাঁপছে।—জয় মা দুর্গা!"

* * * *

পাড়ায় সহসা সোরগোল। একখানা মোটর এসে ঢুকেছে। ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করছে।

মাণিক বললে—"বোধ হয় বড় কেউ inspectionএ (পরিদর্শনে) এসেছেন।"

ডাক্তার বিরক্ত ভাবে বললেন—"আসতে দাও, ওদিকে দেখবার দরকার নেই।—যা করছো করো।"

"ডাক্তার সাহেব—ডাক্তার সাহেব" হাঁকতে হাঁকতে, একজন কুল্লা মাথায় পেটিআঁটা আরদালি, অতিরিক্ত ব্যস্তভাবে এসে হাজির—"বড়া হুজুর আয়ে হেঁ—ডাক্তার সাহাব কো জলদি বোলাতে হেঁ", ইত্যাদি।

মাণিকলাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলবেন—। কি বলবো?"

ডাক্তার—"বলবে আবার কি, রুগী মেরে ফেলব নাকি! আসতে হয়—তিনি আসুন—"

পেয়াদার বিরাম নেই—ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

ডাক্তার দোরের সামনে পেয়াদাকে দেখে—"চিল্লাতি মত, ভাই গফুর। যাকে কহো—"ডাক্তার সাহেব কামমে হায়। মরিজকো ছোড়কে নেহি উঠ্‌সেক্তে। জরুরি কুছ রহে তো আপ মেহেরবানী করকে আসেক্তে।"

আরদালি বললে—"হুকুরকা মেজাজ আপ জানতে হেঁ—বহুৎ বিগড় যায়েঙ্গে।"

শুনে বিনোদের মাথায় আগুন ধরে গেল। বুঝতে পেরে মাণিক ভীত হয়ে বললে—"আপনি এখন কথা ক'বেন না, কাজ চলুক। যা বলবার আমি বলছি"—

(আরদালির প্রতি)—"যো কাম সুরু হো গিয়া—ছোড়কে কোই উঠনে নেহি সেক্তা ভাই। তুমি বললেই—হুজুর সব সমঝ যায়েঙ্গে। পারো তো—হুজুরকে সঙ্গে করকে লাও ভেইয়া। তিনি সচক্ষে দেখকে যান। তোমার কথা" ইত্যাদি।

আরদালি মিঠে কড়া মূর্ত্তিতে চলে গেল।

মিষ্টার A হচ্ছেন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব। ওজনে আড়াই মোন। দর্শনে revolting—ডিষ্ট্রিক্টের অন্যতম মালিক। তাঁর দাপটে সবাই সশঙ্ক। মেজাজ মিষ্টতাহীন। একান্ত অনিচ্ছায় cholera infected areaয় পা বাড়িয়েছেন বা কলেরা ক্ষেত্রটা মটোর দিয়ে মাড়িয়েছেন। রুমালখানা নাকে চেপে গাড়িতেই বসে আছেন,—হুকুমে কাজ চলছে। আরদালির আওয়াজেই পাড়া মাৎ। হুজুরের হাতে কতকগুলি কাগজ—ডাক্তারের বিপক্ষে দরখাস্ত। দরখাস্তকারীদের ডাক পড়ছে।—সকলেই পেটের ধান্দায় মজুরি করতে বেরিয়ে গেছে—তারা বাড়ি নেই, কেবল রাগ বাড়ছে। শেষ—মহাল্লার মোড়লের ডাক পড়েছে।

আরদালি এসে নিজের অভ্যস্ত ভাষায় খবর দিলে—"ডাক্তার নেহি আসেকেঙ্গে, আপকো তলব কিয়া হুজুর।" অর্থাৎ আপনাকে যেতে হুকুম করেছে।

সপ্তম ছাড়িয়ে "কেয়া" বলেই দপ্ করে জ্বলে উঠলেন।—"বেহুদা—নালায়েক" বলতে বলতে, infected areaর কথা ভুলে, এক লাফে নেমে পড়লেন,—"হামকো তলব! চলো দেখতে হেঁ"—

দেখে শুনে মালিক প্রমাদ গুণলে—"এখনো যে পাঁচ-সাতটা instalment (দফা) বাকি! সে ডাক্তারকে ঠাণ্ডা করছিল।—"ফাঁকা কথা বইত' নয়, দু'বার Boss বললেই মামলা মিটে যাবে। ঠোকবো কেনো Sir, লোকটা দুটো কথা কয়ে—'আসলে' হারিয়ে দিয়ে যাবে?" ইত্যাদি।

বিনোদ বুঝলেন, চেপে গেলেন।

Boss (কর্ত্তা) তখন প্রায় সামনেই—৫।৭ গজের মধ্যেই চলে এসেছেন, দেখতেও পাচ্ছিলেন ডাক্তার কাজ করছেন।—"জলদি বাহার আও ডাক্তার, হামারা হুকুম"—

ডাক্তার সে কথার উত্তর না দিয়ে, কেবল বললেন—"পইলে সেলাম তো লিজিয়ে হুজুর, তকলিফ্ মাফ্ কিজিয়ে। হাম্

উঠনেসেই Case fatal হো যায়গা মালিক। Saline injectionকে বাত হামসে আপকো আচ্ছাই মালুম হয়। আপকে পাস হাম তো লেড়কাই হায়।—আওর ২।৩ পাঁইট বাকি Sir"—

লোকটি বোধ হয় স্বনামপ্রসিদ্ধ চেঙ্গেজখার বেভেজাল রক্তের দাবী বজায় রাখতে চায়। খাম্বাজি গলায় বললেন—"কুছ্ দরকার নেহি—চলে' আও, মরণে দেও"—

বিনোদির অন্ধ মা দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন—কাঁপছিলেন। সুমধুর—"মরণে দেও" শুনেই পড়ে' অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মেয়েটি চীৎকার করে' কেঁদে উঠলো।

চেয়ারম্যান সাহেব বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বুড়িয়া কোন্ হায়? আফং হিঁয়া কেঁও—নিকাল দেও"—

কে একজন পরিষ্কার কামিজ পরা লোক, ছুটে জল এনে বৃদ্ধার মুখে চোখে দিতে দিতে বললে—"রোগীর অন্ধ মা, ওই তার একমাত্র ছেলে।—০-র (পল্টনের সাহেবের) personal servant (নিজের ভৃত্য)—তিনি আমাকে বিনোদির খবর নিতে পাঠিয়েছেন।"

শুনে চেয়ারম্যান চমকে—"কেয়া? Commanding সাহেবকা কেয়া?"

"Personal servant হাম যাকে খবর দেনেসে সাহাব খুদ্‌ভি আসেক্তে। ইস্ লেড়কেকো বহুৎ চাহাতে হেঁ। ডাক্তার সাহাবকো ভি বোলায়ে হেঁ"—

শুনে—সহসা সেই ভীমরুলের চাকের প্রতি রন্ধ্রে অভাবনীয় হাসি ফুটে উঠলো। হাসতে হাসতে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—"দেখলে তো আমার inspection কিরূপ কড়া! আমি এই ভাবেই পরীক্ষা করে' আমার সেরেস্তার staffএর লোক যাচাই করি! আমিই বিনোদকে বাছাই করে' এ কাজে পাঠিয়েছি। ওর কাজ আমি জানি—প্রাণ দিয়ে কাজ করে—ফাঁকি দেয় না। ও যদি এই ইনজেকসন্ ছেড়ে উঠে আসতো, ওর চাকরি থাকত না—কালই অন্য ডাক্তার পাঠাতুম। হাম কিসিকা খাতির নেহি রাখতে।—জান্ সবকা এক হায়, কেয়া গরীব কেয়া রহিম। হামারা যাঁচ বড়া কড়া হায়" ইত্যাদি বলে'—হো হো করে' হাসলেন।

কামিজ পরা লোকটি বললে—"সচ্চা হাকিমের কাজই এই। কড়া না হলে এত বড় এলাকা কেউ এমন সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারে না। তাঁরা যে কি মতলবে কোন্ কথা কন্, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে বোঝে! বুঝতে বহুদিন যায়। আপনাদের তাঁবেদারিতে থেকে থেকে এখন কিছু কিছু বুঝতে পারি।"

শুনে হুজুর বেজায় খুসি হলেন, বললেন—"তুম্ ঠিক্ সমঝ্ লিয়া। বুড়িয়া মাইকো সমঝা দেনা ভেইয়া।"

পরে ডাক্তারের প্রতি প্রসন্ন কণ্ঠে—"তোমার একনিষ্ঠ কাজে আমি বড় খুসি হয়েছি—I am very much satisfied with your work Doctor—Remember duty first and duty last—Rest assured you will have its return soon on first opportunity—

ডাক্তার একমনে কাজ করে' যাচ্ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন "মানিক চেয়ারম্যান সাহেবকে Preventive Tablet আগে দাও, বহুক্ষণ বিষদুষ্ট areaর মধ্যে রয়েছেন—অভ্যস্ত নন। এখনি খাইয়ে দাও, এখানকার জল যেন দিওনা। বলে দাও আর বেশিক্ষণ না দাঁড়ান—কাজের জন্যে না ভাবেন। অতিরিক্ত ভাবাটা ওঁর নেচার"

হুজুরের কানে সব কথাই পৌঁচচ্ছিল। সচকিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—"হঁ্যা আমার অনেক কাজ আছে—দাও।"

ট্যবলেট্ মুখে ফেলে—"বিনোদ যখন রয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত।"

বাইরে ফিরে—"মোটার" বলে' হাঁক দিতেই,—সামনে ভূমি স্পর্শ করে' করজোড়ে যুধিষ্ঠির হাজির।

কোন্ হায়, কেয়া চাহতে?

আরদালি বললে—"মহল্লাকে সরদার হুজুর।"

চেয়ারম্যান—যুধিষ্ঠিরের প্রতি—"মহল্লাকে খবর কেয়া হায় কেয়সা হায়?"

যুধিষ্ঠির—"আপকে দুয়াসে বিমারি রোজ সট্ রহা হায় হুজুর। ডাক্তার সাহাব দিনরাত ঘুম রহে হেঁ। দাওয়াই, মিছরি সাবু, সবকো মিল রহা হায়"—

চেয়ারম্যান আশ্চর্য্য হয়ে—"মিছরি সাবু?

যুধিষ্ঠির—হাঁ হুজুর। সব বড়া গরীব হায় মালিক। বাজার সে মিলনা ভি মুস্কিল হায়। কাঁহা কাঁহা সে মাংওয়া রহে হেঁ। ডাক্তার সাহেবকা হুকুম—মিলনাই চাহিয়ে। সব কোই খুসি হায় হুজুর।—লেকেন এক বাত মে হাম লোক বড়া শোচমে পড়ে হেঁ। আপ মেহেরবাণী করকে ডাক্তার সাহাবকো না হানে-খানে হুকুম দিজিয়ে। আপনা তরফ উনকা বিলকুল খেয়াল নেহি হুজুর। কহতে কহতে হাম সব থক্ গেয়ে। ডাক্তার খুদ, আচ্ছা রহে তব না সব ঠিক্ রহে মালিক।"

চেয়ারম্যান ব'লে উঠলেন—"জরুর, জরুর, বহুৎ ঠিক্ বাত। হাম উনকো কহেকে যাতে হেঁ। তুম্ উনকো মিছরি আওর সাবুকো বিল্ (bill) দেনে কহনা"—

ডাক্তারের প্রতি—Take care of yourself Doctor—I mean your health, I am very much pleased—

Now Good day Doctor-don't forget to see the O-c- নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে কাজ কোরো, পল্টনের o cর সঙ্গে দেখা করতে ভুলনা।"

হুজুর মোটর হাঁকিয়ে লম্বা দিলেন। সঙ্গে আরদালি, তার হাতে এক কুড়ি কই মাছ!

সকলের যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বৃদ্ধা উঠে বসেছে। হুজুরের কথার মধ্যে যে ভাল উদ্দেশ্য ছিল, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করা হয়েছে।

অজামিলের 'নারায়ণে'র মত o.cর উল্লেখটি Dr বিনোদের ভাগ্যে অভাবনীয় স্বর্গ সৃষ্টি করেছিল।

মাণিকলাল বললে—"গত কয়দিন এই দুর্গ্রহের দুর্ভাবনাই আমাকে দিনরাত পেয়ে বসেছিল Sir আপনাকে বলতে পারছিলুম না। নিজে কিন্তু একদণ্ড সুস্থির ছিলুম না।"

'ইন্‌জেকসন্‌' শেষ হয়েছিল। ডক্তোর বললেন—মানুষে কি কিছু করে হে! শুনলে তো আমাদের সত্যরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা? কোথা থেকে এত সত্য জোগালো তা ভেবেই পাই না! সে গেলো কোথায়?

"সে সাফাই সাক্ষী সেরে, বোধকরি ষ্টেসনে মাল খালাস করতে গেছে।"

ডক্তার বললেন—"কতো পুণ্য থাকলে এ সব মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে আর কথকদের মুখেই যুধিষ্ঠিরের পরিচয় পেতুম, আজ তিনি যেন সশরীরে দর্শন দিলেন! সত্যগুলো শুনলে তো? তা না হলে কেষ্টোর মতো ঘুঘু ছেলেকে বশ করতে পারতেন কি! এও মিত্র সাহেবকে একদম লাড্ডু বানিয়ে দিয়েছে। বেটা সাবুমিছরি পেলে কোথা?—এখন বিল্‌ (Bill) বানাও—বলে' ডাক্তার হাসলেন। দেখছি সত্যের বান্‌ ডেকেছে, কতদূর ভাসিয়ে নেযাবে জানি না!"

মাণিকও হাসলে। বললে—ক'টা মাস ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি! ধর্ম্মপুত্রকে মহাপ্রস্থানের দিকে না টানে।

ডাক্তার বললেন—আসল কাজ করেছেন কিন্তু সেই কামিজপরা লোকটি। বন্ধুটি কে বলো দেখি?

মাণিক। আজ্ঞে তাঁর কথাই ভাবছিলুম। এ দুর্য্যোগ কাটাবার ব্রহ্মাস্ত্র—ওই ও সির (o.cর) নামটি, তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছিল।—একেবারে যেন জোঁকের মুখে নুন দিলে!

ডাক্তার। সেটা আমি খুব লক্ষ্য করেছিলুম। তাতে ক্রুদ্ধ বিষধরের বিষাক্ত চক্ষু একদম ফ্যাকাসে মেরে যায়।—"সায়নাইডেও" সময় নেয় হে, কিন্তু পাক্কা পেসাদার পাপী কেমন সামলালে দেখেছ? আচ্ছা থাক এখন। সে লোকটি কোথায়?

মাণিক। তিনি কি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন মশাই! তিনি যে o.cর কেরাণী, বিনোদীর খবর নিতে এসেছিলেন। তাঁকে বলে দিয়েছি—বিনোদীর অবস্থা এখন আর তেমন hopeless নয়। আর আপনি বৈকাল পাঁচটার সময় যাবেন, কারণ—স্নান করে', কাপড় বদলে disinfected না হয়ে যাবেন না,—তাও বলে দিয়েছি।"

ডাক্তার। Thank you, ঠিক করেছে। কিন্তু তিনি আবার ডাকলেন কেন?"

মাণিক। বোধকরি আপনার মুখে সব শুনতে চান। বিনোদীকে খুব ভালবাসেন শুনেছি—

ডাক্তার। তাই হবে। হ্যাঁ—"কেমন বুজছো বিনোদীর অবস্থা?"

মাণিক। ভাববেন না, ভালই মনে হচ্ছে তো।

ডাক্তার। মা তাই করে' দিন। আমার মাথা ঘুলিয়ে রয়েছে।

দর্শনীয় চেহারা চলে' যাওয়ায়, দেখবার বস্তু আর কিছু ছিলনা,—ছেলেদের ভিড়ও ছিল না। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে আর মেয়েটিকে একটা টাবলেট খাইয়ে দিয়ে—ডাক্তার বললেন—"চলো মাণিক, বেলা অনেক হয়েছে।"

উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

—"সবই দেখছি মায়ের বিচিত্র খেলা হে মাণিক। যত ভাবছি —বৈরাগ্যই বাড়ছে" বলে,' ডাক্তার অন্যমনস্ক হলেন।

মাণিক। শুনেছি শ্মশান পার হলে ওটা খসান্‌ দেয়,—থাকে না। Instalment গুলো আগে এসে যাক মশাই। দেখেন নি—নূতন চাকরে একটা বড় লাফ্‌ মেরে মনিবের বাহবা পেলে, তাকে ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়ে দেয়—একদিন hopeless foolও শুনতে হয়। তখন বৈরাগ্যের পালা সামলাবার সময় আসে। ওটা নিজের হাতেই আছে—তাড়াতাড়ির কি দরকার।

ডাক্তার। সব জিনিসেরি ছুপিট থাকে কিনা, তাইতেই ঘুমিয়ে দেয় হে। কেবল একজনেরি ছুপিঠ নেই, just like বিলিয়ার্ড ball ফুঁপি নেই, ধরতে গেলেই ফস্‌কে যায়। তাই তাঁর নাম "অধর"। আচ্ছা থাক্‌।—

বাসায় পৌঁছে গেলেন।

—"তা যাই বলি আর যাই বলো মাণিকলাল, নিজের বাসার চেয়ে আরামের কিছু নেই—তা সে ফুলের চালাই হোক, আর খাপরার ছপ্পরই হোক সেটা স্বাধীকারের স্বাদ রাখে। এ যেন স্বর্গে এলুম। এইবার একটা গোল্ড্‌ফ্লেক্‌ ধরাই—কি বলো?"

মাণিক। আজ্ঞে নিশ্চয়ই। নিজের এলাকা ছাড়া ওর খাঁটি আস্বাদ কারো অট্টালিকার ইজিচেয়ারে বসে' মেলেনা হুজুর।"

ডাক্তার। very true লাখ কথার এক কথা বলেছ মাণিক। পরে স্নানাহার সেরে—"একটু শুই বড় ক্লান্ত হয়েছি" বলে' খাটিয়া নিলেন।

শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে কন্যাদায় বাঙ্গালার বন্যাদায়ের চেয়েও ভীষণ। মধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখ অনেকটা কন্যার বিবাহের উপরই নির্ভর করে। এই কন্যাদায়ের দুঃখদুর্দ্দশার কথা না বলিলে বাঙ্গালী সংসারের অন্তর্লোকের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া যায় না। কন্যাদায় সমাজের পক্ষে একটি গহন ও জটিল সমস্যা। কাজেই এই সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের—বিশেষতঃ বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের একটা প্রধান বিষয়বস্তু। অন্য দেশের সাহিত্যে এ বালাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই এই সমস্যা সাহিত্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্যা লইয়া অবশ্য বেশি মাথা ঘামান নাই। রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, প্রভাতকুমার ইত্যাদি সাহিত্য-রথিগণ এই সমস্যা লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। কন্যাদায়ের দুঃখ-দরদী শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বাঙ্গালী সংসারের কোন দুঃখই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—সর্ব্বপ্রধান দুঃখটিই বা এড়াইবে কেন? এই দুঃখ অবলম্বনে তিনি অরক্ষণীয়া নামক বড় গল্পের গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। কোন কোন লেখক কন্যাদায় লইয়া propaganda-সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া সে শ্রেণীর নয়—ইহা উদ্দেশ্যহীন অবিমিশ্র কথাসাহিত্য, কন্যাদায় ইহার বিষয়বস্তু বা রসোপাদান মাত্র।

অরক্ষণীয়ায় শরৎচন্দ্র যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাই বাঙ্গালী পল্লী-সংসারের অবিকল চিত্র, তাঁহার নিজের চোখে দেখা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সমাজের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া সমভাবেই কঠিন হইয়াই আছে বটে। সমস্যা কিন্তু রূপ বদলাইয়াছে, অন্যান্য সমস্যার সহিত মিলিয়া এ সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে পাড়ায় পাড়ায় আজকাল ঢিঢি পড়িয়া যায় না, কন্যার হাতের অন্নজল অস্পৃশ্য হয় না, লোকে কন্যার পিতাকে সমাজে একঘরে করে না অথবা কন্যা মৃত পিতামাতার মুখাগ্নির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। কন্যার সমাদরও পূর্ব্বা হইতে বাড়িয়াছে—শুধু সে আজ পালনীয়া নয়, 'শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' উঠিতে বসিতে ১৩।১৪ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যাকে গালাগালি দিয়া কেহ দড়িকলসী ও গঙ্গাগর্ভ দেখাইয়া দেয় না। ৬০।৭০ বৎসরের বুড়াও তৃতীয় চতুর্থ পক্ষে আজ আর বিবাহ করে না। শরৎবাবু যে সময়ের সমাজচিত্র দেখাইয়াছেন—সে সময়ে এই সবই প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকরা কন্যাদায় লইয়া কথাসাহিত্য এখনো রচনা করিতে পারেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অরক্ষণীয়ার ন্যায় অশ্রুঘন সাহিত্য আর তাঁহাদিগকে রচনা করিতে হইবে না!

একটি দরিদ্র ঘরের অবিবাহিতা কন্যার অদৃষ্ট অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন—কিন্তু কাণ টানিলে মাথা আসার মত দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের অন্তস্তলের সর্ববিধ দুঃখ, জ্বালা, হীনতা, ঘৃণ্যতা, পঙ্কিলতা সমস্তই এই উপন্যাসিকাখানিতে আলোকচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী সংসারের ভিতরটাও যেমন ফুটিয়াছে, তাহার বাহিরটা—তাহার প্রাকৃতিক ও মানসিক আবেষ্টনীটিও—তেমনি অবিকল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর গ্রাম্য অন্তঃপুরের চিত্রই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সে জন্য উপন্যাসিকাখানিতে নারীচরিত্রেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কয়েকটি হতভাগিনী নারীর জীবনযাত্রার কথাতেই পল্লীবাসী বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের ক্ষতবিক্ষত স্বরূপটি দেখানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বাঁশবনে ঘেরা এঁধো পুকুরের ধারের পল্লীকুটীরের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইত না। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন যদি এইরূপ পল্লীসংসারের চারিপাশে না কাটিত, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারাও এই সৃষ্টি সম্ভব হইত না। রসশিল্পীর বাল্যস্মৃতি কেমন করিয়া পরিণত বয়সে রসসৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠে, অরক্ষণীয়া তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সমস্ত নারীচরিত্রগুলিই জীবন্ত। দুর্গামণির জীবন অবিমিশ্র দুঃখের ইতিহাস—জ্ঞানদারও তাহাই—তবে তাহাকে শেষে আশ্বস্ত করা হইয়াছে। স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠে বিষের মাত্রা একটু অধিক হইয়াছে—ছোটবউ খুব স্পষ্টরূপে ফুটে নাই। অতি অল্পপরিসরের মধ্যে 'পোড়া কাঠ' খুব উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছে। এই 'পোড়াকাঠ' অগ্নিগর্ভ—তাহার স্ফুলিঙ্গগুলি গল্পটিকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। অরক্ষণীয়ার সকল চরিত্রের কথা ভোলা যাইতে পারে—'পোড়া কাঠকে' ভুলিবার উপায় নাই।

শরৎচন্দ্র যে সমাজের নরনারীর চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাদের হৃদয়ের বালাই বড় নাই। তাই কোথাও একটু হৃদয়ের পরিচয় পাইলে রুক্ষশুষ্ক পর্ব্বতগাত্রে—গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় উপভোগ্য হইয়া উঠে। হইয়াছেও তাহাই অতুলের আবির্ভাবে। শেষাংশটুকু বাদ দিলে অতুলচরিত্র যথাযথই মনে হয়। কলেজে-পড়া আজকালকার রোমান্টিক টাইপের ছেলে উত্তেজনাবশে একটু মহত্ত্ব ও উদারতা দেখাইয়া বসে—কিন্তু সে মহত্ত্বের আদর্শ বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে, এমন প্রত্যাশা দুর্গামণিই করিতে পারে—কোন শিক্ষিত বহুদর্শী লোক তাহা করিবে না-প্রথম তৃষিত যৌবনে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কোন প্রতিবেশিনী বালিকাকে তাহার চোখে ভাল লাগিয়া যাইতে পারে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রূপগুণমণ্ডিতা বহু পুরবাসিনী কন্যাকে ফেলিয়া তাহাকে কৃতবিদ্য যুবক বিবাহ করিবে—এমন প্রত্যাশা জ্ঞানদার মত সরলা বালিকাই করিতে পারে। তপঃশুষ্কা বিগতলাবণ্যা গৌরীকে শিব কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হন নাই। তপঃপ্রতীক্ষারই মর্য্যাদা তিনি রাখিয়াছিলেন। ইহা প্রেম জগতের চরম আদর্শ! গল্পের অতুল শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের সেই দেবাদিদেবের আদর্শই অনুসরণ করিবে ইহা ত স্বাভাবিক নয়। তবু বলিতে হয়—কলেজেপড়া ভাবাকুল যুবক

সাময়িক উত্তেজনাবশে কখন কি করে তাহারই-বা ঠিক কি? শরৎচন্দ্র অতুলের মুখের আশ্বাসেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—তাহার বেশি ত কিছু বলেন নাই। আশ্বাসেই গ্রন্থের মত সংকল্পেরও অবসান হইতে পারে। যে অতুলের প্রাক্তন আশ্বাসে আমরা বিশ্বাস করি নাই সে অতুলের এ আশ্বাসেও আমরা বিশ্বাস নাও করিতে পারি।

এই বড় গল্পটির সমস্তটুকুই Realistic, ইহার উপসংহারটুকু কেবল Idealistic. এই Idealismএ গ্রন্থের গৌরব কিছুই বাড়ে নাই। ইহা শুধু নিদারুণ শোকদুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ-ঘাতে আর্ত্ত চিত্তকে একটু সান্ত্বনা দান। পাঠক ইহাতে আশ্বস্ত হয় না। দুঃখের কাহিনীই সত্য—সান্ত্বনাটা যে মিথ্যা তাহা পাঠক-চিত্ত সহজেই বুঝিতে পারে।

অরক্ষণীয়া নিরবচ্ছিন্ন বেদনারই পরমসত্য কাহিনী। যিনি এ কাহিনী লিখিয়াছেন—তাঁহাকে বলা যায় না—দুই-একটা সুখের কাহিনীও ইহাতে যোগ দিলেন না কেন? সুখে দুঃখেই ত এ সংসার।

তবে ত একথা বলা যায়—যে সকল চিত্রের সহিত সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নাই—আবেষ্টনী-সৃষ্টির অঙ্গীভূত হইয়া এমন কতকগুলি চিত্র ইহার ফাঁকে ফাঁকে থাকিলে পাঠক-চিত্ত মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়িতে পারিত অর্থাৎ একটু ventilation এর ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

অতি কারুণ্য যতটা অশ্রুজল ঝরায় ততটা রস ঝরাইতে পারে না। রসিকচিত্ত শিরীষ-পুষ্পের মতই সুকুমার।

"পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।"

অরক্ষণীয়ায় শরৎচন্দ্র সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অরক্ষণীয়ার বেদনার কথা দরদের সঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন—কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নাই। এই মন্তব্য পরিণীতা গল্পের গুরুচরণের মুখে স্পষ্ট হইয়াছে—

"এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই—না খাই—শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়—এ সমাজ বড় লোকের জন্যে।"

শরৎচন্দ্র এই গল্পে যাহাদের কথা লিখিয়াছেন—তাহাদের কথা লিখিবার দিন আজিও ফুরায় নাই। বর্ত্তমান যুগে দুই-একজন ছাড়া তাহাদের কথা লইয়া কেহ আর মাথা ঘামান না। মূল কথা হইতেছে—লেখকদের দরদের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে তাহাদের লইয়া রসসৃষ্টিও সম্ভব নয়। কাজেই লেখকদের ইহাতে কোন দোষ নাই। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন যে নগরে কাটে নাই—ধনীর সংসারে যে তিনি প্রতিপালিত হ'ন নাই—অতিরিক্ত মার্জ্জিত রুচির আবহাওয়ায় যে তিনি পরিবর্দ্ধিত হ'ন নাই, তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতিই হউক (বলা বাহুল্য, ক্ষতি তাঁহারও হয় নাই, দরদী হৃদয়ের ক্রমোন্মেষ ও অভিজ্ঞতার মূল্যও ত কম নয়।) বঙ্গ সাহিত্যের খুব বড় একটা লাভ হইয়াছে, অরক্ষণীয়ার মত অনেকগুলি রস সম্পদ আমাদের উপভোগে লাগিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৫১ সালের ভারতবর্ষে শ্রীজনরঞ্জন রায় শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখা যায়। একটি মত শ্রীধর স্বামী, শ্রীচৈতন্য, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং অসংখ্য মহাপুরুষগণের মত। সে মত এই যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার যে সকল লীলার উল্লেখ আছে তাহা আলোচনা করিলে হৃদয় পবিত্র হয় এবং ভগবদ্‌প্রেমের সঞ্চার হয়। আর একটি মত খৃষ্টান পাদ্রিগণের দ্বারা প্রচারিত। সে মত এই যে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহা লাম্পট্য-পূর্ণ অতএব অশ্রাব্য। রাজা রামমোহন রায় শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির মত গ্রহণ না করিয়া খৃষ্টান পাদ্রিগণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। জনরঞ্জনবাবু রামমোহন রায়ের মত সমর্থন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে রামমোহন যদি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইতেন। সে উত্তর এই যে, ঈশ্বর এবং আদর্শ মানব উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। মানবের জন্য ঈশ্বর কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিলে মানবের পাপ হইবে, যে ব্যক্তি সেই নিয়মগুলি যত বেশী পালন করিবে সে তত বেশী আদর্শ চরিত্রের হইবে। কিন্তু ঈশ্বর সেই সকল নিয়মের অধীন নহে। অথবা তিনি নিজের জন্য অন্য নিয়ম করিয়াছেন। তিনি নিজের জন্য একটি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং "যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি।" যাহারা তাঁহাকে সখা বলিয়া ডাকে তিনি তাহাদের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করেন, যাহারা তাঁহাকে সন্তানরূপে স্নেহ করেন তিনি তাহাদিগকে পিতামাতারূপে ভক্তি করেন এবং যাহারা তাঁহাকে পতিরূপে ভজনা করেন তিনি তাহাদের নিকট পতিরূপেই দেখা দেন। কৃষ্ণোপনিষদে দেখিতে পাওয়া

যায় যে শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন তখন বনবাসী মুনিগণ তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দর দেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমি যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, আপনারা গোপিকা হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবেন"। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর।" বৃদ্ধমাতার সেবা করা পুত্রের ধর্মকার্য্য। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরলাভের জন্য সে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিসেবা রমণীর পক্ষে ধর্ম। গোপীগণ সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরলাভের জন্য। এইরূপ সাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ পতিরূপেই গোপীদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার অবশ্য আদর্শ মানবের মত হয় নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত আদর্শ মানব নহে। তিনি ঈশ্বর।

ব্যাপারটা যে অলৌকিক হইয়াছিল,—অতএব লৌকিক নিয়ম অনুসারে ইহার সমালোচনা অন্যায্য—ইহা ভাগবতে বলা হইয়াছে। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিল ইহা তাহাদের স্বামীরা জানিতে পারে নাই,—কারণ তাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের পত্নীরা তাহাদের পাশেই রহিয়াছে। গোপীরা দেখিতেছে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস করিতেছে। গোপীদের স্বামীরা দেখিতেছে গোপীরা তাহাদের পাশেই রহিয়াছে। কোন্ গোপী আসল, কোন্ গোপী নকল তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। কিন্তু কথা এই যে penal code প্রয়োগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডনীয় করা যায় না। ফরিয়াদী কোথায়? যাহাদের নালিশ করা উচিত সেই সকল গোপ বলিতেছে যে তাহাদের পত্নীরা তাহাদের পাশেই ছিল। অধিকন্তু আসামীর বয়স ১১ বৎসর। যাহা হউক,—ফরিয়াদী থাকুক বা না থাকুক, বিচারক অনেক। প্রথম বিচারক—খৃষ্টান পাদ্রিগণ। দ্বিতীয় বিচারক—রাজা রামমোহন রায়। তৃতীয় বিচারক—বাবু জনরঞ্জন রায়। ইঁহাদের সকলেরই রায়—শ্রীকৃষ্ণের দোষ, তিনি পরস্ত্রীর সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং," শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, তিনি "আত্মারাম" নিজের আনন্দেই পরিপূর্ণ, তাঁহার বিষয় ভোগবাসনা থাকিতে পারে না, তাঁহার মধ্যে কামের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীচৈতন্যদেব কাঁদিয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়াছেন—শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়—কিন্তু বিচারকগণ এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা রায় দিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ লম্পট এবং দণ্ড দিয়াছেন দ্বীপান্তর।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এ সকল কথার অর্থ কি যে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, কামবীজে তাঁহার উপাসনা। ইহার অর্থ এই যে সাধারণ মানবের মধ্যে কামভাব ঈশ্বরীয় সাধনার প্রধান অন্তরায়···সেই অন্তরায় দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করা হয়, —বিষের দ্বারা বিষের প্রতিকার হয়,—তেমন রাসলীলার দ্বারা কামভাব দূর করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ভজনের পথ সহজ করা হইয়াছে। যাহাদের মনে কামভাব আছে রাসলীলার বিবরণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, ফলে তাহাদের মন কৃষ্ণচিন্তায় নিবিষ্ট হইবে। * মন কৃষ্ণচিন্তায় নিবিষ্ট হইলে কামভাব চিত্ত হইতে বিদূরিত হইবে এবং সাধক ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "রাস মহাভারতে নাই। * * * ইহা পরের কল্পনা।" মহাভারত পাণ্ডবদের জীবন বৃত্তান্ত। পাণ্ডবদের জীবনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের যে অংশ সংশ্লিষ্ট মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ৩৭ জীবের অনুগ্রহের জন্য ভগবান নর দেহ ধারণ করিয়া এরূপ ক্রীড়া করেন যাহা শুনিয়া জীব তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন হয়।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ মেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ভাগবত ১০।২৯।১৫

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বন্ধুত্ব,—যে কোনও ভাবের সাহায্যে সর্বদা ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিলে ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সেই অংশই বলা হইয়াছে। রাসলীলার সহিত পাণ্ডবদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এজন্য মহাভারতে রাসলীলার কথা নাই। ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী অন্য কবি রাসলীলা কল্পনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করবার কোনও হেতু নাই।

আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রুতি বা বেদ। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু বলিতেছেন যে বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনুস্মৃতি। জনরঞ্জনবাবু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শাস্ত্র বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বাক্য এই—

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"

এই বাক্যের অর্থ এই যে শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই বড় হইবে। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিই বড় হইবে। ঠিক বিপরীত অর্থ। জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন যে রাজা রামমোহন না কি বলিয়াছেন যে "ভাগবতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে ভগবত্তা (ভগবত্তা?) আরোপিত হইয়াছে তাহা মনু-বিরোধী। মনুর বিপরীত বাক্য গ্রাহ্য নহে।" শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার এ কথার সহিত মনু সংহিতার বিরোধ আছে ইহা বড় কৌতুকপ্রদ কথা। রামমোহন কি যুক্তির দ্বারা এই বিচিত্র উক্তি সমর্থন করিয়াছেন জনরঞ্জনবাবুর তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক।

জনরঞ্জনবাবুর আর একটী অদ্ভুত উক্তি "ভারত সংহিতা অর্জুনপুত্র জন্মেজয়ের সর্প সত্রে" বর্ণিত হইয়াছিল। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু বলেন অর্জুনের পুত্র জন্মেজয়।

পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন "বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ও মহাভারতের যে যে অংশে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কথা আছে সেই সেই অংশ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত।" যদি প্রক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে ঐ সকল

* অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভাগবত ১০।৩৩।

গ্রন্থের এমন কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইত যাহাতে সে সকল অংশ নাই। জনরঞ্জনবাবু কি এমন পুঁথি দেখিয়াছেন? কলিসন্তরণ উপনিষদে আছে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

উপনিষদে সকলের অধিকার নাই। যাহাতে সকলে এই পরম পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে এজন্য তন্ত্রে ইহার একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশ পূর্বে বলিয়া প্রথম অংশ পরে বলা হইয়াছে

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "কলির মানুষ রামকে ঠেলিয়া দিয়া কৃষ্ণকে বড় করিল।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ং।" জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "গৌড়ীয় বৈষ্ণব কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ং এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।" যাহা ভাগবতে আছে তাহার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে দায়ী করা হইয়াছে।

ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। কেহ ঈশ্বরকে প্রভুরূপে কেহ পুত্ররূপে কেহ মাতারূপে কেহ পতিরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ভালবাসেন। হিন্দু শাস্ত্র-কারগণ সকল রকমেই ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহার যে ভাবে উপাসনা করিতে ভাল লাগে সে সেই ভাবেই উপাসনা করুক। অন্য ভাবে উপাসনাকে নিন্দা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

চোর

শ্রীভবেশ দত্ত

রায় বাহাদুর রমাকান্তবাবু অনেক দিন পর গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। আগে প্রায় বছরে একবার করিয়া আসিতেন কিন্তু ইদানীং মাস তিনেকের বেশী হইয়া গেলো তিনি আর যান নাই। বোধহয় গ্রাম তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, তাই শহরের কোলাহল হইতে একটু নিরিবিলি গ্রাম্য জীবনযাপন করিতেছেন।

সেদিন দারোয়ানের চীৎকারে রায়বাহাদুরের ঘুম ভাঙিয়া গেলো! তিনি বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন দারোয়ান একটা লোককে অবিরাম প্রহার করিতেছে!

তিনি দারোয়ানকে ওপরে ডাকিলেন।

দারোয়ান লোকটাকে ধরিয়া আনিয়া বলিল:—হুজুর আমার রান্নাঘর থেকে এই লোকটা আধ সের চাল চুরি কোরে নিয়ে পালাচ্ছিল!

রায় বাহাদুর লোকটির আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন!

তাহার পরণে জীর্ণ একটা বস্ত্র, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পেটটা বড় হইয়াছে, সারামুখে দারিদ্র্যের চিহ্ন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি ধমক দিলেন: ওর চাল চুরি কোরেছিস্?

লোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল: হুজুর কাল থেকে ছেলে মেয়েগুলো কিছু খায়নি, বৌটা জ্বরে বেহুঁস হোয়ে পড়ে আছে!

কাজ কোরে খেতে পারিসনে, জানিস চুরি করা কি ঘৃণ্য কাজ! কি পাপ কাজ আজ তুই কোরেছিস ভেবে দেখেছিস্?

হুজুর—

তিনি আবার ধমক দিলেন: চোপ, শুয়ার, চুরি কোরে পেট ভরানোর চেয়ে গলায় দড়ি দিতে পারিসনে, ওরে হতভাগা তোর যে নরকেও স্থান হবেনা।

লোকটি কাঁদিতে লাগিল!

তিনি লোকটিকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন: জানিস্? তোকে আমি জেল খাটাতে পারি।

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল নীচেয় দারোগা আসিয়াছেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে।

রায় বাহাদুরের মুখটা কেন জানি পাংশু হইয়া গেলো।

তিনি একটু কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলেন: ভালই হোয়েছে, ডেকে নিয়ে আয়, এ বেটাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

দারোগা ও পুলিশ উপরে আসিয়া বলিলেন: রায়বাহাদুর আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার কোরলাম!

তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন: মানে?

মানে, অতবড় নীচ কাজটা কোরে এসে এখানে আত্মগোপন কোরলে কি আর গভর্ণমেন্টের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

কিন্তু—

আচ্ছা বলুন তো কত হাজার কুইনাইনের বড়ি আপনি গ্রামের নামে নিয়ে গোপনে মোটা টাকায় বেচেছেন!

আমি!

হ্যাঁ চলুন তো!

পুলিশ হাতকড়া পরাইয়া দিল!

লোকটি অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

রায় বাহাদুর এতদিন পর শহরে চলিলেন।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য—ধর্ম্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্য আলোচনা সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মও খুব প্রাচীন। তবে এই ধর্ম্ম কখন হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলাও সহজ নহে। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হইতে পারা না যাইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যে ইহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই সময় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল এবং ইহার উপাসনায় বিষ্ণুপাদেরই পূজা করা হইত। বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজার পূর্ব্বে গয়ায় যে বিষ্ণুপাদের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কোদ্ধৃত উর্ণবাভের 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ' শীর্ষক বচন হইতে স্বর্গত কাশীপ্রসাদ জয়শয়াল প্রমাণ করিয়াছেন। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের অনেক আগে ত্রি-বিক্রম বাসব বিষ্ণুবাসুদেব বলিয়া পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দামোদর ও গোবিন্দের পূজা ও সাধারণ্যে বেশ প্রচলিত হইয়াছিল—(Buhler S. B. E. XIV)

প্রাচীন শিলালিপিগুলিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। লুডার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আবার খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের বিষয় উল্লেখ আছে। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেগুলি ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। কাজেই ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং এই বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। ভারতে ধর্ম্মমতের অন্ত নাই। সকল সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দই সাহিত্য সেবা করিয়াছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বৈষ্ণব মহাজনগণের পূর্ব্বে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সাহিত্যের নিছক লালন কাব্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণের অশেষ অনুগ্রহ না হইলে যে বঙ্গ সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করিতে পারা যাইত না তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগের পালবংশীয় নৃপতিগণের সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্যের ধরাবাঁধা ইতিহাস আরম্ভ কি না, নাথ সিদ্ধদিগের ধর্ম্মপ্রচার অথবা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যপ্রচার সে সব সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি না, আমি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়াসী নহি। যোগীপাল, মহীপাল, ডাক খনার বচনের বিষয়বস্তু উল্লেখ করিয়া সুধীজনের মহামূল্য সময় হরণ করিবার দুর্ম্মতিও আমার নাই। আমি কেবল বার বার করিয়া এই কথাই জগজন সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই যে, বঙ্গ সাহিত্যের গভীর পরিণতির সহিত বৈষ্ণব সাহিত্য সর্ব্ববৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, যে মাধুর্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ, সেই মাধুর্য্য, নিষ্ঠা, নিবিড়তার দ্বারা কাব্যলক্ষ্মীকে বাঁধিয়া লইয়া বঙ্গসাহিত্যকে গোষ্ঠের ন্যায় চিরসশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা ইহার রচয়িতা, তাঁহারা একাধারে সাধক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য রচনা তাঁহাদের নিকট বিলাস মাত্র ছিল না, সাধনারই অঙ্গীভূত ছিল। বৈষ্ণব মহাজনগণ আপনাপন হৃদয়ে নিকুঞ্জলীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক যাহা অনুভূতির দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাহাই পদাবলীর ছন্দে রচনা করিয়া জগজনকে উপহার দিয়া গিয়াছেন।

এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন একদিকে কাব্যলক্ষ্মীর অত্যুজ্জ্বল মণি, তেমনই অন্যদিকে ইহা একাধারে বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-সংহিতা-নীতিশাস্ত্র-ধর্ম্মশাস্ত্র ও বটে। তাহা না হইয়া যদি কেবল কল্পনাপ্রসূতই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে একই কালে দেবতা ও মানবরূপে শ্রেষ্ঠ ভক্তি ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইত না এবং বৈষ্ণবের মর্ম্মকথাও নব নব ভাবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কালের করাল তলে বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য কেবল আকাশেই জালবোনা নহে, এই জন্যই তাহা স্থায়ী হইয়াছে। তাই যুগে যুগে কত সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া গেল, তবুও এ ভাণ্ডার এতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হইল না। অবশ্য সেই ধর্ম্ম ও সাধনার বর্ত্তমানে হয় ত কিছু কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ের পরতে পরতে রাধাকৃষ্ণের অমরমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিল, ইহাই আমাদের লাভ।

আত্মাকৃষ্টির এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তাহার শাশ্বত পিপাসা। পরিপূর্ণতার প্রতি প্রাণের আকুল আগ্রহ ভারতের চিরন্তন প্রথা। ইহাকে সে আকাশকুসুম বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই। তাই তাহার চিহ্ন বিশ্বসভা হইতে মুছিয়া যায় নাই। প্রাণের এই যে আকুল নিবেদন, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পদাবলীর বৈষ্ণব কবি ভারতের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের মত কিনিয়া লইয়াছেন। আমরা বাহিরে যে রূপটি দেখি, তাহাই শুধু সুন্দর নয়। বাহিরের রূপটি আমাদের অন্তরের স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া দেয় মাত্র। আমরা ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি তাহা খণ্ড। কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড। যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রস-পান-পিপাসু অপূর্ণ খণ্ডাকৃতি জীবভৃঙ্গ। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে।

তাই যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত জাতির উত্থান পতন হইল, কিন্তু বৈষ্ণব কবি প্রেমপ্রীতির যে অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গেলেন, তাহার আদর্শ জগতের বুক হইতে কোন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ আবার ভরিয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তগমনে নব নব ভাবের আরতী প্রদীপ জ্বালাইয়া আবার প্রেমের ঠাকুর আসিয়া আমাদেরই বাঙ্গালায় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে যে তিনটি রসধারার নির্গম হইয়াছিল, তাহার শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণছায়ায় প্রয়াগ সঙ্গম হইল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতীর রসজীবনে পূর্ণযৌবন আসিল। বৈষ্ণব সকলকেই সাগ্রহে আলিঙ্গন দান করিলেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, বাঙ্গালার বাহিরে

অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই নূতন শ্রেণীর স্থাপত্য রচনা করিয়াছিলেন, এবার বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে এক অভিনব, অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা হইল, বৈষ্ণবের রত্নভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। ঘরমুখো বাঙ্গালী গৃহ কোণ হইতে বহির্গত হইয়া গয়া গেল, কাশীগেল, বৃন্দাবন যাত্রা করিল—সমস্ত ভারতের দৃষ্টিপথে এক অভিনব কাব্যসুধা হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। বাঙ্গালী পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল, এখন সে সকল স্থানের অধিবাসী বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব ধী সন্দর্শনে নতমস্তকে প্রণাম করিল। বাঙ্গালীর সাহিত্য তাহার পুর্ণরূপ পাইল, সমস্ত জাতি এক নবতম আলোকের সন্ধান পাইয়া প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী ছিল অপদেবতার পুজারী ও উপদেবতার উপাসক এখন হইতে হইল দেবতার লীলাসহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা মধুময় ঘটনা আর কি ঘটিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত, চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুত্রয়ের আবির্ভাব এই বাঙ্গালাদেশেই হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অমিয়-ধারা প্রবাহিত করিলেন, তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিল, নবগঠিত জাতি তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ লাভ করিল। শ্রীবৈষ্ণবদিগের অনুপ্রেরণায় জাতির জীবন বৈষ্ণব ভাবাবেগে রণিত হইয়া উঠিল, তাহাদের হাতের রচনা সমস্তই বৈষ্ণব ভাবোন্মাদনায় রণিত হইয়া পড়িল, বৈষ্ণব সাহিত্য পুর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়া বহুধারায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া একটি ধারা সংস্কৃত ভাষায় প্রবাহ লাভ করিল, আর একটি ধারা কবিরাজগোস্বামী, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বৈষ্ণবের ভক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় পূর্ব্বক বঙ্গ ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল; আর একটি ধারা অবলম্বন করিল—পদাবলী সাহিত্য। পদাবলী সাহিত্য যে কেবল বিশিষ্ট রূপই লাভ করিল, তাহা নয়, বৈচিত্র্যও বাড়িয়া গেল। একটি শাখা লোচনদাস, নরহরি দাস, বাসুদেব প্রভৃতির পরিচালনায় শ্রীচৈতন্যের মহাবেশময় লীলাবৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিল। আর একটি শাখা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির পরিচালনায় বৃন্দাবনলীলার অনুসরণে নবদ্বীপ লীলার রচনা করিল। নব নব রসের সমাবেশে কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কেলিকে ছাড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইল। আবার আর একটি ধারা শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতির পরিচালনায় বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলী একত্র সঙ্কলিত হইয়া রসের ক্রম বিবর্ত্তনের ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক বিভিন্ন লীলা রচিত করিয়া তুলিল এবং সেই পালাই গ্রামে গ্রামে রসকীর্ত্তন সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনকে রসজীবন করিয়া গড়িয়া তুলিল।

এইরূপেই বৈষ্ণব সাহিত্য জাতির মর্মে মর্মে গাঁথিয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্যই নয়। যাঁহারা সাহিত্য হিসাবে ইহার গ্রাহক হইতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ইহাতে বিমলানন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত রস কেবল তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যাঁহারা এই সাহিত্যের মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকেই পরম প্রেমাস্পদ কল্পনা করিয়া তাঁহারই সহিত শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর প্রণয়লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন—কিন্তু চৈতন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ মধুর ভাবে আরাধনার প্রবর্ত্তন ত করিলেনই এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া সমস্ত প্রকার মনের সম্পর্কের ভিতরেই শ্রীভগবানের প্রকাশ ও লীলা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনুভব করিলেন যে—যাহাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তাহার মধ্যেই আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা—প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না। সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না—তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ তরে
যথাসাধ্য যে যাঁহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তারা
লুটে পুটে নিতে চায় সব। এত গীতি
এত ছন্দ, এত ভাব উচ্ছ্বসিত প্রীতি
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধা স্রোতে।

এই জন্যই বলিতেছিলাম যে সাহিত্যের রূপ ছাড়াও ইহার আর একটি রূপ আছে, যাহা সন্দর্শনে ভক্তহৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। ইহা একদিকে যেমন ধর্ম্মগ্রন্থ, তেমন আবার কাব্যগ্রন্থও বটে; তাই শুকদেব বলিয়াছেন, 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধুর্য্য পূর্ণ কাব্যরসকে আশ্রয় করিয়া জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি রসনির্ঝরিণী প্রবাহিত করিলেন—

তাহা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য, চৈতন্য নিত্যানন্দের পরশ প্রাপ্তিতে সমস্ত দেশকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল—

প্রেম বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। প্রেমের আগ্রহে ও আর্ত্তিতে বিরহে ও মিলনে, বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চ প্রণালীকে যেমন তিনি মূর্ত্তিদান করিয়া তুলিলেন, বৈষ্ণবের সাহিত্যও সেই নবপ্রবর্ত্তিত পথে কুল কুল তানে ভাবগীতি গাহিতে গাহিতে পরমানন্দে ছুটিয়া চলিল। এইজন্য এককালে কানু ছাড়া যেমন গীত ছিল না, পরে তেমনই আর গৌরচন্দ্রের চরিত বর্ণনা ছাড়া গীত কল্পনা করা যাইত না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যেমন প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইল, তেমনই ছন্দ, গীত, সুর, ভাবধারা দিকে দিকে উৎসারিত হইয়া জগজনকে মোহিত করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে চণ্ডিদাস বা বিদ্যাপতির অনুকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, মৈথিলী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতির সংমিশ্রণে 'ব্রজ বুলি, নামে এক সুললিত, শ্রুতিসুখকর বৈষ্ণবীয় ভাষার জন্মদান করিলেন। ভগবৎলীলা মাধুর্য্যপূর্ণ এই যে কাব্য—ইহা বস্তুতই বিশ্বসাহিত্যে অতুল। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা লীলাকে রূপক বলিয়া মনে করেন। এরূপ শ্রেণীর লোকের স্বরূপ যে বৈদেশিক আওতায় নীলাম হইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন—"যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত-মূর্ত্তি স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।......কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ বৈচিত্র্যে ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে। মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"সেদিন কবির চোখের সামনে কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন। চোখে কাজল-পরা, ঘাটথেকে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা—সে মেয়ে আজ নেই, আছে সেই শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানে তেমনি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীবর্গ বৈষ্ণব-কবিতা যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাঙ্গালীর প্রাণের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বৈষ্ণব কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও উষর চিত্তকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে তত্ত্ব অপেক্ষা রসের দিক দিয়া বুঝিলে ঠিক বুঝা যাইবে।

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
নয়ন মেলিয়া তোমা দেখি।

এই ভাব রসে উদ্বেলিত হইয়া যে কাব্য রচিত হইল, তাহার প্রধান আশ্রয় হইল প্রেম। আবার মানবের সূক্ষ্ম অনুভূতি বেদনা যে দিন পরম নিগূঢ় আস্বাদনের বিষয় হইল, সেই দিন তাহার আশ্রয় হইল গীতি কবিতা। বাঙ্গালীর সাহিত্য শিল্প ও চির-প্রচলিত রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লী বীথিকার কুসুম শোভিত ললিত বিতানের মধ্য দিয়া গীতি অক্ষরে নৃত্য করিতে করিতে আপনার চলার রাস্তা করিয়া লইল। এ ঝঙ্কার এখনও থামে নাই, বঙ্গ সাহিত্যে গীতি কবিতার প্রভাব এখনও উন্মূলিত হয় নাই। শুধু সাহিত্য সাধনা কেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন, সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালীতেও ইহার ঢেউ যাইয়া লাগিয়াছে। "এদেশের পাখীর কূজন, অলির গুঞ্জন, নদীর কলধ্বনি, পত্রের মর্ম্মর, শিশুর কাকলী, পশুর কণ্ঠস্বর সবই ছন্দে গাঁথা। এদেশের উপাসনা হইতে ধানভানা পর্য্যন্ত সবই কবিতার ছন্দে। লৌকিক ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ—সবই ছন্দ ছড়ায়। বালিকা পুণ্যি পুকুর, সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত করে, পল্লীবালা ভাঁজো গায়, সতীলক্ষ্মীরা ব্রতোপাসনা করে, কন্যাদের অনক্ষরী শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যৎ শ্বশুর বাড়ীর আভাস দেয়, শিশুর চোখে সন্ধ্যা বেলায় ঘুম আনে, ভোরবেলায় তার নিদ্রাভঙ্গ হয়, দুপুরবেলায় তাহার দৌরাত্ম্য থামে, সবই কবিতার ছন্দে। ভগিনী ভ্রাতার কপালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা দেয়, জননী সন্তান সন্ততিকে আশীর্ব্বাদ করে, শিশুরা চন্দ্র সূর্য্য ঝড় বৃষ্টি পশু পাখীর সঙ্গে কথা কয়, কামিনীরা বেহাইকে ঠাট্টা করে, ভামিনীরা কলহ করে ছন্দ ছড়ায়। বহুদর্শী গ্রামবৃদ্ধই হোক, বর্ষিয়সী পল্লী মহিলাই হোক, ভূতের ওঝা, সাপের রোজা, নৌকার দাঁড়ী, পথের ভিখারী, পশারিণী, দেয়াশিনী, ফেরিওয়ালা সবারই সম্বল—সবারই পুঁজি কতকগুলি ছন্দে গাঁথা কাব্য কথা। দেশের প্রবাদ প্রবচন, শাসন বচন অভিজ্ঞতার সকল ফলাফল কবিতার পংক্তিতে রচিত। শোকাতুর পল্লী-রমণীর উচ্চৈস্বরে রোদনের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মকথা, মর্ম্মব্যথা, কর্ম্মপ্রথা সবই প্রকাশিত ছন্দে।" বাস্তবিক বাঙ্গালার আদি কবি জয়দেব গোস্বামী যে কি এক অভিনব অত্যুজ্জ্বল পরিস্থিতির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন কে জানে—কোথায় ইহার শেষ। জয়দেব যে পরিস্থিতির অবতারণা করিলেন, যাহার পতাকা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সগৌরবে বহন করিয়া চলিলেন, তাহারই পটভূমির উপর আবির্ভূত হইল বাঙ্গালার প্রেম সাধনার সিদ্ধবিকাশ, অনন্ত রস ঘনমূর্ত্তি, নদীয়া জীবন ধন শ্রীচৈতন্য। আর সে ধারা আজিও জাতির প্রাণে প্রাণে অমলানন্দের অমিয় ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে ভাব-সমৃদ্ধ সহজিয়া সাধক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার শুদ্ধ শুভ্র হৃদয়াবেগকে অপূর্ব্ব সাহিত্য কথায় বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। বাঙ্গালীর যাহা নিবেদন, যাহা তাহার হৃদয় মথিত ধন, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কেলি বৈষ্ণবের আসল কথা নহে, ইহা প্রেম-সত্যকে অমর করিয়া রাখিবারই উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয় প্রণয়িনীর রুচি বিকশিত

ক্রিয়াকলাপে পৃথিবীর ইতিহাস দোষ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবগণ এক উদ্ভট গল্পের অবতারণা করিলেন—প্রণয়ী প্রণয়িনী তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়াও আরও দিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে নিস্তার পাইল না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়ে ছিল মনে।

তাহার পর নিজেই তাহার উত্তর দিয়া বলিয়াছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" নহে—

"—আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয় জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে—কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি—দিই তাই
প্রিয় জনে। প্রিয় জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে। আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির এই যে প্রেমের সন্ধান আমরা পাই, যে প্রেম শ্রীচৈতন্য নদীয়ার পথে পথে সশিষ্যে বিলাইয়া গেলেন, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব সামগ্রী—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

এই প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ এবং ইহারই প্রভাবে জাতির চিত্ত সরস, সুন্দর, উন্নত, ধর্ম্মানুগত ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই প্রভাবে শাক্ত কবিদিগের শ্যামা সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে আবার ইহারই প্রভাবের সহিত পাশ্চাত্য ভাবধারা মিলিত হইয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যকে ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক কালের কবিগণ এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য্য ও পদ লালিত্যকে লালন করিয়া যুগোপযোগী নব নব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

এই জন্যই কত কাল চলিয়া গেল, কত যুগ পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু যমুনাতীরের সেই বিশ্ব-বিমোহিনী সুর ঝঙ্কার আজও থামিল না। আজ সে শ্যাম নাই, সে বাঁশরী নাই, কিন্তু ভক্ত ভাবুকের হৃদয়ে সে সুর গলিয়া গলিয়া তেমনি বাজিতেছে তাঁহারা তেমনই আকুল, তেমনই ব্যাকুল, তেমনই বিহ্বল !

ভাবের প্রবাহ কে কবে চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছে ? ইহা যে আপনি উথলিয়া উঠে। ভক্ত হৃদয়ে প্রেমের পীযূষ প্রবাহ যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখনই তাহার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকাল কত যুগযুগান্ত পরে শ্যামসুন্দরের রূপে পাগল হইয়া, বাঁশরী বিতানে আত্মহারা হইয়া কেন্দুবিল্বের কুঞ্জ-কুটীরে কবি-কুল-চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী, নান্নুরের পল্লীতে চণ্ডীদাস, মিথিলার নিভৃত কুঞ্জে বিদ্যাপতি, শ্রীখণ্ড গ্রামে গোবিন্দদাস, কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস, যে প্রাণ কাঁদান সঙ্গীত লহরী সৃষ্টি করিলেন, সে কোমল মধুর পদাবলী আজও জাতির প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, একটী অভিনব ভাবগাথা সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে, গৃহে গৃহে ভক্তি সহকারে পঠিত হইতেছে, অমূল্য সম্পদ রূপে সাদরে রক্ষিত হইতেছে।

এই যে বৈষ্ণব সাহিত্য, ইহা যেন সমুদ্রমুখী নদীর স্রোত—উভয় তীরে মনুষ্য বসতি, পুষ্পবন, গোচারণ মাঠ, শিশুর কাকলী, কত দৃশ্য—কত গন্ধামোদিত উপবন, কত সোনার ফসলে হাস্যময় দিগন্তলয়ে দিগ্‌বধূদের অকূল লীলা, কিন্তু মোহানায় পৌঁছিবার সময় দেখিবেন, দূরে সুদূর বিস্তৃত অনন্ত সাগর—যেখানে সমস্ত কল কোলাহল থামিয়া যাইয়া রহস্যের নির্ব্বাক ধ্যান মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণব কবিরা সংসারের কাহাকেও বাদ দেন নাই, সেই প্রেমময়ের নিত্যলীলা যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ তাহাকেও বাদ দিয়া হয় না। তাই তিনি সকলের জন্য ব্যাকুল। এইখানেই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রস রহস্যের সংমিশ্রণে বৈষ্ণব সাহিত্য এই যে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাব পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

জীবনপথের এত শ্রান্তি এত হাঁটাহাঁটি, এত সুখ দুঃখের পরিণাম কি তাহা আমরা জানি না—কিন্তু এই দুর্গম পথ যে ভবিষ্যতের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত তাহা আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারি। বৈষ্ণব সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন ছত্র আছে, যাহাতে সেই অনন্তপথের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই ইহা রসিক পাঠকের কাছে যেমন আদরের তাহা অপেক্ষা অধিক যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের নিকটও তেমনই উপভোগ্য। এই রসধারা মর্ত্ত্য পথ ধরিয়াই চলিয়াছে সত্যে, কিন্তু তবু বলিতে হইবে ইহা বিষ্ণু পদচ্যুত। জয়দেব লিখিয়াছেন—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসু কলাসু কুতুহলম্
মধুকর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।

যাঁহারা ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিতে চাহেন, এবং যাঁহারা পার্থিব প্রেমগীতিকা শ্রবণে উৎসুক তাঁহারা—এই উভয় বিধ পাঠকই গীতগোবিন্দ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের পদাবলী পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈষ্ণব কবি জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে দেখিয়াছেন, প্রেম মন্দিরে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না জানয়ে তারে,
প্রেমের আরতি যে জন জানায়
সেই সে চিনিতে পারে।

এই প্রেম তীর্থের পথিক আমাদের পরমারাধ্য। এই জন্য বিষ্ণুশর্ম্মা যেমন গল্প শুনাইতে যাইয়া রাজকুমারদিগকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, বৈষ্ণব কবিও তেমনই মানুষী প্রেম কাহিনী দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া জগজনকে সর্ব্ব কথার মধ্যে যাহা সার তাহাই শুনাইয়া দিতে যাইয়া সরস্বতীর এলাকা ছাড়িয়া সরস্বতীনাথের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণের রূপ যেমন সর্ব্বত্র ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, কাব্যলক্ষ্মীও তেমনই অপরূপ বেশে সজ্জিতা হইয়া জগজনকে একেবারে তন্দ্রাভিভূত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল নদেরচাঁদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলায়। মানব-দেবতার রূপ ও গুণের আস্বাদন মানসে পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ মধুচক্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে কি না জানি না।

হে তপস্যার ধন, তুমি কেন একবার নদীয়াতে আসিয়া দেখা দিয়াছিলে, তাহা বলিতে পারি না। সাধকগণ যাহাকে নিমেষ মাত্র ধ্যানে পাইয়া আবার যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করিয়া চলে,তুমি কি সেই সাধনার মহাধন? সংসারে ত সকলেই ধন পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার মত কে কোথায় ভগবানের জন্য পাগল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছে। তোমার অশ্রুসজল চোখের কোণে যাহার প্রতিকৃতি পড়িয়াছিল, তাহাকে তোমার মধ্য দিয়াই ভারতবাসী বার বার মাত্র দর্শন করিয়াছে, আর সেই প্রেমধারা এখনও প্রবহমান রহিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমিয় সাগরে।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

শেষ জীবন

(১৬)

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বার হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬ই জুন হইতে লণ্ডনে প্রিভি কৌন্সিলে জুডিসিয়্যাল কমিটিতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে

সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ)

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যধন পরলোকগমন করেন এবং এই মৃত্যু-সংবাদে তিনি বিশেষ ব্যথিত হন।

ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর কেবল প্রিভি-কৌন্সিলে ব্যারিষ্টারীই করেন নাই, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণ ও জননায়কগণকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কে একটি সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা অতি বিশদভাবে বিবৃত করেন। উহার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া কলিকাতায় ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটীর সদস্যগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক পত্র লিখেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাতপুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে উক্ত সোসাইটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই পত্রের উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :

খিদিরপুর, বেডফোর্ড পার্ক
ক্রয়ডন
২৮শে মার্চ্চ ১৯০৩

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ৫ই তারিখের পোষ্টকার্ডের জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত এবং ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কের রবিবাসরীয় বৈকালিক সম্মেলনে আমি যে মতামত বিবৃত করিয়াছি তাহা আপনার এবং ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটীর সদস্য ও অধ্যক্ষ সভায় প্রশংসা লাভ করিয়াছে জানিয়া আপনাকে ও তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য কাজ করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এদেশে পড়িয়া আছে, কিন্তু অর্থ ব্যতীত এদেশে আমাদের প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা সহজ নহে—এবং আমাদের অর্থের অভাব। আমরা কি করিতেছি তাহা আপনারা 'ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে দেখিবেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় রাষ্ট্রসভার ব্রিটিশ কমিটীতে আপনাদের

সমাজ যাহা কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন—তাহা তৎকর্তৃক ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং সাধুভাবে এদেশে ব্যবহৃত হইবে।

শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বনার্জ্জী বি-এল
সহকারী সভাপতি, ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটী

আপনাদের বশংবদ
ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী

তিনি ইংলণ্ডে কংগ্রেসের পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটীতে মূল্যবান পরামর্শ দিতেন, কংগ্রেসের লণ্ডনস্থিত মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া'র সম্পাদককে নানা তথ্য ও উপদেশ প্রদান করিতেন। হিউম একস্থানে বলিয়াছেন যে-সকল সঙ্কটে তিনি পরামর্শ দিতেন ও মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের সকল সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিতেন।

তিনি য়ুরোপীয় বেশভূষা আচার ব্যবহারাদি অবলম্বন করিলেও যাঁহারা তাঁহার স্বদেশের বেশভূষা আচার ব্যবহার নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিতেন তাঁহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। বোধ হয় আচারনিষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বাহ্যতঃ যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত সেরূপ আর কাহারও সহিত নহে, অথচ স্যর গুরুদাসের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইলে উমেশচন্দ্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন:

খিদিরপুর, বেডফোর্ড পার্ক
ক্রয়ডন
২৪শে জুন ১৯০৪

প্রিয় স্যর গুরুদাস,

আজ সকালের কাগজে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজকে সম্মানিত করিয়াছেন দেখিয়া আমি অসীম আনন্দ লাভ করিলাম এবং এই উপলক্ষে আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। যদি আমাকে বলিতে অনুমতি দেন ত বলিতে পারি যে, আপনি যে যে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহাতেই একনিষ্ঠভাবে যেভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন তাহা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না এবং আপনার কর্ত্তব্য-পরায়ণতার তুলনা নাই। যদিও আপনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধু, ন্যায়পরায়ণ, অমায়িক ও বিচক্ষণ বিচারপতি ছিলেন, তজ্জন্যই যে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি তাহা নহে। আপনি স্বদেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনচেতা বলিয়াই আপনাকে আমি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয়, নবীন যুবকগণের মঙ্গল কিসে হয়, ইহাই আপনি অনুক্ষণ চিন্তা করেন। আমি আশা করি আপনার অবসর গ্রহণ করিবার পর আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আপনি দেশের উন্নতির জন্য কাজ করিয়া যাইবেন। আমাদের বন্ধু রাজনারয়ণ মিত্র,—যিনি গলদেশে অস্ত্রোপচারের পর সম্প্রতি সুস্থ হইয়াছেন,—আমাকে তাঁহার প্রণাম জানাইতে বলিতেছেন এবং আপনার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল সুখভোগের কামনায় আমার সঙ্গে যোগ দিতেছেন।

ভবদীয়
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের 'ব্রাইটস্ ডিজিজ রোগে দৃষ্টিশক্তি অতিশয় ক্ষীণ হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ উড এবং অন্যান্য সন্তানগণ

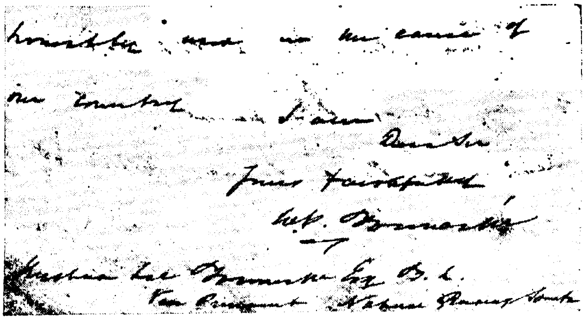

উমেশচন্দ্রের ইংরাজী হস্তাক্ষর

তাঁহার প্রিভি কৌন্সিলের মোকদ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার পত্রাদি শুনিয়া লিখিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি একেবারেই

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোবাধ্যায়

দৃষ্টিশক্তিহারা হন, তথাপি জীবনের শেষ দিনগুলি পর্য্যন্ত তিনি কাজ করিতে বিরত হন নাই। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেও তিনি প্রিভি

কৌন্সিলে মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। মিঃ এস্কুইথ (পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী), লর্ড হ্যালডেন, লর্ড রেডিং প্রভৃতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যেরূপ যোগ্যতাসহকারে মোকদ্দমা করিতেন তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয়দের মধ্যে প্রিভি কৌন্সিলের বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডের বন্ধুগণের অনুরোধে ওয়ালথামষ্টো হইতে উদারনীতিক দলের প্রতিনিধিরূপে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। তিনি নির্বাচিত হইবেন এরূপ আশাও ছিল,

উমেশচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে

কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দৃষ্টিশক্তিহারা হওয়ায় তিনি সে প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন।

শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ৩রা নভেম্বর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ক্রয়ডন হইতে তদীয় খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন:

"স্বদেশী আন্দোলনের সহিত আমার গভীর সহানুভূতি আছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে দেশাত্মবোধ এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে, আর আমি বিশ্বাস করি, যদি যথাযথরূপে ইহা পরিচালিত হয় ইহাতে আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে—ভারতীয় ব্যাপারসমূহ এদেশের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে। শুধু ইহাই নহে, আমাদের লুপ্ত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার হইবে এবং দেশের শিল্পজীবন সঞ্জীবিত হইবে।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতবর্ষে যে সকল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা নির্বাচিত সভাপতির প্রার্থনায় তিনি প্রতি বৎসর তাঁহার মূল্যবান উপদেশপূর্ণ বাণী পাঠাইতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে যেবারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেবারে উমেশচন্দ্র সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে একটি দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার এক-স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"আপনি সম্প্রতি এ দেশে আসিয়া সাধারণ সভাসমূহে এবং ব্যক্তিগত-ভাবেও এ স্থানের অধিবাসীদের সংস্পর্শে থাকিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এ দেশের লোকেরা ন্যায় বিচার করিতে অনুৎসুক নহে এবং আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ; আমাদিগকে কেবল দেখাইতে হইবে যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত। কংগ্রেসের সদস্যগণ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত এবং যদি আমরা প্রতিনিয়ত আন্দোলন করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ন্যায় ও বিধিসঙ্গত, যে আমরা শাসন-

গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে

পদ্ধতি অবগত আছি এবং পরিচালনে সমর্থ, এবং এই অধিকার প্রদান করিলে আমাদের স্বদেশের এবং ইংলণ্ডের কল্যাণ হইবে, তাহা হইলে অনতিকালমধ্যে আমাদিগকে অধিকার দিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। স্বরাজলাভের জন্য আমরা যে একান্ত উৎসুক এ ধারণা ব্রিটিশ জন-সাধারণের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্য আমাদিগকে দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বিষয়ক আন্দোলন অবিশ্রান্তভাবে চালাইতে হইবে, কারণ একমাত্র ব্রিটিশ জনসাধারণই আমাদিগের ঈপ্সিত অধিকার আমাদিগকে দিতে পারে। আমাদের দাবী যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ব্রিটিশ জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য ভারতবর্ষে কংগ্রেস-নির্দ্দেশিত পথে আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে।"

কংগ্রেসের ইতিহাসে উমেশচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন:

"তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি অধিনায়ক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং

শাসকসম্প্রদায়ের বিরক্তি উৎপাদন করে—তিনি সে ভাবে রাজনীতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না। তাঁহার সংশ্রব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে একটী দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবময় আসন প্রদান করিয়াছিল যাহা শাসকসম্প্রদায় সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা হয়ত অন্যথা উহা লাভ করিতে পারিত না। * * *

তিনি কংগ্রেসের জন্মাবধি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বের প্রভাব ব্যবহারাজীবদিগকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল! বাগ্মিতায় তাঁহার সমসাময়িক কেহ কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছেন, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁহার সহযোগীদের কেহ কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু ধীর ও শান্তভাবে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যথোচিত উপায় উদ্ভাবন, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতি-বিশারদোচিত পরামর্শ ও নির্দ্দেশ প্রদান প্রভৃতিতে তিনি তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে অতুল্যপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জননায়কের আসন আজিও শূন্য রহিয়াছে। তিনি ইহলোকে নাই—তাঁহার আসন অধিকার করিতে কেহ নাই, এবং বাঙ্গালাদেশ তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতমটীর বিয়োগব্যথা নীরবে বহন করিতেছে!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই ক্রয়ডনে উমেশচন্দ্র দেহরক্ষা করেন এবং গোল্ডার্স গ্রীণে তাঁহার চিতাভস্ম সমাহিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন "দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি আমাকে বরোদায় লিখিয়াছিলেন যে এক দুরারোগ্য ও সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি আর অধিককাল বাঁচিবেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম উহা সত্য নহে; কিন্তু যখন একমাস পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ডে আসিলাম এবং যখন আগমনের পর প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তখন আমি দেখিয়া মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলাম যে তাঁহার অন্তিমকাল বহুদূরবর্ত্তী নহে। গত শনিবার ২১শে জুলাই ১৯০৬, মাননীয় মিষ্টার গোখলে ও আমি তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে গিয়াছিলাম! কিন্তু তিনি কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না,—প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করা হইতেছিল। সেই রাত্রেই আমরা টেলিগ্রাম পাইলাম যে তিনি আর ইহজগতে নাই!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই দৌহিত্রী সুষমাকে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "গত শনিবার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন এবং দাদাভাইয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। গোখলে শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন, সুতরাং আমি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের জন্য কাজ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহশীল, বৎসরান্তে একবার করিয়া ভারতবর্ষে যাইব।" ৩১শে জুলাই তিনি বিহারীলাল গুপ্তকে লিখিয়াছিলেন, "টেলিগ্রামে এখানকার সব খবরই পাইতেছ; মর্লির অতি সহৃদয়তাপূর্ণ বক্তৃতা এবং ভারতবর্ষকে কিছু যথার্থ অধিকার দান এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—যাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম।" রমেশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের প্রায়ই সংবাদ লইতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তাহার কন্যা কমলাকে লিখিত পত্রে আছে,—

"আমাকে লিভারপুলে মিষ্টার গোখলেকে এবং উমেশচন্দ্র বনার্জ্জীর

উমেশচন্দ্র ৫৭ বৎসর বয়সে

কন্যাকে দেখিতে যাইতে হইয়াছিল, এবং গত কল্য এবং তৎপূর্ব্বদিন লণ্ডনে মিঃ জন মর্লির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হয়। * * *

আমাদের অন্যতম দেশসেবক মিষ্টার আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলাম। এ দেশে গত দুই মাসের মধ্যে ডব্লিউ-সি-বনার্জী ও বদরুদ্দীন তায়েবজী ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। যাঁহারা বিগত যুগে রাজনীতিক কার্য্যে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে চলিয়া যাইতেছেন, নবীনগণকে এখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত আসন পূর্ণ করিতে হইবে এবং আমি আশা করি তাঁহারা তাহা যথাযোগ্যভাবে পূরণ করিবেন।"

ক্রমশঃ

সতর্কী

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবন জড়ায়ে মৃত্যু হাসিছে
চিত্ত ভাবনা হীন।
নিত্য কামনা জনম লভিছে
ভাঙা গড়া নিশিদিন ॥…

জীবন-বীণার তন্ত্রীতে যবে
মরণ আঘাত হানে—
বাসনার ধূপ ধূম উদ্‌গারী
নির্য্যাস নাহি দানে ॥

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

অমল সন্ধ্যার কিছু পরে গৌরীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

গৌরীর বাবা ও মা তাহাকে পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহেশবাবু তাহাকে বারান্দায় মাদুরের উপর বসাইয়া বলিলেন—ইংরিজিতে এম্-এ পড়ছো—কেমন পড়াশুনো হচ্ছে? ফাষ্ট ক্লাস পাবে মনে হয়? আর পাবেই বা না কেন,—ফাষ্ট ক্লাস অনার্সই ত পেয়েছিলে।

অমল বলিল,—এখন পর্য্যন্ত যেরূপ পড়াশুনা হ'য়েছে তা'তে আশা কম।

—কেন, কেন বাবা?

অমল—টিউসনি ক'রতে হয়—টাকাটা ত নিজেই জোগাড় করি, কাজেই সুস্থ মনে পড়া অনেক সময় হয় না।

—যাক্, সামনের বছরটা যেমন ক'রে হোক্ পড়াশুনা ক'রবে, যাতে ফার্ষ্ট ক্লাস হয়।

অমল মহেশকাকার কথার মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছিল সন্দেহ নাই, তবুও তাহার মনে হইল এই সমাদর ও সাহানুভূতি নিরর্থক নাও হইতে পারে। গৌরীর সঙ্গে তাহার বিবাহের সামাজিক কোন বাধাই নাই। তাহার জীবনের প্রতি, কৃতকার্য্যতার প্রতি হয়ত সেই কারণেই তাহার এই আগ্রহ।

কাকীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে খাইতে ডাকিলেন। গৌরীই পরিবেশন করিবে। কাকীমা অমলকে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—অমল, আমার কথা তোমার মনে আছে?

অমল কাকীমাকে দেখিয়াছে বটে কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। সে ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইল মাত্র। তিনি পুনরায় বলিলেন,—ছোটকালে তোমার আড়ি ছিল আমার সঙ্গে। তোমাদের পুকুরে জল আনতে যেতাম, তোমার বয়স হয় ত তখন বড়জোর ছয়। তোমাদের বড় ঘর ও পশ্চিমের পোতার ঘরের মাঝে এতটুকু একটু রাস্তাছিল, তুমি দুই ঘরের দাওয়ায় দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রোজই ব'লতে,—ছুঁয়ে দি ছুঁয়ে দি। মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে—

অমল হাসিয়া উঠিল,—গৌরীও মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া হাসিল। গৌরী অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অমলের প্রতি একবার চাহিল।

—শুনলাম, দুপুরে নিজে রেঁধেছ, কি দরকার ছিল? ও গৌরীও নেহাত অবুঝ, আমাকে একটু জানাল না। কাল তুমি এখানেই খাবে, গৌরী তোমার মায়ের রান্না ক'রে দেবে।

অমল খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া বলিল—মার সঙ্গেই আমি খাবো।

কাকীমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত কোনকালেই এমন লাজুক ছিলে না। পুরুষ ছেলে একটু মাছ না হ'লে কি খেতে পারবে?

—ছোটকাল থেকে ত মার সঙ্গেই খাই,—আর মা—

কাকীমা পুনরায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—মার সঙ্গে বসে না খেলে ভাল লাগে না—না? বেশ বাবা তাই খাবে; কিন্তু তুমি ত ভুলে গেছ, ছোটকালে তুমি দিবারাত্রি একরকম আমার কাছেই থাকতে—তোমার মা ত তোমাকে দেখতে সময়ই পেতেন না। কত রাত্রি তুমি আমার এখানেই ঘুমিয়েছ—

অমল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলিল,—আমার মনে নেই ত।

—থাকবে কি করে? তখন ত তোমার বয়েস বড় জোর দেড় বছর। তুমি সামনের উপর রান্না ক'রে খেলে তাই কষ্ট পাই—মা তোমার অবশ্য নই, কিন্তু কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ত ক'রেছিলাম—

গৌরী বলিল,—ভাত রাঁধার নমুনা ত দেখলাম—কিন্তু কিছুতেই স্বীকার যাবেন না যে পারি না।

অমল প্রতিবাদ করিল,—তোমার চেয়ে ভাল পারি,—আলু ভাতে ত নুনে পোড়া—

—মিথ্যে দোষ দিলেই ত আর হয় না।

কাকীমা হয়ত মনে মনে হাসিলেন—ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনায়। বলিলেন,—যাক্, কাল তোমরা দুটিতে মীমাংসা ক'রে নিও—তুই কাল দিদির রান্না ক'রে দিয়ে আসিস্—সকাল সকাল দশটার আগে—

—কিন্তু সে কি খাওয়া যাবে!—অমল মিটিমিটি হাসিয়া বলিল।

গৌরী বলিল,—আপনি ত ভারী ঝগড়াটে দেখ্‌বো, জেঠিমা ত কাল খাবেন। তিনি ত মিথ্যা বলবেন না।

কাকীমা হাসিলেন,—মেয়ের এই স্বভাব-সুলভ প্রগল্ভতা দেখিয়া এবং খুশী হইলেন সম্ভবতঃ তাহাদের নৈকট্যের পরিচয় পাইয়া।

পরদিন সকালে পাড়ার উপর একটু ঘুরিয়া আসিয়া অমল দেখে,—গৌরী পিঠের উপর একরাশ ভিজাচুল ছড়াইয়া সমস্ত শক্তি দিয়া

বাটনা বাটিতেছে। শ্রমে মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ভিজা চুল স্থানচ্যুত হইয়া বার বার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল,—মা, তুমি জল খেয়েছ ?

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বেড়া হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—গৌরী থাক্‌তে তোর আর সে ভাবনা নেই।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস নিক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—পরের মেয়ে, কবে বিয়ে হ'য়ে কোথায় চলে যাবে! বুড়োকালে যদি ওর মত কেউ কাছে থাকৃতো তবে ত কোন ভাবনাই ছিল না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া গৌরী মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন,—তোকে বিদেশে পাঠিয়ে কত ভাবনাই ভাবি কিন্তু কি ক'রবো! আমি যদি মরে যাই তুই কি ক'রবি, একটু স্থিতি ভিতি ক'রে দিয়ে যেতে যেন পারি।

অমল বলিল,—ও সব কি ব'লছো। ক'লকাতায় আমার কোন কষ্ট হয় না। যাক্‌—কিন্তু—

গৌরী চট্ করিয়া বলিল,—কিন্তু কিন্তু করেন কেন? চা খাবেন ব'ললেই হয়।

অমল ব্যঙ্গ করিল,—তুমি কি চা ক'রতে পারবে ?

গৌরী হাসিয়া বলিল,—আমি ত স্বীকার করেছি যে আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল রাঁধ্‌তে পারেন তবে আবার কেন? আমাদের তৈরী চা ভাল না লাগারই কথা—

—কারণ ?

—মিস্ অপর্ণা রায়ের মত বিদুষী মেয়েদের হাতে যাঁরা চা খান তাঁদের গেয়ো চা পছন্দ হবে কেন ?

অমল চিন্তা করিয়া বুঝিল,—টেবিলের উপর লেখা চিঠিখানার ঠিকানা অন্ততঃ গৌরীর চোখ এড়ায় নাই।

মা প্রশ্ন করিলেন,—তুই ত থাকিস্ মেসে, তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় হল কেমন করে ?

অমল বলিল,—আমাদের সঙ্গেই পড়ে যে, নিজেই আলাপ ক'রেছে।

—খুব বড়লোক ?

—হ্যাঁ, খুব না হ'লেও বড়লোক।

গৌরী প্রশ্ন করিল,—কেমন দেখ্‌তে ?

অমল চট্ করিয়া জবাব দিল,—তোমার চেয়ে সামান্য একটু ভালো।

গৌরী হতাশ স্বরে বলিল,—তবে আর চা ক'রে কি হবে! এত খারাপ হবেই।

—হোক্, মাঝে মাঝে খারাপ চা খেতে হয়।

মা হাসিলেন,—গৌরীও হাসিয়া উঠিল। মা অপর্ণার প্রসঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করিলে, অমল চিঠি লিখিবার কারণ, তাহার সহানুভূতি ও কুশল প্রশ্নের জন্য ব্যস্ততার কথা সকলই জানাইল।

গৌরী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল,—খুব সুন্দরী ?

অমল হাসিয়া জবাব দিল,—ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দরী।

গৌরী ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিল,—ও বাবা!

যাহাই হৌক মা তাহাকে না খাওয়াইয়া কখনই খাইবেন না। অমল তাই সকাল সকালই খাইতে বসিয়াছিল। খাইতে বসিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—দুই রকমের মাছ, ও নানা তরকারী। সে প্রশ্ন করিল,—মা, মাছ এলো কোথা থেকে ?

মা বলিলেন,—গৌরীর মা পাঠিয়েছে।

—এর আবার কি দরকার ছিল! আমি ত মাছ তেমন ভালও বাসিনা।

মা সাম্‌নে পিঁড়ির উপর বসিয়া ছিলেন, একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—দরকার তোর না থাক্‌লেও তার ত আছে। সেই ত তোর আসল মা,—তুই যখন ছোট, আমি ত ভাসুরপো আর দেওরপোদের জন্যে প্রাণপাত করে দিবারাত্রি কাটিয়েছি, তোর দিকে ফিরে চাইবার অবসরও হয়নি, তখন ওই ত তোকে রাখতো—ওর ছেলেপুলে ত অনেক বয়সে হ'য়েছে তাই—আর তার ত গৌরীই বড় মেয়ে।

অমলের মনে পড়ে, বিধবা হইবার পরে এই সংসারে তাহার মা দিবারাত্রি ধান ভানিয়া, রান্না করিয়া কোন মতে শ্বশুরের ভিটা ধরিয়া পড়িয়া ছিলেন—তখন তাহার সংসারে আদর না ছিল এমন নয় কিন্তু যেদিন তাহার প্রয়োজন ফুরাইল সেদিন সরিকরা সকলেই তাহাকে এখানে নির্ব্বাসিত করিয়া, নিরুপায় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল—অমল নিজের বাহু বলেই আপনার শিক্ষালাভ করিয়াছে। অমল এ সকল জানিত,—তাই গৌরীর মায়ের প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন,—যাদের জন্যে তখন আমি তোর দিকে তাকাইনি তারা ত কেউ আমাকে দেখ্‌লো না,—কিন্তু গৌরীর মা সেদিনও ছিল আজও আছে। নইলে আজ তার আর আমাদের মধ্যে কত তফাৎ তবুও সে ত ভুলে যায় নি। যাদের জন্য প্রাণপাত ক'র্‌লাম তারা ত এখন বড় হ'য়েছে, আমরা বেঁচে রইলুম কি না সে খোঁজও ত তারা একবার নেয় না।

অমলের আরও মনে পড়ে, সে যখন স্কলারসিপ পাইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল তখন সকল জেঠতুতু খুড়তুতু ভাইকেই মা অনুরোধ

করিয়া ছিলেন কিন্তু কেহ তাহার ভার লয় নাই—এমন কি বাসায় থাকিতে দিলেও সে পড়িতে পারিত—নানা অজুহাতে তাহারা তাহাও থাকিতে দেন নাই। এমনকি এজমালি সম্পত্তির উপযুক্ত অংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। নানা কথা মনে পড়িয়া অমলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—দরিদ্র দেখিয়াও যাহারা সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায় তাহারা সত্যই মহৎ। কৃতজ্ঞতায়, করুণায় বিষণ্ণতায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরী প্রশ্ন করিল,—রান্না কেমন হ'য়েছে ব'ললেন না।

অমল মুখ তুলিয়া বলিল,—বেশ হ'য়েছে, সত্যিই তুমি ভাল রাঁধতে পারো।

গৌরী প্রশংসা শুনিয়াও খুশী হইল না—সে এমনি উত্তর আশা করে নাই। অমলের নিন্দার অন্তরালে প্রশংসা থাকিত, আজ তাই তাহার মনে হইল যেন এই প্রশংসার অন্তরালে নিন্দাই রহিয়াছে। গৌরী তাই মুখ ভার করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল,—সত্যই ভাল হ'য়েছে। কিন্তু গৌরী তাহা বিশ্বাস করিল না।

•

খোকার পড়ার ক্ষতি হইতেছে এবং নিজেরও হইতেছে, অতএব অমল তিন চারদিন পরেই কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। যে কয়েকটি টাকা টিউশনি হইতে পাইয়াছিল তাহা যাতায়াতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—মেসের টাকা বাকি। একটি মাস এখনও চালাইতে হইবে, বাড়ী হইতে এই বৈশাখ মাসে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। নিজের অবস্থার কথা নিরুপায় মাতাকে জানাইয়া কোন লাভ নাই।

যে কয়েকটি টাকা ছিল মেসের ম্যানেজার বাবুকে দিয়া সামান্য কয়েক আনার পয়সা যে নিজের অত্যাবশ্যক খরচের জন্য রাখিয়া দিল। কলেজে যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না—কেন সে নিজেও বুঝিতে পারে না কিন্তু যাইতেই হইবে। অন্যসূত্রে কিছু একটা উপায় করা প্রয়োজন। রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচয় হইয়াছিল—হয়ত পরিশ্রম করিলে কিছু করা যাইতে পারে। বিলিতি উপন্যাস ত তাহার কিছু কিছু পড়া আছে, প্রয়োজন হইতে পড়াও যাইতে পারে।

কলেজে যাইয়া অমল দ্বিতলের বারান্দা দিয়া যাইতেছিল,—আগে আগে একদল ছাত্রী যাইতেছেন—অপর্ণা কি যেন বলিতে বলিতে যাইতেছে। অকস্মাৎ সে ফিরিয়া, স্বদল ত্যাগ করিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কখন এলেন?

—আজ সকালে।

—মা পথ্য করেছেন?

অমল লক্ষ্য করিয়াছিল মা'র পূর্ব্বে অপর্ণা 'আপনার' কথাটা বাদ দিয়াছে—সহসা কি যেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, পথ্য করেছেন।

—এত সকালেই ফিরলেন যে!

—সেখানে থাকবার প্রয়োজন কিছু নেই, তাই আর রইলাম না।

—তাঁকে একটু সবল ক'রে এলেই ত পারতেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না।

অপর্ণা এতক্ষণে প্রশ্ন করিল,—মেয়ে কি রকম দেখ্‌লেন।

—অসুখ সেরেছে, তবে পথ্য করেন নি, খুব দুর্ব্বল—

অপর্ণার জন্যে তাহার বান্ধবীগণ এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু অপর্ণার প্রস্থান করিবার কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল,—আপনার যথেষ্ট সাহস বেড়েছে দেখছি।

—কেন?

—এত লোক সমক্ষেও আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আপনার সাহস হ'য়েছে—এটা—

অপর্ণা কটাক্ষ করিয়া কহিল,—ও এই? আপনারা কি বাঘ যে ভয় ক'রবে—

অমল হাসিয়া কহিল,—আয়নায় দেখ্‌লে এ কথা বিশ্বাস হয় না কিন্তু আপনাদের মুখ চোখ ঐ কথাটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপর্ণা একটু তিরস্কারের সুরে বলিল,—এত দিন পরে দেখা হল, তাতেও ঝগড়া ক'রবার লোভ আপনি সংবরণ ক'রতে পারছেন না! আশ্চর্য্য আপনার মন—

অমল স্বীকারোক্তি করিল,—সত্য কথা ব'লতে কি, ঝগড়া—যদি তাই হয় তাতেই খুব আনন্দ পাই।

অপর্ণা হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল,—You are brutally cruel.

একটা ঘণ্টা বাজিল।

অমল বলিল,—চলুন, ক্লাসে।

—ক্লাস হবে না, চলুন লাইব্রেরীতে যাই—না হয় গল্প করি—

অমল অপর্ণাকে অনুসরণ করিয়া চারতলার একটি শূন্য কক্ষে উপস্থিত হইল। অপর্ণা একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল,—বসুন, আপনার সমস্ত কাহিনী শুনি। আপনার পত্রের জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রেছিলাম—যা হোক সংবাদ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

অমল সমগ্র ঘটনাই বর্ণনা করিল,—তুচ্ছ, তুচ্ছতম সমস্তই

বলিল কিন্তু দুইটা সংবাদ যা অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য তা সে গোপন করিল এবং প্রসঙ্গ ক্রমে এড়াইয়া গেল—একটি তাহাদের দারিদ্র্য এবং অপরটি গৌরীর সম্বন্ধ।

জানালার ফাঁকে দূর দিগন্তের যে অংশটুকু দেখা যাইতে ছিল তাহারই মাঝে ধূসর একখানি নিবিড় মেঘের পানে চাহিয়া অপর্ণা সমস্তই শুনিল। অমল চুপ করিলে ক্ষণিক পরে অপর্ণা বলিল,—মা আমার পত্র দেখে ছিলেন।

—কি ব'ললেন?

—তিনিও আরোগ্য সংবাদে আনন্দিত হ'লেন! অপর্ণা আরও কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল।

অমল তাই প্রশ্ন করিল—আর কিছু?

—আর আবার কি? আপনি এলেই একবার নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ভাল—অবশ্যই যাবো।

—কবে?

—আজই চলুন। ওখানে যেয়েই চা খাবেন।

—বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনাকে ক'রতে পারি—নির্ভয়ে?

অপর্ণা হাসিয়া বিদ্রূপ করিল,—আমাদের করবেন ভয়—এত বিনয় আপনার?

অমল বলিল,—এতদিন আপনাদের দলের মাঝে থেকে আমাকে কখনও চেনেন এমন ভাব দেখান নি, কিন্তু আজ যথেষ্ট ব্যঙ্গ সহ্য ক'রতে হবে জেনেও কেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এলেন—

—সংবাদটার জন্যেই. আর পূর্ব্বে আসিনি তার কারণ, প্রয়োজন ছিল না। আজ আপনাকে কোন প্রশ্ন না ক'রলে দুঃখ পেতেন হয়ত—

ও আমাকে দুঃখ দিতে চান না তা হ'লে!

—সজ্ঞানে ইচ্ছা করি না,—তবে আপনার মনে এ সুবুদ্ধিটুকু থাকলে সুখী হ'তে পারতাম।

অপর্ণা অকস্মাৎ উঠিয়া গেল। অমল স্থবির, জীর্ণ জড়ের মত তাহার গমন পথের পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই অনাগত স্বপ্নের সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানার আপিসের Supdt লোকেন চাটুজ্জে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কতগুলি ছবি দেখছে। একটা ফাইল হাতে কনষ্টেবল রামটহল ঢুকল। ঘরে অনেকগুলি চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি

রামটহল। সেলাম হুজুর।

লোকেন। সেলাম।

রামটহল। ইয়ে ফাইল কহাঁ রকখেঁ হুজুর!

লোকেন। এই টেবিলে রাখ। আর আজকের কাগজটা নিয়ে এস।

রামটহল। জী হুজুর। (টেবিলের ওপর ফাইল রেখে রামটহলের প্রস্থান। লোকেন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফাইল দেখছে এমন সময় ইন্সপেক্টর খগেন দত্তর প্রবেশ)

খগেন। দেখলুম ব্যারিষ্টার দ্বিজেন বসু এসেছেন···

লোকেন। বেশ। আমি প্রস্তুত।

খগেন। কিন্তু ওর মেয়েও সঙ্গে এসেছেন—

লোকেন। মিস্ বসু?

খগেন। হ্যাঁ।

লোকেন। কেন? কেসের সঙ্গে ওঁর কি সংস্রব।

খগেন। প্রেম। আমার মনে হয় মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে মিস্ বসুর একটু—

খবরের কাগজ নিয়ে রামটহলের প্রবেশ

রামটহল। হুজুর আজকা অখবার আউর এক সাহব আয়ে হ্যাঁয় উনকা কার্ড। (লোকেনকে খবরের কাগজ ও কার্ড দিলে)

লোকেন। দ্বিজেন বসু, বার-অ্যাট্-ল, এম-এল-এ।

খগেন। মিস্ বসুকে তো আসতে বারণ করা যাবে না।

লোকেন। ভাল দেখায় না। আর আপত্তি করবার বিশেষ কোন কারণও দেখি না।

খগেন। করে কোন লাভও নেই। বাড়ী গিয়ে মিষ্টার বসু মেয়েকে সব কথাই বলবেন। তার চেয়ে উনি এইখানেই আসুন, তাহলে আর অভদ্রতার দোষ পেতে হবে না—

লোকেন। ইউ আর রাইট। রামটহল, সাব কো সেলাম দেও—

রামটহল। জী হুজুর। রামটহলের প্রস্থান

লোকেন। মিষ্টার চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ পেয়েছ?

খগেন। না, বিশেষ কিছু নয়…

লোকেন। আমাদের মধ্যে যা কথাবার্ত্তা হবে, মিস বসু মিষ্টার চৌধুরীকে গিয়ে এখনই জানাবেন।

খগেন। বন্ধ করতে হবে—

লোকেন। লাভ?

খগেন। বিশেষ কিছু নয়।

লোকেন। ধর মিস্ বসু গিয়ে তাকে সব কথা বললে। সে যদি নির্দ্দোষ হয় তাহলে তখুনি আমাদের কাছে এসে ব্যাপারটা কি খোলাখুলি-ভাবে জানতে চাইবে, আর যদি দোষী হয় তা হলে চুপ করে যাবে।

খগেন। এর উল্টোটা যদি করে তা হলেও তো কিছু অস্বাভাবিক হবে না। দোষী হলেও অনেকে সাধুর ভাণ করে এসে ব্যাপারটা কি খোলাখুলি ভাবে জানতে চায়, আবার অনেক নির্দ্দোষীও হাঙ্গামার ভয়ে চুপ করে যায়।

লোকেন। তা বটে। আসল ব্যাপারটা যে কি তা তো বুঝতে পারছি না আর তুমিও বিশেষ বোঝাতে পারছ বলে মনে হচ্ছে না।

খগেন। তার কারণ ব্যাপারটা যে কি তা আমি নিজেও এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি। আমরা আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে চোর ধরি কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীতে কোন দু'জন লোকের আঙ্গুলের ছাপ এক রকম হয় না। এটা সত্য তো?

লোকেন। হ্যাঁ, ধ্রুব সত্য।

খগেন। কিন্তু এই প্রতুলবাবুর কেসে তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কাল রাত্রে আমি তাঁর আঙ্গুলের ছাপ এনলার্জ করে আমাদের রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়েছি—

লোকেন। কিন্তু প্রতুলবাবুর আঙ্গুলের ছাপ তো আমাদের রেকর্ডে নেই।

খগেন। না। কিন্তু ওঁর ছাপ মিলেছে আর একজনের ছাপের সঙ্গে—একেবারে হুবহু।

দ্বিজেন বসু ও মল্লিকা বসুর প্রবেশ

লোকেন। আসুন মিষ্টার বসু। নমস্কার। নমস্কার মিস্ বসু।

দ্বিজেন। নমস্কার। আমাদের দেরী হয় নি তো।

খগেন। না স্যর। বসুন। (চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) বসুন, মিস্ বসু। (উভয়ে বসল)

দ্বিজেন। ব্যাপারটা কি বলুন তো। টেলিফোনে বললেন একটা ভয়ানক দরকারী কথা আছে—

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। মিষ্টার প্রতুল চৌধুরীর সম্বন্ধে—

মল্লিকা। মিষ্টার চৌধুরীর সম্বন্ধে?

খগেন। হ্যাঁ মিস্ বসু। দেখুন মিষ্টার বসু আমরা তাঁর সম্বন্ধে ভয়ানক ধাঁধায় পড়েছি।

দ্বিজেন। কেন? সে কি করেছে?

খগেন। কিছুই করেন নি। সেইখানেই তো মুস্কিল।

মল্লিকা। তবে আপনি তাঁকে জড়াচ্ছেন কেন?

খগেন। আমরা জড়াচ্ছি না, তিনিই আমাদের জড়িয়েছেন—

দ্বিজেন। আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকেন। খগেন, সমস্ত ব্যাপারটা প্রথম থেকে মিষ্টার বসুকে খুলে বল। আমরা ওঁর পরামর্শ চাই।

দ্বিজেন। নথিং অফিশিয়াল?

লোকেন। আজ্ঞে না। এ কাজে হাত দেবার আগে আপনার একট মতামত দরকার। অবশ্য ইনফর্ম্যালি। আপনি ক্রিমিন্যাল ল-এ এক্স্‌পার্ট—খগেন, তুমি ওঁকে কেসটা সব খুলে বল।

খগেন। দেখুন মিষ্টার বসু, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিছলুম রেজার সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করব বলে। সে জেল-ফেরত আসামী জানেন তো? সেখানে আমি কথায় কথায় মিষ্টার চৌধুরীকে একটা ছবি দেখাই তাতে ওঁর আঙ্গুলের ছাপ পড়েছিল। কৌতুহলবশতঃ—

মল্লিকা। রেজা ছল মাত্র, আঙ্গুলের ছাপ জোগাড় করাই আপনা আসল উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিজেন। মল্লিকা চুপ কর। আগে সবটা শোনো।

খগেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান লোক। মিস্ বসু যা বললে তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। আমি তাঁরই সামনে যে ছবিটা ওঁর আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছিলুম তা মুছে ফেলবার ভাণ করি। একটু আধটু মুছেও গিছল, কিন্তু ছবির উল্টো পিঠে তা পরিষ্কার ভাবে পড়েছিল কারণ প্রিন্টটা আগে থেকেই এইজন্য তৈরী করা ছিল।

মল্লিকা। আউটরেজাস!

খগেন। প্লীজ মিস্ বসু! তারপর সেই ছবিটাকে আমি এনলার্জ করে আমাদের রেকর্ডে খুঁজে দেখি—

মল্লিকা। তাঁর আঙ্গুলের ছাপ আপনাদের রেকর্ডে কোথেকে এল?

খগেন। তাঁর আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। মিষ্টার বসুর এই আঙ্গুলের ছাপের সিষ্টেম যে নির্ভুল তা আপনি বিশ্বাস করেন?

দ্বিজেন। নিশ্চয়ই করি।

খগেন। আর পৃথিবীতে কোন দু'জন লোকের আঙ্গুলের এক ছাপ হতে পারে না, তাও স্বীকার করেন?

দ্বিজেন। করি। কিন্তু এ সব কথা কেন?

খগেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দিল্লীতে একটা বিখ্যাত ব্যাঙ্ক রবারীর কেস্ হয়েছিল জানেন?

দ্বিজেন। হ্যাঁ সে বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছি—

খগেন। সে মিষ্ট্রি সলভ্‌ড হয়নি। হেড আপিস থেকে ব্রাঞ্চে ভ্যানে করে টাকা নিয়ে যাবার সময় এই চুরিটা হয়। মিনিট দু'তিন পরে ব্যাঙ্কে টাকা গুণে নেবার জন্য ছাপ খোলা হতেই দেখা যায় তাতে শুধু কাগজ আর সীসে। ভ্যানের মধ্যে দু'জন লোক ছিল। একজনের

পায়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে চোট লেগেছিল। সে পথে নেমে গিছল— নিজের ব্যাগ নিয়ে—

দ্বিজেন। সেই চুরি করেছিল—

খগেন। নিশ্চয়ই, কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে নি। হী সিম্পলি ভ্যানিশ্‌ড।

দ্বিজেন। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো।

লোকেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তবে সেই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর পিছনে আর একজন লোক ছিল যার প্ররোচনায় এবং সাহায্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়। সেই লোকটী একজন কেমিষ্ট। তাকেও তারপর থেকে দিল্লীতে কেউ দেখে নি। পুলিশ তার কোন খোঁজ খবর আজ অবধি পায় নি, কিন্তু তার দোকানে কয়েকটী খালি শিশিতে তার হাতের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গিছল। সেইটার এনলার্জড ফটোগ্রাফ প্রত্যেক বড় বড় শহরের থানার রেকর্ডে রাখা আছে।

খগেন। এই ঘটনার সাত বছর পরে করাচীতে ঠিক এই রকমই একটা রহস্যময় চুরি হয়। এও গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লাগা, নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমে যাওয়া ইত্যাদি সব সেই আগেকার মত—আর সেই লোকটী যে চুরি করেছিল তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি।

লোকেন। এতে কি মনে হয় না এর পিছনেও সেই কেমিষ্ট ছিল—

দ্বিজেন। তা হয় বই কি।

খগেন। আবার প্রায় সাত বছর পরে লাহোরে এই রকম ঘটনা ঘটল। সেই গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লাগা, নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমে যাওয়া, সব সেই রকম। সেবারেও চোরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু তার পেছনে যে লোক আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে ধরা গেল না। লোকেনবাবু তখন লাহোরে।

লোকেন। আমি তখন সবে চাকরীতে ঢুকেছি। সন্ধান নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী আবিষ্কার করলুম। পাড়া প্রতিবেশী এর বেশী কিছু বলতে পারলে না। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না এবং রাত্রে কখনও বাড়ীর থেকে বার হতেন না। তাঁর ঘর থেকে আঙ্গুলের ছাপ জোগাড় হ'ল, আর সেই ছাপ আগেকার রেকর্ডের ছাপের সঙ্গে মিলে গেল।

খগেন। একই রকম চুরি, পিছনে একই লোক, এবং সেই লোকটী কেমিষ্ট—

দ্বিজেন। রিমার্কেব্‌ল বটে!

লোকেন। এবং ক্রমেই ব্যাপারটা আরও রিমার্কেব্‌ল হয়ে উঠতে লাগল।

খগেন। তারপর ছ' সাত বছর অন্তর অন্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সেই একরকমের চুরি হতে লাগল। কখনও রেঙ্গুনে, কখনও মাদ্রাজে, কখনও কাশ্মীরে শ্রীনগরে। শেষ চুরির পর প্রায় সাত বছর হ'তে চলল—

লোকেন। তাই আমাদের মনে হয় শীঘ্রই সেই রকম একটা চুরি হবে।

দ্বিজেন। অতি আশ্চর্য্যের কথা তো!

খগেন। প্রত্যেক বার একই উপায়ে চুরি হয় কিন্তু নতুন নতুন কর্ম্মচারীর সাহায্যে। আর সেই কর্ম্মচারী যে কোথায় উধাও হয়ে যায়. পুলিশ শত চেষ্টা করেও তার সন্ধান পায় না।

মল্লিকা। তারা কোথায় যায়?

খগেন। তা বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয়—

দ্বিজেন। কি সন্দেহ হয়?

খগেন। যে তাদের খুন করে ফেলা হয়।

মল্লিকা। সকলকে।

খগেন। তাই মনে হয়।

দ্বিজেন। কিন্তু লাশ?

লোকেন। কখনও পাওয়া যায় নি। সেইটেই তো সব চেয়ে গোলমাল। কোন সূত্রই মেলে না। আজ অবধি সাতটা এই রকম ঘটনা হয়েছে—সেভেন পারফেক্ট ক্রাইমস্—

খগেন। অ্যাণ্ড সেভেন পারফেক্ট মার্ডার্স। সেই জন্যই পুলিশ রেকর্ডে এটা ক্লাসিক হয়ে পড়েছে।

দ্বিজেন। এবং এই হতভাগ্যদের পিছনে যে লোকটী, সেই সব টাকা আত্মসাৎ করেছে!

লোকেন। হ্যাঁ। পুলিশ তাকে ধরবার চেষ্টার ত্রুটী করে নি, দু'একবার কিছু কিছু এভিডেন্সও পেয়েছে—

খগেন। এবং তার চেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট, কয়েকবার তার আঙ্গুলের ছাপও পেয়েছে, কিন্তু তাকে পায় নি।

মল্লিকা। এ যেন রূপকথার মত শোনাচ্ছে।

খগেন। তা শোনাচ্ছে, কিন্তু অনেক সময় ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

লোকেন। লাষ্ট চুরি ঘটেছে—নাগপুরে। সেখানেও পুলিশ তাকে শত শত চেষ্টা করেও ধরতে পারে নি, কিন্তু আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছে। আমাদের কাছেও কপি পাঠিয়েছে।

দ্বিজেন। আগেকারগুলির সঙ্গে মিলে যায়?

লোকেন। একেবারে হুবহু।

দ্বিজেন। তাহলে শেষ বার যখন চুরি হ'ল তখন তার বয়স তো অনেক!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় আশী পঁচাশীর কাছাকাছি!

মল্লিকা। ডিটেক্‌টিভ গল্প হিসেবে ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সবের সঙ্গে মিষ্টার চৌধুরীর কি সম্বন্ধ?

খগেন। আমি তাঁর কথা ভাবছি না, ভাবছি আঙ্গুলের ছাপের কথা।

দ্বিজেন। আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

খগেন। বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ফাইল খুলে কয়েকটী ছবি পাশাপাশি সাজিয়ে) এই দেখুন। প্রত্যেক চুরির তারিখ লেখা, যে কয়েকটী আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তার এনলার্জড ফটোগ্রাফ আর তার পাশে এইটী মিষ্টার চৌধুরীর আঙ্গুলের ছাপের ছবি। হুবহু মিলে যাচ্ছে না—লাইন, যব, দ্বীপ, উঁচু, নীচু—

দ্বিজেন। তাই তো। সবই যেন একই ছবির কপি—

লোকেন। অথবা একই লোকের আঙ্গুলের ছবি।

খগেন। অথচ দু'জন লোকের আঙ্গুলের ছাপ একরকম হয় না।

দ্বিজেন। তা তো হয়ই না। কিন্তু এও তো অসম্ভব!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মল্লিকা। সেই লোক আর মিষ্টার চৌধুরী এক লোক হতে পারেন না।

দ্বিজেন। প্রতুলের বয়স পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশের বেশী হবে না—

মল্লিকা। আর আপনাদের হিসেব মত তার বয়স পঁচাশীর কাছাকাছি—

খগেন। আপনারা যা বলছেন সবই ঠিক। কিন্তু এই আঙ্গুলের ছাপ নিয়েই হয়েছে মুস্কিল।

লোকেন। কারণ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তির একরকম আঙ্গুলের ছাপ হতে পারে না।

মল্লিকা। হতে পারে। তার প্রমাণ এই ছবিগুলিই দিচ্ছে।

লোকেন। অথচ ভুল হওয়া অসম্ভব।

মল্লিকা। কিন্তু পঁচাশী বছরের বৃদ্ধকে পঁয়ত্রিশ বছরের লোক বলে মনে করাও অসম্ভব।

খগেন। তা অসম্ভব স্বীকার করি, কিন্তু আঙ্গুলের ছাপ এক হওয়া আরও অসম্ভব।

দ্বিজেন। আপনারা যা বলছেন তা যেন একটা হেঁয়ালী—

লোকেন। কিন্তু ছবি গুলি তো হেঁয়ালী নয় মিষ্টার বসু। তাদের অবিশ্বাস করব কি করে। যখন আঙ্গুলের ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে তখন আমাদের ধরে নিতে হবেই যে সেই লোক আর মিষ্টার চৌধুরী অভিন্ন।

খগেন। তাছাড়া মিষ্টার চৌধুরীও কেমিষ্ট।

মল্লিকা। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

খগেন। আর যে ছবিটির আর্টিষ্টের সন্ধান পাওয়া যায় নি,—প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে দিল্লী প্রদর্শনীতে এগজিবিট করা হয়েছিল,—তার রঙ, এবং অঙ্কনপদ্ধতি আর মিষ্টার চৌধুরীর রঙ, এবং অঙ্কনপদ্ধতি হুবহু এক।

মল্লিকা। আপনি কি করে জানলেন।

খগেন। আপনাদের ড্রইংরুমে প্রতুলবাবুর আঁকা নৈনীতাল পাহাড়ের একটী ছবি আছে। মিষ্টার বসুই আমাকে এই অদ্ভুত মিলের কথা গল্পচ্ছলে একদিন বলেছেন।

মল্লিকা। আপনারা কি বলছেন! মিষ্টার চৌধুরী সে হতে পারেন না?

লোকেন। খোঁজ করে দেখতে হবে।

মল্লিকা। মানে?

লোকেন। খগেনবাবু যা তথ্য সন্ধান করেছেন তা কতদুর সত্য। যদি সত্য হয়—

মল্লিকা। যদি সত্য হয়…(একটু থেমে) কিন্তু তা যে হতে পারে না।

লোকেন। (যেন মল্লিকার কথা শুনতে পায়নি এইভাবে) যদি সত্য হয় তা হলে মিষ্টার চৌধুরীকে একদিন এখানে নিয়ে আসতে হবে—

মল্লিকা। তিনি না হয় এলেন, কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হবে?

লোকেন। যদি তিনি আসতে রাজী না হ'ন—

মল্লিকা। কেন হবেন না?

লোকেন। কারণ তিনি যদি সেই লোক হ'ন—

মল্লিকা। অ্যাবসার্ড।

লোকেন। রুটীনওয়ার্ক। উপায় নেই। আচ্ছা, নমস্কার মিষ্টার বসু। নমস্কার মিস্ বসু—

দ্বিজেন। নমস্কার। (উঠে দাঁড়াল)

মল্লিকা। কিন্তু এ কি বৃথা চেষ্টা নয়। অনর্থক জেনে শুনে—

লোকেন। তবু করতে হবে। কারণ তিনি যদি সেই লোক হ'ন তা হলে তাঁর বয়স এখন পঁচাশীর কাছাকাছি, আর সাত সাতটী খুনের জন্য তিনি দায়ী। জগতে অসম্ভব কিছু নেই, মিস্ বসু। কেঁচো খুঁড়তে অনেক সময় সাপ বেড়িয়ে পড়ে— ক্রমশঃ

বাঙ্‌লায় পূজা

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

সারা বৎসর পরে
ফিরে কি এসেছে পূজা?
বাঙ্‌লা গিয়েছে ম'রে—
কে পূজিবে দশভুজা?
তুমি নন্দিনী বন্দিতা মাতা,
শক্তি রূপিণী অপরাজিতা,
এলে তিনদিন তরে?
ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার বারি,
লজ্জা-বসন,—সব নিলে কাড়ি,
বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে।
প্রদীপ জ্বলে না শূন্য ভিটায়,
ভরেছে আগুন আগাছা কাঁটায়,—
বুঝি রাঙাপায় ফুটে।
বোধন-শঙ্খ বাজাবার বল
নাই কারো বুকে, নাই সম্বল—
ধুলায় ধুসর লুটে।
কত জন গেছে চ'লে চিরতরে
তুমি একবার ডাক নাম ধ'রে
বল—"উঠ উঠ জাগো!"
অকূলে কোথায় ভেসে গেল যারা,
যারা বেঁচে আজো হ'য়ে সব হারা,—
সাথে লও ডেকে মাগো ॥

মরিতে চাহি না আমি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। সকাল থেকে বসে বসে এই কথাটা ভাবছি। একটা পুরাণো চিঠি সামনে খোলা পড়ে রয়েছে, আর একটা চিত্র চোখের সামনে ভাসছে। পাঁচ বছর আগে লেখা বন্ধুর একটা চিঠি, সৈন্য দলে যোগ দেবার আগের রাত্রিতে লেখা চিঠি, আসন্ন বিরহবিহ্বল বাঁচবার বাসনা-ব্যাকুল নব-বিবাহিতের চিঠি। তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর দেশ জার্মান অধিকৃত হয়েছে, নিজের দেশ চারিদিকে মুখরিত জলপ্লাবনের মধ্যে শেষ বৃক্ষটার মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকে কাল প্রত্যূষে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। সে লিখেছে "আমার চারিদিকে পতনোন্মুখ পৃথিবী, প্রলয়োচ্ছ্বাসের জলকল্লোল কাণে এসে বাজছে, নবপরিণীতাকে পিছনে একা ফেলে রেখে যাওয়া অনন্ত দুঃখের। তবু তোমার দেশের যে কবির বাণী তুমি আমায় প্রায়ই বলতে সেটা আমি আমার এই শেষ চিঠিতে তোমায় শুনিয়ে যাচ্ছি—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" পাঁচ বছর আগেকার নীরব মরণের আহ্বান-রাত্রির ভাষা আজ সকালে আমার কাছে নিবিড় জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে তুলছে। মরিতে চাহি না আমি।

তবুও ত এই ছয়বৎসরে কত মৃত্যুর ও মৃত্যুর চেয়ে বড় ধ্বংসের খেলা ইয়োরোপে অভিনীত হয়েছে এবং কত ব্যাপক ও গভীরভাবে হয়েছে তার পরিমাণ এখনো কেহ জানে না। যুদ্ধ পূর্ব্বের আমার ইয়োরোপ। আজ সুদূর অতীতের অলীক সুখ স্বপ্নের মত কোথায় হাতছানি দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। স্মৃতির পটে দাগ মিলাতে মিলাতে রণাঙ্গনে, বিপর্য্যস্ত প্রান্তরে ও সন্ত্রস্ত সহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিচ্ছেদক্লিষ্টের অন্বেষী মন নিয়ে। কিন্তু কোথায় সে ইয়োরোপ। যার মোহন মাধুরী ও অনন্ত জীবন অন্তরলোকে নূতন আলোকপাত করেছিল, যার দেওয়া কল্পনামালা ও আনন্দের অলক্তক রণক্ষেত্রের শত ধূম্রজাল সত্ত্বেও অমলিন থাকবে, যার ছোট ছোট ছবি, তুচ্ছ খেয়ালের খেলা, অকারণ আনন্দ ও বিফল বেদনার মুহূর্ত্ত গুলি স্মৃতির আনাচে কানাচে অনন্ত রূপ ধরে বার বার জেগে উঠছে? মিলিয়ে দিতে কি পারবে তাদের এই বিস্মরণের সুদূর প্রভাতের মায়ায় আজকের অচিরস্থায়ী ধ্বংস উৎসব, মানবাত্মার অনভিপ্রেত এই সর্ব্বনাশা মৃত্যু-অভিযান?

চিরচঞ্চলের মধ্যে নিত্যকালের যে আভাস ইয়োরোপ দেখিয়েছে তা হচ্ছে মানবের অনুভব, সুখ দুঃখ ভালবাসার বিচিত্র বিকাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লবের বস্তুতন্ত্রের মধ্যেও ইয়োরোপ মানুষের কথা ভুলতে পারে নি। তাই দশবৎসর আগেকার পুরাণো ছবিগুলিরও শাশ্বতরূপ বার বার দেখতে পাচ্ছি খুব নিকটে। ন্যুরেমবার্গের অপরিচিত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি দূরের একটা ঐতিহাসিক দুর্গের রহস্য উদ্ঘাটন করে আসার পর। যে ঘরে কয়েদীদের উপর মধ্যযুগের প্রথায় অত্যাচার করা হত ঠিক তার পাশের ঘরেই অতীতের কোন রাজকুমারীর চম্পকাঙ্গুলীর আলাপে অভ্যস্ত বিচিত্রবীণা একটা রাখা ছিল। তাতে কেমন করে লুকিয়ে রূঢ় অঙ্গুলীর আঘাতে সুরগুঞ্জন তুলবার চেষ্টা করছিলাম এবং কয়েকজন দর্শক তা শুনে কেমন করে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এসেছিল সে কথা ভেবে বিদেশীজনোচিত গাম্ভীর্য্যের মুখোসের উপরও হাসি যে অসম্ভব ভাবে জেগে উঠছে তা বুঝতে পারছি আর অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে করতে চলেছি। এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে আমায় এই মানসিক বিপদ্ থেকে উদ্ধার করল। একটা বিস্কুটাখণ্ডের লোক অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের বাহিরের স্কট ছাত্র স্মিতহাস্যে আমায় আহ্বান করল। সে ভেবেছিল যে কোন বিশেষ কারণে আমি কৌতুক অনুভব করছি এবং যদিও আমি অপরিচিত, এই বিদেশে আমিই তার কাছে পরিচিত, কারণ ইংরেজীতে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ করতে পারব। আর আমি যদি অপরিচয়ের ব্যবধান লঙ্ঘন করে তার ডাকে সাড়া দিই তাহলে সে আমার কৌতুকটার অংশ নিতে উৎসুক। এমন লোকের সঙ্গে ভাব না করে উপায় কি? তা ছাড়া জার্মান জীবনের মধ্যে প্রবেশ করবার ভাল চাবীকাঠী নিশ্চয়ই এর কাছে আছে। যে এমন ভাবে বিদেশীয়তার বর্ম্ম ভেদ করে এগিয়ে এসেছে সে নিশ্চয়ই এদেরও মধ্যে মিশে গেছে এবং হয়ত এরও মনের মধ্যে ঘুরছে সেই কবিতাটা—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি।'

রাত্রে আমরা দুজনে মাটীর নীচে লুকানো একটী সপ্তদশ-শতাব্দীর পুরাণো 'সেলারে' রাত্রিভোজন করতে গেলাম। সে যুগের ব্যবহৃত পাত্রে যুগোপযোগী পানীয় আছে। দুজনের বাহুর ভিতর দিয়ে পরস্পর বাহু প্রসারিত করে তা পান করতে হয়। কারণ? কারণ খুব সামান্যই বলতে পারা যায়, অথবা বিশেষ অসামান্যও বটে। যে গানটী সবাই মিলে বাজনার তালে তালে ঐক্যতানে গাইছে তার অর্থ হচ্ছে—রাইন নদীর জলধারা সুন্দর, কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর হচ্ছে সে রাইনবালা—যার নয়নে সে জল প্রতিবিম্ব

ফেলে, যার কেশরাশি রাইনধারার মত অংশদেশে সাবলীল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, অতএব তোমরা সবাই 'সার্কলিং রাইন' পান কর। এমন গান, এমন উল্লাস ও পানীয় বিনিময়ের এমন রুচির প্রথা দেখে দেখে আশা মিটে না। রাইনের নামে সবাই বিহ্বল, গানে ও বাজনায় সবাই মুগ্ধ, আর বার্ণসের দেশের বন্ধুটীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে যদিও সে খুব আনন্দ পাচ্ছে তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে বিঁধ্‌ছে। সে কি কারো প্রীতির স্মৃতি? সে কি কারো বিস্মৃত প্রীতি? না সে কি স্মরণে বিস্মরণে আলো আঁধারে জড়ানো আনন্দবেদনার অব্যক্ত অনুভবরাশি যা তার মৌখিক গীতি উচ্চারণের মধ্যে রূপ পাচ্ছে? মনে পড়ল বার্ণসের কবিতা—

My heart is sair
I dare na'tek,"

থাকুক না হয় তার মনে বেদনা। এই বিহ্বল রজনীর আনন্দ-চঞ্চলতা স্রোতের মত সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। দেশী বিদেশীর কোন প্রভেদ নেই; এত শুধু ভোজনশালা নয় এ হচ্ছে চিত্তবিশ্রামের আশ্রম। গীত সুধা ও পীত সুরায় সবারই 'পরাণ হল অরুণ বরণী'। কে বলে ভাঙ্গা কাঁচ ও ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দেওয়া যায় না? ভাঙ্গার উপর বেদনার উপর ইয়োরোপে নূতন দাবী, নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী ও জীবনকে বহুভাবে নেবার দার্শনিকতা অহরহ প্রলেপ দিচ্ছে। তারই রাসায়নিক প্রক্রিয়া একদিন মনকে স্থিতিশীল ও দুঃখকে সহনীয় করে নেবে। এমনি করেই শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, দেশ বিশেষ নয়, সমস্ত ইয়োরোপ বারবার বিপর্য্যস্ত ও যুদ্ধত্রস্ত হয়েও আবার গীতচ্ছন্দে আনন্দসম্ভারে প্রাণের উল্লাসে জেগে উঠবে। আজকের বোমারু বিমান নিপীড়িত আকাশের মোহন নীলিমায় লঘুপক্ষ পাখীর মত বিহার করবে মানুষ, ভগ্ন লুণ্ঠিত পুরাতনের জায়গায় তৈরী হবে নূতন পরিকল্পনায় গ্রাম ও সহর। ধ্বংসের মরুর উপর বপন করে নেবে নবশ্যাম তৃণদল।

যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল কি হয়েছে সেই জার্মান-ফরাসী নবদম্পতীটীর, যারা রাইনবক্ষে আমার সঙ্গে এক জাহাজে জলবিহারে যোগ দিয়েছিল? সে দিনও এমনি ঘনঘটা জার্মানীর ভাগ্যাকাশকে মলিন করে তুলেছিল, আশঙ্কা সংশয়ে দোদুল্যমান ছিল 'সার'-বাসী এই দম্পতীর মত। বরটী আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধবে?"

জার্মান বর ও ফরাসী বধূ। যুদ্ধ যদি বাঁধে হৃদয় ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সে কথা মনে হল। তারা জানত না যে তাদের আগেকার কথাবার্ত্তার অনেকখানিই দ্রুতগামী ষ্টীমারের বাতাসে ভেসে আমার অবাঞ্ছিত কানে এসে পৌঁছিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম যে শুনতে নেই এদের নিভৃত আলাপন; কিন্তু আমার অবস্থা তখন সেই কালিদাসবর্ণিত, ন যযৌ ন তস্থৌ। সরে যদি যাই এরা বুঝতে পারবে কেন সরে গেলাম; কে জানে তাতে হয়ত এই ক্রৌঞ্চমিথুনের কথোপকথনের যতিভঙ্গ হবে, আর আমার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করা হবে না! আর যদি বিদেশী বলে কিছুই দেখছি না শুনছি না বুঝছি না এই ভাণ করে জাহাজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে রাইনের শোভা নিরীক্ষণ করতে থাকি তাহলে শুধু এদের মধুচন্দ্র যাপনের কোন যতি বা ছন্দ কেন, মানবশাস্ত্রের কোন ব্যাকরণই ভঙ্গ হবে না একটুখানি প্রবঞ্চনা ছাড়া। তা এদের সুবিধার জন্য না হয় নিজে একটু পাপ সঞ্চয়ই করলাম!

বধূ। শোন, যে কথাটা আজ এতক্ষণ মনের মধ্যে ভারী হয়ে আছে। আজকের 'টাগেব্লাটে'র খবরটি ত ভাল নয়। কি হবে বল ত?

বর। কিছুই হবে না। আজ আমরা মধুচন্দ্র যাপনে চলেছি। আজ কিছুই হবে না।

বধূ। আজ ত কিছুই হবে না। কিন্তু পরে ত হতে পারে?

বর। জানি না। যদিবা কিছু হয় আমরা দুজনে ত তেমনি থাকব। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

বধূ। কিন্তু পারবে কি তুমি আমায় তোমার কাছে রাখতে? তোমার দেশ ত আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

বর। না, না, তা হতে পারে না। তুমি ত এখন আর ফরাসী নও, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

বধূ। যুদ্ধ হলে ত তাতেও হবে না। বিদেশী স্ত্রীদের ত গতবার আটক করে রেখেছিল।

বর। না, না, আজ ওকথা ভেবো না।

বধূ। তুমি যে কি বল। আমি কি ওকথা ভাবছি? তোমার কাছে আমি আছি; আমার ভাববার সময় কোথায়?

বর। ঠিক তাই; আমাদের এসব ভাববার সময় নেই।

খানিকক্ষণ সব নীরব। শুধু রাইনবক্ষের ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ দুটী উন্মুখ উদ্বেল হৃদয়ের প্রতিরূপ হয়ে ষ্টীমারের পিছনটাকে আঘাত করে করে চলে যাচ্ছে। তাদের চিন্তা আমাকেও দোলা দিয়ে যাচ্ছে আর দুধারের গিরিদুর্গগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে শত শত আশানাশ ও হৃদয়ভঙ্গের মূক সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নবদম্পতীর রূপান্তর হয়ে গেল।

বর। শুনছ, বড় ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু যদিই বা যুদ্ধ বাধে তার জন্য ভাবনা করে কি হবে? তার আগের দিনগুলিই

অনন্তকাল। সেই অনন্তকালের আস্বাদ আজ পাচ্ছি; একটুখানি কাছে এস।

বধূ। তুমি ভাবছ কেন? কিছুই হবে না। আমিই মিছিমিছি খবরটার কথা তুলে দিনটা মাটী করে দিলাম।

বর। না, না, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সব কথাই আমাদের ভাবা দরকার। তবেই ত আমাদের দেশের জনমত যুদ্ধের বিরুদ্ধে তৈরী করতে পারব।

বধূ। যুদ্ধ যুদ্ধ আর খালি যুদ্ধ! ছেলেবেলায় দেখলাম, আবার এখন হয়ত দেখতে হবে।

বর। কে জানে, আমাদের ছেলেদেরও হয়ত দেখতে হবে।

বধূ। না, তা হতে দেব না। কামানের রসদ যোগাবার জন্য আমাদের ছেলেদের হতে দেব না। আজকাল সব মেয়েরাই এ কথা বলছে। ভবিষ্যতে শান্তি অটুট রাখবে মেয়েরাই। তুমি দেখে নিয়ো।

ভবিষ্যতের এই আশ্বাসে যে বর বর্তমানে বিশ্বাস করল তা মনে হল না। শুধু মেয়েটী আদর্শের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রচ্ছুরিত জলরাশির উপর ফেনার মালার মত ঝলমল্ করতে লাগল আর বরটী এতক্ষণে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে একটু সরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধবে?"

সেই নবদম্পতীর যুগলস্বাক্ষর সম্বলিত উপহার রাইনতীরের চিত্রটী আমার কাছে এখনো আছে; নেই হয়ত তাদের আশঙ্কার উপর ক্ষণজয়ী শান্তির নীড়টী; নেই হয়ত তাদের বিবাহের বা মিলনের বন্ধন। রাষ্ট্রতন্ত্র হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তিগুলির উপর ছড়িয়ে দেয় তন্দ্রা, রাজনীতি করে প্রীতিকে নির্মমভাবে নিপীড়ন। মানুষ যেন জন্ম থেকে তাদের জন্যই উৎসর্গীকৃত। তবু তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, রাজা ও রাজনীতির ভাঙ্গাগড়া উপেক্ষা করে মানবাত্মা জাগে নূতন মিলন বন্ধনে। নবীন যাত্রাপথের পথিক হয়ে। তাই ইয়োরোপের যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ক্লেশ ও দ্বেষের উপর জয়ী হয়ে নব নব যুগল স্বাক্ষর পড়ে যায় হৃদয়ের নিগূঢ় নিঃশীম প্রতিলিপিতে। ইয়োরোপ ত মরতে চায় না।

আবার একটী চিত্র এগিয়ে আসছে আজকের এই স্বপ্নময় আশ্বিনের শারদ আশ্বাসের আবরণ ভেদ করে। পুরাণো বইয়ের দোকান সর্ব্বদা আমাকে আকর্ষণ করে, আর কল্পনাকে নাড়া দিয়ে যায়। খালি মনে হয় পুরাণো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হয়ত একদিন এমন একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে এসে পড়বে যা আমায় বিখ্যাত, হয়ত বা অমর করে দেবে। ছাত্রাবস্থায় ভাবতাম বহু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই মূলে রয়েছে আকস্মিক ঘটনা, কে জানে আমিও হয়ত অজ্ঞাতে পুরাণো পুঁথির পথে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলব। বলা যায় না, ওই ন্যুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ দোকানদারের আলমারীগুলিতে যে পুরাতন ও হস্তান্তরিত জ্ঞানভাণ্ডার ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে কোন বই থেকে হয়ত একটী গোলাপের শুকনো পাপড়ী অতীতের কোন মিসর রাজকুমারী বা গ্রীক মহিলা কবির স্মৃতি-সুরভিত ইতিহাসই বা বহন করে আনবে। অথবা হয়ত কোন গুপ্তচরের গোপন সংকেত চিত্র যা আজই সন্ধ্যাবেলায় কোন নির্দ্দিষ্ট অথচ অজ্ঞাত আগন্তুকের প্রতীক্ষা করছে তার বদলে আমার কাছেই সহসা প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই পুরাণো বইয়ের দোকান দেখলেই আমি তার ভিতরে যাই। জ্ঞানের আলো বা অভ্যন্তরের অন্ধকার দুই-ই আমার মনকে জাগিয়ে দেয়। সে জন্যই প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে একটা দোকানে গেলাম যার এক কোণে ভূগর্ভে একটী কফিশালাও আছে। সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ বিরাট্ তথ্যের প্রান্তসীমায় অজ্ঞাত পদক্ষেপ করেছিলাম তা কে তখন নিজেই জানতাম?

সেই একান্ত নিভৃত কোণে বসে কয়েকজন বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত ছাত্র আণবিক শক্তিকে বিস্ফোরণ বা আলোড়ন করা যায় কি না সে তথ্যের ব্যর্থ চেষ্টার পর চেষ্টার কথা আলাপ করছিল; তারা ভাবছিল যে এর মধ্যে যে সৃষ্টির আদিম শক্তি লুকানো আছে তাকে যদি মুক্তি দিতে পারে তাহলে সংসারে অসাধ্যসাধন করা যাবে। সেই লোকগুলি আজ কোথায় গেল? তারা কি শুধু জ্ঞান পিপাসায় বা যুদ্ধোন্মুখ রাষ্ট্রের স্বার্থে এই অনুসন্ধান করছিল, অথবা তাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানের উপর শত্রুর গুপ্তচর সন্ধানী নয়ন রেখেছিল? অথবা তারা কি তাদের যন্ত্রালয়ে জীব কল্যাণের যে রহস্যে নিয়োজিত ছিল তা উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল অথবা মঙ্গলের পথচ্যুত হয়ে অশনির মত অমোঘ মৃত্যুর মত নির্ম্মম আণবিক বোমা আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল? আজ সমস্ত পৃথিবী বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করছে, জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ কি মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করলে, হে পাশ্চাত্য বস্তু বৈজ্ঞানিকের দল? সংহতির স্থলে এ কি সংহারের পথ খুলে দিলে, হে প্রতীচী, যার ফলে একটা বোমার আচমকা আলোয় বিশ্বের চোখ বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ হয়ে গেল, প্রলয়ের ঘোর রব আমাদের কাণকে জ্ঞানের বাণীর প্রতি বধির করে দিল?

এই যদি শেষ ফল হয় তবে কি হবে এই শ্যামল সুন্দর ধরণীকে নিয়ে, তার প্রেমরসাস্পদ ফলে ফুলে বিকশিত জীবনের বিহারক্ষেত্র প্রিয়গৃহ ও প্রিয়সঙ্গ নিয়ে? এ সব কি আমরা সৃষ্টি করেছি শুধু সংহার করবার জন্য? এত কাব্যগাথা চিত্রভাস্কর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞান, এত হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির উদ্ভব ও স্বীকার, এত কার্য্যকরী বিস্তার

আবিষ্কার ও প্রসার এ সব, সব কি শুধু যে অণুতে মানবের জন্ম সেই অণুতে শুধু তাকে নয়, তার সঙ্গে যুগযুগান্তের সঞ্চিত সৃষ্টি ও সভ্যতাকে নিমেষে নির্ম্মমভাবে ফিরিয়ে দিবার জন্য? কবি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষ এক একটা খণ্ড দ্বীপ, তাদের ঘিরে রয়েছে বিরহের লবণসমুদ্র। আমরা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি সেই ব্যবধানকে লোপ করবার জন্য; জাহাজ ও বিমান হয়েছে দুরত্বেক কমিয়ে ভাই ভাই একঠাঁই করবার জন্য। আর এখন কি জাহাজ আসবে সমুদ্রপথে শুধু শত্রুবাহিনী বহন করে আনবার জন্য? আকাশপথে আসবে মারণ পক্ষী? শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞানান্বেষণের ফল কি এই হল? তা ত হতে পারে না। তাই আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই জনমত উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে যাতে পৃথিবী মানবেরই থাকে, দানবের হাতে বিকিয়ে না যায়।

প্রতীচী তাই স্বার্থ সত্ত্বেও জাগ্রত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ইয়োরোপে প্রশ্ন উঠেছে যে মানবের শিবসাধনায় যা উৎসর্গ হবার কথা ছিল পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করার জন্য সে বিদ্যাকে কেন নিয়োগ করা হল? অণু বিস্ফোরণের মধ্যে ইয়োরোপ চেয়েছিল শিব; চোখ চেয়ে দেখতে পেল চারিদিকে রাশি রাশি শব। তাই সে বলছে, শুধু শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়াতে শান্তি স্থাপিত হয় নি; মানবাত্মাকে নিজের উপর বিজয়ী হতে হবে। এই চেষ্টা সার্থক হোক্। এই চেষ্টাতেই প্রাচী শতাব্দীর পর শতাব্দী রত ছিল।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্
তেনাহং কি কুর্য্যাম্।

সেই অমৃতের অন্বেষণ শেষ হয় নি যে এখনো। চারিদিকে যখন ধ্বংস ও অশান্তির লীলা চলেছে তখন প্রাচীর প্রাচীন সাধনা ও প্রতীচীর নবীন সন্ধান শান্তি ও কল্যাণের পথ আবিষ্কার করুক। এ দুইয়ের কেহই অপরকে ছেড়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারবে না। পরমাত্মার জ্ঞান ও পরমাণু বিজ্ঞান দুই ই সভ্যতার পরমায়ুর জন্য প্রয়োজন। তা যদি পাই তবেই আমরা পাব মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৩

নির্ব্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে চিনতে পারলেন। সে-ও যেন বুঝতে পারলে যে পুরন্দরবাবু তাকে চিনেছেন। তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা গেল তা। হঠাৎ সুমিষ্ট হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার।

"পুরন্দরবাবু আশা করি চিনতে পেরেছেন আমাকে"—গাঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলো বলল সে। কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

"যুগল পালিত না কি"

পুরন্দরবাবুও একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

"ন'বছর আগে বর্দ্ধমানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়েছিল, মনে আছে আশা করি আপনার"

"হ্যাঁ…নিশ্চয়। কিন্তু এখন রাত তিনটে। আপনি আমার বন্ধ দরজার সামনে দশ মিনিট ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন কড়ায় হাত দিয়ে, এর মানেটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"রাত তিনটে! বলেন কি"—পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে যুগল শুধু বিস্মিত নয় একটু আহতও হল যেন—"তাই তো, তিনটেই দেখছি। আমায় মাপ করুন পুরন্দরবাবু, সিঁড়িতে উঠবার আগে ঘড়িটা আমার দেখা উচিত ছিল। বড় লজ্জিত হলাম, আবার একদিন আসব তখন বলব সব, দু'একদিনের মধ্যেই আসব, এখন যাই"

"সব বলতেই যদি চান এখনই বলুন"—পুরন্দরবাবু তার হাত ধরলেন—"আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে আসবারই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয় আপনার, তা না হলে এত রাত্রে শুধু শুধু এত কষ্ট করে এলেন কেন। কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিলই—বলুন কি সেটা"

তিনি উত্তেজিতও হয়েছিলেন, হতাশও হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। একটু লজ্জাও করছিল…রহস্য, বিপদ কিছুই তো নয়। কল্পনায় যেটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিলেন একটু আগে তা কিছুই নয়—নিরীহ যুগল পালিতে পরিণত হল শেষ পর্য্যন্ত! কিন্তু না, এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার হাত এড়াতে পারছিলেন না তিনি।

যুগল পালিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে, পাশেই বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন। লোকটা কি বলে শোনাই যাক। আপাদমস্তক ভাল করে' দেখলেন আর একবার। ভাল করে মনে পড়ল সব। যুগল পালিত কিন্তু চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলে না। স্যায়ত সে যে

তার অদ্ভুত আচরণের জবাবদিহি করতে বাধ্য একথা যেন তার মাথাতেই আসছে না। বরং সে এমনভাবে পুরন্দরবাবুর দিকে চাইতে লাগল যেন পুরন্দরবাবুই কিছু বলবেন। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ফাঁদে পড়লে ইঁদুর যেমন হকচকিয়ে যায় তেমনি হয়েছিল হয়তো। পুরন্দরবাবু কিন্তু রেগে উঠলেন।

"এরকম করার মানেটা কি! আপনি ভূতও নন স্বপ্নও নন নিশ্চয়, মতলবটা কি খুলেই বলুন না"

যুগল পালিত উসখুস করতে লাগল। তারপর একটু মুচকি হেসে একটু থেমে থেমে বলল—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এ সময়ে এবং এ ভাবে আসাটা অদ্ভুতই মনে হচ্ছে আপনার···যদিও অতীতের কথা মনে করলে কি ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা ভাবলে··· এটা অবশ্য ঠিক এ সময়ে আসব ভাবি নি আমি···পাকেচক্রে হয়ে গেল···"

"পাকেচক্রে মানে! জানালা দিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে আপনি পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে চাইতে চাইতে রাস্তাটা পার হলেন"

"ও, আপনি দেখেছিলেন তাহলে! তাহলে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করছি বোধহয়···দেখুন তিন হপ্তা আগে আমি এখানে এসেছি, নিজের একটা কাজে। আমি যুগল পালিত আপনি তো জানেনই, চিনতেই তো পারলেন। আমি এখানে এসেছি চাকরির তদ্বির করতে। বদলি হতে চাই আমি। খুব ভাল পোষ্ট খালি হয়েছে একটা, ঢের বেশী মাইনে···কিন্তু সে চাকরি এখানে নয় যেখানে ছিলাম সেখানেও নয়, যদিও···মোট কথা আসল ব্যাপারটা হচ্ছে— গত তিন সপ্তাহ ধরে' এই কোলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে' বেড়াচ্ছি। কাজটা ওজুহাত মাত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছি এইটেই আসল কথা। —চাকরিটা যদি হয়ও খুব যে ধন্য হয়ে যাব তা নয়, তখনও হয়তো এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ঘুরছি। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি পুরন্দরবাবু। আর দেখুন হারিয়ে ফেলেছি বলে' খুশীই হয়েছি মনে হচ্ছে—মানে আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি আপনাকে— এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হয়তো মাপ করবেন"

"কি রকম মনে হচ্ছে?" পুরন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যুগল পালিত নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে। তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "সে আর নেই"

পুরন্দরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তাঁর কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বুকের ভিতরটা মুচড়ে দিলে কে যেন।

"কে! মিসেস পালিত?"

"হ্যাঁ। অপর্ণা গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছে···যক্ষ্মা হয়েছিল। দু'তিন মাস ভোগবার পর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল একদিন। আমাকে ফেলে চলে গেল। কি অবস্থায় ফেলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন"

হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে যুগল পালিত নিজের বাহুযুগলকে দুধারে প্রসারিত করে' মাথাটা নীচু করে রইল। পুরন্দরবাবু দেখলেন টাক পড়েছে লোকটার।

যুগলবাবুর কথা শুনে এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে পুরন্দরবাবু যেন চাঙ্গা হলেন খানিকটা। একটা শ্লেষতিক্ত নির্মম হাসির আভাসও যেন খেলে গেল ঠোঁটে···কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। যে মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র শুনলেন তাকে অনেকদিন আগে তিনি চিনতেন, অনেকদিন আগে ভুলেও ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদে এতটা বিচলিত হয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"তাই না কি!"···আমাকে এতদিন খবরটা দেন নি কেন। দেওয়া উচিত ছিল। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"আপনার সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সহানুভূতি যে মেকি নয় তাও জানি। যদিও···"

"যদিও?"

"যদিও আপনার সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে—কিন্তু আপনি আমার দুঃখে যে রকম বিচলিত হলেন কি করে' যে, বিশ্বাস করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভাষা পাচ্ছি না। অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধেও আমার ওই এক কথা—ভাষা পাচ্ছি না—এই তো এখানেই পূর্ণ গাঙ্গুলী রয়েছেন— অকৃত্রিম বন্ধু একজন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমি বন্ধুত্বই বলি সেটাকে, আমার স্পর্দ্ধা মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ন'বছর আগে, তারপর যদিও আপনি আর যান নি আমাদের কাছে, চিঠিপত্রও লেখেন নি···"

লোকটা সুর করে' গান গাইছে যেন। আর সর্ব্বদা চোখ নীচু করে' মাটির দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সব লক্ষ্য করে চলেছে।

পুরন্দরবাবু ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। সকৌতুকে এবং সবিস্ময়ে যুগল পালিতকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। তার সব কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সে যখন থেমে গেল তখন অসংলগ্ন কয়েকটা কথা তাঁর মনে হল।

"আচ্ছা, এর আগে আপনাকে চিনতে পারি নি কেন বলুন তো!"— হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—রগের শিরাগুলো দপ দপ করে উঠল তাঁর— "অন্ততঃ পাঁচবার রাস্তায় দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে"

"হ্যাঁ; আমারও মনে আছে তা। আপনার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল—দু'বার, কিম্বা তিনবার বোধহয় আপনি এসে পড়েছিলেন আমার সামনে"

"আপনিই এসে পড়ছিলেন বলুন। আমি একবারও যাই নি ইচ্ছে করে—"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। যুগল পালিত থেমে গেল, পুরন্দরবাবুর দিকে এক নজর চেয়ে বলল—"আমাকে চিনতে না পারার ঢের কারণ আছে। প্রথমত হয়তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়—তা ছাড়া আমার বসন্ত হয়েছিল, মুখে দাগ হয়ে গেছে···"

"ও! বসন্ত হয়েছিল না কি! বসন্ত কি করে—"

"বাগালাম? আরও কত কি হতে পারত। কিছু কি বলা যায়, মশাই। অদৃষ্ট মন্দ হলে সবই হতে পারে—'

—

"তা বটে, তা বটে। বলুন কি বলছিলেন—"

"আমিও অবশ্য আপনাকে দেখেছিলাম রাস্তায়—"

"আচ্ছা—আপনি হঠাৎ 'বাগালাম' বললেন কেন! আমি কথাটা ঠিক ও রকম ভাবে বলতে চাই নি। আচ্ছা থাক ও কথা, যা বলছিলেন বলুন—" তাঁর মনে প্রসন্নতা যেন ফিরে আসছিল। ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। উঠে পায়চারি করতে সুরু করলেন।

"যদিও আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, কোলকাতায় আসবার সময়ই যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু সত্যি কথা বলছি, মনটা এমন ভেঙে গেছে…ফাল্গুন মাস থেকে বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সত্যি বলছি—"

"ও—কি বললেন—চুরমার হয়ে গেছে? আচ্ছা এক মিনিট—সিগারেট খান আপনি কি…"

"আপনি তো জানেন, আগে অপর্ণা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমি…"

"হ্যাঁ আগে তো খেতেন। ফাল্গুনের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি"

"এক আধটা খাই কখনও কখনও"

"নিন তাহলে একটা। এই যে দেশলাই—ধরিয়ে নিন। তার পর বলুন—বলে যান—এ যে অত্যন্ত, মানে—"

পুরন্দরবাবু নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন এবং বিছানার উপর বসলেন।

যুগল পালিত চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ।

"আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো"

"চুলোয় যাক আমার শরীর"—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—"আপনি বলে যান"

যুগল পালিত পুরন্দরবাবুকে বিচলিত হতে দেখে একটু যেন খুশী হল। আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে গেল তার।

"কিন্তু বলবার আর কি আছে? ভেবে দেখুন, আমার সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে গেল—মানে সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। কবিত্ব নয়, ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর উদ্দেশ্যহীন হয়ে এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—কোলকাতা শহর নয়—মনে হচ্ছে যেন একটা অরণ্য। সব যেন গুলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল—সব শূন্য। শূন্যতাটাই পেয়ে বসেছে যেন আমাকে। এ অবস্থায় কোন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে, এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় আবার অন্য রকম হয়—সব মনে পড়ে যায়, সকলের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে' যে সময় চিরকালের জন্যে চলে' গেছে সেই সময় যারা ছিল তাদের সঙ্গ।…মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে সেই অতীতকে ফিরে পেতে, সেই অতীতের যারা সাক্ষী ছিল তাদের কাছে যেতে…বুকের ভেতরটা এমন করতে থাকে যে তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রাত দুপুরেও—হ্যাঁ অন্যায় জেনেও—রাত দুপুরেও বন্ধুর কাছে যেতে তখন বাধে না…রাত তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙিয়েও তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে…সময়টা অবশ্য ঠিক করতে পারি নি…সে বিষয়ে ভুল হয়েছে আমার…কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ে ভুল করি নি আমি। এই যে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এইতো যথেষ্ট এইতেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে মনে করি। সত্যি আমি ভেবেছিলাম বড় জোর বারোটা বেজেছে…এখনও আমার বারোটার বেশী মনে হচ্ছে না। দুঃখের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছি, বুঝলেন—দিগ্বিদিক জ্ঞান আর নেই। ঠিক দুঃখও নয় বুঝলেন…জিনিসটার অভিনবত্ব বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে—"

পুরন্দরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়েছিলেন, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন—"ভারী অদ্ভুত তো"

"সত্যিই অদ্ভুত হয়ে গেছি আমি যে"

"ঠাট্টা করছেন না আশা করি—"

"ঠাট্টা!" শুধু বিস্ময় নয়, যুগল পালিতের চোখের দৃষ্টিতে বেদনাও ঘনিয়ে এল—"এ কি ঠাট্টা করবার বিষয়। যার মৃত্যুর কথা বলছি—"

"থাক—ও কথা আর বলবেন না"

পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং আবার পায়চারি সুরু করলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যুগল পালিত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই পুরন্দরবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"যাবেন না, বসুন, বসুন, বসুন"

বাধ্য বালকের মতো যুগল বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পুরন্দরবাবু হঠাৎ তার সামনে থেমে বললেন…"সত্যি, আপনার কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে—"

যেন পরিবর্ত্তনটা হঠাৎ এখনই চোখে পড়ল তাঁর।

"ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অসাধারণ। অন্য লোক হয়ে গেছেন একেবারে—"

"তা আর বিচিত্র কি। ন' বছরে—"

"না ফাল্গুন থেকে?"

"হি হি"—হাসি চেপে যুগল পালিত বললে—"না, তা নয়। আচ্ছা, জিগ্যেস করতে পারি কি—ঠিক কি পরিবর্ত্তনটা দেখছেন আমার"

"একথা জিগ্যেস করছেন আপনি! যে যুগল পালিতকে আমি জানতাম তিনি বেশ শক্ত সমর্থ সৌখীন লোক ছিলেন, বেশ বুদ্ধিমান… এখন যাঁকে দেখছি তাঁকে তো মনে হচ্ছে একটা ভাঁড় মাত্র!"

পুরন্দরবাবু বিরক্তির সেই সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে সীমায় গম্ভীর লোকেরও রসনার রাশ টেনে রাখা শক্ত হয়।

"ভাঁড়? তাই আপনার মনে হচ্ছে? এখন আর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আমাকে? সত্যি?"

যুগল পালিতের মুখে ব্যঙ্গ-দীপ্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। মনে হল কি একটা যেন মনে মনে উপভোগ করছেন তিনি।

"বুদ্ধিমান? না,—তবে চতুর মনে হচ্ছে বটে—মানে অতি-চতুর—" বলেই পুরন্দরবাবু ভাবলেন মনে মনে, "অশিষ্টতা হচ্ছে…কিন্তু এ লোকটাও কম অশিষ্ট না কি…রাতদুপুরে এমন—তা ছাড়া এর উদ্দেশ্যই বা কি…"

"ছি ছি কি বলছেন পুরন্দরবাবু, আপনি হলেন পুরোনো বন্ধু একজন"—যুগল পালিতের চোখে মুখে নিখুঁত আন্তরিকতা ফুটে উঠল যেন—চেয়ারে ঘুরে বসল সে।

"কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলুন তো! আমরা কি এখন পৃথিবীতে আছি? সামাজিক গণ্ডী কি এখন বেঁধে রেখেছে আমাদের? আমরা দুজন বন্ধু, অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু, বহুকাল পরে এক সঙ্গে মিলেছি মন খুলে কথা বলছি, আমাদের অমূল্য বন্ধুত্বের যে প্রাণ-স্বরূপ ছিল তার কথাই স্মরণ করছি…"

কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। মাথা নীচু করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে' বসে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগলেন তিনি।

"হয়ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়"—আবার মনে হল তাঁর—"কিন্তু না। মদ খায় নি তো? না—তাও নয়। কিছু বিচিত্র নয় অবশ্য। মুখটা লাল হয়ে আছে বেশ। মদও যদি খেয়ে থাকে—ব্যাপার একই দাঁড়াচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যটা কি? কি চায় ও?"

"মনে আছে আপনার, মনে আছে"—হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে যুগল পালিত আবার সুরু করলে…"সেই যে আমরা একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম মহিম মল্লিকদের জমিদারিতে—সেই বাচ খেলা, হৈ হৈ করা, গান হুল্লোড়—সন্ধ্যের সময় সেই যে আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে শোনাতেন—নিরুদ্দেশ যাত্রা—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি'—মনে আছে সে সব? আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথাটা মনে আছে? আপনি কি একটা বৈষয়িক দরকারেই এসেছিলেন আমার কাছে…বসবার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আমি—অপর্ণা এসে ঢুকল—বাস্—ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন, আর সত্যিকারের বন্ধু। ঠিক এক বৎসর অন্তরঙ্গতাটা বজায় ছিল—ঠিক এক বছর—রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের মতো—"

পুরন্দরবাবু মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করছিলেন ধীরে ধীরে। অধীর চিত্তে শুনছিলেন—সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠছিল—তবু শুনছিলেন—হ্যাঁ বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন।

"অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা আমার কখনও মনে হয় ন তো" অপ্রতিভভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "তাছাড়া আপনি অমন চীৎকার করে' কথা বলছেন কেন, আগে তো আপনি এত চেঁচাতেন না…এমন অস্বাভাবিক ভাষাও ব্যবহার করতেন না। এমন করবার মানেটা কি"

"হ্যাঁ, আগে আমি কথা কম কইতাম, মানে গম্ভীর ছিলাম"—যুগল পালিত বলে' উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"আগে আমি কথা শুনতেই ভালবাসতাম। সে বলত আমি শুনতাম। আপনার মনে আছে বোধহয় কি সুন্দর কথা বলত সে—কি চমৎকার রস দিয়ে দিয়ে। আর চিত্রাঙ্গদার কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক—আপনার মনে থাকবার কথা নয়—আমাদেরই মনে হয়েছিল—তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, কিন্তু আপনি চলে আসবার পর। অর্জ্জুন যেমন হঠাৎ এল হঠাৎ চলে গেল…"

"কি অর্জ্জুন অর্জ্জুন করছেন" পুরন্দরবাবু মাটীতে পা ঠুকে ধমকে উঠলেন। তাঁর মনে এমন একটা বিশ্রী স্মৃতি জাগছিল!

"আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল অর্জ্জুনের কথা" অতিশয় মধুমাখা কণ্ঠে যুগল পালিত আবার বললে, "বিশেষ করে' পূর্ণবাবু যখন এলেন—আপনি যেভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই এলেন। তিনি পাঁচ বচ্ছর ছিলেন"

"পূর্ণবাবু? মানে? পূর্ণবাবু কে?

পুরন্দরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা জমে' গেল যেন।

"পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। আপনি চলে আসবার এক বছর পরে তিনিও কৃপা করে আমাদের সাহচর্য্য দান করেছিলেন ঠিক আপনারই মতো"

"ও হ্যাঁ—ঠিক তো—মনে পড়্‌ছে"—পুরন্দরবাবু আত্মসম্বরণ করে' বললেন, "পূর্ণবাবু! ঠিক—তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে"

"হ্যাঁ, বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেবের অফিসে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন। চমৎকার লোক, ভাল বংশের ছেলে—"

যুগল পালিত যেন গদগদ হয়ে পড়ল একেবারে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কি ভাবছিলাম—ও—হ্যাঁ তিনিও তো…"

"হ্যাঁ তিনিও, তিনিও—" পুরন্দরবাবু অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে কথাটা বলে ফেলেছিলেন যুগল পালিত সোল্লাসে তাই পুনরাবৃত্তি করল…"হ্যাঁ তিনিও। তিনি থাকতে আমরা চিত্রাঙ্গদাটা অভিনয়ও করেছিলাম একবার। আমাকে কিন্তু অর্জ্জুনের ভূমিকায় নামতে দেয় নি—অপর্ণাই দেয় নি—"

"কি মুশকিল! আপনার অর্জ্জুন হবার যোগ্যতা কোথায়—আপনি হলেন নিখাদ যুগল পালিত"—বিরক্তিভরে রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—রাগে বিরক্তিতে কাঁপছিলেন তিনি—"ক্ষমা করবেন…ও পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু তো এখানেই আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না। যান নি সেখানে?"

"গেছি বই কি। গত পনর দিন থেকে প্রত্যহ যাচ্ছি। কিন্তু দেখা হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না কেউ। তাঁর অসুখ, শোনা কথা নয়, নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি তাঁর অসুখ। শক্ত অসুখ। ছ' বচ্ছরের বন্ধু। উঃ—সত্যি বলছি পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে ভগবতী বসুন্ধরে দ্বিধা হও—সত্যি বলছি। আবার মাঝে মাঝে অতীতটাকে আঁক্‌ড়ে ধরতেও ইচ্ছে করে—অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিল সবাইকে—আবার কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল খানিকটা হালকা হবার জন্যে…"

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন। আজকের মতো অন্তত যথেষ্ট হয়েছে—কি বলেন"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ বলে বসলেন।

"যথেষ্ট, যথেষ্ট"—যুগল পালিত উঠে দাঁড়াল—"চারটে বাজে, স্বার্থপরের মতো আপনাকে এভাবে…ছি ছি…"

"শুনুন, আমি গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে এর পরে। তারপর

আশা করি—আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, সত্যি করে' বলুন, আপনি কি মদ খেয়েছেন ?"

"মদ ? মোটেই না"

"এখানে আসবার ঠিক আগে, কিম্বা তারও আগে মদ খান নি আপনি ?"

"আপনাকে বড্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে পুরন্দরবাবু। আপনার জ্বর হয় নি তো—"

"না কিছু হয় নি। কাল দেখা করব আপনার সঙ্গে একটা নাগাদ"

"এসে পর্য্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন যেন প্রকৃতিস্থ নন" উপভোগ করতে করতে কথাগুলো বললে যুগল পালিত—"সত্যি বড় খারাপ লাগছে আমার, বিবেক দংশন করছে। এরকম সময়ে এসে আপনাকে···আমি যাচ্ছি···শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুমুন একটু—"

"শুনুন, আপনার ঠিকানাটা কি"

"৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট—"

"ও আচ্ছা। যাব আমি—"

"নিশ্চয়। কৃতার্থ হব তাহলে"

যুগল পালিত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

"শুনুন"—পুরন্দরবাবু ডাকলেন আবার—"ঠিকানা বদলে ফেলবেন না তো···"

"ঠিকানা বদলে ফেলব মানে ? কি যে বলেন !"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে যুগল পালিত।

কোন উত্তর না দিয়ে দড়াম করে' কপাটটা বন্ধ করে' দিলেন পুরন্দরবাবু। খিল দিলেন। তালা লাগালেন। জানালার কাছে গিয়ে থু থু করে' অনেকবার থুতু ফেললেন, মুখের ভিতর কেমন অশুচিতা অনুভব করছিলেন যেন একটা। নিষ্পন্দ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার। (ক্রমশঃ)

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

দুপুরবেলা আকাশ কালো করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

নদীর জলে মেদুর ছায়া বিকীর্ণ করিয়া—তাল নারিকেলের বীথিকে ধারা-বর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া এবং তেঁতুলিয়ার কলতরঙ্গে উদ্দাম উল্লাস জাগাইয়া ঘণ্টা দু তিন বেশ এক পসলা ঝরিয়া গেল। কিন্তু আকাশের কান্না থামিল না—থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দমকা বহিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে ঝরিতে লাগিল: ঝির ঝির-ঝির—

সন্ধ্যা ঘনাইতেছে অসময়ে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিভ্রান্ত বিহ্বল একদল কাক নারিকেল পুঞ্জের ওপর তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে গোল হইয়া উড়িতেছে—বাতাসের ঝাপটায় ওদের কারো বাচ্চা নীচে পড়িয়া গেছে বোধ হয়। তাণ্ডব-তালে ব্যাঙের কনসার্ট বাজিতেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব কোলাহলকে যেমন করিয়া হোক ছাপাইয়া উঠিবার সংকল্প করিয়াছে ওরা।

কর্ম্মহীন অলস দিন। মাসটা যদিও আষাঢ় নয়—তবু এই আশ্চর্য জগৎ, সীমানাহীন অন্ধ আকাশ, বিশৃঙ্খল একটা বিরাট নদী, সব মিলাইয়া নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ আর নির্ব্বাসিত মনে হয়, কবিরা কল্পনা করিতে পারে শাশ্বত বিরহের স্মৃতি-মধুর একটা মীড়-মূর্চ্ছনা যেন। রাণী তো কাছেই, তবু ভাবিতে ভালো লাগে: চঞ্চল ভ্রমরের মতো দুটি চোখের উৎসুক দৃষ্টি দিগন্তে মেলিয়া দিয়া কে দেখিতেছে নবঘন শ্যামশোভাকে—কোন রত্নপুরীতে কে যেন 'মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়মুদ্গাতু কামা—' কিন্তু 'তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ'—।' কালিদাস কখনো চর ইসমাইলে আসিবার সুযোগ পান নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে রামগিরির চাইতে এটাকে ঢের বেশি অনুকূল পরিবেশ বলিয়াই তাঁহার মনে হইত। কুর্চিফুল নাই ই থাকিল, কিন্তু নাম না-জানা যে মিষ্টি একটা বুনো ফুলের গন্ধ বাতাসে আসিতেছে—

কোথায় রামগিরি—কোথায় কুর্চি—কোথায় বা 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতা !' তৈলাক্ত হ্যাট, বিবর্ণ ওয়াটারপ্রুফ, এবং জুতার ওপরে একরাশ কাদা লইয়া মামুদপুর থানার দারোগার ঘটনাস্থলে প্রবেশ। অলকা হইতে যক্ষ নয়, পাতাল হইতে রক্ষ আসিয়া দর্শন দান করিল।

মণিমোহন বলিল, বসুন।

—না স্যার, বসব না। অনেক কাজ, বসবার সময় হবে না। শুধু আপনাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।

—কোন্ কথাটা ?

—সেই রেইডের ব্যাপারটা।

—ওঃ—মণিমোহনের মনটা চমকাইয়া উঠিল। আর কি দিন ছিল না। আকাশ বাতাস ঘিরিয়া এখন স্বপ্ন ঘনাইতেছিল, এখন সমস্ত শিরা গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়া আশ্চর্য একটা অনুভূতির মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতে ভালো লাগিতেছিল—বাতাসে নাম না-জানা ফুলের মৃদু মধুর অলস সুরভির মতো মনে পড়িতেছিল কাকে? এম্‌নি একটা সন্ধ্যায় দুটি বাহুর নির্মম পেষণে কোমল বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল কে, কার সুগন্ধি নিশ্বাস মুখের ওপরে ছড়াইয়া পড়িয়া নেশায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল?

দারোগা বলিলেন, জল বৃষ্টি, আপনার একটু কষ্টই হবে স্যার। কিন্তু কী করা যায়—এর চাইতে ভালো দিন আর হবেনা।

—হুঁ।

—অ্যাবসকণ্ডার, ঠিক তো নেই, যখন কোন দিকে রাতারাতি সটকে পড়ে। আমরা অবশ্যি কড়া নজর রাখছি, কিন্তু যা দেশ—বোঝেনই তো সব। কোনো নদী নালা দিয়ে একবার ছটকে বেরুতে পারলেই গেল। তারপর সমুদ্রের মোহানায় কে কাকে খুঁজে বেড়াবেন বলুন। এতো আর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা নয় কিংবা ই বি আরের রেলগাড়ি নয় যে চারদিকে নজর দিলেই—

—বুঝেছি। কথাটাকে মাঝখানেই মণিমোহন থামাইয়া দিল। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে মনে পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি: আমার দেশ শুধু শহর নয়, আমার দেশ শুধু নাগরিক-সমষ্টিও নয়; ভারতবর্ষের প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী জনপদের প্রান্তে প্রান্তে সেখান হইতেই একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই—

চকিতে মণিমোহন অনুভব করিল একটা জিনিস—যা এতদিন সে ভাবিতেও পারে নাই। চর ইসমাইল শুধুই কি একটা পাণ্ডববর্জিত দেশ—ভদ্রলোকের কল্পনার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরায় দ্বীপমালার স্যায় একটা আশ্চর্য রহস্যপুরী? অথবা বিরাট এই বাংলা দেশের একটা অলক্ষ্য প্রাণকেন্দ্র—যেখান হইতে একদিন উজান স্রোত বহিয়া জীবনে এবং চিন্তায়, রাষ্ট্রে এবং সভ্যতায় নতুন প্লাবন বহাইয়া দিবে? এতদিন তো শহরই দু হাতে দান করিয়া আসিতেছে, এবার কি পল্লীর সেই ঋণ পরিশোধের পালা দেখা দিল?

নিঃশব্দে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মণিমোহন ধরাইল, ধোঁয়ার জলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিল মেঘম্লান আকাশের দিকে।

—তা হলে আজকেই ঠিক?

—আজকেই।

—শহরের কোনো খবর পেলেন?

—এখনো পাইনি। টেলিগ্রাম অফিস সেই ওপারে—মানে একবেলার পথ। তা ছাড়া যুদ্ধের চাপে লাইন এমন এনগেজড, যে, কখন গিয়ে তার পৌছুবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ আর দেরি করাও ঠিক নয়—কখন যে ফসকে হাত থেকে পিছলে যাবে বলা যায় না। তাই বলছিলাম আর দেরী না করে যা পারি আমরাই করে ফেলি।

পিয়ারী আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। বর্ষার দিনে রাণী নিশ্চয় খিচুড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছে—পেয়াজ আর আধসেদ্ধ মুগের ডালের একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ আসিতেছে। আর টেবিলের ওপরে রাখা দারোগার তৈলমলিন টুপিটা হইতে ভাসিতেছে ঘামের দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় দারোগার চোখের নীচে অত্যন্ত গাঢ় একটা কালিমার রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত অবসাদ, জোয়াল টানিয়া চলা নির্বোধ পশু বিশেষের অবসন্ন প্রতিচ্ছবি।

মণিমোহন বলিল, ধরতে পারলে আপনার নিশ্চয় কিছু আশা আছে।

—তাতো আছেই।—অত্যন্ত খুশি হইবার চেষ্টা করিয়া দারোগা হাসিলেন: ইন্‌স্পেক্টরী তা হলে এবার হয়ে যেতে পারব স্যার। আর সাত আট বছরের মধ্যেই তো রিটায়ার করতে হবে, এখনো যদি চান্স না পাই তা হলে আর—

—অনেক দিন সার্ভিস তো হয়ে গেল আপনার, এত দিন চান্স পেলেন না কেন?

—কপাল স্যার, কপাল। দারোগা ললাটে করাঘাত করিলেন: কত জুনিয়ার চোখের সামনে দিয়ে টপাটপ টপকে গেল, আমি বসে বসে দেখলাম। কবার তো নমিনেশনও গেল কিন্তু ধোপে টিঁকল না। আসল ব্যাপার কী, জানেন? হিন্দুর আজকাল আর কোনো আশা ভরসা নেই—পীরের দরগায় জাত জন্ম জবাই দিতে না পারলে সরকারী চাকরীতে সুবিধে হবে না। পাকিস্তান পাকিস্তান কী ওরা বলছে স্যার, পাকিস্তান তো হয়েই আছে অনেককাল আগে।

মণিমোহন হাসিল: দেখুন, এই ফাঁকে যদি কিছু করে নিতে পারেন।

—সেইজন্যেই তো এমন করে লেগে পড়েছি স্যার। ঠেলে দিলে ক্রিমিন্যাল এলাকায়, ভাবলাম প্রচুর স্কোপ পাব—গ্যাংকে গ্যাং ধরে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এসে যা নমুনা দেখলাম তাতে গ্যাং তো দূরের কথা, এখন পৈতৃক প্রাণটা টিঁকিয়ে রাখতে পারলে হয়। এগুলো তো মানুষ নয়, জানোয়ার।

সত্যিই ইহারা মানুষ নয়। মণিমোহনের মনে হইল: মানুষ নয় বলিয়াই এখনো বাঁচিয়া আছে। পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতির কোঁচা পায়ে জড়াইয়া, ট্রামে বাসে মারামারি করিয়া এবং ডায়বেটিজ ও

ডিস্‌পেপসিয়ার নাগপাশে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া যাহারা অতি-মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের চাইতে ইহারা একটু আলাদা বই কি। হিংস্র উন্মত্ত যে পশু শক্তি নিজের প্রচণ্ড বলশালিতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে—ইহারা তাহাদেরই দলে। ধুতি চাদরে বিড়ম্বিত মানুষ যেখানে হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া তুলসীর মালা হাতে করিয়া পারত্রিক নিষ্কৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তখন দেহে মনে অমিত পাশব-শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইহারা জীবন অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে। জমিরের চোখের আগুনের সেই দীপ্তিটা মণিমোহন কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

দারোগা কহিলেন, যাক—ও নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে। আমিও বামুন স্যার, শাস্ত্র বলে পাতা চাপা কপাল। পাতা উড়েই যাবে একদিন—কে জানে এবারেই সে সুযোগটা পেয়ে গেলাম কিনা।

—পাবেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

পুলকিত হইয়া ব্রাহ্মণ দারোগা দাঁত বাহির করিলেন: আপনাদের আশীর্বাদ। কিন্তু আজকে রাত্রেই স্যার। আন্দাজ নটা সাড়ে নটা আপনাকে নেবার জন্যে নৌকো পাঠিয়ে দেব। ভালো পান্‌সী নৌকো—আরাম করে যেতে পারবেন, পুরু গদীও দিয়ে দেব।

—তাই দেবেন।

দারোগা উঠিয়া পড়িলেন। নমস্কার স্যার। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—সে তো দিলেনই, সেজন্যে আর বিনয় করে কী করবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি তা হলে—

থতমত খাইয়া জুতার তলায় কাদার ছপাছপ্‌ শব্দ তুলিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে। ভিজা মাটির গন্ধ বহিয়া 'বায়ু বহত পুরবৈয়া।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে কাজরী গানের একটা পংক্তি: "আয়ি রে গগন মে কারী বদরিয়া—"

কিন্তু কোথায় বা কাজরী গান, কোথায় নীপ-শাখায় দোলনা দুলিতেছে—কদমের রেণু উড়িয়া পড়িতেছে। দুলিতে দুলিতে অধরে অধর মিশিতেছে—মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বাজিতেছে মল্লারের সুর। স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের চাইতেও দূরে—ভাবনা-কামনা-কল্পনার অতীত জগতে।

সামনের চর ইসমাইল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নামিয়াছে। এপারে সুপারি নারিকেল বীথিতে অশ্রান্ত উদ্দাম সঙ্গীত—ওদিকে নদীতে প্রখর কল্লোল্লাস। কূলভাঙা জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়।

রাত্রি বাড়িতেছে। যাহাকে অথবা যাহাদের ধরিবার জন্য আজ রাত্রিতে তাহাদের অভিযান—সে এখন কী করিতেছে? হয় তো অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। শৃঙ্খলিত সমস্ত দেশের বেদনা আর জমাট অশ্রু তাহার দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে বর্ষা করুণ এই তমস্বিনী রাত্রির মতো। থাকিয়া থাকিয়া খর বিদ্যুতের চমকে তাহার দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অনাগত রূপ—জ্বালাময়, আগ্নেয়।

আর এমনি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়? আগা খাঁ প্রাসাদের চারিদিকে কি বর্ষার মল্লার গানে নিপীড়িত দেশের কান্না বাজিয়া উঠিতেছে? ভারতের অর্দ্ধ নগ্ন মৌনব্রতী ফকিরও কি কালো আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই রাত্রি সত্য নয়, এই অন্ধকারের পরপারে—

ঘর্‌র্‌র্—

রূঢ় কর্কশ শব্দ। মাথার উপর দিয়া এই বর্ষা রাত্রেও বিমান উড়িয়া চলিয়াছে—আসমুদ্র হিমালয় অতিক্রম করিয়া—অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বাধা-বন্ধনকে অসঙ্কোচে পার হইয়া বিজয়ের অভিযান? ভারতবর্ষের অশ্রুভারাচ্ছন্ন আকাশ কি সে গতিকে বাধা দিতে পারে?

বিদ্যুতের আগুনে দিগ্‌দিগন্ত চকিতে যেন জ্বলিয়া গেল। শুধু অশ্রুভার নয়, বজ্রও বটে। একদিন জ্বলন্ত অগ্নি-বর্ষণে সেও নিজের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবে। কিন্তু সে কবে! এই সরকারী চাকরী, এই নিশ্চিন্ত জীবন—মণিমোহনের পক্ষেও কি সে দিনটি একান্তই বাঞ্ছনীয়?

লঘু পায়ের শব্দ। রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—খিচুড়ি হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

—না, শুয়ে পড়া চলবে না রাণু। বেরোতে হবে।

—বেরোতে হবে? এই রাত্তিরে? কোথায়?

—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। সরকারী চাকরী, দায়িত্ব বোঝো না?

বিষণ্ণভাবে হাসিয়া মণিমোহন উঠিয়া পড়িল। রাণী কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল মেঘ মন্থর দিগন্তের দিকে—তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সিঙ্গাপুরে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার পরিবারের অপর কয়জনকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বৃটীশ ভারতের রক্ষাকার্য্য ও পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহারা যাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারেন, সেজন্য সরকারী আদেশে তাঁহাদের আটক রাখা হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর শরৎবাবুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এক পক্ষ কাল পরে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে যে মন্ত্রিসভা ছিল, তাহা শরৎবাবুর মুক্তি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ভাতা প্রদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ফলে ১৯৪২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শরৎবাবুর পরিবারের জন্য মাসিক হাজার টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ৬ই মার্চ্চ তাঁহাকে ত্রিচিনপল্লী হইতে কুর্গের অন্তর্গত মারকারায় আটক রাখা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৪শে মার্চ্চ শরৎবাবুর শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহাকে কুন্নুরে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্বে আর একবার ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৫ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত ৩নং আইনে শরৎবাবুকে আটক রাখা হইয়াছিল।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ১১টায় শরৎবাবু মুক্তিলাভ করেন। লালা শঙ্করলাল শরৎবাবুর সহিত কুন্নুরে আটক ছিলেন—তিনিও ঐ সঙ্গে কারামুক্ত হন। ঐ দিনই পাঞ্জাবে তাঁহার পুত্র শিশির বসু এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু ও দ্বিজেন্দ্র বসু মুক্তিলাভ করেন। কুন্নুরে শরৎবাবুকে কংগ্রেস কর্ম্মীরা বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। কুন্নুরে শরৎবাবু বলেন—৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই দুইটি কথায় মহাত্মা গান্ধীর মারফত ভারত তাহার অন্তরের বাণী ব্যক্ত করে। ইহা ভারতের পক্ষে উদাত্ত আহ্বান। আর বহির্জগতের পক্ষে সাবধান বাণী। সেই মহান নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবনত হওয়া উচিত। তিনি সারা জগতেরও নেতা।'

শরৎবাবু শুক্রবার সন্ধ্যায় কুন্নুর ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ আসেন, সেখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাহার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর পথে বেজওয়াদা ও কটকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ১৭ই সকাল সাড়ে ১২টায় তাঁহাকে সাঁতরাগাছি ষ্টেশন হইতে মোটরে হাওড়া ময়দানে আনিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেদিন কলিকাতার বহু লোক হাওড়া ময়দানে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। কয়েক লক্ষ লোক ময়দানে ও কলিকাতার পথে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল। দেশনেতার প্রতি এরূপ সম্বর্দ্ধনা সাধারণত দেখা যায় না।

মাদ্রাজে তিনি বলিয়াছেন—আটক থাকায় বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ মাত্র দেখিয়াছি। এই সকল সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হয় যে, ১৯৪৩ সালে বাঙ্গালার উপর দিয়া এক চরম দুর্দ্দিন চলিয়া গিয়াছে।

হাওড়া ময়দানে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন—বাঙ্গালার যুবকরা বৃটীশ বেয়নেট ও বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙ্গালার যুবক আবার বুক পাতিয়া দিতে রাজী হইবে। বাঙ্গালার যুবকরা বলুক—তাহাদের রক্তবিন্দু ভারতের স্বাধীনতার বীজ বপন করিবে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক বলিলেই ধ্বংস হইবে না। যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে রাজী থাকেন, তবেই স্বাধীনতা আসিবে, নচেৎ আসিবে না। জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি

বলেন—"মেকী বীরত্বের অভিনয় করিও না—সংগ্রামে প্রকৃত বীর হও।"

১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে তিনি নিজ গৃহে এক সাংবাদিক সম্মিলনে বলেন—কংগ্রেসের মধ্যে সম্পূর্ণ একতাই হইতেছে বর্ত্তমানের একান্ত জরুরী প্রয়োজন। শুধু আমার প্রদেশেই নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ একতা সংঘটনের জন্য আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যায়ত্ত শক্তি প্রয়োগ করিব। যথাসম্ভব সত্বর যাহাতে সমুদয় জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে কংগ্রেসের মধ্যে আনয়ন করা যায়, তদুদ্দেশ্যে আমার যেটুকু করণীয় তাহাও আমি সম্পাদন করার চেষ্টা করিব। কংগ্রেস আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই অবতীর্ণ হইবে। আমি চিরদিনই সেবক—দশ বৎসর বয়স হইতেই আমি নিজেকে কংগ্রেস সেবক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বোম্বাই অধিবেশনে যোগদানের জন্য শরৎবাবু ১৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার কলিকাতা ত্যাগ করেন।

বড়লাটের ঘোষণা—

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাতে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আসিয়া গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—যতশীঘ্র সম্ভব বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নকারী সভা আহ্বান করিবেন। ১৯৪২ সালে ঘোষিত বৃটীশ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, বা অন্য কোন ব্যবস্থা কিম্বা কোন সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত কি না—তাহা স্থির করিবার জন্য বড়লাট নির্ব্বাচনের পরেই বিভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত কথা আরম্ভ করিবেন, এ বিষয়ে তিনি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিতও আলোচনা করিবেন। নির্ব্বাচনের পর তিনি শাসন পরিষদও গঠন করিবেন—পরিষদে ভারতের বড় বড় দলগুলির সমর্থিত লোক গ্রহণ করা হইবে। যতশীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দান করিতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর। বর্ত্তমানে ভোটাধিকার প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না—শুধু নির্ব্বাচন তালিকা সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

বড়লাটের ঘোষণা জানিবার জন্য যাঁহারা উৎসুক ছিলেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের সকলকেই হতাশ হইতে হইবে। এইরূপ ঘোষণা আমরা বহুদিন হইতে শুনিতে অভ্যস্ত—এবং ইহাও জানি, শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্বত মুষিক প্রসব করিয়া থাকে। বিলাতের কর্ত্তারা যে আমাদের কিছু স্বেচ্ছায় দান করিবেন না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব নিজেদের ত্যাগ ও কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে—একথা সর্ব্বদা যেন আমরা মনে রাখি।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র নদীয়া শান্তিপুরের অধিবাসী ও কৃষ্ণনগর আদালতের উকীল। তিনি কেন্দ্রীয়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এল-এ

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ যেভাবে দেশবাসীর সেবা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে একটি ছোট দলের (জাতীয় দল) সম্পাদক হইয়াও তিনি পরিষদের সকল কার্য্য অতি নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদন করিতেন ও দেশবাসীর সকল অভাব অভিযোগের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। তিনি শান্তিপুরে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চায় যেরূপ উৎসাহ দান করেন, তাহাও এ যুগের পক্ষে অসাধারণ। যাঁহারা পরিষদের নূতন বিরাট গৃহ ও তাহার সংগ্রহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের কার্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। আমরা মৈত্র মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

সুভাষচন্দ্র বসু—

শ্রীযুক্ত এম্-সি-গুহ সিঙ্গাপুরে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলম্বোতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—সুভাষচন্দ্র বসু যেমন বৃটীশ বিরোধী, তেমনই জাপানেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং জাপানের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন—জাপানের হাতে খেলার পুতুল হন নাই। শ্রীযুক্ত গুহ সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বোম্বায়ের অধিবেশনে ২১শে সেপ্টেম্বর যখন শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন একজন সুভাষচন্দ্রের জন্য শোক করিতে বলায় কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ তাহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না—কাজেই শোক প্রস্তাব করা হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি জাতীয় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সেজন্য তাঁহাকে জীবনের অধিকাংশ সময় জেলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

সারদাচরণ মিউজিয়াম—

হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী গ্রামে মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে স্বর্গত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের স্মরণার্থ একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মিউজিয়মের অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করিবেন। বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, লিপি ও চিত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অবণীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এই মিউজিয়মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

রাওলপিণ্ডিতে বাঙ্গালী কালীবাড়ী—

বাঙ্গালা দেশ হইতে দেড় হাজার মাইল দূরে রাওলপিণ্ডিতে ১৮৫৮ সালে প্রবাসী বাঙ্গালীদের চেষ্টায় বাঙ্গালী কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও তথায় প্রায় এক হাজার বাঙ্গালী বাস করিত। কালীবাড়ী সংলগ্ন অতিথিশালাতে প্রতিবৎসর শত শত ভ্রমণকারী বাঙ্গালী আশ্রয় পাইয়া থাকে। কাশ্মীর ভ্রমণকারী বাঙ্গালীরা সকলেই এই কালীবাড়ী দেখিয়াছেন। বর্ত্তমানে রাওলপিণ্ডিতে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সে জন্য কালীবাড়ী ও আতথিশালার অর্থাভাবে দুরবস্থা আসিয়াছে। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে কালীবাড়ীর সাধারণ সম্পাদক। আমরা বদান্য বাঙ্গালীদিগকে এই কালীবাড়ী ও অতিথিশালার সংস্কার ও রক্ষা কল্পে অর্থসাহায্য দান করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালীর এরূপ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সম্মান লাভ—

ভারত সরকারের রাঁচী লাক্ষা গবেষণাগারের পদার্থবিদ্ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবার কলিকাতা বিশ্ব-

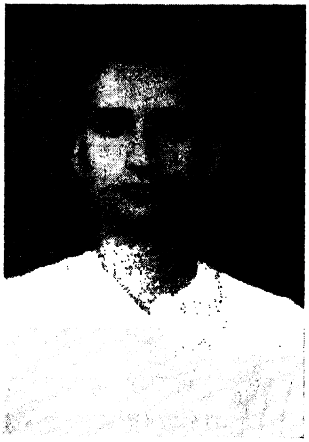

ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডি-এস্-সি

বিদ্যালয়ের ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্বে আর কেহ এই উপাধি লাভ করেন নাই। গিরীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন গবেষক ছাত্র হিসাবে ও কিছুকাল পরিভাষা কমিটীর সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

ডক্টর সুশীলকুমার বসু—

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার বসু অস্থিপ্রাপ্ত সংযোগ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার এবং জাপানের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

কমলা বক্তৃতা—

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ সালের কমলা বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। এখন তাঁহারা মুক্তিলাভ করায় সত্বর তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে। মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু শুধু রাজনীতিক নেতা নহেন—অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহারা বিখ্যাত। কাজেই লোক তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে।

কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যা—

কলিকাতা, টালীগঞ্জ, সাউথ সুবার্ব্বান, গার্ডেন রীচ ও হাওড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থানের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩ শত ৩৬ জন। রেজেষ্টারী করা রেশন কার্ড অনুযায়ী এই হিসাব করা হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ ও অন্যান্য যে সকল লোক রেশন কার্ড রেজেষ্টারী করে নাই, তাহারা এই হিসাবে বাদ পড়িয়াছে। ঐ লোক সংখ্যা অনুসারে কলিকাতায় প্রতিদিন ২১২১১ মণ দুধ প্রয়োজন—জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কম চাহিদা প্রতিদিন ১০৮৯৮ জন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় মাত্র ৩৬৯৩ মণ দুধ সরবরাহ হয়। যদি চাহিদা মিটাইতে হয়, তবে সরবরাহ তিন গুণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আশানুরূপ-ভাবে প্রয়োজন মিটাইতে হইলে উহার পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ বাড়ান দরকার। সহরে প্রতিদিন ২৬৪৪ মণ দুধ উৎপন্ন হয়, রেলে ও হাঁটাপথে ৯৭০ ও ৭৮ মণ দুধ প্রতিদিন কলিকাতায় আসে। সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রতিদিন ৩০০ মণ দুধ প্রয়োজন। সহরে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ৪০২ মণ দুধ প্রয়োজন। সাধারণ সময়ে বৎসরে ৪০ হাজার গো-মহিষ কলিকাতায় আমদানী হইত। কিন্তু এখন তাহা খুব কমিয়া গিয়াছে। এখন যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে মাসে মাত্র ১০০০ ও ৫০০ গো-মহিষ পাঠাইবার অনুমতি আছে—সেজন্য গরুর দাম পূর্ব্বে ১৫০ টাকা ছিল এখন তাহার দাম হাজার টাকা বা তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কলিকাতায় দুধ সরবরাহ বাড়ান না হইলে সহরের দুধ আরও কমিয়া যাইবে। সেজন্য একটি পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি ঐ পরিষদ সত্বর কোন ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে, তবেই সহরের লোক দুধ পাইবে—নচেৎ কিছুদিন পরে সহরে এক সের দুধের দাম দুই টাকা বা আরও বেশী হইবে।

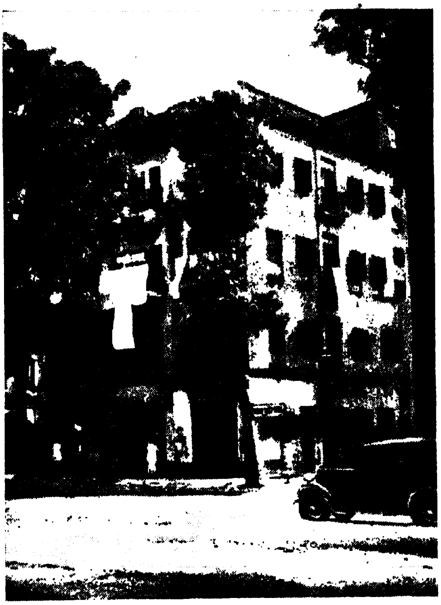

১১১ নং রসা রোডস্থ গৃহ

(ইহার মালিক সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনকে ইহা দান করিয়াছেন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে)

বোম্বাই কর্পোরেশন ও শিক্ষা—

পরলোকগত দেশ নেতা সার ফিরোজ শা মেটার শতবার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া 'নাগরিক নীতি ও রাষ্ট্রনীতি' বিষয়ে

একজন অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকেও অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বোম্বাই কর্পোরেশনের এই কার্য্য সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া উচিত।

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের বয়স ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পরিষদের পক্ষ

কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

হইতে গত ২৬শে আগষ্ট তাঁহাকে বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় পৌরহিত্য করেন। সভায় পরিষদের পক্ষ হইতে এক তাম্রফলকে লিখিত অভিনন্দনপত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়। সভায় রবিবাসরের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগ করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মুণীন্দ্রবাবু পীড়িত—সে জন্য তাঁহার কালীঘাটস্থ গৃহেই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

সিংহল রাজনীতি—

সিংহল রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি বিলে সিংহলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিয়াছিল ও সিংহল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীলঙ্কা' নাম রাখার প্রস্তাব করিয়াছিল। বৃটীশ উপনিবেশ সচিব ঐ বিল বাতিল করায় গত ১৮ই জুলাই তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রস্তাব ৩১—৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। পরাধীন সকল দেশের অবস্থাই একরূপ।

হিন্দু মহাসভা-কর্ম্মীদের ত্যাগ—

ওয়াভেল প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলেম লীগের মধ্যে ভারতের স্বার্থ ত্যাগ করার প্রস্তাব করিয়া বড়লাট হিন্দু মহাসভার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে হিন্দু মহাসভা তাঁহার কর্ম্মীদিগকে রাজদত্ত উপাধি ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফলে দিল্লীতে ১৮ই আগষ্ট স্থির হইয়াছে পাঞ্জাবের ডাক্তার সার গোকুলচাঁদ নারাং, যুক্ত প্রদেশের রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ ও দিল্লীর রায় বাহাদুর হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের উপাধি ত্যাগ করিবেন। আশা করি, এই নীতি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইবে।

বন্যায় সাহাজাদপুরের অবস্থা—

উত্তর বঙ্গে সর্ব্বত্র বন্যার কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। পাবনা জেলার সাহাজাদপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সাহাজাদপুর বন্যার জলে ভাসিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতে হাঁটু জল। শৃগালের ভয়ানক উৎপাত হইতেছে। এক বাড়ীতে রাত্রিতে ঘরে শৃগাল ঢুকিয়া এক বৃদ্ধাকে জীবন্ত অবস্থায় আহার করিয়াছে। সকালে তাহার মাথার খুলি ও একখানা পা ছাড়া আর কোন চিহ্ন ছিল না।—সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবে?

যুদ্ধে ভারতীয় বন্দী—

জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার ভারতীয় সৈন্য ও নাবিক প্রভৃতি বন্দী করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৩০০ জন বন্দীনিবাসে মারা যায় ও ২০০ জন নিখোঁজ হয়। বাকী ১১ হাজার লোককে ইতিমধ্যে ভারতে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯শে জুলাই লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে, ৭০০ জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এখনও বিলাতে রহিয়াছে। শীঘ্রই তাহাদের ভারতে প্রেরণ করা হইবে।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ট্রাম ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও সম্মিলনে যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল। বীরভূম-বাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের ৪টি শাখায় যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (সাহিত্য), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী (দর্শন), সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কাব্য) ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী (সঙ্গীত) সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়, কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উভয় দিনই উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন সাংখ্য বেদান্ততীর্থ উভয় দিনই সভার মঙ্গলাচরণ করেন। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাসের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ। ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার শান্তিপুরে (নদীয়া) এক বিরাট জনসভায় বাঙ্গালার প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন এ[বং] কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যর[ত্ন] শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যা[য়] অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমা[র] রায়চৌধুরী, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দা[স] শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু প্রমুখ বহু [ব্যক্তি] সভায় যোগদান করেন। শান্তিপুর নিবাসী ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল সভায় পৌরহিত্য করেন। কবি করুণা-নিধানকে ঐ উপলক্ষে বহু মানপত্র, বহু গ্রন্থ এবং একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর হইতে কবি নীহাররঞ্জন সিংহও সম্বর্দ্ধনা সভা[য়] যোগদান করেন। শান্তিপুর নিবাসী কেন্দ্রীয় ব্যব[স্থা] পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীবিনা[য়] সান্যাল প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি করুণানিধানের প্র[তি] শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের লোক দ[রি]দ্র পল্লীবাসী এই বৃদ্ধ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দ্বারা বাঙ্গা[লা] সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন

শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

সাহিত্যিকের মাতৃবিয়োগ—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) মাতৃদেবী গত ১১ই আগষ্ট পরিণত বয়সে ভাগলপুরে স্বামী, ৬ পুত্র ও বহু পৌত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার

বনফুলের মাতাঠাকুরাণী

চাণ্ডারহাটী গ্রামের কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন এবং জীবনে কোন শোক পান নাই। তাঁহার বিশেষ সাহিত্য-প্রীতি ছিল এবং আধুনিক ও প্রাচীন সব লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

সীমান্ত নেতা চারুচন্দ্র ঘোষ—

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশস্থ পেশোয়ার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পেশোয়ারে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যাহারা ঐ অঞ্চলে ভ্রমণে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ডাক্তার ঘোষের আতিথ্য ও দেশ সেবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে পেশোয়ারে বাস করিয়া তিনি ঐ প্রদেশে যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, ডাক্তার চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। সেজন্য তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া আমরা মনে করি।

ডাক্তার শম্ভুনাথ ঘোষ—

২৪পরগণা টাকী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দীননাথ ঘোষের পুত্র ও রায় বাহাদুর ডাঃ হরিনাথ ঘোষের অনুজ ডাক্তার শম্ভুনাথ ঘোষ সম্প্রতি তাঁহার আগড়পাড়ার বাসভবনে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর কামারহাটী সাগর দত্ত দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর আগড়পাড়ায় বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছিলেন।

ডাঃ শম্ভুনাথ ঘোষ

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩রা আগষ্ট ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮২ সাল হইতে ৬৩ বৎসর কলিকাতার মেসার্স টার্ণার মরিশন কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ ছিলেন এবং সঙ্গীত চর্চ্চায় খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালায় যে আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমসাময়িক কালের চিত্র পাওয়া যায়।

ভূদেব শোভাকর—

নদীয়া জেলার হরিপুর নিবাসী জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব ভূদেব শোভাকর গত ১৫ই জুলাই লক্ষ্ণৌয়ে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি নিজ চেষ্টায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া

ভূদেব শোভাকর

তিনি পরে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি অনুকরণযোগ্য ছিল। তিনি সপ্তপর্ণী ও সপ্তচিরজীবী নামক দুইখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি নদীয়া জেলার বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা, গান ও আবৃত্তি শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। কয়েক বৎসর তিনি লক্ষ্ণৌয়ে অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ৯০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া সিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি কেশব একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু ইংরাজি ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। স্বাধীন চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার সহজ, সরল ও নিয়মিত জীবনযাপন প্রণালী সকলের অনুকরণ যোগ্য।

পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ—

২৪পরগণা ভাটপাড়ার গুরু বংশের পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয় গত ১৩ই আষাঢ় ৮৪ বৎসর বয়সে স্বর্গগত

পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ

হইয়াছেন, তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডি ছিল—তিনি সারাজীবন বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করি গিয়াছেন।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

দুর্ভিক্ষ কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট

বঙ্কিমচন্দ্র সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ যতই সুফলা এবং শস্যশ্যামলা হউক, এদেশে যত লোক বাস করে তাহাদের পক্ষে বাংলার উৎপন্ন খাদ্যশস্য ার্য্যাপ্ত নয়। ইহার উপর বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের উদাসীন শাসন-্যবস্থার জন্য বাংলাকে বাধ্য হইয়া বহুসংখ্যক অতিথির খাদ্যসংগ্রহের ায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত ওয়ায় বাংলায় ব্রহ্মদেশ হইতে মোট প্রয়োজনের শতকরা যে ১০ ভাগ াউল আসিত তাহা বন্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় খাদ্যাদির প্রয়োজন দ্ধি সত্ত্বেও আমদানীর অভাবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ্যবস্থার জন্য ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ নরনারী সহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। এই দুর্ভিক্ষের করুণ বার্ত্তা ক্রমে দেশে বদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং নানা সমালোচনার চাপে পড়িয়া ভারত-রকার অবশেষে সার জন উডহেডের নেতৃত্বে সার মণিলাল নানাভাতি, াঃ এ্যাক্রয়েড, মিঃ রামমূর্ত্তি ও মিঃ আফজল হোসেনকে লইয়া ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন বহু ্যত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া এবং অনেক পুঁথিপত্র পাঠ করিয়া বিশেষে মানুষের সৃষ্ট এই লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের উপর একটি বস্তারিত রিপোর্ট দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টটি প্রকৃতপক্ষে ইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ প্রধানতঃ বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ারণ ও ফলাফলের উপর রচিত হয় এবং ইহা প্রকাশিত হয় গত মে াসে। আমি ভারতবর্ষের গত আষাঢ় সংখ্যায় 'উডহেড কমিশনের রিপোর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের প্রথমাংশ সম্বন্ধে বশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই রিপোর্টের দ্বিতীয়াংশ বা ড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই অংশে দুর্ভিক্ষ কমিশন বাংলার বগত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলেন নাই, তবে ইহাতে তাঁহারা াধারণভাবে ও সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ এবং প্রতিরোধের পায় সম্বন্ধে নানাবিধ পরামর্শ দিয়াছেন। কি ভাবে ভারতে খাদ্য-স্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, এদেশের আর্থিক অবস্থায় কি উপায়ে নসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব, কেমন করিয়া ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা রোধ করা যাইবে—এইরূপ নানা জটিল সমস্যার আলোচনা এই চূড়ান্ত রিপোর্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতসরকার তিনটি দুর্ভিক্ষ মিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসময়ে রিপোর্টও প্রকাশ করিয়া ছলেন, কিন্তু তবু ভারতে তেরশো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর সংঘটিত হইল। ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এই রিপোর্টটিতে সকল সম্ভাব্য সমস্যাই বিশদভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টটি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছেন, যে এই রিপোর্টের মন্তব্য ও উপদেশসমূহ ভারতের ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং উডহেড কমিশনের পর ভারতসরকারকে সম্ভবতঃ আর কোন দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে না।

ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে দুর্ভিক্ষ কমিশন কয়েকটি পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এদেশে শস্যউৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশ হইতে শস্য আমদানীর ব্যবস্থাই প্রধান। যদিও ১৯৪২-৪৪ সালে ভারত-সরকারের 'ফসল বাড়াও আন্দোলন (grow more food campaign) আশানুরূপ সার্থকতালাভ করিতে পারে নাই, তবু কমিশন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চেষ্টা করিলে এই আন্দোলন ভবিষ্যতে অবশ্যই সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। বিদেশ হইতে এখন কিছুকাল অন্ততঃ ভারতে সুবিধা-মত খাদ্যশস্য আমদানী করিতে কমিশন ভারতসরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে, সরকারের উপর আগামী কয়েক বৎসর সমগ্র দেশবাসীকে খাদ্যসরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সর্ব্বদা ৫ লক্ষ টন পরিমাণ শস্য হাতে মজুত রাখা। কমিশন মোটামুটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১-৫২ সাল নাগাদ ভারতবর্ষ সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ইহা ছাড়া দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতসরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন, জনসাধারণের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে তজ্জন্য ভারতসরকার যেন খাদ্যবস্তুর দর হঠাৎ খুব পড়িয়া না যায় বা খুব চড়া না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখেন। ভারতবাসীর খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন মাছের চাষ বৃদ্ধির সম্ভাবনীয়তা ও প্রয়োজনের উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং দরিদ্র এই দেশে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের অভাব আছে বলিয়া শরীর রক্ষা-কারী খাদ্য হিসাবে আলু, মিষ্টি আলু, কলা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে বলিয়াছেন। গ্রামোন্নয়নের জন্য তাঁহারা কৃষিকর্ম্মের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এবং কুটির শিল্প ও গ্রাম সংগঠনের কাজ বাড়াইবার সুপারিশ করিয়াছেন এবং দেশে জলতাড়িত বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা চালিত বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়া যাহাতে গ্রামের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয় তদ্বিষয়ে সরকার ও শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে ২০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমানের ৪০ কোটির স্থলে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি হইবে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে কমিশন সম্ভবমত প্রসূতিসদন, শিশুমঙ্গল সমিতি ও মহিলা ডাক্তারদের মারফৎ বহু-সন্তানবতী অথবা দীর্ঘকাল অন্তর সন্তান-কামিনী নারীদের জন্মশাসন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারকে উপদেশ

দিয়াছেন। তাছাড়া কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত যে সব অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশ আছে, সেগুলিতেও ভারতবর্ষের অতিরিক্ত জনসংখ্যার কতকাংশ প্রেরিত হইতে পারে। কমিশনের সদস্য মণিলাল নানাভাতি একটি পৃথক মন্তব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার আশু অবসানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য ভারতের মত দুর্ভাগ্য দেশের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা করা এক কথা এবং সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা আর এক কথা। মোটের উপর দুর্ভিক্ষ কমিশন উভয় রিপোর্টেই এদেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেগুলি পালিত হইলে এদেশ হইতে ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা অবশ্যই অনেকটা কমিয়া যাইবে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এবারও হয়তো দুর্ভিক্ষ কমিশনের মূল্যবান মতামতসমূহ শুধু সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রেরই কলেবর বৃদ্ধি করিবে, কারণ ১৯৪৩ সালের পর এখন পর্য্যন্ত ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন মোটেই লক্ষ্য করা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে পরিচালনার ত্রুটিতেই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই বাংলাদেশ পুনরায় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে।

উডহেড কমিশন ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে ভারতসরকারকে এদেশে ফসল বৃদ্ধির ও বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার যথার্থতা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে বাজারে পণ্যাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা যখন দেখা দেয়, তখনি বাজারের পণ্য দেখিতে দেখিতে বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার বাজার হইতে চাউল এইভাবেই উপিয়া গিয়াছিল। একবার বন্ধুবর যাদুকর পি সি সরকার ম্যাজিক দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার হাতের একটি টাকা বেমালুম আমার পকেটে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। কি করিয়া যে টাকাটি আমার পকেটে আসিল তাহা সমবেত সকলের সহিত আমিও বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিতে মিঃ সরকার উত্তর দিলেন 'টাকাটা আপনার পকেটে গেল আপনার পকেটটা ছিল ব'লে।' বলা বাহুল্য উত্তরটি অত্যন্ত হাল্কা, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হওয়ার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আমার মনে পড়িয়া গেল। ১৯৪৩ সালের প্রথমে বাজারে যেই গুজব রটিল চাউল আর পাওয়া যাইবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা পরিবার বাঁচাইতে, প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদের রক্ষা করিতে, এমন কি গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের জন্য হু হু করিয়া চাউল কিনিতে লাগিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা পর্য্যন্ত সামান্য সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া এবং সঞ্চয় না থাকিলে অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া বাড়তি দামে বহু পরিমাণ চাউল ঘরে তুলিয়া তবে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাদুকর সরকারের কথায় আমার যেমন পকেট ছিল বলিয়া টাকাটি লোকচক্ষু এড়াইয়া পকেটে চলিয়া আসিল, বাংলার বাজারের চাউলও যাহাদের পকেটে টাকা ছিল, এক নিঃশ্বাসে তাহাদের গুদামে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল। এইভাবে সঞ্চিত চাউলের কত যে রক্ষা ব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহার পরিমাপ করা যায় না। অথচ হাতে টাকা ছিল না বলিয়া যাহারা সময়ে চাউল কিনিতে পারে নাই, তাহারা ক্রমে চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্য-ঘটিত চড়া বাজারে কোনক্রমেই অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিল না এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে ৩০।৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণে বাধ্য হইল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সত্যই যদি দেশে ফসল বাড়াইবার এবং খাদ্য আমদানী নীতিতে শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে সরকার ৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য হাতে মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই মজুত শস্যের জন্য কোন সময়ে খাদ্য পাওয়া না যাইবার গুজব রটিবে না এবং ফলে অর্থবানদের দৌরাত্ম্যে বাজার হইতে খাদ্য শস্য উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে বলিয়া দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

মোটামুটিভাবে যদিও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টটিতে আমরা খুসী হইয়াছি, তথাপি একথা না বলিলে নয় যে, এদেশের পরিস্থিতির বিচারে রিপোর্টটিতে যেন কিছু কল্পনাবাহুল্য থাকিয়া গিয়াছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইহাতে সন্নিবেশিত উপদেশগুলির কতগুলি কার্য্যকরী হইবে সে বিষয়ে সত্যই আমাদের সন্দেহ আছে। কমিশন প্রথমেই বলিয়াছেন যে, গত ১ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের শাসকবর্গ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন 'দুর্ভিক্ষের ফলে দেশে যাহাতে মহামারী না দেখা দেয় তাহা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থার দ্বারা দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করিয়া তুলিবার দায়িত্বও যে দেশের শাসকবর্গের, তাহা ভারতবর্ষে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নাই।' তাঁহাদের বিবৃতিতেই দেখা যায় যে, স্বাভাবিক সময়েও ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ অধিবাসী পর্য্যাপ্ত আহার পায় না। এ হেন করুণার-পাত্র দেশের প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়াও যে সরকার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য বজায় রাখিয়াছেন, উডহেড কমিশন সেই সরকারকে ভারতবাসীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্পর্কে এমন সব ব্যাপক উপদেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারত সরকার কর্ত্তৃক যেগুলির পরিপূরণের আশা আকাশকুসুমকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্ভিক্ষ কমিশনের এই সুপারিশের আগেই ভারত সরকার যদি এদেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় সামান্য অবহিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের চেহারা সত্যই ফিরিয়া যাইত। ভারতে বৎসরে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বৃদ্ধিতে কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বাড়তি লোক সংখ্যা ভারতের আর্থিক ভারসাম্য বিপন্ন করিতে পারে। সত্য বটে, বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বৃদ্ধি দুর্ভাবনার কথা। কিন্তু অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভে যথেষ্টসংখ্যক শিল্পশ্রমিক সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আজও যে ভারতে এতটুকু শিল্পপ্রসার সম্ভব হইল না, তাহার জন্য তো ভারত সরকারের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী। কমিশন বলিয়াছেন, বাড়তি জনগণের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত জনবিরল দেশে গিয়া বাস করিলে ভারতের উপর চাপ কমিবে। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি খুব কম এবং সেখানে বহু বাড়তি ভারত-

বাসীর সত্যই স্থান হইতে পারে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষের যে বিষ এই সব উপনিবেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের লোক এই সকল দেশে কুলীর মর্য্যাদা ছাড়া আর কি আশা করিতে পারে। লোক বৃদ্ধি সমস্যা দূরীকরণে কমিশন যে জন্মশাসন শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন, তাহা অবিবেচনাপ্রসূত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। জাতীয় আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা থাকিলে, দেশে শিল্প সমৃদ্ধি ঘটিলে এবং অর্থের অন্তর্দেশীয় প্রচলন-গতি বৃদ্ধি পাইলে বাড়তি জনসংখ্যা দেশের ক্ষতি না করিয়া উপকারই করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বা চীনের আসল সমস্যা তাহাদের জনসমস্যা নয়, আসল সমস্যা তাহাদের আর্থিক বনিয়াদের শিথিলতা। কৃষিকেন্দ্রিক এই দুই দেশে স্বাভাবিক নিয়মে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলায় কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শিল্প বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইয়া যাইতেছে। দেশে শিল্পাদি যথোপযুক্তভাবে প্রসারিত হইলে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সেই অনুপাতে বাড়িয়া গেলে ভারতবর্ষের মত দেশের দরিদ্র থাকার কথা নয়। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া ভারত সরকার যদি অনুগ্রহ করিয়া এদেশের শিল্পপ্রগতি সম্বন্ধে তাঁহাদের চিরকালীন ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কাজ অনেক বেশী হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বলা বাহুল্য দেশবাসীর আহার, বাসস্থান বা জীবনযাপনের যে কোন উন্নততর ব্যবস্থা সম্পাদনে কাগজে কলমে কোন পরিকল্পনা রচনা দারিদ্র্যক্লিষ্ট কোটি কোটি ভারতবাসীর আয় বৃদ্ধি না হইলে নিঃসন্দেহে নিরর্থক হইয়া যাইবে। ব্রিটেনে বিভারিজ পরিকল্পনায় ব্রিটিশ জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া সেই সঙ্গে পণ্য ব্যবস্থায় প্রাচুর্য্য রক্ষার কথা বলা হইয়াছে। এদিক হইতে দুর্ভিক্ষ কমিশনের পণ্য প্রাচুর্য্য রক্ষায় বা পণ্য গুণে উন্নতিসাধনের এই পরামর্শ কতকটা দুর্ব্বল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সার মণিলাল নানাভাতি পৃথক মন্তব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হইলে জমি ভোগকারী ও সরকারের মধ্যে জমিদার শ্রেণী অধিষ্ঠিত থাকিয়া অকারণে শোষণের সুযোগ পাইবে না এবং ফলে প্রজাদের আর্থিক সুবিধা হইবারই কথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সরকার জাতীয়ভাবাপন্ন না হন, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রজাদের শাসন করিবার সহিত প্যলন করিবার দায়িত্বও সরকার সমানভাবে উপলব্ধি না করেন, সে পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী প্রথা লোপ পাইয়া সরকারের অধিকারে জমি আসিলে এই জমিই শেষ পর্য্যন্ত সরকারের শোষণের অন্যতম উপায় হইয়া দাঁড়াইবে।

দুর্ভিক্ষ কমিশন ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করিতে খাদ্য শস্য আমদানীর ও নিয়ন্ত্রণের নীতি এখনও কিছুদিন চালাইবার যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। সরকার হঠাৎ খাদ্য শস্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইলে সম্ভবতঃ এই সকল খাদ্যের মূল্যরেখায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। পণ্য জোগানে চাহিদার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সরকার যদি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণনীতি তুলিয়া লন, তাহা হইলেই ক্রমে স্বাভাবিক বাজার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া কমিশনের ন্যায় আমরাও বিশ্বাস করি। তবে সমস্ত আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া ভারতে এই স্বাভাবিক বাজার ফিরিয়া আসিতে ১৯৫১-৫২ সাল অবধি বিলম্ব হইবে বলিয়া কমিশন যে অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু আমরা কতকটা বিস্মিত হইয়াছি। অন্তর্দেশীয় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠন ব্যাপারে সরকারের সহানুভূতি থাকিলে আমদানী ব্যবস্থা সুপরিচালিত হওয়ার উপর যেখানে মোটামুটি সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, সেখানে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করার কোন অর্থ হয় না। নিয়ন্ত্রণনীতি যতদিন চলিবে ততদিন নিরুপায় জনসাধারণ বাধ্য হইয়া পণ্য ব্যবহারে সঙ্কোচ করিবে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে পণ্যের যে অপচয় হইবে তাহাও তো কম নয়; আমাদের বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা এই অপচয়ের বহু প্রমাণ পাইয়াছি।

মোটের উপর উডহেড কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে প্রকৃত ঘটনার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার মর্ম্মন্তুদ বেদনার একটি করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন প্রকৃতপক্ষে উপদেশ রাশি বর্ষণ করিয়াছেন এবং এই সকল উপদেশে ভাল ভাল কথার দিকে যেরূপ নজর দেওয়া হইয়াছে, উপদেশসমূহ কার্য্যকরী হইবার সম্ভাব্যতার প্রতি সেইরূপ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ষ্টার্লিং পাওনা হ্রাসের অপচেষ্টা

ব্রিটেনের নিকট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠার পশ্চাতে ভারতীয় জনগণের দুঃসহ দুঃখবরণের একটি বিরাট ইতিহাস আছে। যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে বিপন্ন এদেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীকে বঞ্চিত করিয়া ভারতসরকার ব্রিটেনকে ভারতের স্বল্পপরিমাণ পণ্যের একাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ব্রিটেন সেই ভারতীয় পণ্যের সাহায্যে অন্তর্দেশীয় পণ্যচাহিদার সহিত জোগানে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং ভারতকে নগদ টাকা না দিয়া এই সকল পণ্যের মূল্যের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় জমা রাখে কাগজী ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতি পত্র। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি যে কবে শোধ হইবে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। ক্রমে নানাভাবে ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং এখন ব্রিটেনে গৃহীত ভারতের জাতীয় ঋণের দরুণ প্রায় ৪ শত কোটি টাকা শোধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেনের কাছে ভারতের পাওনা হইয়াছে একশত কোটি পাউণ্ড বা প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এদিকে এই পাওনার উপর ভরসা করিয়া ভারতসরকার ভারতের বাজারে ১১৪০ কোটি টাকার নোট ছাড়িয়াছেন এবং যুদ্ধের দরুণ ঋণপত্র লইয়া মোট ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ শত কোটি টাকার বেশী। ইহার উপর ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাবদ ভারতের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৫ শত কোটি

টাকা পাওনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে অবশ্যই তাহার বর্ত্তমান অর্থনীতিতে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, এবং সে দিক হইতে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পূর্ণ ভাবে ফিরিয়া না পাইলে তাহার পক্ষে শিল্পসংস্কার-আদি এই পরিবর্ত্তন সাধনের কোন ব্যবস্থা কর্য়াই সম্ভব নয়।

যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে বিপন্ন করিয়া ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে যে ঋণ প্রদান করিয়াছে, বিজয়ী ব্রিটেনের কাছে তাহা সুদসমেত প্রত্যর্পণের আশা করাই ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুদ প্রদান দূরে থাক, ভারতের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ব্রিটেন যে হাবভাব দেখাইতেছে তাহাতে আসল ফিরিয়া পাইলেই আমরা সৌভাগ্য মনে করিব। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভারতের পাওনা হ্রাসের উদ্দেশ্যে অভিযোগ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ নাকি ব্রিটেনকে অন্যায্য দরে পণ্যাদি বিক্রয় করিয়াছে সুতরাং তাহার প্রকৃত পাওনা দাবীকৃত পাওনা অপেক্ষা কম। সুখের কথা এ সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী পার্লামেন্টারী কমিটি উক্ত অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন ধুরন্ধর ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ভারতের শুভাকাঙ্খীর মুখোস পরিয়া এমন কথাও বলিতেছেন যে, ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং পাওনাই ভারতের মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুঃখের একমাত্র কারণ, এই পাওনার পরিমাণ কমাইয়া দিলে অর্থবান দেশবাসীর শোষণ হইতে অসংখ্য দরিদ্র ভারতবাসী নাকি মুক্তি পাইবে। যদিও সরকারী ভাবে এ সম্পর্কে এখনও কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই, তবু অবস্থা দেখিয়া অনুমিত হয়, ব্রিটিশ সরকার সুবিধা পাইলে ভারতের পাওনার একাংশ ফাঁকি দিয়া আর্থিক দায়িত্বমুক্ত হইতে বোধ হয় অনিচ্ছুক হইবেন না।

সম্প্রতি এই পাওনা আদায়ের ব্যাপারে আমেরিকার ভাব-ভঙ্গি আমাদের বিশেষ আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছে। যুদ্ধাবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়ায় ব্রিটেন চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত ব্রিটেনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া শিল্পাদির সংস্কার সাধনে ও রপ্তানীবাণিজ্য সম্প্রসারণেই ব্রিটেনের পক্ষে ভবিষ্যতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে। এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সাহায্য প্রদান বন্ধ করে তাহা হইলে ব্রিটেনের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। এই জন্য ব্রিটিশ সরকার মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য এবং ব্রিটেনের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইবার জন্য লর্ড কিনেস, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছেন। কিনেস-হ্যালিফ্যাক্স মিশন এখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সেনেটের সদস্যবৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্রিটেনকে পুনরায় ঋণ প্রদানে অনেক সেনেটরেরই অনিচ্ছা দেখা যাইতেছে। তবে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার এমনি যথেষ্ট সম্প্রীতি আছে এবং সেই জন্যই কোন কোন সেনেটর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ব্রিটেনের দেনার অঙ্ক কতকটা কমাইয়া তারপর তাহাকে সাহায্য করিতে চান। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রে মার্কিন সেনেটের ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য মিঃ ইমানুয়েল সেলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দুইটি সর্ত্ত স্থির করিয়া তিনি প্রতিনিধি পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। সর্ত্ত দুইটি হইতেছে :—

(১) ব্রিটেনকে বাণিজ্য ব্যাপারে সাম্রাজ্যিক সুবিধা লাভের দাবী ত্যাগ করিতে হইবে, এবং

(২) উপনিবেশ, রক্ষণাধীন দেশ প্রভৃতির কাছে ব্রিটেনের যে ঋণ আছে তাহা আংশিক ভাবে অথবা সমগ্র ভাবে নাকচ করিতে হইবে।

মিঃ সেলার স্পষ্টই বলেন যে, আমেরিকা অবশ্যই ব্রিটেনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার নিজস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াই আমেরিকা এই সাহায্য দানে অগ্রসর হইবে। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নিকট বিপুল পরিমাণে ঋণগ্রস্ত, ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা ভাল ভাবে পরীক্ষা না করিয়া নূতন ঋণ প্রদানের অযৌক্তিকতা মার্কিন সেনেটের রিপাবলিকান দলের সদস্য মিঃ হ্যারল্ড কুসনও জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেনকে আরও সাহায্যপ্রদানে ইচ্ছুক সেনেটের সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :—সহকর্ম্মীগণ কি ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, যে দেশ ইতিমধ্যেই আমাদের নিকট হইতে ৬৫ কোটি ডলার বাহির করিয়া লইয়াছে এবং যাহাকে যুদ্ধের সময় ঋণ ও ইজারা খাতে ২ হাজার ৯ শত ৫০ কোটি ডলার দেওয়া হইয়াছে, তাহার পক্ষে পুনরায় এখানে আসিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতে কতখানি আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদানের প্রয়োজন?

অবশ্য ব্যবসাদার জাতি হিসাবে এবং অর্থবান উত্তমণ হিসাবে ঋণ প্রদানের পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে ব্রিটেনের ঋণপরিশোধে শক্তির পরিচয় লাভে সচেষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই ভাবে ব্রিটেনের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মধ্যস্থ হইয়া ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির নিকট জমিয়া উঠা ঋণ নাকচের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে তাহার ফলে ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশ নিঃসন্দেহে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রিটেনের নিরুপায়তার সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যিক সুবিধা লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, তাহার আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করিতে নিজেদের প্রাপ্য অর্থ ফিরিয়া পাইবার আশায় তাহারা ব্রিটেনের দেনার পরিমাণ কমাইতেও ইচ্ছুক হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ আমেরিকার একান্ত মুখাপেক্ষী ব্রিটেন নিজস্বার্থেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উপদেশানুসারে কাজ করিতে সচেষ্ট হইবে;—কিন্তু এদেশের ভবিষ্যত পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন সঞ্চিত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির দরুণ পাওনা টাকা হইতে ভারতবর্ষ যদি বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর আর্থিক দুর্দ্দশা ভবিষ্যতে অবশ্যই শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আসন্ন এই চরম দুর্ভাগ্য হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য ভারত সরকারের দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। গত যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের পাওনা ১৯০ কোটি টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছিলেন, এবারও যাহাতে অনুরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া ভারতের আর্থিক স্বার্থ বিপন্ন না হয়, সে বিষয়ে ভারত সরকারের অবহিতি অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে ভারতের শুভার্থী সকলেরই প্রবল আন্দোলন চালানো উচিত।

২৭. ৯. ৪৫

শ্রীশঙ্কর দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশঙ্কর দেব কাহারো মতে ১৩৭১ শকাব্দায় (১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসে, আবার কাহারো মতে ১৪০৩ শকাব্দায় (১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ফাল্গুন মাসে আবির্ভূত হন। কেহ কেহ ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্কর দেবের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন আসাম নওগাঁ জেলায় কুসুম্বর ভূঞা একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী ছিলেন। কুসুম্বর পুরুষানুক্রমে দেবী পূজক। বহুদিন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি শিব পূজার ফলে পুত্র লাভ করিয়া পুত্রের নাম রাখেন শঙ্কর। শঙ্কর দেবের জন্ম রাশি অনুসারে নাম গঙ্গাধর। শঙ্কর দেব বাল্যকালেই মাতৃহীন হন। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে শঙ্করের সংস্কৃত শিক্ষালাভের পর কুসুম্বর পুত্রের বিবাহ দেন। একটী কন্যা জন্মগ্রহণের পরই পত্নী স্বর্গগত হইলে শঙ্কর দেব তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল তীর্থ ভ্রমণের পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। রামচরণ ঠাকুরের মতে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে আড়াই মাসের পথ অতিক্রম করিয়া কোন স্থানে (গৌড়ে রামকেলিতে?) তিনি রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। রামচরণ ঠাকুর বলেন শঙ্কর দেবের সঙ্গে রূপ সনাতন সীতাকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপের পরমাসুন্দরী ভার্য্যার ব্যাকুলতায় শঙ্কর দেব তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। সীতাকুণ্ড হইতে গৃহে ফিরিয়া রূপ সনাতন সংসার ত্যাগ করেন। তীর্থ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন জোর করিয়া শঙ্করের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। অতঃপর রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে দেশত্যাগ করিয়া শঙ্কর দেব ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

ত্রিহুত নিবাসী জগদীশ মিশ্র নামক কোন পণ্ডিত জগন্নাথ দেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শঙ্কর দেবের সাক্ষাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে আসেন, এবং পাঠান্তে আসামেই স্বর্গগত হন। তাহার পর হইতেই শঙ্কর দেব ভাগবত আলোচনা এবং অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই সময় শঙ্কর দেবের পুরোহিত রামগুরুর জামাতা কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন কালে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া শঙ্কর দেবকে উপহার দেন। আহোম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, এই সময় তাঁহার সহিত মাধব দেবের সাক্ষাৎ হয়, মাধব দেব তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন, এই মাধব দেবই শঙ্কর দেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। শঙ্কর দেব ও মাধব দেব উভয়েই কায়স্থকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণে অহোম রাজ শঙ্করদেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে তিনি কোচ রাজ্যে গিয়া বড়পেটায় বসতি স্থাপন করেন। কোচরাজ নর নারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজের সঙ্গে শঙ্কর দেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়, তজ্জন্য রাজ সভায় তিনি প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণ সময়ে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। শঙ্কর দেব হরিলীলাবিষয়ক ছয় খানি একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে সীতা স্বয়ম্বর নাটক সেনাপতি শুক্লধ্বজের আদেশে রচিত। নাটকগুলি "অঙ্কিয়া নাটক" নামে পরিচিত। শঙ্কর দেব ১৭২টী কীর্ত্তন গীতে সংক্ষেপে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুবাদ করেন। বাঙ্গালায় পদাবলী যেমন কীর্ত্তন নামে আখ্যাত, আসামেও এই গীতগুলি তেমনই কীর্ত্তন নামেই প্রচলিত। ভাগবতের অনুবাদে তিনি বলিয়াছেন—

কিরাত কচারি খাসি গারো মিরি
যবন কঙ্ক গোয়াল।
আসাম মুলুক রজক তুরুক
কুবাচ ম্লেচ্ছ চণ্ডাল॥
অনো পাপীনর কৃষ্ণ সেব কর
সঙ্গত পবিত্র হয়।
ভকতি লভিয়া সংসার তরিয়া
বৈকুণ্ঠে সুখে চলয়॥

অন্যত্র তিনি উপদেশ দিয়াছেন—

ওবা নরলোক হরি ভজিয়োক
শুরো ইটো উপদেব।
এরা আলজাল জীবাকত কাল,
জরা ভৈল পরবেশ।
অন্য দেবী দেব ন করিবা সেব
না খাইবা প্রসাদ তার।
মূর্ত্তিকো না চাইবা গৃহে না পশিবা
ভক্তি হৈব ব্যাভিচার॥

গানে এবং অভিনয়ে তিনি ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে ১৪৯০ শকাব্দের (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) ভাদ্র শুক্লা দ্বিতীয়ায় কুচবিহারে তিনি তিরোহিত হন। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, শঙ্কর দেব আচার্য্য অদ্বৈতের শিষ্য, তিনি জ্ঞানবাদ প্রচার করায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন। আচার্য্য অদ্বৈত দীর্ঘজীবী ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালেই তিনি যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের জীবদ্দশাতেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভু অপেক্ষা শঙ্কর দেব বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত শঙ্কর দেব অপেক্ষাও বয়সে বড় ছিলেন ইহা অনুমান করা চলে। গুরুশিষ্য সমবয়সীও হইয়া থাকেন। ইহাও সেকালে একালে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গালার প্রবাদ বিশ্বাস করিলে বিশেষ অসঙ্গতি ঘটে না। মহাপ্রভুর মত শঙ্কর দেব মধুর ভক্তির প্রচারক ছিলেন না। তিনি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করেন। আমরা নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকরে (দ্বাদশ তরঙ্গ) এক শঙ্করের কথা পাইতেছি।

অদ্ব�ৈতাচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞান পক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধ মুক্তি কৈনু এ প্রকারে॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেঁহো না ছাড়ে অদ্বৈত তারে ত্যাগ কৈলা॥

ইনিই আসামের ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীশঙ্কর দেব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। পত্নী বিয়োগের পর তীর্থ পর্য্যটন কালে তিনি বাঙ্গালায় নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে আসিয়া কিছুদিন অদ্বৈতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য দেবের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে অথবা শ্রীবৃন্দাবন হইতে অরণ্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহার আসামে যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। আসামে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির বিখ্যাত, মণিকুট পাহাড়ের নীচে একটা গুহা "চৈতন্য গোফা" নামে পরিচিত। শ্রীক্ষেত্রে শঙ্কর দেব ও চৈতন্য দেবের মিলন সম্বন্ধে দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য গমন করন্ত।
কৃষ্ণ চৈতন্যর গিয়া থানক পাইলন্ত॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক।
না করিবা কেহো নমস্কার চৈতন্যক॥
যিটো জনে নমস্কার করু চৈতন্যক।
উলটায়া তেঁহো প্রণমন্ত সিজত্রক॥
মনে নমস্কার তাক্ষ করিবা এতেকে।
এহি বুলি শিখালন্ত লোক সমস্তকে॥
কৃষ্ণ চৈতন্য আছা মঠর ভিতর।
ব্রহ্মচারী কহিলন্ত আসিছা শঙ্কর॥
শঙ্করের নাম শুনি কৃষ্ণ চৈতন্যর।
মিলিল আনন্দ বাজ ভৈলন্ত মঠর;
দুহার মুখ তরহি আছিলন্ত চাই।
দুয়ো নয়নর নীর ধারে বাহি যাই॥
শঙ্করো নয়নর নীর বহে ধারে।
পথ হন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥
কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে।
পশিলা মঠত গিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে॥
না মাতিলা দুইকো দুই না দিলা উত্তরে।
পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্করে॥

দ্বিজভূষণ কবিও লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বঞ্চিলন্ত॥
চৈতন্য গোসাঞি তথা ভৈলা দরশন।
দুইকো দুই চাহিলা নহিলা সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মাত্র দুই চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে পশিলন্ত॥

শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্কর দেব শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। প্রথম স্কন্ধ ও দ্বিতীয় স্কন্ধ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্কন্ধের অংশ, দশমের বাল্যলীলা ও একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধের অংশ শঙ্কর দেবের অনুবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অপরাপর অংশ ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শঙ্কর দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই; কেলি গোপাল বা রাস-ক্রীড়া নাটকে তিনি শ্রীরাধার অবতারণা করিয়াছেন। এই নাটকে জয়দেবের "রাধা মাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী" শ্লোকের অনুকরণে শঙ্কর দেব লিখিয়াছেন—"রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ যোষিতঃ"।

আসাম জোড়হাটের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ শঙ্কর দেব রচিত কয়েকটী কীর্ত্তন "শ্রীশঙ্কর দেবর বর গীত" নামক সঙ্কলনে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি

প্রকাশিত হওয়ায় অসমীয়া ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় লাভ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য দেবের সম-সময়ে রচিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদের সঙ্গে আলোচ্য পদ গুলির বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগ কেদার

ধ্রু,—পায়ে পড়ি হরি করহোঁ কাতরি
প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয় বিষধর বিষে জর জর
জীবন না রহে মোর ॥
পদ,—অথির ধন জন জীবন যৌবন
অথির এহু সংসার।
পুত্র পরিবার সবহি অসার
করবোঁ কাহেরি সার ॥
কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল
থির নহে তিল এক।
নাহি ভয়ো ভব ভোগে হরি হরি
পরম পদ পরতেক ॥
কহতু শঙ্কর এ দুঃখ সাগয়
পার করু হৃষীকেশ।
তুঁহু গতি মতি দেহু শ্রীপতি
তত্ত্ব পন্থ উপদেশ ॥

উদ্ধৃত পদ সুপ্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে" পদটীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রাগ আসাবরি

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—
ধ্রু,—বালক গোপালে করতরে কেলি।
উচ্চায়া পাচনী নাচে হাসে গোপমেলি ॥
পদ,—নীল তনু পীত পট ধটি লটি লোর।
নব ঘন ঘন যৈচে বিজুলী উজোর ॥
শিরে শিখগুক দোলে গলে গজমতি।
কোটি মদন মনোমোহন মুরুতি ॥
চরণে মঞ্জীর ঝুরে উরে হেমহার।
শঙ্কর কহ ওহি হরিক বিহার ॥

শঙ্কর দেবের একটী পদে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সন্ধান পাওয়া গেল। কংস কারাগার হইতে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব নন্দালয়ে যাত্রা করিলেন। ছয় পুত্রহারা-দেবকীর সে দিনের দুঃখের কাহিনী কোন কবি বর্ণন করেন নাই। শঙ্কর দেব একটী পদে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন—

রাগ ধানশ্রী

ধ্রু,—হরিকে বয়ন হেরি মাই
ফোকারয় শ্বাস নীর নয়ন ঝুরাই ॥
পদ,—আজু জনমি সুত গেয়ো পরদেশ।
কতনা বিহিল বিধি অভাগীক ক্লেশ ॥
বিনে তুহো রহব জীবন নাহি মোই।
কহ শঙ্কর কৃষ্ণ বল সব লোই ॥

শঙ্কর দেবের উদ্ধব সংবাদের পদে গোপী-বিরহের যে মর্ম্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেই তাহা তুলিত হইতে পারে ॥

রাগ তুর বসন্ত

ধ্রু,—কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে
প্রাণ কৃষ্ণ কবে আবে।
পুছয়ে গোপী প্রাণ আকুল ভাবে
নাহি চেতন গাবে ॥
পদ,—বাঁশরী ধ্বনি শুনি গো বৎস দেখি।
লাগে আগি গায়ে উদ্ধব সখি ॥
কালিন্দী দেখি সখি ফুটয়ে বুক।
হেথায়ে খেলায়াছিলা সে চান্দমুখ ॥
হরিল নয়ন সুখ ॥
বিরিন্দাবন বৈরী হামারি ভেলি।
দেখিতে না বিছরোঁ গোপাল কেলি ॥
ধ্বজ, বজ্র, যব, পঙ্কজ চায়ি।
তথায়ে কান্দোঁ হামু লোটায়া কায়ি ॥
গুণ গোবিন্দ গায়ি ॥
কৃষ্ণ সূর্য্য বিনে ব্রজ আঁধার।
নে দেঁখো এ দুখ অম্বুধি পার ॥
আর কি দেখবো গোপাল প্রাণ।
কৃষ্ণ কিঙ্কর শঙ্কর এহুঁ ভাণ ॥
হরিক হৃদয়ে জান ॥

এই ধরণের পদগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীবিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশা গাবো বেণুরবাইমে।
সঙ্কর্ষণ সহায়েন কৃষ্ণে নাচরিত প্রভো ॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তী নন্দগোপ সুতং যত।
শ্রী নিকেতৈ স্তৎ পদকৈ বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥
গত্যা ললিতয়োদার হাস লীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরাম হে ॥

মিথ্যা কথা বলা

যাদুকর পি-সি-সরকার

অনেকেই আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে যাদুকরেরা বেশী বেশী মিথ্যা কথা কহে। কথাটা খুবই সত্য! যাদুবিদ্যার ভিত্তিই যে ঐ মিথ্যাভাষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্যাপারটাই যে আগাগোড়া ফাঁকি, যে ব্যক্তি একশত টাকার নোট ছিঁড়িয়া, পুড়াইয়া দিতে পারে, সে সামান্য কয়েক টাকার জন্য এত পরিশ্রম করে কেন? যে মুহূর্ত্তে হাজার হাজার টাকা তৈয়ার করিতে পারে, টাকার বৃষ্টি নামাইতে পারে সে সামান্য কয়েক টাকার জন্য খেলা দেখাইয়া বেড়ায় কেন? আসলে ব্যাপারটাই ফাঁকি। যাহা দেখান হইতেছে সবই মিথ্যা। জগতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতারক ও মিথ্যাবাদীর উপর আমরা চটা, কিন্তু যাদুকর নামক এক শ্রেণীর প্রতারকের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান। এই যাদুকরদের মধ্যেই হয়ত অনেকে শঠশ্রেষ্ঠ হইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না। এই মিথ্যা কথা বলারও নানাবিধ দিক আছে—(১) করণীয় কার্য্য সম্বন্ধেই মিথ্যাভাষণ, যেমন গলা কাটিয়া জোড়া দেওয়া ইত্যাদি। এখানে সকল লোকেই জানেন যে গলা কাটিলে মানুষ কখনও জীবিত থাকে না বা থাকিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত শিক্ষিত সুসংস্কৃত দর্শকই যাদুকরের ঐ ফাঁকিতে পড়িয়া থাকেন এবং যাহা অসম্ভব তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। (২) প্রদর্শনকালে মিথ্যা কথা বলা—যেমন হাতের পশ্চাতে অথবা আঙ্গুলের ফাঁকে টাকা, পয়সা, তাস লুকাইয়া রাখিয়া দর্শকদিগকে বলা যে এই দেখুন আমার হাত একেবারে খালি! ইত্যাদি। দর্শকগণ সাধারণ দৃষ্টিতে আপাততঃ হাত খালি দেখিয়া বিশেষ করিয়া যাদুকরের উপর নির্ভর করিয়া হাত খালিই মনে করেন এবং পরে বোকা প্রতিপন্ন হন। (৩) যাদুকরের নাম বাসস্থান বা আত্ম পরিচয়েই ফাঁকি। এই ধরণের মিথ্যাভাষণ আমাদের দেশে খুব কমই দৃষ্ট হয় তবে ইউরোপ আমেরিকা অঞ্চলে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমেরিকান যাদুকর রবিনসন সাহেব মুখে রং মাখাইয়া ইউরোপে যাইয়া নাম লইলেন চাই-নিজ যাদুকর 'চাং লিং সু'। তিনি তাঁহার বাসস্থান চীনদেশে এবং নিজে প্রকৃত চাইনিজ বলিয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করেন। বলাবাহুল্য পৃথিবীর বহুদেশই তাঁহার এই ফাঁকির ফাঁকে পড়িয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানেন না। যাদুকর করাচী ও তৎপুত্র কাদের নিজেদিগকে ভারতীয় পরিচয় দিলেও আমরা জানি তাঁহারা প্লিমাউথ (Plymouth) নিবাসী ইংরেজ এবং প্রকৃত নাম মিষ্টার ডার্ব্বি। যাদুকর 'ওকিটো'ও তৎপুত্র 'ফু: মানচু' নিজেদিগকে চাইনিজ পরিচয় দিলেও আমরা জানি তাঁহারা ডেভিড ও থিয়োডোর ব্যামবার্গ নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের নিবাস হল্যাণ্ড (Holland)। যাদুর খেলা দেখাইতে এ সমস্তর কতটা প্রয়োজন জানি না, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরদিগকেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যার আশ্রয়ে যাইতে দেখিয়াছি। আমেরিকানগণ বলেন প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যবসায়ী যাদুকরদিগের ঐ মিথ্যাভাষণ অন্যায় নহে। (Some concessions must be given to them) তাঁহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া উচিত। আজকাল বিজ্ঞাপনের বাজারে হয়ত ইহা চলন হইতে পারে কিন্তু আমি ইহার আরও কারণ খুঁজিয়া পাই। আমাদের যাদুবিদ্যার গোড়াতেই গলদ। প্রকৃত 'যাদু' বা 'ইন্দ্রজাল' বিদ্যা বলিয়া যাহা খ্যাত অধিকাংশ যাদুকরগণই উহা করেন না—হয়ত কেহই করেন না। আমরা যাহা করি উহা যাদুবিদ্যার অভিনয় মাত্র—"an actor playing the part of a magician." আমরা ঐশ্বরিক অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকরের অভিনয় করি মাত্র। বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আগত যান্ত্রিক কৌশল জাত খেলা সম্বন্ধে এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইহা থিয়েটারের কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাদুকর মন্ত্র (?) পাঠ করিতেছেন এবং রঙ্গমঞ্চে একটি জিনিষ আস্তে আস্তে শূন্যে উঠিতে আরম্ভ করিল দর্শকগণ যাদুকরের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হইয়া করতালি দিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেহই জানেন না যে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎ হইতে সুতা টানিয়া যাদুকরের সহকারীই সমস্ত করিতেছে—যাদুকরের নিজের কোন ক্ষমতাই নাই। যাদুকর যে থিয়েটারের অভিনেতার ন্যায় একজন ইহা এখান হইতেই বিশেষভাবে সূচিত হয়।

মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ আমরা সকলেই অপছন্দ করি কিন্তু এই মিথ্যাই যখন ছদ্মবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন আমরা ইহাকে চিনিতে পারি না। সিনেমার ছবিতে দুঃখের কাহিনী দেখিয়া কত দর্শককে কাঁদিয়া আকুল হইতে দেখা যায়। মূলতঃ উহা যে ছবি এবং কাল্পনিক ঘটনা আমরা ভুলিয়া যাই। দেবদাসের মৃত্যু ও পার্ব্বতীর করুণ ক্রন্দন আমাদের মনে রেখাপাত করে কারণ আমরা চিত্রবর্ণিত এক একজন নায়ক নায়িকার সমর্থক হইয়া উঠি এবং অন্তরের মিল খুঁজিয়া পাই। এখানে স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হইয়া উঠে—কাজেই ঐরূপ হয়। উন্নতমনা দেশহিতৈষী দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে জুতা ছুড়িয়া মারিবেন বিচিত্র কি? প্রত্যেক মিথ্যাভাষণের পশ্চাতের এইরূপ স্বার্থের প্রশ্ন যে কোন ভাবেই হউক জড়িত আছে। কলিকাতায় যাঁহারা দোতালা বাসে উঠিয়াছেন তাঁহারা বাস কণ্ডাক্টরের বুলি "উপরমে যাইয়ে—একদম খালি হায়!" নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে হয়ত দোতলা অপেক্ষা নীচের তলাই তখন বেশী খালি রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে নীচের তলায় ও সিঁড়িতে ভীড় জমাইয়া নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি না করাই তাহার উদ্দেশ্য। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আরও বহু মিথ্যাভাষণ

আমাদের নজরে আসে। ট্রেণে একটি কামরায় উঠিতে গেলেই সকলে চীৎকার করিয়া উঠেন—"মশাই, এখানে জায়গা নাই, সামনে কয়েকটা গাড়ীর পর একেবারে খালি কামরা পাবেন।" অপরপক্ষে কেহ যদি বেঞ্চ দখল করিয়া শুইয়া থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুনিতে পাইবেন —হয় তাঁহার শরীর অসুস্থ নতুবা তিনি ভীষণ দীর্ঘপথের যাত্রী. গত কয়েক রাত্রি ঘুম হয় নাই ইত্যাদি। প্রেম ও যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যার আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেথানে কিছুই "unfair" নহে, কাজেই অপরপক্ষকে বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করাই শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের সময় এক পক্ষ যদি আক্রান্ত হয় তখন ক্ষতির পরিমাণ 'সামান্য' হয়; কিন্তু নিজেরা যখন আক্রমণ করেন তখন 'ভীষণ' হয়। ওপক্ষের লোকের মৃত্যু তালিকা যেরূপ প্রকাশিত হয় অনেক সময় তাহা যোগ দিয়া চলিলে হয়ত জনসংখ্যা সে দেশের বহুগুণ বেশীই প্রমাণিত হইবে। প্রেমের ব্যাপারেও তাহাই—উচ্ছ্বাসের সহিত কত কথাই বলিতে শুনা যায় কিন্তু কার্য্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য খুবই কম। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা কত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি তাহার খোঁজই রাখি না। নিজে আলস্যবশতঃ পত্রের উত্তর না দিয়া লিখিতে আরম্ভ করি "নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।" বরপক্ষ মেয়ে দেখিয়া আসিবার সময় সকলেই পছন্দ করেন এবং বাড়ীতে যাইয়া মতামত জানাইবেন বলিয়া যান। কিন্তু প্রকৃত সত্য গোপনই থাকিয়া যায়। অফিসের কর্ম্মচারী সাতদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী গেলেন, সেথানে যাইয়া সাংসারিক কাজে ব্যপৃত রহিলেন, তখন বড় সাহেবের নিকট তার আসিল "ভীষণ অসুস্থ ছুটির extension চাই।" বাড়ীর চাকর অন্যত্র চাকুরী পাইল অথবা অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন, একটি চিঠি বা টেলিগ্রাম আনিয়া হাজির করিল "মুলুকমে তাহার স্ত্রী বা বিশেষ আত্মীয়ের ভীষণ অসুখ, যাওয়া প্রয়োজন।" ইনকমট্যাক্স দিবার সময় প্রায় সকলকেই দেখা যায় নিজের আয় দেখাইতে চাপাচাপি করেন। সব চাইতে মজা হইল রাজনৈতিক কারণে যখন নেতারা না মরিয়াও খবরের কাগজ মারফৎ পুনঃ পুনঃ মারা যান এবং জীবিত হন। এরূপ দৃষ্টান্তেরও আজকাল অভাব নাই। আজকাল সভ্যসমাজে 'ইলেকসন প্রপাগণ্ডা,' নামে একশ্রেণীর নির্জ্জলা মিথ্যাকথা প্রচারের সুযোগ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কত শ্রেণীর মিথ্যাই ইহার নামে চলিয়া যায় তাহা বাস্তবিকই কৌতুকপ্রদ। দেশ-বিশেষকে স্বরাজ স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি দিবার কথাও কতভাবে শুনা যায় —ইহাও যে কতদূর সত্যভাষণ কালই প্রমাণ করিয়া দিবে। বিশ্লেষণ করিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায় স্বার্থের সঙ্গে মিথ্যাকথা বলার সম্পর্ক যথেষ্ট। আমার এক বন্ধুর গল্প মনে পড়িতেছে। আমার এক বন্ধুকে একজন ভদ্রলোক একটা অচল দুয়ানী দিয়াছিলেন। বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিলেন "ভাই কালে কালে হইল কি? জগত হইতে সত্য কি উঠিয়া গেল? নতুবা একজন দিব্যি ভদ্রলোকের ছেলে আমাকে একটা অচল দুয়ানী গছাইয়া গেল।" আমি কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দেখি ভাই তোমার অচল দুয়ানীটা"—তখন তিনি বলিলেন "সেটি কি আর রাখিয়াছি নাকি! সঙ্গে সঙ্গে আলুওয়ালার নিকট আলু কিনিয়া চালাইয়া আসিয়াছি।" হাসিয়া ফেলিলাম মুহূর্ত্ত আগে যেটি তাঁহাকে 'গছান' হইয়াছিল সেটিকে তিনি নির্ব্বিবাদে 'চালাইয়া' আসিলেন। স্বার্থের খাতিরে একই ব্যাপার এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

বাল্যকালে প্রথমভাগে পড়িয়াছিলাম 'কদাচ মিথ্যাকথা কহিও না' এবং 'মিছাকথা কহা বড় দোষ। আজ দেখিতেছি কথাটাই ফাঁকিতে ভরা। আধুনিককালে ফুলের চেয়ে ফুলকপির দাম বেশী—কাজেই "নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও,—বাকীর খাতায় শূন্য থাক" নীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুজগতে, রাজনীতিতে, প্রেমে, সংসার পরিচালনায় সর্ব্বত্রই মিথ্যার প্রভুত্ব। স্বার্থ যতদিন প্রবল থাকিবে মিথ্যার প্রচার ও প্রসার ততদিন থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নমঙ্গলে পড়িয়াছিলাম—"বিশ্বে কভু বিশ্বভেবে হবে না ঠকিতে, সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।...জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়, স্বপ্নশুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।" হিং টিং ছটের ঐ উপদেশ দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

জিজ্ঞাসা

শ্রীপরেশ ধর এম্-এ

ভগবান, মোরা দয়া চাইনে কো, খেতে যে চাই
আস্তাকুঁড়ের ও দুটি ভাতে কি পেট ভরে?
লেড়ী কুকুরের জ্বালায় তাও তো জোটে না ছাই
জানিনে কো আজ অভিশাপ দেব কার পরে।
ভগবান, তুমি দুনিয়ার কিছু জানো না যে
আকাশে বসে কি মানুষ-কীটের খবর পাও?
মহাশূন্যের আছে মৃদুনীল চাঁদোয়া যে—
এখানে রৌদ্রে, ব্যধিতে, ক্ষুধায় নিদ্ উধাও।
ড্রেনের পাশেই পোকা-কিলবিল্ গলিত ভাত
তারি তরে মোরা করি যে ঝগড়া হানাহানি

কারো নাক নেই, কারো ঠ্যাং, কারো একটি হাত
তুচ্ছ ন্যাকড়া, ভাঁড়, ইঁট, নিয়ে টানাটানি।
কালো ময়লায় সারা দেহ ঢাকা চামড়া ক্ষয়;
চোখের ঘোলাটে আলোর কামনা কামনাহীন
তেলছাড়া চুলে জড়াজড়ি জট্-ধুলোয় ময়
আঙুলের ডগা কুষ্ঠে খেয়েছে-আয়ু যে ক্ষীণ।
অনুভূতি নেই—শুধু আছে এক ক্ষুধা বিষম!
ভগবান, তুমি আকাশ-প্রাসাদে নাক ডাকাও
দুনিয়াময় ত সোনালি শস্য কত রকম—
শুধু কি মোদের ভাগ নেই তাতে বলতে চাও?

খেলা ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ঃ

আরসানাল এবং ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটোনের অধিনায়কত্বে সার্ভিস টুরিষ্ট একাদশ দল একটি বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান ক'রে আই এফ এ একাদশ দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে। সার্ভিস দলটিতে ডিচবার্ণ (স্পার্স এবং ইংলণ্ড), মেওয়ার্ড (ব্ল্যাকপুল এবং ইংলণ্ড) এবং ডেনিস কম্পটোন (আরসেনাল এবং ইংলণ্ড) এই তিনজন ইংলণ্ডের ইণ্টার ন্যাশানাল ফুটবল খেলোয়াড় ছাড়া আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ইংলিস এবং স্কটিশ ফুটবল খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল তাঁরা আমাদের দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের খেলার পার্থক্যের পরিচয় পেয়েছেন। ইতিপূর্ব্বেই সার্ভিস দলের খেলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আলোচ্য প্রদর্শনী খেলায় আই এফ এ দলে এ বছরের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় যোগ দিতে পারেন নি। তার ফলে দল মনোনয়ন খুব ভাল হয়নি। আই এফ এ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝপড়ার অভাব সব থেকে বেশী চোখে পড়েছে। সমস্তক্ষণ খেলার মধ্যে আই এফ এ দল মাত্র দু'বার গোল দেবার সুযোগ পায় এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। রক্ষণভাগে ডি সেনের চমৎকার খেলার জন্যেই গোলের সংখ্যা কম হয়েছে। ৫টি গোলের জন্য তাঁকে দোষী করা যায় না, এর জন্য দায়ী সমস্ত দল, বিশেষ করে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা। গত ৬০ বছরের উপর আমরা এই বিদেশী ফুটবল খেলা চর্চা করছি এবং আমাদের দেশের কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের কথা ভুলতে পারি নি। সার্ভিস দলের খেলা দেখে আমাদের অনেক ধারণা বদলাতে হবে তা না হলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন দিন উন্নত হবে না। কখনও কোন খেলোয়াড় তার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার জন্য খেলবে না, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দলের জন্যে খেলতে হবে এবং নিজে গোল দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা না করে দলের অপর খেলোয়াড়কে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ দিতে হবে। নিজের ক্রীড়াচাতুর্য্যের উপর উচ্চ ধারণা রেখে দলের অপর খেলোয়াড়কে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা দলেরই পক্ষে ক্ষতিকর; আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের এই নীতির জন্যই সমস্ত দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার একান্ত অভাব দেখা যায় ফলে খেলা মোটেই দর্শনীয় হয় না। কেবল দু'চার জন ভাল খেলোয়াড় হলেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাল হয় না। 'টিম ওয়ার্ক'ই হচ্ছে প্রধান।

সার্ভিস একাদশের খেলায় প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের খেলা লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই সমস্ত দলের জন্য খেলছে এবং এই খেলার মধ্যেই খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পরিচয় পরিস্ফুট হচ্ছে, নিজের থেকে হাততালি পাওয়ার চেষ্টা নেই। নিখুঁত বল পাশ এবং পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া সমস্ত খেলাটি দর্শকদের উপভোগ্য করে তুলেছিল। বুট পায়ে বল ড্রিবলিং কত দর্শনীয় এবং কার্য্যকরী হতে পারে তার পরিচয় দেন ডেনিস কম্পটোন। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে দিয়ে যেখানে পা দিয়ে বল পাশ করা নিখুঁত হবে না বুঝেছে সেখানে মাথা পেতে দিয়ে দলের খেলোয়াড়কে তারা বল দিয়েছে। খেলায় stereotype পদ্ধতি অবলম্বন না ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি

অবলম্বন ক'রে দর্শকদের মনে শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা খেলার বিভিন্ন অবস্থায় তৎপরতার সঙ্গে কোন মীমাংসায় পৌছতে পারে না। সার্ভিস দলের খেলোয়াড়দের সুবিন্যস্ত পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়রা কোন রকমে নাগাল পায়নি। ছত্র ভঙ্গ অবস্থায় তাদের মাঠে খেলতে হয়েছিল। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং ক্রীড়াচাতুর্য্য ছাড়া বিদেশী ফুটবল খেলোয়াড়রা দৈহিক-গঠনে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় বহুগুণে উন্নত ছিল। পৃথিবীর ফুটবল খেলায় প্রাধান্য লাভ করতে হলে আমাদের খেলোয়াড়দেরও যে অটুট দেহের অধিকারী হ'তে হবে সেদিন আমরা সর্ব্বক্ষণই অনুভব করেছিলাম।

কিন্তু যে দেশের খেলোয়াড়দের সামান্য বেতনে অফিসের চাকরী করে পরিবার প্রতিপালন করতে হয় সে দেশের খেলোয়াড়দের খেলার উপযোগী দেহ ও মন তৈরী করা যে কতখানি বিড়ম্বনা তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। খেলার উন্নতির জন্য খেলোয়াড়ের সময়, অর্থ এবং উৎসাহের প্রয়োজন। যারা খেলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের পক্ষেই এ সব সম্ভব।

ভিক্টরী কাপ ঃ

কলকাতায় ভিক্টরী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এই প্রথম। যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব সৈন্যদল ভারতে এসেছে তাদের বিভিন্ন আর্মি ফুটবল টিম এবং কলকাতার প্রথম বিভাগের প্রথম আটটি ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সেই দিক থেকে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

ভিক্টরী কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৪-১ গোলে তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যালকাটা ক্লাবকে হারিয়ে ভিক্টরী কাপ বিজয়ের প্রথম গৌরব লাভ করে। ফাইনাল খেলাটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। মোহনবাগান এবং ক্যালকাটা উভয় দলই নিজ নিজ স্বজাতির মধ্যে জনপ্রিয় এবং অন্যতম প্রাচীন দল।

একদিকে ভারতীয়দল, বিপরীত দিকে ইংরেজদল। উভয় দলই পরস্পরের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্থানীয় ক্লাব। সুতরাং স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই খেলার আকর্ষণ খুবই বড়।

সেমিফাইনালে ক্যালকাটা ১-০ গোলে ১০১ বি মিলিটারী দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। এ বছরের লীগ-শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই ১০১ বি মিলিটারী দলের কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায়।

মোহনবাগান ক্লাবকে বি এ্যাণ্ড রেল দল, ভবানীপুর এবং মহমেডানস্পোর্টিং ক্লাব এই তিনটি পুরাতন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারিয়ে ফাইনালে যেতে হয়।

ফাইনাল খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব বিজয়ী হয়। বিজন বোস একাই তিনটি গোল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এবার লীগ এবং শীল্ডের খেলাতেও ক্যালকাটা ক্লাব তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের ফাইনালে আশুতোষ কলেজ ১-০ গোলে বিদ্যাসাগর কলেজকে হারিয়ে এ বছর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

ইলিয়ট শীল্ডের ফাইনালে সিটি কলেজ ৩-১ গোলে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজকে হারিয়ে এ বছর ইলিয়ট শীল্ড পেয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ গত দু'বছর পর্য্যায়ক্রমে শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল। সিটি কলেজের বি মুখার্জি একাই দলের ৩টি গোল করেন।

ইংলণ্ড বনাম আয়ারল্যাণ্ড ঃ

এক আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড ১-০ গোলে আয়ারল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

কে এস দিলীপসিং জী ঃ

কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি, সাসেক্স এবং ইংলণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে এস দিলীপসিংজীকে 'ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবে'র সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়েছে।

ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফুটবল ঃ

ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হাওড়া ২-০ গোলে বর্দ্ধমানকে হারিয়ে রেঞ্জার্স জুবলী কাপ

পেয়েছে। গত বছরের ফাইনালে খুলনা জেলার কাছে হাওড়া পরাজিত হয়েছিল।

কুচবিহার কাপ ঃ

কুচবিহার কাপের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে এ বছর কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের মহাবীর একাই দলের ৩টি গোল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যায়, এ বছর এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তিন দিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে চতুর্থ দিনের খেলায় ৩-২ গোলে মোহন-বাগানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশের যুবকদের খেলা-ধূলায় যেমন উদ্দীপনা ছিল তার একান্ত অভাব গত কয়েক বছর দেখা দিয়েছে। বাঙ্গলা দেশের স্কুল ও কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য বাঙ্গালী জাতির দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলার ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন।

সকল ছাত্রছাত্রীই যোগদান করতে পারে এমন ব্যবস্থা কোথাও নেই কিম্বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা খেলা-ধূলায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা এ পর্য্যন্ত কোথাও করা হয়নি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল ছাত্রদের খেলাধূলায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এমন অনেক ব্যয়াম আছে। সে দিক থেকে কোন বাধা নেই। আমাদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার উৎসাহ কমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া বিবেচনা বোধ করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব 'Students welfare Society' আছে। এই সমিতির একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কাজের কোন দৃষ্টান্ত আমরা পাইনা। এই সমিতিরই রিপোর্টে প্রকাশ, ভগ্ন-স্বাস্থ্যহেতু দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহু। তাছাড়া দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের কারণে আরও আধি ব্যাধি আছে। রিপোর্টে এ খবর প্রকাশ করা যেমন তাঁদের কর্ত্তব্য তেমনি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের এই অবস্থায় কি ভাবে রক্ষা করা যায়। সেইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

* * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয় কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং তার ফলাফল প্রকাশ করা। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও যথেষ্ট গলদ যেমন রয়েছে তেমনি এই পদ্ধতিই আমাদের ছেলেমেয়েদের ভগ্নস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ হয়েছে। স্তূপীকৃত পাঠ্যপুস্তক উদ্ধার করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেবল অকৃতকার্য্যই হচ্ছে না, অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ছে। যে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অসাফল্যের সংখ্যা সব থেকে বড় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাই প্রধান কারণ, না শিক্ষাপদ্ধতির গলদ—এ অনুসন্ধান করার দায়িত্ব ছাত্রদের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষাক্ষেত্রে এর থেকে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে। বাঙ্গলা দেশের ছেলেমেয়েদের এই ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং যুবকদের কর্ত্তব্য আছে তেমনি কর্ত্তব্য বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের। সরকারী সাহায্য ছাড়া এরূপ একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

* * * *

ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও আজ বাঙ্গলা দেশের সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং এই ফুটবল খেলাকে জাতীয় খেলা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বাংলা দেশের কয়েকটি নামকরা ফুটবল প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছর অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের দলে খেলবার সুযোগ দিয়ে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের কি ভাবে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তার পরিচয় নতুন করে দিতে হবে না। শীল্ড এবং লীগ পাওয়াই যেন বেশীর ভাগ ফুটবল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে। কোন আদর্শ নেই বা কোন গঠন মূলক কাজের পরিকল্পনা নেই। যে কোন প্রকারে জিত হলেই হ'ল।

অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের আমদানিতে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার উৎসাহ কমে যাচ্ছে। অথচ ক'লকাতায় খেলবার সুযোগ পাওয়াতে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুটবল খেলার বেশ একটা আমেজ এসে গেছে। সমস্ত ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী যদি

খেলোয়াড় আমদানির মনোভাব ত্যাগ না করেন তাহলে নিকট ভবিষ্যতে ফুটবল খেলায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আর কিছুই থাকবে না।

* * * *

বিলেতে সখের এবং পেশাদার এই দুই শ্রেণীতে খেলোয়াড়দের ভাগ করা হয়েছে। বিলেতে নানা দেশ থেকে খেলোয়াড়দের টাকা দিয়েও খেলার জন্যে আমদানী করা হয়। কিন্তু সেখানের ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ভাল খেলোয়াড়দের দিয়ে ভাল খেলোয়াড় তৈরী করা এবং খেলার আর্ট উপভোগ করা। এই দিক থেকে আমাদের এখানে খেলোয়াড় আমদানি করা হয় না।

এখানের ফুটবল মহলে এখনও পেশাদার প্রথার চলন হয়নি। অফিস, সংসার এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সখ করে খেলবার আগ্রহ আর কতদিন থাকে। ফুটবল খেলার উপযোগী শরীর রাখতে হলে পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। এ সমস্তই অর্থ ছাড়া পাওয়া যায়না বলেই আমাদের এখানের কোনো খেলোয়াড়ের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেশী দিন থাকে না।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান"—৩৲
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মন জানে"—৩৲
মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "মঞ্চে ও নেপথ্যে"—৩৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত "ঈশপের গল্প"—৸৹
শিবপদ দাস প্রণীত উপন্যাস "এ মেয়ে, মেয়ে নয়, মানসী"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "টাওয়ার অফ লণ্ডন"—২৷৹
রঞ্জিত সিংহ প্রণীত "ময়নামতীর দেশ"—১৲
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পে বাঙলার ইতিহাস "সোনার বাঙলা"—২৷৹
মৃগনাভি প্রণীত উপন্যাস "তাজমহলের দেশে"—২৲
শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায় প্রণীত "অভ্রছায়া"—২৲
কানাই বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রঙ ছুট"—১৸৹
বিটু মুখোপাধ্যায় অনূদিত উপন্যাস "অমর মানুষ"—২৷৹
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "মঞ্জুলিকা"—২৲
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রবি-রশ্মি" (২য় খণ্ড)—৬৲
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত "মরণ মেলার যাত্রী"—১৲
অতনু গুপ্ত প্রণীত "আবৃত্তি-ধারা"—১৷৹
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "চার পুণ্যস্থান"—১৲
শ্রীভৈরবানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীকালিকাকল্পামৃতম্"—২৲
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত "প্রাচ্যবাণীমন্দির প্রবন্ধাবলী" (১ম খণ্ড)—১৲
শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "জয়শ্রী"—২৲
গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সাম্প্রতিক শাসন সমাচার"—২৷৹
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ প্রকাশিত "বার্ষিক শিশুসাথী" (১৩৫২)—৩৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র"—১৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস—"ডাকাত-কালীর জঙ্গলে"—১৲
সুজিতকুমার নাগ ও শান্তি সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "আগমনী"—।৹
প্রশান্তি দেবী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "তমসাবৃতা"—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার প্রণীত "অরণ্যের অঞ্জলি"—১৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন সেন   আরতী   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

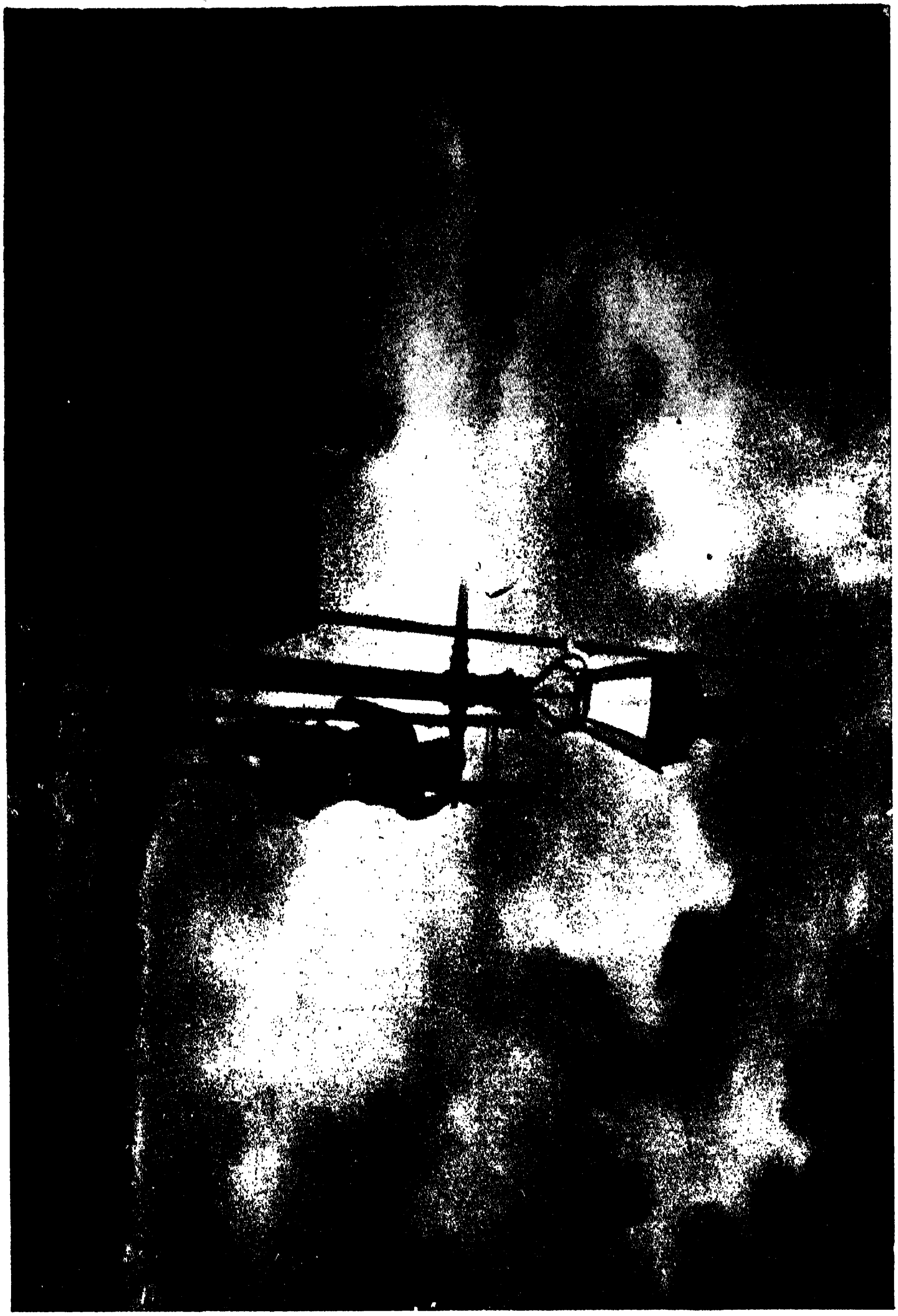

গিয়াছে। অনিল একটা বিস্কুটের টিন খুলিয়া লীলার হাতে একখানা দিয়াছে এবং আর একখানায় কামড় দিতেছে। এমন সময়ে বিমল বারান্দায় উঠিয়া হাঁকিল, অনিল!

এই যে এসেছ—বেশ। ওগো, এদিকে এস, দেখ কারা এসেছে।

অলকা বিমলের স্ত্রী রেণুকে পূর্বে দেখে নাই। বিমলের বিবাহ হইয়াছে সে সংবাদ জানে, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ এই প্রথম। রেণু অসামান্যা রূপসী। যেমন দেহের বর্ণ তেমনি চোখ মুখের শ্রী। একখানি চাঁপা রংয়ের ছাপা সিল্কের শাড়ীতে তাহাকে জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছে। অলকা অগ্রসর হইয়া রেণুর দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল—

আসুন, আমার কি সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

আমাকে 'আপনি' বল্‌বেন না অলকাদি, আমি আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাহলে তুমিও আমাকে 'আপনি' বল্‌তে পাবে না।

সকলেই ঘরে গিয়া বসিল। চেয়ার মাত্র দুখানা, তাই অনিল এবং অলকা বেঞ্চির উপরই বসিল। অনিল হাঁকিল টিকুয়া, চার কাপ চা ক'রে নিয়ে আয়।

চা আসিল। গল্প চলিতে লাগিল। অনিল কহিল, আচ্ছা বিমল, তোমরা ত প্রায় এক সপ্তাহ এখানে এসেছ, কেমন লাগ্‌ছে বল ত!

মন্দ কি। সহর থেকে এসে এখানে ত বেশ ভালই লাগ্‌ছে।

খুব নির্জন, না?

তা নির্জনই ভাল। মানুষের হট্টগোল ত বারমাসই আছে।

তা বটে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এতটা নির্জনতা ভাল নয়। অন্ততঃ নিজ পরিবারেও লোকজন বেশী থাক্‌লে অনেকটা ভাল লাগে।

কিন্তু ভাই, পিসী, মাসী, কাকী এসব নিয়ে বেড়াতে আসার চেয়ে, মোটে না আসাই ভাল। এরা সব থাক্‌লে এমন অবাধে বেড়ান বা বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সব মাটী। এই দেখ না, যদি মা বা কাকীমা সঙ্গে আস্‌তেন, তাহলে কি আর আমি নিঃসঙ্কোচে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ আলাপ কর্‌তে পার্‌তাম, না তুমিই পার্‌তে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে। একদিনের আলাপে ত নয়ই। একমাসের মধ্যেও হয়ত হ'ত না।

তোমার বাড়ীর লোকেরা বুঝি খুব সেকেলে?

সংসারে যত রকম লোক, তত রকম মত। নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চা খাওয়া শেষ করে চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌।

অলকা কহিল, হাঁ, চল, এঁদের সঙ্গেই আজ বেরোনো যাক্‌। আমরা ত কোন যায়গাই চিনি নে।

বিমল উত্তর দিল, এখানে চিন্‌বার বিশেষ কিছু নেই। অতি ছোট জায়গা। দুদিন বেড়ালেই সব দেখা হয়ে যাবে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে—আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, সে আর কি বল্‌ব।

সেটা উভয়তই।

অতঃপর চারজনে বেড়াইতে বাহির হইল। লাল রাস্তা ধরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। ষ্টেশনে একখানা ট্রেন আসিয়াছিল। তাহার যাত্রীদের ওঠানামার কলরব শেষ হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। যাহারা এখানে নামিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়টি ছেলে, কয়টি মেয়ে, তাহাদের লাগেজ কম কি বেশী, মেয়েরা সুন্দরী কি না, ইহারা চাকুরে না উকিল, ব্যারিষ্টার না জমিদার, প্রভৃতি নানা প্রকার অনুমান ও গবেষণা করিতে করিতে রেল লাইন পার হইয়া দোকান-গুলির পাশ দিয়া, পুকুরের পাড় ধরিয়া, লেভেল-ক্রসিং পার হইয়া চাকাই রোড ধরিয়া খানিকটা হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিল। পথিমধ্যে পরস্পরের সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ হইল। বন্ধুপত্নীর সহিত বিমল বেশ মিষ্ট দুই চারটি রসিকতাও করিল। রেণু তাহাতে একটু বিরক্ত হইলেও মুখে হাসি ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

উভয়ে বিদায় লইবার সময়ে স্থির হইল, আগামী শনিবারে হল্‌দি ঝরণায় চড়ুইভাতি হইবে। দুপুরে সেখানে যাইবে এবং সন্ধ্যায় ফিরিবে।

অনিল ও অলকা বাসায় ফিরিয়া দেখিল, লীলা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিয়া টিকুয়ার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

৩

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ভ্রমণ দৈনন্দিন কাজ। পথে প্রায় দুবেলাই বিমল ও রেণুর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হইলেই কিছুদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে ভ্রমণ, গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা চলে। পরে কেহ বা ষ্টেশনের দিকে, কেহ বা 'নীলাবরণের' দিকে চলিয়া যায়। বিদায়ের সময়ে উভয় পক্ষই উভয়পক্ষকে সানন্দ ও সাদর ভাষায় বিদায় দেয়।

সেদিন সকালে অনিলেরা গেল ষ্টেশনের দিকে? ষ্টেশন পার হইয়া 'ব্রীজের' উপর দিয়া লাট্টু পাহাড়ে যাইবে, তথা হইতে ফিরিয়া কিছু বাজার করিয়া, পোষ্টাফিস্‌ হইতে খবরের কাগজ

লইয়া, ষ্টেশনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন হইয়া, রেলওয়ে ওভারব্রীজের উপর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া বাড়ী ফিরিবে, এইরূপ ইচ্ছা।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা লাটু পাহাড়ে পৌঁছিল। অলকা কহিল, এটাকে লাটু পাহাড় বলে কেন?

দেখতে যেন একটা লাটু উল্টা হয়ে আছে, তাই বোধ হয়।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া নূতন সূর্যের আলোকে চতুর্দিকের পাহাড়ের সারি, তাহার মধ্যে অবস্থিত উঁচু নীচু ভূমি, বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, লালরংএর আঁকাবাঁকা পথ সাপের মত লম্বমান রেল-পথ প্রভৃতি অতিশয় মনোরম দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ এই সকল সৌন্দর্যউপভোগ করিবার পর তাহারা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। অলকা কহিল, আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

সর্বদা ওখানে থাকলে আর অত লাগবে না।

অর্থাৎ তোমার মতে, কাউকে বেশীদিন ভাল লাগে না।

আমি বুঝি তাই বলছি? মানুষের সঙ্গে বুঝি অন্য জিনিষের তুলনা হয়?

আচ্ছা, এখন তাড়াতাড়ি চল, রোদ উঠে পড়ল।

ষ্টেশনের নিকট আসিয়া তাহারা দেখিল, টিকুয়া খুকীকে কোলে লইয়া এখানে আসিয়াছে। বাজার হইতে কিছু ঢেঁড়স, একটা লাউ, সওয়া সের আলু, একসের কচু, আধসের কাটা কাতলা মাছ ও দুই পয়সার পান কিনিয়া দিয়া টিকুয়াকে এবং খুকীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া, কোন্ বাড়ীর কাহারা বাজার করিতে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যেই মন্তব্য করিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুজনেই ওজন হইয়া দেখিল, শিমুলতলার জল-বায়ুতে গত তিনদিনের মধ্যে কোনই উন্নতি হয় নাই। ইতিমধ্যে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিয়া পড়িল। কয়েকজন যাত্রী নামিল। একজনের নিকট হইতে লাগেজ বাবদ সাতটাকা ছয় আনা আদায় করিবার জন্য নীল পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা গেল। অলকা জিজ্ঞাসা করিল, ও কে?

একজন ক্রু।

ক্রু কাকে বলে?

যে যাত্রীদের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য 'ক্রু' করে আদায় করে, তাকে 'ক্রু' বলে।

ও, বুঝেছি।

ইতিমধ্যে ওভারব্রীজটি স্ত্রীলোকে ভরিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ যেমন ম্যাল, পুরীতে যেমন সমুদ্রতট, শিমুলতলায় তেমনি রেলওয়ে ষ্টেশন বিশেষতঃ ওভারব্রীজ। অলকা কহিল, চল, ব্রীজের ওপর যাই।

না, আমি ওখানে যাব না। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ পোষ্টঅফিস থেকে কাগজখানা এনে প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারি করি।

ব্রীজের উপর ছোট বড় লম্বা বেঁটে, মোটা সরু, ফর্সা কাল, সুশ্রী কুশ্রী, সধবা, বিধবা, কুমারী, নানা প্রকারের প্রায় কুড়িটি মহিলা সমবেত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইত যে ইহাদের মধ্যে দশ জনের নামই 'বীণা'। কেহ বা বীণাপাণি, কেহ বা শুধু বীণা। অপর দশজনের নাম অলকা, বিমলা, আরতি ইত্যাদি।

সম্মুখেই সমবয়স্ক একটা তরুণীকে দেখিয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?

আজ ছয় দিন হল।

কেমন লাগছে?

লাগছে ত ভালই। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট। কিছু পাওয়া যায় না।

কেন, যা দরকার প্রায় সবই ত পাওয়া যায়।

আমি ত বাজার যাইনে, কিন্তু উনি বলছিলেন যে এখানে, চাল, ডাল নুন তেল, মাছ পাঁটা, মুরগী, ডিম, দুধ, ঘি, আলু, কপি, পটল, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো শাক, কচু ওল, লেবু, লঙ্কা, বেগুণ, আদা, পেঁয়াজ, পেঁপে, ঢেঁড়স, মূলা আর পান সুপারি—এছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। খাবার কষ্টে ওঁর শরীর রোগা হয়ে গেছে। আর আমারও, এই দেখুন, সেমিজটা ঢল্ ঢল্ কচ্ছে। উনি বলছেন, শিগ্‌গিরই আমরা মধুপুর বা দেওঘর চলে যাব।

আর একটু অগ্রসর হইয়া অলকা দেখিল একটি মহিলা কি যেন সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন। উৎসুক হইয়া অলকাও পাশে গিয়া বসিল। মহিলাটি বলিতেছেন, 'কাল এক কাণ্ড হয়েছিল। দাদা আর বউদি, আমি আর উনি, বেড়াতে ত গেলাম নীলাবরণের দিকে। সেখানকার শুকনো নদীটার মাঝে যেখানে সেই পাথরগুলো, সেখানে বসে খানিক গল্পগুজব ক'রে ফিরবার সময়ে দাদা বল্লেন, তোরা ঐ রেলপথ ধরে চলে যা—শীগ্‌গির হবে। আমরা ঐ মাঠের ভেতর দিয়েই ফিরে যাই। দেখি যদি ঐ বস্তিটার মধ্যে কিছু তরকারী টরকারী পাই ত নিয়ে যাব'খন। আমরা ত ফিরে এলাম। দাদা আর বউদির খোঁজ নেই। রাত আটটা বাজল, নটা বাজল, তবু খোঁজ নেই। কেউ বল্লে, ওদিকে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। মা ত কেঁদেই আকুল। লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন। মালীও বেরুল। আমাদের চাকরটাও বেরুল। কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মাঠের মধ্যে ভীষণ অন্ধকার, চারিদিকে কোথাও কিছু দেখা যায় না। ডাক দিয়ে

সাড়া মেলে না। শেষে পাশের বাড়ীর একটা ছেলে তাদের পুরাণো গ্রামোফোনের চোঙাটা নিয়ে মাঠের মাঝে গিয়ে চীৎকার করতে করতে তবে সাড়া পাওয়া গেল। রাত্রি এগারটার সময়ে তারা বাড়ী ফির্ল। জিজ্ঞাসা করতে বল্লে, আমরা পথ হারিয়ে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

একটি সুবেশা তরুণী হাসিয়া বলিলেন, কল্‌কাতায় ত গড়ের মাঠ আর লেক ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানে এসে আপনার দাদা ও বউদি সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরালা মাঠে একটু না হয় পথই হারিয়েছেন, তাতে আপনারা অত ব্যস্ত হলেন কেন?

একটা হাসির রোল উঠল। আরো নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অলকা লক্ষ্য করিল একটি যুবতী বধূ কোনই কথা বলিতেছে না, কাহারো কথার জবাব দিতেছে না। শুধু যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, তখন ঠোঁটের বামকোণ দিয়া ঈষৎ মুচকি হাসিয়াই পুনরায় গম্ভীর হইয়া বসিতেছিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটী কিশোরীকে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁকে চেন?

হ্যাঁ, উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন।

তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না কেন?

উনি মস্ত বড় ঘরের মেয়ে কি না. তাই বোধ হয়।

তাই নাকি?

দিল. তাহাদের একা থাকিতে কোন অসুবিধা হইবে না। সে সর্বদা দেখাশুনা করিবে। মালী রোজ রাত্রে বাড়ী যাইত, তাহাকে বলা হইল. অনিল না ফেরা পর্যন্ত সে বাসাতেই থাকিবে। যাইবার সময়ে অনিল অলকাকে ভরসা দিয়া গেল. বিমল রয়েছে তোমার ভয় কি?

বিকালে বিমল ও অলকা চা খাইতেছে। টিকুয়া খোকাকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে। বিমলের স্ত্রী পাড়ায় আর এক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

দিনটি চমৎকার। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীল আভা মিশিয়াছে নীচের দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল মাঠের সঙ্গে; পশ্চিম গগনের ঈষৎ রক্তিম আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে উঠানে. বারান্দায় চায়ের টেবিলে আর অলকার মুখে। উঠানে দেওয়ালের পাশে এবং উঠানের মধ্যস্থিত পথের দুই পাশে ফুল গাছের সারি। সেগুলির উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে প্রজাপতি আর মৌমাছি। সমস্ত আকাশ বাতাস শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যেন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

অলকা ও বিমল চা খাইতেছে এবং গল্প করিতেছে। বিমল একটা বড় কোম্পানীর ক্যানভাসার। কার্যোপলক্ষে তাহাকে সারা বৎসর নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। ভারতের বহু স্থানে সে ঘুরিয়াছে। সেই সকল স্থানের কত বিবরণ একের পর এক বলিয়া যাইতেছে

বলে, কুইন অফ, শিমুলতলা। এই কয়দিনেই পাড়ার মেয়েরা বউরা ওঁকে একেবারে আপন করে ফেলেছে।

বিমল একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে অলকাও যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। একটু পরে বিমল বলিল, আমার কুইন কিন্তু আপনি।

তড়িতাহতের মত অলকা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং "আমার শরীরটা ভাল নেই, আমায় মাপ করবেন" বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। একটু বসিয়া থাকিয়া বিমলও উঠিল।

৫

পরদিন অনিলের বাসার সামনে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া থামিল। অনিল সবিস্ময়ে দেখিল, অলকা খুকীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেছে। গাড়ীর মাথায়, পিছনে, সামনে, ভিতরে জিনিষপত্রের পাহাড়।

অনিলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, ব্যাপার কি? হঠাৎ আজই? জ্যাঠামশায় তো একটু ভালই আছেন। আমি তো দু' এক দিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছিলুম।

অলকা চুপে চুপে বলিল, বিরহ সহ্য হ'ল না।

কি যে বল! এত খরচপত্র করে এত ঝঞ্ঝাট সয়ে একটু চেঞ্জের ব্যবস্থা করলুম, তা দিলে সব গোলমাল করে।

বেশ করলুম। নাও এখন জিনিষপত্রগুলো নামাও।

কি করে এলে একা-একা এত সব জিনিষপত্র নিয়ে?

দেখতেই তো পাচ্ছ, এসেছি। মেয়েদের তোমরা যতটা সরলা আর অবলা ভাব, আমরা তা নই।

খরচপত্রের কি করলে? তোমার কাছেতো বেশি কিছু ছিল না।

দুগাছা চুড়ি ষ্টেশন মাষ্টার মশায়ের কাছে রেখে, ওখানকার সব খরচপত্র মিটিয়ে এসেছি—মায় মালীর বখশিস্ পর্য্যন্ত।

ষ্টেশনমাষ্টার দিলেন?

বললুম, আমার স্বামীর ভয়ানক বিপদ, একটু উপকার করতেই হবে। তাছাড়া, চুড়ি দুগাছাও তো খাঁটি গিনি সোনার।

আমার ভয়ানক বিপদ? আমার আবার কি বিপদ হ'লো?

আমাকে কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেলে তোমার আর কি বিপদ?

তার মানে?

মানে পরে শুনো। এখন দেখো, জিনিষপত্রগুলো সব নামলো কিনা।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাত বাড়িতেছে—তেমনি ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়া পড়িতেছে কালো আকাশ। পৃথিবীর অশ্রান্ত কান্না। চর ইসমাইল ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া। অবিরাম ঝিঁঝিঁর একতান—ব্যাঙের আনন্দ-মুখর কলধ্বনি।

অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর পর তিনখানা নৌকা চলিয়াছে। গাজীতলার পাশ দিয়া, হাটখোলার মধ্য দিয়া, জেলে আর চাষাদের বস্তিকে পাশে ফেলিয়া খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—ভাদ্রের ভরা উজানের স্রোত তাহারি মধ্যে বহিতেছে প্রচণ্ড কল্লোল তুলিয়া—কুটা ফেলিলে উড়াইয়া নিয়া যায়।

ভরা খালের তীক্ষ্ণ জোয়ারে তীরের মতো ছুটিয়াছে নৌকা। একটানা জলের শব্দ—মাঝে মাঝে আকস্মিক এক একটা বিরাম যতির মতো কাদার মধ্যে লগি ঝপাস ঝপাস করিয়া পড়িতেছে—নৌকার ছইকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াই আবার একটা বিশ্রী ছর্ ছর্ ধ্বনিতে পেছনে ছিটকাইয়া পড়িতেছে বেতকাঁটা, নলখুরি ফুলের লতা। সুপারীর কাঠ ফেলা ছোট ছোট গ্রাম্য ঘাটে ঘূর্ণি বাজিতেছে।

দিগন্তে দিগন্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া চলিয়াছে। আকাশটা যে অমন সহস্র ভাবে ফুটিফাটা হইয়া আছে—বজ্রের আলোয় সেটা যেন স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতেছে। রাত্রে আবার প্রবল খানিক বর্ষণ নামিবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশটা আশ্চর্য। বৈশাখ বলো, জ্যৈষ্ঠ বলো, যে মাসই হোক একবার বৃষ্টি নামিলেই হইল। তারপর আর কথাবার্তা নাই—হয়তো পর পর সাতদিন ধরিয়াই এতটুকু আলো ফুটিল না—রাশি রাশি মেঘ আর অসংলগ্ন বৃষ্টি চলিতে লাগিল সময় ও সীমানাহীন ছন্দে!

মনিমোহন ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহিরের জল কল্লোলে আর রাত্রির এই অনন্ত সজল তমসায় সে যেন হঠাৎ দশ বছর আগে ফিরিয়া গেছে। সেই যেদিন নদীতে অতিকায় জেলে ডিঙির মতো বড়ো বড়ো বালির চড়া ঠেলিয়া ওঠে নাই, যেদিন তেঁতুলিয়ার রোলিংকে সমুদ্রের তাণ্ডব বলিয়া মনে হইত; যেদিন মনে হইত পৃথিবীটা এখানে এখনো বিশ্বকর্মার কর্মশালার খানিকটা অবিন্যস্ত উপচার—সবটা মিলিয়া কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই—আদিম জগতের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে সামান্য এতটুকু আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। তারপর নদীতে চড়া পড়িল—চর ইসমাইল আগাইয়া আসিল মানুষের কাছাকাছি—সভ্যতার নিকট সান্নিধ্যে। কী ঘটিল এবং কী যে ঘটিল না। এই অন্ধকার রাত্রে বিশাল নদী বাহিয়া এম্‌নিই একটা যাত্রা মনে পড়িতেছে—সেই যেদিন—। সীমাহীন চিহ্নহীন আকাশ-বাতাসে আজকের চর-ইসমাইল দশ বছর আগেই আবার ফিরিয়া গেল নাকি!

চোখ দুইটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—মনে হইতেছে ডাক-বাংলোয় পাত্‌লা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া রাণী এখন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে অচেতন স্বপ্নছায়ার মতো থাকিয়া থাকিয়া দুইটা রাইফেলের নল চক চক করিয়া উঠিতেছে। নাঃ—সেদিন আর এদিনের পৃথিবী এক নয়।

ঘস্ ঘস্ করিয়া নৌকা ভিড়িয়া গেল হঠাৎ। একটা টর্চের আলো মণিমোহনের মুখের ওপর ঝল্‌সাইয়া উঠিল—নিদ্রার আমেজটা ভাঙিয়া গেছে।

চাপা গলায় দারোগা ডাকিতেছেন: স্যার?

—কী খবর?

—এসে পড়েছি—উত্তেজনায় দারোগার গলা কাঁপিতেছে।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়া মণিমোহন উঠিয়া বসিল।
—নামতে হবে?

—আপনি একটু ওয়েট করুন স্যার। ওদিকের ব্যবস্থা করে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা—মণিমোহন আবার গা এলাইয়া দিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিল। কাদার উপর আট দশ জোড়া বুটের ছপাছপ শব্দ এবং তিন চারটি টর্চের জোরালো আলো সুপারী বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত বোধ হয় দেড়টার কাছাকাছি। চোখ হইতে ঘুমের জড়তাটা কিছুতেই কাটিতেছে না। বোটের মাঝিরা ফিসফাস করিয়া কী বলিতেছে—কথাগুলা ভালো করিয়া শোনাও যায় না—বোঝাও যায় না। নৌকার তলা দিয়া জলের সুতীব্র শব্দ। এতক্ষণ যার অস্তিত্ব কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই, সুযোগ পাইয়া সেই মশার ঝাঁক আসিয়া চারদিক হইতে গুঞ্জন তুলিয়াছে। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের পাখায় ভাসিয়া চলিয়াছে, ঝিণ্টু, রাণী—কলিকাতার চৌরঙ্গী—সাউদার্ণ অ্যাভিনিউর কৃত্রিম চন্দ্রালোক; হা হা করিয়া

বশ্রী চেহারার একটা রোগা হাড় জিরজিরে লোক প্রবল ভাবে হাসিয়া উঠিল: কে, সেই পাগলা পোষ্ট মাষ্টারটা? এখনো বাঁচিয়া আছে নাকি—এই দশ বৎসর পরেও?

আবার চমক ভাঙিল। পোষ্ট মাষ্টার নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। যামঘোষ। প্রহর ঘোষণা করিতেছে তারস্বরে। জলের শব্দ, ব্যাঙের ডাক—মাঝিরা তামাক খাইতেছে।

পকেট হইতে সিগারেটের টিনটা বাহির করিতে গিয়া মণিমোহন আবার ঝিমাইয়া পড়িল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া একটা ঝড়ের রাত বহিয়া চলিয়াছে। অন্তরে ঝড়, বাহিরে ঝড়। আরণ্য আর উদ্দাম ভালোবাসা। মশার গুঞ্জন নয়—গুন্ গুন্ করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছেই—নৌকার ছইয়ের উপর টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—রাণী?

—স্যার?

এবার আর ডাক নয়—কাণের কাছে ব্যাকুল আর্তনাদের মতো স্বরটা ঝনাৎ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া সেতারের তারের মতো বাজিয়া উঠিল। ছন্দোপতন।

—স্যার ঘুমুচ্ছেন?

ইহার পর আর ঘুমানো চলে না। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ দুইটাকে মণিমোহন এক সঙ্গেই মেলিয়া দিল: কী হয়েছে—অমন হাঁক ডাক কেন?

—সর্বনাশ হয়েছে স্যার।

—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ? ডাকাত পড়েছে নাকি?

—ডাকাত পড়লেও তো ভালো হত স্যার—মণিমোহনের মনে হইল দারোগা যেন বুক ফাটিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন: সব মাটি স্যার—কিচ্ছু হল না। পাখী পালিয়েছে। একেবারে ফুড়ুৎ।

যাক—আপদ গিয়াছে। বড় করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল মণিমোহন, কিন্তু দারোগার ব্যাকুল চোখ মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া হইল অত্যন্ত।

—তাইত! পালালো কী করে?

—আর বলবেন না। যোগসাজস ছিল ভেতরে ভেতরে—আমাদেরই কোনো এক ব্যাটা ইনফর্মার কিংবা চৌকীদার ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়। গিয়ে দেখি শূন্যপুরী খাঁ খাঁ করছে—কারো কোনো পাত্তা নেই।

—তারপর?

—তারপর আর কী। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—গাঁয়ের তিন চার জায়গায় হানা দিয়ে এলাম—উঁহু। কোথায় কে! তারা এতক্ষণে বে-অব-বেঙ্গল ছাড়িয়ে প্রায় জাভা সুমাত্রার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে বোধ হয়। তারপরে সিঙ্গাপুর কিংবা সাংহাই।

—কিছুই হল না তা হলে?

—হল না কি স্যার, হওয়াতে হবে।—ক্ষিপ্ত দারোগার দাঁতের ভেতর কড়মড় করিয়া একটা হিংস্র শব্দ উঠিল: যেটা আশ্রয় দিয়েছিল—তাকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে এসেছি। এই মাগীই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে—ঘা কতক কষে লাগালেই মুখ দিয়ে আপনা থেকে কথা বেরিয়ে আসবে।

—মাগী! মেয়েমানুষ!

—মেয়েমানুষ বই কি। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আর সাধারণ মেয়েমানুষ তো নয় স্যার—বাঘিনীর জাত একেবারে। দেখুন না শ্রীমতীর চেহারাখানা—

টর্চের আলো দারোগার পেছনে বন্দিনীর মুখের উপরে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল মণিমোহন। দশবছর পরেও সে মেয়েটাকে চিনিতে পারিয়াছে। নীলার মতো চোখ, আগুনের মতো রঙ। বর্মার বুদ্ধমূর্তির মতো চিত্র করা দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দশবছর আগে যেমন করিয়া প্রথম আসিয়াছিল, আজো ঠিক তেম্নি ভাবেই তাহার দরবারে বিচার প্রার্থী।

টর্চের আলোটা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তির মর্মরশুভ্র পাংশু মুখের উপর জ্বলিতে লাগিল, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিতে লাগিল নীলার মতো দুটি আশ্চর্য চোখ। বহুদিন পরে মণিমোহন আবার সম্মোহিত হইয়া যাইতেছে।

আট

ঠিক সেই সময়েই আর একটি বিচিত্র নাটকের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিলেন বলরাম ভিষকরত্ন।

বাইরে বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরের মধ্যে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, লাল তেল বলিয়া আলোর চাইতে ধূম্রজালই বিকীর্ণ করিতেছে বেশি। সামনে একখানা 'সর্বজ্বর সংগ্রহ খুলিয়া লইয়া বলরাম হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছেন এবং টাকের উপরে মশার হুল ব্যর্থ চেষ্টায় শুদ্ধমাত্র সুড়সুড়ি দিয়া চলিয়াছে।

সামনে গড়গড়ায় কল্‌কেটা অনাদরে আপনিই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইতেছে। তামাকের তীব্র গন্ধে আমন্ত্রিত হইয়া রাধানাথ দরজার ফাঁকে মুখ বাহির করিল। অমন ভালো তামাকের এমন অপচয়টা তাহার পছন্দ হইল না। ইঁদুরের মতো হুঁশিয়ার পা ফেলিয়া রাধানাথ ঘরে ঢুকিল, তারপরেই গড়গড়ার মাথা হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবার নেপথ্যে তিরোহিত হইল।

—কবিরাজ মশাই, কবিরাজ মশাই!

—ডি ক্রুজার আকুল কণ্ঠ।

—কী রে, এমন অসময়ে কী ব্যাপার?

—শীগ্‌গির আসুন।

—কী হয়েছে?

—বাবার অবস্থা ভারী খারাপ।

—ভারী খারাপ? কেন—কী হয়েছে? বিকেলে দেখে এলাম, দিব্যি আছে, জ্বর নেই—এর মধ্যে আবার কী হল?

—আমি জানি না, আপনি আসুন।

—আঃ—এই রাত্তিরে জলকাদার মধ্যে হাড় জ্বালিয়ে মারলি! আচ্ছা, চল। কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।—ক্রুজা কাঁদিয়া ফেলিল: আপনি চলুন। শীগ্‌গির চলুন।

চটি পরিয়া এবং মসীমান লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। এমন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে! অন্ধকার বনবীথিকে আলোড়িত করিয়া এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। টিপ টিপ করিয়া বর্ষাধারার ক্ষণ বর্ষণ। পায়ের নীচে জল আর কাদা ছপ ছপ করিতেছে, ঘাসে ঘাসে জোঁক নড়িতেছে। চর ইসমাইল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, বলরামও নিঃসংশয় হইয়াই ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা আসিয়া দেখা দিল!

মনে মনে বলরাম সমস্ত পৃথিবীটাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আরো বেশি করিয়া রাগ হইতেছে বুড়ো ডি সিল্‌ভার উপরে। সুস্থ থাকিয়া লোকটা পৃথিবী শুদ্ধ লোককে জ্বালাইয়া বেড়ায়, অসুস্থ অবস্থাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। মরিতে হয় তো সোজাসুজিই চোখ দুইটা উল্টাইয়া বসিয়া থাক বাপু, এমন ভাবে মানুষকে উদ্বাস্ত করা কেন! এই পর্তুগীজগুলাই দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব—যেমন নাম, তেমনি আকার প্রকার, আর তেমনিই ব্যবহার। মরিয়া মরিয়া তো প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দু চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেও আপদের শান্তি হয়। নিজের মনেই গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে বলরাম ডি-সিলভার বাড়িতে আসিয়া পা দিলেন। আর আসিয়া যে কাণ্ডটা চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—এ কী রে! কেমন করে হল?

—আমিও জানি না। বাড়ীতে এসেই দেখি—

—এত রাত কোথায় ছিলি?

ক্রুজা নিরুত্তর। কোথায় বদমায়েসী করিতে গিয়াছিল নিশ্চয়—একেবারে পুরাপুরি বখিয়া গিয়াছে হতভাগা ছেলে। কিন্তু এ কী ব্যাপার।

মেজেতে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে ডি সিলভা। চারদিকে রাশি রাশি ভাঙা শিশি-বোতল, ঘরময় কাঁচের টুকরা। কতগুলা বাক্স প্যাঁটরা খোলা—এলোমেলো আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে সমস্ত। সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া, মেঝে একাকার করিয়া ডি-সিলভা বমির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। সে বমি রোগীর নয়—মাতালের। মদের এবং ক্লেদের একটা দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উলটাইয়া আসিবার উপক্রম করে। বড় বড় হিক্কা উঠিয়া ডি সিল্‌ভার আপাদ মস্তক ঝাঁকিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে আর দেরী নাই, বড় জোর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা বেমালুম মিটিয়া যাইবে।

ঘৃণা কুঞ্চিত বলরাম ঝুঁকিয়া পড়িলেন রোগীর উপরে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। পিছনে আশঙ্কা পাণ্ডুর মুখে ক্রুজা নীরব আর নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া।

—কিচ্ছু হয়নি। খালি পেটে একরাশ কড়া মদ টেনে এই অবস্থা হয়েছে।

—মদ!

—নিশ্চয় মদ। কেন মদ দিলি এনে?—বলরাম ফাটিয়া পড়িলেন: এই রোগা মানুষকে মদ খাওয়ালি কোন্ আক্কেলে? এখন যে বাপ মেরীর পাদপদ্মের দিকে রওনা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিস হতভাগা বেকুব কোথাকারের!

—আমি—আমি তো মদ আনিনি।

—তবে? মদ এলো কোত্থেকে? আশমান থেকে পাখা মেলে উড়ে আসতে পারে না তো।

—বোধ হয় মামা।

—মামা!—বলরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, তোর আবার মামা কে?

—তা তো জানি না। আজই এসেছে—

—চুলোয় যাক। যেমন হতভাগা ভাগনে, তেমনি হতভাগা তার মামা। যা এখন জল আন্—দৌড়ো, দৌড়ো। মাথায় জল দে—

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া পরিচর্যা চলিল। মাথায় জল, পাখার বাতাস। আস্তে আস্তে ডি সিলভার নিশ্বাস সহজ আর স্বাভাবিক হইয়া আসিল—মনে হইল এইবারে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

—নে, এইবারে বুড়োকে খাটের ওপরে তুলে ফেল। এর পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ধরাধরি করিয়া দুজনে ডি-সিলভাকে খাটে তুলিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে একটা বড়ি বাহির করিয়া বলরাম বলিলেন, জ্ঞান হলে এটা খাইয়ে দিস। আর ভালো কথা, আর তোর মামা ধুরন্ধরটি গেলেন কোথায়?

—জানি না তো।

—বেশ মামাটি বটে। বোনাইকে এক পেট মদ গিলিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু ঘরের এমন অবস্থা কেন রে? বাক্স প্যাটরা ভাঙা—জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌—

—অ্যাঁঃ!

ক্রুজা এতক্ষণে চমকিয়া উঠিল: তাই তো। চোর এসেছিল নাকি? মামাই বা গেল কোথায়?

বলরাম বলিলেন, হুঁ। চোর যে কে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বেশ মামাটি জুটিয়েছিলে বাবাজীবন। বাপটিকে মারবার মতলব করে জিনিস-পত্তর হাতিয়ে সে নিরাপদে একদম পলায়মানঃ!

ক্রুজা আবার বলিল, অ্যাঁঃ!

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। পারিস তো পুলিশে খবর দে—আমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। যত সব—হুঃ!

ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। আর আমাকে সাক্ষী-টাক্ষী মানিসনি বাপু, পুলিশের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

বলরাম লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।

মড়ার মতো মুখ লইয়া ক্রুজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। উঃ মামা—মামার পেটে পেটে এই মতলবই ছিল তাহা হইলে—অত করিয়া একটা টাকার ঘুষ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল তবে এই জন্যই! আর ওদিকে ডি-সিলভা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—ঠিক এই ভাবেই তাহার নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত বড় বড় শ্বাস বহিতেছে।

অকারণ একটা হিংসায় ক্রুজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল এখনি সে ঝাঁপ দিয়া ডি-সিল্‌ভার ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়ে—কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া খামচাইয়া তাহার একাকার করিয়া দেয়। ক্রুজার পায়ের গুঁতা লাগিয়া একটা মদের শূন্য বোতল ঘরময় গড়াইয়া গেল।

কিন্তু গঞ্জালেস তো ঠিকই করিয়াছে। কালো অন্ধকারে—বৃষ্টির অশ্রান্ত কান্নার ভিতর দিয়া তাহার নৌকা নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। তীব্র নেশায় উদার এবং উদাস হইয়া হেঁড়ে গলায় গান জুড়িয়াছে গঞ্জালেস। আশ্চর্য—সে তো গান নয়, প্রার্থনা। মাতা মেরীর পবিত্র নাম কীর্তনে নদীর বুক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পুলকে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রেরণায়।

নেশার ঝোঁকে সে চর-ইসমাইলে আসিয়াছিল এবং নেশার ঝোঁকেই আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ডেভিড্ গঞ্জালেস্ জাগিয়াছে তাহার রক্তে। কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড়ো—পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি নাই পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে—নির্মম ভাবে ভোগ করিয়া যাও—নিষ্ঠুর ভাবে আদায় করিয়া লও। এই অত্যন্ত সার কথাটা তাহার বাবাই খুব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে নাই—ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করে নাই—একটি নারীর জন্যে কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মাতালের মতো দিকে দিগন্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় নাই। অক্লেশে ডাকাতি করিয়াছে, বন্য যৌবনকে চরিতার্থ করিয়াছে—খুন করিয়াছে, বীরের মতো বাঁচিয়াছে এবং বীরের মতো মরিয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের আদর্শ সন্তান।

তবে সেই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন? পর্তুগীজ চিরদিনই পর্তুগীজ—চিরকালই সে যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয় করিয়াছে। পেরিরা নয়—অনুগৃহীত সেই বাঙালি মেয়েটা নয়—ঘুমন্ত শান্ত কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির মৃদু-মর্মরও নয়। অন্তহীন নীল সমুদ্র। ড্রাগন আর মড়ার মাথা আঁকা কৃষ্ণ পতাকা। কামানের অগ্নিপিণ্ড দিয়া বাণিজ্য জাহাজকে অভ্যর্থনা। জলন্ত সপ্তগ্রাম—দীপময় দুর্গ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

পরস্বাপহরণে এই হাতে খড়ি। নতুন করিয়া জীবন সুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয়—পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল—আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চর ইস্‌মাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন। (ক্রমশঃ)

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

৪টায় শেষ ক্লাসটাও হইয়া গেল। অমল বাহির হইয়া দেখে অপর্ণা পথে অপেক্ষা করিতেছে, অমল নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল—চলুন, আর দেরী না।

অমল বলিল—এখানে প্রাথমিক গলা ভেজানো সেরে গেলে হ'ত না ?

—না, আধঘণ্টা চা না খেলে মানুষ মরে না—চলুন।

অমল অপর্ণার এই আগ্রহকে উপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা একটা সিটে বসিয়া বলিল—বসুন—

ট্রামের যাত্রী যাহারা তাহারা মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিল—এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে ? তাহাদিগের মুখের উপরে একটা করুণার দৃষ্টি হানিয়া অমল বসিয়া পড়িল। অপর্ণা কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া দুইখানি টিকিট করিয়া ফেলিল। অমল হাসিয়া বলিল—টিকিট কেনার এত গরজ কেন ?

—আপনি আমার অতিথি, পাছে আপনি টিকিট করেন এই ভয়ে।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল—যাক্, আমার মাঝে এতখানি উদারতা যে থাকতে পারে ভেবেছেন, এতেই আমি ধন্য হ'য়েছি। অমল জানিত উভয়ের টিকিট করিলে ফিরিবার সময় চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত ট্রামে ফিরিয়া বাকীটুকু হাটিয়া ফিরিতে হইত।

অপর্ণা হাসিয়া টিকা করিল—ভুলও বুঝ্তে পারি।

অমল বলিল—ভুল বোঝাই আপনাদের—অর্থাৎ মেয়েদের ধর্ম্ম।

অপর্ণা জবাব দিল না,—পাশের পেভমেণ্টের পথচারীদিগের প্রতি একটা অনৈচ্ছিক দৃষ্টি রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অমল মনে মনে ভাবিল,—অপর্ণার পরাজয়ের কথা। কথায় সে এমন বার বার কখনও পরাজিত হয় নাই,—এমন ভাবে দল ছাড়িয়া আসিয়া সে কখনও আলাপ করে নাই, আগ্রহভরে তাহাকে বাড়ীতেও লইয়া যায় নাই। অপর্ণার কি যেন একটা হইয়াছে—সে ভাল করিয়া অপর্ণাকে লক্ষ্য করিল। অন্যান্য দিন তাহার বেশে মুখে একটা সযত্ন প্রসাধনের রেশ পাওয়া যায়, আজ চুলগুলি তাহার অযত্নবদ্ধ, মুখে কোনরূপ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় নাই। অমল বুঝিল অপর্ণার একটা কিছু হইয়াছে এবং তাহাকে এমনি করিয়া লইয়া যাইবার পিছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে তাই প্রশ্ন করিল,—আপনার কি হ'য়েছে বলুন ত ?

অপর্ণা অমলের মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তার মানে ? এ প্রশ্ন আপনার মনে হয় কেন ?

—নাচার, হ'লে কি ক'রবো ?

—সংযম শিক্ষা ক'রতে হবে—

—তাই হবে, চুপ ক'রে ভব্য ভদ্রলোকের মত বসে থাকি ?

—হ্যাঁ। চুপ ক'রে বসে থাকুন।

অমল গেট-দরজা ঠেলিয়া আগেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। কে যেন দ্বিতলের ঝুলবারান্দা হইতে বলিল—অমলবাবু, নমস্কার।

অমল চাহিয়া দেখে করুণা। স্মিত হাস্যে উচ্চকণ্ঠে সে কহিল,—নমস্কার।

বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতেই করুণা আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর্ণা বলিল,—আপনি বসুন অমলবাবু, একজন সাথী ত দিয়ে গেলাম।

করুণা প্রশ্ন করিল,—আপনার মার অসুখ সেরেছে ?

অমল আশ্চর্য্য হইল,—অপর্ণাদের বাড়ীতে অমলকে লইয়া নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহা না হইলে করুণার পক্ষে তাহার মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সে করুণাকে পাশের চেয়ারে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল,—হ্যাঁ, অসুখ সেরেছে। তুমি জানলে কি ক'রে ?

করুণা বিজ্ঞের মত বলিল,—ও সব খবর জানি।

—কেমন ক'রে ?

—আপনার চিঠি আমি পড়েছি যে ! মা পড়েছে, বাবা পড়েছে—মা আপনাকে নিয়ে আস্তে বলেছে, জানেন।

—কেন ?

করুণা প্রশ্নে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই বলিল,—এমনি।

অপর্ণা এই সময়ের মাঝেই কাপড় ছাড়িয়া খাবার ও চা লইয়া ফিরিল। অমলের সামনে খাবার ও চা রাখিয়া বলিল,—নিন, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমি একটি রাঘব বোয়াল—এ অনুমান ক'রে আমাকে

অসম্মান করা হ'ল না কি? পক্ষান্তরে এতে আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে না কি?

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল,—হোক্, না খাওয়ার মধ্যেও কোন পৌরুষ নেই।

—না, না, কিছু তুলে রাখুন, থাম্‌কা নষ্ট করে কি হবে?

—ও খেতেই হবে—না খেলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হ'বে।

—কিন্তু আপনার?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—খাবারটা এখানে আপনার সাম্‌নে না হয় নাই খেলাম,—চা খেলেই ভদ্রতা রক্ষা হবে।

আহারান্তে অপর্ণার মা আসিয়া অমল ও তাহার মাতার কুশল প্রশ্ন করিলেন। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—তাঁকে, অমন গ্রামে ফেলে রেখেছ কেন বাবা? এখানে আন্‌লে তোমারও সুবিধে হয়—মেসে খাওয়া দাওয়ার ত কত কষ্ট হয়!

অমল একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—মা এখানে কিছুতেই আস্‌তে চান না। গ্রাম ছাড়তে মা একেবারেই নারাজ।

—সেখানে তোমাদের আর কে আছেন?

—আমাদের ব'লতে সরিকরা আছেন, তা ছাড়া আমি মায়ের একই ছেলে।

—তোমাদের জমিদারীর যা পাওনা তা ক'লকাতা থেকে মাসে মাসেও ত আনাতে পারো—সেখানে পড়ে থাকবার কি প্রয়োজন!

অমল মিথ্যা কথা বলিল,—মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব নহে কিন্তু আজ সত্য বলিতেও যেন তাহার বড় দ্বিধা হইতেছিল। সে বলিল,—মা'কে সারাজীবন ধ'রে এই কথাটাই আমি বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।

অপর্ণার মা একটু থামিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ তা হয়, তিনি যে কেন সেখানেই পড়ে থাকেন তা বোঝার বয়স তোমার হয়নি অমল, কিন্তু আমরা ত বুঝি—ঐ ভিটাই ত তার জীবন।

অমল তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া গেল। অমল সন্দেহ করিল, অপর্ণার মা সকলের কুশল প্রশ্নের ফাঁকে পরোক্ষে তাহার বাড়ীর অবস্থা জানিতে চাহিয়াছেন। অমল সে প্রশ্নকে বার বার কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছে তাই মনের মাঝে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল—তাহার মনে হইল, এ মিথ্যা ভাষণে বা সত্য গোপনে, তাহার অপরাধ হইয়াছে।

সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট চিত্তে বলা যায় না অপর্ণার মা চলিয়া গেলেন, অমল কি যেন একটু চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার বাবা কোথায়?

—আফিসে, রাত্রি ৮টার আগে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই।

—অতএব?

—আমি আর করুণা ছাড়া কথা ব'লবার কেউ নেই।

—শুভ খবর। প্রসঙ্গান্তরে সে প্রশ্ন করিল,—আমাদের সমিতির খবর কি?

—সংবাদ শুভ,—বেথুন পর্য্যন্ত আমাদের প্রচারকার্য্য গেছে, দুই একজন নতুন সভ্যা হ'য়েছেন।

—তারপর?

—পরশু একটি সোসাল হবে, ডলি মিত্রের বাড়ীতে—নং অম্বিকা ঘোষ লেন। আপনাকে উপস্থিত থাক্‌তে হবে, কাল কলেজে নোটিশ পাবেন।

অস্থিরচিত্ত করুণা এতক্ষণ যেন কোথায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—অমলবাবু জানেন? দিদির বিয়ে—

অমল সহসা কিছু বলিতে পারিল না,—এত দিনের স্বপ্ন তাহার মাত্র দুইটি প্রগল্‌ভ শব্দে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মনের সংগোপনে যে চিন্তাধারা তাহার জীবনরসে সঞ্জীবিত হইয়াছিল সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শে যেন তাহা মুহূর্ত্তে মরিয়া গিয়াছে—যাতনায় একটু ছট্‌ফট্ করিতে, আর্ত্তকণ্ঠে একটু কাতরোক্তি করিতে যেন তাহার সময় হয় নাই। অমল নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—শুভ সংবাদ, নেমন্তন্নটা কবে? কোথায় বিয়ে হবে—

করুণা কহিল,—ওই ত, অজিতবাবুর সঙ্গে,—বিলেত ফেরৎ।

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল,—বল ত এতক্ষণ এমনি খবর গোপন রাখ্‌তে হয়? কবে? তোমার দিদির কি অন্যায়। ইতর ব্যক্তি যারা তারাত' মিষ্টান্নের আশা অন্ততঃ ক'রতে পারে—

অমল অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল। সে অবনত মুখে, লজ্জিত দৃষ্টিতে টেবিলের উপরে কি যেন দেখিতেছে। কর্ণমূল পর্য্যন্ত তাহার আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় এই অপরিসীম লজ্জাকে সে গোপন করিতে পারে নাই। ক্ষণিক বাদে সে চোখ তুলিয়া চাহিল। অমল দেখিল, এমনি আর্দ্র, এমনি করুণ, এমনি দীন নেত্রে যে অপর্ণা তাহার পানে চাহিতে পারে তাহা সে কোনদিন ভাবিতেও পারে নাই। ধরা পড়া চোরের মত নির্ব্বাকভাবে সে কেবল লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতেছে।

অমল হাসিয়া বলিল,—এ শুভ সংবাদটা দেওয়ার জন্য এতদূর নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল? এটা ত কলেজেই জানাতে পারতেন।

অপর্ণা তবুও কিছু বলিল না। অমলের মুখের পানে চাহিয়া

থাকিল মাত্র। অমল করুণাকে ডাকিয়া বলিল—অজিতবাবুর বাড়ী কোথায় ?

করুণা বলিল—তা ও জানেন না—শ্যামবাজারে, তাঁকে চেনেন না ?

—না। চিন্‌বো কি ক'রে !

—তিনি ত প্রায়ই আসেন।

অমল করুণার নির্ব্বুদ্ধিতায় হাসিয়া বলিল,—বিয়ে কবে ? নেমন্তন্ন ক'রবে ত ?

—শীগ্‌গিরই—

অপর্ণা করুণাকে একটা ধমক দিয়া বলিল,—যা মিথ্যা কথা বলিস্ না। যা এখান থেকে—

করুণা যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনি ছুটিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু যাহা বলিবার তাহা নিঃশেষেই বলিয়া গেল। অমল বলিল—সত্য কথা বলায় ওর ত কোন অপরাধ হয় নি, আর শুভ সংবাদ যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল হয়—

অপর্ণা এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল,—কথাটা সত্য নয়। বেশী বললে আংশিক সত্য বলা যায়।

—যথা ?

—অজিতবাবু বিলেত ফেরত বড় লোকের ছেলে। টাকা বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই—বিলেত গিয়ে তিনি কোন ডিগ্রিও আন্‌তে পারেন নি, এমন কি একটা মেম সাহেবও আন্‌তে পারেন নি। মা বাবার ধারণা এমন সৎপাত্র আর ভূ-ভারতে নেই—

—আপনার ?

—লেখাপড়া শিখি আর যাই করি, বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মতামত আজও অবান্তর হ'য়েই আছে।

—আপনারও ত মত হওয়াই উচিত। বাড়ী গাড়ী এসব কিছুরই ত অপ্রাচুর্য্য নেই—আর অধিক কি চাই ? এর চেয়ে বেশী মানুষে কি আশা ক'রতে পারে !

অপর্ণা ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল—ও আর কিছু আশা ক'রবার নেই, তা হ'লে ?

—নাঃ, আপনাদের আর আবার কি চাই ?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না। অমল বারবার আঘাত করিয়াও কোন জবাব না পাইয়া বিষণ্ণ হইল। অনুশোচনা হইল, এমন করিয়া আঘাত না করিলেই হয়ত ভাল হইত। তাহার চাহনির মাঝে যে বেদনা ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহা উপেক্ষা করা ভাল হয় নাই—এই বিবাহের মাঝে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা দুঃখময় প্রসঙ্গ আছে। হয়ত এমনও হইতে পারে অপর্ণা মনে মনে হয়ত তাহারই মত স্বপ্নরচনা করিয়াছিল তাহা আজ ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। অমল তাই বলিল,—বলা হয়ত আমার অন্যায়, উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই জানি, তবুও যে ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে তার দাবীতে এবং আমার অন্তরের থেকে আপনাকে যত খানি আপনার ক'রে ভেবেছি তার দাবীতে—

অমলের স্বর অশ্রুভারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল সে সহসা থামিয়া গেল। অপর্ণা তাহার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার চাহিল। অমল পুনরায় ধীর কণ্ঠে কহিল—যদি বিয়ে করেনই তবে মানুষকে ক'রবেন, গাড়ী বাড়ী আর ব্যাঙ্ককে ক'রবেন না। তোমার যে অন্তরের পরিচয় পেয়েছি সে গাড়ী আর বাড়ীতে শান্তি পাবে না।

অকস্মাৎ "তোমার" বলিয়া ফেলিয়া এবং নিজের অসংযত অশান্ত কণ্ঠস্বরের জন্য লজ্জিত হইয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কোন কিছু চিন্তা না করিয়া, এমন কি একটা বিদায় নমস্কার না জানাইয়াই সে চলিয়া আসিল। গেটের নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল অপর্ণা ঘরের মাঝে তেমনি করিয়া নির্ব্বাক নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়াই আছে। বাহিরের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দৃশ্যের মাঝে তাহার দৃষ্টি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ট্রামে বসিয়া অমল ভাবিতেছিল—

অপর্ণা তাহার বিবাহের সংবাদটা ইচ্ছা করিলে কলেজেও দিতে পারিত, বাড়ীতে যাইয়া তৃতীয়পক্ষ মারফতে জানাইবার কি প্রয়োজন ? হয়ত এ সংবাদ জানাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, করুণা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অপর্ণার মাঝে আজ সে যে সংযম এবং প্রতিঘাত করিবার অনিচ্ছা দেখিয়াছে তাহা স্বাভাবিক নয়—হয়ত তাহার মন এ বিবাহে অনুমতি দেয় নাই, তবুও তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া না জানাইলে ক্ষতি ছিল না।

আরও কিছু বয়স হইলে সে হয়ত অন্যরূপ ভাবিতে পারিত, কিন্তু যৌবনের উদার ও মহৎ অন্তর লইয়া সে বার বার অপর্ণার উপরে অভিমানে ক্রোধে নিজেকে নিজে দংশন করিতেছিল। বড় লোকের মেয়ের সহিত আর একজন বড় লোকের ছেলের বিবাহ হইতেছে—এমন কতই নিত্য হয় তাহাতে অমলের মনে করিবার কি আছে। তবুও সে কিছুতেই অপর্ণাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। নিষ্ফল ক্রোধে বার বার তাহার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—

ট্রাম যখন মধ্যপথ অতিক্রম করিয়াছে তখন অমল স্থির করিল—সে দরিদ্র, এই অসম্ভব আশা পোষণ করা তাহার পক্ষে

াহাকে বলে বাতুলতা তাহাই মাত্র। তাহার কর্ত্তব্য অন্যরূপ—
ন এই পথেই রমলাদের বাড়ীতে পড়াইতে যাইবে স্থির করিল এবং
াল হইতে মনের সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসের মোহ ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত
তীত পরিচয়কে অস্বীকার করিয়া সে পড়াশুনা সুরু করিবে।
যমন করিয়াই হোক্, সে অপর্ণার অবিরাম দুর্ণিবার আকর্ষণ হইতে
নিজেকে মুক্ত করিবে। কেহ ভাল বাসিল না বলিয়া দুঃখ করা
লে, দুঃখময় জীবনকে ধ্বংস করা চলে, কিন্তু অভিযোগ করা
লে না—

অমল রমলাদের বাড়ীর সদর দরজায় কড়া ঘনঘন নাড়িয়া
ল। খোকা দরজা খুলিয়া একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে
াহিয়া বলিল—আপনি?

অমল কথা বলিল না,—পড়িবার ঘরে বসিয়া খোকার উদ্দেশ্যে
হিল—বই নিয়ে এস—

বই একতলা হইতে দ্বিতলে স্থান পাইয়াছিল, খোকা আনিতে
গল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না। রমলা আসিয়া বলিল,—কবে
লেন? আপনার মায়ের শরীর ভাল?

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল,—হ্যাঁ।

রমলা একটা চেয়ারে বসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,—পথ্য
'য়েছেন?

—হ্যাঁ।

—এত শিগ্‌গির চলে এলেন, আর একটু সুস্থ ক'রে এলেই ত
ারতেন।

অমল এই সামান্য সহানুভূতিতে অনেকটা আনন্দ বোধ
রিল—অশান্ত অভিমান পীড়িত অন্তরে যেন একটা ঠাণ্ডা প্রলেপের
কামলতা অনুভব করিল। অমল হাসিয়া বলিল,—খোকার
ড়ার ক্ষতি হচ্ছে, আর আমি থেকে বিশেষ কিছুই ত ক'রতে
ারবো না।

—কি অসুখ?

—জ্বর, তার সঙ্গে অন্যান্য একটু বুকের দোষও ছিল।

—বাড়ীতে শুশ্রূষা ক'রবার কে আছেন?

—মা বলেন ভগবান আছেন, আর আমি বলি সহৃদয়া
প্রতিবেশিনীরা আছেন।

রমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—যা হোক্ খুব ভরসা ব'লতে
হবে।

—হ্যাঁ, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান ব'য় একটা কথা আছে।

রমলা প্রবেশোন্মুখ খোকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—চা'র
ব্যবস্থা ক'রে এসেছিস? যা নিয়ে আয়—এতদিন পরে উনি এলেন,
একটু ভদ্রতাও ত ক'রতে হয়!

অমল বলিল,—আপনি থাক্‌তে তার ভাবনা নেই বলেই মনে
হয়!

চা আসিল। অমল দুই এক চুমুক খাইয়া বলিল,—আপনার
খবর কি,—এতদিনে নতুন কিছু—

রমলা বলিল,—একটা সুখবর আছে, আমাদের একটা
Cultural society হ'য়েছে, আমি মেম্বার হ'য়েছি। পরে
আপনাকেও মেম্বার ক'রবো।

অমল ভীত কণ্ঠে বলিল,—সেখানে কি হবে?

—সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

অমল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমি যে কাপালিক!

রমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—কাপালিককে
এবার কালিদাস ক'রে দেব আমরা সকলে মিলে। আপনার অঙ্কশাস্ত্র
বড়ই নিরস,—ভরসা আপনার মাঝে এখনও যেন একটু সাহিত্যপ্রীতি
জীবিত আছে—

—সেটা যে জীবিত আছে এটা বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু
আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রলে মনে হয় যেন কিছু কিছু
বুঝি—

—যাক্, যদি ভাল লাগে, আপনাকেও সভ্য হ'তে হবে
কিন্তু।

—অবশ্যই, সাহিত্যক্ষেত্রে আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে
যাবেন, দেখি ও সব ব্যাপার কিছু কিছু বুঝি কিনা।

রমলা আঁখি ভঙ্গি করিয়া কহিল,—ও সব একেবারেই না
বোঝেন এমন ত নয়, তবে স্বীকার করার সৎসাহস আপনার থাকা
উচিত।

—তার চেয়েও বড় প্রয়োজন আপনাকে—

কথাটা দ্ব্যর্থক, রমলা তাহা বুঝিয়াই আত্মপ্রসাদের সঙ্গে কহিল,
—আমাকে?

রমলা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হাসিয়া প্রস্থান করিল। অমল
এতগুলি মিথ্যাকথার পুনরুক্তি করিয়া মনে মনে কেন যেন খুশী
হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কর্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

(পূর্বানুবৃত্তি)

ধর্মবিশ্বাস মেডিঈভ্যাল্ (মধ্যযুগের); ধর্মমত মানুষের মনকে ভেদাভেদ সংস্কারের দ্বারা সঙ্কীর্ণ তার বুদ্ধিকে গোঁড়ামি দ্বারা বিকৃত করে, অতএব রাষ্ট্রতন্ত্র ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি থেকে ধর্মকে বার ক'রে দিয়ে মন্দিরে মস্‌জিদে অথবা চার্চে তাকে চাবিবন্ধ করে রেখে দাও, তবেই উন্নতি—অনেকে আজকাল এইরকম কথা বলছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে আমাদের দেশের অনুষ্ঠান-গুলিকে যা কলুষিত করছে সে ধর্ম নয়, ধর্মের বিকার। যে তথা-কথিত ধর্মবুদ্ধি মানুষকে তার বিবেক এবং বিচার-বুদ্ধির উল্টাপথে প্ররোচিত করে সেটা ধর্মবুদ্ধি নয়, অধর্মবুদ্ধি। যা বিবেক বর্জিত, তাকে ধর্মের ছাপ দিলেই তা ধর্ম হয় না। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা বিবেকের পরিপন্থী। কোন্ ধর্মে বলে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করো, মানুষকে ঘৃণা করো? গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, নীচতাকে ধর্মের মুখোষ পরিয়ে নিয়ে এলে তাকে ধর্ম বলে না বলে ধর্ম-বেশী। ধর্মবেশীর ওপর রাগ করে যদি বলো ধর্মকেই বহিষ্কৃত করে দাও—তাহলে মানুষের শিক্ষা সভ্যতা লব্ধ আর সমস্ত বৃত্তিগুলোকেও বহিষ্কৃত করে দিতে হয়, কেননা যে মানুষ হীন, সে তার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সব রকম বড়ো বড়ো মুখোষ পরিয়ে আনবে, যথা নীতির মুখোষ, সৌভ্রাতৃত্বের মুখোষ, বিশ্বপ্রেমের মুখোষ, বিশ্বহিতের মুখোষ, নিঃস্বার্থ পরমঙ্গলের মুখোষ ইত্যাদি। ছদ্মবেশীদের দৌরাত্ম্যে তুমি যদি আসলগুলিকেও গলাধাক্কা দাও, তাহলে শুধু রাষ্ট্র কেন, কোনো অনুষ্ঠানই চলবে না। ছদ্মবেশীদের ছলনা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যদি আসল নলরাজাটিকেও সভা হতে বহিষ্কৃত করা হত, দময়ন্তীর তাহলে স্বয়ম্বরা হওয়াই হত না। ধর্মকে দিয়ে মানুষ দেশে দেশে, কালে কালে অনেক উঞ্ছবৃত্তি করিয়েছে, করছে এবং সুযোগ পেলেই করবে,—অসুররা যেমন দেবতাদের বন্দী করে এনে পা টিপিয়েছিল। আর তুমি যদি ধর্মের নাম সইতে না পারো, নীচ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুমি যার নাম সইতে পারো তারি মুখোষ প'রে আসবে। তখন তুমি কি করবে? এর একমাত্র উপায় হল, অকল্যাণকে দূর করতে হলে আসল থেকে নকলের প্রভেদটাকে খুব ভাল করে চিনতে হবে। দময়ন্তী জানতেন দেবতারা ছায়া ফেলেন না, তাঁদের অনিমেষ নয়ন, স্বেদাম্বুহীন কায়া। তাতেই তিনি আসল নলকে চিনতে পেরেছিলেন। ধর্মবেশীর মুখোষের ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলতে হলে ধর্মের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকা চাই; সুতরাং ধর্মকে দূর করে দেওয়া নয়, তাকে আরো ভাল করে জানতে হবে।

স্বদেশের ও বিদেশের সমস্ত আদর্শ কর্মীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁদের প্রত্যেক লক্ষণটি গীতার কর্মযোগের মধ্যে রয়েছে, কোনোটি বাদ যায় নি। এমন কি তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বর মানতেন না, তাঁরা নিজেকে মানতেন। এই নিজেকেই গীতা বলেছেন আত্মা, আর তত্ত্বজ্ঞানীমাত্রেই জানেন—আত্মা আর পরমাত্মা একই। তাঁরা সকলেই যে হিন্দু তাও নয়,—কেউ কেউ কোনো ধর্মমতই মানতেন না। সকলেই যে গীতা পড়েছিলেন তাও নয়, কেউ কেউ ভাল লেখাপড়াই জানতেন না। তবু তাঁদের সংকার্য-গুলি গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। এব্রাহাম্ লিংকন, সান্‌ইয়াট্ সেন্, কামাল আতাতুর্ক, লেনিন,—মাত্র এই ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট—এঁরা বিভিন্ন মহাদেশের মানুষ হলেও, আদর্শ কর্মযোগী এঁদের বলতে কোনো হিন্দুরই বিবেকে বাধবে না। এই সব বিভিন্ন মানুষের কাজের সঙ্গে গীতোক্ত কর্মযোগের এত মিল কেন? তার কারণ, গীতোক্ত কর্মযোগ মানুষের সহজাত ধীশক্তি ও প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত—কোনো সঙ্কীর্ণ ধর্মমত বা আবেষ্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—প্রতিভার এমন উন্নততম বিকাশ,—যে আমরা, যারা বহু শতাব্দীর চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট, মানুষের বহুতপস্যায় লব্ধ জ্ঞানের দান যারা পেয়েছি, তারা যদি কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আধুনিক তত্ত্ব গীতায় আছে কিনা খুঁজে দেখতে চাই, আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে হবে না, দেখতে পাবো গীতা আমাদের অনেক আগেই এগিয়ে চলে গেছেন, আমরাই বরং পিছনে পড়ে আছি। গীতা নিয়ে যাঁরাই একটু নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই একথা স্বীকার না ক'রে পারবেন না। বিদেশী পণ্ডিতের সার্টিফিকেট্ জাহির করব না, কেননা তা অপ্রীতিকর। শুধু William Humboldt এর উক্তিটিই উল্লেখ করব, কারণ এটি তাঁর করুণ হৃদয়ের সার্টিফিকেট নয়, কৃতজ্ঞচিত্তের নমস্কারে নত বন্দনা,—"It (the Geeta) is the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue."

একটিমাত্র শ্লোকে কর্মযোগের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়টিকে গীতায় বহন করে আনা হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার দিক দিয়ে এমন শ্লোক অতুলনীয়। সে শ্লোকটি আমরা বহুবার শুনেছি, কিন্তু ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেছি কি ?—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূ: মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি।

এই শ্লোকে চারটি কথা বলা হয়েছে,—(১) কর্মেই তোমার অধিকার (২) ফলে কদাচ তোমার অধিকার নেই (৩) তুমি কর্মফলহেতু হয়ো না, মানে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কাজে প্রবৃত্ত হবার হেতু না হয় ; এবং (৪) কর্মত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়।

আমাদের বুঝতে হবে কর্ম বলতে কি রকমের কাজ বোঝায়, 'অধিকার বলা হয়েছে কেন, এবং কর্মফল মানে কি ? আর কিছু লেখার আগে পূজ্যপাদ পূর্ববর্তীদের মনে মনে স্মরণ করি প্রণাম করি, তাঁদের ঋণ অন্তরের কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করি। আমার মতো নগণ্য লেখকের সঙ্কোচ সহজেই অনুমেয়। বিনয়ের ভণিতা করাও অশোভন, কেননা এক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশ অহঙ্কার প্রকাশেরই নামান্তর। আমি আর কীই বা বলতে পারি, এক শুধু ভূমিকা-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকু প্রতিধ্বনি করা ছাড়া ?—"আমি এমন বলিতেছি না যে আমি ইহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, বা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব।···যতটুকু পারি বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধহয় ক্ষতি নাই।" "ক্ষতি নাই"—এইটুকুই আমার সান্ত্বনা, এইটুকুই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির মার্জনার পথ পরিষ্কার করে যেন।

করণীয় কাজের কথা উঠলে প্রথমেই দুটি বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হতে হবে—সনাতনী এবং প্রগতিশীল। সনাতনী মত, হল পূজা-অর্চন, ঈশ্বরারাধনাই হল একমাত্র কাজ, আর সব বাজে কাজ। হিন্দু শুধু নয়, সকল ধর্মের সনাতনীদের এই মত। আর প্রগতিশীলদের মত, হল, পূজার্চন, মন্দির মসজিদ্ চার্চ গমন—এ সবের প্রয়োজন নেই, সমাজসংস্কার, জাতিগঠন, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিসাধন, এই সবই হল আসল কাজ। সনাতনীদের স্মরণ করিয়ে দিই পুণ্যফলপ্রাপ্সু হ'য়ে যাঁরা পূজার্চন সাধনভজন নিয়েই আছেন, পরের দিকে একবার দৃকপাতও করেন না, গীতা তাঁদের নিন্দা করে বলেছেন তাঁরা 'অবিপশ্চিত'—অল্পবুদ্ধি, তাঁরা কামাত্মা, তাঁরা স্বার্থপর, স্বর্গপর। এ রকম লোক সংসারাবদ্ধ মনুষ্য কীটের মতোই ঘোর স্বার্থপর। এই দুই স্বার্থপরতার বাইরের চেহারাটা আলাদা—একটা আধ্যাত্মিক, অপরটা সাংসারিক—কিন্তু ভেতরটা এক।

কিন্তু তাই বলে আবার এমন ভুলও যেন না করি যে পূজার্চন-সাধন ভজন ব্রত নিয়ম সব নিষিদ্ধ হয়েছে। গীতা বলেছেন পুণ্য-ফলের লোভে নয়, নিষ্কামভাবে করতে হবে এ সব। পূজার্চনা, সাধন ভজন কিসের জন্যে ?—চিত্তশুদ্ধির জন্যে। কামনা, বাসনা, শোক, হিংসা প্রভৃতি হতে চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে, তবেই মঙ্গল। আগে শান্তং, তারপরে শিবং। নইলে চিত্তশুদ্ধি নিজেই নিজের একমাত্র লক্ষ্য,—an end in itself—হতে পারে না। আমরা সচরাচর যেসব জিনিষ দিয়ে কাজ করি, যেমন ছুরি, কাঁচি, কোদাল, কুড়ুল, থালা, ঘটি, বাসন,—এদের শান দিয়ে বা ধুয়ে মুছে পালিশ ক'রে রাখতে হয়, যাতে এরা আরো ভালো ক'রে, আরো অনেকদিন ধরে কাজে আসে। তেমনি পূজার্চনব্রতনিয়মাদির দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে, চিত্তশুদ্ধ করতে হবে, এগুলি হল মনকে প্রস্তুত করার তপস্যা। কিসের জন্যে প্রস্তুত করবার ?—মানুষের মঙ্গল করবার।

মঙ্গল কাকে বলে ? নিজের সুখ যে কি তা সকলেই জানি। প্রত্যেকে নিজের সুখের জন্যে লালায়িত। ভোগের সমস্ত আয়োজন, উপকরণ নিজের দিকে আকর্ষণ করি কারণ তা করতেই ভাল লাগে, পরকে বঞ্চিত করতেও দ্বিধা করি না, কারণ পরের ভাল ভাল লাগে না। নিজের ভোগকে বাড়াব কেমন করে যদি পরের ভোগকে খর্ব না করি ?—তাই আমার সুখ পরের দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনি আবার পরের সুখ নিজের দুঃখের কারণ হয়। কর্তব্য বলে, পরের সুখে উদাসীন হয়ো না, আমরা বলি, কর্তব্য ভারি অপ্রিয়, কঠোর। প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ নিয়ে লড়ছি ব'লে এ জগতে বিরোধের পর বিরোধ জমা হয়ে উঠেছে। নিজের স্বার্থ নিয়ে লড়াই কেন ?—নিজেকেই ভালবাসি, অপরকে ভালবাসি না বলে। কিন্তু এই এক আশ্চর্য জিনিষ আবার এক শুধু মানুষের মধ্যেই দেখতে পাই, জন্তুজানোয়ারের মধ্যে পাই না—যে মানুষের ভালবাসা যতই গভীর হতে গভীরতর হয় ততই সে ভালবাসা আপনাকে অতিক্রম করে পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়।' শিশু খেলনা আঁকড়ে ধরে, তাতেই তার সুখ, তাতেই তার আনন্দ। খেলনা কেড়ে নাও, তার দুঃখের আর শেষ থাকবে না। সেই শিশু বড় হয়ে নিজে যখন বাপ হয়, তখন খেলনা নিজে নিয়ে আর সুখ নেই, খেলনা তার শিশুসন্তানের হাতে তুলে দিতে পারলেই সুখ। মানুষ এর চেয়ে বড় সচরাচর আর হয় না, তার ভালবাসা নিজেকে অতিক্রম ক'রে কেবল তার পারিবারিক গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

"আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে ?"

যখন সে আরো বড় হয়, তখন সকল মানুষকে নিজের মতো, নিজের

ছেলের মতো, নিজের আত্মীয়ের মতো দেখে। একেই বলে সর্বভূতে আত্মদর্শন। তখন আত্মপ্রীতি সর্বজীবে ভালবাসা রূপে দেখা দেয়। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি,—যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলেছিলেন মৈত্রেয়ীকে—

আমার ভালবাসা আছে
সবার ভালবাসা হ'য়ে,
আমার প্রীতিকামনাতেই
প্রেমের ধারা যায় রে ব'য়ে।

ভালবাসা যখন এম্‌নি ক'রে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন পরকে বঞ্চিত রেখে নিজের ভালতে আর সুখ নেই, তখন পরের ভালতেই আনন্দ। পর তখন আর পর নয়, একেবারে বুকের মধ্যে এসে আপন হয়ে যায়। তখন সকল দ্বন্দ, সকল বিরোধ ঘুচে যায়, স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে তখন সমস্ত কাজ পরার্থে উৎসারিত হয়, তখন কর্তব্য আনন্দময়, ত্যাগ আনন্দময়। মানুষের প্রেম যখন এম্‌নি ক'রে জাগে, তখন তার মনের সমস্ত তমঃ ঘুচে যায়। তখন তার দিবাও নয়, রাত্রিও নয়—তখন তার মনের আলো আর রাত্রি দিবায় খণ্ডিত নয়, মনে তখন চিরন্তন জ্যোতিঃ, তখন আর সৎও নয়,অসৎও নয়, ভালও নয়, মন্দও নয়, তখন শিব এব কেবলঃ—তখন কেবলি শিব, তখন অবারিত মঙ্গল,—

যদা অতমঃ তং ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্ন চাসঞ্চ্ছিব এব কেবলঃ। (শ্বেতাশ্বতর)

কর্মযোগের কর্ম হল মানুষের এই মঙ্গলকর্ম। একবার নয়, দুবার নয়, বারংবার ক'রে গীতা এ কথা বলেছেন। প্রথমেই মনে করিয়ে দিই তাঁদের, যাঁরা ভেবে রেখেছেন সাধনভজন উপাসনা সংযম নিয়মই হচ্ছে একমাত্র পরমার্থ; তা নয়—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ।

—কিন্তু যাঁরা সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে ইন্দ্রিয়গুলি সম্যক্ সংযত ক'রে অব্যক্ত অনির্দেশ্য সর্বত্রগ অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ধ্রুব নির্বিশেষ অক্ষরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা যদি সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকার্যে রত থাকেন তাহলে আমাকে (ঈশ্বরকে) পান। ক্রমশঃ

বন্ধু

শ্রীরণজিৎরঞ্জন দত্ত

বহুদিন পর রমেশের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে গেল। ছোটবেলাকার বন্ধু! দেখে খুবই আনন্দ হ'ল! তাই ডেকে বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

অনেক কথাই হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম: কি করছ আজকাল?

বললে: আজকালকার দিনে যা সবচেয়ে লাভজনক তাই অর্থাৎ ব্যবসা।

ব্যবসায় যে খুব লাভ হচ্ছে তা তার জামাকাপড়,সোনার বোতাম, ঘড়ি এবং ফাউন্টেন পেন দেখেই বেশ বোঝা যায়।

ঠিক করে ফেললুম, রমেশ এবং আমি একত্রে ব্যবসা করব। ব্যবসা আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না। তবে রমেশের ন্যায় বন্ধু যখন আছে তখন আর ভাবনা কি?

ঠিক হ'ল, প্রথম যা টাকা লাগবে, তা আমিই দেব।

* * * *

রমেশ কয়েকদিন আমার বাসায় খুব ঘোরাফেরা করতে লাগল। একদিন ওর সঙ্গে সমস্তই ঠিক করে ফেললুম। পূর্বের কথানুযায়ী, ও কে একটা হাজার টাকার চেক কেটে দিলুম।

টাকা পেয়ে ও আর আমার সঙ্গে দেখাই করে না। ব্যাপারটা কি? টাকাটা মেরেই দিল কিনা কে জানে?

না; একদিন ওর একটা চিঠি পেলাম। টাকা তা হলে মারা যায় নি! আর রমেশ কি টাকা মারতে পারে? নিশ্চয় এতদিন কোন কাজে ব্যস্ত ছিল বলে আসতে পারে নি—তাই চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

লিখেছে:

বন্ধু!

আর বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শেষ পর্য্যন্ত, তোমাকেই 'ভুয়ো' ব্যবসার লোভ দেখিয়ে ঠকাতে হোল। যাক্, দুঃখ করো না। লোককে ঠকানই আমার ব্যবসা। কি ব্যবসা করছি তা সেদিন তোমায় জানাতে পারি নি। আজ নিশ্চয় সেটা জানতে পেরেছো। প্রীতি নিও। ইতি—

হতভাগ্য রমেশ।

হিসেব নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

ডাক্তার ব্যস্তভাবে উঠে—"ইস্—করলে কি মাণিক—ডাকতে হয়—চারটে বেজে গেছে যে! যাবার কথা পাঁচটায় না? ওদের engagement আর imprisonment এক কথাই। দুটোতেই বদ্ধ থাকতে হয় যে"—

মাণিক। আজ্ঞে তা হয় বই কি মশাই—

ডাক্তার। তুমি তো বেশ কলায়ের-দাল-মাখা বুলি ফস্ করে' বললে। এ তো শ্বশুরবাড়ী যাওয়া নয় যে একটা পাঞ্জাবী চড়ালেই আর কোঁচা ছড়ালেই কার্ত্তিক! এ যে বড় কঠিন ঠাঁই। একটি বই কোট নেই যে। তুমি আবার 'disinfect' শুনিয়ে বেড়া নেড়ে দিয়ে এসেছো। ডাক্তারদের নিজের বেলা ও কথার মানে—"ঝেড়ে পরা"! ও কথা যে অন্যের জন্যে—

মাণিক। আপনাদের সঙ্গে এতদিন রয়েছি, সেটা আমি জানি হুজুর। কোটটা তাই রোদ্দুরে দিয়ে শুদ্ধ করে' রেখেছি। এখন একবার বুরুস্টা ঘোসে দি। হবে না?

ডাক্তার। খুব হবে, বেশ হবে, অতিরিক্তও হবে। রদ্দুর য শুদ্দুর প্রধান বস্তু—পঞ্চগব্যের ওপর। আজকাল সাগর-পারেও সার্টিফিকেট পেয়েছে। সেখানকার মেয়ে মদ্দে যদ্দুর পারেন সর্বাঙ্গে নিত্য রদ্দুর লাগাচ্ছেন। ভারী পবিত্র হে। আমাদের রৌদ্রপক্ক চাষী ঘরামীদের দেখনি, সারাদিন রোদে থেকে কি চেহারাই বানিয়েছে—স্বাস্থ্যের আস্তো নমুনো। যাক্, কিন্তু হাপ্‌প্যান্টা যে পরেই আছি—

মাণিক। ভুলে যান কেনো—আপনার instalment রক্ষী security-pantটা যে fast করছে, এখনো অঙ্গে ওঠেনি!

ডাক্তার। তাই নাকি! আমায় বাঁচালে—দাও দাও, ওটা গলে ফেলি। উঃ—এদিকে যে সাড়ে চারটে হয়!

মাণিক। এই নিন না—পরে ফেলুন—পরে ফেলুন। আমি হাটটায় ব্রাস্ বুলিয়ে আনি।

ডাক্তার তয়ের হয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে—মাণিক না থাকলে আমার অস্তিত্বই নেই, কোথায় গেল'? ডাক্ দিলেন। মুখে দুর্গা নাম তখন ঘন ঘন চলছে।—"তাই তো O/C আবার ডাকলে কেনো?"

কোট হাতে মাণিক হাজির—"নিন, পরে' ফেলুন দিকি"—

* * * এই তো, আবার কি চাই? ডাক্তার খাস্তগিরের মত দেখাচ্ছে। হাঁ—ষ্টেথিসকোপ্‌টা নিতে ভুলবেন না।

ডাক্তার। ও আবার কেনো? আমি তো রোগী দেখতে যাচ্ছি না।

মাণিক। তা কি বলা যায় মশাই। ওটা আপনাদের 'আপ্তসার'—এইন্ত্রীর চিহ্ন। ও-সি (O/C) খুসিই হবেন। দেখবেন—রোগ বেরিয়ে পড়বে।

ডাক্তার। বলো কি? তুমি যে ভাবালে। ওদের আবার রোগ আছে নাকি? বলছো—দাও।—

ষ্টেথিসকোপটা নিয়ে পকেটে পুরলেন।—"তুমি যাবে না!"

মাণিক। না—তিনি আপনাকেই ডেকেছেন। ওদের মাপা কাজ—মাপা কথা—বাড়তি কিছু পাবেন না। আমার না যাওয়াই উচিৎ।

ডাক্তার। (চিন্তিতভাবে) তাই তো। তবে একাই দুর্গা বলি, কি বলো।—মা দুর্গতিনাশিনী—

(যাত্রা করলেন)

মাণিকলাল (আপন মনেই)—দাড়িটে কিন্তু চেঁছে নিলেই ভালো হ'ত—আর বললুম না। একে চঞ্চল মানুষ, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, তায় ভোঁতা blade—রক্তারক্তি করে বসতেন। মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের বাধাও আছে। খাসা লোক কিন্তু।—

—যাক, ভেবে আর কি করবো।—এদিকে এসে পর্য্যন্ত বাড়ির খবরও পাইনি। না পাওয়াই ভালো। খুদিটা কেমন আছে কে জানে! দেখতে দেখতে তো বেড়েই উঠছে। 'সারদা' সাহেব বিয়ের বয়স বাড়িয়ে বরদার কাজ করেছেন, তাই রক্ষা।—

—যাদের হতভাগ্য বাপেরা বিদেশে অল্প বেতনে চণ্ডীর কৃপা পেয়েছে, তাদের ছেলেদের জন্যে দুর্ভাবনা নেই—রাখাও মিছে। সান্ত্বনার মধ্যে—যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তেমনি হবে। তার একটি অক্ষর ঘোচাবার সাধ্য কারো নেই। বঙ্কিমবাবুদের সংসারে মা বলতেন—ওকে তোমরা বোকোনা, পীড়ন কোরনা। ও ডিপুটি না হয় নাই হোলো, মুন্সেফ হবে। আমরা বলি—সাইকেল মেরামত করবে, না হয় বিচুলি বেচবে। অদৃষ্টে থাকে তো শেষে

বিনি-পয়সায় জীবন বিমার (Life Insuranceএর) এজেন্ট হতেও পারে। মিছে ভেবে ম'র কেনো !—

—আমাদের দৃষ্টি আর কতটুকু—পালম শাকের ক্ষেতে ছাগল ঢুকলো কিনা—পর্য্যন্ত। বাড়ের কিছু তো দেখি না। বাড়ের মধ্যে ঘুঁতে ছেলেটার মাসে দুবার টনসিল বাড়ে, আর খুড়ো মশায়ের বেড়াটা বেড়ে এগিয়ে আসে। ঘুঁতের মা কিন্তু যখন-তখন শোনান—"চাল বাড়ন্ত"। শুনে খুসি হই, বলি—হরির দয়া। তখুনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শোনান—"না আনলে যে চলবে না"। ভাবি—সে আবার কি রকম বাড়ন্ত! শেষ রঘু মুদী "বাড়ন্তর" মানে বুঝিয়ে দেয় !—

—ভোমলাটাকে কাছে রেখে পড়াতে পারলে বোধ হয় কিছু হোতো, সে আমার দুক্ষু বোঝে। দেড় বছরে 'প' বর্গে পৌচেছে, নতুন বই কিনতে বড় হয় না, বা দেয় না—যথা লাভ। নিজে তো দেখতে পারব না—মাষ্টার রাখতে হোতো, মাসে মাসে ছ' টাকা জলে যেত'।—

—ডাক্তার মশাই আমার পাকা লোক, সব বোঝেন। তাঁকেই সব কথা বলি, পরামর্শও চাই। বললুম—ছেলেটার মাথা আছে—যা একবার শোনে তা ভোলে না। কার কাছে "সমীচীন" কথাটা শুনেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "সমীচীন" কি বাবা ?—ভাগ্যিস বানানটা জিজ্ঞাসা করেনি! বললুম—এই যেমন "মেডিসিন, সাড়ে তিন"—অমন ঢের আছে রে, ও এখন নয়—এর পর শিখিস।—তাই মাষ্টারের কথা ভাবছি মশাই।—

—শুনে বলেছিলেন—অবস্থা বুঝেই সব। মাথা খারাপ কোরো না। ওসব ফালতু আয়ের কাজ—আমাদের জন্যে নয়। যুধিষ্ঠিরেরও হেঁটে মহাপ্রস্থান আছে। এর মধ্যেই ছেলের জন্যে মাষ্টার কি! তার চেয়ে ভগবতীর সেবা ভালো—দুধও পাবে, ঘুঁটেও পাবে। ভাগ্যে বেশী পেলে—রোজগেরে ছেলের কাজ দেবে। টাকায় এখন দুসের দুধ দাঁড়িয়েছে। মনে করনা—যুদ্ধ শেষে আবার দশ সেরে উঠবে! টেক্সো একবার বাড়লে কমতে শুনেছ কি? দুধও তখন পো হিসেবে দয়া দেখাবেন। তার সঙ্গে বড় লোকের দয়া মিশে তাকেই কায়েমিপাট্টা দেবে। একটু ভেবে দেখো। ইত্যাদি—

—হুজুর খাঁটি কথা কন্। মাথায় কিন্তু দুনিয়া ঘোরে। সকল বিষয়ই ভাবা আছে। বলেন—"ওটা নিম্ন মধ্যবিত্তের বিত্ত-শূন্য চিত্তপ্রসাদ, অর্থাৎ দায়িত্ব হে। আমরা না ভাবলে ভাববে কে?"

—ইস্—ঘণ্টা উত্তরে 'গেল'—ফেরেন না যে! দেখব নাকি? খাসা মানুষ, সুখে দুঃখে সব সময়েই রহস্যপ্রিয়। মনটি বড় সাদা। তাই ওঁর জন্যে এত ভাবি, দুদণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না, অনেকের কাছেই তো কাজ করলুম—এমন মানুষ একটিও মেলেনি। ইনি কেবল একটি বিষয়ে কিছু কাহিল। অল্প বয়স, নূতন বিবাহ—ওটা বোধ হয় সকলেরি হয়, পরে ভুলে যাই। এখন তো আর কনে-বউ আসেন না—গৃহিণীই হয়ে আসেন, তাঁদের গিন্নীদের মত শ্রদ্ধায় রাখতে হয়। চিঠি আসে যেন Editorial Leader—'নতুন চালের' মত সইতে সময় নেয়। প্রায়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গাঁথা। ক্রমে আমাদেরি মত পয়ারে দাঁড়াবে।—এখন যেমন আমরা পাই—"শ্রীচরণেষু, সাবধানে থেকো, খ্যাঁসারির দালটা খেওনা। খুকিটের বোধ হয় দাঁত উঠছে, তাই পেটটা ভালো নয়। ভাববার দরকার নেই। একরাশ গোবোর মেখে ফেলেছি—ঘুঁটে ফুরিয়েছে। আজ আর নয়, আমার প্রণাম লও। ইতি সেবিকা।"—মোচোড়খেগো গেঁটে ভাষা নয়। অভিধান ঘাঁটতে হয় না—পদে পদে উদ্ধৃত কবিতার উপদ্রব নেই।—

—না: অনেক দেরি হল যে—দেখতে হয়েছে। মাণিক উঠে পড়লো।—এত দেরি হবার তো কথা নয়! তালাটা আবার কোথায় রাখলুম—এই যে—

"আর তালা লাগাতে হবে না হে—এসে গেছি" বলতে বলতে ডাক্তারের প্রবেশ।

মাণিক চমকে উঠে—বাচলুম মশাই—আমি যাচ্ছিলুম। সাহেবদের এতো ফালতু সময় থাকে জানতুম না! বরং আমাদের বদ্ হাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেই তাঁদের দেখি। yes or no বলতেই বলে' দেন কিনা। সত্যবাদীদের বলতে শুনেছি—তিরিশ বছর দেহের সব রক্তটুকু দিয়ে হুজুরদের চাকরি করলুম, কখনো বাড়ির অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে শুনলুম না, যেন রাস্তার কুলি মজুর ছিলুম!—দেরি হচ্ছে দেখে তাই দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম। যাক্—সংবাদ সব ভাল তো মশাই?

ডাক্তার। (হাসি মুখে)—সব বলছি—পেট ফুলছে। Cape of Good Hope আগে একটা ধরাই—I mean your Gold flake—

"বসুন—এই নিন না।"

ডাক্তার।—বুঝলে মাণিক, একেবারে ফ্রন্টিয়ারে গিয়ে পড়েছিলুম হে—সেখানে রক্তের কারবার। আমার দেহে কিন্তু এক ফোঁটাও ছিল না—থোঁড়-মেরে গিয়েছিলুম। Military Call (ডাক্) আমার দেহের কল্ বিগড়ে দিয়েছিল। দেখি—আমাদের সেই কামিজপরা Savior (রক্ষাকর্ত্তা) বারাণ্ডায় ঘুরছেন।—আমাকে দেখেই—"আসুন—আসুন। সাহেব দু'বার খোঁজ করেছেন।"

শুনে প্রাণটা শিউরে গেল।—"এতো খোঁজ কেনো, ব্যাপারটা কি, একটু বলে' দাও ভাই।"

কামিজপরা ক্লার্ক কিশোরী, হাসি মুখে বললে—ভাববেন না, ব্যাপার কিছুই নয়। জানেনই তো বড় লোকদের কাণ্ড—সবই প্রকাণ্ড। সাহেব তায় খাস আমেরিকান—মর্ত্তের দৌলতাবাদের লোক। লাইম্ যুস্ ঢেলে, দু' ডিশ্ (meat) মাংস খেয়েছিলেন। রাতে গলা খুস্ খুস্ করে' থাকবে, দু'বার ক্যাম্প কাঁপিয়ে কেসেও ছিলেন। সেই দুর্ভাবনায় মন-মরা হয়ে বসে' আছেন। বন্ধুদের কাছে ওঁদের শোনা ধারণা পাকা করা আছে।—ইণ্ডিয়ার সব কিছুই বিষাক্ত।—একবার একটা কাট-পিঁপড়ে কামড়ায়, তাতে রক্ত পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি! এ আমার দেখা।

ওরা নিজের দেশের বাঘের কামড় সয়, ইণ্ডিয়ায় একটা মশা কামড়ালে ডাক্তারের ডাক পড়ে,—ভিয়েনাতেও ছোটে।—গুরু-ভক্তির পরিচয়।—(চঞ্চল ভাবে)—"না—আর নয়, আমি খবরটা দি"।

(ক্লার্ক কিশোরী খবর দিতে চলে গেলেন)

শুনে আমি বাঁচলুম, পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম যন্তরটা (টেথিসকোপটা) আছে। ভাগ্যে দিয়েছিলে মাণিক! আমি 'টেথিসকোপে' ওস্তাদ, sound—শব্দ আমার হাত-ধরা। অনাহতও আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না।—আনন্দে—কামানো গোঁফেই তা দিয়ে ফেললুম!

কিশোরী বেরিয়ে এসে ডাক দিলে—"আসুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি কোটটা টেনে—তার কোঁচমেরে, যতটা পারি সোজা হয়ে, গটগট্ করে' হাজির হয়েই—রগে চারটে আঙুল চিত্ করে' ঠেকিয়ে, সাহেবকে সামরিক সেলাম করলুম।

—O/C খুসি হয়ে, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বিনীতভাবে বললুম—"ক্ষমা করবেন, আমাদের সেটা নিয়ম নয় Sir. আগে আপনার আদেশ শুনি—আজ্ঞা করুন"।

সাহেব খুসির হাসি হেসে, নিজের কাসির কথা কইলেন ও চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে X' Rayর ব্যবস্থা আছে কি?"

শুনে আমি অবাক! বললুম—X' Ray কেনো, কি হবে Sir! Chest বা lungsএ (বুকে কি গলনালিতে) কিছু হলে', তার soundএই defect (শব্দেই তার দোষ) ধরা পড়ে? পরে অন্য ব্যবস্থা। আপনি ভাববেন না—your humble Doctor is an expert in detection by sound—আমি ও সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—

"আপনার সঙ্গে কোনো যন্ত্রাদি আছে?"

নিশ্চয়ই আছে Sir—I believe you mean থর্মমিটার—Thermometer. It is an inseperable appendage of our body Sir—সেটা যে আমাদের অঙ্গের অংশ বিশেষ, বলেই সেটা বার করে ফেললুম।

Very good, come in please. বলেই উঠে—পাশের একটা পর্দ্দাফেলা ঘরে ঢুকে পড়লেন—সঙ্গে আমি। গায়ের কাপড় (পোষাক) খুলতেই যেন আকাশ থেকে শিবের দক্ষযজ্ঞ বিনাশন বীরভদ্র উপস্থিত। কী বিরাট মূর্ত্তি, যেন marble rock কোঁদা কাঠামো। ভাবলুম—এ বুকের sound—houndএর ডাকই শোনাবে।

বললেন—"am ready Doctor" (আমি প্রস্তুত।)—আমিও অপ্রস্তুত ছিলুম না। T. C. টেথিসকোপ আমার হাতের খেলনা—কাণের বন্ধু। মনেও বিশ্বাস ভোরপুর—আমি specialist, তাই দুর্গানাম নিতেও ভুলে গেলুম। পরীক্ষা আরম্ভ করে' দিলুম।

• প্রভুর কাঠা-প্রমাণ বুক—এ পিঠ ও পিট চষে' ফেললুম। কোথাও ভালমন্দ কোনো সাড়াই পাই না! Not even natural sound—ব্যাপার কি! দেহটি মেদমাংসের মৈনাক, শব্দভেদী যন্ত্র মূক মেরে গেল নাকি! সামনে সাক্ষাৎ ভীম, আমার অঙ্গ ক্রমে হিম। কেবলি তাঁর বুকে পিঠে থাবলাচ্ছি কিছুই পাচ্ছিনা!—বিরক্ত হবেন যে! তখন দুর্গা নাম আপনিই এলো। সাহসে ভর করে' বললুম—"আপনি আমাকে বুক পরীক্ষা করতে ডেকেছেন Sir?"

O/C বললেন "Why—what you mean? তুমি কি বলতে চাও?"

বললুম——You have got a chest, as best as Rock! No defect anywhere কোথাও কোনো খুঁৎ নেই, ওটা আপনার সাধারণ সহজ কাসি simply superficial আহারের সঙ্গে কোনো টক্ জিনিস ব্যবহার করেছিলেন কি?

বললেন—Yes Doctor, you have guessed aright. Now I remember I took about quarter of a pint of Lime juice with my evening meal ঠিকই ধরেছ। আমি খানিকটে লেবুর রস (আরক্) খেয়েছিলুম বটে।

বললুম—It clarifies every thing বাক্, ও কাসির জন্যে আর দুর্ভাবনা রাখবেন না। 'লাইম যুস' আপনার উপকারই করবে।

তাড়াতাড়ি 'টেথিসকোপটা' পকেটে পুরে বললুম—আর কোনো

চিন্তার কারণ নেই sir, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার তুষ্টির জন্যে, আমি না হয় তিন দিন পরে বৈকালে আর একবার এসে পরীক্ষা করে' যাব।

ও-সি (O/C) খুসি হয়ে বললেন—Many thanks—very much obliged Doctor—you are always welcome বহু ধন্যবাদ, বড় উপকার করলে ডাক্তার। তোমার কোনো বাধা নেই, সর্ব্বদাই আমার দ্বার তোমার জন্যে খোলা থাকবে, যখন ইচ্ছা এসো।

—বুঝলে মাণিক, আমার মন কিন্তু তখন ওই টেথিস্‌কোপের মধ্যে পড়ে। সরে' পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। বলো কি, একটুও আওয়াজ দিলেনা! তা কি করে' হয়! এমন তো কখনো হয়নি—হ'তেও পারে না। সকালে ওটা বেশ করে দেখতে হবে। না দেখে আমার স্বস্তি নেই। যাক্—

পরে ড্রইংরুমে এসে বললেন—take your chair please, এখন তো তোমার চেয়ারে বসতে আর আপত্তি নেই? আর ইতস্তত করতেও দিলেন না। চাঙ্গা হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—how is my house boy-that-that, I always forget his name Something like venola or vinolia—সে ছোকরা কেমন আছে, তার নাম আমার মনে থাকে না—

বললুম—"আপনি কি বিনোদীলালের কথা"···yes, yes. thanks. How is he? সে কেমন আছে?

Progressing well sir—very fine figure, may God help him.—The only son of an un-fortunate blind mother—ক্রমে ভালই দেখছি, অন্ধ মায়ের একমাত্র ছেলে—

Is he? any how save his life Doctor. Dont mind cost—তাই নাকি? মা অন্ধ?—যেমন করে হোক তাকে বাঁচাও ডাক্তার। খরচের জন্যে ভেবনা।

বললুম—আবশ্যক মত সবই করা হবে sir। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ তো আমার নিজের কর্ত্তব্য।

তার পরও সাহেব ছাড়তে চান না—এ কথা সে কথা, যেন আমাদেরি একজন। এ আবার কোন্ দেশী সাহেব!—চা বিস্কুট হাজির হ'ল—খেতেও হ'ল। শেষ হাতঘড়িটা দেখলুম। শোনাছিল ওটা নাকি বিদায় নেবার ইঙ্গিং, কখনো তা করতে হয়নি, করলে নিশ্চয়ই রক্ষা থাকত না।

ইনি কিন্তু বললেন—"কাজ আছে নাকি?" বললুম—একটা রোগীকে না দেখে ফিরতে পারব না,—caseটা বাঁকা। বড় সব গরীব, মনে পড়লেই চঞ্চল করে sir—

তবে আর তোমাকে detain করবনা (দেরি করাব না) এক মিনিট সময় দাও—বলেই উঠে গেলেন। তখুনি ফিরে এসে একখানা ১০ টাকার নোট—"এটা গরীবদের জন্যে" বলে' আমার হাতে দিলেন। "দরকার মত ব্যবহার কোরো।"

পরে দু ছড়া কাবলে কলার মত আঙুল, আমার সামনে ছড়িয়ে ধরে—"যেটা ইচ্ছে খুলে নাও"—অর্থাৎ আংটি।

সবিনয়ে বললুম—এখন থাক sir, ও সব আপনার সখের জিনিস, এ দেশে দুষ্প্রাপ্য। বিনোদী ভাল হয়ে উঠুক—

O/C বললেন—"না, একটা তোমায় নিতেই হবে as sovenir" ছাড়লেন না। তাঁর কড়ে আঙুলেরটি নিতেই হল'। আমার পায়ের বুড়ো আঙুলেও কিন্তু ঢলকো হবে।

বললেন—"তা হলে আমি তোমাকে 4th day afternoon expect করবো—(চতুর্থ বৈকালে)"—

আমি "Certainly sir—নিশ্চয়ই" বলেই Good night জানালুম।—তাই এত দেরি হয়ে গেল। কী বিপদেই পড়েছিলুম মাণিক! নিরক্ত অবস্থায়—মা দুর্গা আর মধুসূদনকে বিরক্ত করে' মেরেছি—

মাণিক। বিপদ কি মশাই, এ তো সম্পদের বিপদ—

ডাক্তার। তুমি বুঝছনা আমার মনের অবস্থা। ওই T. C. (টেথিসকোপ) আমাকে আজ মশালের শেষ সোপান পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়েছে—কেবল 'কোপ'টি এখনো ঝাড়েনি। সেটা টেথিস্‌কোপের মধ্যেই অপেক্ষা করছে। অন্তরটা কি বেইমান—একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলেনা হে! মুখের জোরেই ফিরে এসেছি—রোগ যদি থাকে তো তাঁর বুকেই রয়ে গেছে।—"নাহংকারাৎ পরো রিপু"। দয়াময়ী আমার দর্প চূর্ণ করে' শেষ বাঁচিয়ে ফিরিয়েছেন। এখন যা হয় করো। যন্তরটা ভাল করে' দেখতে হবে মাণিক! না হয় হেড্‌কোয়াটার থেকে একটা নূতন যন্তর আনিয়ে নিতে হবে। কারণ চতুর্থ দিনে আবার দেখব' বলে' এসেছি।

মাণিক। আপনি ভাববেন না, রাত্রেই আমি দেখে রাখব। তার পর আংটীটা দেখে "এ যে আসল হীরে মশাই!"

ডাক্তার। ওরা মরবার মুখে থাকে—তাই সব সাধ মিটিয়ে রাখে। বীরের হীরে শেষ ম্যাথরে পায়। সাহেবটি ভালো, তাই বোধহয় ব্রাহ্মণকে দান করে' রাখলেন। ভগবান ভালই করবেন।

উদাস ভাবে—বেদান্তই ঠিক্ কথা কয় হে—জগৎটা একদম মিথ্যে দিয়ে গড়া। যুধিষ্ঠিরকে দেখছ না, কিছুই তার আটকায় না—আবার মিছরি ঢুকিয়ে তাকে মিষ্টি করেও দিলে!

মাণিক। এতো খবরের কাগজ পড়েন, আবার ও কথা কেনো! তাতে এখন তো বহুৎ order made যুধিষ্ঠিরেরও দেখা পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই দরকার হয়ে থাকবে। ভেবে কাজ কি—মহাজনদের অনুসরণ করাই তো বিধি—

ডাক্তার। তা বটে, তবে থাক। বড়দের নজিরই তো—সাফাই। তবু পূর্ব্বসংস্কারগুলো মনে পড়ে' কষ্ট দেয়।

মাণিক। যতদিন কাজে থাকা, ততদিন ওসব না ভাবাই ভালো।

ডাক্তার দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাণিকলালের জ্ঞানের কথা শুনে একটু হাসি টেনে বললেন—"তবে কিছু খেতে দাও—শুয়ে পড়ি। আর পারছি না মাণিক।"

"এই যে নিন না"—মাণিক প্রস্তুতই ছিল। ডাক্তার আহারান্তে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রাদেবীর দয়াও সহজেই এসে গেল। মাণিক কাজকর্ম্ম না সেরে শোয়না।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

(১৭)

শোক প্রকাশ (ইংলণ্ডে)

উমেশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর ইংলণ্ডের নানাস্থানে শোকসভা আহূত হয়। একটি সভায়

অ্যাল্যান অক্টেভিয়াস হিউম বলেন :—

দীর্ঘকাল যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগান্তে আমাদের ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের অন্যতম একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী পক্ষসমর্থক ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী তাঁহার ক্রয়ডনের বেডফোর্ড পার্কে অবস্থিত বাসভবনে শান্তিতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রথমাবধি অবিচলিত চিত্তে উহা দ্বারা প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট

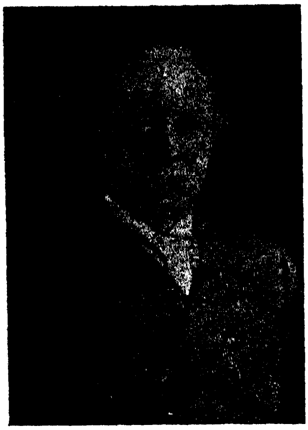

অ্যাল্যান হিউম

ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার শোকাবহ মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত বিজড়িত ছিলেন এবং উহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, সাফল্য ও নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহার পদগৌরবের ও মহান চরিত্রের, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও বিস্তৃত প্রভাবের শক্তি উহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আধুনিক কালে আর কোনও ভারতবাসী তাঁহার দেশবাসীর উপর—কেবল বাঙ্গালা প্রদেশে নহে সমগ্র ভারতবর্ষে—উমেশচন্দ্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তারিত করেন নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে, যেদিন হইতে তিনি শাসন সংস্কারের আন্দোলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে—তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন নাই—যখনই তিনি তদ্দ্বারা ভারত-বাসীর কোনও রূপ সাহায্য বা উন্নতি হইবে দেখিয়াছেন বা দেখিতে পাইয়াছেন মনে করিয়াছেন। যদিও এই দারুণ দুর্ঘটনা (কেবল তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী আমাদের নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণের ক্ষতি) অদূরবর্ত্তী গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অনেক দিন হইতে, প্রতীয়মান হইতেছিল, আমার সন্দেহ হয়, এখন এই শোচনীয় ঘটনায় আমাদের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি কি না। অবশ্য কয়েকমাস হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি বর্ত্তমান সঙ্কটময় কালে তাঁহাকে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিতে অক্ষম করিয়াছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও, তাঁহার উপদেশ ও অভিজ্ঞতা আমাদের সুপ্রাপ্য ছিল। আমার বিবেচনায় আমার সময়ের আর কোন ভারতবাসী তাঁহার দেশের নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞতার পাত্র নহেন। কোনও জীবিত ভারতবাসী তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিতে সমর্থ নহেন, কিম্বা তিনি অতীতে শাসন সংস্কারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারের আন্দোলন পরিচালিত করিতে তাঁহার ন্যায় যোগ্যতা কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন; এবং যদি তাঁহার তিরোধানে ভারতবর্ষ আজি রোদন করে, রোদন তাহাকে করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে যথার্থ-ই রোদন করিবে একজনের জন্য—যিনি তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহাকে ভক্তি করিয়াছেন—এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অসঙ্কোচে পরিহার পূর্ব্বক গত বিংশতিবর্ষকাল ব্যাপিয়া তাহার অধিবাসিগণের উন্নতি সাধনের ও মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমরা—ভারতীয় ও ব্রিটন—যাঁহারা এই বিংশতিবর্ষকাল তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—তাঁহার মৃত্যুতে যে কি ভাবে ব্যথা পাইয়াছি ও বহুদিন পাইব, তাহা সমুচিতভাবে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে আমি নিজে আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বন্ধুকে হারাইয়াছি। এমন কোন কল্পনাতীত ভীষণ বিপদ ছিল না যাহাতে পতিত হইলে আমি তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে যাইতাম না, এবং আমি নিশ্চিত জানিতাম তাঁহার নিকট প্রার্থিত যে কোন উপদেশ, সাহায্য, আন্তরিক ও সক্রিয় সহানুভূতি হইতে আমি বঞ্চিত হইব না। এখন তিনি পরপারে গিয়াছেন এবং আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে দিন গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না।

রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন :

ভারতবর্ষের একজন প্রধান দেশনায়ক অপসৃত হইলেন। প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক, শাসনসংস্কারপ্রার্থী ধীর রাজনীতিক, বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী তাঁহার আত্মীয় ও অসংখ্য বন্ধুকে শোকসাগরে নিমজ্জিত

করিয়া তাঁহার ক্রয়ডনস্থিত বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার তিরোধানে শোকাকুল। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতির পদে ভারতবর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বরণ করিয়াছিল। বিংশতি বর্ষের অধিককাল ব্যাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অদম্য শক্তি, আন্তরিক স্বদেশভক্তি, সমীচীন পরামর্শ এবং প্রভূত অর্থ দ্বারা তাঁহার দেশের কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ওয়ালথ্যামষ্টো হইতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুশ্চিকিৎস্য রোগের তাড়না তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করে এবং সেই রোগ আজ অকালে মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে

রমেশচন্দ্র দত্ত

মৃত্যুমুখে পাতিত করিল। দীর্ঘকাল রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বদা ধীরভাবে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য ও আদর্শ নব্য ভারতীয়গণকে স্বদেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শিত করুক, তাঁহারা যেন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত দেশের কাজ করেন—কিন্তু ধীরতা ও বিবেচনার সহিত। যদি আমরা খাঁটি হই তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি আমাদেরই নিজের হাতে।

লণ্ডনের স্মৃতি-সভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন :

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার তিরোধানে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যে কোনও যুগে মানবজাতি দরিদ্র হয়। ভারতবর্ষে, তাহার বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তনকালে, যখন চতুর্দ্দিকে নানা কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, তাঁহার তিরোভাব একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দুর্ঘটনা এবং যদি আমরা বলি যে আমাদের ক্ষতি অপূরণীয় তাহা হইলে অতিরঞ্জিত বাক্য বলা হইবে না। আমরা সকলেই জানি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দেশের একজন অতি উৎকৃষ্ট ও খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব ছিলেন। যদি তিনি আর কিছু না হইয়া শুধু তাহাই হইতেন তাহা হইলেও তাঁহার উদ্দেশে প্রকাশ্যভাবে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় জীবন পরিপূর্ণ হইতে গেলে তাহা বহুমুখী হওয়া আবশ্যক এবং যিনি, যে কোনও ক্ষেত্রেই হউক না কেন, ভারতীয়ের নাম গৌরবান্বিত করেন তিনি আমাদের জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত করেন এবং তাঁহার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্যের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনি একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী দেশনায়ক, অক্লান্ত দেশসেবক ছিলেন—যাঁহার মনের উদারতা ও আত্মার মহত্ত্ব তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক বাক্যে প্রকটিত হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীক্ষ্ণ, সবল ও ব্যাপক বুদ্ধির, আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির, অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শক্তির, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতার, অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতার এবং কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার গুণে যে কোনও ক্ষেত্রেই তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন তাহাতে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন; মানব জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার সুদূরপ্রসারিণী, তাঁহার গভীর ও একাগ্র অনুভূতি এবং বিরাট প্রতিভা দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সৌম্য আকৃতি, অপূর্ব্ব সৌজন্য ও মধুর ব্যবহার, তেজঃ ও সংযমের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাকে দর্শনমাত্র একজন মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিত। এরূপ ব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর দেখা যাইবে। যে দেশে স্বায়ত্তশাসন আছে সে দেশে জন্মিলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতেন। ভারতবর্ষে আমরা তাঁহাকে দুইবার জাতীয় রাষ্ট্রসভার সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলাম এবং আরও উল্লেখযোগ্য এই যে যখন এই প্রতিষ্ঠান ২১ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ একমত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেই নেতৃত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আর দুই তিন জন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহার সময় এবং অনেকে হয়ত জানেন না, প্রভূত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। উহার জন্য যাহা কিছু উদ্বেগ তিনি সানন্দে সহ্য করিয়াছেন, উহার সাফল্যের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কংগ্রেস সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করিত। তাঁহার অকুতোভয়তা ছিল অপূর্ব্ব এবং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে উহা বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার সাহস এবং সুন্দর বিচারশক্তি সতত তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাল ধরিয়া থাকিলে সকলেই নিরাপদ জ্ঞান করিত। তাঁহার বাগ্মিতা হৃদয়কে কম্পিত, উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিত। পক্ষান্তরে তাঁহার সেই ব্যবহারিক বুদ্ধি ছিল যদ্দ্বারা তিনি যাহা লভ্য এবং যাহা অলভ্য তাহা

পার্থক্য বুঝিতে পারিতেন এবং যখন প্রয়োজন হইত তখন সংযমের রাশ তাঁহার অপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে কেহ টানিয়া রাখিতে পারিতেন না। যেখানে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হয় সেই বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে, আমার স্মরণ হয়, একাধিকবার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব উদ্দাম-প্রকৃতির সভ্যগণের বিচার বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছিল এবং যেখানে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল তথায় শান্তি স্থাপিত করিয়াছিল। এরূপ নেতার বিয়োগে যে ক্ষতি হইল তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই এবং তিনি এমন সময়ে চলিয়া গেলেন যখন তাঁহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক, যখন কংগ্রেসের তরী তরঙ্গসঙ্কুল বারিধিতে দিশাহারা হইবার চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজ ভবনদীর ওপারে, কিন্তু তিনি একেবারে আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যান নাই। একটি মহৎ আদর্শের অমূল্য ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবার জন্য, তাঁহার স্মৃতি পূজা করিবার জন্য। সর্ব্বোপরি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন সেই প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার এত প্রিয় ছিল এবং যাহার তিনি এত সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজি আমাদের এই শোক আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুসারে এবং দেশের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব এই সংকল্প গ্রহণ করাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের একমাত্র উপায়।

উমেশচন্দ্র (সপরিবারে)

দাদাভাই নৌরোজী বলেন :—

"উমেশচন্দ্রের উক্তিগুলি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় যুক্তিযুক্ত এবং দূরদর্শী যেহেতু উক্ত উক্তিগুলি অনেক গবেষণার ফল। তিনি অযথা গর্ব্ব বা উল্লাস প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি ও তাঁহার সহযোগীরা যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার স্থায়িত্ব দেখিয়া এবং তাঁহার আশা সফল হইতেছে দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষা কেহ এত বেশী আহ্লাদিত হন নাই। কংগ্রেসের জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দাদাভাই নৌরোজী

কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি যথোচিত পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার উপদেশ এবং নেতৃত্ব তাহাদের মন্ত্রণা সভায় সর্ব্বদাই মূল্যবান বিবেচিত হইত ও গুরুত্ব আরোপিত করিত। তিনি ব্যবসায়ে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। তাহা অপেক্ষা তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মী পাওয়া দুর্লভ এবং সকলে তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সান্ত্বনা পাইবে। তাঁহাকে হারাণো অতি দুঃখের বিষয়—যদিও যাঁহারা তাঁহাকে হারাইয়াছে তাহারা কখনও তাঁহাকে কিম্বা তিনি ভারতবর্ষের যে মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না।" (ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের নাট্য-কাহিনী ও ইতিহাসের মর্য্যাদা

অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্যতীর্থ

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তদস্তদেবেতরো জনঃ—এই কারণেই শ্রেষ্ঠদের আচরণ বিষয়ে বিশেষ সংযম ও সতর্কতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাহা প্রমাণ করেন, সাধারণ লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে বলিয়া তাঁহাদের অসতর্কতা, অসংযম এবং ভ্রান্তির সহিত অনেক অসত্য ব্যাপক বিস্তারলাভ করিয়া বসে, আবার অনেক সত্য প্রাপ্য মর্য্যাদা লাভে বঞ্চিত হইয়া কোণঠাসা হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রেষ্ঠদের অসতর্কতা এবং ভ্রান্তি (মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটে) বিশেষভাবে সংক্রামক এবং সাংঘাতিক। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি শুধু যে তাঁহার নিজের পক্ষেই সত্য তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

সাহিত্য সমালোচনাক্ষেত্রে যাহারা ইতর অর্থাৎ অতি সাধারণ, তাহাদের সৌখীন মন্তব্য ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াই শব্দ-তরঙ্গে মিলাইয়া যায় বা অন্য কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিলেও নগণ্য বলিয়া মনে স্থান পায় না। ফলে ইতরের অসতর্ক ও যদৃচ্ছ মন্তব্য, সত্য মিথ্যার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া জগতের মঙ্গল বা ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা প্রখ্যাতধী সমালোচক, সমালোচনা-কালে যাহাদের মন্তব্য সকলেই আশা করেন তাহাদের একটী হাঁ বা একটা "না" কাহাকেও ভাসাইয়া বা তলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে—তাহাদের সমালোচনা, অনেক সময় জনপ্রিয়তার মস্তক একেবারে চর্ব্বণ করিতে না পারিলেও, পাঠকের বিচার-বুদ্ধিকে ঘোলাটে করিয়া, বিচারের সাবলীল গতি যে ব্যাহত করিতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাঠ্য-পুস্তকের সমালোচনা আরো গুরুতররূপে বিবেচ্য এই কারণে যে, ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়ের মস্তিষ্কই ঐ সমালোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়; ছাত্ররা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে এবং অধ্যাপকগণ ব্যাপ্তি ও গভীরতা মন্থন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের অনুবর্ত্তন করেন। এই সকল ক্ষেত্রে সমালোচকদের ভ্রান্তি যার পর নাই মারাত্মক, কারণ গুরু ও ছাত্রপরম্পরা এই ভ্রান্তির মায়ায় সত্যের স্বরূপ দেখিতে পারে না।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানি বি-এ ও এম-এ উপাধি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় নাটকখানির প্রামাণিক সমালোচনা, ছাত্র-অধ্যাপক উভয়ের নিকটই অতি-কাম্য এবং বহুমূল্য। বিখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে অধ্যাপকরা কৃতকৃত্য এবং তৃপ্ত হন এবং ছাত্রগণ তাহা পরম সমাদরে টুকিয়া রাখে—উত্তরপত্রে হুবহু লিখিয়া দিয়া বেশী সংখ্যা পাওয়ার আশায়। অধ্যাপক বলিয়া এবং চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানির অধ্যাপনার ভার আমার উপর ন্যস্ত বলিয়া নাটকখানি সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং স্বকীয় মন্তব্যও স্থির করিতে হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা-কালে—অর্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ—ন্যায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা' নামক গ্রন্থখানি উলটাইয়া দেখি।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা—নাট্যকারের অনুকরণে বলি—'প্রথম বাধা পেল সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায়, সেখানে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানি সম্বন্ধে এক কথায় রায় দিয়া ফেলিয়াছেন—"অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও নাটক হিসাবে প্রাণহীন" শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে শুধু যে উদাসীনই নহেন, বেশ বিরূপও—এমন একটা সন্দেহ সেইদিন কেন যেন মনে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সন্দেহ যে সত্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) প্রকাশে প্রমাণিত হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

এই প্রবন্ধে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি সবিনয়ে এবং যুক্তি-সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উক্ত গ্রন্থে চার-পাঁচ-পংক্তির মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সমালোচনা শেষ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সংলাপের অসঙ্গতি চরমে উঠিয়াছে, অত্যধিক নাটকীয় ঘটনার স্রোতে পড়িয়া কোন চরিত্রই বিকশিত হইতে পারে নাই। সংলাপের বাহুল্যে ও বৈষম্যে নায়ক চাণক্যের ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাট্য-কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।" অধ্যাপক সেন মহাশয়ের বক্তব্য নিশ্চয়ই এই যে, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে কাহিনী নাট্যকার রচনা করিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সমর্থিত নহে; ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত-কাহিনী যে-ভাবে পাওয়া গিয়াছে, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা গ্রহণ না করিয়া স্বকপোলকল্পিত কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছেন এবং উল্লিখি

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাসে যতখানি দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য লইয়া আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা রক্ষা করেন নাই, তথা চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রতিপাদ্য এই যে—দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে একটু-আধটু উপেক্ষা করেন নাই, ইতিহাসের মর্য্যাদাকে নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন।

এখন আমরা যদি দেখি যে নাট্যকার ইতিহাসকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই নাট্য-কাহিনী বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং মুখ্য ঘটনা ও চরিত্র চিত্র ইতিহাসানু-মোদিতই হইয়াছে, তাহা হইলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্যকে অযথার্থ বলিয়া ঘোষণা না করিয়া উপায় নাই।

এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণায় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় (ক) যে মৌর্য্য (মুরার পুত্র ?) চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে নন্দকে পরাভূত করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন, তাহার অতুলনীয় শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং কন্যা-বিনিময়ে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হয়। অনেকে বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; দেখা যাইতেছে যে চাণক্যের সাহায্যে হৃতরাজ্য উদ্ধার করা—নন্দবংশের অবসান ঘটানো, পরাজিত গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যার সহিত পরিণয় বন্ধন, বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—চন্দ্রগুপ্তের জীবনের এই সকল বৃত্তান্ত ইতিহাস স্বীকৃত।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপরেই নাটকখানির বহু-প্রকোষ্ঠযুক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার চন্দ্রগুপ্ত, কৌটিল্য-রাজ চাণক্যের সাহায্যে নন্দকে পরাভূত করিয়া সম্রাট হইয়াছেন, বাহুবলে গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রথম দৃশ্যে, দিগ্বিজয়ী সেকান্দারের সম্মুখে চন্দ্রগুপ্তের মুখপাত্রে হিন্দুবীরের অসীম শৌর্য্যের নিদর্শন উপস্থিত করিয়া, নাট্য-কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্তকে বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিগ্বিজয়ী বীর রূপে অঙ্কিত করিয়া ইতিহাসেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এক কথায় বলা চলে, ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়িয়া কোথাও বিবর্ণ হইয়া পড়েন নাই। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত- কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা উপেক্ষিত হইয়াছে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে তিনটী জাতির কাহিনী-ধারা সম্মিলিত করা হইয়াছে। প্রথম ধারায় আর্য্য (নন্দবংশ ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত এবং ব্রাহ্মণ চাণক্য কাত্যায়ন প্রভৃতি), দ্বিতীয় ধারায় গ্রীক সেলুকস হেলেন এ্যান্টিগোনাস প্রভৃতি এবং তৃতীয় ধারায় পার্ব্বত্য রাজবংশীয় চন্দ্রকেতু ও ছায়া। প্রথমতঃ এই তিন ধারার সম্মিলনের ঐতিহাসিকতা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধারান্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিলে নাটকখানির ঐতিহাসিকত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা করা হইবে।

এখন প্রথম ধারার ঐতিহাসিকতা পূর্ব্বেই আলোচিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারার ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের লেখা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়; তাহারা লিখিয়াছেন—"তিনি (সেলুকস) পঞ্জাব জয়ের আশায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। কেবল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন না, বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বালুচিস্থানের কয়েকটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে হইল। দুই রাজবংশের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রগুপ্ত-কাহিনীতে যে গ্রীক অধ্যায় যোজিত হইয়াছে তাহা ইতিহাস সমর্থিত। তৃতীয় ধারায় উপন্যস্ত পার্ব্বত্য জাতির সাহায্য গ্রহণের বৃত্তান্ত, পুরাণে বা গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত না থাকিলেও প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য "মুদ্রারাক্ষস" রচনার পরবর্ত্তী কাল হইতে প্রায় ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে এই বৃত্তান্তকে সমর্থন না করিলেও সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া সমস্বরে ধিক্কৃত করেন নাই; চন্দ্রগুপ্তের জীবনী আলোচনা-কালে তাহারা মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাট্যকাব্যের উল্লেখ করিয়াও থাকেন। সুতরাং পার্ব্বত্য ধারার মিলনকে মর্য্যাদানাশক ইতিহাস-প্রতিকূল যোজনা বলিবার কারণ নাই। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মুখ্য রেখাঙ্কনে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা কোনদিক দিয়াই উপেক্ষিত হয় নাই।

প্রতি ধারার বিশেষ বিশেষ চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখি—চন্দ্রগুপ্তে ইতিহাসের রেখা ও বর্ণ প্রধানতঃ অক্ষুণ্ণ। চন্দ্রকেতুর সহিত বন্ধুত্বস্থাপন, পার্ব্বত্য জাতির সাহায্য গ্রহণের বৃত্তান্ত সংরক্ষণে এবং ছায়ার সহিত সম্বন্ধ নাটকীয় প্রয়োজনে। নন্দ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব থাকায় কবি তাহাকে প্রয়োজনানুরূপ রূপ দিতে পারেন বা কোন কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়াও তাহার চরিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। তাই, নন্দের ঐতিহাসিকতা প্রশ্নের বাহিরে। বাচাল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কল্পিত, লঘু চরিত্র। মুরা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য এই—"কেহ কেহ বলেন যে তাহার মায়ের বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা॥ অনেকের মতে এই নাম হইতে মৌর্য্য নামের উৎপত্তি। তাহারা বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান (ভাঃ ইঃ—সেন ও রায়চৌধুরী)। যেখানে মতদ্বৈধ

(ক)—(১) The oxford History of India—Smith page 72-74

(২) Ancient India. Its invasion of Alexander the great by Mc. Grindle (page 404-410)

(৩) Political History of Ancient India—Ray-Chaudhuri—(page—214-222)

(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (সেন ও রায়চৌধুরী প্রণীত) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ৪৭ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান সেখানে কোন একপক্ষ অবলম্বন করিলে ইতিহাস প্রতিকূলতা দেখান হয় না। সুতরাং মুরা যে ষোল-আনা ঐতিহাসিক এ বিষয়ে ইতিহাস প্রমাণ এবং যিনি মুরাকে শূদ্রা এবং চন্দ্রগুপ্তের জননীরূপে অঙ্কিত করিবেন তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন না।

প্রধান চরিত্র চাণক্য—বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট—ইতিহাসের বুদ্ধিসর্ব্বস্ব কৌটিল্য, হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত অপূর্ব্ব চাণক্য মূর্ত্তিতে পরিবর্দ্ধিত। চাণক্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বার্ত্তা এই—কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে—(ভারতবর্ষের ইতিহাস, সেন ও রায়চৌধুরী)। চাণক্যের জীবনে অন্যান্য যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা "মুদ্রারাক্ষস" নাটক হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীভৎসের উপাসক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র কৌটিল্যের পাশাপাশি সুন্দরের প্রসাদ-বুভুক্ষু, স্নেহার্ত্ত চাণক্য, ব্রাহ্মণের আদর্শে ফিরিয়া যাইবার জন্য যাহার ব্যাকুল হৃদয় অনুতাপের বন্যায় দুকূল প্লাবিত করিতেছে, এ চাণক্যের সবটুকু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি। অনেকে চাণক্য চরিত্রটীর অন্তর্নিহিত নানা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সংলাপে শুধু "বাহুল্য" এবং উক্তিতে শুধু 'বৈষম্য' দেখেন; তাঁহাদের সমালোচনায় চাণক্য একটী নষ্ট ভূমিকা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সেন মহাশয় সমালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"সংলাপের বাহুল্যে ও বৈষম্যে নায়ক চাণক্যের ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে"। চাণক্যের চরিত্রের নানা ব্যক্তিত্বময় অন্তঃস্থলে যাহারা প্রবেশ করিতে না পারিবেন তাহারা চাণক্যের সংলাপে বাহুল্য ও বৈষম্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে বাধ্য এবং ইতিহাসের কৌটিল্য চাণক্যের নানা ব্যক্তিত্বের একটী মাত্র। সুতরাং বলা যাইতে পারে কৌটিল্যের অভাব উপলব্ধ না হওয়ায় চাণক্য চরিত্রটীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা উপেক্ষিত হয় নাই। চন্দ্রকেতুকে ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিলে যে অন্যায় করা হয় না, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'ছায়া'র ঐতিহাসিক কায়া না থাকিলেও ইতিহাসকে কলুষিত করে না; তাহার নীরব এবং উদার প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রেমের মাধুর্য্যকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক কাব্যে ইতিহাসের প্রতিবন্ধক না হইলে ছায়ার ন্যায় কায়াহীন চরিত্র সৃষ্টি করা চলে এবং তাহা কবির পক্ষে শ্লাঘার কথা, তেমনি ইতিহাসের মর্য্যাদার পক্ষেও দুশ্চিন্তাজনক নহে। গ্রীক ধারার সেকেন্দার সেলুকস এ্যান্টিগোনাস নামতঃ এবং অনেকাংশে কার্য্যতঃও ঐতিহাসিক। হেলেন হিসাবে অনৈতিহাসিক হইলেও "সেলুকস কন্যা"রূপে ঐতিহাসিকতা দাবী করিতে পারে। হেলেনকে বিদুষী ও আদর্শবাদিনী করিবার স্বাধীনতা কবির ন্যায্য অধিকার, ইতিহাসের মর্য্যাদার ইহাতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

আশা করি, এতক্ষণে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তিসহকারে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমি ঐতিহাসিকত্বের মাত্রা নিরূপণ করিয়াছি এবং এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও পোষণ করি যে নাট্য-কাহিনীতে এবং চরিত্র-চিত্রণে ইতিহাসের মর্য্যাদা কোনভাবেই উপেক্ষিত হয় নাই। অথচ আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর মত একখানি বহু-পঠিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক রূপে অধ্যাপক মহাশয়ের খ্যাতি ব্যাপক এবং ব্যাপক বলিয়াই তাহার মন্তব্য, আমার মতে, ব্যাপক ক্ষতি করিতে থাকিবে।

যে কথা ভূমিকায় লিখিয়াছি তাহা স্মরণ করিয়াই, সাহিত্য-সমালোচকদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়কে, তাহার সমালোচনা সংহরণ করিতে অনুরোধ না করিয়া পারিতেছি না। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য—নাট্য-কাহিনীতে কি ভাবে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা, নতুবা সমালোচনা প্রত্যাহার করা। যখন দেখি—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন এবং সাজাহানের (দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সাজাহান শ্রেষ্ঠ—৩৮৯ পৃঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস) মধ্যে "ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা" খুঁজিয়া পান না এবং চন্দ্রগুপ্তের নাট্য কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে দেখেন—তখনই তাঁহার "ইতিহাসের মর্য্যাদা" আমাদের ন্যায় দ্রষ্টার কাছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের মত ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। "ঐতিহাসিক মর্য্যাদা" কথাটা তিনি কি অসাধারণ তাৎপর্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত না হইলে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও এবং মর্য্যাদার সমস্ত পারিভাষিক অর্থ জানিয়াও সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকিবে বলিয়াই আমার ধারণা।

উপসংহারে আমি এই আশা করি যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় লোকহিতার্থে তাহার সমালোচনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে বা তাহার সমালোচনার অযথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মত প্রত্যাহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না এবং ইহাও আশা করি কলেজের অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিবেন ও ছাত্রদের ভ্রান্ত মতের আবর্ত্ত হইতে যথাসাধ্য উদ্ধার করিবেন।

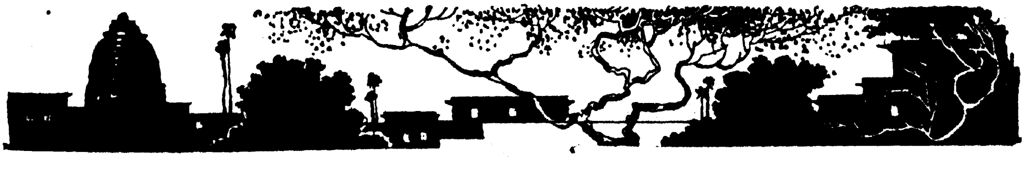

সংস্কৃত উপাধি মহামহোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অধুনা-প্রচলিত পরীক্ষা রীতির সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্য উপাধি প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের "ডিগ্রী" এবং "টাইটল্" সংস্কৃতের এক "উপাধি" কথা দ্বারাই প্রকাশ করা হয়। কিন্তু 'ডিগ্রী' শ্রেণীর উপাধিগুলি যেমন কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার পরিচায়ক হইয়া থাকে, তেমনই কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি উপাধিও পরীক্ষা-বিশেষ উত্তীর্ণ হওয়ার পর দেওয়া হয়। এই সকল উপাধির জন্য যে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহা পরীক্ষা-সংসদ বা বোর্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বিদ্যাভূষণ, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি উপাধি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ছাত্রবর্গকে নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা সমাপ্তির সাক্ষ্যস্বরূপ প্রদান করিতেন। বহুদিন হইতেই এই সকল উপাধি পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান স্বরূপ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ নিয়মের দ্বারা সন্নিবদ্ধ না হওয়াতে এই সকল উপাধি শিক্ষিত সমাজে উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতেছে না। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ "বিদ্যাদিগ্‌গজ" প্রভৃতি উপাধি বিদ্রূপাত্মক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুরাজার আমলে উপাধিধারী পণ্ডিতগণ যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ "বিদায়" বা দক্ষিণা পাইতেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে বিদ্যাসাগর, বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি উপাধির তুলনাত্মক শ্রেষ্ঠতা বিবেচিত হইত।

বিদেশী হইলেও ইংরাজরাজ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতা এবং বহুমুখী উৎকর্ষ দেখিয়া ভারতবাসীর বিদ্যা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি সংস্কৃতের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ বিদ্যার সাগর ছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সাত আট শত বৎসর ব্যাপী মোসলেম রাজত্বের সময় প্রাচীন ভারতের যে সম্পদগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধার ও বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। পাশ্চাত্য রাজনীতি কখনও প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতির ধ্বংস-সাধনের পক্ষপাতী হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ইংরাজ-রাজের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্ব প্রচলিত অর্থশূন্য উপাধি প্রদানে বাধা না দিয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক—"শাস্ত্রী," "আচার্য্য," "তীর্থ" প্রভৃতি উপাধি পরীক্ষার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সকল উপাধি নামের পশ্চাতে যোগ করিতে পারেন।

রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, স্যর্ প্রভৃতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ও একটি প্রকৃত উপাধি বা টাইটল্। ইহা কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্যস্বরূপ "ডিগ্রী" নয় এবং উপাধিরূপে নামের পূর্ব্বেই যোগ করা হয়। পরীক্ষা-বিশেষের সাহায্যে শত শত শাস্ত্রী, তীর্থ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রচারের জন্য যে ভাবে নির্ব্বাচিত করা হয়, সেইরূপে শত শত আই-সি-এস্ সাধারণ রাজকর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি "ভাইসরয়" ও গভর্ণর প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ সেইরূপ কোনও কারণ-বশতঃই পরীক্ষা দ্বারা মহামহোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হয় না। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহাদের শিষ্যের শিষ্যগণ বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন অধিরোহণের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হইলে যখন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হয়, সেই সময় তদানীন্তন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রচলিত করেন এবং ইহাই স্থির হয় যে প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারকল্পে যে সকল হিন্দু পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন, তাঁহারাই এই উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবেন। এই সঙ্গে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি নামের পূর্ব্বে বসিবে এবং উপাধিধারী পণ্ডিতগণ দরবার উৎসবে রাজা উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পরেই স্থান পাইবেন। অন্যান্য রাজসম্মান প্রধানতঃ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করে; মহামহোপাধ্যায় উপাধি মূলতঃ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। উদাহরণ-স্বরূপ একজন মহামহোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবৎসর যাঁহারা রাজকীয় উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। বীণাপাণির মন্দিরে দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর তপশ্চরণের জন্য বহুদিন হইতেই তিনি পণ্ডিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া সরকার নিজের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। এস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক মহাশয় এই সম্মানের যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় তিনি নিজের চরিত্রগত বিনয়বশতঃ ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদিন পরে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে সংস্কৃত বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান প্রদান করিয়া সরকার ভারতের প্রাচীন কৃষ্টির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থান কালে অধ্যাপক প্রসন্নকুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি "মানসার" গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপনা হয়। ইংলণ্ডে ডিগ্রী লাভ করিয়া তাঁহার অনু-সন্ধিৎসা ও জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায়ের প্রভাবে প্রাচীন ভারতের স্থপতি শিল্প বিষয়ক যে সুবৃহৎ গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা চিরকালই পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিয়া এই সুদীর্ঘকাল অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে প্রাচীন স্থপতি শিল্পের মত একটি দুর্ব্বোধ্য ও অচর্চিত বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি মৌলিক গবেষণার যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডল কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। 'মানসার' বাস্তু শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আচার্য্য মহাশয় সাত খণ্ডে এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৬০১০ বড় মাপের পৃষ্ঠা আছে। প্রথম খণ্ডে শিল্প শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে শিল্পের ত্রিসহস্র পরিমিত পারিভাষিক শব্দসমূহের শব্দকল্পদ্রুমের মত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রীতিতে মানসার গ্রন্থের সংস্কৃত মূল সম্পাদিত। চতুর্থ খণ্ডে মূলের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। পঞ্চম খণ্ডে মানসার নিয়ম অনুসারে রচিত গৃহাদি ও স্থাপত্যের উদাহরণসমূহ অঙ্কন করা হইয়াছে। ষষ্ঠ খণ্ডে ভারত ও ভারতের বাহিরে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার যে সকল স্থানে ভারতের বাস্তু শিল্প দেখা গিয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম খণ্ড, যাহা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নামে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সহস্রাধিক নক্‌সা সহ গৃহাদির স্থাপত্যের আমূল ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপের নানা দেশের এবং আমেরিকার নানা স্থানের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ একবাক্যে আচার্য্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, অমানুষিক পরিশ্রম ও সফলতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেবল বিশেষজ্ঞ নহে, প্রায় সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আচার্য্য মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য কেবল প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন।

পুরাকালে বেদবেদাঙ্গের উপদেষ্টা উপাধ্যায় নামে পরিচিত হইতেন। পরে মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, অধ্যয়ন, তপঃ ও দান, এই নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উপাধ্যায় বলা হইত। আর যিনি এত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন যে নিজের শিষ্যকে ও অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করা হইত। অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য, ইউরোপ ও ভারতের নানা স্থানে অধ্যাপনা ব্রত অবলম্বন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তিনি বিলাত-ফেরৎ অধ্যাপক হইয়াও সদাচারী যশস্বী হইয়াও নিষ্ঠাবান, আর সুপণ্ডিত হইয়াও নিরভিমান। সুতরাং তাঁহার উপাধির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ভাবেই করা যাক না কেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে যোগ্যপাত্রেই যোগ্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

শেষের দিন

৺কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ধূ ধূ করে লেলিহান দারিদ্র্য কঠোর
একা আমি বসে দেখি জনহীন গ্রাম মরুময়—
কল্পনার মায়ামৃগ আজ ভাবি কোথা গেল মোর ?
শৈশবের যাত্রাক্ষণে যার সাথে ছিল পরিচয়।
জীবনের কোলাহল গ্রামে গ্রামে আনন্দ প্রচুর
কে কোথায় গেল চলি ছাড়ি নিজ সাধের ভিটায়—
আনন্দের বেণুবনে সুর কোথা তন্দ্রালু মধুর
বিরহের স্বপ্নলোকে ভরে প্রাণ স্মৃতির জ্বালায়।
জননীর শেষ দিন আজো মাখা গ্রামের কুটীরে
অশোক শেফালী কাঁদে যে ঘরের গুচ্ছ আঙিনায়
তাহার স্মরণে প্রাণ দূরে আজ ভাসে আঁখিনীরে
স্বদেশ জননী মোর প্রবাসীর আনন্দ কোথায় ?
যেথায় যে ভাবে রহি হে জননী তোমা ভুলিব না
প্রবাস বিরহী মন নিত্য রবে তোমার ধূলায়—
অশ্রুর উৎসব মাঝে কুড়াইব স্মরণের কণা
আমার শেষের দিন তব সাথে লইব বিদায়।

শরৎচন্দ্রের নববিধান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নববিধান একটি বড় গল্প। ইহা শরৎসাহিত্যে একটি দলছাড়া রচনা। ইহার বিষয়বস্তু ইঙ্গবঙ্গ সমাজের। যদিও ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যথাযথ আবেষ্টনী ইহাতে নাই। শরৎচন্দ্র বিভার মধ্য দিয়া ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মনোবৃত্তিটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ সমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। সাধারণ হিন্দু আদর্শের সহিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আদর্শের একটা সংঘর্ষ ইহাতে দেখানো হইয়াছে।

শৈলেশ আটশত টাকা মাহিনার (মাহিনাটা বয়স হিসাবে একটু বেশীই) বিলাত-ফেরত অধ্যাপক। গ্রহদোষে বিলাত যাওয়ার আগে তাহার সঙ্গে উমেশ তর্কালঙ্কারের কন্যা উষার বিবাহ হইয়াছিল। শৈলেশের পিতা নব্যবঙ্গের মার্জ্জিত (Refined) হিন্দু, ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছিল, মেয়েকে ইংরাজিশিক্ষা দিয়াছিল এবং ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বৈবাহিকের বনিতে পারে না—তাহার বাড়ীতে পণ্ডিত-কন্যার আচরণও প্রীতিকর হইবার কথা নয়। এরূপ বিবাহ ঘটল কি করিয়া তাহাই বিস্ময়ের বস্তু। ইহাকেই বলে আসল অসবর্ণ বিবাহ।

বলিয়া তাহারা নিজেদের সমাজের গলদ কোথায় তাহা বুঝে এবং হিন্দুর আচার নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতার মধ্যে কতটুকু সৎ ও মহৎ তাহাও বুঝে। তাই বিভার স্বামী ক্ষেত্রমোহন এই নিষ্ঠাবতী বধূর মহিমা উপলব্ধি করিল। বিভা কিন্তু করিল না। কারণ, বিভা পাইয়াছে ঐ সমাজের বাহিরের আবরণটুকু, কিন্তু কোন culture তাহার নাই।

শরৎচন্দ্র ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যে সব দোষ আছে তাহা লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। কেবল এ সমাজের জীবনযাত্রা যে অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও ঋণাভিমুখী এবং নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলাই যে আদর্শ গৃহিনীপনার দ্বারা এই সমাজের লক্ষ্মীছাড়া পুরুষগুলোকে ঋণজাল হইতে বাঁচাইতে পারে তাহাই জোর দিয়া বলিয়াছেন। শৈলেশের স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই শৈলেশের ভৃত্যতন্ত্রশাসনের সংসারে শৃঙ্খলা ও শ্রী ফিরাইয়া আনিল। এই শৃঙ্খলা ও শ্রীর যে কোন মূল্য আছে, বিভা তাহা বুঝিত না—যদিও শৈলেশ বেশ বুঝিয়াছিল। বিভার আক্রমণে তাহার এই সুবুদ্ধি স্থায়ী হইল না। শৈলেশ দেখিল—ইহা লইয়া তাহার একমাত্র ভগিনীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিয়া যায় এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজে স্ত্রীর জন্য সে অপাংক্তেয় হইয়া পড়ে। শৈলেশের স্ত্রী তেজস্বী পিতার কন্যা—তেজস্বিনী। সে স্বামীর মানসিক শান্তির জন্য আত্মসৌভাগ্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। শৈলেশের অন্তরের ইচ্ছা ছিল না যে সে ফিরিয়া যায়। কিন্তু নিজের সমাজে মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং ভগিনীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমানবশে সে বাধা দিল না। তারপর হইতে শৈলেশের অন্তরে দারুণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। শরৎচন্দ্র এই মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কেবল শৈলেশের পরবর্ত্তী আচরণে তাহার অপরাধের অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন।

পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে—ইহাই প্রচলিত সংস্কার। ইঙ্গবঙ্গ সমাজও ইহা অস্বীকার করে না। কিন্তু পতিকে পত্নীর সহধর্ম্মী হইতে হইবে ইহা আজিও যেন সংস্কারের বাহিরে। যে প্রেম পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী হইবার প্রেরণা দেয়, সেই প্রেমই যে পতিকে পত্নীর সহধর্ম্মী হইবার প্রেরণা দিবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে? কলিকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ও বিভার কড়া শাসনের বাহিরে গিয়া শৈলেশ যেমনই মুক্তির স্বাদ পাইল তেমনি তাহার চিত্তে অপমানিত লাঞ্ছিত প্রেম তাহাকে দুর্দ্দম বিক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইল। শৈলেশের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়া গেল। যে-আত্মীয়সমাজের ভ্রূকুটিতে সে প্রেমের অপমান করিয়াছিল—শৈলেশ সে-আত্মীয়সমাজ হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল। নিজ পত্নীর নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য নহে—বিভাদের কাছ হইতে বহুদূরে পলাইবার জন্যই সে হিন্দুত্বের চরম

গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিল। এতদূর গোঁড়ামি উষার পক্ষেও অসহ্য। শৈলেশ হিন্দুয়ানির চরম গোঁড়ামি আশ্রয় করিয়াও ভগিনীর নিকট বর্জ্জনীয় নয় কেন? হৃদয়ের বন্ধনের জন্য। তাহাই যদি হয় তবে নিষ্ঠাবতী হওয়ার জন্য পত্নী কেন বর্জ্জনীয় হইবে? হৃদয়ের বন্ধন তো সেখানে নিবিড়তর। বিভাকে শৈলেশ তাহার আচরণের দ্বারা কি এই শিক্ষাই দিল?

শৈলেশ গোঁড়া হিন্দু হইয়া গুরু, গোস্বামী ও ভাগবতের ভক্ত হইল। বিভা মনে করিল—পল্লীগ্রামের মেয়েমানুষ হয়ত কোন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন তুক্‌তাক্ করিয়া গিয়াছে। তুক্‌তাকের শক্তিকে ইঙ্গবঙ্গসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে না, কিন্তু সাহেব-শৈলেশের এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন বিভাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাই তাহার মনে এইরূপ একটা অবৈজ্ঞানিক সন্দেহ হইল। ক্ষেত্রমোহন শিক্ষিত ব্যক্তি—তিনি ঠিক্ ধরিয়াছিলেন—"উষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসে নি। এসব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।" কিন্তু শৈলেশের পক্ষ হইতে ইহা নিজের জীবনব্যাপী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—সহধর্ম্মিণীকে পাইবার জন্যই যেন ইহা তপস্যা। বিনা তপস্যায় উষার মত আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না।

শৈলেশ বিলাত হইতে আসার পর উষা নিজে জোর করিয়া আসে নাই। সে বুঝিয়াছিল স্বামীর আশ্রয়ে তাহার স্থান হইবে না—দাসী হইয়া সে থাকিতে পারে. জীবনসঙ্গিনী সে হইতে পারিবে না। নিজের নারীত্বের মর্য্যাদার সহিত পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে তপস্যা করিতেছিল। শৈলেশের স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার আসিবার কথা—কিন্তু নারীত্বের মর্য্যাদাহানি করিয়া সাধিয়া সে স্বামীগৃহে আসে নাই। সেখানে যে তাহার সগৌরব স্থান হইবে—তাহার কোন লক্ষণ সে পায় নাই। কিন্তু যখন তাহাকে আনিতে পাঠানো হইল তখন সে আগ্রহের সহিতই আসিল। ইহাই তেজস্বিনী উষার পক্ষে স্বাভাবিক। আসিয়াই সে গৃহকর্ত্রীর আসনটি দখল করিয়া বসিল। ক্রমে সে নিজের আচারনিষ্ঠা ও স্বামীর অনাচারী স্বভাবের মধ্যে একটা সন্ধিসামঞ্জস্য ঘটাইয়া লইতেই চেষ্টা করিয়াছিল। প্রেমই ইহার বন্ধন-সূত্র। শৈলেশও ক্রমে স্ত্রীর আদর যত্নে বশীভূত হইয়া পড়িতেছিল। মাঝখান হইতে বিভা আসিয়া উষার নারীত্বের মর্য্যাদা বুঝিল না—প্রেমের মূল্যমর্য্যাদাও উপলব্ধি করিল না—শৈলেশকে বুঝাইল যে সে স্ত্রৈণ হইয়া ইঙ্গবঙ্গসমাজের সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। দুর্ব্বলচিত্ত শৈলেশের মন তথনও প্রস্তুত হয় নাই—সেও উষার প্রেম ও নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। উষা দেখিল এখনও সময় হয় নাই। সে নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সময় থাকিতেই সসম্মানে বিদায় লইয়া গেল। কিন্তু সে শৈলেশের চিত্তে যে প্রভাব সঞ্চার করিয়া গেল—ক্রমে তাহার ক্রিয়ার আরম্ভ হইল। এলাহাবাদ যাইবার সময় শৈলেশ তাহার ভগিনীর কাছে সোমেনকে না রাখিয়া যখন সঙ্গেই লইয়া গিয়াছিল তখনই বিভার বুঝা উচিত ছিল—শৈলেশের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়াছে। তারপর বিভা ও তাহার সমাজের সবচেয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে জীবনযাত্রায়, শৈলেশ অন্তর্গূঢ় অভিমানবশে সেই জীবনযাত্রার চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

উষা স্বামীর সংবাদ নিশ্চয়ই রাখিত, সে বুঝিল যে এইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছে বলিয়া নয়, সে ভগিনীর ভ্রূকুটির ভয়কে জয় করিয়াছে বলিয়াই সে বুঝিল, এইবার সে আপন সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ধর্ম্মোন্মাদনা হইতেও স্বামীকে বাঁচাইবার প্রয়োজন। স্বামী গোঁড়া হিন্দু হইয়া মালা জপ করুক ইহা সে কোনদিনই চাহে নাই। হিন্দুর শান্ত সংযত জীবনযাত্রার সহিত বিজাতীয় জীবনযাত্রার একটা সন্ধি সামঞ্জস্য করিতে সে চাহিয়াছিল এইবার তাহা সম্ভব হইল। ইঙ্গবঙ্গীয় জীবনযাত্রা যেমন অকল্যাণকর ধর্ম্মোন্মত্ত জীবনযাত্রাও তেমনি সংসারের পক্ষে অকল্যাণকর। দুইএর সামঞ্জস্যেই গৃহ সংসারের কল্যাণ। এই সত্যটি উষা বুঝিয়াছিল স্বভাবতঃ অন্যের তাহা বুঝিতে দেরী হইয়াছিল বলিয়াই গল্পটির সৃষ্টি হইয়াছে।

উষা নিজের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া প্রেমের গৌরব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল—এজন্য নিজের আজন্মলালিত সংস্কার ও নিষ্ঠার অনেকটুকুই সে ত্যাগ করিতে রাজী ছিল। কিন্তু সে নিজের নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর হাতে ভোগের পুতুল হইতে চাহে নাই। সতী ধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিলে নিষ্ঠাবতী উষার উচিত ছিল আবদুলের রান্না নিষিদ্ধ মাংস স্বামীর সঙ্গে একটেবিলে বসিয়া ভক্ষণ করা এবং মেম সাহেব সাজিয়া তাহার সঙ্গে বিজাতীয় সমাজে অবাধ মেলামেশা করা। কারণ, স্বামীর যে ধর্ম্ম তাহাই পালন করা সতীধর্ম্ম। কিন্তু প্রেমধর্ম্ম তাহা নয়—প্রেমধর্ম্মের সার্থকতা একজনের স্বাতন্ত্র্য অন্যের মধ্যে বিলোপ সাধনে নয়—নারীত্বের সমস্ত মর্য্যাদা স্বামীর মধ্যে বিসর্জ্জনে নয়—দুইজনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দুইএর জীবনের সন্ধি-সামঞ্জস্যে। যে পতি পত্নীর নারীত্ব ও তাহার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না—সে পত্নীকে মনুষ্যত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত করে। বুঝিতে হইবে প্রভুত্বকেই সে পতিত্ব বলিয়া মনে করে এবং পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার নাই, সে দাস্য চায়, প্রেম চায় না। উষা প্রচলিত আদর্শের সতীর চেয়ে ঢের বেশী মহীয়সী। বঙ্গসাহিত্যে শরৎচন্দ্র সতীত্বের অভিনব আদর্শ দান করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরে এইরূপ আদর্শের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর চরিত্রের নারীত্ব কেবল হৃদয়বৃত্তিরই উপর প্রতিষ্ঠিত। উষার নারীত্ব কেবল হৃদয়বৃত্তি নয়, প্রখর ধী-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনে রাখিতে হইবে ভ্রমর একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের কন্যা, আর উষা শাণিতবুদ্ধি তর্কালঙ্কারের কন্যা। ঠিক্ সুসময়ে নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অচঞ্চল তেজস্বিতার সহিত স্বামীকে সে যদি ত্যাগ করিয়া না যাইত, তাহা হইলে বিভার অত্যাচারে সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইত না অশান্তিময় সংসারে দাসীত্ব স্বীকার করিয়া নিজের নারীত্বের অবমানন করিত—পতিকেও সুখী করিতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি এক প্রকারের বস্তু, বৈষ্ণবতার গোঁড়ামি আর এক প্রকারের বস্তু—কোন কোন বিষয়ে মিল থাকিলেও দুইটি পৃথক বস্তু শরৎচন্দ্র দুই শ্রেণীর গোঁড়ামি এক সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে একটু বেশিমাত্রায় Emphasis দিয়াছেন। অবশ্য আর্টের জন্য শৈলেশকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বহু দূরে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু তাহার একটা কলাসঙ্গত সীমা আছে। শরৎচন্দ্র শৈলেশকে নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার Rationality পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছেন। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ভারসাম্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মিসরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

(২)

৮শে সেপ্টেম্বর—৪৪

ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেশ অন্ধকার। পশ্চাতের রান্দায় বিগ্‌নোনিয়া লতার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট আলোক দিনের াগমনের বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছিল। আমি একটু প্রার্থনা করে নিলাম। ালো জ্বেলে দেখি ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। তবু বেশ গাঢ় অন্ধকার। য়ারা এলে, বললাম গরম জল। বেচারা রাত্রির অভুক্ত সাহেবকে গরম ন ও স্নানের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিল। স্নান শেষ করে এসে দেখি, নিকটা রুটি, মাখন, চা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে। সকাল লার চা পান শেষ করে হোটেলের অফিসে গিয়ে B. O. A. C-কে ান করলাম—আমার যাত্রার সময় জানাতে। তারা উত্তর দিলে— ইট কার্ডে লিখে যাত্রার ছয় ঘণ্টা আগে জানান হবে। তবে সী প্লেনে যাওয়া হবে না, এটা ঠিক। Ensigne অর্থাৎ ল্যাণ্ড প্লেনে যাওয়া ব—বস্‌রা, বাগদাদ, প্যালেষ্টাইন ঘুরে। বসরাতে এক রাত্রি থাকতে ব, তারপর বাগদাদ। বেশ ভালই, ইরাকটা দেখা যাবে।

বেলা নয়টাব সময় বেয়ারা এসে বল্লে, ব্রেক্-ফাষ্ট। অভুক্ত সাহেবকে চারা যত্ন করবার জন্য অত্যন্ত সজাগ। হোটেলের সকলেই ইউরোপীয় মরিক কর্ম্মচারী ও শ্বেতাঙ্গিনী—একচারিণী অথবা সহচারিণী। আমি কমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ। পাশে বিরাট প্রকোষ্ঠের এক অনাড়ম্বর কোনে অতি ংযত হস্তে অনভ্যস্ত ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে উপবাসব্রত ভঙ্গ করা াল। প্রায় দশটার সময় ফিরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি খলাম। তখন মিঃ ক্ষিতীশ সেন এসে উপস্থিত হলেন। প্রবাসে াত্মীয়বান্ধবহীন স্থানে অপ্রত্যাশিত পরিচিতের সাক্ষাৎলাভে খুব আনন্দ লো। এরোপ্লেন, সী-প্লেন, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি যাত্রীবাহী আকাশ- ানের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সংবাদ নিলাম। অনেক নূতন বিষয় ানলাম। কবে কোথায় কখন কোন দুর্ঘটনা এরোপ্লেনে হয়েছে, তার ংবাদও নিলাম। তাঁর সঙ্গে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত গল্প করলাম, াঝখানে একটার' সময় লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। প্রায় চারটার সময় আবার া খেয়ে মিঃ সেনের গাড়ীতে সহর ঘুরবার জন্য বেরুলাম। করাচী কি মৎকার সহর! মরুভূমির মধ্যে কাঁকর ভেঙ্গে এমন সহর তৈরী করা একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। সহর তো ভারতের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, রোদা, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, জব্বলপুর, কলিকাতা—কতই দেখলাম। ব সহরেই স্থানবিশেষ অংশবিশেষ সুন্দর ও পরিষ্কার। কিন্তু করাচীর তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিষ্কার, সুবিশাল পথ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা, অদৃশ্য- নিঃসারণী ধূলিকণা-শূন্য পটখণ্ড আর চোখে পড়ে না। সারাদিন মৃদুমন্দ মলয় কচ্ছ উপসাগর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। পরিশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য করাচীর সিন্ধু-শীকর-সিক্ত বায়ু-হিল্লোল ঢেউ অতি আরামপ্রদ। একটি দিন করাচীতে বিশ্রাম করায় শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ করলাম। আর চক্ষু ত সার্থক হলোই।

অনেকক্ষণ সহর ঘুরে মিঃ সেন আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক আছেন—B. O. A. C র অফিসার। একজন ভাগলপুরের বিভু মুখাৰ্জ্জী, আমার প্রাক্তন ছাত্র। মিঃ সেন আমাকে বল্লেন, কায়রোতে বড্ড শীত, আমার গায়ের গরম সোয়েটার যথেষ্ট নয়। তিনটি 'পুল-ওভার' আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, যেটি পছন্দ হয় নিন। আমাকে কিন্তু-ভাবাপন্ন দেখে হেসে বল্লেন, এই তিনটিই আমার স্ত্রীর হাতের তৈরী। আপনার লৌকিকতা নিষ্প্রয়োজন। জোর ক'রে সব চেয়ে ভাল 'পুলওভার' আমায় দিলেন। বিদেশে এই বন্ধুটির সহায়তা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। জানি তিনি ধন্যবাদপ্রত্যাশী নন, তবু তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজে তৃপ্ত হ'লাম। তারপর B. O. A. C র প্রধান কার্য্যালয়ে এলাম—বিভু মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করতে। সে এরোপ্লেনের distribution ও weight officer—কে কোথায় বসবে, কোন্ ভার কোন্ অংশে নির্দ্দিষ্ট হবে তাই ঠিক করা তার কাজ—অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। বিভুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে—"মাষ্টার মশায়, আপনার ওজন ১৫২ পাউণ্ড। আপনার জন্য খুব ভাল জায়গা প্লেনের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছি।" আপনার এয়ার সিক্‌নেস্ হবে না। কালকে আমরা আপনাকে ভোর বেলা প্লেনে তুলে দেব। আপনার নাইট কার্ড আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় আনন্দ হ'লো, যাত্রার সুবিধার জন্য নয়। প্রবাসে পরম আত্মীয়তার দাবী অনুভব ক'রে।

তার পর হোটেলে ফিরে এসে রাত্রি ১০টার সময় নাইট কার্ড পেলাম। যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা confidential মোহরাঙ্কিত একখানি চিঠি। তাতে লেখা আছে—

Airport of KARACHI.

LOCAL TIME is 6 hours 3 mins Fast on Greenwich

CURRENCY COUPONS (Value 5) may be cashed at Rs 3/5 each.

ENQUIRIES of any kind will gladly be dealt with by the Company's representative :—

ARRANGEMENTS FOR TOMORROW. 30. 9. 44, (Date)

(1) You will be called at 5-00 A. M. (Local Time)

(2) Your baggage will be collected at 5-36. A. M. (Local Time)

(3) The Car will leave THE HOTEL at 5-45. A. M. (Local Time)

(4) The air liner is to leave at 7-30. A. M. (Local Time)

MEALS will be Served as follows :—

Breakfast Lunch Tea Dinner	ON BOARD, AT BASARAH.	(3) Prof. Raychowdhury

২৯শে সেপ্টেম্বর ৪৪

ঠিক নাইট কার্ড অনুসারে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। আমরা ছয়টায় B. O. A. C.র আফিসে এসে উপস্থিত হ'লাম। বিভিন্ন হোটেলের যাত্রী সমবেত হয়েছে। নূতন কয়েকজন যাত্রীও আমাদের সঙ্গী হ'লো। তার মধ্যে একজন মস্কো যাত্রী—জাতিতে পার্শী, বাগদাদে নেমে তেহ্‌রান হয়ে মস্কো যাবেন। আর একজন মাদ্রাজী, ত্রিবাঙ্কুর নিবাসী Silviraj পুণা থেকে চলেছেন মধ্যপ্রাচ্যের Y. M. C. A.এর সেক্রেটারীর কাজ নিয়ে। অন্যান্য বারো জন যাত্রী। আমরা প্রায় ৮ মাইল মোটরে এসে মারী এয়ার ষ্টেশনে পৌঁছলাম। আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র Censure করা হ'লো, ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখলো। বেশ কৌতূহলের ব্যাপার। এই কাজটা শেষ হ'তে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগল। এর জন্য রয়েছে ছ'জন ডাক্তার, পাঁচজন কাষ্টম্‌স্ অফিসার, তিনজন ছাড়পত্র-পরীক্ষক, দশজন পুলিশ। বিরাট যজ্ঞ, অথচ কি সামান্য আহুতি।

মারী বিমান-ঘাঁটি অতি বৃহৎ। বহির্ভারতের সমস্ত বিমান এই ঘাঁটিতে অবতরণ করে। অবারিত মাঠ, চারপাশে জনমানব, বৃক্ষলতা কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই ; শুধু একখানি বিমানপোত দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রী নিয়ে পশ্চিমের পথে চ'লবে। বিরাট দৈত্য, অতিকায়। অন্ধকার জয় করে আলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করছিল। আমরা প্লেনে উঠামাত্রই এক মিনিটের মধ্যে সে বিমান-দৈত্যের কি বিরাট গর্জ্জন। পাঁচ মিনিট কাল পাঁয়তারা কসে উঠল আকাশের পথে। অন্ধকার তখনও আলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছিল। তার রাজত্ব পৃথিবীর বুকে আর কতক্ষণ। একটু পরেই দেখি চলেছে জলের উপর দিয়ে—গাঢ় কালো জল, অন্ধকারে আরো কালো হ'য়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে সাদা পাঁজা তুলার মত মেঘখণ্ডের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। অন্ধকারের কোলে সাদা মেঘশিশুগুলির লুকোচুরি খেলা—আলোর অন্তরালে আরো সুন্দর দেখায়। দার্জ্জিলিংয়ের পথেও এই মেঘশিশুর খেলা দেখেছি পাহাড়ের কোলে ; কিন্তু সেখানে সবুজ বনস্পতির অন্তরালে ; তাই সে সৌন্দর্য্য অন্যরূপ। যাক্ আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্বে আলোরই জয় হ'লো। আমরা পশ্চিম-যাত্রী পূবের আকাশ দেখতে দেখতে চ'ললাম। কিন্তু অরুণ দেবের দেখা আর পেলাম না ; মেঘ সূর্য্যের সারথিকে ঢেকে দিয়েছে। আমরা আকাশের বহু উপরে উঠলাম। —আরো উপরে ক্রমশঃ দেখলাম—আমাদের চারিদিকে মেঘ ছুটে আসছে, মেঘের পরে মেঘ, তার উপরে মেঘ। তারা যেন মানুষের হাতে গড়া বিমান-দৈত্যের আকাশ-অভিযানের বিরুদ্ধে তাদের মৌন প্রতিরো[ধ] জানাচ্ছে। আমাদের বিমান মেঘপুঞ্জকে খণ্ড-বিখণ্ডিত ক'রে বিজ[য়ী] সেনানীর মত জয় গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে চারিদিকে বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা ক[রে] চলেছে। মানুষ আর প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বের শেষ ফল এখনো অনিশ্চিত।

স্থলপথচারী বিমান জলপথচারী বিমান থেকে বোধ হয় বেশী আরামপ্র[দ] যদিও করাচীর লোকেরা বলছিল সীপ্লেন বেশী আরামদায়ক। যা[ই হোক] আরাম জিনিষটা ব্যক্তিগত। আমাদের বিমান Agrica ; মাত্র বারো যাত্রী নিয়ে চলেছে। একজন বড় সাহেব সস্ত্রীক চ'লেছেন লণ্ডনে একজন রাশিয়ান মস্কোযাত্রী। আমার পাশে একটি শিখযুবক মধ্যপ্রা[চ্যে] যুদ্ধে যাচ্ছেন ছুটি শেষ ক'রে। পশ্চাতে সিলভিরাজ। অন্যান্য সব সৈন্য।

ব্রেকফাষ্ট বক্স ভেঙে আমরা খেলাম—সেই মাংস, ফল, ডিম, মাখ[ন] রুটি—সেই কাঠের কাঁটা চামচে। ফ্লাস্কে রয়েছে জল, বরফ, কফি, [ও] লেমনজুস। এবার আমরা প্রায় ১০ হাজার ফিট উপরে উঠেছি নীল জল, নীল আকাশ, নীল আবেষ্টনে আমাদের এলুমিনিয়ামের তৈ[রী] শ্বেতকায় বিমান চারিদিকের নীলের স্পর্শে নীলাভ হয়ে উঠেছে। মেঘে[র] ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ায় প্রকৃতি এক অভি[নব] সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। কলিকাতা—করাচীর পথে আমার [ভাল লেগে] পেয়েছিল। এবার অচেনা পথ যেন আমায় বেশী আকর্ষণ করছে জল স্থির, বিমান স্থিরগতি, আমি স্থির, চারিদিক নিস্তব্ধ। অসীম শূ[ন্যের] মধ্যে একমাত্র বিমানগতির শব্দ, সেটাও আর শব্দ ব'লে মনে হচ্ছে কারণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, মহাকবি কালিদাসের উত্তররামচ[রিতে] রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের যে বিমানযাত্রার ব[র্ণনা] রয়েছে, তার স্মৃতি জেগে উঠল। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে প্রকৃ[তির] বৈচিত্র্যের কাহিনী প্রচুর। কিন্তু এখানে প্রকৃতির শূন্যতা ব্যতিরে[কে] আর কিছুই অনুভব করা যায়না। ঊর্দ্ধে সীমাহীন আকাশ, নি[ম্নে] দিগন্তব্যাপী লবণাম্বুরাশি, পার্শ্বে বিরাট শূন্যতা—সে শূন্যতা স্পর্শ করা যা[য়]।

সমুদ্র আমার কাছে নূতন নয়, নোয়াখালিতে জন্ম। শিশুকাল থে[কে] সমুদ্র দেখেছি। চট্টগ্রামে পোতাশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগর দেখে[ছি] অবিশ্রান্ত ঊর্ম্মিমালার কি বিরাট আলোড়ন। বম্বেতে India Gate[এর] সামনে দাঁড়িয়ে আরব-সাগর দেখেছি—কি শান্তি, বিরাট প্রশান্তি মাদ্রাজের সাগর সৈকতে দাঁড়িয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মত্ত নর্ত্তন দেখেছি লবণাক্ত জলধারায় অবগাহন করেছি। সমুদ্র আমার কাছে অ[পরিচিত নয়,] পরিচিত। কিন্তু আজকের মত আকাশ থেকে এমন কাল, নিস্ত[ব্ধ] স্থির জলরাশি—যা পারস্য উপসাগরে দেখলাম—তেমন আর দেখিনি মানুষ এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনায়াসে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

আমাদের বিমান সাড়ে দশটার সময় জীবানি বিমান কেন্দ্রে (Jiwa[ni] Airport) নামল। বেলুচিস্থানের মধ্যেই কোয়েটার ৫০ মাইল দূ[রে] জনবিরল বৃক্ষলতাহীন মরুপ্রান্তর, খিলাতের খান সাহেবের নিকট থে[কে] ব্রিটিশ এইস্থান বন্দোবস্ত নিয়ে নূতন বিমানকেন্দ্র স্থাপন করেছে, র[শিদ] আলির বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। (ক্রমশঃ

বাসর-শয্যা

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

ব্যাপারটা সাংঘাতিক সন্দেহ নাই, কিন্তু বুঝিতে একটু দেরী হইয়া গেল! বিবাহের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে, বাসর ঘরেই প্রথম আবিষ্কৃত হইল যে বর একেবারে বদ্ধ কালা!

বদ্ধ কালা হইলে যে লোকে বোবা হইবেই সেকথা কাহারও অজানা নাই। বিবাহ বাড়ীতে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! 'কপাল" ফাটিল কনের! নাপিত ছাড়া বরপক্ষের সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

বিয়ে বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত বরকে কথা বলিতে কেহ দেখে নাই, বলানর কোন প্রয়োজনও হয় নাই; কিন্তু বাসর ঘরে বর কোন কথা না বলায় এমন কি কোন ভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত না দেখানয়, মেয়েদের কেমন সন্দেহ হয়—বর বোবা নয় তো?

নাপিতকে জিজ্ঞাসা করায় সে একগাল হাসিয়া বলে—"বাবু কানে শুনতেই পান না, তা কথা কেমনে বলবেন!"

নাপিতের কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া সকলের গা-পিত্তি জ্বলিয়া যায়, কিন্তু নাপিতের উপর রাগিয়া কোন লাভ নাই।

বর কালা-হাবা শুনিয়াও লোকে যেন বুঝিতে সময় নিল—বিশ্বাস মনে হয় যেন!...উপায় কি হইবে!

কিছুই নয়, খানিকটা সোরগোল হইল প্রথমে। অনেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করিল! বিমর্ষ মুখে নানা রকম মন্তব্য করিতে করিতে অনেকেই বাসরঘর ছাড়িয়া গেল।

কনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা চোখের জল চাপিয়া অন্য ঘরে তাহা ফেলিতে গেলেন। রহিল কেবল কনের দু'একজন অতি-প্রিয় বান্ধবী!...

বর মুখ নীচু করিয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে। এই মারাত্মক ব্যাপারের জন্য সে যেন অত্যন্ত লজ্জিত, কিন্তু তাহার যেন কোন হাত ছিল না এই সব বিয়ের ব্যাপারে। কনে বরের দিকে পিছন ফিরিয়া অঝোরঝরে অশ্রু ফেলিতেছে। বান্ধবীরা সান্ত্বনা দিতেছে!

একজন বলিতেছে—এই জন্যই আগের কালে বর দেখার প্রথা ছিল। কনে দেখা যখন আছে—তা'কে কথা বলান, পায়ে হাঁটান, গান গাওয়ান সবই যখন হয়, বিয়ের আগে ছেলেই বা আজকাল দেখা হয় না কেন?

আর একজন বলিল—কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এরকমের জুচুরি তো কখনও শুনিনি। এ তো দিনে ডাকাতির চেয়ে সাংঘাতিক! সতীর যে এরকম বর জুটবে কল্পনাও করতে পারিনি!

আর একজন বলিল—মুখরা সতী এইবার যে কি করবে ভেবেই পাই না। যাস্‌নে তুই শশুরবাড়ী। বর হয়েছে হোক্, এখানেই থাকিস্ তুই। যেমন ছিলি তেমনি থাকবি এখানে। কনে যে কি করিবে তাহার কোন কিছুরই কুলকিনারা পাইল না সে! "আমি একটু একেলা থাকতে পারলে যেন বেঁচে যেতাম"—এই কথাটি বলি বলি করিয়াও সে বলিতে পারিল না। অনেক রকম মন্তব্য শুনিয়া শেষে সে বলিয়া ফেলিল—"কিছু মনে করিস্ না ভাই তোরা, আমায় যদি একটু একেলা থাকতে দিতে পারতিস্......" কথাটা কান্নার জন্য শেষ করিতে পারিল না সে!

ঠাট্টা করিবার মত মনোভাব কাহারও ছিল না। কোন রকম মন্তব্য না করিয়া একজন বলিল—একেলা মানে এই ঘরেই তো?

বুকফাটা কান্না সতীকে কোন উত্তর দিতে দিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল সে।

বান্ধবীরা আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সাহস সঞ্চয় করিয়া একজন কেবল বলিল—পারিস তো একটু ঘুমিয়ে পড়, অমন করে দুঃখ করে কি হবে!...

রাত্রি শেষ হইতে দেরী নাই। বর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে—হয়ত ঘুমাইতেছে। সতী কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া বাসর জাগিতেছে! অনুচ্চ স্বরে সে একবার বলিল—"ভগবান এই আমার কপালে ছিল? কেন, কি অন্যায় করেছিলাম আমি!...সব পূজাই তো ভক্তি ভরে করে এসেছি আমি।...কত শিবপূজা, কত ব্রতই না করলাম আমি—এসব কি তবে কিছুই না!"...... তাহার যেন মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়া গিয়াছে! আপন মনে কত কথাই না সে বলিয়া চলিয়াছে!

...আচ্ছা যারা কালা তারা কি কখনও শুনতে পায় না?... বোবাদের মুখে কি কখনও ভাষা ফুটতে পারে না?...কেমন করে আমি জীবন কাটাব?...ওঃ এত কষ্টের এত দৈন্যের এত দুঃখের কুমারী জীবন ভেঙ্গে শেষে এই অবলম্বন পেলাম!...কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছে...

...আমার জীবন দিয়ে সার্থক করে তুলবো আমাদের স্ত্রীজীবন। ...এই যদি ইঙ্গিত হয়, হে ভগবান, ওঁর জীবনের আমিই হব কাণ্ডারী, আমিই হব ওঁর ভাষা। গভীর দুঃখে দুঃখী

হয়ে আমিই করবো ওঁকে সুখী; বিদ্রোহ করবো সকলকার বিদ্রূপের ওপর।

সতী স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল—সুন্দর সুপুরুষ ঘুমাইতেছে। পায়ে হাত দিতেই তাহার স্বামী চোখ চাহিল। "আমার এই সব কথা তুমি শুনতেও পাচ্ছ না? আমার মনের কথা কিছু বুঝলে কি? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আমার জীবন তোমার পায়ে উৎসর্গ করলাম। কথাটা বুঝলে না বোধ হয়?"

স্বামী তাহার উঠিয়া বসিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"বেশ তো, এ আর নতুন কথা কি? বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোঝাপড়া তো হয়ে গেছে। এতে এত আবোল-তাবোল বকারই বা কি সার্থকতা আছে, এত কান্নাকাটিরই বা কি দরকার ছিল?"

"ধরণী দ্বিধা হও" বলিয়াই সতী লজ্জায় মুখ লুকাইল! ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু তাহার আগেই স্বামী তাহার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

"বোসো। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পেট ফুলে উঠেছে। এইবার আমি বলি, তুমি শোন।"

"ছিঃ! ছিঃ! তুমি কি গো! আমি এখন লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে! তুমি যে কালা হাবা নও, তাই বা বলবো কেমন করে?—রসিকতার একটা সীমা থাকা দরকার…!"

"আমার সম্বন্ধে তোমার কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। আমি ওই রকম! পুরুষ জাতটাই এই রকম…।"

নাপিতটাকে আর বিয়ে বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না!

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

কায়রোর রাজকীয় গ্রন্থাগারের বোস্তাঁ পুঁথির অন্তর্গত ক্ষুদ্রক চিত্র-সমূহের কোন বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ পাওয়া যায় নাই এবং মূলচিত্রগুলির কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কায়রোর পুঁথির মোট ছয়খানি চিত্রের মধ্যে অন্ততঃ একখানি চিত্রে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে বায়জাদের নাম লিখিত আছে, কিন্তু চেষ্টার-বিয়েটি সংগ্রহের বোস্তাঁ পুঁথির কোন চিত্রেই বায়জাদের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয় না। কেবল পুঁথির একস্থানে লিখিত আছে যে এ চিত্রগুলি শিল্পী (১) দাস বায়জাদের (de—'abdal mudhuib Bihzad') তুলিকায় অঙ্কিত। এই হৃদয়গ্রাহী চিত্রগুলিতে বর্ণযোজনার অপূর্ব্ব সাফল্য দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু যে সুকুমার আদর্শ, যে সূক্ষ্ম রেখাপাত, বায়জাদের পরবর্ত্তীকালের চিত্রগুলির অঙ্গস্বরূপ, এগুলিতে তাহার বিশেষ কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, তাই জনৈক লেখক অনুমান করিয়াছেন যে এগুলি বায়জাদের হাতের চিত্র হইলে তাঁহার চিত্রী জীবনের প্রথমাংশেই অঙ্কিত (২)। চিত্রে নীল বর্ণের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বায়জাদ নাকি এ রঙটির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

বায়জাদের শিল্প পদ্ধতিতে প্রভাবিত হইয়া বোখারা শিল্পকেন্দ্রে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও বোস্তাঁ গ্রন্থের দুইখানি চিত্রের উল্লেখ দেখা যায়। একখানি চিত্রে এক মূর্খ ব্যক্তি বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়া আছে, সেই শাখাটিই কর্ত্তন করিতেছে। (১নং চিত্র) ইহা মহাকবি কালিদাস বিষয়ক এক জন-প্রবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপর চিত্রটিতে বিখ্যাত সারাসেন্ (Saracan) বীর সুলতান সালাদিনের (৩) পুত্র মালিক সালে আয়ুব দরবেশদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত। পারস্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন-রূপে পরিগণিত কোনও কোনও চিত্র বহুবার নকল করা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ণিত চিত্র দুইখানি

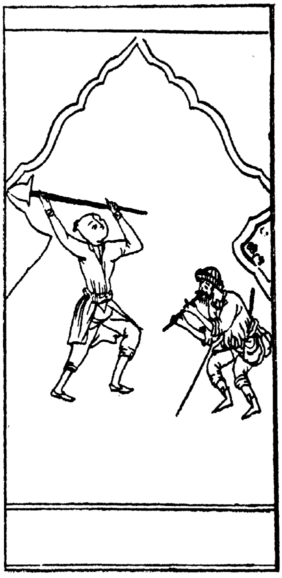

১নং চিত্র

(১) মুধুইব, মুধেহিব বা মুজেহিব শব্দ সোনালী হল্‌কর (gilder) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে হয় প্রাচ্যদেশসুলভ বিনয়বশে এই সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী আপনাকে "কারুশিল্পী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) J. V. S. Wilkinson in Indian Art and Letters, N. S. XVI, Vol. I, p—5.

(৩) সালাদিন সারওয়াল্‌টার স্কট রচিত 'টালিসমান' গ্রন্থের অন্যতম প্রধান নায়ক।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে, বায়জাদের মৃত্যুর প্রায় ২১।২২ বৎসর পরে অঙ্কিত, সুতরাং ইহা বায়জাদ রচিত চিত্রের নকল হওয়াও অসম্ভব নয়। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দের পর বায়জাদের প্রভাব বোখারা হইতে বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে উহা বলবৎ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মার্কিণ দেশে যে সকল চিত্রিত পারসীক পুঁথি স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইখানি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম নামক সংগ্রহাগারে রক্ষিত "হফ্ত্ পাইকার" পুঁথির চিত্রগুলি বায়জাদের প্রথম বয়সের চিত্রকর্ম্মের নমুনা বলিয়া পরিগণিত। পুঁথিখানি দিল্লীশ্বর আকবরকে পঞ্জাবের একজন শাসন-কর্ত্তা ১৫৮০ খৃঃ অব্দে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। বষ্টন (Boston) মিউজিয়মে সারফুদ্দিন আলি ইয়েজ্‌দি রচিত 'জাফরনামা' নামক তৈমুরলঙ্গের যে ইতিহাস গ্রন্থ রক্ষিত আছে তাহা বিখ্যাত লিপিকার (কাতিব) শির আলি কর্ত্তৃক লিখিত। পুঁথিখানি ১৪৬৭ খৃঃ অব্দের, সুতরাং বায়জাদের জীবিতকালেই উহা লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থের পাতাগুলি হাতে হাতে জীর্ণ হওয়ায় কাগজ আঁটিয়া লইতে হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর (খৃঃ অঃ ১৬০৫-১৬২৭) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন বায়জাদের মৃত্যুর প্রায় ত্রিসপ্ততি বৎসর পরে। ঐতিহাসিকের চক্ষে এ যে খুব বেশীদিনের কথা তা নয়। জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকারসূত্রে পুঁথিখানি পাইয়া নিজ হাতে উহাতে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পিতৃদেব সম্রাট আকবরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে এ গ্রন্থের চিত্রগুলির সব কয়খানিই বায়জাদের তুলিকাসঞ্জাত। পুঁথিখানিতে

২নং চিত্র

মোট দ্বাদশখানি চিত্র আছে তাহার মধ্যে অন্ততঃ চারিখানি বায়জাদের শিল্পের খাঁটি নিদর্শন। ফ্রাঁসিয়ার শিল্প-সমালোচক মঁসিয়ে গ্যাস্ত মিজিয় এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন (৪)। অপর একজন বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সম্রাট জাহাঙ্গীরের উক্তি পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৫)।

মিজিয় কথিত চিত্র চারিখানির বিষয়বস্তু নিম্নে বর্ণিত হইল—

(১) তৈমুর কর্ত্তৃক উদ্যান সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

(২) সমরকন্দে মসজিদ নির্ম্মাণ।

(৩) কোনও শত্রুদুর্গ অবরোধ।

(৪) সাদী সৈন্যের যুদ্ধ।

সম্ভবতঃ এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় ১৫০৫ খৃঃ অব্দে সুলতান হোসেন বাইকারার দেহান্তের পূর্ব্বেই। যে সময় জাফর-নামার চিত্রণকার্য্য আরব্ধ হয় বায়জাদের অঙ্কন-ধারা তখন পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বায়জাদ নাকি যুদ্ধের চিত্র আঁকিতে ভালবাসিতেন। গতিপ্রাণ পরিকল্পনা ও শক্তিমত্তার বিকাশেই ছিল তাঁহার আনন্দ—ইহাতেই তাঁহার চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তৈমুরের অভিযানের চিত্রনিচয়ে যুদ্ধের ও যুদ্ধোদ্যমের অভাব নাই। দুর্গ আক্রমণের চিত্রে, সাদী সৈন্যদলের যুদ্ধের চিত্রে গতি ও চলচ্চাঞ্চল্য সুপরিস্ফুট। এ ছাঁদের চিত্রের সহিত প্রথমোক্ত নিজামী পুঁথিখানির চিত্রণ পদ্ধতির বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

জনতাবহুল চিত্রপটে মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন স্তরে সাজাইবার যে প্রথাটি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল তাহা বায়জাদ যে অনুসরণ করেন নাই তাহা নয়। কোন কোনও স্থলে, যেমন সমরকন্দে মসজিদ নির্ম্মাণের চিত্রে, এ ধারা খাপ খাইয়াছে ভাল। ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের খাম্‌সা পুঁথিতে কাশিম আলি অঙ্কিত (৬) সৌধনির্ম্মাণের যে চিত্রখানি (চিত্র নং২) সন্নিবিষ্ট আছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিন্যাসপদ্ধতি যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। কতক গাঁথা প্রাচীরের চারিদিকে "ভারা" বাঁধা, সেই ভারায় উঠিয়া বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকের দল আপন আপন কর্ম্মে নিরত। ভূ-পৃষ্ঠেও ব্যস্ত কর্ম্মিগণ চারিদিকে ইমারত গঠনের উপকরণাদি বহন করিতেছে। কোন কোনও চিত্রে দেখিতে পাই, কতক লোক পাহাড়ের উপর, কতক লোক ব গিরি দুর্গের বুরুজে। এইরূপ সুকৌশল সন্নিবেশ হেতু চিত্রের অন্তর্নিহিত ঐক্যের যে ব্যত্যয় হয় বায়জাদ যে তাহা ন বুঝিতেন তাহা নয়। পরবর্ত্তীকালের ছবিগুলিতে তিনি এই দোষ দূরীকরণের জন্য স্থানে স্থানে বস্ত্রাবাসের রজ্জুর ন্যায় শ্বেত রজ্জু বিন্যাস করিয়া পটভূমির বিভিন্নাংশ জ্ঞাপন ও সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। শ্বেত বর্ণে অঙ্কিত হওয়ায় রজ্জুগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এ কৌশল অপর চিত্রীগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী সাফাবীয় যুগেও অবলম্বিত হইয়াছিল। সেন্টপিটার্স্‌বর্গে (৭

(৪) Manuel d'art Masulman গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৫) V. Goloubew in Ars Asiatica, Vol. XIII, p. 7.

(৬) দেখা গিয়াছে যে কোন কোনও স্থলে বায়জাদ ও কাশি আলি উভয়ে মিলিয়া একই পুঁথির চিত্রণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে ভ্রমক্রমে অনেক সময় কাশিম আলির রচিত চিত্র বায়জাদের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের অঙ্কন রীতিতে এইরূপই সৌসাদৃশ্য ছিল।

(৭) Les Calligraphes et les Miniateristes Mussalmar P. 326 et seq.

কৃত আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ অব্দের একখানি পুঁথির চিত্রগুলিও বায়জাদের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৫২২ খৃঃ অব্দেও যে বায়জাদ জীবিত ছিলেন তাহার লিখিত প্রমাণ আছে সুতরাং সেন্টপিটার্সবর্গের পুঁথিখানি বায়জাদ কর্ত্তৃক চিত্রিত হওয়া অঙ্কনকালের দিক দিয়া কোন মতেই আটকায় না।

মঁশিয়ে শার্ল উয়ার্ট (M. Ch'arles Huort) তাঁহার "মুসলমান লিপিকার ও ক্ষুদ্রক চিত্রকর" বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ভিয়েনার রাজকীয় গ্রন্থশালায় বায়জাদের সাত খানি চিত্র রক্ষিত ছিল, তাহার মধ্যে একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট কোন নরপতির প্রতিকৃতি। রাজনৈতিক বিপর্য্যয় হেতু সেন্টপিটার্সবর্গের পুঁথিখানি ও ভিয়েনার সেই চিত্রগুলি এখন যে কোথায় গিয়াছে তাহা কে বলিবে? সেন্টপিটার্সবর্গ অধুনা লেনিনগ্রাড নামে পরিচিত।

সুলতান হোসেন বাইকারার অধীনে বায়জাদের কার্য্যকাল ১৪৬৮ হইতে, মতান্তরে ১৪৮৭ হইতে ১৫০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। তাতার আক্রমণ হেতু তৈমুরীয় বংশের শেষ নরপতি, বাইকারার পুত্র বদিউজ্জমান, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং আত্মরক্ষার্থ তাঁহার ভগিনীপতি প্রথম সাহ ইস্‌মাইলের (Shah Ismail I) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে হিরাটের শূন্য সিংহাসন তাতার নেতা মহম্মদ খাঁ সাইবানি কর্ত্তৃক অনায়াসেই অধিকৃত হয়। মহম্মদ খাঁ সাইবানির অধীনে বায়জাদ ১৫০৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র চারি বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। বোধ হয় সাইবানির নিজ ফরমাইস মতই তাঁহার চিত্রকররূপে পরিকল্পিত একখানি প্রতিকৃতি বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। এই তাতার যোদ্ধার সাধ জন্মিয়াছিল চিত্রকর ও লিপিকাররূপে যশোলাভ করিবার। তিনি নাকি বায়জাদের অঙ্কন সংশোধন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে "কলম" ধরিতেন। ইহাকেই বলে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।

বায়জাদ রাজসভার চিত্রাদি যে না আঁকিয়াছেন তা নয়। মনে হয় রাজসভার জাঁকজমক শিল্পী হিসাবে তাঁহাকে একটু যেন বেশী করিয়াই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার এজাতীয় চিত্রের মধ্যে রহিয়াছে বহুবর্ণে সমুজ্জ্বল অশ্বারোহীবৃন্দের সংযান, রাজপ্রাসাদের উৎসব ও নিমন্ত্রণ পর্ব্ব এবং নানা সমারোহ মধ্যে রাজ সন্দর্শনার্থ লোক সমাগম (চিত্র নং ৩)। আবার কোথাও বা তাঁহার পরিকল্পিত চিত্রে শত্রুনগরী আক্রান্ত ও অধিকৃত হইতেছে, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদল রণোন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া কাতারে কাতারে বিপক্ষপক্ষের সম্মুখীন হইতেছে, আবার কোথাও বা খণ্ডযুদ্ধের সুতীক্ষ্ণ সংঘর্ষ বিদ্যমান। সেনানীদিগের পরিধানে স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত মূল্যবান বিচিত্র সাঁজোয়া, কাহারও অঙ্গে কিংখাপের নয়নমনোহর আঙ্গরাখা, কাহারও বা অঙ্গচ্ছদ কোমল পশুলোমের ধূসর ও পিঙ্গল বর্ণাভায় পরিশোভিত। এই প্রসঙ্গে জাফর-নামার অন্তর্গত তৈমুর কর্ত্তৃক রাজোদ্যানে সভাসদগণের আমন্ত্রণের চিত্র এবং সুলতান হোসেন বাইকারার সভায় রাজসম্ভাষণের চিত্র—এই দুইখানি চিত্রের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে বায়জাদ আমির খসরু রচিত খাম্‌সা কাব্যের চিত্রণকার্য্য সমাধা করেন। এ পুঁথিখানিও এক্ষণে "চেষ্টার বিয়েটী" সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ক্ষুদ্রক চিত্রের মোটসংখ্যা ত্রয়োদশের অধিক নয়; তাহার মধ্যে যে কয়খানি বায়জাদের নিজ কলমের তাহার বিবরণ পুঁথির পুষ্পিকাংশে (Colophon-এ) প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানিতে হস্তাক্ষরের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, সুতরাং পুঁথিটী যে একই লিপিকার কর্ত্তৃক লিখিত সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পুঁথির মানব মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ছাঁদের এবং উঁহাদের ভঙ্গিমাও কিছু উগ্র ও বিকট রকমের, তাই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এগুলি আসলে বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত নয়। সন্নিবেশ কৌশল, বর্ণবৈভব, সূক্ষ্মাংশগুলির অঙ্কননৈপুণ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে বিশেষজ্ঞদিগের এ সন্দেহ অমূলক বলিয়াই মনে হয়। ডাঃ এফ্ আর মার্টিন (Dr. F. R. Martin) একটু বড় ছাঁদের মূর্ত্তিগুলি ভিত্তিচিত্রণ রীতির প্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার এ মতবাদ বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দেওয়াল চিত্রণ-রীতির সহিত বায়জাদের যে ভালরূপই পরিচয় ছিল তাহা বুঝা যায়—

৩নং চিত্র

সম্রাট আকবরের জন্য নকলকরা একখানি পুঁথির চিত্র হইতে। এই গ্রন্থে হিরাটের কয়েকটি দেওয়াল চিত্রের নমুনা যত্ন সহকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহরুখ যে হিরাটে একটি উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যস্থ গৃহের ভিত্তিগাত্রে চিত্র সন্নিবেশ করাইয়াছিলেন একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়াছি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ৯০০ হিজিরাব্দে (খৃঃ ১৪৯৪ অব্দে) সুলতান মহম্মদ নুর কর্ত্তৃক লিখিত হাফিজের দেওয়ান গ্রন্থের একখানি

পুঁথিতে, প্রত্যেক গজলের উপরিভাগে যে দুই দুইটি করিয়া পক্ষীচিত্র অঙ্কিত আছে তাহার প্রত্যেকটিতেই বায়জাদের তুলিকাসম্পাত অনুভূত

৪নং চিত্র

হয়। অঙ্কন-ধারার ললিত মাধুর্য্যে ও মেদুর রঞ্জন কৌশলে এ চিত্রগুলি এখনও দর্শকমাত্রেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে।

গভীর ভাবোন্মেষ ও মধুর মনোহারিত্ব গুণের সমাবেশহেতু জনৈক দরবেশের একখানি সুবিখ্যাত প্রতিকৃতিও বায়জাদের কলানৈপুণ্যের নিদর্শন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এ চিত্রখানি প্রাচ্যশিল্পে মানব প্রতিকৃতি (তসবির) অঙ্কনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে যে বিপুল হৃদয়গ্রাহিত্ব (monumentality), মধুর লালিত্য (grace), ও প্রোজ্জ্বল প্রাখর্য্য একাধারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ভাবুক সমাজ তাহার উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। একদিকে স্থৈর্য্য ও অপরদিকে ভাবাবেগের তীক্ষ্ণতাই এ শ্রেণীর অন্যান্য চিত্র হইতে এ চিত্রটির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া পরিকল্পনার মৌলিকতায় ইহাকে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে (৮)। বায়জাদ প্রায়ই আঁকিয়াছেন যোদ্ধৃবর্গের নানাভঙ্গীর নানাবিধ চিত্র, তাই তাঁহার দ্বারা দরবেশের চিত্র অঙ্কিত হওয়া সম্ভব কিনা তাহা লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ম'সিয়ে সাকিসিয়ান বায়জাদ কর্ত্তৃক এ প্রকার চিত্রাঙ্কন সম্ভব বলিয়া মনে করেন না (৯)। বায়জাদ যে দৃশ্য চিত্রের শান্তিময় প্রতিবেশে দরবেশ (চিত্র নং৪) ও ধর্ম্মোপদেশকদিগের আকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে (১০)। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র এখনও এ উক্তির সমর্থন কল্পে সাক্ষ্য দিতেছে। (ক্রমশঃ)

(৮) A. U. Pope, Introduction to Persian Art, p. 110.

(৯) Sakisian, Op. cit., p. 110.

(১০) Thomas Sutton in Rupam, Nos 19-20, p. 113.

সিনান

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

ওগো ও কা'দের বিরহ-আসার
বরিখে বরিখা-ধারায় মিশি,
খঞ্জন-আঁখি অঞ্জন ধুয়ে
কালো হ'ল বুঝি তিমিরে দিশি।
মেঘে মেঘে বাজে মন্দ্র গভীর
ঝিমরি ঝিমরি অকহা কথা
ব্রজ-জন হৃদি-বল্লভে স্মরি
আজ' উথলিছে অসহ ব্যথা।
ওই কারা দেয় নীপ-অঞ্জলি
বকুল কামিনী বিছায়ে পথে,
কেতকী-বুকের পরাগ নিছায়
শিহরে ভাবিয়া বিদায়-রথে!
সিনান করায় কা'রা সে প্রিয়েরে
নয়নের নীরে ধেয়ানে ধরি,
বৃকভাণু-রাজ-নন্দিনী আজ
চির-মরমীর মরমে মরি।
প্রাণে মনে জাগে স্নান-অভিষেক
তা'রি উৎসব-হরষ শুনি,
স্নান-যাত্রায় বর-সজ্জায়
কবে বার হবে দিবস গুণি।
হৃদয়ের লোহে রাঙা ব্রজরজে
আর কি সে রথ আসিবে ফিরি,
আভীর কিশোরী কিশোরের প্রেমে
নিকষিত হেম বাঁধনে ঘিরি
কোথা বন্ধুর সন্ধানে ফিরি
অজানা অচিন্ বন্ধুর পথে,
এ মণি-কোঠায় অধরারে ধরি
সারথি করিব এ দেহ-রথে।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৪

প্রগাঢ় নিদ্রার পর বেলা সাড়ে ন'টার সময় উঠলেন তিনি। মুহূর্ত্তেই সব মনে পড়ে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন। অপর্ণার মৃত্যুর কথাই মনে হতে লাগল। কাল রাত্রে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা সমস্ত ওলট-পালট করে দিয়েছে, অতিশয় বেদনাময় অনুভূতি রেখে গেছে একটা সারা বুক জুড়ে। যুগল পালিত যতক্ষণ ছিল বেদনাটা ঢাকা ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, ন'বছর আগে যা যা ঘটেছিল মানস-পটে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সব।

এই মহিলাটিকে, যুগল পালিতের স্ত্রী এই অপর্ণা পালিতকে, তিনি একদিন ভালবেসেছিলেন। যতদিন বৰ্দ্ধমানে ছিলেন ততদিন তার প্রণয়ী ছিলেন তিনি। বৰ্দ্ধমানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের কাজে—সে-ও এক মকোর্দ্দমার ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য পুরো একবছর বাড়ি ভাড়া করে' সেখানে না থাকলেও চলত। প্রণয়-ব্যাপারের জন্যেই অতদিন থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর্ণা তাঁকে যেন যাদু করেছিল। যেন ভর করেছিল তাঁর উপর। এই মেয়েটার সামান্য খেয়াল মেটাবার জন্যে না করতে পারতেন হেন কাজ ছিল না।

বস্তুত তার পূর্ব্বে এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি তাঁর। তীব্র উন্মাদনার আস্বাদ সেই তাঁর জীবনে প্রথম। এক বৎসর পরে বিচ্ছেদ যখন আসন্ন হয়ে এল, (যদিও সে বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না এই আশা তিনি তখন করেছিলেন)—সত্যিই যাবার সময় ঘনিয়ে এল যখন, তখন এমন অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে অপর্ণাকে হরণ করবার কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। তাকে সে কথা বলেও ছিলেন—স্বামীকে ছেড়ে, ঘর সংসার ছেড়ে, সমাজকে তুচ্ছ করে' তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও পেড়েছিলেন—হ্যাঁ, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধই করেছিলেন—বেশ মনে পড়ছে। যদিও অপর্ণা প্রথমটা নিমরাজি হয়েছিল (হয় তো সংসারের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, হয় তো অভিনবত্বের আশায়) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বেঁকে দাঁড়াল। সে আপত্তি করল বলেই পুরন্দরবাবুকে একা বৰ্দ্ধমান ত্যাগ করতে হল। তা না হলে পুরন্দরবাবু তাকে নিয়েই আসতেন। কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। অপর্ণাই তা'কে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিল।

কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁর মনে হত, বারবার মনে হত—সত্যিই কি অপর্ণাকে ভালবেসেছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর মিলত না। ভালবাসা? না, মোহ? ঠিক করতে পারেন নি কিছু। আজও পারেন নি। কোলকাতায় ফিরে নূতন কোন প্রেমের প্রভাবে পড়ে' যে একথা মনে হত তা নয়। যদিও ফিরে এসেই তিনি দলে মিশে রামবাগান সোনাগাছি চষে' বেড়িয়েছিলেন রীতিমত—কিন্তু সেই প্রথম দু'মাস তাঁর সমস্ত মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কোন মেয়েমানুষই চোখে লাগে নি, কেউ মনে দাগ কাটতে পারে নি। অপর্ণার প্রতি তাঁর মনোভাব ভালবাসা না মোহ, এ প্রশ্ন মনে বারম্বার জাগলেও এটা তিনি ঠিক জানতেন যে আবার কোনক্রমে যদি বৰ্দ্ধমানে গিয়ে পড়েন তাহলে অপর্ণারই মায়াপাশে আবার গিয়ে ধরা দেবেন অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর এ বিশ্বাস বদলায় নি। পাঁচ বৎসর পরে একথা স্বীকার করতে কিন্তু লজ্জা হত তাঁর—সমস্ত অন্তর আত্মধিক্কারে ভরে উঠত, অপর্ণার উপরও ঘৃণা হত, সত্যটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বৰ্দ্ধমানের ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যও লাগত খুব। তিনি—পুরন্দর রায়চৌধুরী—কি করে' এমন একটা খপ্পরে পড়লেন! প্রেম? অসম্ভব। লজ্জায় দুঃখে আত্মগ্লানিতে চোখে জলও এসে পড়েছে। হ্যাঁ জল! আরও কিছুদিন পরে অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন অবশ্য। প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে' মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে—সফলকামও যে হন নি, তা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ ন'বছর পরে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আবার। সমস্ত।

একটা বিষয়ে বিস্ময় লাগছে কিন্তু। এখন, বিছানায় বসে বসে' নানাবিধ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট অনুভব করছেন তিনি—যদিও সংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সত্যি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে নি। সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছে না! সত্যিই এতটা হৃদয়হীন আমি নাকি?—নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন। এখন অবশ্য আর ঘৃণা করেন না তাকে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে তার প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে এখন। ন'বছরের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে অপর্ণার একটা স্বরূপ খাড়া করেছিলেন তিনি মনে মনে। মফঃস্বলের শহরে হাবভাবময়ী কলাকুশলা একধরণের ভদ্রমহিলা দেখা যায়—যারা সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করে, পার্টিতে যায়, সব কথায় বুকনি দেয়, অপর্ণাও সেই জাতের মেয়ে—তার বেশী কিছু নয়—তিনিই হয় তো তাকে স্বপ্নলোকে দেবী বানিয়েছিলেন। হয় তো! এটাও মনে হত হয় তো তাঁর বিচার নির্ভুল নয়। বিশেষ করে' এই কথাটাই মনে হচ্ছে এখন। হয় তো…কিন্তু না—বিরুদ্ধ সাক্ষী অনেক বর্ত্তমান। এই পূর্ণ গাঙুলী লোকটা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট ছিল ওই পরিবারের সঙ্গে এবং তার মতো সে-ও হয়তো ফেঁসে ছিল। পূর্ণ গাঙুলী কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে, কোলকাতায় থাকলে তার হিল্লে হ'ত কিছু একটা, কারণ তার মস্তিষ্কে বা চরিত্রে এমন কিছুই ছিল না (পুরন্দরবাবুর তাই ধারণা অন্তত) যার জোরে চেনা-শোনা সমাজের বাইরে গিয়ে সে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু কোলকাতা ত্যাগ করে' অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে বর্দ্ধমানে গিয়ে আড্ডা গাড়লে—কেবল ওই অপর্ণার জন্যে। শেষ পর্য্যন্ত কোলকাতায় এল—অপর্ণা তাকে ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করেছিল বলে' সম্ভবত। ওই মেয়েটার সত্যিই আকর্ষণ করবার, বশ করবার, শাসন করবার অদ্ভুত কুহকিনী শক্তি ছিল একটা।

কিন্তু যে সব গুণের জোরে মেয়েরা পুরুষদের সাধারণত আকর্ষণ করে, বশ করে, অপর্ণার সে সব গুণ ছিল না। সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। পুরন্দরবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তার বয়সও আটাশ বছর—অর্থাৎ যৌবনও উত্তীর্ণ প্রায়। সুন্দরী না হলেও তার সারা মুখে অপূর্ব্ব কমনীয়তা ছিল একটা, চোখ খুব বড় ছিল না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত শক্তির ব্যঞ্জনা। রোগা ছিল খুব। খুব বেশী লেখাপড়া শেখে নি, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কেমন যেন জেদি গোছের ছিল। নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে জানত। মতান্তর শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। কখনও কোন ব্যাপারে আপোষ করে নি। চালচলনে শহুরে ভাব খুব বেশী না থাকলেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ বৈশিষ্ট্য। মার্জ্জিত রুচিও ছিল, যদিও তার পরিচয় প্রধানত পাওয়া যেন প্রসাধনে আর সাজসজ্জায়। চরিত্রে ছিল সে সম্রাজ্ঞী—আধিপত্য করবার লোভ এবং শক্তি দুইই ছিল তার। যাকে ভালবাসত তাকে পদানত করে' রাখত একেবারে। আসন্ন বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়ত না কখনও। বিপদের সময় তার মনের জোর দেখে অবাক লাগত সত্যি। অদ্ভুত চরিত্র। উদারতা এবং নীচতার এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল একরকম। যুক্তির ধার ধারত না, প্রয়োজন হলে 'দু' দুগুণে চার' এ সত্যকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বাধত না তার। নিজের দোষ বা নিজের ভুল দেখতেই পেত না কখনও। স্বামীকে আজীবন বঞ্চনা করে এসেছে, অসংখ্য চাতুরী খেলেছে তার সঙ্গে—কিন্তু সে জন্য কখনও দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয় নি। তাকে দেখে পুরন্দরবাবুর মনে পড়ত উর্ব্বশী কবিতার প্রথম লাইনটা—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী। ও যেন সকলের। চিরন্তনী কামিনী! নিজেও বোধহয় সে তাই অকপটে বিশ্বাস করত। পুরুষের মনোহরণ করাই তো তার কাজ। তাতে আর পাপ পুণ্য কি! যাকে যতক্ষণ ভালবাসত ততক্ষণ তার সঙ্গে প্রতারণা করত না। কিন্তু ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যেই শুরু হত অভ্যাসের দাসত্ব, অমনি শিকাল কাটার সুযোগ খুঁজে বেড়াত সে। প্রণয়ীকে পীড়নও যেমন করত, সোহাগও করত তেমনি। উদগ্র কামনার নিষ্ঠুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল যেন। অথচ নীতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা—হ্যাঁ বক্তৃতাই দিত—ভ্রষ্ট চরিত্র লোককে নিদারুণ ভাষায় গালাগালি দিতে শতমুখ হ'য়ে উঠত, অথচ নিজে ছিল ভ্রষ্টা! কিন্তু সে যে ভ্রষ্টা তা কিছুতেই, হাজার প্রমাণ প্রয়োগ করেও, বোঝান যেত না তাকে। প্রণয়ী পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে ভাবতেন—"ভণ্ডামি নয় সত্যিই হয়তো ও ওইরকম। হয়তো ভ্রষ্টা হয়েই জন্মেছে—ওই ওর প্রকৃতি। এ জাতীয় মেয়েরা কখনও বুড়ো হয় না, কখনও কারও গৃহিণী হয় না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একটার পর আর একটাকে বরণ করে যায় কেবল। ওই ওদের ধর্ম্ম। বিবাহিত স্বামীই বোধহয় ওদের প্রথম প্রণয়ী। কিন্তু সে প্রণয়টা আরম্ভ হয় বিবাহের পরে। এরা খুব সহজে স্বামী পাকড়াতেও পারে। যখন দ্বিতীয় প্রণয়ী বরণ করে তখন স্বামীকেই দোষ দেয়, যেন স্বামীর কাছে সুখের আস্বাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পর-পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে। পর-পুরুষের বাহুপাশে যখন ধরা দেয় তখন প্রাণ ঢেলেই দেয়, তাতে কোন ভণ্ডামি থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত ওরা মনে করে—যা করছি ঠিকই করছি, দোষের কিছু নেই এতে···। আমরা সতীই—"

এ ধরণের মেয়ে থাকা যে সম্ভব পুরন্দরবাবুর এ বিশ্বাস সত্যিই হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর হয়েছিল যে এই মেয়েদের অনুরূপ এক জাতীয় স্বামীও আছেন যাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা চিরকাল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যান্ আর কিছু করেন না, আর কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। এঁরা কেবল বিয়ে করবার জন্যই জন্মান যেন। নিজেদের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এরা বিয়ের পর অবিলম্বে স্ত্রীর পরিপূরক হয়ে পড়েন ঠিক। এঁদের কতকগুলো চারিত্রিক লক্ষণও থাকে। কেমন যেন মেয়েলি ভাবাপন্ন হন এঁরা। এঁদের চলন বলন হাবভাব সব কিছুই পেলব পেলব। দেখলেই চিনতে পারা যায়। পুরন্দরবাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যুগল পালিত এই জাতীয় লোক। কিন্তু গতরাত্রে যে যুগল পালিতকে দেখা গেল সে তো একেবারে অন্যলোক, বর্দ্ধমানে যার সঙ্গে আলাপ ছিল এ তো সে নয়। অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেল লোকটা। বদলাবার কথাও—পুরন্দরবাবুর মনে হল—এ অবস্থায় বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর জীবিতকালে সে স্ত্রীর পরিপূরক ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আর তা থাকবে কি করে'—সে তো এখন একটা ভগ্নাংশ মাত্র···দু'জনে মিলে সমগ্র ছিল। সমগ্র জীবনের একটা অংশ হঠাৎ কেটে বেরিয়ে এসেছে যেন···বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত।

অতীতের যুগল পালিত সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর মনে নানা কথা জাগছিল। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি···

"বর্দ্ধমানে লোকটা স্বামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাকরি করত, একজন পদস্থ কর্ম্মচারীই ছিল, কিন্তু তাও যেন স্ত্রীর জন্যই! স্ত্রীর গয়না কাপড় কেনবার জন্য, তার সামাজিক সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য দশটা পাঁচটা আপিস করে মরত লোকটা। আর খুব নিষ্ঠাভরেই করত। একটু ফাঁকি দিত না কাজে। অথচ আপিসে খুব যে একটা সুনাম ছিল তাও নয়। দুর্নামও ছিল না। বাপের বিষয় আশয় ছিল কিছু। ভালভাবেই চলে যেত। দামী শোফা সেট, কার্পেট, দামী দামী বাসন বেয়ারা বয়।—চতুর্দ্দিক ঝকঝকে, তকতকে টিপটপ রাখতেই হত। কারণ ভয়ানক বড় লোক-ঘেঁসা ছিল। বড় বড় অফিসার তো বটেই, নামজাদা যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে বর্ত্তে যেত যেন

লোকটা। বাড়িতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। বহু বড়লোকের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। অপর্ণারও বেশ খাতির ছিল বড়লোক মহলে। অপর্ণা অবশ্য খাতির পেয়ে গলে' পড়ত না কখনও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই নিত সে এসব। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বড় বড় লোকদের সে নিমন্ত্রণ করত যখন, তখন সত্যিই উপভোগ্য হ'ত ব্যাপারটা। অতিথি-সৎকার করতে জানত সে। যুগলকেও এমন তালিম দিয়ে ছিল যে নামজাদা অভিজাতবংশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতেও তার তাল কাটত না কখনও। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে যুগল পালিতেরও নিজস্ব বুদ্ধি আছে কিছু—ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতেই হয়তো আলাপ করতে পারে সে—কিন্তু পাছে বেশী বকবক করে এই ভয়ে অপর্ণা তাকে ওজন-করা ভদ্রতা-সম্মত কথা ছাড়া অন্য কথা কইতেই দিত না। ভদ্রসমাজে যুগল পালিতের স্বকীয়তা পরিস্ফুটই হতে পায় নি কখনও। ভালমন্দ মিশিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র ছিল নিশ্চয়ই একটা। কিন্তু তা কেউ জানবার সুযোগ পায় নি। মৃদু হেসে আলতো আলতো ভদ্রতা করেই কালক্ষেপ করতে হত তাকে। তার সদগুণগুলো চাপা পড়ে যেত অপর্ণার জ্যোতিতে, আর বদগুণগুলো বিলুপ্ত হত তার শাসনে। পুরন্দরবাবুর মনে পড়ল যুগল পালিতের পরচর্চ্চা করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল,প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ভালইবাসত সে—কিন্তুঅপর্ণার ভয়ে সে মুখখুলতেপারতনা। নানারকম গালগল্প করার দক্ষতা ছিল যুগলের, কিন্তু করতে পেত না। যা সংক্ষেপে সারা যায় এবং যা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিত না তাকে অপর্ণা। যুগল মদ খেত, সুযোগ পেলে বেশ টানতে পারত, কিন্তু উপায় ছিল না। অপর্ণা ভারী কড়া ছিল সে বিষয়ে। স্ত্রীর ভয়ে যুগল মদ ছুঁত না। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে' সন্দেহ করবার উপায় ছিল না—বরং মনে হত অপর্ণাই পতিভক্তিপরায়ণা বাধ্য স্ত্রী, ভুলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না। শুধু মনে হত নয়, অপর্ণা তা নিজেও বিশ্বাস করত সম্ভবত। যুগল হয় তো অপর্ণাকে ভালবাসত—হয় তো খুব গভীর ভাবেই ভালবাসত, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না। অপর্ণার কড়া শাসনের জন্যই হয় তো ছিল না। বর্দ্ধমানে থাকবার সময় পুরন্দরবাবুর প্রায়ই মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে অপর্ণার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা যুগল জানে কি না। কোন সন্দেহই কি হয় না তার মনে? অপর্ণাকে প্রশ্নও করেছেন অনেকবার—কিন্তু প্রতিবারই এক উত্তর পেয়েছেন। অপর্ণা বিরক্তি ভরে প্রতিবারই বলেছে—উনি কিছু জানেন না, জানতে পারেন না—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অপর্ণার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—স্বামীকে কখনও খেলো করবার চেষ্টা করত না সে। অপর কেউ করলে বরং চটে যেত। স্বামীর পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক করত তার সঙ্গে। ছেলেপিলে ছিল না, সুতরাং একটু বার ফটকা হতেই হয়েছিল তাকে। কোন নিমন্ত্রণ কোন পার্টি বাদ যেত না। কিন্তু তাই বলে' যে ঘরের দিকে টান ছিল না, তা নয়। মনে হত বাইরের সামাজিক আনন্দে তার মন ভরত না। ঘর-সাজানো, সেলাই-করা, রান্নার ব্যবস্থা করা এই সব গৃহস্থালী কাজেও অনেক সময় কাটাত সে। কাল রাত্রে যুগল যে কথাটা বললে—অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনার চর্চ্চাও হত। কখনও যুগল পালিত কোন বই পড়ত তাঁরা শুনতেন। তিনিও পড়তেন কখনও কখনও। যুগল চমৎকার পড়তে পারত, মাঝে মাঝে তাক লেগে যেত পুরন্দরবাবুর। অপর্ণা সেলাই করতে করতে গম্ভীরভাবে শুনত। রবিবাবুর গল্প কবিতা পড়া হত বেশী…কিন্তু মাঝে মাঝে গম্ভীর জিনিসও হত—হীরেন দত্তর 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়া হয়েছিল একদিন। পুরন্দরবাবুর রুচি ও বিদ্যার প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নীরবে শ্রদ্ধা করত সে। কখনও উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাবটা যেন পুরন্দরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে তা' নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ে সে প্রায় চুপ করেই থাকত—পুরন্দরবাবুর মনে হত এ সব বিষয়ে খুব যেন উৎসাহ নেই তার। সমাজে থাকতে গেলে এ সবের সংস্রবে বাধ্য হয়ে আসতে হয়—হয় তো এদের উপযোগিতাও আছে কিছু—তাই যেন সে এসব সহ্য করে। যুগলের কিন্তু খুব উৎসাহ ছিল এ সব বিষয়ে।

পুরন্দরবাবুর দিক থেকে ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছিল—অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় উন্মত্ততার শেষ সীমায় উপস্থিত হব হব করছিলেন—ঠিক সেই সময়ে প্রণয়-পর্বে ছেদ পড়ল হঠাৎ একদিন। হঠাৎ অপর্ণাই সব চুকিয়ে দিল একদিন। তাঁকে ছেঁড়া চটির পাটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে—একথা কিন্তু বুঝতে পারেন নি তিনি তখন।

এর মাস দুই আগে এক বিলেত-ফেরত ছোকরা পুলিশ বিভাগে বড় চাকরি নিয়ে বর্দ্ধমানে এসেছিল। যুগলদের বাড়িতে যাতায়াতও সুরু করেছিল সে। আগে তাঁরা তিন জন ছিলেন—ইনি আসাতে চার জন হলেন। অপর্ণা এই 'ছেলেমানুষ' অফিসারটিকে বেশ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলে—ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তাকে 'ছেলেমানুষ' বলেই গণ্য করেছে সে। পুরন্দরবাবুর মনে তাই কোন সন্দেহই হয় নি। এ সব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তাঁর—কারণ অপর্ণা তখন তাঁকে 'নোটিশ' দিয়েছে। বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। বহু কারণ অপর্ণা দেখিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধানতম—সে সন্তানসম্ভবা। সুতরাং অবিলম্বে অন্তত চার পাঁচ মাসের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে…এ নিয়ে কোন কেলেঙ্কারী যদি হয় তাহলে তার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না অন্তত। পুরন্দরবাবুর মনে হল যুক্তিটা বড্ড বেশী প্যাঁচালো। তিনি সোজা বললেন—চল আমার সঙ্গে। বম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, কাশ্মীর যেখানে হোক। কিন্তু কিছু হল না, তাঁকে একাই ফিরতে হল শেষ পর্য্যন্ত। অবশ্য মাত্র তিন চার মাসের জন্য—এ আশ্বাস না পেলে কোন যুক্তিই নিরস্ত করতে পারত না তাঁকে, অপর্ণাকে নিয়েই আসতেন তিনি। ঠিক দু'মাস পরে অপর্ণার এক চিঠি পেলেন—আপনার ফেরবার দরকার নেই আর। যা মরে' গেছে, কি হবে তাকে আবার বাঁচিয়ে? চেষ্টা করলেও তা কি আর বাঁচে কখনও? সুখবর আছে, একটা আমার যে "ভয়" হয়েছিল তা অলীক। পুরন্দরবাবু খবর পেলেন

"ছেলেমানুষ" পুলিশ অফিসারটি বেশ জমিয়েছেন সেখানে। পুরন্দরবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। মোহের সমস্ত কুয়াসা কেটে গেল নিমেষে। আরও কিছুদিন পরে, মানে কয়েক বৎসর পরে, এ খবরও তিনি পেয়েছিলেন যে পূর্ণ গাঙ্গুলীও গিয়ে জুটেছিল সেখানে এবং এক আধ দিন নয় পুরো পাঁচটি বছর ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলীর এত সুদীর্ঘ সৌভাগ্যের কারণ বোধ হয় অপর্ণা বুড়ো হয়ে আসছিল ক্রমশ, চেখে বেড়াবার প্রকৃতি ছিল না, সুযোগও জোটে নি হয় তো।

বিছানায় পুরো এক ঘণ্টা বসে' রইলেন তিনি। তারপর উঠে স্নান করলেন, চা খেলেন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি, যুগল পালিতের খোঁজে। তার সঙ্গে কাল রাত্রে যে অভদ্র ব্যবহারটা করেছিলেন তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে হবে যেমন করে হোক। ছি, ছি, বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন…।

গত রাত্রে যুগল পালিতের রহস্যময় আবির্ভাবটার নানা ব্যাখ্যা নিজেই বার করছিলেন তিনি মনে মনে…হয়তো আকস্মিক খেয়াল লোকটার…কিম্বা হয় তো মদ খেয়েছিল…কিম্বা আরও কিছু হবে হয় তো। কিন্তু যার সঙ্গে সব চুকে বুকে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে আবার কেন যে তিনি নূতন ক'রে পরিচয় ঝালাতে যাচ্ছেন তার কোন ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় এল না। কি যেন একটা আকর্ষণ করছিল তাঁকে। প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া তুলেছে লোকটা! (ক্রমশঃ)

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রতুল চৌধুরীর বাড়ী। বসবার ঘর থেকে সব যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতুল মল্লিকা-বসুর ওয়েল-পেন্টিংএর ফিনিশিং টচ দিচ্ছে। নিরঞ্জন গুপ্তের প্রবেশ।)

নিরঞ্জন। প্রতুল, যে সার্জ্জেনের কথা বলেছিলে তাঁর সঙ্গে কথা কইলুম। তিনি রাজী হলেন না।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। আমি তাঁকে বললুম—তুমি আমার পেশেণ্ট এবং যতখানি তাকে বলা চলতে পারে জানালুম কিন্তু…

প্রতুল। সে আরও বেশী জানতে চাইলে বোধহয়?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন করতে লাগল—যার উত্তর তাকে দেওয়া সম্ভবও নয় উচিতও নয়। আর কোনও লোক আছে?

প্রতুল। না। আর কোন ভাল সার্জ্জেনের নাম তো মনে পড়ছে না।

নিরঞ্জন। তবে এখন কি করবে?

প্রতুল। বম্বে যাব মনে করছি।

নিরঞ্জন। এখনও মনে করছ! মন স্থির করে ফেল। আর বেশী সময় নেই। কাল তোমার ব্লডপ্রেসার নিয়েছিলুম মনে আছে?

প্রতুল। হ্যাঁ। সময় যে আর নেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনও গিরীন পাত্রের ব্যাপারটা ঠিক হয় নি। আচ্ছা বম্বের ডাক্তারকে তুমি জান?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। সে আমার সঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছে। এখানকার ডাক্তারদের মত এত কৌতূহল, চুলচেরা বিচার সে প্রয়োজন মনে করবে না।

প্রতুল। ছাট্স গুড। কিন্তু গিরীনের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে তো যেতে পারছি না।

নিরঞ্জন। কেন? টাকার জন্য?

প্রতুল। হ্যাঁ। শীঘ্রই আমার টাকার দরকার হবে।

নিরঞ্জন। কত চাই? আমি দিতে পারি।

প্রতুল। থ্যাঙ্ক ইউ। এখনও প্রায় এক মাস সময় হাতে আছে। আমার মনে হয় এরই মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারব।

প্রতুল। কে? (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

রেজা। (নেপথ্যে) আমি স্যর

প্রতুল। ভেতরে এস। (রেজার প্রবেশ)

রেজা। খগেনবাবু এসেছেন—

প্রতুল। ইন্সপেক্টর খগেন দত্ত?

রেজা। হ্যাঁ স্যর। সঙ্গে আরও একজন লোক আছেন—

প্রতুল। আচ্ছা, তাঁদের পাঠিয়ে দাও। (রেজার প্রস্থান)

নিরঞ্জন। এই দ্বিতীয়বার তারা এল—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে?

নিরঞ্জন। পুলিশের লোক, বিনা কাজে আসে না। এবার প্রতুল তোমার কাজে অনেক বাধা পড়ছে। পদে পদে—

প্রতুল। তুমি এইখানেই থাক। ওরা কি বলে এবং করে একটু লক্ষ্য কোরো। (খগেন দত্ত ও লোকেন চাটুজ্জের প্রবেশ)

খগেন। নমস্কার। আপনাকে আবার বিরক্ত করতে আসতে হ'ল, সে জন্য আমি দুঃখিত—

প্রতুল। না, না, তাতে কি হয়েছে।

খগেন। ইনি আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লোকেন চট্টোপাধ্যায়।

প্রতুল। বেশ, বেশ।

লোকেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সুখী হলুম। আপনি যে দয়া করে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে—

প্রতুল। নট অ্যাট অল।

খগেন। (লোকেনের প্রতি) ইনি ডাক্তার গুপ্ত

নিরঞ্জন। নমস্কার।

লোকেন। নমস্কার স্যর। সো গ্ল্যাড টু সী ইউ।

প্রতুল। আপনারা কি আবার রেজার সন্ধানে এসেছেন?

খগেন। না, একেবারে অন্য ব্যাপারে।

লোকেন। আমরা একটু ধাঁধায় পড়েছি, তাই আপনার সাহায্য নিতে এসেছি।

প্রতুল। কিন্তু আমি তো পুলিশের লোকও নই, ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ারও নই—

লোকেন। তা জানি, কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবেন না—

খগেন। সেই জন্যই আপনাদের আবার বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি।

লোকেন। (হঠাৎ ছবির দিকে দেখে) মিস বসুর ছবি! (উঠে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে) চমৎকার হয়েছে। (একটু পেছিয়ে গিয়ে) বিউটিফুল। আপনি যে এত বড় আর্টিষ্ট তা জানতুম না।

প্রতুল। ধন্যবাদ।

লোকেন। আপনার রঙের কাজ অপূর্ব্ব— অদ্বিতীয় বললেও অন্যায় হবে না।

প্রতুল। আপনাদের ভাল লেগেছে।

লোকেন। নিশ্চয়ই। আজকাল কোন আর্টিষ্ট এই রকম রঙ ব্যবহার করতে জানেন না। আচ্ছা এইবার কাজের কথা বলি। আপনারা বিজি লোক, সময় নষ্ট করব না। খগেনবাবু একদিন আপনাকে একটা ছবি দেখিয়েছিল মনে আছে?

প্রতুল। হ্যাঁ, আছে।

লোকেন। সেই ছবিতে আপনার আঙ্গুলের ছাপ পড়েছিল এবং তাই নিয়ে আপনি একটু রসিকতাও করেছিলেন—

প্রতুল। ওঃ, সেটা রসিকতা ছিল বুঝি? আমি তা ঠিক বুঝতে পারি নি।

লোকেন। কিন্তু সেই রসিকতার ফল ভয়ানক সীরিয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে;

প্রতুল। তাই নাকি!

লোকেন। নতুন একজন লোককে কি ভাবে আঙ্গুলের ছাপ রেকর্ড করতে হয় শেখাচ্ছিলুম। আপনার ছাপটা হাতের কাছে ছিল। পাউডার দিয়ে ডেভালপ করে তার একটা এনলার্জ্জড ছবি তুলি—

প্রতুল। কিন্তু উনি যে বললেন ছাপ মুছে দিচ্ছি।

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ দিয়েছিলুম—কিন্তু উল্টো পিঠে—

লোকেন। রেকর্ডে আপনার আঙ্গুলের তো ছাপ নেই তাই, ভাবলু এতে আর এমন ক্ষতিকর কি হবে—

প্রতুল। তা তো বটেই—

লোকেন। কিন্তু কি করে আঙ্গুলের ছাপ কমপেয়ার করতে হয় তা শেখাতে গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের ছাপ বার করলুম, আর—

প্রতুল। আর কি?

লোকেন। রেকর্ডের একটা ছাপের সঙ্গে আপনার আঙ্গুলের ছা মিলে গেল।

প্রতুল। ভারী আশ্চর্য্য তো!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ কারণ সে ছাপ প্রায় পঞ্চাশ বছ আগেকার। আচ্ছা, মিষ্টার চৌধুরী, আপনার বয়স কত হবে?

প্রতুল। আপনিই অনুমান করুন।

লোকেন। আমার তো মনে হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী নয়।

প্রতুল। পঁয়ত্রিশ।

লোকেন। তাইতেই তো গোল বেধেছে।

প্রতুল। কেন? কোন লোকের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হওয়াতে আপনাদের আপত্তি আছে?

লোকেন। না তা নয়। আপনার বয়স পঁয়ত্রিশ, কিন্তু ে লোকটার আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে আপনার আঙ্গুলের ছাপ মিলেগেছে তা বয়স আপনার চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর বেশী।

প্রতুল। তার আমি কি করতে পারি বলুন? তবে শুনেছিল কোন দু'জন লোকের ছাপ এক হতে পারে না।

লোকেন। আজ্ঞে না, হতে পারে না।

খগেন। সেই জন্যই আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সব কাজ, কারণ ে নির্ভুল। এই প্রথম ভুল প্রমাণিত হ'ল—

লোকেন। অথচ ভুল হওয়া অসম্ভব।

প্রতুল। একটু যে গোলমালে পড়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দে নেই। সেই লোকটা কে?

লোকেন। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা জানি না। আম মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে। খগেনবাবু যে ছাপ ছবিতে পেয়েছেন বোধহয় আপনার নয়।

প্রতুল। তা হতে পারে—

লোকেন। আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন, তা হলে এ গোলযোগের মীমাংসা হয়ে যায়।

প্রতুল। কি রকম?

খগেন। আপনি যদি আমাদের সকলের সামনে আপনার আঙ্গুে ছাপ দেন—মানে বুঝতে পারছেন, তা হলে আমরা কমপেয় করে—

প্রতুল। আপনি কি বলতে চান?

লোকেন। আমাদের ভুল সম্বন্ধে সিওর হতে পারি। খগেনবাবু, ছাপের জন্য যা কিছু দরকার, সব সঙ্গে করেই এনেছেন।

খগেন। (পকেট থেকে একটা কৌটা বার করে) এক মিনিটও লাগবে না।

লোকেন। এই দেখুন সেই লোকটার আঙ্গুলের ছাপের ছবি। (পকেট থেকে ছবি বার করলে) আপনাদের সামনেই মিলিয়ে দেখব, তাহলেই ভুল ধরা পড়ে যাবে।

প্রতুল। তা ঠিক। কিন্তু সাধারণতঃ লোকেরা আঙ্গুলের ছাপ দিতে চায় না।

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু এটা অফিশিয়াল নয়

প্রতুল। অফিশিয়াল না হলেও আন-ইউজুয়াল। আপনি কি বলেন ডক্টর গুপ্ত?

নিরঞ্জন। বটেই তো। তবে ওরা যখন এত করে বলছেন—

লোকেন। আজ্ঞে হাঁ। একটা রিকোয়েষ্ট। বুঝতে পারছেন তো দু'জনের একরকম আঙ্গুলের ছাপ হলে কি রকম গণ্ডগোল হবে। পুলিশ, ব্যাঙ্ক, অফিস—সকলের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আপনার সাহায্য চাইছি।

প্রতুল। (হেসে) যদি আমি আপত্তি করি?

লোকেন। (হেসে) তা হলে আপনাকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের লিষ্টে ফেলতে হবে। বুড়ো আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করা যাক, কি বলেন? খগেনবাবু, কালীটা নিয়ে আসুন। (খগেন কালীর কৌটা আনলে)

প্রতুল। কিসের সন্দেহ?

লোকেন। সে একটা কিছু ঠিক করে নিলেই হবে। চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, খুনী, টেররিষ্ট—হাতটা লুজ করে রাখুন স্যর—

(প্রতুলের বুড়ো আঙ্গুল কালীতে ডুবিয়ে একটা কাগজে ছাপ নিল)

লোকেন। দেখুন কি পরিষ্কার ছাপ উঠেছে। এইবার তর্জ্জনী—

প্রতুল। খুব ভাল ছাপ উঠেছে তো—

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (তর্জ্জনীর ছাপ নিয়ে) এই দেখুন। এইবার মধ্যমা—আমি অনেক দিন থেকে এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছি কিনা। অভ্যাস হয়ে গেছে। কত ছাপ যে নিয়েছি, চোর ছ্যাঁচড় থেকে আরম্ভ করে (মধ্যমার ছাপ নিয়ে) সাত সাতটা খুন করেছে এমন লোকের পর্য্যন্ত!

প্রতুল। (অবিচলিত স্বরে) সত্যি!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইবার এর পরের আঙ্গুলটা—

খগেন। একদিন থানায় যাবেন স্যর আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। খুব ইণ্টারেষ্টিং—

প্রতুল। তাই নাকি! বেশ যাওয়া যাবে।

লোকেন। (আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে) আপনি এর আগে নৈনিতালে ছিলেন না?

প্রতুল। হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

লোকেন। এমনি জিজ্ঞেস করলুম। মিষ্টার বসুর সঙ্গে সেইখানেই আপনার আলাপ হয়েছে না? এইবার স্যর কড়ে আঙ্গুলটা—(ছাপ নিয়ে) ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিলুম।

খগেন। দিন স্যর, আঙ্গুলগুলো মুছে দিই।

(একটা নেকড়া দিয়ে আঙ্গুল মুছে দিল)

লোকেন। চমৎকার প্রিণ্ট উঠেছে। (ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও একটা ছবি বার করে) এইবার মিলিয়ে দেখা যাক—খগেনবাবু, এ যে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

খগেন। (ছাপের সরঞ্জাম পকেটে রেখে) তাই তো আমি বলেছিলুম।

লোকেন। (প্রতুলকে) এই দেখুন সার। প্রত্যেক আঙ্গুলটা মিলে যাচ্ছে—যব, দ্বীপ, রেখা—কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়! যখন এই ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছিল তখন আপনি জন্মান নি। অথচ এ যেন আপনারই আঙ্গুলের ছাপের ছবি!

খগেন। তা হলে কি দাঁড়ায়?

লোকেন। বলা শক্ত। মিষ্টার চৌধুরী, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এই প্রিণ্টগুলো আমি নিয়ে যাব।

প্রতুল। যদি নিয়ে যান, আমার অমতে নিয়ে যেতে হবে।

লোকেন। ব্যাপারটা গুরুতর।

প্রতুল। পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে কেউই ভালবাসে না।

লোকেন। তা জানি স্যর। আচ্ছা, এক কাজ করুন না। একবার আমাদের আপিসে আসতে পারেন—

প্রতুল। আজ তা সম্ভব হবে না। আমাদের সমস্ত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আপ্‌সেট হয়ে যাবে।

লোকেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে লোকে এন্‌গেজমেণ্ট অনেক সময় আপসেট করতে বাধ্য হয়—

প্রতুল। আপনি ইচ্ছা করলে জোর করে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। পুলিশের চোখে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাম কতটুকু!

লোকেন। তা আমি করতে চাই না। তবে আপনাদের শান্তি এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই আমাদের অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে হয়।

খগেন। আচ্ছা, আজ না পারেন তো কাল একবার—

লোকেন। হ্যাঁ, তাতেও চলবে। পারবেন?

প্রতুল। কাল হতে পারে। কখন?

লোকেন। দশটা নাগাদ—

প্রতুল। দশটায় একটু অসুবিধা হবে। ধরুন খেয়ে দেয়ে যদি তিনটে নাগাদ যাই।

লোকেন। তাতেই হবে। ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট দিলুম স্যর, কিছু মনে করবেন না।

প্রতুল। না, না, কষ্ট কিসের।

লোকেন। (খগেনকে আড়াল করে) কাল এলে আমাদের ব্ল্যাক্ মিউজিয়াম আপনাকে দেখাব। সব বড় বড় খুনী, ডাকাতদের ছবির রেকর্ড—ভারী ইণ্টারেষ্টিং—(লোকেন কথা কইছে, সেই ফাঁকে একটা

রুমাল দিয়ে খগেন প্রতুলের তুলি তুলে নিয়ে পকেটে রাখলে—তারপর অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে এল)

খগেন। তাহলে আজ আমরা চলি।

লোকেন। আমাদের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করলেন তার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার ডক্টর গুপ্তা—

নিরঞ্জন। নমস্কার।

খগেন। নমস্কার স্যর। কাল বিকেলে তবে—

প্রতুল। সেখানে গেলে কি করবেন?

লোকেন। আপনার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ম্যাগনিফাই করে ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব পার্থক্যটা কোথায়।

খগেন। আমি তো পার্থক্য খুঁজে পাই নি।

লোকেন। নিশ্চয়ই আছে। খুব বড় করে এনলার্জ করলে ধরা পড়বেই। (প্রতুলের) আপনাকেও দেখতে চাই। তবে যদি কোন পার্থক্য না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে আপনি সেই লোক, আপনার বয়স পঁচাশীর কাছাকাছি, অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ইম্পসিবল। সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, আচ্ছা স্যর—নমস্কার।

খগেন ও লোকেনের প্রস্থান

(প্রতুল কিছুক্ষণ দরজায় কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করল। তারপর দরজাটা হঠাৎ খুলে বাহিরে দেখে এসে আবার বন্ধ করলে)

প্রতুল। দেখছিলুম ওরা আড়ি পেতে শুনছে কিনা?

নিরঞ্জন। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে ঠেকছে। ওদের মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হয়েছে।

প্রতুল। প্রিণ্টগুলো পরিষ্কার উঠেছিল, তাই নিয়ে যেতে দিলুম না—(কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ঘরে কি যেন খুঁজতে লাগল)

নিরঞ্জন। কি খুঁজছ?

প্রতুল। আমার তুলিটা?

নিরঞ্জন। ছবির কাছেই টুলের ওপর ছিল তো।

প্রতুল। এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই ওরা নিয়ে গেছে।

নিরঞ্জন। তাতে তোমার আঙ্গুলের ছাপ আছে। কাগজটা দিলেনা দেখে—

প্রতুল। এরা ভয়ানক চালাক—

নিরঞ্জন। শুধু চালাক নয়, ডেঞ্জারাস।

প্রতুল। হ্যাঁ। (একটু পরে) আঙ্গুলের ছাপ কোত্থেকে পেলে?

নিরঞ্জন। আগেকার কোন কেসের—

প্রতুল। কিন্তু আমি তো প্রত্যেক বারই খুব সাবধানে কাজ করেছি।

নিরঞ্জন। ওরা আরও বেশী সাবধানে সন্ধান করেছে। খুঁত একটু না একটু মানুষ মাত্রেরই থাকে। এখন তোমার একটীমাত্র কর্ত্তব্য—

প্রতুল। এখান থেকে সরে পড়া।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এবং অবিলম্বে। এখনই—

প্রতুল। এখনই— (এগিয়ে গিয়ে ছবির দিকে চেয়ে রইল)

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এখনই। আমার কি রকম মনে হচ্ছে যে দেরী করলে— (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস। (জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—নাম গিরীন পাত্র—বললেন?

প্রতুল। গিরীন! আচ্ছা, ওঁকে পাঠিয়ে দাও। (জনার্দ্দনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। ওর সঙ্গে তোমার যা বন্দোবস্ত হয়েছে, সব ক্যান্সেল করে দাও।

প্রতুল। তা সম্ভব নয়।

নিরঞ্জন। কিন্তু এখানে থেকে তোমার এ রকম কাজের মধ্যে জড়িত হওয়া ভয়ানক রিস্কি।

প্রতুল। তা জানি। কিন্তু নিরুপায়। আর একজন লোকের জোগাড় করে তাকে আবার এই রকম কাজে রাজী করাতে অনেক দিন লাগবে। অথচ আমার হাতে খুব অল্প সময়।

নিরঞ্জন। কিন্তু এখন একাজ করা তোমার উচিত হবে না। এখনই তোমার কলিকাতা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (গিরীন পাত্রের প্রবেশ)

গিরীন। প্রতুলবাবু, আমি— (নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে চুপ করল)

প্রতুল। আজ আপনি আসবেন তা তো আশা করি নি—

গিরীন। না, কিন্তু বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি। পিছন দিকের গলি দিয়ে এসেছি, কেউ দেখতে পায়নি।

প্রতুল। বার বার আমার কাছে আসাটা উচিত নয়—

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?

গিরীন। ভাল স্যার। নমস্কার। (প্রতুলের প্রতি চাপা গলায়) আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছিল—

নিরঞ্জন। কিছু মনে করবেন না গিরীনবাবু। প্রতুল, আমার কয়েকটা জিনিষ ওঘরে গোছাবার আছে··· (নিরঞ্জনের প্রস্থান)

প্রতুল। বলুন, কি বলবার আছে—

গিরীন। আমায় এখনই চলে যেতে হবে। (প্রতুলের কাছে সরে এসে) কাল টাকা যাবে—

প্রতুল। কাল! কখন?

গিরীন। কাল সকালে। ঠিক ব্যাঙ্ক খুলতেই, দশটা নাগাদ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। সব নোট।

প্রতুল। কাল সকালে?

গিরীন। হ্যাঁ। (একটু থেমে) তবে আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে বা মত বদলায়—

প্রতুল। মত বদলাবে কেন? হাওড়া পুলে পৌঁছবে সাড়ে দশটা নাগাদ, কি বল?

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হলে কাজে লাগবেন?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। কেন, আপনার ভয় করছে?

গিরীন। আমার ভয় করছিল আপনার জন্য। যদি শেষ অবধি পেছিয়ে যান।

প্রতুল। সে ভয়ের কোন কারণ নেই। খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবেন।

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। কি কি করতে হবে সব মুখস্থ আছে। কিছু ভাববেন না।

প্রতুল। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী অপেক্ষা করবে—

গিরীন। গাড়ীর মধ্যেই পোষাক বদলে নেব—

প্রতুল। হ্যাঁ, পোষাক গাড়ীতেই থাকবে। আপনার পোষাক আর ব্যাগ গাড়ীতে ফেলে রেখে, নতুন ব্যাগে টাকাগুলো নিয়ে নেবেন—

গিরীন। তারপর উইলিংডন ব্রীজের কাছে গিয়ে গাড়ী বদল করে একটা ট্যাক্সিতে চড়ব—

প্রতুল। হ্যাঁ। ব্রীজ পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরের রাস্তা দিয়ে বাগবাজার হয়ে আমার বাড়ীতে আসবেন। তা হলে কেউ আপনাকে ফলো করতে পারবে না।

গিরীন। এত সাবধান হলে কি করে ফলো করবে! আমার জিনিষ-পত্তর সব এখানে রেডী থাকবে তো?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। তারপর আপনি এমন দূর দেশে পাড়ি দেবেন যে কেউ আর আপনাকে খুঁজে পাবে না।

গিরীন। আমি এ কাজে হয় ত' হাত দিতুম না, কিন্তু এই ব্যাঙ্কের লোকেরা আমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে—জানেন, ফণীবাবু আমার পরে জয়েন করে আমাকে সুপারসীড করে গেল। এতে কার না রাগ হয়?

প্রতুল। বটেই তো! মাত্র কালকের দিনটা বই ত নয়!

গিরীন। আমি সেই এক কাজে আজ বারো বছরের ওপর রগড়াচ্ছি। নো-প্রোমোশন! একটা বদ্ধ ঘরে বসে খালি টাকা গুণছি! এতদিনে আমার অ্যাকাউণ্টেণ্ট হয়ে যাবার কথা। অন্ধকার ঘর, দিনে আলো জেলে রাখতে হয়—

প্রতুল। আজ শেষ। কাল থেকে আপনাকে আর ত' সেখানে যেতে হবে না।

গিরীন। না। এ কি কম শাস্তি। জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

প্রতুল। এইবার আপনি চির-শান্তি পাবেন। আর কারো চাকরী করতে হবে না।

গিরীন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ উঠি। এখনই আবার আপিসে যেতে হবে। আজ রাত্রে এক্সট্রা ডিউটী দিতে হবে বলে এক ঘণ্টা ছুটী পেয়েছিলুম।

প্রতুল। মনে রাখবেন, খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

গিরীন। নিশ্চয়ই। আচ্ছা নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার।

গিরীন। (দরজার কাছে গিয়ে) সকাল সাড়ে দশটায়—

প্রতুল। হ্যাঁ—ঠিক সাড়ে দশটায়— (গিরীনের প্রস্থান)

প্রতুল। (ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে) নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। (নেপথ্যে) এই যে— (নিরঞ্জনের প্রবেশ)

প্রতুল। টাকার বন্দোবস্ত কালই হবে।

নিরঞ্জন। কালই?

প্রতুল। হ্যাঁ। খুব বরাত ভাল যে ঠিক সময়—

নিরঞ্জন। প্রতুল—তুমি এ কাজ এখনও করতে যাচ্ছ। জান, পুলিশ তোমায় সন্দেহের চোখে দেখছে—

প্রতুল। জানি। কিন্তু তারা তো গিরীনকে চেনে না।

নিরঞ্জন। চিনে নিতে কতক্ষণ!

প্রতুল। সেই কতক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। নিরঞ্জন তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। এতে কোন রিস্‌ক্ নেই। কাল তিনটে অবধি আমি সন্দেহের বাইরে। হাতে অনেক সময় আছে।

নিরঞ্জন। তাহলে একান্তই তুমি একাজ করবে।

প্রতুল। হ্যাঁ। করতেই হবে।

নিরঞ্জন। (ল্যাবরেটরীর দিকে দেখিয়ে) ও ঘরের বাথ-টবের ব্যাপার—

প্রতুল। হ্যাঁ, তাও। টাকার আমার প্রয়োজন, আর গিরীনকে সরানোও আমার প্রয়োজন। বম্বেতে গিয়ে আমার অনেক টাকার দরকার পড়বে।

নিরঞ্জন। কিন্তু আমার মতে এ সময় ও কাজে তুমি হাত দিও না।

প্রতুল। অসম্ভব। এতটা এগিয়ে এখন আর থামা যায় না। গিরীন ভ্যানের মধ্যে টাকার ব্যাগ বদল করবে। আমি সাহায্য না করলে ধরা পড়ে যাবে। তারপর জেরায় সে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেবে—

নিরঞ্জন। তার আগে তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে।

প্রতুল। না, তাতে আরও বেশী গণ্ডগোল হবে। আমি টাকা নিয়ে কাল দুপুরের গাড়ীতে যাব। তুমি আজই চলে যাও। বম্বেতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে দেখা কোরো।

নিরঞ্জন। কিন্তু আমার আজ যাওয়া হতে পারে না। কাল সকালে যাব।

প্রতুল। আমি চাই না যে তুমি কাল এখানে থাক।

নিরঞ্জন। কেন? গিরীন পাত্রের জন্য!

প্রতুল। (একটু থেমে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ও কাজ কোরো না।

প্রতুল। করতেই হবে।

নিরঞ্জন। আমি এ জিনিষ সাপোর্ট করতে পারি না—

প্রতুল। কিন্তু আমার এ ছাড়া অন্য কোন নিরাপদ পথ নেই।

নিরঞ্জন। আমার মনে হয় এই সব ব্যাপারের সন্ধানই পুলিশ পেয়েছে।

প্রতুল। হতে পারে না। কোন বার এই রকম হিণ্ট কাগজে দেয় নি।

নিরঞ্জন। সন্দেহের কথা পুলিশ সব সময় ব্যক্ত করে না, পাছে আসামী সাবধান হয়ে যায়। বন্ধু, এবার তোমার ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে। রেজাকে দিয়ে কাজ হ'ল না, সুবোধবাবু রাজী হলেন না, পুলিশ একবার এল, অন্য ডাক্তার রাজী হ'ল না, আবার পুলিশ এল—এখন আবার যখন পালাবার বিলক্ষণ সময় হাতে রয়েছে, এখন টাকার জন্য দ্বিধা করছ—কে জানে, এই দ্বিধার জন্যই হয় ত'—

প্রতুল।—তুমি বৃথা আমার জন্য-ভয় পাচ্ছ নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন। বিলক্ষণ ভয়ের কারণ রয়েছে।

প্রতুল। চিন্তিত হবার মত নয়। (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

নিরঞ্জন। তোমার চলে যাওয়া উচিত।

প্রতুল। যাব—কাল।

নিরঞ্জন। না, কাল নয় আজ, এখনই, এই মুহূর্ত্তে—

প্রতুল। কে? (আবার খটখটধ্বনি)

রেজা। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস। (জনার্দ্দনের প্রবেশ)

রেজা। হুজুর, সেইদিন যে মেয়েটী এসেছিলেন, মিস বসু—

প্রতুল। ওঃ! তিনি এসেছেন? আচ্ছা নিয়ে এস।

(জনার্দ্দনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। মিস বসু! এই আর একটী কারণ যে জন্য আমি তোমাকে এত করে যেতে বলছি। (ক্রমশঃ)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

পঞ্চম প্রকরণ—মন্ত্রি-পুরোহিতোৎপত্তি

নবম অধ্যায়

মূল :—জানপদ, অভিজাত, স্বগ্রহ, অবগ্রহ-বিশিষ্ট, শিল্প-শিক্ষা-যুক্ত, দূরদৃষ্টি, প্রাজ্ঞ, ধারণাশক্তিমান্, দক্ষ, বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, প্রতিপত্তিমান্, উৎসাহ প্রভাব যুক্ত, ক্লেশসহ, শুচি, মিত্রভাবাপন্ন, দৃঢ়ভক্তি, শীল বল-আরোগ্য সত্ত্ব সম্পন্ন, স্তব্ধভাব ও চাপল্যবর্জ্জিত, সম্প্রিয়, অবৈরকারী—এইগুলি অমাত্য-সম্পৎ। ইহার এক পাদ ও অর্দ্ধগুণহীন (যথাক্রমে) মধ্যম ও নিকৃষ্ট।

সঙ্কেত :—মন্ত্রী—প্রধানামাত্য—অপরাপর অমাত্যবর্গ তাঁহার অধীন। মন্ত্রীর নিম্নলিখিত পঞ্চাবংশতি গুণ থাকা প্রয়োজন। জানপদ—জনপদে জাত; বিজিগীষু-রাষ্ট্রে উৎপন্ন (গঃ শাঃ)—অর্থাৎ দেশী লোক হওয়া চাই, বিদেশী বা domiciled হইলে হইবে না; native (S H)। অভিজাত—বিশুদ্ধ উচ্চবংশজাত। স্ববগ্রহ : (মূল)—শোভনবন্ধু এইরূপ সাম্প্রদায়িক অর্থ (গঃ শাঃ); influential (S H)। গণপতি শাস্ত্রী আর একটি অর্থ দিয়াছেন—যাঁহাকে প্রমাদ বা অকার্য্য হইতে অনায়াসে নিবৃত্ত করা যায়—easily accessible or amenable. শিল্প গজ-অশ্ব-রথারোহণ-যুদ্ধ-গান্ধর্ববিদ্যা ইত্যাদি। চক্ষুষ্মান্ (মূল)—নীতি-শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রই চক্ষুঃ (গঃ শাঃ); অর্থশাস্ত্রাভিজ্ঞ; possessed of foresight (S H) প্রাজ্ঞ—প্রজ্ঞা—স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি—তদ্বিশিষ্ট, wise. মেধাবী—of strong memory (S H)। দক্ষ—ক্ষিপ্রকারী (গঃ শাঃ); কর্ম্মে কুশল; bold (S H)—expert বা skilful বলা উচিত। বাগ্মী—মধুর ও যুক্তিপূর্ণ বচনের বক্তা (গঃ শাঃ), eloquent (S H)—orator, finished speaker বলা ভাল। প্রগল্‌ভ—প্রৌঢ় (গঃ শাঃ); skilful (S H), forward বা full of enthusiasm বলা উচিত। প্রতিপত্তিমান্—প্রতিকারে বা প্রতিবচনে সমর্থ; অথবা ইতিকর্ত্তব্যতা-নিশ্চয় যাঁহাদের আছে। (গঃ শাঃ); intelligent (S H). শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদটি ভাল। প্রতিপত্তি—বোধ—বোধ শক্তি-বিশিষ্ট এইরূপ অর্থই সঙ্গত। উৎসাহপ্রভাবযুক্ত—পুরুষকার-যুক্ত ও শক্তিমান্, অথবা উৎসাহ-শক্তি ও প্রভুশক্তি-বিশিষ্ট; possessed of enthusiasm and dignity (S H)। উৎসাহশক্তি—the power of energy বলা ভাল। প্রভুশক্তি—কোশ-দণ্ডজনিত তেজঃ (অমরকোশ) —majesty or pre-eminent position of the king himself—এইরূপ অনুবাদ আপ্তে করিয়াছেন। ক্লেশসহ—শ্রমজয়ী (গঃ শাঃ); possessed of endurance (S H), শুচি—চতুর্ব্বিধ উপধা-দ্বারা শুদ্ধ (গঃ শাঃ); pure in character (S H)। মৈত্র—সর্ব্বত্র স্নিগ্ধভাবে ব্যবহারকর্ত্তা (গঃ শাঃ); affable (S H)—friendly. দৃঢ়ভক্তি—অবিচলিত-রাজানুরাগ-বিশিষ্ট (গঃ শাঃ); firm in loyal devotion (S H)—শীল। সদ্‌বৃত্ত (গঃ শাঃ); excellent conduct (S H)। বল—দেহশক্তি (গঃ শাঃ); strength (S H)। আরোগ্য ব্যাধিহীনতা; health (S H)। সত্ত্ব ধৈর্য্য (গঃ শাঃ); আর; bravery (SH)—stamina বলা ভাল। স্তম্ভ—স্তব্ধভাব, উদ্ধত গর্ব্বিত ভাব; procastination (S H)—অনুবাদ ঠিক নহে—haughteur বলিলে ভাল হয়। চাপল্য—অস্থিরস্বভাব ficklemindedness (S H); সম্প্রিয়—

সৌম্যদর্শন (গঃ শাঃ)—সম্যগ্‌রূপে জনপ্রিয় বলা উচিত ; affectionate (S H) ; popular বলাই সঙ্গত। বৈরাগামকর্ত্তা (মূল)—স্ত্রী-ভূমি-প্রভৃতি নিমিত্ত বৈরোৎপাদন যিনি না করেন—অথবা উক্ত-নিমিত্তক বৈরভাবের প্রশমন-কর্ত্তা (গঃ শাঃ) ; free from such qualities as excite hatred and enmity.—এই পঞ্চবিংশতি গুণ অমাত্যের পরিপূর্ণ সম্পৎ। এই পঞ্চবিংশতিটি গুণই যাঁহাতে বর্ত্তমান—তিনিই উত্তম অমাত্য বা প্রধান মন্ত্রী হইবার যোগ্য। ইহাদিগের একপাদ (অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ) যাঁহার নাই, তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য হইবার উপযোগী। আর ইঁহাদিগের অর্দ্ধেক গুণ যাঁহার নাই—তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর অমাত্য হইতে পারেন। পাদার্দ্ধগুণহীনৌ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ ভ্রান্তিকর—possessed of one half or one quarter of the above qualifications—devoid of one fourth or one half of these qualifications—বলা উচিত।

মূল :—তাহাদিগের মধ্যে জনপদ (ও) অবগ্রহ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকটে পরীক্ষা করিবেন ; সমান বিদ্যাবিশিষ্টগণের নিকট শিল্প ও শাস্ত্রচক্ষুষ্মত্তার (পরীক্ষা করিবেন) ; কর্ম্মারম্ভে প্রজ্ঞা, ধারয়িষ্ণুতা ও দক্ষতার (পরীক্ষা করিবেন) ; কথাপ্রসঙ্গে বাগ্মিতা, প্রগল্‌ভতা ও প্রতিভার (পরীক্ষা করিবেন) ; আপদে উৎসাহ ও প্রভাব-শক্তির ও ক্লেশসহিষ্ণুতার (পরীক্ষা করিবেন) ; সম্যগ্‌রূপ ব্যবহার হইতে শুচিতা, মৈত্রী ও দৃঢ়ভক্তির (পরীক্ষা করিবেন) ; সহবাসিগণের নিকটে শীল বল-আরোগ্য-সত্ত্ব-যোগ-অস্তব্ধভাব ও অচাপল্যের (পরীক্ষা করিবেন) ; প্রত্যক্ষতঃ সম্প্রিয়ত্ব ও অবৈরিতার (পরীক্ষা করিবেন)।

সঙ্কেত :—তাহাদিগের—উত্তম-মধ্যম-অধম-এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ; অথবা—জানপদত্বাদির মধ্যে। আপ্ততঃ (মূল)—আপ্তিযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে ; আপ্তি—বিশ্বাস, আপ্য—বিশ্বাস্য। আপ্ত, বিশ্বস্ত—প্রামাণিক পুরুষ—যথাদৃষ্টার্থবাদী (গঃ শাঃ) ; from reliable persons. পরীক্ষা করিবেন—পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। সমানবিদ্য—তুল্য-বিদ্যাবিদ্‌। শাস্ত্রচক্ষুষ্মত্তা—শাস্ত্ররূপ চক্ষু ; তত্ত্বতা—শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত প্রজ্ঞা ; শ্যামশাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করেন নাই—পক্ষান্তরে শিল্পের ইংরাজি দিয়াছেন—educational qualifications. ইহা সম্ভবতঃ ছাপার ভুল। বরং scriptural lore বলা উচিত। কর্ম্মারম্ভ—কার্য্যানুষ্ঠান (গঃ শাঃ) আরম্ভ অর্থে সুরু করা নহে ;—'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী'—গীতা ১২। ; application in works (S H) ; undertakings বলা ভাল। কথাযোগ—কথাপ্রসঙ্গ (গঃ শাঃ) power shown in narrating stories, in conversation (S H)। প্রতিভানবত্ত্ব—নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রজ্ঞাপ্রতিভা ; flashing intelligence (S H) ; geniusবলা উচিত। ক্লেশসহত্ব-bravery in troubles (S H)—মূলানুগ নহে—capability of enduring troubles বলা উচিত। সংব্যবহার (মূল)—সমাচরণ (গঃ শাঃ) ; সংব্যবহার ও ব্যবহার একই অর্থ ; frequent association (S H) ; dealing বলা ভাল। সংবাসী (মূল)—সহবাসী (গঃ শাঃ) ; intimate friends (S H). অস্তব্ধ-ভাব—দম্ভের অভাব।

মূল :—রাজবৃত্তি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অনুমেয়। স্বয়ংদৃষ্ট প্রত্যক্ষ, পরোপদিষ্ট পরোক্ষ। কৃত (কর্ম্মাংশ-দ্বারা) অকৃত (কর্ম্মাংশের) উৎপ্রেক্ষণ অনুমেয়।

সঙ্কেত :—জানপদত্বাদি গুণ-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ, আপ্তবাক্য ও অনুমান এই তিন প্রমাণই আশ্রয়ণীয় কেন তাহার কারণ এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (গঃ শাঃ)। রাজবৃত্তি—রাজবৃত্ত, রাজচরিত্র, রাজব্যবহার (গঃ শাঃ) ; works of a king (S H) পরোক্ষ—আপ্তবাক্য হইতে অবগত (গঃ শাঃ) ; taught by another, invisible (S H)। কৃত (অনুষ্ঠিত) কর্ম্মাংশ-দ্বারা অকৃত (করিষ্যমাণ) কর্ম্মাংশের পরিণাম-সম্বন্ধে আন্দাজ করার নাম—অনুমেয়। Inference of what is not accomplished from what is accomplished is inferential (S H)। Inference না বলিয়া speculation বলিলে ভাল হইত।

মূল :—কর্ম্মসমূহের যৌগপদ্যহেতু ও অনেকত্ব ও অনেক (স্থান) স্থিতত্ব-নিবন্ধন—'দেশকালাত্যয় না হউক'—এই (অভিপ্রায়ে) পরোক্ষভাবে অমাত্যগণ কর্ত্তৃক (কর্ম্ম সম্পাদন) করাইবেন—ইহাই অমাত্য কর্ম্ম।

সঙ্কেত :—শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ—"অযৌগপদ্যাত্‌ কর্ম্মণাম্"। গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—"যৌগপদ্যাত্‌ কর্ম্মণাম্"। শেষোক্ত পাঠটিই ভাল লাগিয়াছে। কর্ম্মগুলি যদি যুগপৎ-সম্পাদ্য না হয়, তাহা হইলে বরং রাজার পক্ষে স্বয়ং ঐগুলি সম্পাদন করার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু যুগপৎ-সম্পাদ্য হইলে একাকী রাজার পক্ষে এককালে বিভিন্ন দেশে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মোটেই সম্ভব হয় না—অগত্যা অমাত্যগণের দ্বারা ঐ সকলের অনুষ্ঠান করাইতে হয়। গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—রাজকীয় কর্ম্ম সংখ্যায় বহু, বহুপ্রকার ও নানা প্রদেশে উহাদের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ সকল কর্ম্মের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান রাজা স্বয়ং করিতে পারেন না। অতএব, যথাযোগ্য দেশ-কাল-বিভাগানুযায়ী তাহাদের অনুষ্ঠানার্থ অমাত্য-নিয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম্ম যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে গুণবান্ অমাত্য নিযুক্ত করা উচিত। এই কারণে অমাত্যগণের গুণ-পরীক্ষার বিধান। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজী- As works do not happen to be simultaneous—ইহা তদীয় পাঠের অনুরূপ। অনেকস্থত্বাৎ (মূল)—অনেক দেশে অবস্থিত বলিয়া ; 'pertain to distant and different localities' (S H) ; distant —মূলে নাই। 'দেশকালাত্যয়ো মা ভূৎ'—দেশ ও কালের অত্যয় (অতিক্রম) না হউক ; 'in view of being abreast of time and place' (S H)—মূলানুগ নহে—with the intention—'let there be no lapse of time and place'—বলা চলিত।

মূল :—উদিতোদিত কুলশীল-সম্পন্ন ষড়ঙ্গ বেদ-দৈব-নিমিত্ত ও দণ্ডনীতিতে উত্তমরূপে শিক্ষিত—ও দৈব মানুষ আপৎসমূহের অথর্ব্ব-মন্ত্র ও উপায় দ্বারা প্রতিকারকর্ত্তাকে পুরোহিত করিবে। আচার্য্যকে যেরূপ শিষ্য, পিতাকে (যেমন) পুত্র, স্বামীকে যেরূপ ভৃত্য (অনুবর্ত্তন করে), সেইরূপ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন।

সঙ্কেত :—উদিতোদিতকুলশীলং (মূল)—'উদিতৈঃ শাস্ত্রোক্তৈর্বিদ্যাভিজনাদিভিঃ উদিতাঃ সমৃদ্ধাঃ উদিতোদিতাঃ তেষাং কুলং বৃত্তং চ যস্য তং তথাভূতম্, উদিতোদিতকুলজাতম্ উদিতোদিতাচারযুক্তম্ চ' (গঃ শাঃ)। উদিত—উক্ত—শাস্ত্রোক্ত গুণ বিদ্যা-উচ্চবংশে জন্ম ইত্যাদি; তাহাদিগের দ্বারা উদিত অর্থাৎ সমৃদ্ধ। উদিতোদিত—শাস্ত্রোক্তগুণ-সমৃদ্ধ। উদিতোদিত কুল ও শীল যাহার। যাঁহার বংশে পূর্ব্বপুরুষগণ শাস্ত্রোক্তগুণ-সমৃদ্ধ, আর যিনি স্বয়ং শাস্ত্রীয়গুণসম্পৎসম্পন্ন।—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর অভিমত অর্থ। শ্যামশাস্ত্রী উদিতোদিত—বীপ্সায় দ্বিত্ব ধরিয়া 'বিশেষরূপে প্রশংসিত'—এই অর্থ করিয়াছেন—'whose family and character are highly spoken of.' দৈব—জ্যোতিষ—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পরিণাম 'দৈব' নামে অভিহিত হয়—ইহা যে শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তাহাই দৈব (গঃ শাঃ); নিমিত্ত—শকুনশাস্ত্র, হাঁচি-টিক্‌টিকি ইত্যাদি; কামসূত্রে চতুঃষষ্টি ললিত-কলার মধ্যে 'নিমিত্তজ্ঞান' অন্যতম কলারূপে নিরূপিত হইয়াছে। শ্যামশাস্ত্রী একত্রে অনুবাদ করিয়াছেন—'portents, providential or accidental.' অভিবিনীত—সুশিক্ষিত; well versed. শ্যামশাস্ত্রী ইহার অর্থ করিয়া অত্যন্ত বিনীত—obedient (S H)। দৈব-মানুষ সম্পৎ—দেবকৃত ও মানুষকৃত সম্পৎ। অথর্ব্বভিঃ—অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তি-মন্ত্রাদি প্রয়োগে দৈবকৃত আপদের প্রতিকার করা যায়। আর মানুষকৃত আপদের প্রতিকার করিতে সাম-দান-ভেদ দণ্ড—এই চার উপায়ের প্রয়োজন। অনুবর্ত্তন—অনুসরণ।

মূল :—ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত মন্ত্রি-মন্ত্রণা দ্বারা অভিমন্ত্রিত শাস্ত্রানুগামী ক্ষত্র অশস্ত্রযুক্ত (হইয়াও) একান্তভাবে অজিতকে জয় করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—ব্রাহ্মণ—পূর্ব্বোক্ত-গুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতীয় পুরোহিত। এধিত (মূল)—বর্দ্ধিত; সম্পৎসমূহের বিবরণ-দ্বারা বৃদ্ধি (পুষ্টি) প্রাপ্ত। মন্ত্রী—যথোক্তগুণ-বিশিষ্ট অমাত্য; তাঁহাদিগের মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রণা—কর্ত্তব্য-বিষয়-নিশ্চয়; তাহার দ্বারা অভিমন্ত্রিত—সংস্কৃত। অভিমন্ত্রিত স্থলে 'অভিরক্ষিত' পাঠও পাওয়া যায়। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—charmed; well advised বলা চলিত। শাস্ত্রানুগম্—শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে তৎপর (গঃ শাঃ); faithfully follows the precepts of the shastras (S H); faithfully—না বলিলেও চলে। অশস্ত্রিতম্—শস্ত্রযুক্ত না হইয়াও—অর্থাৎ বিনা যুদ্ধেও (গঃ শাঃ); though unaided with weapons (S H); Jolly—'There is a pun here....faithful to the dictates of the shastra though unaided with weapons.' পাঠান্তর—শাস্ত্রানুগতশাস্ত্রিতম্—শাস্ত্রানুমোদিত-শাস্ত্র-ব্যবহারী—যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে এরূপ শাস্ত্র ব্যবহার করিবেন না—ইহাই বক্তব্য—'provided with arms handled according to science'(Jolly). অত্যন্ত অজিতং জয়তি (মূল)—গণপতিশাস্ত্রীর মতে—অজিত (অর্থাৎ অলব্ধকে) জয় (লাভ) করেন। কিন্তু শ্যামশাস্ত্রীর অর্থ—অজিত হইয়া থাকেন ও অত্যন্ত জয় করেন (অর্থাৎ সফলতা লাভ করেন)—becomes invincible and attains success. গণপতি শাস্ত্রীর মতে—ইহা অলব্ধ-লাভ-রূপ ফল সূচিত করিতেছে! অন্যথায়, অজিত হয় ও জয়লাভ করে—এ দুইটি বাক্যের পুনরুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে মন্ত্রিপুরোহিতোৎপত্তি-নামক পঞ্চম প্রকরণে নবম অধ্যায়।

আমি চাই প্রেম

শ্রীবীণা দেবী

আমি চাই প্রেম নিকষিত হেম
সোনার আখরে লিখা
যে প্রেম পরশে অনল বরষে
জ্বলি' উঠে প্রাণ-শিখা।
বঁধু সেই প্রেম মোর ভালো—
দুখ পাই আমি তাহে ক্ষতি নাই
দহনের জ্বালা স'ব বঁধু তাই;
শুধু অন্ধকার দুরি'
মণিকোঠা ভরি'
জ্বেলে নিতে চাই আলো।
যে আলোকে সদা তোমারে হেরিয়া
বাসিব সবারে ভালো।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি

১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের পর সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বাংলা সরকার তথা ভারত সরকারকে অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে গোপনে গোপনে কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও আশানুরূপ সজাগ নন। বাংলায় এখনই খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবার মত অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। রেশনহীন অঞ্চলে চাউলের দাম ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং সময়ে সময়ে কালনার ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু সহরেও খোলা বাজারে চাউল পাওয়া না যাইবার সংবাদ আসিতেছে। বিগত মন্বন্তরের আগেও যেমন সরকার দেশবাসীকে অন্নস্বচ্ছলতা সম্বন্ধে আশান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবারও তাঁহাদের দিক হইতে সেই চেষ্টার ত্রুটি দেখা যাইতেছে না। গত ৪ঠা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতায় বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসি পর্য্যন্ত সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলা এখন উদ্বৃত্ত প্রদেশ এবং এখান হইতে ঘাটতি অঞ্চলসমূহে খাদ্যশস্য প্রেরণ করিলে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সরকারী মতে উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইলেও বাংলার অন্নস্বাচ্ছল্যের কোন প্রমাণই যে এখন পাওয়া যাইতেছে না, তাহা দেশবাসী মাত্রেই জানেন। এখনই কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে বহিরাগত নিরন্নের দল অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে সুরু করিয়াছে। শুধু বাংলার লোকই এই আসন্ন সঙ্কট-সম্বন্ধে আশঙ্কাগ্রস্ত হয় নাই, বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকা 'অবজারভার' পর্য্যন্ত গত ৭ই অক্টোবর 'বাংলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের ভীতি' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বড় বড় হরফে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এবার পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি ও পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য বাংলায় প্রভূত শস্যহানি হইয়াছে এবং সরকারই স্বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও এবার গত বৎসরের শতকরা ৯৪ ভাগের বেশী ফসল পাওয়া যাইবে না। আমাদের মনে হয় সরকারী হিসাব অপেক্ষা ফসলের অবস্থা আরও খারাপ। আউশ ফসল এবারে অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমনও এবার তিন চতুর্থাংশ ভাগের বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয় না। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ অবস্থায় আগামী বৎসর বাংলায় খাদ্যাদির জোগান ও চাহিদার সমতা রক্ষা করিতে হইলে বাংলার প্রতি কণা চাউল সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া বাহির হইতে যথাসাধ্য চাউল আমদানী করা উচিত। কিন্তু চাউল সংরক্ষণ দূরে থাক, বাংলা সরকার বদান্যতা করিয়া বাংলা হইতে চাউল রপ্তানীর যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে দেশবাসীর আতঙ্কিত না হইয়া উপায় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয় দলের নেতা ও ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি এক পত্রে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে জানাইয়াছেন যে, বাংলাকে আসন্ন দুর্গতি হইতে বাঁচাইতে হইলে অবিলম্বে এই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে। গত ১২ই অক্টোবর রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা সরকারের খাদ্যবিভাগের পরামর্শদাতা মিঃ এ উইলিয়ামস্ বলেন যে, মজুতের সুবিধার জন্য বাংলা হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, তবে ইহার পরিবর্ত্তে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাউল বাহির হইতে বাংলায় আমদানীর বন্দোবস্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, মিঃ উইলিয়াস্ আরও বলিয়াছেন, ভারত সরকার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, দরকার হইলে তাঁহারা ১৯৪৫-৪৬ সালে কলিকাতার বার্ষিক চাহিদার অনুরূপ ৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাংলাকে সাহায্য করিবেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাচিংস ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনার জন্য ব্রহ্মে গিয়াছিলেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনিও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের শেষ নাগাদ ব্রহ্ম হইতে বাংলায় কিছু পরিমাণ চাউল আমদানী আশা করা যায়। মিঃ হাচিংসের বিবৃতিতে আরও জানা গিয়াছে যে, শ্যামদেশ হইতে এখন জাহাজাদি জোগাড় হইলে ৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করা যাইতে পারে।

মিঃ উইলিয়ামস্ বা মিঃ হাচিংসের উপরিউক্ত বিবৃতি পড়িলে মনে হয়, সরকার বাংলার খাদ্যসমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল এবং আমদানী করিয়া এদেশের খাদ্যশস্য মজুত করিতেও তাঁহারা সচেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রপ্তানীর ব্যাপারে প্রমাণ যেমন পাওয়া গিয়াছে, আমদানীর সেরূপ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়া এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অস্বস্তিকর নানাবিধ খবর আসিতেছে বলিয়া ঘরপোড়া গরুর মত বঙ্গবাসী তাঁহাদের আশ্বাসে ভরসা লাভ করিতে পারিতেছে না। মিঃ হাচিংসই স্বীকার করিয়াছেন যে, আগামী বৎসর বাংলায় ১০ লক্ষ টন চাউল কম পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং এখন শ্যামদেশে চাউল উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি শুধু জাহাজের অভাবে সে চাউল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাংলায় আসিয়া পৌঁছাইতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাপারটা সত্যই নিতান্ত দুঃখের হইবে। এবার কম ফসল উৎপাদন অনিবার্য্য বলিয়া বাংলা সরকারের উচিত আর চাউল ইত্যাদি রপ্তানী না করিয়া ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি মত খাদ্যশস্য বাহির হইতে আনান এবং ব্রহ্মের চাউল যথা-সত্বর আমদানী করা। এইভাবে চেষ্টা করিলে হয়তো মজুত শস্যের জন্য ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলা সরকার কোন রকমে জোগান ও চাহিদার সমতারক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে পারিবেন।

তবে যে বাংলা সরকারের পরিচয় আমরা বিগত দুর্ভিক্ষের সময় হইতে পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে দেশবাসীর স্বার্থসংরক্ষণে এই আগ্রহ অবশ্যই আশা করা যায় না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে জয়ী হইতে হইবে। আমরাও শ্রীযুক্ত ঘোষের এই অভিমত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাস্তবিক আসন্ন নির্ব্বাচনে যদি বা কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী প্রার্থীগণ জয়ী হন এবং তাঁহাদের দ্বারা গঠিত সচিবসঙ্ঘ এই সব দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই বিপন্ন দেশবাসী আসন্ন সঙ্কট হইতে রেহাই পাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে। দেশজোড়া অভাব আর অধঃপতনের বন্যা প্রতিরোধ করিতে হইলে বাংলা সরকারকে অপরিসীম নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ দেখাইতে হইবে। কাজেই দেশকে ভালবাসিয়া যাঁহারা দুঃখবরণের নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দুঃসময়ে তাঁহাদের সহায়তাই নিঃসন্দেহে সর্ব্বাধিক কাম্য।

ভারতের আর্থিক জীবন ও ভারতসরকার

ভারতবাসী অতি দরিদ্র জীবন যাপন করে। ভারতের লোকের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় অনূর্দ্ধ ৭৫ টাকা। অসহ দারিদ্র্যের জন্য ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর করুণার পাত্র হইয়া আছে। সার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ীর মত সরকারী মুখপাত্র পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের শতকরা ৩০ জন অধিবাসী প্রাণধারণের উপযোগী দৈনিক আহারও সংগ্রহ করিতে পারে না। কৃষিজীবনের ক্রমবর্দ্ধমান অস্বচ্ছলতা ও পরিবারবৃদ্ধির চাপে ভারতবাসী আজ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এদেশের জরাজীর্ণ অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ যাহোক জোড়াতালি দিয়া চলিয়াছিল. যুদ্ধের প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে এখন তাহার শেষ শৃঙ্খলাটুকুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ শুধু সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব নয়, ঋণভারেও আকণ্ঠ জর্জ্জরিত। সহজদৃষ্টিতে এখন তাহার চারিপাশে এমন কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট হইতে ভারতবর্ষ মুক্তি পাইতে পারে।

অথচ দুঃখের হইলেও ব্যাপারটা সত্য যে, ভারতবর্ষের এই দারুণ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবার কথা ছিল না। একদা ধর্ম্মজীবনের অনস্বীকার্য্য প্রভাবে আড়ম্বরহীন জীবনযাপনপ্রণালীর প্রতি ভারতবাসীর ছিল অনুরাগ, সেদিন নিত্যনূতন অভাবসৃষ্টি ও সেই অভাব পরিপূরণের বহু বিচিত্র পথ আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা না থাকায় ভারতবাসী স্বেচ্ছায় কৃষি-জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিল। তারপর যখন ভারতবাসীকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া কঠোর বাস্তবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল এবং পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অধিবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আসিল তাহার কাছে, তখন নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ এমন এক স্বার্থপর বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের খর্পরে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না। কৃষি-জীবনের ক্রমোন্নতি সাধনের সহিত যুগোপযোগী শিল্পপ্রগতি সৃষ্টি করা ভারতবাসীর পক্ষে কঠিন ছিল, এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। শিল্পসংগঠনের জন্য প্রধানতঃ কাঁচামাল ও শ্রমসম্ভার এই দুইটি জিনিষেরই প্রয়োজন এবং উভয় বস্তুই ভারতবর্ষ শুধু সুলভে নয় প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারে। এই বিরাট সুযোগ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে দরিদ্র জীবন যাপনে বাধ্য হইতেছে ইহা সত্যই গভীর পরিতাপের বিষয়।

আগে যাহাই হউক, পৃথিবীব্যাপী বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের প্রভূত সুযোগ ছিল। বলিতে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সার্থক সুযোগেই অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ সব দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তথা ভারত সরকারের ধাপ্পাবাজিতে ভারতের এই দুই মহাযুদ্ধকালীন আর্থিক স্বাচ্ছল্যসৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল। যুদ্ধের চরম প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া ভারতে কিছু কিছু যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধের পরেও বিমান, মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ভারতবর্ষের কল্যাণ হইতে পারিত, সেই অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি শত প্রয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধের মধ্যে এদেশে নির্ম্মিত হইবার ব্যবস্থা হইল না। যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিমান তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে একটি কারখানা বাঙ্গালোরে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কারখানা কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুধু বিমান মেরামতই করিয়াছে, একখানিও বিমান তৈয়ারী করে নাই। ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী সম্বন্ধে ভারত সরকারের রেলওয়ে মেম্বার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই সকল প্রতিশ্রুতি আজও কার্য্যকরী হয় নাই। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারত-বর্ষ সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যুদ্ধের মধ্যে জগৎ সমক্ষে বহু প্রচারকার্য্য চালান হয়, কিন্তু আসলে যুদ্ধের কল্যাণে ভারতীয় শিল্প সমৃদ্ধ না হইয়া কতকটা পঙ্গু হইয়াছে, ইহা আপাতদৃষ্টিতে ভ্রান্ত ধারণা মনে হইলেও কঠোর সত্য। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের চাপে এবং মুনাফার লোভে কাপড়ের কল, কাগজের কল প্রভৃতিতে প্রচুর কাজ হইয়াছে, ইহার জন্য যন্ত্রপাতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পরে এখনই সেই সব যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়; কাজেই যুদ্ধকালীন বাড়তি উৎপাদনকে শিল্প সমৃদ্ধি মনে করা ঠিক হইবে না। বিদেশ হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত প্রয়োজনের চাপে ভারত সরকার হয়তো এদেশে কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু শুধু পরিমাণে নগণ্য বলিয়া নয়, এই সব শিল্পের উৎপন্ন পণ্য সরকার এমনভাবে গ্রাস করিয়াছেন যে, দেশবাসীর সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটিতে পারে নাই। ফলে যুদ্ধের পরে এখন যখন বিদেশী পণ্য আমদানীর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন দেশবাসী অবশ্যই বহুপরিচিত বিদেশী পণ্য ছাড়িয়া সেই সব অচেনা দেশী মাল ব্যবহারে উৎসাহ পাইবে না। যুদ্ধের সময় অর্থের অন্তর্দ্দেশীয় প্রচলন-গতি বৃদ্ধি পাইয়া এদেশের অনেকের হাতে ভাল টাকা আসিয়াছিল, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অঙ্ক অনেক দেশবাসীকে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার বা পুরাতন শিল্পপ্রসারে আর্থিক সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিতও

করিয়াছিল। কিন্তু কণ্ট্রোলার অফ ক্যাপিটাল ইস্যু মারফৎ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ে বিচিত্র বাধার সৃষ্টি করিয়া এবং শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাঁচামাল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই উৎসাহ ভারত সরকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলি ফাঁপাই টাকায় বোঝাই হইয়া যাইতেছে, এই টাকা খাটাইবার জন্য উপযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি না থাকায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য হইয়া সুদের হার খুবই কমাইয়া দিতে হইয়াছে। ১৯৩৩/৩৪ সালে যেখানে বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা সুদ দিয়াও ব্যাঙ্ক আমানত সংগ্রহ করিতে পারিত না, এখন সেইস্থানে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের সুদ বার্ষিক শতকরা ।০ আনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে টাকা খাটাইবার সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়া যুদ্ধের মধ্যে অর্থবান জনসাধারণ শেয়ার-মার্কেটে টাকা খাটানো লাভজনক মনে করিয়াছে এবং তাহাদের চাহিদার চাপে শেয়ারগুলির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন যুদ্ধের পরে বাজারে শেয়ারের দর ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতের যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকায় সেই মূল্য হ্রাস সম্ভব হয় নাই।

অথচ এদিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ভয়াবহ বেকার-সমস্যা দেখা দিতেছে। ভারত সরকারের রেলবিভাগ হইতেই নাকি ২ লক্ষ ৬২ হাজার লোকের কর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। যদিও গত ৯ই আগষ্ট রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট এ্যাণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের কাজ শেষ হওয়ায় ভারতে ২৬ লক্ষ ৯৯ হাজারের মত লোক বেকার হইবে, আমাদের মনে হয় তাঁহার সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে আসন্ন বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ ৫০ লক্ষ হইবেই। যৌথ পারিবারিক জীবন ও স্ত্রীলোকদের পুরুষের উপর নির্ভরশীলতার জন্য ভারতের ন্যায় দেশে এই ৫০ লক্ষ লোক বেকার হওয়ার অর্থ অন্ততঃ ২ কোটি দেশবাসীর জীবনযাপন অনিশ্চিত হইয়া পড়া। দেশে যথেষ্ট শিল্প প্রসার হইলে এবং সামরিক শিল্পসমূহকে যথাযথভাবে এবং অবিলম্বে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিলে এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইত, কিন্তু বাস্তবিক সরকার যে এই দারুণ সমস্যা লইয়া শেষ পর্য্যন্ত কি করিবেন, সে সম্বন্ধে এখনো তাঁহাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন যুদ্ধের কাজ হইতে মুক্ত লোকেদের অন্যভাবে কাজ দিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইভাবে একসঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ পাইলে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পক্ষে বেকার জীবনের দিনগুলি কাটান বা সেই অর্থে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া এই দুই দেশের সরকার কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য কোন শিল্প শিক্ষা করিতে এবং ছোট আকারে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পর্য্যন্ত আর্থিক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গৃহনির্ম্মাণ বা ব্যবসা সুরু করিবার জন্য অল্পসুদে এবং দীর্ঘ-মেয়াদে রাষ্ট্রের নিকট হইতে ৫ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ভারতবর্ষের এই বেকার সমস্যা অবশ্যই আরও অনেক বেশী জটিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের লজ্জাকর ঔদাসীন্য আমাদের সত্যই হতাশ করিয়াছে।

যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দপ্তর নামে একটি নূতন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দপ্তরের ভার পান স্যার আর্দ্দেশির দালাল। বলা বাহুল্য দপ্তরটি নিতান্তই লোক দেখানো, কাজেই এই দপ্তর মারফৎ আমরা ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কথা যত বেশী শুনিয়াছি, কাজ সে তুলনায় কিছুই দেখি নাই। অবশ্য স্যার আর্দ্দেশির তাঁহার সুনাম রক্ষা করিতে যত্রতত্র এই দপ্তরের কর্ম্মপ্রবণতার অনেক সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। গত ৮ই অক্টোবর জেনারেল পলিসি কমিটির এক সভাতেও তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাহার দপ্তর মারফৎ কাজ অনেক হইয়াছে এবং সেই সকল কাজে সুফলও নিতান্ত কম ফলে নাই। অবশ্য তাঁহার দপ্তরের নির্দ্দেশে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ বাদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে পরিকল্পনা রচনা করা ও সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কি এক কথা? যে পর্য্যন্ত এই সকল পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা না হয়, সে পর্য্যন্ত স্যার আর্দ্দেশিরের এই বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। জাপান কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বাজার ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে পারে—এমন কথা সম্প্রতি আমরা অনেকের মুখে শুনিতেছি। উক্ত ৮ই অক্টোবরের সভায় স্যার আর্দ্দেশিরও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য বটে জাপান বর্ত্তমানে যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে শীঘ্র এশিয়ার হৃত বাণিজ্যবাজার ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাপানের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া ভারতবর্ষ সেই বাজার গ্রাস করিতে পরিবে—এমন হাস্যকর কল্পনা ভারত সরকারের সদস্য স্যার আর্দ্দেশির পর্য্যন্ত কেমন করিয়া করিতেছেন। ভারত সরকারের অসীম অনুগ্রহে এদেশে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে এই অতি-দরিদ্র দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোককে পণ্য জোগান যায় না। ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজন কবে মিটাইবে তাহারই ঠিক নাই, সে আবার জাপানের পরিত্যক্ত বাজার অধিকার করিবে কিরূপে?

ভারতের জাহাজ শিল্প

আধুনিক জগতে শিল্পবাণিজ্যে যে জাতি বড় তাহার প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের মূলে জাতীয় জাহাজ শিল্পের যে বিশিষ্ট স্থানে আছে, সে কথা অনেক সময় উল্লিখিত হয় না। ভারতবর্ষ অবশ্য শিল্পের দিক হইতে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। কিন্তু ভারতের বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ব্রিটেন, জার্ম্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে এত বেশী চালান যায় যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিল্পজাত পণ্য ভারতে আমদানী হইলেও প্রতিবৎসরই এদেশের

অনুকূলে বাণিজ্যিক গতি থাকে। এই বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্য কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতকে চালাইতে হয় বিদেশী জাহাজের সাহায্যে। যে ভারতসরকারের লজ্জাকর নিশ্চেষ্টতার জন্য ভারতে অজস্র সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই, সেই ভারতসরকারই কার্য্যতঃ শ্বেতস্বার্থসংরক্ষণের মোহে ভারতের জাহাজীশিল্প সংগঠনের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান নাই। ভারতে এপর্য্যন্ত একখানিও সমুদ্রগামী বড় গোছের জাহাজ নির্ম্মিত হয় নাই। ১৯৪১ সালে ভিজাগাপটমে যে জাহাজ কারখানা স্থাপিত হয় তাহা বাঙ্গালোরের বিমান কারখানার মত কেবল জাহাজ সারাইয়াই চলিয়াছে। কোন শিল্প ব্যাপক আকারে গড়িয়া তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে সেই শিল্পজাত পণ্য লইয়া বাহিরের দেশের সহিত বাণিজ্য চালান। কিন্তু ভারতে জাহাজের প্রয়োজন এত বেশী যে, এদেশে যত ব্যাপক ভাবেই জাহাজ শিল্প গড়িয়া উঠুক না কেন, সেই শিল্প আগামী কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত যত জাহাজই উৎপন্ন করিবে সমস্ত জাহাজ ভারতের কাজেই লাগিয়া যাইবে। যুদ্ধের মধ্যে এই পরম প্রয়োজনীয় জাতীয় আত্মরক্ষামূলক শিল্পটি ভারতসরকারের সহযোগিতায় এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল ; কিন্তু অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও ভারতসরকার এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কিছুতেই ভারতে প্রসারিত হইতে দেন নাই। অথচ যুদ্ধের সময় ভারতের বহু জাহাজ নষ্ট হইয়াছে, কাজেকাজেই অবিলম্বে নূতন জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ভারতের জাহাজ সমস্যার অবশ্যই সমাধান করিতে হইবে। ব্রিটেনের মুখ চাহিয়াই প্রধানতঃ ভারতসরকার এদেশে শিল্পপ্রসারে ঔদাসীন্য দেখান, কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটেনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাহার পক্ষেও নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে দরকারমত জাহাজ পাঠান কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্ত্তমানে ভারতে যে ধরণের সুবিধা আছে, তাহাতে এখানে ৫৯৫ ফুট চওড়া এবং ৮০ ফুট লম্বা জাহাজ তৈয়ারী করা চলিতে পারে। এই ধরণের জাহাজে ১৪ হইতে ১৫ হাজার টন মাল বহন করা চলিবে। এইরূপ প্রতিটি জাহাজের খোলের জন্য প্রয়োজন হয় ২ হাজার ৮ শত টন ইস্পাতের, কিন্তু ভারতীয় স্বার্থসম্বন্ধে চিরউদাসীন ভারতসরকার এই ইস্পাত সরবরাহে একরূপ অনিচ্ছা দেখাইয়া এখনও ভারতবর্ষের দারুণ ক্ষতিসাধন করিতেছেন।

দেশরক্ষার ব্যাপারে জাহাজ কিরূপ অত্যাবশ্যক তাহা দুইটি মহাযুদ্ধের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আজ আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাছাড়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে সুবিধামত বাণিজ্য প্রসার করিতে হইলে নিজস্ব জাহাজ না থাকিলে সত্যই চলে না। বিদেশযাত্রী জাহাজের কথা দূরে থাক, ভারতের উপকূলভাগে যে বাণিজ্য চলে, তাহারও শতকরা মাত্র ২০।৩০ ভাগ জাহাজ ভারতীয়দের হাতে আছে। এই দৈন্য হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ভারতসরকার সম্প্রতি ভারতের জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। মনে হয় যুদ্ধের অসুবিধা ভোগ করিয়া ভারতসরকার কতকটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, জাহাজ শিল্পের ন্যায় অত্যাবশ্যক শিল্পকে বিপন্ন করিয়া রাখিলে বিপদের দিনে টিকিয়া থাকা এদেশের পক্ষে একান্ত কঠিন। এমনও হইতে পারে যে, ব্রিটেনের অকর্ম্মণ্যতার সুযোগে বাহিরের কোন জাতি পাছে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য তথা বহির্বাণিজ্যের জাহাজ যোগাইবার ভার গ্রহণ করে এইভয়ে ভারতসরকার ভারতে জাহাজ শিল্প সংগঠন সম্বন্ধে একটু যেন আগ্রহশীল হইয়াছেন। সার আর্দ্দেশির দালালের পরিচালনাধীনে ভারতসরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ নামে যে নূতন দপ্তর খোলা হইয়াছে তাহার অধীনে স্থাপিত হইয়াছে কয়েকটি কমিটি। এই কমিটিগুলির কাজ—ভারতের বিভিন্ন শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি করিয়া মন্তব্য পেশ করা। এই কমিটিগুলির মধ্যে 'সিপিং পলিসি কমিটি' নামে একটি জাহাজ শিল্প পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতসরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার মহম্মদ আজিজুল হক এই পলিসি কমিটির অধিবেশনে ভারতের জন্য পৃথিবীর জাহাজী ব্যবসায়ের অংশ দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের একচতুর্থাংশ জাহাজও যে ভারতের হাতে নাই ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় এবং ভারতসরকার এই দারুণ দীনতা হইতে এখন দেশকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার ভারতীয় বণিক সভায় (Indian chamber of commerce) বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সভার প্রেসিডেন্ট মিঃ এম এ মাষ্টার ভারতে জাহাজ-শিল্প প্রসারের প্রয়োজন ও সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রসারের এক প্রবল অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শীঘ্রই আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ বৈঠকের অধিবেশন হইবে। যুদ্ধের নানা ওলট পালটের পর এই বৈঠকের অসাধারণ গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু প্রকাশ, এই বৈঠকে নাকি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইবে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের জাহাজ যে পরিমাণ মাল বহন করিত, এখনও সেই হার বজায় রাখা হউক। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারত পশ্চাৎপদ দেশ হিসাবে এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কম মাল বহনের অধিকার পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় জাহাজের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন মালবহনের অধিকার ছিল। কিন্তু বাস্তবিক এত কম মাল বহনের অধিকার পাইলে তাহার চলে না। কাজেই তাহার অধিকার সম্প্রসারণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। উপরোক্ত বণিক সভার বক্তৃতায় মিঃ মাষ্টারও বলিয়াছেন, যে ভারতের গুরুতর ক্ষতির ফল বিবেচনা করিয়া যাহাতে সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। আগেই আলোচনা করা হইয়াছে, ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক ভারতের জাহাজ ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল মনোভাবই দেখাইয়াছেন। আমরা আশা করি বিলম্বে হইলেও এইবার অন্ততঃ সরকারী এবং বেসরকারী উৎসাহে ভারতের জাহাজশিল্প কতকটা প্রসারের সুবিধা পাইবে।

হিন্দুধর্ম্ম ও সংগঠন

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ্-ডি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুধর্ম্ম, জাতির মধ্যে কোন বীরোচিত বিকাশের প্রেরণা না দিলেও, ইহা সাধারণ সমাজ-জীবনের ভক্তি, বিনয়, নিজ অবস্থায় সন্তোষ, পুরাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, একটা উচ্চ অঙ্গের নীতিজ্ঞান ও গভীর আস্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার করিয়াছে। রাজশক্তির বিরোধিতা ও পরিমণ্ডলের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমাজ-জীবনে এরূপ উচ্চস্তরের ধর্ম্মভাব ও আদর্শবাদ বজায় রাখা যে কত দুরূহ তাহা একটু ভাবিলেই বোধগম্য হইবে। এইরূপ অবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে যে নেতৃত্বশক্তি ও জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার প্রয়োজন তাহার তুলনা অন্য কোনও দেশের সমাজ নিয়ন্ত্রণের ইতিহাসে বিরল। জনশিক্ষা বিষয়ে এই অদ্ভুত নৈপুণ্যের ফলেই ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে একপ্রকারের শান্ত, নিরুত্তাপ ধর্ম্মভাব একেবারে অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের প্রতি ভক্তিপূর্ণ নির্ভর, দেবদেবীর প্রসঙ্গের প্রতি করুণ লোলুপতা, আকাশ-বাতাসের মত তাহার সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বেষ্টন করিয়া আছে। চাষী প্রথম হলকর্ষণের পূর্ব্বে, ব্যবসায়ী তাহার দৈনিক কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে, দেবানুগ্রহের উপর তাহাদের একান্ত নির্ভরের চিহ্নস্বরূপ মাঙ্গল্য বিধির অনুষ্ঠান করে। প্রতি উৎসবে, ঋতুচক্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনে এই সদা-জাগ্রত ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাকৃত আনন্দের ও প্রাথমিক প্রয়োজনের মধ্যে এক উচ্চতর পরিতৃপ্তি ও আদর্শ-ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। এই বদ্ধমূল ধর্ম্ম-প্রাণতা আমাদের জীবনে আতিশয্যজনিত নানা বিকৃতি আনিয়াছে; তথাপি ইহাই আমাদের সত্য পরিচয় ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়া আবার জীবনের নূতন ভিত্তিরচনার চেষ্টা করিলে তাহার উপর কোন পাকা, স্থায়ী ইমারত নির্ম্মাণ করা চলিবে কি না সন্দেহ।

৪

এখন আসল প্রশ্ন হইতেছে যে হিন্দুর এই সনাতন ধর্ম্মবোধকে, সমস্ত ক্ষয়জীর্ণতা ও অস্বাস্থ্য বিকার হইতে রক্ষা করিয়া নূতন বাস্তবজ্ঞানে অনুপ্রাণিত ও যুগোপযোগী করিয়া, আধুনিক যুগের বৃহত্তর কর্ম্মপরিধির কেন্দ্রস্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে কি না! রাজনীতি ও ধনোৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্ত্তমানের প্রধান প্রচেষ্টা—ইহাদের সহিত ধর্ম্মের আত্মীয়তা স্থাপন চলিবে কি না? তাহা যদি সম্ভব না হয়, জীবনের প্রধান প্রবাহের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ যদি চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ধর্ম্ম ইহার সামাজিক কল্যাণশক্তি হারাইয়া ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় হইবে। তাহা হইলে বেদ্ উপনিষদ, গীতা,রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যে জীবন দর্শন ব্যাখ্যাত ও উদাহৃত হইয়াছে, যে আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আধুনিক হিন্দুর জীবনে তাহাদের আর কোন সার্থক প্রয়োগ থাকিবে না। তাহা হইলে সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও বক্তৃতামঞ্চে হিন্দুর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিষয় ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে স্ফীত না হইয়া সোজাসুজি আমাদের পূর্ব্বতন ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। মুখে ধর্ম্মের বুলি না আওড়াইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী, অন্ধ ঘূর্ণাবেগে ঝাঁপাইয়া পড়াই সহজ ও দ্বিধাহীন কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া আমরা না পারি আমাদের পুরাতন মনোবৃত্তি পুনরুদ্ধার করিতে, না পারি আধুনিক যুগের প্রগতির সঙ্গে সমান মাত্রায় পা ফেলিতে। ধর্ম্ম আমাদের ঊর্দ্ধগতির প্রেরণা না যোগাইয়া অগ্রগতির পায়ে শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের জীবনসংগ্রামে সহায়তা না করিয়া দুর্ব্বিষহ বোঝার চাপে আমাদিগকে প্রপীড়িত করিতেছে, আমাদের লঘুহস্তে অস্ত্রসঞ্চালনের বাধা জন্মাইতেছে। কাজেই মনে হয় আধুনিক জগতে হিন্দুধর্ম্মের স্থান সম্বন্ধে একটা পাকা-পাকি রকমের বোঝাপড়ার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ধর্ম্ম যে নিতান্ত অবান্তর প্রক্ষেপ নহে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সুপরিস্ফুট হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্ম্মনীতি ও অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ভারত জনমনের উপর মহাত্মার অসাধারণ প্রভাব তাঁহার এই ধর্ম্মনীতিপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ তাঁহাকে কোন রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই শ্রদ্ধা করে না—তাঁহাকে ঈশ্বর-জানিত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য ধর্ম্মমিশ্র রাজনীতির যে বিপদ আছে' ইহার মধ্যে যে বিচার বিভ্রমের যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্ত্তমান তাহা মহাত্মাজীর নেতৃত্বে বারংবার উদঘাটিত হইয়াছে। তথাপি রাজনীতিজ্ঞানবর্জ্জিত অশিক্ষিতের দেশে ইহা যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়—একটা অভিনব পরীক্ষামূলক পন্থা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দও যোগবলে দেশের কল্যাণসাধন করা সম্ভব—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। নবীন পাশ্চাত্য আবির্ভাবের সহিত সনাতন প্রাচ্য ধর্ম্মনীতির এই সামঞ্জস্য প্রয়াস দেশ-প্রেমের নূতন জোয়ারের উচ্ছ্বাসকে পুরুষ-পরম্পরা খনিত গভীর হৃদয়া-বেগের প্রণালীতে পরিচালিত করার এই প্রচেষ্টা সফল হইবে কি না তাহা বিচারের সময় এখনও আসে নাই। এই মতবাদের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত গঠন ভবিষ্যৎ পরিণতির অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

ইতিমধ্যে ইউরোপেও রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে উচ্চতর আদর্শ-বাদের প্রয়োজনীয়তা আবার নূতন করিয়া অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান

মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ইউরোপ বুঝিয়াছে যে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই অবিমিশ্র, অসংস্কৃত পাশবনীতির নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন প্রয়োজন। v1, v2 ও জার্ম্মানীর অস্ত্রাগারে আর যে সমস্ত ভয়াবহ মারণাস্ত্র শান দেওয়া হইতেছিল তাহাদের রহস্যোদ্ঘাটনে ইউরোপের লুপ্ত ধর্ম্মবোধ আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। সভ্য ও ধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে যুদ্ধ চালাইবার পরিকল্পনা ইউরোপের রণনীতি বিশারদদের অনুধ্যানের বিষয় হইয়া উঠিতেছে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের ধর্ম্মযুদ্ধের আদর্শ বোধ হয় ইউরোপকে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ রাজনীতি ও ধনোৎপাদনের ব্যাপারেও নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে উদারতর, অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ নীতির অবলম্বন অপরিহার্য্য। এই বাঁচিবার তাগিদেই Atlantic Charter ও World Security Conference (পৃথিবীর নিরাপত্তারক্ষার জন্য সম্মিলন) এর আসল জন্মদাতা। হয়ত ইহার মধ্যে এখন যেটুকু ভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণা আছে উপায়ান্তরহীন, নির্ম্মম প্রয়োজনের পেষণে তাহা ক্রমশঃ ও সংস্কৃত হইয়া উন্নততর আদর্শবাদে রূপান্তরিত হইবে। আদিম মানবের বাধ্যতামূলক সঙ্ঘবদ্ধতা হইতে উচ্চতর সামাজিক ও নৈতিক গুণের বিকাশের সুপরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে সেই একই কারণে—যে আইনের ছাপমারা দস্যুবৃত্তি এখন ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির আসল ভিত্তি তাহারও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণ হইতে মনে হয় যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে ধর্ম্ম ও সমাজ কল্যাণ-বুদ্ধির প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

৫

কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের রাষ্ট্র ও সমাজনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে যে বাধা আছে তাহা দুরতিক্রমণীয়। আধুনিক যুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়াছে—ধর্ম্মের স্থানে দেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কতকগুলি নূতন আদর্শ লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে দেশপ্রীতির যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ বলি দিয়াছে ও অশ্রুতপূর্ব্ব দুঃখ-ক্লেশ ও স্বার্থত্যাগ সহ্য করিয়াছে। ধর্ম্ম এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের শতাংশের একাংশও দাবী করিতে পারিত না। সুতরাং পাশ্চাত্য মহাদেশে পুরাতন ধর্ম্মের আদর্শ যে এক অভিনব প্রেরণার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষেও এই নূতন ধর্ম্মনীতি ধীরে-ধীরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্মের এই ক্ষীয়মান প্রভাবের জন্য বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি হইবে না, কেননা এই প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে ও সেই সমস্ত দেশের মুখ্য প্রচেষ্টাসমূহ ধর্ম্মের গৌণত্ব, এমন কি ইহার অবান্তরত্বও স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইয়াছে। তাই সাধারণ ইউরোপীয় রবিবারে গীর্জ্জায় পাদরির বক্তৃতা শোনা ও সপ্তাহের অন্য কয়দিন যীশুখৃষ্টের অনুশাসন উল্লঙ্ঘনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা—ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য অনুভব করে না। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আদর্শ অনেক উচ্চতর—সমগ্র জীবন-পরিধির উপর ইহার সর্ব্বগ্রাসী একাধিপত্য। যুদ্ধ বিগ্রহের নির্ম্মম বাস্তব প্রয়োজনে এই ধর্ম্মনীতির ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্যভিচারকে সমর্থন করার প্রাণান্ত প্রয়াস হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ইহা জাতির বিবেক বুদ্ধিকে কত মর্ম্মান্তিকভাবে পীড়িত করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের নিপাতসাধন, সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুর বধ প্রভৃতি নীতি বিচ্যুতির দৃষ্টান্তগুলি মহাভারতকারের অনেক ওকালতী, তর্ক ও কূটকৌশল জাল বিস্তারের হেতু হইয়াছে। আধুনিক যুগের অসংখ্য নূতন কার্য্যক্রমের মধ্যে নীতিজ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তার খুব দুরূহ সমস্যা। রাজনৈতিক নির্ব্বাচন, ব্যবসায় পরিচালনা, যান্ত্রিক উপায়ে শিল্পোৎপাদন প্রণালীর বিরাট ব্যবস্থা—এ সমস্তের মধ্যে ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা কতখানি রক্ষিত হইবে অনুমান করা কঠিন। তথাপি ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যেই ধর্ম্মের কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্যথায় আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকিবে না; পৃথিবীর কাছে কোন নূতন অবদানের অর্ঘ্য আমরা ধরিতে পারিব না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারে, রণনীতিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপের সহিত তুলনায় এত পশ্চাৎপদ, যে এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতেই বহু শতাব্দীর সাধনা প্রয়োজন হইবে। তার পর তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় বলিয়াই মনে হয়। কাজেই পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে আমাদের যদি বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করিতে হয়, সভ্যতার শরনৈবেদ্য-সম্ভারসজ্জিত স্বর্ণথালে যদি আমাদের কোন পূজোপহার স্থান পায়, তবে তাহা হইবে নূতন ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিতে নহে, ঐশ্বর্য্য ভোগ ও প্রয়োগের অভিনব মনোবৃত্তিতে। বাহিরের উপকরণবৃদ্ধিতে নহে, নূতন জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠায়, শক্তির অদম্য আস্ফালনে নহে, তাহার আত্মসমাহিত, বিক্ষোভহীন স্থৈর্য্যে। ভবিষ্যৎ কাল ভারতবর্ষের নিকট ইহারই প্রত্যাশী, এই প্রত্যাশিত উপহার নিবেদন করিতে না পারিলে ভাবী জগৎ ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে স্বীকার করিবে না।

আজ স্বাধীনতা লাভই ভারতের কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে, একটা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটেই সুস্পষ্ট নহে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, ভদ্র ও শোভন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ, আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মর্য্যাদাবোধ, অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সমকক্ষতা—ইত্যাদি সুবিধা স্বাধীনতা লাভের খুব প্রত্যক্ষ ফল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকের ভাষায় 'এহো বাহ্য'। স্বাধীনতার সত্যকার ব্যবহার—জাতির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ। জাতি যাহা হইতে পারিত, কিন্তু প্রতিকূল বহির্ঘটনা ও আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার জন্য যাহা ঘটিয়া উঠে নাই—স্বাধীনতা সম্ভাবিত ইতিহাসের সেই অলিখিত অধ্যায়গুলিকে নূতন করিয়া রচনা করিবে; জাতির স্রষ্টা ও নেতাদের মনে যে আদর্শ পরিকল্পনা অর্দ্ধস্ফুট ছিল তাহাকে বাস্তব রূপ দিবে। অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে জাতির প্রতিভাকে পূর্ণ স্ফুরণের সুযোগ দিবে। সাতশত বৎসর পূর্ব্বের

পরিত্যক্ত সূত্র পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া ও তাহাতে পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত গ্রন্থি যোজনা হইয়াছে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া, এ সমস্ত বিবর্ত্তন ধারার প্রভাবে যে নূতন লক্ষ্য উদ্ভূত হইয়াছে, ভাবী যুগের যাত্রা পথে তাহারই নিগূঢ় ইঙ্গিতটী অনুসরণ করিতে হইবে। অতীত যুগে প্রত্যাবর্ত্তনের অসম্ভাব্যতা স্বীকার করি; কালের স্রোতকে বিপরীত দিকে ফিরান যায় না। গীতা-উপনিষদ যুগের মহান সাধনা ও আদর্শকে যতই শ্রদ্ধা করি না কেন, সে যুগের আবেষ্টন আর নূতন করিয়া গড়া চলিবে না। তথাপি অতীতের সমস্তটাই মৃত বা বরখাস্ত নহে; ইহার কিয়দংশ বর্ত্তমানের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে সজীব ও সক্রিয়। ভবিষ্যতের পন্থানির্দ্ধারণের সময় এই সজীব অতীত প্রভাবকে পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হইবে। যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সংগঠনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে অতীতের মৃত ও জীবিত অংশের নির্দ্ধারণ ও পৃথকীকরণ। প্রাণহীন, গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠানের নাগপাশে ধর্ম্মের যে মৌলিক প্রেরণা বন্দী হইয়া আছে, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া যুগোপযোগী নূতন বহিরবয়বের মধ্যে রূপায়িত করিতে হইবে। পুরাতন উৎসবের মধ্যে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে; উৎসবের সহিত আনন্দের যে নিত্য সম্বন্ধ কৃত্রিম অনুশাসনের চাপে ক্ষুণ্ন ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। যাত্রা, কবি, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার ও জনসাধারণের মনোরঞ্জন এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইত তাহারা এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে ও গ্রাম সমাজের উৎসাহহীনতায় মলিন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভিতর দিয়া সাধারণের চিত্তকে আবার স্পর্শ করিতে হইবে ও হিন্দুধর্ম্মের নূতন আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চাষী-গৃহস্থ ও গ্রাম-শিল্পীদের গৃহে বহুদিন পরে আর্থিক অসচ্ছলতা দেখা দিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকালের অব্যবহার জন্য তাহাদের আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অসাড় হইয়াছে মনে হয়। এই আকস্মিক সৌভাগ্যের অনুকূল অবসরে সরল আমোদ-প্রমোদ ও ধর্ম্মপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত আনন্দকে পল্লীসমাজে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। উচ্চতর ধর্ম্ম, দর্শন-আলোচনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের প্রাণ এই সমস্ত আবেদনে সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে; নেতারাই এ বিষয়ে পশ্চাদপদ ও সংশয়াচ্ছন্ন। গত চূড়ামণি যোগে যে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, পথক্লেশ, অনশন, দারিদ্র্য প্রভৃতি বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া, এক আত্মহারা ভাবোন্মাদের প্রেরণায় ভাগীরথীতীরে সমবেত হইয়াছিল, তাহারাই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী—তাহাদের মধ্যে ভারতের সনাতন আত্মা অক্ষুণ্ন প্রাণশক্তিতে বিদ্যমান। আধুনিক নেতারা যদি এই অক্ষয় দুর্ব্বার প্রাণ-সম্পদকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন, ক্ষণস্থায়ী আবেগের জোয়ারকে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অপব্যয়হীন নিয়মিত প্রবাহে পরিণত করিতে পারেন, তবে কি না অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইতে পারে? অশিক্ষিত জন-সাধারণের এই যুক্তি তর্কাতীত, বদ্ধমূল সহজ সংস্কার, অসংখ্য হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকৃত নির্ম্মল জীবন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদ, ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের জনসেবাব্রত ও সংগঠনের কল্যাণময় প্রচেষ্টা, লোকলোচনের অন্তরালস্থিত অনেক সাধকের আত্মসমাহিত তপশ্চর্য্যা—এই সবগুণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্মিলিতভাবে এক নীরব আবেদন জানাইতেছে—"অতীতের শিক্ষা আমরা ভুলি নাই; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তুমি আমাদের কর্ণে যে মন্ত্র দিয়াছ তাহা অবিচল নিষ্ঠার সহিত 'আমরা সাধন' করিয়া যাইতেছি। এখন আমরা নূতন পথনির্দ্দেশ, নূতন ব্রতগ্রহণ ও উদযাপনের জন্য প্রতীক্ষমান। আমাদের এই ভক্তি-বিশ্বাস, এই যুগযুগান্তর সঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদ যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে নিয়োগ কর। অস্ত্র প্রস্তুত; ইহার সাহায্যে সংশয়ের জটিল গ্রন্থি ছেদন কর, জড়বাদের দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নব বিজয়-অভিযানের রাজপথ নির্ম্মাণ কর।" জননায়কের কর্ণে এই আবেদন ধ্বনিত হইবে। যিনি এই স্বপ্ন-সুষমাকে কর্ম্ম জগতে সার্থক রূপ দিতে পারিবেন, তিনিই গীতার অমর ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

ভ্যানিটি ব্যাগ

শ্রীকানাই বসু

পুণ্যগেহে পুরাতনী যে লক্ষ্মীর ঝাঁপি
গৃহলক্ষ্মীকরস্পর্শে দশদিক ছাপি
উথলিয়া ধন ধান্য কল্যাণ বিতরে,
আজি আশীর্ব্বাদসহ আধুনিকা করে
তাই দিনু নবরূপে, এ ভ্যানিটি ব্যাগ।
বস্তুমাত্র নিও, কোরো ভ্যানিটিরে ত্যাগ।

ভক্তির কবিতা

অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র এম-এ

বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসাত্মক কাব্যের অভাব নেই। বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ইত্যাদি রচনা কাব্যানুরাগী বাঙালী মাত্রেরই সুপরিচিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই সব রচনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' অপরিপক্ক কিশোরবৃত্তি যতোই না কেন প্রকাশিত হয়ে থাক, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি রচনা পরিণত কবিচিত্তের ভক্তিবোধের সুনিশ্চিত প্রমাণরূপেই গ্রাহ্য।

একজন বিদেশী সমালোচক লিখেছিলেন যে ভক্তিরসাত্মক কাব্য "like the height of tragedy is beyond the reach of oratory।" তাঁর অভিমত হ'লো এই যে, কবির মনে যদি ভক্তিভাবের ঐকান্তিক স্ফুরণ-ই ঘটে, তাহ'লে তার আবার অলংকৃত উদ্ঘাটন কেন? ভক্তির আস্বাদনেই তো ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া উচিত। তার পরিবর্তে অলংকার-ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রের শাসন মেনে সাজিয়ে-গুছিয়ে যদি কোনো ভক্ত কথা রচনা করতে বসেন, তা'হলে তাঁর ভক্তির ফাঁকিটাই কি ধরা পড়ে না? অর্থাৎ যে ভক্ত কবিতা লিখবেন, তিনি আগে ভক্ত, না আগে কবি?

সাধারণ বুদ্ধিতে এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, কবির স্বভাব হলো কবিতা লেখা, আর ভক্তের লক্ষণ হ'লো ভক্তিভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া। শেষের ব্যাপারটি যেখানে আত্মসিদ্ধ সেখানে ভক্ত কেবল ভক্তই থেকে যান। আর যদি তাঁর স্বভাবই হয় কথার সংগে কথা মেলানো, তাহলে ভক্তির প্রকাশ ঘটে কাব্যের চমৎকারিত্বে। আর কবিদের কাজই যেহেতু সাদৃশ্যের সন্ধান রাখা, সেজন্য ঈশ্বরের কথা থেকে অবলীলাক্রমে তাঁরা সামান্য মানুষের সংসারে নেমে আসতে পারেন। সেখানকার সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা তখন তাঁদের রচনায় মূর্তি লাভ করে, যদিও তলে-তলে একটা প্রবল ফল্গুস্রোত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে যায়। এই স্রোত হ'লো ভক্তিভাবের স্রোত।

সংস্কৃতে অলংকারশাস্ত্রের একখানি বই-এ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসংগে পানক বা সরবৎ-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সরবতে যেমন মরিচ, লবণ ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শর্করার স্বাদটাই প্রাধান্য লাভ করে, কাব্যবিশেষের আস্বাদনেও তেমনি বিভিন্ন রসের সহযোগিতা চোখে পড়ে। এই সব পৃথক স্বাদের মধ্যে অন্যগুলির প্রাধান্য প্রারম্ভিক, আর মূল রসটির প্রাধান্য পার্যন্তিক অর্থাৎ শেষ অবধি।

ভক্তিরসাত্মক কবিতার স্বাদ সম্বন্ধে এই পানকের দৃষ্টান্তটি সুপ্রযোজ্য। পানকের পার্যন্তিক স্বাদ যেমন শর্করার স্বাদ, ভক্তিরসাত্মক কবিতার পার্যন্তিক স্বাদ তেমনি ভক্তির স্বাদ। সংসারের সুখদুঃখের কথা, শাস্ত্রের কথা, পাণ্ডিত্যের কথা, ইন্দ্রিয়সুখের কথা,—এই সব থেকেও কাব্যে ভক্তির কথাই যখন প্রবলতম প্রকাশ লাভ করে, তখনই সে কাব্য হয় ভক্তির কাব্য।

সাধারণতঃ আলংকারিকদের রচনায় ভক্তিরস বলে পৃথক কোনো রসের উল্লেখ দেখা যায় না। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বে ভক্তিপর্বের যে পাঁচটি স্তরবিভাগ সূচিত হয়েছে, সেগুলি হলো যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে ভক্তির প্রথম অবস্থাটাই হলো শমভাব। রসশাস্ত্রে এই শমভাবজাত 'শান্ত'রসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে অনেকে আবার এই বস্তুটিকে পৃথক একটি রসের মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন নি। ভরতের পরবর্তী আলংকারিক অভিনব গুপ্ত বলেছেন, প্রয়োগত্ব যেখানে নেই, কাব্যে রসাস্বাদ ব্যাপারও সেখানে অসম্ভব। এই 'প্রয়োগত্ব' শব্দটির মানে হলো 'repnesentableness'। শমভাব যেহেতু চিৎপ্রবৃত্তির বিশ্রামসূচক, সেই কারণে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই ভাব প্রয়োগসাধ্য নয়। এর কোনো নাটকীয় অভিব্যক্তি নেই। অভিনব গুপ্ত তাই শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

'দশরূপকের' লেখক ধনঞ্জয় বলেছেন,

> রত্যুৎসাহজুগুপ্সাঃ ক্রোধাহাসংস্ময়োভয়ং শোকঃ।
> শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য॥—দশরূপক, ৪।৩৫

অর্থাৎ রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, ক্রোধ, হাস, বিস্ময়, ভয় এবং শোক ব্যতীত শমভাবকেও কোনো কোনো আলংকারিক স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু নাট্যে এর পুষ্টি নেই।

ধনঞ্জয়ের এই উক্তির ব্যাখ্যাপ্রসংগে টীকাকার ধনিক বলেছেন,

আচার্য যেহেতু অন্যান্য ভাবের বিভাবাদি আলোচনা করলেও শান্ত-রসের অনুরূপ কোনও আলোচনা করেন নি এবং অনাদিকালপ্রবাহে যে রাগ-দ্বেষের তাড়নায় অন্যান্য ভাবের প্রকাশ, সেই রাগদ্বেষই যখন শমভাবে অস্বীকৃত, তখন শমভাবের অস্তিত্ব রসশাস্ত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে কি ভাবে?

সুতরাং দেখা গেলো, অভিনবগুপ্ত কার্যোল্লেখে যা বলেছিলেন, ধনিক কারণোল্লেখে তাই বললেন। অভিনব গুপ্ত প্রয়োগত্বক্ষমতাকে রসত্বের নির্ণায়ক বলে স্বীকার করেছিলেন; আর ধনিক বললেন, শান্তরসের মূলে তেমন কোনো ভাব নেই, তেমন কোনো কারণ নেই—যা অনাদিকালপ্রবাহে মানবচিত্তে নেতিবাচক ভাবে নয়, স্পষ্ট প্রেরণায় কর্মের তাগিদ জানিয়েছে।

'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ বলেছেন,

> রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চেষ্টৈত্যষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপিচ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৫

এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রথমে আটটি ভাবের উল্লেখ করে শেষে শমের উল্লেখ করা হয়েছে। এই শমভাবের বর্ণনায় বিশ্বনাথ বলেছেন,

শমো নিরীহাবস্থায়াং স্বাত্মবিশ্রামজং সুখং

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৮০

পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য আলোচনায় যে কথাটি অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো মাত্র, বিশ্বনাথের এই একটি উক্তিতে সেটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলো। নিরীহাবস্থায় আত্মার বিশ্রামে যে সুখবোধ, তাই হলো শমভাব। যতো নিরীহ, স্তিমিত এবং অনুচ্চারিতই হোক না কেন, এই বোধ যে সুখের বোধ সেকথা বিশ্বনাথের প্রসাদে আমরা জানতে পারছি। সুতরাং ভক্তির কবিতার মূলে সুখের প্রেরণা যে কোথা থেকে আসে, তা বোঝা গেলো। শমভাবগ্রস্ত ভক্ত পরম সুখময়তায় আচ্ছন্ন হন, তারপর সেই চিত্ত যদি আবার কবির অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে এই সুখবোধ কাব্যে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

'কাব্যপ্রদীপের' লেখক গোবিন্দ ঠক্কুর শমভাবের মধ্যস্থতা না মেনে সরাসরি ভক্তিরস বলে একটি স্বতন্ত্র রসের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কা'রও মতে রস বলতে একমাত্র শৃংগার বা আদি রসই ধর্তব্য, আবার অন্যান্যদের মতে রস বারো রকম,—"কেচিচ্চ দ্বাদশ" ইত্যাদি। এই দ্বাদশ রসের উল্লেখকালে বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় বলেছেন,

"ভক্তিবাৎসল্যশ্রদ্ধাখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহিতাঃ
শৃঙ্গারাদয়ো নবেত্যর্থঃ।"

ভক্তি, বাৎসল্য এবং শ্রদ্ধার সংগে শৃংগার প্রভৃতি নব রসের যোগে সর্বসমেত রস দ্বাদশসংখ্যক। দেখা যাচ্ছে, এখানে শান্ত রসকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়ে ভক্তি, বাৎসল্য এবং শ্রদ্ধাকে রসপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। মম্মট ভট্ট বলেছেন,

নির্বেদস্থায়িভাবাখ্যঃ শান্তোঽপি নবমোরসঃ।
রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ভাব প্রোক্তঃ॥

—কাব্যপ্রকাশ, ৪।১২

অর্থাৎ নবম রসের নাম শান্তি রস; নির্বেদ এর স্থায়ী ভাব—ইত্যাদি।

এই অংশের টীকায় অবশ্য টীকাকার গোবিন্দ ঠক্কুর একথা মানেন নি। তিনি বলেছেন, শান্ত রসের স্থায়ী ভাব হলো সর্ববৃত্তির বিরাম। নির্বেদ এর ব্যভিচারী ভাব।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ছাত্র এই রকম আলোচনার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হতে পারেন। এজাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির যেন অন্ত নেই। সেই বিতর্ক-জালের জটিলতায় অধিকতর পর্যটনের অবশ্য পুরস্কার আছে। কিন্তু আপাততঃ যে আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হলো, তা থেকে এই কথাটি নিঃসংশয়ে বোধগম্য হয় যে ভক্তির প্রভাবে মানুষের মনে সর্বপ্রকার চিৎপ্রবৃত্তির বিরামজাত এক অপরিসীম আনন্দের বোধ সঞ্চারিত হয়। সেই আনন্দ থেকেই কবিতার প্রেরণা জাগে। বৈষ্ণব পদকর্তা লিখেছেন,

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে বিসরি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

এখানে আদি-অন্তহীন এক পরম আনন্দের আশ্রয় কবিচিত্তে প্রেরণা জাগিয়েছে। পারাবারে যেমন কোটি কোটি তরংগের উত্থান-পতন নিত্যই ঘটে চলেছে, সেই পরম আনন্দস্বরূপের চেতনায় তেমনি এই জীবলীলার প্রবাহ। আর একটি গানে ভক্ত বলেছেন,

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥

মাধবের অভিমুখে ভক্তের কাতর মিনতি কাব্যের বাহনে এইভাবে ধ্বনিত হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভক্তিরসাত্মক কবিতার মূল ভাবটাই হলো এই—এই বিশ্বাস এবং সমর্পণ। নীলকণ্ঠ অধিকারীর গানে আছে,

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ-ভিখারী
যে পদ বই ভব, জানে না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী।

বিদেশী কবি Christopher Harvey প্রায় একই কথা বলেছেন ভিন্ন ভাষায়,—বাংলা অনুবাদে যেটা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম:—

ব্যাকুল মনের ভাবনা কোথায় পরম রতন আছে
বিশ্বে কোথায় মিলবে গো তা'

সেই তো আদি, কেন্দ্রও তা'
যা' কিছু সব তারই আলোয় বাঁচে।

যে কথা Solomonএর গানে, অথবা David-এর স্তোত্রে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে, সেই কথাই বাংলা দেশে বলেছেন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বিহারে বিদ্যাপতি, বৃন্দাবনে মীরাবাঈ। জীবলোক এবং জড়পদার্থের আশ্রয় সেই পরমা শক্তির উপলব্ধিতে যে আনন্দ এবং আত্মসমর্পণের প্রেরণা জাগে, তারই ফলে কবির কণ্ঠে ভক্তির কবিতা আসে। ভারতবর্ষের ভক্ত কবীর এই আনন্দেই বলেছিলেন,

'ইস্ ঘট্, অন্তর বাগ বাগীচা'

—এই মাটির পাত্রটার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা কতো কাননের আনন্দ লুকিয়ে রেখেছেন—কতো সমুদ্রের নীলিমা, আকাশের জ্যোতিষ্ক!

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ হয় নাই—নূতনভাবে ও নূতন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধ বিমান ও ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ নয়, ইহা প্রধানতঃ কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। অবশ্য প্রয়োজনমত দুই চারিটি গুলীগোলাও চলিতেছে।

মিত্রপক্ষের প্রধান পাঁচটি শক্তির মধ্যে তিনটি সাম্রাজ্যবাদী, একটি আধা-ঔপনিবেশিক শক্তি এবং একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক শক্তি। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের অবসানের পর এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের পূর্ব্বের স্বার্থ ও অধিকার ষোল আনা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গণ জাগরণ ঘটিয়াছে ; গণশক্তি এখন পূর্ব্বের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই, ইউরোপে এবং মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে এই মুক্তিকামী জাগ্রত গণশক্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল বিরোধ দেখা দিয়াছে।

প্রাচ্য অঞ্চলে

যুদ্ধ শেষ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বৃটিশ রাজনীতিকরা পশ্চিম ইউরোপের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া দল গঠনের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পর সোভিয়েট রুশিয়া যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের কষ্ট হয় নাই। পূর্ব্ব-ইউরোপ হইতে বল্‌শেভিক্‌ ভাবধারার পশ্চিমমুখী প্লাবন রোধ করিবার জন্য বৃটিশ রাজনীতিকরা এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধের পর প্রবল শক্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে ইহাও বোঝা গিয়াছিল। এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিবার শক্তি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজনীতিকরা ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত বৃটেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার এই পরিকল্পনা স্মরণ করিলে প্রাচ্য অঞ্চলে আজ আমরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য ফরাসী, ওলন্দাজ ও বৃটিশের মধ্যে যে সহযোগিতা দেখিতেছি, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দৃঢ়সূত্রে সংযুক্ত ; ইহাকে সম্মিলিতভাবে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বোঝে। যুদ্ধের সময় বৃটেন্‌ যেমন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্ত শাসনের আশ্বাস দিয়াছিল, ওলন্দাজ ও ফরাসীরাও তেমনি তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীকে বৃটিশ-মার্কা প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যুদ্ধোত্তর কালে এই সব অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের আপত্তি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী! ইহা বরদাস্ত করা যায় কেমন করিয়া ? ইন্দো-চীন বা ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারকে সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। এই সব অঞ্চল বন্ধনমুক্ত হইলে প্রাচ্যের সমগ্র পরাধীন দেশে উহার প্রবল প্রতিক্রিয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সাম্রাজ্যবাদীরা বোঝে। এই জন্যই ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ বুলেট্‌ অবাধে চলিতেছে এবং "লেবেলবিহীন" মার্কিণ অস্ত্রও ব্যবহৃত হইতেছে।

আনন্দের কথা এই—প্রাচ্যের স্বাধীনতাকামীরা এখন আর পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালাইবার কথা ভাবেন না ; তাঁহারা তাঁহাদের সংগ্রামের একটা সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার নেতা ডাঃ সুকর্ণের তৎপরতা এবং বর্ম্মী-নেতা জেনারল আউং সান্‌ ও ভারতবর্ষের নেতা পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রতিক বিবৃতি আশাপ্রদ।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বহুবিধ পরস্পর-বিরোধী সংবাদের মধ্য দিয়া এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি দেশের স্বাধীনতাকামীরা ফরাসী ও ওলন্দাজের কবল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা দমনের জন্য বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং জাপানীদিগকে নিয়োগ করা হইতেছে। এ কথায় কিছু সত্য আছে যে, এই সব দেশের কোনও কোনও দল প্রথমে জাপানীদের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই প্রাচ্যের এই সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কে তাহাদের ভুল ভাঙ্গে ; তখন সমগ্র দেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টই এখন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভের পণ করিয়াছে। ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বলিয়া থাকে যে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের বর্ত্তমান নেতারা জাপানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে ; কাজেই তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা চলিতে পারে না। এই অভিযোগ ইচ্ছাকৃত সত্যের বিকৃতি। আর, এই দুইটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানীরা সাহায্য করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ; বরং স্বাধীনতা-কামীদিগকে দমন করিবার জন্যই মিত্রপক্ষ জাপানীদের সাহায্য লইতেছে।

ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা দুষ্কর। তবে, এইটুকু নিশ্চিত বলা চলে

যে, এই দুইটি অঞ্চলের জাগ্রত গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখা আর সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতাকামীরা সামরিক ব্যাপারে একটা বড় অধিকার আদায় করিয়াছিল; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদিগকে দাবাইবার চেষ্টা হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে যে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, তাহার একটি অংশ প্রথমে ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। পরে, জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী মুখোস খুলিয়া যাওয়া মাত্রই ব্রহ্ম নেতা জেনারল আউং সানের নেতৃত্বে সমগ্র ব্রহ্মদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। গত ১৯৪৩ সালে এই দলের পক্ষ হইতে জেনারল আউং সান ভারতবর্ষের মিত্রপক্ষের প্রধানকেন্দ্রে গোপনে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত। এই প্রতিরোধ বাহিনী ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিবার কাজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে জেনারল আউং সানের সহিত লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, প্রতিরোধ বাহিনী তাহাদের কর্ম্মচারীদের অধীনে থাকিয়াই ব্রহ্মদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে এইভাবে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া একটা অভুতপূর্ব্ব ব্যাপার। ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিতে ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়া কাজ চালানোই রীতি; রাজনীতি ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ শাস্ত্র। ঔপনিবেশিক দেশে কোন্ শ্রেণীকে লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হয়, তাহা ভারতবাসী আমরা ভালভাবেই জানি।

ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধবাহিনী যে অধিকার লাভ করিয়াছে, বেল্জিয়ামের প্রতিরোধ-বাহিনী সেই অধিকার দাবী করায় গত বৎসর সেখানে প্রায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সেই সময় প্রতিরোধ বাহিনীকে দমন করিবার জন্য বৈদেশিক শক্তির সঙ্গীন সেখানে উদ্যত হইয়াছিল। গ্রীসে প্রতিরোধ বাহিনীর দাবী না মানার জন্য এক মাস ধরিয়া সেখানে গৃহযুদ্ধ চলে। একমাত্র ফ্রান্সে জেনারল দ্য গল্ প্রতিরোধ বাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মত হন।

ব্রহ্মের গভর্ণর স্যর রেজিন্যাণ্ড ডরম্যান্ স্মিথ্ এখন রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রহ্মের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগের প্রভাব রোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রধান প্রধান দপ্তরগুলিতে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে চান; কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিকে তিনি শাসন পরিষদে গ্রহণ করিতে অসম্মত। এই অন্যায় জিদের জন্য আউং সানের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগ্ ডরম্যান্ স্মিথের শাসন পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লীগের মনোনীত ব্যক্তিরা শাসন-পরিষদের কার্য্যকলাপ লীগের সর্ব্বোচ্চ পরিষদকে জানাইবেন এবং সেই পরিষদের আদেশ অনুসারে কাজ করিবেন। ইহাকেই ইংরাজিতে "দুর্ণাম দিয়া ফাঁসী দেওয়া" বলে। বৃটেনে গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অপবাদ রটাইয়াছিল। প্রতিক্রিয়া পন্থীদের অপকৌশল সর্ব্বত্রই একরূপ।

সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে গণশক্তির দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া আর নিজের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা এক কথা। "মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করিতে" দ্বিধা স্বাভাবিক। কিন্তু গণশক্তি জাগ্রত ও একতাবদ্ধ হইলেই সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসে। শোষিত ও নিষ্পেষিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব ও অনৈক্যই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। ব্রহ্মদেশে এই ভিত্তি চিরদিনের মত ধ্বসিয়া গিয়াছে। শত ডরম্যান স্মিথের কূটবুদ্ধি এই ভিত্তি আর গাঁথিয়া তুলিতে পারিবে না।

চীনে গৃহ-যুদ্ধ

মাসাধিক কাল ধরিয়া চুংকিংএ কম্যুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং ও মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই আলোচনা অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অবশ্য, মীমাংসার সকল আশা এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চুংকিংএ আলোচনা চলিবার সময় উত্তর চীনে সরকারপক্ষের সৈন্য অকস্মাৎ কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন যায়গায় ছোট ছোট সজ্বর্ষ চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শক্তিশালী; কারণ যে সব জাপানী সেনা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কম্যুনিষ্টদের হাতে গিয়াছে। সরকারপক্ষ জাপানের তাঁবেদার সেনাবাহিনীকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে কম্যুনিষ্টরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

চীনস্থিত মার্কিণ সেনাপতি জেনারল ওয়েডমীয়ার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সজ্বর্ষে আমেরিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নাই। মার্কিণ বিমানবাহিনী ও জলযান চীনা সৈন্যকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনের মত বিশাল দেশে এই সাহায্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বিশেষতঃ চীনের সাধারণ সংযোগসূত্র এখন বিচ্ছিন্ন।

চীন-সোভিয়েট চুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সর্ত্ত এই যে, সোভিয়েট রুশিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। বস্তুতঃ চীনের বর্ত্তমান সজ্বর্ষে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; কম্যুনিষ্টদের নিকট কোথাও একটি সোভিয়েট অস্ত্র দেখা যায় নাই। চীন-সোভিয়েট চুক্তির এই সর্ত্তে পরোক্ষে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ উত্তমরূপেই জানেন যে, বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে চীনের সরকারপক্ষ কখনও কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিতে পারিবে না। আজ অন্য কোনও শক্তি যদি কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষকে সমর্থন করিতে থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া নীরব থাকিবে না। চীনে কম্যুনিষ্টদিগকে দাবাইয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সমর্থনে সেখানে অর্দ্ধ-ফ্যাসিস্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা সে নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিবে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় "আরবের লরেন্স" নামে পরিচিত এক ব্যক্তি মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদিগকে তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে তাহাদিগকে স্বাধীনতার আশ্বাস শুনাইয়াছিল। প্যালেষ্টাইন্‌বাসী এইরূপ একটি মুসলমান সম্প্রদায় তখন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় খলিফার বিরুদ্ধে গিয়াছিল।

এদিকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য টাকারও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইহুদীদের নিকট হাত পাতিবার সময় মিত্রপক্ষ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতিদিয়াছিলেন যে,যুদ্ধের পর তাহারা একটি নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর প্যালেষ্টাইনবাসী স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পাইল বৃটিশের ম্যাণ্ডেট ; আর ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র হইল এই প্যালেষ্টাইন। ম্যাণ্ডেটরী অধিকারের সূত্র ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সকল ঐশ্বর্য্য ক্রমে প্যালেষ্টাইনে পৌঁছায়। আর দলে দলে ইহুদীরা যাইয়া প্যালেষ্টাইনে ভীড় জমায়। রাজনীতিক্ষেত্রে প্যালেষ্টাইন-বাসীর লাভ হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ; আর অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহুদীরা আরবদের নিকট হইতে জমিদারী কিনিয়া আরব কৃষকদিগকে উচ্ছেদ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। আরবদের সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে একটা সাময়িক মীমাংসার ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থায় প্যালেষ্টাইনে নূতন ইহুদীদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া ঐ দেশটি ইহুদী অঞ্চল ও আরব অঞ্চলে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। প্যালেষ্টাইনবাসী আরবরা তাহাদের মাতৃভূমিকে এইভাবে বিভক্ত করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যালেষ্টাইন কতকটা শান্ত ছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পরই প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই বিষয়ে বৃটেন্ আমেরিকার সামান্য মতদ্বৈধ ছিল ; এখন তাহাও দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্যালেষ্টাইনের আরবদের প্রতি মধ্য-প্রাচ্যের সকল মুসলমান রাষ্ট্রই সহানুভূতিসম্পন্ন। কাজেই, বৃটেন মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাজ্যগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিতে চাহে নাই। কিন্তু আমেরিকার পক্ষ হইতে জিদ্ করা হয় যে, প্যালেষ্টাইনে আরও এক লক্ষ ইহুদীর জায়গা করিয়া দিতে হইবে।

নাৎসী-ফ্যাসিস্তদের প্রভুত্বের আমলে ইহুদীরা অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের সকলেই তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনের আরবদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। কোন্ পুরাকালে প্যালেষ্টাইন্ ইহুদীদের বাসভূমি ছিল, সে নজীর দেখানো অর্থহীন।

প্রকৃত কথা এই,সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মধ্য-প্রাচ্যে—বিশেষতঃ প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ঢুকাইয়া একটা বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের উপর বৃটেনের নেকনজরের প্রধান কারণ—উহা সুয়েজখালের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত এবং এংলো-ইরানিয়ান্ তৈল কোম্পানীর পাইপ্ লাইন প্যালেষ্টাইনের হাইফা পর্য্যন্ত আসিয়াছে ; সেখান হইতে এ তৈল জাহাজে ওঠে। সম্প্রতি আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তৈল আহরণের নূতন নূতন অধিকার লাভ করিয়াছে। এই তৈল বহনের জন্যও হাইফা পর্য্যন্ত পাইপ লাইন নির্ম্মিত হইতেছে। কাজেই, প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে ট্রুম্যান-বার্ণস্ কোম্পানীর অত্যধিক আগ্রহ স্বাভাবিক। বৃটেন অপেক্ষা আমেরিকা আরও বেশী সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছে। ইহার কারণ—প্যালেষ্টাইনের পার্শ্ববর্ত্তী ইরাক্, ট্রান্স জর্ডান প্রভৃতি দেশে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বহু পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার এখন নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করা দরকার। এই জন্যই ইহুদীদের সম্পর্কে বৃটেন অপেক্ষা আমেরিকার অন্যায় জিদ্ বেশী।

বল্‌কান্ সমস্যা

পূর্ব্ব ইউরোপে হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুল্‌গেরিয়ায় যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৃটেন ও আমেরিকা তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ঐ সব অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নির্বাচনের ফলে যে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, তাহাকেও উহারা মানিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। ইহা ছাড়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থনৈতিক চুক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকা প্রবল আপত্তি জানাইয়াছে।

বল্‌কান অঞ্চলে যে সব গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগী কোনও ব্যক্তি স্থান পায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সব দেশের অর্থনৈতিকক্ষেত্রে যাহারা প্রধান পাণ্ডা ছিল, তাহারা অনেকেই পরে ফ্যাসিস্ত শক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। কাজেই, ফ্যাসিস্তদের সহযোগী লোকদিগকে তাড়াইবার ফলে বৃটিশ ও মার্কিণ ধনিকদের বহু পুরাতন মিত্র ও সহযোগী ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে। ইহাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টগুলির উপর বৃটেন ও আমেরিকার বিরূপ হইবার প্রধান কারণ।

রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির সহিত রুশিয়ার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এইভাবে অঞ্চলগত ভিত্তিতে যদি অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি আসিবে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বৃটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন্ বলিয়াছেন—Regional economic and commercial pacts should give way to world pacts. ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েট রুশিয়া ইরাণে তৈল আহরণের অধিকার পায় নাই। হয়ত বলা হইবে—ইরাণ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়াকে তৈল আহরণের অধিকার না দিলে অন্যে কি করিবে ? ইহার উত্তর—রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক চুক্তি করিলে অন্যের তাহাতে বলিবার কি আছে ?

এই world pactএর আদর্শ যদি রুশিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রয়োগ করিতে চায়, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ কি বলিবেন ?

সাময়িকী

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—

৫ই নভেম্বর দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় বৃটীশ বাহিনীর ৭ জন অফিসার লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন ভারতীয়—তাহাদের নাম (১) মেজর জেনারেল ব্ল্যাকল্যাণ্ড (২) ব্রিগেডিয়ার হার্ক (৩) লেঃ কঃ স্কট (৪) লেঃ কঃ ষ্টিভেন্সন (৫) লেঃ কঃ নাসির আলি খাঁ (৬) মেজর প্রীতম্ সিং (৭) মেজর বনোয়ারীলাল। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনের জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে পক্ষসমর্থনকারী কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার দিলীপ সিং, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ আলি, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণ আছেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালন করিতেছেন—এড্‌ভোকেট জেনারেল সার এম-পি-এঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়ালস্। আসামী ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিং ধিলন, ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ ও ক্যাপ্টেন সাহগলের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সীট দাখিল করা হইয়াছে।

১৯১৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে ক্যাপ্টেন সা নওয়াজের জন্ম হয়। আজাদ হিন্দ-ফৌজে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি ১১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। তাঁহার পরিবারের ৬২ জন বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করে। দেরাদুনে মিলিটারী ট্রেণিং একাডেমীতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৩৬ সালে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমিতে মণিপুরে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। ক্যাপ্টেন পি-কে সাইগল ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৪০ সালে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। তিনি লাহোর হাইকোর্টের জজ মিঃ অচ্ছুরামের পুত্র। আজাদ-হিন্দ-ফৌজে তিনি কর্ণেল পদে উন্নত হইয়াছিলেন ও উহার অফিসারদের শিক্ষাদান করিতেন। লেঃ ধীলন ১৯১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল লাহোর জেলার আলগনে জন্মগ্রহণ করেন ও দেরাদুনে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে রেগুলার কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনি বিবাহিত, কিন্তু কোন সন্তানাদি নাই। তাঁহার পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী পশু চিকিৎসক। তাহার দুইভাই সরকারী সেনা বিভাগে ও অপর আর এক ভাই ডেপুটী ফরেষ্ট রেঞ্জারের চাকরী করে। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর পতনের পর ১৯৪৫ সালের ১৭ই মে পেগুতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ে তিনি মেজর মোহন সিং কর্ত্তৃক গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে কাজ করিয়াছেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠনের ইতিহাস ও তাহাদের কার্য্যকলাপ একটি অবিস্মরণীয় জাতীয় বাহিনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজাদ হিন্দ-ফৌজের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগের যুদ্ধের অবস্থার কথা মনে আসে। সে সময়ে বৃটিশ শক্তি জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া হইতে সরিয়া আসে। পশ্চাতে রাখিয়া আসে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয়কে—তাহাদের জাপানের হাতে পড়িতে হয়। এতদিন তাহাদের প্রভু ছিল বৃটিশ, তাহার পর হইল জাপানী। ভারতে চলিয়া আসার সময় বৃটিশ সেনা বাহিনীর জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা দানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অসম্মতির ফলে ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বৃটিশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া তাহাদের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাপান তাহার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অসহায় ভারতীয়দিগকে ব্যবহার করিবে, সুভাষচন্দ্র ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি যে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট বলিলে অন্যায় হইবে। ইঙ্গমার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ৯টি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট এই আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লয়। জাপান আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে পরাধীন বাহিনীতে এবং অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্টকে তাঁবেদার গভর্ণমেণ্টে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক গঠিত স্বাধীনতা সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভারতীয়দের দ্বারা ও ভারতীয়দের অর্থে দেশকে বিদেশীর কবল

হইতে মুক্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—মালয়, ব্রহ্ম ও দক্ষিণপূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতীয়দের রক্ষা করা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আজাদ-হিন্দ্-গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল—(১) সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী (২) ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী—নারী সংগঠন (৩) মিঃ এস-এ-আয়েঙ্গার—প্রচার (৪) লেঃ কঃ এ-সি-চ্যাটার্জ্জি—অর্থ। (৫) লেঃ কঃ আজিজআমেদ (৬) লেঃ কঃ এস-এন-ভগৎ (৭) লেঃ কঃ জে কে ভোঁসলে (৮) লেঃ কঃ গুলজারা সিং (৯) লেঃ কঃ এ পি লোকনাথম্ (১০) লেঃ কেঃ এম্ জেড-কিয়ানী (১১) লেঃ কঃ ঈশান কাদ্রি (১২) লেঃ কঃ সা নওয়াজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি (১৩) মিঃ এ এম সহায়—সম্পাদক (১৪) রাসবিহারী বসু—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা (১৫) মঃ করিম গণি (১৬) শ্রীদেবনাথ দাস (১৭) মঃ ডি-এম খান (১৮) মিঃ এ ইয়েলাপ্পা (১৯) মিঃ আই-থিবি (২০) সর্দ্দার ঈশ্বর সিং—পরামর্শদাতা (২১) মিঃ এ-এন-সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

এই প্রসঙ্গে বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গত অধিবেশনে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। তাহাতে বলা হয়—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই কথা জানিতে পারিয়া উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন যে, ১৯৪২ সালে মালয়ে এবং ব্রহ্ম দেশে যে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ গঠিত হইয়াছিল, সেই বাহিনীর বহু সংখ্যক অফিসার ও নরনারী এবং পশ্চিম রণাঙ্গণের কিছু ভারতীয় সৈন্য বিচার অথবা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ও বিদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রহিয়াছেন। যে সময়ে এই ফৌজ গঠিত হয় সে সময়ে ও তাহার পরে ভারতবর্ষ, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং অন্যান্য স্থানে যেরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহার কথা ও তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীর প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের ও যুদ্ধ বন্দীদের ন্যায় আচরণ করা ও যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আরও বহু সুদূরপ্রসারী কারণের কথা এবং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবার অপরাধে (যেরূপ ভ্রান্তপথেই হউক না কেন) যদি এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে একটি শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন ও নূতন ভারতবর্ষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকৃত পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যে তাঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, যদি তাঁহাদিগকে আরও শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা শুধু অযৌক্তিক হইবে না, ইহার ফলে সংখ্যাতীত গৃহে ও সমগ্রভাবে ভারতীয়গণের চিত্তেও বেদনার সঞ্চার হইবে এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হইবে। সুতরাং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী একান্তভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, এই বাহিনীর অফিসার ও নরনারীগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আরও আশা করেন যে, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানের যে সমস্ত অসামরিক ভারতবাসী ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপ উৎপীড়ন বা দণ্ডদান করা হইবে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আরও আশা করেন যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কার্য্য-কলাপের জন্য কোন ভারতীয় সৈনিক বা কোন অসামরিক ভারত-

ক্যাপ্টেন সা নওয়াজ

বাসীকে ইতিপূর্ব্বে যদি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হইবে না।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হইলে তথায় সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী জাপানী হেড কোয়ার্টারের মেজর ফুজিয়ারা পরামর্শ দেন—ভারতীয়গণ যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ মালয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে এক সভা করে ও স্থির হয় যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জাপানী তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইবে না। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মিলন হয়। তাহাতে সিঙ্গাপুর হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিদল ছাড়াও

হংকং, সাংহাই, ও জাপানের প্রবাসী ভারতীয়গণ যোগদান করেন। সেখানে স্থির হয়—পূর্ব্ব এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। তথায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠিত হয় ও তাহার কর্ম্মপরিষদ স্থির হয়। তাহার পর ১৫ই হইতে ২৩শে জুন (১৯৪২) ব্যাংককে এক প্রতিনিধি সম্মিলন হয়। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, বার্মা, বোর্ণিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম হইতে ১০০ প্রতিনিধি তথায় সমবেত হন। তথায় আজাদ-হিন্দ্ আন্দোলনের নিম্নলিখিত মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয়—

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব্ব এসিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণকে লইয়া একটি আজাদ-হিন্দ্-সংঘ গঠন করা হইবে (২) আজাদ-হিন্দ্-সংঘের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও সকল প্রকার

ক্যাপ্টেন ধিলন

পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও উহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসৃত হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র সাধন করিতে হইবে। (৩) পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় বাহিনী হইতে এবং ভারতীয় বেসামরিক জনসাধারণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ গঠন করিতে হইবে (৪) ভারতবর্ষের প্রতি ও এই নবগঠিত আজাদ হিন্দ সংঘের প্রতি জাপানীদের নীতি কি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইতে হইবে।

সংঘের সভাপতি হইলেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও সংঘের প্রধান কর্ম্মস্থল হইল সিঙ্গাপুর। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয় ও পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশে ইহার শাখা সংঘ স্থাপিত হয়। তাহার পর জাপ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সংঘকে তাঁবেদার করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে সফল হয় নাই। ১৯৪৩এর এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি প্রতিনিধি সম্মিলনে স্থির হয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তথায় যাইলে তাঁহার উপর নেতৃত্ব দেওয়া হইবে। ১৯৪৩এর ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌছিলে ৪ঠা জুলাই তাঁহাকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সভাপতি করা হয়। সুভাষচন্দ্র ঐ সময়ে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, আজাদ হিন্দ্-ফৌজই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী। জাপানীদের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিলে ইহা বিভীষণ বাহিনী বলিয়া কুখ্যাত হইবে। ইহার নীতি, কার্য্যকলাপ, নেতৃত্ব—ভারতীয় দেশপ্রেমিকগণ কর্ত্তৃকই চালিত হইবে। জাপানীদের ভারত আক্রমণের অধিকার নাই। কোনরূপ বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব বা একজনও বৈদেশিক সৈন্যকে ভারত ভূমিতে স্বীকার করা হইবে না। জাপানীগণ যদি বলেন যে, তাঁহারা ভারতকে বৃটিশ শক্তির কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করিতে যাইতেছেন, তথাপি আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ তাঁহাদের অন্যায় আক্রমণকারী হিসাবেই গণ্য করিবে। ভারতবর্ষকে যদি বৃটীশের কবল হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে ভারতের একমাত্র নিজস্ব বাহিনীই তাহা করিতে পারে। জাপানীদের সামরিক কৌশল ও নীতির দ্বারা এই ভারতীয় বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারিবে না। জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিলে ইহা পঞ্চম বাহিনী বলিয়া ইতিহাসের কলঙ্কভাগী হইবে। ঐ সময়ে মালয়ে একটি সামরিকশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় ও এক এক দলে ৭ হাজার লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐরূপ বহু দল শিক্ষালাভ করে। ঐ সময়ে অর্থ ভাণ্ডার, সৈন্যবাহিনী, নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ব্যাপক হওয়ায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীন-ভারত-অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট নাম দিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন ও ২৩শে অক্টোবর ঐ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল দেশ সে সময়ে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সকলেই ঐ গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লয়। ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী ঐ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ সময়ে আজাদ-হিন্দ্-সংঘের মালয়ে ৭০টি শাখা, ব্রহ্মদেশে ১০০টি শাখা ও শ্যামে ২৪টি শাখা গঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন, মাঞ্চুকুও, জাপান প্রভৃতি স্থানে ও শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীরা ঐ গভর্ণমেণ্টের জন্য ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে মালয় এই সংঘকে ৪০ লক্ষ টাকা উপহার দেয়। কুয়ালামপুরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়। তথায় মাসিক ৭৫ হাজার ডলার ব্যয় করা হইত। মালয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ২ হাজার একর জমী বাসোপযোগী করা হয়। ব্রহ্মদেশে এই সংঘের অধীনে ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ আক্রমণাত্মক কার্য্য আরম্ভ করে ও ১৮ই মার্চ্চ তাহাদের বাহিনী ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে পদার্পণ করে। ঐ বাহিনীতে ৩টি দল ছিল—(১) সুভাষ দল—৩২০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল সা নওয়াজ (২) গান্ধী দল—২৮০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল ইয়ানং কয়ানি (৩) আজাদ দল—২৮০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল মোহন

ক্যাপ্টেন সাইগল

সিং। তাহা ছাড়া সঙ্গে ৩০০ বাহাদুর দলের সৈন্য ও ১০০ বেসামরিক সাহায্যকারী ছিল। ৩০০০ সৈন্য লইয়া গঠিত নেহরু দল লইয়া অধ্যক্ষ কর্ণেল গুরুবকস্ সিং ধীলন তাহাদের পিছনে ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে—সুভাষচন্দ্র পরদিন ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। তথায় মেজর জেনারেল লোকনাথনের নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্য ও সংঘের সহ-সভাপতি শ্রীযুত জে-এন ভাদুড়ীর উপর অন্যান্য দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়। জাপানীদের পশ্চাদপসরণ ও বৃটীশ কর্ত্তৃক পুনরধিকারের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রেঙ্গুণে কোনরূপ রাহাজানি বা অরাজকতা ছিল না। আজাদ হিন্দ্ সংঘ রেঙ্গুণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়াছিল। ২৮শে মে তারিখে ভাদুড়ী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ সংঘ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সংঘের বহু কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাঁহারা এখন কে কোথায় আছেন, তাহা জানা দুষ্কর হইয়াছে।

১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র ফৌজকে শেষ নির্দ্দেশ দেন—তাহাতে তিনি বলেন—আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকিবে।

বিচার—

গত ৫ই নভেম্বর সকালে দিল্লীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বেলা সওয়া ১০টায় আদালত বসিলে সামরিক আদালতের সভাপতি ও সদস্যগণ শপথগ্রহণ করেন ও আসামী সা নওয়াজ সাইগল ও ধীলনকে আদালতে হাজির করা হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা ও তাহাতে সহায়তা করা—আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত এই সকল অভিযোগ আদালতে আসামীদের নিকট পঠিত হয় ও আসামীগণ প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন। আদালতে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা যায়—দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর আসামীরা তাহাদের আত্মীয় পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই মামলার সকল বিষয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিন সপ্তাহ সময় চাহিলে তাহাতে আপত্তি করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়—সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার সার এন পি এঞ্জিনিয়ারের উদ্বোধন বক্তৃতা ও প্রধান সরকারী সাক্ষী লেঃ ডি সি নাগের জবানবন্দীর পর সময় দেওয়া হইবে। তদনুসারে সার এন পি এঞ্জিনিয়ার উদ্বোধন বক্তৃতা করেন ও জলযোগের পর লেঃ নাগের জবানবন্দী আরম্ভ হয়।

ঐ দিন আদালতে উপস্থিত ৩ জন আসামী ছাড়া ও অপর তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়—(১) ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ (২) সুবেদার সিঙ্গারা সিং (৩) জমাদার ফতে খাঁ। তাহাদের যুদ্ধ করা ছাড়া ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২১ ও ৩২৯ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

সে দিন ২২ বৎসর পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রথম ব্যারিষ্টারের পোষাক পরিয়া আদালতে উপস্থিত হন। সার দলীপ সিং, পণ্ডিত নেহরু, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, আসফ আলি ও ডাঃ কে-এন-কাটজু প্রথম শ্রেণীতে ও ডাক্তার

প্রশান্তকুমার সেন প্রভৃতি পশ্চাতের শ্রেণীতে বসিয়াছিলেন। সকলের ফটো গ্রহণের জন্য সেদিন কিছু সময় দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন লেঃ নাগের জবানবন্দী শেষ না হওয়ায় পর দিন ৬ই নভেম্বরও বিচার চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন কতকগুলি প্রশ্নের বৈধতা লইয়া সরকার পক্ষে সার এন পি এঞ্জিনিয়ারের সহিত আসামী পক্ষের শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইএর বাগবিতণ্ডা হইয়াছিল। ঐদিন তৃতীয় দফার আসামী ক্যাপ্টেন বারহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আসামী পক্ষে ১২৫ জন সাক্ষী আছেন—তন্মধ্যে ঝাঁসীর রাণী সৈন্যদলের অধিনায়িকা ডাঃ মিস লক্ষ্মী অন্যতম।

মিস লক্ষ্মী স্বামীনাথমের বয়স ৩২ বৎসর। তাঁহার পিতা মাদ্রাজে ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৮৪০ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জাপানের হাতে বন্দী হন ও পরে স্বাধীনভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হন। এখন তিনি কোথায় তাহা জানা যায় না। কেহ বলেন, তিনি রেঙ্গুনে থাকিয়া ডাক্তারী করিতেছেন। আবার কেহ বলেন, তিনি গ্রেপ্তার হইয়া দিল্লীর লাল কেল্লার মধ্যেই আছেন।

দেশবাসীর বিক্ষোভ—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্দ্দেশ মত ৫ই নভেম্বর ভারতের সর্ব্বত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যদের মুক্তির দাবী করিয়া সভা ও বিক্ষোভ করা হইয়াছে। ঐ দিন কলিকাতায় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছে তাহা সাধারণত দেখা যায় না। ভারতের প্রায় সকল সহরে সেদিন সভা হইয়াছে ও লোক কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়াছে। মাদ্রাজ-মাদুরায় ঐদিন পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করায় ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। আরও বহু স্থান হইতে ঐ দিন কর্ত্তৃপক্ষের সভা ও মিছিলে বাধা দানের সংবাদ আসিয়াছে।

৫ই নভেম্বর ভারতের প্রায় সকল দৈনিক সংবাদপত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর গঠনের ইতিহাস ও বিবরণ প্রকাশ করায় উহা পাঠ করিয়া দেশবাসীমাত্রই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। সকল সভায় ঐ সকল বিবরণ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। এই সকল দেশপ্রেমিক বীরকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতেছে ও তাহাদের দুস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা চলিতেছে। উক্ত বাহিনীর সদস্য কাপ্তেন রসিদ আলি, জেম ফতে খাঁ ও সুবেদার সিমগর সিং লাল কেল্লায় আটক আছেন। তাঁহাদের বিচারের সময় যাহাতে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন তাহা মিঃ আসফ আলির নিকট পৌছিয়াছে; শ্রীযুত কেশরাম নাইডু প্রমুখ ৫ জন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যকে নাগপুরের নিকট কামটীতে আটক রাখা হইয়াছে—শ্রীযুত নাইডু সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন।

বোম্বাইয়ের বেলগাঁও সহরে একটি বড় পার্কের—জাতীয় বাহিনীর নেতা লেঃ কঃ জগন্নাথ রাও ভোঁসলার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ১৯০৬ সালে ছত্রপতি শিবাজীর বংশে শ্রীযুত ভোঁসলা জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯২৮ সালে সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন ও ১৯৩৭ সালে ক্যাপ্টেন হইয়া সম্রাটের মুকুটোৎসবে যোগদান করেন। সিঙ্গাপুরের দুরবস্থার সময় তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন ও সর্ব্বোচ্চ সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহাকে ব্যাঙ্ককে গ্রেপ্তার করা হয় ও বর্ত্তমানে দিল্লী লাল কিল্লায় রাখা হইয়াছে। তিনি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার বর্ত্তমান শাসকের আত্মীয়। তাঁহার স্ত্রী ও তিন কন্যা বর্ত্তমানে বরোদায় বাস করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রথম সভাপতি রাসবিহারী বসুর নাম শুনা গিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম ও প্রধান ছিলেন। ১৯১২ সালে দিল্লীতে যে দল লর্ড হার্ডিংএর প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনি সেই দলে ছিলেন। তাঁহার সহকর্মী অবোধবিহারী লাল ও মাষ্টার আমীর চাঁদ ১৯১৪-১৫ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাসবিহারীর গ্রেপ্তারের জন্য সে সময় ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ও সর্ব্বত্র তাঁহার ছবি প্রচার করা হয়। কয় বৎসর গোপনে থাকিয়া ১৯১৫ সালে তিনি জাপানে যান। ৮ বৎসর তিনি গোপনে ছিলেন। পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় ৫ খানা গ্রন্থ লিখেন ও ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া-ইন-বণ্ডেজ' পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। টোকিওতে তিনি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া তিনি ভারতে আসেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ও বিজয়লক্ষ্মী—

বহুদিন আমেরিকায় বাস করার পর গত ২রা নভেম্বর ওয়াসিংটনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। ২০ মিনিট উভয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। মিঃ ট্রুম্যান পণ্ডিত জহরলাল

নেহরুর লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতবাসীদের যে নির্য্যাতন চালাইতেছে, সেই কার্য্যে আমেরিকা ঐ সকল সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করায় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় রাজনীতিক নেতার সহিত কোন মার্কিণ রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ হয় নাই। কাজেই এই ঘটনার উপর রাজনীতিক গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে।

গভর্ণরের পদত্যাগ—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি কেসী পদত্যাগ করিয়াছেন ও মিঃ এফ-জে-বারোজ তাঁহার স্থলে নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনে আমাদের কিছু যায় আসে না—কারণ যিনিই গভর্ণর হউন না কেন, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসননীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মিঃ কেসী প্রথম এদেশে আসিয়া আমাদের অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। সে জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না, কারণ তিনি যে ইস্পাতের কাঠামোর অংশ, তাহা কিছুতেই নরম করা যায় না।

কলিকাতায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট—

গত ২ মাস যাবৎ কলিকাতা ও সহরতলীতে এত অধিক-সংখ্যক কারখানায় এত অধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এরূপ ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। যুদ্ধের সময় কারখানার মালিকগণ প্রচুর লাভ করিয়াছে ও ধনী হইয়াছে। সে সময়ে শ্রমিকদিগকে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ায় কারখানার কাজ কমিয়া যাইতেছে। কাজেই ধনীরাও বহু লোককে বিদায় দিতেছে ও লোকের মজুরীর হার কমাইয়া দিতেছে। কিন্তু অন্যপক্ষে খাদ্য-দ্রব্যের দাম যুদ্ধান্তে না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাইতেছে। এ অবস্থায় দরিদ্র শ্রমিকগণের পক্ষে ধর্ম্মঘট করা ছাড়া অন্য গতি নাই। বিদেশী সরকার ধনীদের পক্ষে, কাজেই সে দিক দিয়াও শ্রমিকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এ অবস্থায় দেশে ক্রমে অশান্তি ও অরাজকতা যে বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য সকল সভ্য দেশে সরকার পুনর্গঠন ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া বেকার লোকদিগের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছে। এদেশে পুনর্গঠনের বড় বড় পরিকল্পনার কথাই শুধু শুনা গিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হইতে দেখা যায় না। ডাক্তার মেঘনাদ সাহার মত বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের সময় যাহারা সে কাজে কোটি কোটি টাকা অর্থ ব্যয় করিতে পারিয়াছে, যুদ্ধান্তে প্রজারক্ষার জন্য তাহাদের টাকার অভাব হইয়াছে—একথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল—

গত ৩১শে অক্টোবর ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের ৭১তম জন্মবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর ১৯১৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কংগ্রেসে যোগদান করেন, ১৯২১ সালে তিনি গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩১ সালে তিনি করাচী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। গত ২৫ বৎসর তিনি সর্ব্বত্যাগী ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিপুরে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা উৎসবে সমবেত সুধীগণ

প্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা প্রদান—

এবার একদল মুসলমান বাঙ্গালা দেশে দেবী প্রতিমা বিসর্জ্জন মিছিলে বাধা দান করিয়া নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বরাহনগর আলমবাজার ও বারাকপুরের মত

কলিকাতার অতি নিকটস্থ স্থানে ও বর্দ্ধমানের মত হিন্দুপ্রধান সহরেও সে চেষ্টা হইয়াছে। ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কথা ত স্বতন্ত্র। পুলিস প্রহরী ও পুলিসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কি করিয়া মুসলমান দাঙ্গাকারীরা ঐ সময় বাধা সৃষ্টি করিতে সাহস পায়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কাহাদের চেষ্টায় এই সকল দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত হইলে বহু সত্য প্রকাশ পায়। কিন্তু বর্ত্তমানের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে দেখা যায় না। কাজেই হিন্দু জনগণের পক্ষে এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থা হারানোই স্বাভাবিক।

খড়দহে উৎসব—

গত ১৩ই আশ্বিন রবিবার ২৪ পরগণা খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-জির মন্দিরে দক্ষিণেশ্বরবাসী শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য বাসরের এক অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল দেবমন্দির ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় আছে, সেগুলিকে সংস্কার ও রক্ষা করার কথাও আলোচিত হইয়াছিল। আহ্বানকারী মৃণালবাবুর চেষ্টায় খড়দহের মন্দিরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান হওয়ায় তাঁহাকে সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। সভা শেষে কীর্ত্তনাদির পর শ্যামসুন্দরের প্রসাদে সকলকে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

খড়দহ শ্রীমন্দিরে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

কর্পোরেশনে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী সমিতির পক্ষ হইতে গত ২৬শে অক্টোবর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ৪০টি অভিযোগ সম্বলিত এক আবেদন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ঐ আবেদনে বলা হইয়াছে, অভিযোগগুলি দূর করার ব্যবস্থা না হইলে সকল কর্ম্মচারী একযোগে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থায় যে যে সকল ত্রুটি দেখা যাইতেছে, সেগুলি দূর করিতে হইলে কর্ম্মচারী-দের সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। এই ৪০ দফা অভিযোগ বিষয়ে ভাল করিয়া তদন্তের পর সেগুলি মিটাইবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ সত্যই যদি একদিন ধর্ম্মঘট হয়, তবে কলিকাতা সহরবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। সেজন্য কে দায়ী হইবে?

ব্রহ্মবাসীদের চরম দুরবস্থা—

শ্রীযুত যমুনাদাস জেটা বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট পদে কাজ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি বিমানযোগে ব্রহ্মে যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—ব্রহ্মদেশে এখন কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া কাপড়ের অভাব খুব বেশী। একটা জামার দাম ৮০।৯০ টাকা। একটা লুঙ্গির দাম যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩ টাকা ছিল, এখন তাহা ৪০ টাকা মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। তবে সেখানে এখনও প্রচুর চাল আছে। সেখানে লোকের দারুণ অর্থাভাব, কারণ নোট বা টাকা আর চলে না। গত আড়াই বৎসর জাপানীদের অধীনে থাকিয়া ব্রহ্মের লোক যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, বৃটীশ তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ঐ ভাবে বাটা নষ্ট করায় জনসাধারণ বৃটীশ-বিরোধী হইয়াছে। মোটের উপর ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমানে বাস করা খুবই কষ্টকর হইয়াছে।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতির ভুয়া কথা—

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসন পৃথিবীর সকল পরাধীন ও নির্য্যাতীত দেশকে স্বাধীনতা দিবার কথা ঘোষণা করিয়া এক ১৪ দফা বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। এবার গত ২৭শে অক্টোবর মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুমান আবার ১২ দফা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সেইরূপ বড় বড় কথা বলিয়াছেন।

তাহাতে পৃথিবীর সকল পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে—অথচ কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে যে ইণ্ডোনেসিয়া ও ইণ্ডোচীনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে মার্কিণ টাকা ও লোক দিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করিতেছে—চীনে কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বৃটীশ-পৃষ্ঠপোষিত চিয়াং কাইসেককে মার্কিণ সাহায্য করিতেছে। সর্ব্বত্র এই ভাব দৃষ্টি হওয়ায় কেহ আর মিঃ ট্রুমানের এই সকল বড় বড় কথায় বিশ্বাস কারবে না। যদি কখনও সত্য সত্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়, তখন সেই চেষ্টার উদ্যোগকারীদের পৃথিবীর নির্য্যাতীত জাতিসমূহ অবশ্যই অভিনন্দিত করিবে।

রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসব—

রাওলপিণ্ডির প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমারোহ সহকারে এ বৎসর দুর্গাদেবীর অর্চনা সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালী কালীবাড়ীর সম্পাদক শ্রীযুত শৈলেন আচার্য্য ও সহ-সম্পাদক শ্রীযুত অনিল ঘোষের তত্ত্বাবধানে সমগ্র উৎসবটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। এতৎব্যতীত শ্রীযুত হেম দত্তগুপ্ত, নীলু ঘোষ, চঞ্চল নন্দী ও অরুণ বসুর কার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

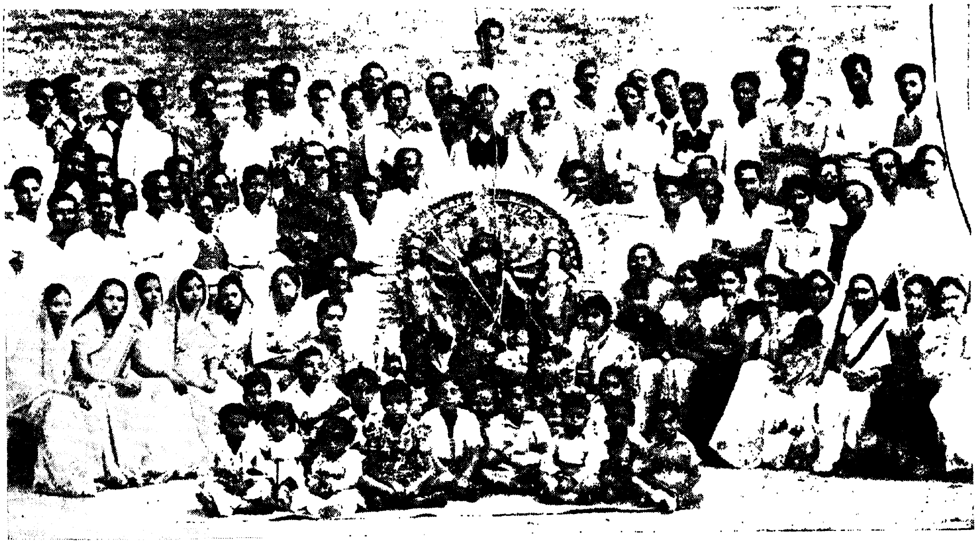

রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসবে সমবেত বাঙ্গালীরা (১৯৪৫)

মালয়ে ভারতীয়দের দুরবস্থা—

মালয়ের কুয়ালালামপুর হইতে স্বামী আত্মারাম শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে তার যোগে জানাইয়াছেন—"সমগ্র মালয়ে ভারতবাসীদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বিশিষ্ট আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মপ্রচারকদের মাসাধিক কাল ধরিয়া নির্জ্জন কক্ষে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহাদের পক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রচলিত মুদ্রা অচল হওয়ায় কিছু করা যাইতেছে না। বন্দীদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করুন, দুর্গতদের সাহায্য দান করুন ও বর্ত্তমান অভাব অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করুন।" শরৎবাবু ঐ সংবাদ বড়লাটকে, বৃটিশ উপনিবেশ সচিবকে ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ খারেকে জানাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুকে ইন্দোনেসিয়ায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কোন ভারতীয়কে কি এ সময়ে তথায় যাইতে দেওয়া হইবে?

কোয়েটায় দুর্গোৎসব—

কোয়েটা প্রবাসী বাঙ্গালীরা এ বৎসরও মহামায়ার পূজা যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম। উপরন্তু কাপড়, চাউল প্রভৃতি পূজার দ্রব্য সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় অনেকেই পূজা সম্বন্ধে এ বৎসর নিরুৎসাহ হন। যাহা হউক কয়েকজন যুবকের উৎসাহ ও চেষ্টায় পূজার সমস্ত অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। হিন্দুস্থান কন্‌ষ্ট্রাক্‌শান কোম্পানীর একাউন্‌টেণ্ট শ্রীযুক্ত এস, এন, বসু পূজাকার্য্যের সংগঠন ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্যে ও শ্রীযুক্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পূজা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও সাহায্য করেন।

আগামী নির্ব্বাচনে কর্ত্তব্য—

বাঙ্গালা দেশে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন আসন্ন এবং শীঘ্রই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনও করিতে হইবে। এ সময়ে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সকল দল মিলিত হইয়া কাজ করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটীর সদস্য ও গঠনমূলক কার্য্যে আস্থাবান শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবার নির্ব্বাচন ব্যাপারে শরৎবাবুর সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—ইহা দেশের পক্ষে সুসংবাদ সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হইয়া যে দল গঠন করিয়াছেন তাহা মৌলবী এ-কে

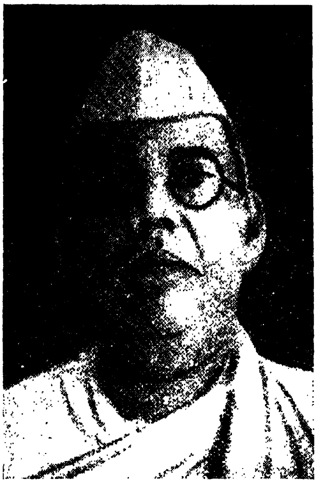

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফজলল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে। সুখের কথা সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমানই এই দলে যোগদান করিয়াছেন ও কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মৌলবী নৌসের আলি সাহেব এ সময়ে কংগ্রেস পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে অগ্রসর হওয়ায় বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের শক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। একদিকে যেমন দেশে কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপত্তি দেখিয়া অকংগ্রেসী দল ভয় পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই প্রায় সকল মুসলমান মুসলেম লীগ দলের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ায় লীগ দলও ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ, সকলেই এখন তাহা মনে করিতেছেন।

পরলোকে চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা টালীগঞ্জ নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে কার্ত্তিক সোমবার ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের নিকট তিনি তাঁহার দানশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ১৯০৪ সালে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হইয়া তিনি ১১৩২ সাল হইতে জমীর উন্নতি বিধানের কাজে প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন ও যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

পরলোকে কিরণচন্দ্র রায়—

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরিচালক সমিতির সম্পাদক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী কিরণচন্দ্র রায় গত ১৯শে অক্টোবর মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যাদবপুর কলেজ ও আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া শিল্প ব্যবসায়ে যেমন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, তেমনি জনগণের সেবায় বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার অগ্রজ মিঃ এস-কে-রায় যাদবপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার শোকসভায় প্রায় ৭৫ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, শ্রীসারদামণি দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই আদর্শে জীবন গঠন করা এবং মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ও সেবার আদর্শপ্রচার করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্রহ্মচারিণী কলিকাতা ১৯নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে একটি মহিলা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদের দ্বারাই উহা পরিচালিত হইতেছে। ইহার কার্য্যাবলী—আশ্রম ও ছাত্রীনিবাস এই দুই বিভাগে পরিচালিত। আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে উৎসব—

ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃতি-মন্দিরে উৎসব

গত ১৮ই অক্টোবর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের জন্মস্থানে এবার সমারোহের সহিত তাঁহার স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় জমীদার ও স্বর্গত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতা হইতে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রভৃতি ঐ উপলক্ষে কমিটী গঠন করা হইয়াছে। কমিটী অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর পাট ঝামটপুরে প্রতিষ্ঠিত মন্দির রক্ষা ও বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা সুরক্ষিত হয়, সেজন্য একটি স্থানীয় কমিটী ও একটি নিখিলবঙ্গ করিবেন।

স্বপ্নরাত্রি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

বহুদিন পরে
ফিরিলাম স্বপ্ন'পরে প্রেয়সীর ঘরে
বিহ্বল আবেশে সুখে যেথা শুক্লারাতি
মাধবীর তৃপ্ত হাসি রাখিয়াছে পাতি'
নির্ম্মল শয্যার পরে, সুষুপ্তা যামিনী,
তার কেন্দ্রে সুপ্তা মোর স্থির সৌদামিনী।
বহুদিন শেষে
হেরিনু বধূরে পুন পরম নিমেষে।
এ মুহূর্ত্তটীরে
চঞ্চল জীবনমাঝে শ্রেষ্ঠ সাধে ঘিরে
কেমনে অক্ষয় রাখি পরিবর্ত্তনের
স্রোত হ'তে দূরে? মোর প্রথম ক্ষণের
ব্যাকুল হৃদয়বার্ত্তা মধুরে গুঞ্জরি,
অনুরাগে হর্ষে লাজে দিব তারে ভরি;
শুধু দুটী কথা—
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি নীরবতা।
সেই ত মোদের
চঞ্চলের মাঝে তবু অনন্তবোধের
পরিণত ক্ষণটুকু, আশা-ভরা হিয়া
গীতচ্ছন্দে মধুগন্ধে হাতে হাত দিয়া
নীরবে বসিয়া থাকা গভীর রাত্রিতে
পাশাপাশি দুটী প্রাণ থাকিবে ধ্বনিতে—
নিদ্রা অবসানে
বধূ মোর সাড়া দিবে অনন্তের কানে।
হয়ত সাধ্বসে
সন্তর্পণে স্পর্শ রাখি খেয়ালের বশে
সহসা চলিয়া যাব, অর্দ্ধ জাগরণে
নিমীলিত শুকতারা উন্মীলন ক্ষণে,
স্পন্দিত শ্রীঅঙ্গখানি সুধীরে বিথারি'
কমল পল্লব সম রহিবে নেহারি
যাত্রা পথটীরে,
রবে মোর স্পর্শরস পুলকেতে ঘিরে।

জীবনে নিবিড়
অনুভবরাশি হেথা করিয়াছে নীড়
জাগিছে নীরব রাত্রি, অতন্দ্র আকাশ
তিলোত্তম এতটুকু পূর্ণের প্রকাশ
টলমল করে যেন নয়নের নীর;
নাহি স্পর্শি তারে মোর পরম রাত্রির

রাখিনু সম্মান
শুধু দৃষ্টিটুকু রেখে গেনু দান।

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোনেশিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ঘুমন্ত সিংহ গা নাড়া দিয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এই সিংহের গর্জ্জনে বিদেশী বণিক জাতির বুক দুরু দুরু করে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাদের আর একবার এম্নি অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল। তখন নিরস্ত্র জনগণের উপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কোনরূপে সে ধাক্কা সামলে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, আজ অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতীচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়ায় গণদেবতার রুদ্ররোষ জ্বলে' উঠেছে। এই দাবানলকে প্রশমিত করবার মত শক্তি আজ আর কারো হাতে নেই। ইন্দোনেশিয়ার এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একই যোগসূত্রে বাধা। ভারতও ইহার সহিত জড়িত এবং এই আন্দোলনের স্রষ্টা ও নেতা। প্রত্যেক ভারতবাসী আজ ইন্দোনেশিয়ার এই গণ-আন্দোলনের গতি অতি আগ্রহ ভরেই লক্ষ্য করছে। তবে এই দ্বীপময় দেশগুলির সব কথা ভারতের সকলের জানা নেই। তারা জানে যে দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি অপরিহার্য্য বস্তু এই দেশগুলি থেকে আসে—চিনি, সাগু, কুইনাইন ও নানা মসলার ডালি আমাদের দ্বারে তারা পৌঁছে দেয়। আরো হয়ত জানে যে এই সকল দেশে একদা ভারতীয় সভ্যতার আলো জ্বলে উঠেছিল। তার বহু নিদর্শন আজও সেখানে অবশিষ্ট আছে। ধর্ম্মে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে এখনও তার ছাপ সুস্পষ্ট।

ওলন্দাজ সামরিক শক্তি যে ইন্দোনেশিয়ার উপর প্রভুত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে. আসলে বৃটীশ ও বৃটীশের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যেরাই সেখানে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ডাচ-সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব বৃটেন স্বেচ্ছায় আপনার কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেই সহানুভূতি যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে রূপান্তরিত হ'তে পারে তা অনেককেই বিস্মিত করবে। তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়ার বিপুল কৃষি, খনিজ, বনজ ও তৈল সম্পদ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি ভাবে ভাগাভাগি করে উপভোগ করে তৎসম্পর্কে ওয়াকেব-হাল হলেই বৃটেনের মাথা ব্যথা ও অন্যান্য শক্তিগুলির পরোক্ষ সমর্থনের হদিস পাওয়া যাবে। অবশ্য একথা খুব সত্য যে, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের শিল্প-স্বার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার বিপুল তৈল সম্পদ, রবার, চা ও আরণ্য-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'লে হল্যাণ্ডকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির সমপর্য্যায়ে নেমে আসতে হবে। কিন্তু এখানে অন্যান্য জাতির স্বার্থও কম নয়। দেশের শতকরা ৪০ ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ ডাচদের হাতে। এখানে বৃটেনের আর্থিক স্বার্থ প্রায় ডাচদের সমতুল্য ; কারণ এখানের বহু চা-বাগানের মালিক ইংরাজ, সুমাত্রার তৈল ও রবার সম্পদের ৪০ ভাগের মালিকও ইংরাজ (ডাচদের সমান)। যুদ্ধের পূর্ব্বে সুমাত্রার অবশিষ্ট ২০ ভাগ তৈল ও রবার সম্পদ ভোগ করত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী ও জাপান।

সুমাত্রা ও যবদ্বীপের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে আমেরিকার বিপুল স্বার্থ জড়িত। এখানকার অরণ্যজাত কাপক কাষ্ঠ আসবাব নির্ম্মাণে বিশেষ উপযোগী। মার্কিণ আসবাব ব্যবসায়ীরা আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য এই কাষ্ঠ ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার রাখে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ মোটর, ছায়াচিত্র ও বেতারযন্ত্র, ইলেকট্রিকের সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবসায়ীরাও এখানে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পেত। কাজেই ইন্দোনেশিয়রা যদি শেতাঙ্গদের শোষণ উচ্ছেদে সমর্থ হয় তা হ'লে ডাচদের তুলনায় বৃটেন বা আমেরিকার কম ক্ষতি হবে না।

এই পটভূমিকায় ইন্দোনেশিয়ার গণজাগরণ ও পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রতিরোধের বিচার করতে হবে। তার আগে প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়া বা ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সেলিবিস, মাদুরা, বালি, লম্বক, ফ্লোরেস, মলুক্কাস, এবং বোর্ণিও নিউগিনি ও টিমোর দ্বীপের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এদের মোট আয়তন প্রায় ৭৩৫২৬৭৯ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা সাত কোটী। (হল্যাণ্ডের মোট ভূমির পরিমাণ ১২৭১২ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৯০ লক্ষ)। এই ইন্দোনেশিয়া নামটার পেছনেও এক ইতিহাস আছে। ডাচরা এই সকল দ্বীপের সরকারী নাম দিয়েছেন 'নেডারল্যাণ্ড্স্ ইণ্ডি'—ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে এই নাম হয়েছে 'ডাচ-ইষ্ট-ইণ্ডিজ'। ডাচরাও এই সকল দ্বীপের কথা উল্লেখ করবার সময়, বিশেষত যখন তারা যবদ্বীপের কথা উল্লেখ করে তখন সংক্ষেপে বলে 'ইণ্ডি' বা 'ইণ্ডিয়া'। ভারতবর্ষকে তারা বলে 'বুর-ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ 'ফোর-ইণ্ডিয়া'। তার অর্থ হ'ল 'প্রথম ভারত'। তাতে ভয়ানক অসুবিধা হত। সেইজন্য গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ডাচ লেখক ডাউয়েস ডেকার এর নাম দেন 'ইনসুল-ইণ্ডিয়া' বা দ্বীপময় ভারত। তারপর শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মাণ পণ্ডিত এ-বাষ্টিনএর গ্রীক অনুবাদ করে নাম

রাখলেন 'ইণ্ডোনেশিয়া'। এর পর থেকে ডাচ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, বৃটীশ মার্কিণ প্রভৃতি লেখক ও পণ্ডিতগণ এই দ্বীপময় দেশের এই সংক্ষিপ্ত নামটী ব্যবহার করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে এই নামটাই চলিত হয়ে গেল।

ইণ্ডোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে সুমাত্রায় য়্যাকিনীজ, যবদ্বীপে সুন্দানীজ, লম্বকে সাসাক, সেলিবিসে মেনাডোনিস, বোর্ণিওতে দয়াক এবং নিউগিনিতে পাপুয়ান জাতির বসবাস। এদের তিন দলে ভাগ করা যায়—ইউরোপীয়ান, আদিম ও বিদেশী প্রাচ্যবাসী। জাতিগত ভাবে তাদের মালয়ী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দ্বীপের কথা ভাষায় বিভিন্নতা সত্বেও সকল দ্বীপেই মালয় ভাষায় কথা বলা চলে। ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানী ভাষার মত বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা মালয় ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। ইণ্ডোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলেরই নয়নানন্দকর। প্রকৃতি এখানে যেন তার রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই ইণ্ডোনেশিয়ার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়েছে। এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র এবং উর্ব্বরতার গুণে এখানকার মাটীতে সোনা ফলে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্যও এর এক পরম আকর্ষণ। বালি ও যবদ্বীপে রমণীয় মন্দির সমূহ দর্শকদের বিস্মিত করে।

ইন্দোনেশিয়ার কৃষি সম্পদও অতুলনীয়। যবদ্বীপ পৃথিবীর ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, কিউবা দ্বীপই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশ। তবে কুইনাইন উৎপাদনে যবদ্বীপেরই স্থান প্রথম। এর সঙ্গে রবার, পেট্রল, তামাক, চা ও কফি তো আছেই। চালই এ দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

এই অপরিমেয় সম্পদের ভাণ্ডার হওয়ায় ইন্দোনেশিয়া খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ থেকেই বিদেশী শক্তিগুলির নিকট পরম লোভনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতীয়গণ ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। সেখানে বিভিন্ন দ্বীপে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তোত্তরবংশীয় রাজা শ্রীবিজয়, সুমাত্রার পালেম্বাংএ রাজধানী স্থাপন করে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপাবলী ও মালয় উপদ্বীপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। যবদ্বীপেও বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ বংশের রাজন্যগণ রাজত্ব করেন। যবদ্বীপের নৌবাহিনী একাধিকবার কাম্বোডিয়ার উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই যবদ্বীপের কোন এক রাজা এক শক্তিশালী নৌবাহিনী পাঠিয়ে চীনের অমিতপরাক্রম রাজার নিকট কর আদায় করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের শক্তি হ্রাস পায় এবং মুসলমান বিজেতারা রাজ্য স্থাপন করে' বালি ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্বীপের অধিবাসীকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। কেবল বালি দ্বীপের অধিবাসীরাই হিন্দুত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আজও ইন্দোনেশিয়ানগণ তাই ধর্ম্মে-মুসলমান হলেও কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা হিন্দু। তাদের নাম-করণেও মুসলমান ও সংস্কৃতের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করেই আজও তাদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক রচিত হয়। বর্ত্তমান ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের পরিচালক তাঁর সুকর্ণ হিন্দু নাম ধারণ করলেও ধর্ম্মে তিনি মুসলমান। ষোড়শ শতাব্দীতে আবার মুসলমানদের আধিপত্য নষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা মসলার অন্বেষণে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করতে আসে। তাদের সঙ্গে আসে খৃষ্টীয় পাদরীর দল। এই সকল পাদরী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তারে বিফল হলেও বণিকগণ অল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে বসে। তবে তাদের এই প্রাধান্যও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পরে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা এসে তাদের স্থান গ্রহণ করে। অবশেষে ওলন্দাজরা ইংরাজদেরও টেক্কা দেয়। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা ভারতে ইংরাজদের ধরণে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। এই কোম্পানী প্রায় দুই শতাব্দীকাল দেশের শাসন পরিচালনা করে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ

... সকল ৪র্থ পাতায় ...

পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

মস্কোতে Titiana Sevryukova ৪৮ ফিট ১০ ইঞ্চি দূরে লোহার বল নিক্ষেপ করে মেয়েদের মধ্যে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বে জার্ম্মান মহিলা Gisela Manetmcyerএর ৪৬ ফিট ২ ইঞ্চির রেকর্ডই পৃথিবীর রেকর্ড ছিল।

ওয়াটার পোলো ঃ

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আমেরিকান সৈনিকদের স্নানাগারে একটি ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা হয়েছিল। হাটখোলা দল এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। লীগের দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কলেজ স্কোয়ার এস সি। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকান এবং বৃটিশ সার্ভিস টীমও যোগদান করেছিল। ইউ এস আর্মির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত

...অংশগ্রহণ করবে। খেলার তালিকাটি এইরূপ—(১) অক্টোবর ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখে নর্থ জোনের সঙ্গে। (২) নভেম্বর ১, ২ এবং ৩ তারিখে প্রিন্সেস একাদশের সঙ্গে। (৩) ৬, ৭, এবং ৮ ওয়েষ্ট জোনের সঙ্গে। (৪) ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে। (৫) ১৫ এবং ১৬ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সম্মেলিত দলের সঙ্গে (৬) কলকাতা—২১, ২২ এবং ২৩ ইষ্টজোনের সঙ্গে। (৭) ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ভারতীয় একাদশের সঙ্গে। (৮) মাদ্রাজ—ডিসেম্বর ৩, ৪ এবং ৫ সাউথজোনের সঙ্গে। (৯) ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ভারতীয় একাদশ দলের সঙ্গে। এই দলে আছেন—এ এল হ্যাসেট (ক্যাপটেন), কে আর মিলার (ভাইস ক্যাপটেন), ডি কে কারমোদী, সি জি পিপার, জে পেট্টিফোর্ড, আর এম ষ্ট্যানফোর্ড, আর এস হুইটিংটন, সি ডি ব্রেমনার এ ডবলউ রোপার, জে এ ওয়ার্কম্যান, আর এস ইলিস, এস জি সিসমে, সি এফ প্রাইস, ডি আর ক্রিষ্টোফানী এবং ই এ উইলিয়মস।

অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দুটি খেলায় যোগদান ক'রে খেলা ড্র করেছে।

ফলাফল—

নর্থ জোন—৪১০ ও ১০৩ (৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়ান—৩৫১

লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে অষ্ট্রেলিয়ান দল উত্তরাঞ্চলের সম্মেলিত দলের সঙ্গে তাদের প্রথম খেলাটি ড্র করেছে। একদিকে ভ্রমণের পরিশ্রম এবং অন্যদিকে মিলার এবং ক্রিষ্টোফানির অসুস্থতার জন্য তাঁরা খেলায় ভাল করে যোগদান করতে পারলেন না। এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করা যায় না। নর্থজোনের ব্যাটিংয়ে সাফল্য দেখালেন আবদুল হাফিজ ১৭৩ রান ক'রে এবং ইমতিয়াজ ১৩৮ রাণ ক'রে নট আউট থেকে। ক্রিষ্টোফানী ৫৮ রানে ৪টে উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংসে ৩৫১ রাণ উঠল। রাণ হিসাবে হ্যাসেটের ৭৩ এবং পেপারের রাণ উল্লেখযোগ্য। আবদুল হাফিজ ১১৫ রাণে ৫টা উইকেট পেলেন।

প্রথম ইনিংসের ৫৯ রাণে অগ্রগামী থেকে নর্থ জোন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো এবং চায়ের পূর্ব্বে একঘণ্টার মধ্যেই ৬১ রাণে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নর্থজোনের ৭ উইকেটে ১০৩ রাণ উঠলে খেলাটি ড্র হ'ল। পেপার ৪৫ রাণ দিয়ে ৫টা উইকেট পেলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নতুন বউ"—২॥০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "স্বপ্ন হলো সত্যি"—১৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বন্দী"—২৲
শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মীরা"—১৷৵০
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "পরকীয়া"—২॥০, "বিপ্লবী তরুণী"—৩৲
অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "এবার অবগুণ্ঠন খোল"—২॥০
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কিশোর রামায়ণ"—১॥০
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রক্ত-রাখী"—৩৲
কমলাকান্ত প্রণীত উপন্যাস "জনকজননীজননী"—২॥০
নরেন্দ্র দেব প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সুহাসিনী"—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার প্রণীত উপন্যাস "প্রত্যাখ্যান"—২॥০
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ধূসর পথের ধূলা"—২৲
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কাশবনের কন্যা"—২৷০
প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "জাগেনি যে-নীতি"—৩৲
স্বামী বেদানন্দ প্রণীত "প্রতিজ্ঞা"—৷০
রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত উপন্যাস "শতাব্দী"—৩॥০
গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "পার্শ্বনাক"—॥৵০
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গল্প-সংগ্রহ "শরতের ফুল"—২॥০

ষাণ্মাষিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩॥৵০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাঘ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালীর শিক্ষা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

আমি শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষক নই ; আমার পক্ষে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তো অনধিকার চর্চ্চা, কিন্তু নিছক সত্য প্রকাশ করার অধিকার াকলেরই আছে।

আমি একজন পুলিশ কর্ম্মচারী। চল্‌তি ভাষায় বল্‌তে গেলে লোকে ৃসে বলবে "তোমার আবার এ রোগ কেন?" নাম বদ্‌লে অথবা নামীতে কাজ সারলে কোন কথাই উঠ্‌তো না কিন্তু আত্ম-পরিচয় না বার মতন কোন যথার্থ কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষ যখন নিজের ছে আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে তখনই সে পাঁচজনের কাছে মাথা ট করে দাঁড়ায়।

আমার পরিচয়টা দেওয়ার একটু দরকারও আছে, কারণ আমার জ্ঞতা লাভ হয়েছিল এই বিভাগের কয়েকটী চাকরীতে কর্ম্মচারী াগ সম্পর্কে। অনেকে হয় তো বলবেন, এই বিভাগে ভাল লোক ী করতে যায় না। ভাল লোক বল্‌তে কি বোঝেন জানি না, বদ্যালয়ের ছাপমারা (Graduate) ভদ্রবংশীয় ছেলেরা এই বিভাগে র আগেই খারাপ হয়ে যায় না নিশ্চয়ই। যাক্ এ আমার আলোচ্য নয়।

আমাদের Enforcement বিভাগে কয়েকটী লোক নেওয়া হবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, ২৫ বছরের নীচে Graduate ছেলে চাই। আবেদনপত্র আস্‌তে স্বরু হল, শেষ দিন উত্তীর্ণ হতে দেখা গেল বারশ প্রার্থী, অথচ চাক্‌রী মাত্র কুড়িটি। এবার বাছাই করার পালা। নির্ব্বাচকদের কাজ বড় সহজ নয়। লটারী করার যদি নিয়ম থাক্‌তো, তা হলে কাজটা অতি সহজেই সারা যেতো ; আর ফলাফলের দিক দিয়ে যে খুব বেশী তফাৎ হত, তা মনে হয় না।

আবেদনপত্রগুলি প্রথমে পরীক্ষা হল, বিজ্ঞাপন মাফিক সমস্ত খবরাখবর দিতে ভুলেছেন কজন, কজনের বয়স বেশী হয়েছে ইত্যাদি। প্রথম সোপানে হড়্‌কে গেলেন প্রায় চারশ। প্রত্যেক দরখাস্তের মধ্যে কত আশা জড়িত আছে। দরখাস্ত পাঠিয়েই কত মনে রঙ্গীণ ছবি ভেসে উঠেছে—কেহ বা আল্‌নাস্‌কারের মতন দিবাস্বপ্ন দেখেছেন। এতগুলি ছেলের জমাট দীর্ঘশ্বাসের কথা মনে করে কচ কচ করে নামগুলো কাট্‌তে দুঃখ যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু উপায়।

পুলিশ বিভাগের কাজে বেশ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, ডানপিটে অর্থাৎ শক্তসমর্থ হওয়া নিতান্ত দরকার। গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করেছেন—

নিম্নতম মাপ হওয়া চাই, লম্বায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি আর বুক ৩০ ইঞ্চি। মাপটা যে খুব উঁচুতে রাখা হয়েছে তা বলা চলে না। চেহারার একটা কদর আছে, তাল পাতার সিপাই দিয়ে কাজ চলে না। বাঙ্গালীর ছেলেকে গায়ের জামা খুলে মাপকাঠির সামনে দাঁড় করলেই তার শরীরের দৈন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা যায় কিন্তু এখানে তা চলে না। দ্বিতীয় সোপানে পার হয়ে বাকি রইলেন মাত্র শ খানেক।

অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করার জন্য একটী নির্ব্বাচক কমিটি বসেছিল, আর আমি ছিলাম তারই একজন সদস্য। আমরা প্রত্যেক প্রার্থীকে ছোট দুএকটী মৌখিক প্রশ্ন করে তাদের মানসিক পরিণতির পরিচয় নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

আমাদের কয়েকটী প্রশ্ন ও বিভিন্ন প্রকারের উত্তর যা পেয়েছিলাম তাই নীচে উদ্ধৃত করছি। আপনারা ভুলে যাবেন না যে ছেলেরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে Graduate—এদের মধ্যে M. A. ও Law পাশ করাও ছিলেন। বাঙ্গালী ছেলেদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা অনেক শুনেছি এবং দেখেওছি। সামরিক বিভাগের এক ইস্তাহারে কয়েকটী উদাহরণও দেখেছিলাম। তবে এক জায়গায় একসঙ্গে এতগুলি ছেলেকে দেখবার সুযোগ খুব বেশী হয়নি। অনেকে হয় তো বলবেন, এসব কিছু নূতন কথা নয়। নূতনত্বের অভাব না থাকতে পারে কিন্তু যখন সকলে জেনে শুনে কোন রকম প্রতিকারের চেষ্টা করেন না তখনই বল্‌তে হবে এ বিষয়ের বহুল প্রচার ও আলোচনা হয়নি এবং হওয়া দরকার।

আমরা প্রথমে কর্ম্মপ্রার্থীদের বয়স জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনার বয়স কত—এ প্রশ্নের মধ্যে আশা করি কোন জটিলতা খুঁজে পাবেন না, কিন্তু উত্তর কি পেয়েছিলাম তাই দেখুন। এই ২৩ কি ২৪ হবে; ঠিক বল্‌তে পারছি না, দরখাস্তে লেখা আছে; ১৯৩৭ সালে ১লা মার্চ্চ ১৬ বৎসর ছিল; Matriculation certificateএ লেখা আছে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "বয়স কত তা যখন সঠিক জানা নেই, কোন সালে জন্ম আশা করি বল্‌তে পারবেন।" "১৯২২ বা ১৯২৩ হবে; এখন ২৩ বছর বয়স হিসেব করে সাল বল্‌তে পারি; (এই উত্তর-দাতাকে হিসেব করতে বলায় বেশ খানিকটা পরে উত্তর পাওয়া গেল—) ১৯২১ হবে আমার ঠিক মনে নাই।"

পাড়াগাঁয় অনেক বৃদ্ধকে বয়স জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি। এই ত্রিশ কি চল্লিশ হবে, আবার কেহ বলেছে শ্যামবাবুর ছেলে রতন আর আমি ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, রতনকে জিজ্ঞাসা করলে আমার বয়স জান্‌তে পারবেন; আমি যখন ছোট ছিলাম গ্রামে মড়ক লেগেছিল, তা দেখুন কত বছর হবে; তা বাবু, গরীব মানুষ কুষ্টি তো নেই, কত আর হবে বছর ৩৫ হবে; কত আর হবে এই সবে দু একটা দাঁত পড়া সুরু করেছে।

আমাদের অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনে বয়সের বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাদের অল্প-পরিসর আবেষ্টনীর মধ্যে দু একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা ঘটে, তা তাদের মনে স্থায়ী হয়ে এঁকে থাকে আর সেইগুলিই হয় জীবনের এক একটি ঘাঁটি। এদের মধ্যে অনেকেই হয় তো কুড়ি পর্য্যন্ত গুনতেই জানে না, এদের পক্ষে হিসেব করে নিজের বয়স বল্‌তে না পারায় কোন লজ্জার ব্যাপার নেই; কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যখন উল্লিখিত উত্তর পাই তখন তাদের শিক্ষার খুব তারিফ করতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নিজের বয়স না জানা বা তা বল্‌তে না পারার সঙ্গে শিক্ষার অভাব বা ত্রুটী কোথায় হল। আমি বল্‌বো, যথেষ্ট। এরা সকলেই দরখাস্ত করার সময় বয়স উল্লেখ করেছেন এবং সকলেই যখন চাকুরী লক্ষ্য করেই লেখাপড়া করেছেন তাদের অন্ততঃ কত বয়স হল এবং কতদিন পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীর বয়স থাকে—এটুকু জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন করা হয়েছিল—Enforcement বিভাগ বল্‌তে কি বোঝেন? উত্তরের বহর দেখুন। উত্তর এল, "তদন্ত বিভাগ; লোক কম পড়েছে তাই লোক নিয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে; Black market বন্ধ করা হবে; Enforce করতে হবে।" এইরূপ উত্তরের পর শুধু Enforce কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় জবাব পেলাম "To force অর্থাৎ force করা।"

আপনি আজকাল কি করছেন—এ প্রশ্নের উত্তরে যারা দু এক বছর নিষ্কর্ম্মা বসে আছেন উত্তর দিলেন Privateএ M. A. পড়ছি। এদের ভয় কিছু করছি না বল্‌লে ক্ষতি হতে পারে। সত্যকে ঢাকতে মিথ্যার আশ্রয় নিলেই বিপদ। Modern Historyতে M. A. পড়া ছেলে আমাদের নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন "First World War ১৯১৬ সালে শেষ হয়েছিল" এরূপ উত্তর পাবার পর একে বাদ দিতে আমাদের দ্বিধা হয়নি।

চীন দেশের আজকালকার রাজধানীরও নাম অনেকেই বলতে পারেন নি। কিন্তু চরম উত্তর পেয়েছিলাম "ইংলণ্ডের রাজধানী বার্কিংহাম"। এর পরেও আশাকরি আর উদাহরণ দেবার দরকার হবে না।

আরও কয়েকটী প্রশ্নের চমৎকার উত্তরে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল এবং রাগ করে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কি ভূগোল পড়েন নি? উত্তর পেলাম "তা ছোট বেলায় পড়েছিলাম, এখন কি আর মনে আছে"? এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পর আমাদের বাঙ্গালী যুবক উত্তর দিলেন—ভূগোল ভুলে গেছেন। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য, ছেলেরা নির্দ্ধারিত পুস্তকাবলীর বাইরে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ সুবিধা পায় নাই, প্রবৃত্তি ছিল কিনা জানি না—অন্ততঃ সেরূপ নির্দ্দেশ কোনদিন সে পায় নাই তা ঠিক। আমাদের বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব। একদিকে আমরা স্বদেশ-বাসীদের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতা দেখে গর্ব্ব অনুভব করি, আবার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়ি।

আমরা যখন বাজারে কোন জিনিষ কিনতে যাই—প্রথমেই কোথায় তৈরী তাই দেখি। ব্রিটিশ, আমেরিকান অথবা জার্ম্মান হলে চোখ বুঁজে ধরে নিই জিনিষটী ভাল, জাপানী অর্থে বুঝি সস্তা,খেলো ও হাল্‌কা—আর দেশী হলে ভাল করে পরীক্ষা করি। এক এক দেশের ছাপের কত মূল্য। মালের বেলায় দেশ হিসেবে তারতম্য দেখি—তেমনই এক এক দেশের শিক্ষারও আদর অনাদর আছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের বাজার দর যে কত কম, তা সকলেই জানেন।' যুদ্ধের আগে ১০।১৫৲ টাকায় বহু Graduate ছেলে পাওয়া যেতো, এখনও যে খুব দর বেড়েছে বলা চলে না। অবশ্যই বাজার দর আমদানী ও চাহিদার উপর নির্ভর করে, কিন্তু যখন কোন ছেলেকে ছাপ মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়—সকলেই আশা করেন "ছেলেটী পণ্ডিত না হলেও মূর্খ নয়।"

কিন্তু আসলে কি দেখতে পাই? বাছাই করার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, ভাল জিনিষটী সবাই চান, ফলে দাঁড়ায় অকেজো অথবা তদনুরূপ ছেলেরা দোরে দোরে ঘুরে বেড়ান। কর্ম্মহীন যুবকদের সংখ্যা বেড়েই চল্লো, অথচ ওই ছাপটুকুর জন্য কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কাজে যোগ দিতে পারলে না।

কেরাণীগিরিও যখন জুটলো না, বাকি রইলো মাষ্টারী। স্কুলের শিক্ষকদের স্থান আমাদের দুর্ভাগা দেশে কেরাণীদেরও নীচে। বেশীর ভাগ স্কুল-মাষ্টার আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছেন। সই করে রসিদ দেন ৫০৲ টাকার, আসলে পান হয় তো ৩০৲, তাও প্রত্যেক মাসে নয়। প্রাইভেট স্কুলের চাকরীর এই অবস্থা। বলুন, এ চাকরী নেহাৎ না ঠেক্‌লে কে করবে?

সর্ব্বত্র বিতাড়িত, বিফলমনোরথ, অসন্তুষ্ট, অর্দ্ধভুক্ত, শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? এর ফল—আমাদের শিক্ষার দিন দিন অবনতি। অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলেরা জাতির গৌরব না হয়ে হচ্ছে বোঝা। এদের ফেলাও যাবে না, অথচ কাজে লাগানোরও উপায় নেই; এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? আমাদের শিক্ষাকর্ত্তারা কি কিছু করবেন না? এইখানেই শেষ করলে হয়তো ভাল করতাম, কিন্তু আনুসঙ্গিক আর দু একটা কথা না বলে পারছি না। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—স্কুল-মাষ্টারদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন করা। তাদের খেয়ে পরে বাঁচবার মতন বেতন দেওয়া; শুধু তাই নয়, এমন বেতন দিতে হবে যাতে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত লোক আকর্ষিত হতে পারে। জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে ছেলেমেয়েদের উপর, তাদের গড়ে তুলতে কার্পণ্য করতে গেলেই ফল হবে বিষময় এবং হচ্ছেও তাই।

অনেকে বলবেন পয়সার অভাব, আমি বলবো এ ভুল আমাদের ভাঙ্গতেই হবে। সব ছেড়ে পয়সা ঢালতে হবে শিক্ষার জন্য। শিক্ষা বিস্তার হল প্রথম, অন্যান্য কাজ হচ্ছে পরে। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে পারলে পরাধীনতার কলঙ্ক মুছে ফেল্‌তে বেশী দিন লাগবে না। তা বলে, শিক্ষাবিস্তার মানে—কুশিক্ষা বিস্তার নয়, তার চাইতে অশিক্ষা ভাল।

এর পর বদলাতে হবে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চল্‌তি প্রথা, Graduate হতেই হবে। Graduate না হলে কি মানুষ হয় না। এ মোহ কেটে যাবার সময় এসেছে, বিশেষ করে যখন পাশ করেই চাকুরী জোটে না। জীবনের এতগুলি বছর অকেজো পড়াশুনায় নষ্ট না করে আগে থেকেই কাজে লাগবার দিকে মন দিতে হবে। কেরাণীগিরিতে B.A. পাশ করার দরকার হয় না। এই পাশই কর্ম্মপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। B.A. পাশ শুনলেই নিয়োগ কর্ত্তার মনে হয় "এ ছোক্‌রা বেশীদিন টেক্‌বে না।"

আমার অফিসের একজন কেরাণীর ভাই B.Sc পাশ করে নানান জায়গায় চেষ্টা করে চাকরী পেলে না। ২।৩ বছর এ ভাবে কেটে যাবার পর বয়স যখন প্রায় পার হয়ে যায়, আমাকে ধরে বসলে। ছেলেটীর ভাগ্যদেবী এবার সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ৪।৫টী চাকরী খালি হতে তাকে নিয়ে নিলাম—বেতন ৪৫৲ টাকা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা সুরু হল। অনুরোধে পড়ে প্রথম কয়েকদিন আবেদন পত্রগুলি সুপারিশ লিখে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি সুরু হল যে বাধ্য হয়ে বল্লাম "তোমার একাজে মন লাগ্‌ছে না, তুমি সরে পড়।" B.Sc পাশ ছেলের কাছে উন্নত ধরণের কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, কয়েক মাস তাকে বৃথা মাসহারা দেওয়া হল। অথচ Matric পাশ ছেলে নিলে সে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যেতো।

আমাদের চাই আগে থেকে আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে ভাল ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। কয়েক বছর আগে, মনে পড়ে একটী প্রস্তাব হয়েছিল—Universityতে পড়বার যোগত্যামূলক আর একটী পরীক্ষা করা দরকার। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু আজ যদি কেহ নিয়ম করে দেয় যে কেরাণীগিরিতে Matric পাশ ছেলে ছাড়া অধিকতর শিক্ষিত ছাত্র নেওয়া হবে না, দেশের শত আপত্তি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অর্দ্ধেক হয়ে যাবে।

আমাদের দেখ্‌তে হবে ছেলেরা যে শিক্ষা পাবে তা যেন তাদের ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগে। Mathematicsএ M.A. পাশ করা ছেলে কোন দিকে কিছু না করতে পেরে ল পাশ করে অধমতারণ উকিল হয়ে বস্‌লেন। তার এতদিনকার সাধনা সব জলে ভেসে গেল। আগে থেকে একটা উদ্দেশ্য ঠিক না করে শিক্ষা দিলেই বাঙ্গালীর অনতিদীর্ঘ আয়ুকালের অতি মূল্যবান অংশ বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকে বলবেন General Educationএর একটা দাম আছে। General Education বলতে B.A. বা B.Sc. পাশ বোঝায় না, আর তার নমুনা তো দেখলেন। Matric পরীক্ষাতেই General Education শেষ করতে হবে।

আর তা করা সম্ভব হবে,যখন আমরা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ভুলে দিতে পারবো। দোভাষী হতে যেয়ে আমরা কোন ভাষাই শিখি না। বাঙ্গালা মাতৃভাষা। অতএব জন্মাবধি পণ্ডিত। বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীর দৈন্য সব চেয়ে বেশী। বাঙ্গালী অন্ততঃ ইংরাজি-জানা বাঙ্গালী বাঙ্গালা জানে না বল্‌লে খুব ভুল বলা হবে না। সে ইঙ্গ-বঙ্গ খিঁচুড়ি ছাড়া কথা বলতে বা লিখ্‌তে পারে না। আর ইংরাজীর তো কথাই নেই, ইংরাজ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর জেলার (District) কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (High English School) প্রধানশিক্ষক মহাশয় (Head Master) জেলা হাকিমের (District Magistrate) পরিদর্শন উপলক্ষে একটী অভিনন্দনপত্র (Address) ইংরাজীতে রচনা করে প্রকাণ্ড সভায় পাঠ করেন। ইংরাজ হাকিম এই অদ্ভুত সাহিত্য রচনা সযত্নে রেখে দিয়েছেন এবং নিজের বন্ধুবান্ধব মহলে তা শুনিয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন। [Bracketএ ইংরাজী কথাগুলি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে!] আমি তাঁকে একদিন বলেছিলাম "দয়া

করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের কাছে এর নমুনা পাঠিয়ে দিন।" তিনি রাজি হলেন না, বললেন "মাষ্টার মশায় ভাল লোক, তাঁর এবং তাঁর স্কুলের ক্ষতি হতে পারে।" অকাট্য যুক্তি, কিন্তু কত শত ছাত্রের যে কত ক্ষতি হচ্ছে বা হবে, তা ভেবে দেখুন। ইংরাজি কি আমাদের সকলকেই শিখ্‌তে হবে? চল্লিশ কোটীর মধ্যে ১ কোটী লোক ইংরাজী জানেন কিনা সন্দেহ, তাদের চল্‌ছে কি করে? অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা না করে কি মানুষ বলে গণ্য হচ্ছে না, বা তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকছে। যাদের দরকার, তারা শিখুন, আপত্তি কি? এই ইংরাজীর উপর জোর দিতে গিয়ে ছেলেরা যে সময় ও উদ্যম নষ্ট করছে তার বদলে তারা কি ফল লাভ করছে?

Matriculation পরীক্ষায় বঙ্গ ভাষার উপর খানিকটা জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল কিছুই হয় নি, হবেও না—যতদিন ইংরাজী একেবারে বর্জ্জন না করা হচ্ছে।

আমি যে কয়টি কথার অবতারণা করেছি তা একেবারেই নূতন নয়, অনেকবারই কথা উঠেছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফল কিছুই হয় নি।

এই ধ্বংসলীলা শেষ হওয়ার পর নূতন করে গড়ার যুগ এসেছে, চারিদিকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করে স্বাভাবিক করে গড়ে তোলার সময় কি এখনও হয় নি?

পশ্চাতের ধূলি

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

(২)

ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃহৎ সরীসৃপের মত ধীর গতিতে গাড়ীখানা বাহির হইয়া গেল, প্ল্যাটফরমের সেই জনস্রোত যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। অমর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, সেই শীতে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে প্ল্যাটফরমের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে ভিড় না থাকিলেও ষ্টেশনে জনতা হ্রাস পায় নাই। অন্যান্য প্ল্যাটফরমে আরও গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই একটুখানি নির্জ্জনতার অবকাশে অমর সেই বিরাট বিশৃঙ্খলা অনুমান করিবার চেষ্টা করিল।

সহর খালি করিয়া অবলা ও শিশুদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সাধ্যমত সকলেই মাতা, স্ত্রী ও শিশুপুত্রদের দূরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিল, জীবিকার শাসনে নিজেরা রহিয়া গেলেন; বিপদের দিনে কোন অভাবিতপূর্ব্ব উপায়ে প্রাণ লইয়া পলাইবেন এই আশা সম্বল করিয়া। কিন্তু এইখানেই কি কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? সমগ্র বিশ্বের পৌরজন হিসাবে আর কি কিছুই করিবার নাই? সকলের কানে কর্ম্মের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল, শুধু তাহারাই বধির হইয়া রহিল? বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজনে ডাক আসিয়াছে। হোক্ সে যজ্ঞ মরণের, হোক সে আয়োজন নারকীয় ধ্বংসের, তথাপি সেই আহ্বানে বিশ্ববাসী সাড়া দিল। ইংরাজ ছুটিল, জার্ম্মান ছুটিল, আমেরিকান ছুটিল, জাপানী ছুটিল, বাহির হইল চীনের বীর। কে ডাকিল ইহাদের—দেবতা, না মানব? সে প্রশ্ন কাহারও মনে উঠে নাই। শুধু বাহির হইয়াছে কঠিন আবরণে নিজেকে সজ্জিত করিয়া—সংঘাতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে। এ যজ্ঞে কাহার সাধনা সিদ্ধ হইবে, কে পাইবে জয়তিলক?

অমর আপন মনেই বলিয়া উঠিল, কেহ না। এ যজ্ঞে বিধাতা আপনার সৃষ্টির চরিতার্থতা লাভ করিবেন মানবের তপস্যা দিয়া, সে তপস্যা মরণের। তাই এ আহ্বান অবহেলা করিবার নহে। অমরের মনে হইল—এ আহ্বান অহর্নিশি তাহাকেও সচকিত করিয়া তুলে, সে সাড়া দেয় না কেন? অমর অনুভব করিল—কি যেন তাহাকে করিতেই হইবে। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া, আতঙ্কে উৎকণ্ঠায়, প্রেরণায় ভাবনায় তাহাকে যেন বিধ্বস্ত করিয়া ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, চলো, তুমিও চলো—বাহির হইয়া পড়। কোথায় যাইবে, কি করিবে সে? স্থির হইয়া সে যতবার নিজেকে প্রশ্ন করিতে চায় তত তাহার ভিতর হইতে একটা অদম্য সংকল্প যেন চীৎকার করিয়া উঠে—চলো, চলো, আর সময় নাই ছুটিয়া চলো। অমর দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিল, প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের ভাবনাটা সে সংযত করিয়া লইতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে সেই প্ল্যাটফরমে একখানা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ষ্ট্রেচারবাহী কুলীরা প্রত্যেক কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ট্রেণ হইতে মৃতবৎ যাত্রীদের বাহির করা হইল। প্রায় সকল যাত্রীই ষ্ট্রেচারে নামিল, কয়েকজন যাহারা হাঁটিয়া গাড়ী হইতে নামিল তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়াই প্ল্যাটফরমের বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। অমর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। নানা জাতির নরনারীদের একটি একটি করিয়া নামানো হইতেছে। বর্ম্মী, চীনা, ইংরেজ এবং ভারতের নানা প্রদেশের নরনারীর কাতর মুখচ্ছবি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া

গিয়াছিল। সহসা তাহার ঠিক সম্মুখ দিয়া একটি বর্ম্মী মেয়েকে ষ্ট্রেচারে বহন করিয়া লইয়া গেল। দারুণ যন্ত্রণায় সে যেন প্রাণপণে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু স্বর বাহির হইতেছে না, শুধু অধিকতর তীব্রতা লইয়া শরীরের অভ্যন্তরের বেদনা মেয়েটির বিকৃত মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। অমর সহসা সেই ষ্ট্রেচারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। হেমলতার সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল, মেয়েমানুষের অত চট্ করে মরণ হয় না, ঠাকুরপো। মরণ এই মেয়েটিরও হয় নাই, অমরের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে সে যখন প্ল্যাটফরমের বাহিরে চলিয়া আসিল, তখনও গাড়ীর বিভিন্ন কামরা হইতে আহত, পঙ্গু, বিকৃতাঙ্গ যাত্রীগণকে নামানো হইতেছিল। অমর কাহারও দিকে ফিরিয়া দেখিল না, তাহার দুই কানে যেন সহস্র নরনারীর আর্ত্তনাদ আসিয়া আঘাত করিতেছিল। কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে শুনিতে সে ষ্টেশনের সীমানার বাহিরে জনাকীর্ণ রাজপথে নামিয়া হাঁটিতে সুরু করিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে এক সময় তালতলার এক বিরাট বাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। ফটকের পার্শ্বে পাথরের ফলকে গৃহস্বামীর নামটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বৃদ্ধগোছের এক দরোয়ানকে কহিল, "ডক্টর মজুমদার বাড়ী আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, ঐ যে হলঘরে মিটিং বসেচে।" বলিয়া দরওয়ানজী ঘরটা দেখাইয়া দিল।

অমর হলঘরের নিকটবর্ত্তী হইতেই ভিতর হইতে একটা মৃদু কলরব শুনিতে পাইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—অনেকগুলি তরুণ ডাক্তার ও ছাত্র পরিবৃত হইয়া তাহার প্রফেসর ডক্টর মজুমদার বসিয়া আছেন। মাসকয়েক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অমর ইঁহার কাছে পড়িয়াছে, তাই অমর নমস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কহিলেন, "এসো এসো, বসো। কি খবর?"

অমর আসন গ্রহণ না করিয়া কহিল, "শুনলুম আপনাদের একটা পার্টি আসাম ফ্রন্টিয়ারের দিকে যাবে? কথাটা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, আজই রওনা হ'বেন। এঁরা সব যাচ্ছেন?" বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তীদের কয়েকজনকে দেখাইয়া দিলেন।

"আপনাদের আরও ভলান্টিয়ার চাই কি, স্যর?"

"চাই তো বটে, কিন্তু কে আর যেতে চায় বলো?" ডক্টর মজুমদার হাসিলেন। কহিলেন, "নিজের দেশও যখন "ফ্রন্ট" হয়, তখন আমরা আঁত্‌কে উঠি। We are lamentably demoralised। যতীন আর আমি কি আর কম চেষ্টা করেছি? এ দেশে বন্যার স্বেচ্ছাসেবক জোটে, কিন্তু ফ্রন্টে যাবার কথায় হৃৎকম্প সুরু হয়। কি বলো যতীন, Is not it a fact?"

যতীন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহাই বটে। অমর সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি ভাবচি স্যর, আমিও যাবো এঁদের সঙ্গে—আপনি যদি অনুমতি করেন—"

অমর আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া থামিয়া গেল। ডক্টর মজুমদার কিন্তু সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলেন। অমরের আজ সারাদিন আহার হয় নাই, অস্নাত শুষ্ক মাথার উপর রুক্ষ কুঞ্চিত কেশ এলো মেলো হইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া দারিদ্র্যের কালিমা বলিয়া ভুল হয়, পরণের কাপড়টা পর্য্যন্ত ধূলিমলিন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডক্টর মজুমদার অমরের আপদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর ঈষৎ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু এঁদের সঙ্গে গেলে তো তুমি কোন বেতন পাবে না, বরং অন্যত্র কোথাও—"

কথাটা অমর বুঝিল। হাসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বেতন আমি চাইনে, স্যর। অন্য সকলের মতো ভলান্টিয়ার হিসেবেই যেতে চাই।"

ডক্টর মজুমদার কথাটা যেন বিশ্বাস করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার বাম দিক্ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "অমর চলুক, স্যর, আমাদের সঙ্গে। ও খুব হার্ডি আছে, স্যর।"

যে ছেলেটি সোৎসাহে কথা কয়টি বলিল, সে অমরের একজন ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী নরেন। কিন্তু তাহার উৎসাহে শীতল জল নিক্ষেপ করিয়া ডক্টর মজুমদার অমরকে কহিলেন, "দেখো, যেতে চাও খুব ভালো কথা। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একটা এত বড় adventureএর মধ্যে যাওয়া, I mean বাড়ীতে ঝগড়া মনোমালিন্য কিছু—"

তাহার কথার ইঙ্গিতে অমর বিরক্ত হইল, কহিল, "সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সে রকম কোন কারণ ঘটে নি। এখন আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আমি এখনই তৈরী হ'য়ে নিতে পারি।"

ডক্টর মজুমদারের ইহাতেও সংশয় ঘুচিল না; তবে কৃত্রিম উৎসাহে কহিলেন, "না, না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো তোমাদের মত স্বেচ্ছাসেবকই চাই। তা' তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা ক'রো। শীতের জামা কিছু নিয়ো, কেমন?"

জামা কাপড়ের কথা শুনিয়া অমর একপ্রকার বিব্রত বোধ করিল। সহসা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিতে না পারিয়া অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিল। ডক্টর মজুমদার তখন অমরের দিকে পিছন

ফিরিয়া কি একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি অমরের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না; কিন্তু নরেন সহসা উঠিয়া আসিয়া চাপা গলায় অমরকে কহিল, "সে সব কিছু আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। চলুন আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।"

নরেন একপ্রকার অমরকে টানিয়া লইয়া চলিল, ডক্টর মজুমদারকে একটা নমস্কার করিবার পর্য্যন্ত সময় দিল না।

বাহিরে আসিয়াই নরেন কহিল, "চলুন, একটা রেস্তঁরায় ব'সে গল্প করা যাক্—এখনও অনেক সময় আছে" বলিয়া অমরকে প্রতিবাদ করিবার সময় না দিয়াই নিকটে একটা চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক সময় কহিল, "দেখুন, আমার দু'টো রাগ্‌ আছে, লেপ্‌ও আছে দু'টো। তা ছাড়া এ আর পি তে কাজ ক'রতে ক'রতে খাকী প্যাণ্ট্‌ পেয়েচি, সেগুলো তো আছেই। আপনার সার্টের নীচে একটা সোয়েটার র'য়েচে, দেখ্‌চি। তার ওপর আমার এই কোটটা চাপিয়ে নেবেন; আমার একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ওভার কোট্‌ আছে সেইটাতেই আমি চালিয়ে নেবো। ব্যস্‌, আর ভাবনা কি?"

নরেন সকল বন্দোবস্ত করিয়া তবে চুপ করিল। অমর কৃতজ্ঞ-ভাবে শুধু সায় দিয়া গেল—কেননা প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। এই অযাচিত সাহায্য না পাইলে সে যাইবে কি করিয়া? সহসা আজ সে যে পথ বাছিয়া লইল, সে পথের দিশা তো ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। দিশা সে এখনও পায় নাই, বন্যার কল্লোলে জাগিয়া উঠিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন গৃহস্থ যেমন গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, কর্ম্মহীন লুপ্তচেতনা সমাজজীবনের বাহিরে আসিয়া সে শুধু তেমনই একটা বৃহৎ স্রোতের গর্জ্জন শুনিতেছে মাত্র। তাই বাহির হইয়াছে, কিন্তু এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। লেপ কম্বল লইতে গেলে তাহার বাবা যে যাইতে দিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। নরেনের এই অনুগ্রহে সে ভদ্রতা করিয়াও কোন অসম্মতি জানাইতে পারিল না।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া নরেন কহিল, "আপনার বাড়ীতে একবার দেখা ক'রতে যাবেন না?"

"না, বাবাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই হবে।"

নরেন বুঝিল—যে কোন কারণেই হোক্‌ অমর বাড়ীতে যাইতে চাহে না। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "বেশ তো, চলুন না আমার মেসে। সেখান থেকে যাবার সময় মেসের চাকরকে দিয়ে আপনার বাবাকে একটা খবর পাঠালেই চলবে, কি বলুন?"

বাড়ীতে যাওয়ার সমস্যাটার এত সহজে সমাধান হইয়া যাওয়ায় অমর অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করিল, "কহিল, সেই ভালো, চলুন।"

বিছানাপত্র নরেনের বাঁধাই ছিল। অমরের জন্য আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া সে অমরকে লইয়া রাত্রির আহার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সারিয়া লইল। সন্ধ্যার পর মুটের মাথায় মালপত্র বোঝাই করিয়া দুইজনে মেস হইতে বাহির হইল।

প্রায় দীপহীন পথে চলিতে চলিতে অমর বোধ করি কিছুই ভাবিতেছিল না—তথাপি নরেন যখন তাহার নব নব পরিকল্পনার বিবরণ দিতেছিল তখন অমরের কানে সেই সহস্র নরনারীর আর্ত্তনাদ তেমনই বাজিতেছিল। হেমলতার শুভ্র স্নিগ্ধ মুখের পাশে সেই বর্ম্মী মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর আকুঞ্চিত বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া গিয়া তাহার গতি অকারণে দ্রুত হইয়া আসিল। আচ্ছাদিত-প্রায় গ্যাসের স্বল্প আলোক অমরের মুখের উপর চোখ পড়িলে নরেন দেখিতে পাইত একটা কঠিন সংকল্পের প্রবল উত্তেজনায় অমরের মুখের পেশীগুলা যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

"গোবিন্দ নিবাসে"র তিনতলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহারাদি সাঙ্গ করিয়া আচমন করিতে করিতে কহিলেন, "ওগো, শুনছ? যদুনাথবাবুর ছেলের ভাত আর বাড়তে হবে না। সে কোথায় নাকি যুদ্ধে গেচে, যদুনাথবাবু এইমাত্র খবর পেয়েচেন। ওঁরও বোধ হয় আজ আর খাওয়া হবে না। দেখো দিকিন্‌, ছোঁড়াটার কাণ্ড? দলে প'ড়ে কোথায় চলে গেল!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাকু সাজিতে লাগিয়া গেলেন।

হেমলতা রান্নাঘরের কাজ সারিয়া ভাতে জল ঢালিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে নিজেকে আবৃত করিয়া যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ভয়ঙ্কর কিসের একটা প্রতীক্ষা করিতেছে। নীচে একতলায় উঠানের নর্দ্দমা হইতে অবিরাম একটা কলকল শব্দ উঠিয়া আসিয়া এই অন্ধকারে প্রতি কক্ষের দ্বারে দ্বারে যেন হানা দিয়া ফিরিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, হেমলতা যেন সেই শব্দটাই কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। দ্বিতলের বারান্দায় যদুনাথবাবুর ঘরের সম্মুখে একটা সাদা পাঞ্জাবী শুকাইতেছিল। সহসা হেমলতা অন্ধকারেও বুঝিতে পারিলেন ওটা অমরের। তিনি দ্রুতপদে পাঞ্জাবীটা তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ছোটবৌ, তোমার সারা হ'ল?"

পাঞ্জাবীটা বিছানার তলায় সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়া হেমলতা সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ, এই যাই।" (সমাপ্ত)

বামুনের মেয়ে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

৭০।৮০ বৎসর আগে পশ্চিম বাংলার পল্লীসমাজ যাহা ছিল 'বামুনের মেয়ে' তাহারই একটা চিত্র। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ উপন্যাসের ইহা পরিপূরক (Supplementary) মাত্র। পল্লীসমাজে আমাদের সমাজের কতকগুলি কথা বলিতে বাকি ছিল—এই উপন্যাসে সেগুলি বলা হইয়াছে। গোলোক চাটুয্যে বেণী ঘোষালেরই আর একটি রূপ। রাসমণির চরিত্রটা ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন। পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র নিজের দেশকে কতটা ভালবাসেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু নিজের মিথ্যাভিমানে দৃপ্তমূঢ় সমাজকে তিনি কতটা ঘৃণা করেন—তাহা এই গ্রন্থে ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। 'বামুনের মেয়ে'তে শরৎচন্দ্র যে সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন—দেশের কোন ঐতিহাসিকও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বামুনের মেয়ের গ্রন্থকার আমাদের মাথার উপর যে উচ্চ আসনে সমাসীন—তাহার পাদপীঠ স্পর্শ করিবার শক্তিও আমাদের মত লেখকের নাই। এখানে তিনি সর্ব্ববিধ অন্ধ সংস্কার ও মিথ্যাচারের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টার ও নিরপেক্ষ তটস্থ উদারদৃষ্টির দ্রষ্টার এই আসন।

সন্ধ্যার পিতামহীর মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এই যে কুলের মর্য্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন ক'রে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে ?" * * *

"মিথ্যাকে মর্য্যাদা দিয়ে যত উঁচু ক'রে রাখবে—তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে।" * * *

"দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধ'রেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তার পরে এমন দুর্দ্দিনও একদিন এসেছিল যে দিন সেই দেশের রাজার আদেশেই তাঁদেরই বংশধরের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবন্ধন করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটী এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যাটা যদি জানতে দিদি, তাহলে ছোট জাত ব'লে যে দুলে মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে তাদের ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হতো।"

"মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে গড়া গণ্ডী, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাণ্ড মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষ যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্য দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জ্জনা কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।"

এই কথাগুলি ৭০।৮০ বৎসর আগের কোন পল্লীরমণীর মুখের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এগুলো শরৎচন্দ্রের নিজেরই মন্তব্য। পল্লীরমণীর মুখে বলানো।

কৌলীন্য-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে—জাতিকুলের অহঙ্কার অনেকটা শিথিল হইয়াছে—সমাজের সত্য দৃষ্টি ক্রমে উন্মীলিত হইতেছে। তবু শরৎচন্দ্রের উক্তিগুলি অন্তর্নিহিত সত্যের বলে এবং কলাচাতুর্য্যময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে স্থান পাইয়া বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

বাংলার পল্লীসমাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের রূপটা নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে যথেষ্ট কলাচাতুর্য্যও আছে Ironyও প্রচুর।

বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ-বিধবা রাসমণির উক্তি—

"মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে। বুড়ো হ'তেই চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন শাস্তরটা জানিনে বল। কারো বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামনী একটা অশাস্ত্র কাজ করেছে ? এই মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙ্গোবা-মাত্তর শিউরে উ বললুম, ওলো ছুঁড়ী করলি কি—আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা। কোন পণ্ডিত বলে যাক দেখিনি—না এতে দোষ নেই ! ডাকো দি তোমার লিখিয়ে পড়িয়ে মেয়েকে—কেমন বলতে পারে ?"

গোলোক চাটুয্যে পাঁচখানা গাঁয়ের সমাজপতি। তিনি জাহা ছাগল ভেড়া চালান দেন, যে গোরু চালান দেয় তাহার মূলধন যোগা বিধবা শ্যালিকার চরিত্র নষ্ট করিয়া তাহাকে ভ্রূণহত্যা করিতে ব করেন এবং বৃদ্ধবয়সে চতুর্দ্দশী কন্যার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করেন। তি শ্যালিকাকে বলিতেছেন—

"প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোধানের দিন একটা পর্ব্ব দিন, ছোটগি আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে ব'লেই এখনো চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উঠছে—জোয়ারভাটা নদীতে খেলছে।

সেবার সেই ভারি অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে—সোডার আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম,—ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হ সেটা বেশি কথা নয় ; কিন্তু গোলোক চাটুয্যেকে যেন এ কথা দ্বিতীয় বার শুনতে না হয়। হররাম চাটুয্যের পৌত্র, যার একা পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়ারহাটির রাজাকেও পাল্কি-বে পাঠাতে হ'তো।"

বৃদ্ধ গোলোক কিশোরী সন্ধ্যাকে বিবাহ করিতে চায়। রাস তাহার মাকে এ শুভ সংবাদ দিয়া বলিতেছে—

"তোর পাগলী মেয়েটা কি তপিস্যিই করেছিল। যা, ভিজে কা ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করগে। পঞ্চাননের বিশালাক্ষীর থানে পুজো পাঠিয়ে দিগে।"

রাসমণি গর্ভবতী বিধবা জ্ঞানদাকে বলিতেছে—

"কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেছে—সেই আপদ বালাইটা ঘুচে যাক—কতক্ষণেরই বা মামলা। তার পরে যা ছিলি, তাই হ'। খা' দা' ঘুরে বেড়া, তীর্থধর্ম্ম বারব্রত কর—একথা কেউ না জানবে—কেউ বা শুনবে।"

রাসমণি প্রিয়নাথ ডাক্তারকে বলিল—"এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের উঁচু মাথা নীচু না হয়। একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ী কি ঢলাঢলিটা করলি বল দিকি!"

তারপর শরৎচন্দ্র কৌলীন্যপ্রথার একটা অতি গূঢ় অঙ্গের পরিচয় দিয়াছেন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহাই রসবিকাশের বৃন্তস্বরূপ—

"এ কুকাজ হীরুনাপিত নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেছে। একে বুড়োমানুষ, তাতে বাতে পঙ্গু; তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ হতে টাকা আদায়ের ভার তার উপর দিয়ে ব'লে ছিলেন, 'হীরু' বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ। এখন থেকে যা কিছু রোজগার করে আনবি—তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

আরো দশবারো জায়গা থেকে সে এমনি ক'রে প্রভুর জন্যে রোজগার ক'রে নিয়ে যেত। এ কাজ নূতন নয়, আর তার মনিবই কেবল একেলা করেন নি—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দুরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

ঠাকুরমা বলেছিলেন—জাতে কে ছোট কে বড় সে কেবল ভগবানই জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন ব'লে ঘৃণা না করে।"

এই সকল উক্তি হইতে যে সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়—সুখের বিষয় সে সমাজের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। শরৎচন্দ্র সন্ধ্যা গন্ধাত্রীর পক্ষে সে কারণে জাত্যভিমানের অসারতা ও মূঢ়তা দেখাইয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এই জাত্যাভিমান অশুভজনক। জাতিতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শরৎচন্দ্রকে এ বিষয়ে সমর্থনই করিবেন।

জাত্যভিমানের দিক হইতে শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার জীবনে যে Tragedy দেখাইয়াছেন—তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সন্ধ্যা অরুণকে ভালবাসিয়াছিল তা পরম সত্য—হৃদয়ের নিভৃততম সত্য। অরুণও তাহাকে ভালবাসিত। জাত্যভিমানের মিথ্যা মোহে এই পরম সত্যকে সন্ধ্যা অস্বীকার করিয়াই তার দণ্ড ভোগ করিল।

সন্ধ্যা অরুণকে বলিল—"আভাসে ইঙ্গিতে কতবার জানিয়েছি যে ছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, আমি ত ভুলতে পারিনে, 'আমি কত বড় বামুনের মেয়ে।' তুমিও আমার স্বজাত— কিন্তু বাঘ আর বেড়াল ত এক নয়, অরুণ দাদা।"

এই বাক্যগুলিতে যে Irony ও universal appeal নিহিত আছে—তাহা শরৎচন্দ্রের এই রচনাকে রসের উচ্চশিখরে তুলিয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা তাহার বংশকুলের অহমিকায় ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, আর অদৃষ্ট-দেবতা মাথার উপরে হাসিতেছেন। এ দৃশ্য অপূর্ব্ব। সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজই শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য, সন্ধ্যা সে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে মাত্র।

তারপর যখন বিবাহের ছাঁদনাতলা হইতে সন্ধ্যার জন্মদোষের জন্য বর উঠিয়া চলিয়া গেল—তখন সন্ধ্যা চেলি পরিয়াই অরুণের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—

"আমাকে আর কেহ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালবাস। তুমি ছাড়া আজ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।"

অরুণ বলিল—আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।

ইহা বুদ্ধিমতী সন্ধ্যার প্রেমাভিমানের দণ্ড নয়—ইহা নিষ্ঠুর জাত্যভিমানের দণ্ড। তাই শরৎচন্দ্রের সমবেদনা অরুণের প্রত্যাখ্যানে সঞ্চারিত হয় নাই।

এই উপন্যাসের সাহিত্যাঙ্গের অবলম্বন কিন্তু এই সমাজতত্ত্ব নয়—সমাজসংস্কার নয়—পল্লীসমাজের প্রতি ঘৃণা মাত্র নয়। ইহার অবলম্বন—প্রিয়নাথের চরিত্র ও পিতাপুত্রীর মধুর সম্বন্ধ। শরৎচন্দ্র দুর্জ্জয় কুলীন-সন্তান গোলোকের চরিত্রের পাশে এই দূষিতজন্মা প্রিয়নাথের চরিত্র আঁকিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্রের পার্শ্বে বিদুরের মত। প্রকারান্তরে শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন—মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব জন্মের উপর নির্ভর করে না। উচ্চ কুলেও গোলকের মত মহাপাষণ্ড জন্মে—নীচকুলে এবং দূষিত সংসর্গেও প্রিয়নাথের মত সাধুপুরুষের জন্ম হইতে পারে।

এই প্রিয়নাথ সমগ্র গ্রামের উপকার করিয়া বেড়ায়—আত্মভোলা মানুষ—গ্রামের লোক পাগলা ঠাকুর বলে—দুঃখীদের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদে—গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ভালবাসে—কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাকে অপদার্থই মনে করে—স্ত্রী তাহাকে নির্য্যাতন করে। ঘরে বাহিরে অনাদৃত এই মহাপুরুষটির একমাত্র আশ্রয় তাহার কন্যা, সন্ধ্যা। লোকে তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করে—সন্ধ্যার বুক ফাটিয়া যায়। এই লোকটির অভিমান তাহার বৃত্তির অভিমান। এই অভিমান রক্ষার জন্য সে এক শিশি ক্যাষ্টর অয়েলও খাইয়া আসে। অনাসক্ত চির-বৈরাগী পুরুষটিকে মানুষের স্তুতিনিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আঘাত তিরস্কার কিছুই বিচলিত করিতে পারে না। বিষাক্ত পল্লীসমাজের বহু ঊর্দ্ধে সে অবস্থিত। এই আদর্শ ব্রাহ্মণটি কিন্তু হিরু নাপিতের সন্তান। সে যখন চিরবিদায় গ্রহণ করিল—তখনও সে নির্ব্বিকার; চোরের মত নিজের ঔষধের বাক্স ও হোমিওপ্যাথির বইগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সঙ্গী হইতে চাহিলে—তাহাকে সে বলিল—

আমার সঙ্গে কোথায় যাবে মা—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাক—সেও অনেক দুঃখ পেলে। আর আমার নাম ক'রে যারা ওষুধ চাইতে আসবে—তাদের ওষুধ দিও। আর দেখ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি

তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস্। সে বেচারা গরিব, বই কিনতে পারে না ব'লেই ই সে কিছুই শিখ্‌তে পারে না।"

এই কথাগুলির স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া যে চরিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়, মহত্ত্বের জন্য নয়, অনন্যসাধারণতার জন্য।

সহস্র অপমান লাঞ্ছনাতেও তাহার হৃদয়ের উদারতা ম্লান হয় নাই। ষ্টেশনে জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা—সে হতভাগিনীর অন্য কোন উপায় নাই—সে সঙ্গে যাইতে চাহিল—প্রিয়নাথ তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গেল।

সুচিকিৎসক হইবার জন্য যে সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন হয় তাহা তাহার ছিল না। তাহার ছিল হৃদয়-বৃত্তির আতিশয্য—হৃদয়-বৃত্তি দিয়া পরোপকার করা যায়—চিকিৎসকের খ্যাতিলাভ করিয়া অর্থোর্জ্জন করা যায় না। দারিদ্র্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল তাহার অসাধারণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা তাহার কন্যা ছাড়া আর অন্য কেহ উপলব্ধি করে নাই। কোন্ অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত জন্মকন্দর হইতে একটি নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলধারা বহিয়া আসিয়াছিল সমতলে, তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করাই ছিল তাহার ব্রত, নীরস শুষ্ক মরুপ্রান্তর তাহার মর্য্যাদা বুঝিল না—তাহার অন্তর্নিহিত তাপে সে ধারা বাষ্পে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া গেল।

বামুনের মেয়ের যে মূল আখ্যানবস্তু তাহার জন্য প্রিয়নাথের চরিত্র অন্যরূপও হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে সমাজ-বিদূষণ ছাড়া এই পুস্তকে আর কিছু পাওয়া যাইত না এবং পুস্তকখানি সাহিত্যের উচ্চস্তরে আরোহণও করিত না। প্রিয়নাথের অপূর্ব্ব চরিত্রই ইহাকে উচ্চ সাহিত্যের মহিমা দান করিয়াছে।

প্রিয়নাথের প্রতি তাহার দুঃখিনী কন্যার গভীর সমবেদনাটুকু এই রচনায় গভীরতর রসসঞ্চার করিয়াছে। Ibsenএর Enemies of the people নাটকে ঠিক এইরূপ অপূর্ব রসসঞ্চারের কথা আছে। অসতর্ক-বুদ্ধি নিতান্ত অসহায় শিশুবৎ পিতাটিকে সন্ধ্যা সন্ধ্যার প্রদীপের মত অঞ্চলের আড়ালে বাঁচাইয়া চলিয়াছে এবং সকলেই যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে তখন সেই কেবল তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা তেজস্বিনী বালিকা। তাহার তেজ ভ্রান্ত জাত্যভিমানকে আশ্রয় করিয়াছিল—তাহার চরম দণ্ড সে লাভ করিল। কিন্তু তাহার চরিত্রের তেজস্বিতা তাহাতেও নষ্ট হয় নাই। বিদায়ের পথে অরুণ যখন বলিল—সন্ধ্যা, সে রাত্রিতে আমি কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেছি। তোমার কথাতেই রাজী হব। তখন সন্ধ্যা বলিল—"কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন উপায় আছে কিনা সেটি জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"

সন্ধ্যার জাত্যভিমান হইতে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—এই অভিমান মানুষ রক্ত হইতে পায় না—ঐতিহ্য (Tradition) হইতে পায়—সামাজিক পরিবেষ্টনী হইতে পায়—সেজন্য ইহা অধিকতর মিথ্যাবস্তু। তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা জন্মগত হইতে পারে। রক্ত হইতে সঞ্চারিত হইলে সন্ধ্যার জাত্যভিমানের মোহ কিছুতেই এত প্রবল হইত না। সন্ধ্যা তাহার পিতামহীর তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা রক্তপথেই পাইয়াছিল।

কৌতুকরস যে অনেক সময় করুণ রসেরই অন্তরঙ্গ সঙ্গী এই পুস্তকে শরৎচন্দ্র স্থলে স্থলে তাহাও দেখাইয়াছেন। প্রিয়নাথের আচরণে এক চোখ আমাদের হাস্যে উদ্দীপ্ত হয়—আর চোখে অশ্রু সঞ্চার হয়।

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত দেশকালাতীত মানসের গভীর সহানুভূতির অশ্রু-শিশিরকণা সত্যের আলোকে ঝলমল করিতেছে। বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় এই সমাজ! যে সমাজে মহাপাপিষ্ঠ ভ্রূণহত্যার অপরাধী বৃদ্ধবয়সে বালবধূর পরিণেতা গোলোক সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বন্দিত, আর বিদুরকল্প সাধু পুরুষ সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রিয়নাথ যে জন্মের জন্য নিজে দায়ী নয় সেই জন্মের অজুহাতে বিড়ম্বিত—দেশ হইতে নির্ব্বাসিত—নিজের পত্নীর দ্বারাও পরিত্যক্ত, সেই সমাজ কি সাক্ষাৎ নরক নয়? এই কথাই শরৎচন্দ্র ঘোষণা করিয়াছেন গভীর আক্ষেপের সহিত।

সর্ববিধ অসত্য সংস্কারের বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্রের সারস্বত অভিযান। বামুনের মেয়েতে জন্মসম্বন্ধীয় অসত্য সংস্কারের উপরে শরৎচন্দ্র পরম সত্যের যে চন্দ্রিকাপাত করিয়াছেন—তাহা দেশকাল অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীনতার দরবারে পৌঁছিয়াছে। এই সংস্কার এখনো মানবসভ্যতার অঙ্গে কলঙ্ক রেখার মত বিরাজ করিতেছে। কৌলীন্য আজ নাই, কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে সত্যের বিশ্বজনীন আবেদনটিকে বাণীরূপ দিয়াছেন—তাহা বিশ্বসাহিত্যে চিরদিন বিরাজ করিবে।*

* কেহ কেহ মনে করেন—প্রিয়নাথের আত্মবিভোর ভাব লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে—তাহার সহজ বুদ্ধির অবস্থাও মাঝে মাঝে দেখানো উচিত ছিল। সন্ধ্যার চিত্তের অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও উত্তেজিত মুহূর্ত্তে তাহার মুখ দিয়াই পিতার জন্মদূষণের সমগ্র ইতিহাসটা অরুণের কাছে ব্যক্ত করায় অস্বাভাবিকতার ছায়াপাত হইয়াছে—একথা আমাদেস মনে হয়।

সন্ধ্যাদীপ

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

স্বর্গের বাতায়নে মর্ত্ত্যের মুখ চেয়ে
সন্ধ্যা তারার দীপ জ্বেলে রাখে কোন মেয়ে?
বাজে আবাহনে শাঁখ ইঙ্গিতে বুঝি তারি,
প্রাসাদে কুটীরে দেয় মঙ্গল দীপঝারি।
আধ আলো ছায়া মাঝে কারে খুঁজি ঝুরে আঁখি
শূন্য পিঞ্জরে ফিরে অচিন্ নীড়ের পাখী?

কর্ম্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

(২)

পূর্ব্বে যে সাধনা আর উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে বিশুদ্ধতম সাধনা উপাসনা আর নেই। যে-সংযমের কথা বলা হয়েছে সে হচ্ছে সব থেকে কঠিন সংযম, যে-বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে সে হল ভেদাভেদশূন্য, ঘৃণাদ্বেষবিবর্জিত সর্বত্র সমবুদ্ধি,—কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে যে তথাপি এই উপাসনা, এ সংযম, এ বুদ্ধি নিয়েও মুক্তি আসবে না, সবই ব্যর্থ হতে থাকবে, যদি সর্বভূতহিতে রত না হও, যদি পরমমঙ্গলে ব্রতী না হও। শ্লোকশেষের ঐ 'সর্বভূতহিতেরতাঃ' কথাটি দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া উচিত।

রাজর্ষি জনকের উদাহরণ দিয়ে গীতা বললেন—

কর্মণ্যেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥

—জনকাদি কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেও কাজ করা উচিত (অর্থাৎ কর্মত্যাগ করা উচিত নয়)।

রাজর্ষি জনকের কথা কে না শুনেছে? রাজা হ'য়েও ভোগসুখে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন, প্রজামঙ্গলই ছিল তাঁর ব্রত। এই জনকেরই লোকবিশ্রুত চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' গোবিন্দমাণিক্যে কি সমুজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে—

"সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। ...গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন।...যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন...সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেন না আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।...যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন, তাহারা ধুলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দুরদুরান্তরব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্তগভীর প্রেম দেখিতে পাইলেন।"

শুধু জনকাদির দৃষ্টান্ত নয়, শ্রীভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্মচেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

ঈশ্বর অতন্দ্রিত হয়ে কর্মে ব্যাপ্ত আছেন। একথা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি, য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ—সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, একাকী তিনিই থাকেন জেগে, একা তিনিই নিরলস অতন্দ্রিত হ'য়ে সর্বপ্রাণীর কাম্যবিধান করেন, তাদের ভোগ্যবস্তুসকল বিধান করেন। তাঁর তো কোনো দায় নেই, এমন কি তাঁর তাড়া আছে যে কাজ তাঁকে করতেই হবে?—ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন—তবুও তিনি কাজ করেন, সর্বজীবের মঙ্গলবিধানের জন্য। তাঁর কাজ, সে হল স্বার্থলেশশূন্য বিশুদ্ধতম মঙ্গলকাজ, কেন না তাঁর সম্বন্ধে স্বার্থের কোনো কথাই উঠতে পারে না। এমন কি অর্থ আছে যা তিনি পান নি? এমন কি জিনিষ আছে যা তাঁর নেই? তিনি যেমন সর্বজীবের শাসন, সংরক্ষণ ও মঙ্গল করছেন, সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও বিনষ্টি হ'তে রক্ষা করছেন, মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন,—তুমিও তেমনি করো, তুমিও আমারি পথের পথিক হও। তিনি বললেন—

একমাত্র মানুষকেই তিনি বলেছেন, তোমার দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও, মাটির দিক থেকে একবার আমার এই অনন্ত নীলাকাশের আলোর দিকে তাকাও, তুমি ক্ষুদ্র নও, হেয় নও, তুমি বীর। এযে আমাদের ওপর তাঁর কত বড়ো ভালবাসা তা কি একটিবারও আমরা ভেবে দেখব না! পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রকে বলেন, আমার এই কাজটি ক'রে দাও তো বৎস,—সে কি তিনি নিজে সেই কাজ পারেন না ব'লে? —সে কেবল তাঁর পুত্রকে মর্য্যাদা দেবার জন্যে, সে কেবল তিনি তাকে ভালবাসেন ব'লে। আমাদের পিতামহগণ জানতেন তাঁর এই ভালবাসা, তাই তো অতি সহজেই বিনা দ্বিধায় তাঁরা ডাকতে পেরেছিলেন তাঁকে পিতা ব'লে, বলেছিলেন 'পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি'—তুমি আমাদের পিতা, তুমি যে পিতা সেই বোধ আমাদের দাও। আমরা যেন বিশ্বপিতার এ ভালবাসার অমর্য্যাদা না করি। তিনি যে দয়া ক'রে ডেকেছেন তাঁর মঙ্গলযজ্ঞে যোগ দিতে, এতে যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। যদি কোনোদিন সত্যি কারো চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারি, সত্যি দুঃখ লাঘব করতে পারি, তাহলে যেন অন্তরের নম্রতায় তাঁকে এই নিবেদন করতে পারি, এই যে তোমার কাজ আমায় দিয়ে করালে এতেই আমি ধন্য হলুম।

ঐ তাঁর মঙ্গলের রথ চলেছে। অরণ্যগিরি ভেদ ক'রে, জনপদের ওপর দিয়ে, মহাসাগর লঙ্ঘন ক'রে, নদনদীর ধারা বেয়ে, যুগ হতে যুগান্তরে

চলেছে। তাঁর জয়ধ্বজা বর্ষার নবমেঘে আকাশে ওড়ে, তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি আর সব ধ্বনিকে ছাপিয়ে কানে এসে বাজে—

"জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।"

কত দেশের নরনারী কত যুগের ওপার হ'তে অনন্ত অবারিতস্রোতে এসে ধরেছে তাঁর মঙ্গলরথের কাছি, কত দুঃখ, কত মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে চলেছে এই বিঘ্নজয়ী নরনারীর ধারা! নিরন্তর সেই মঙ্গলময়ের আহ্বান এসে পৌঁছাচ্ছে মানুষের বুকের মাঝখানটিতে, মানুষ আর আরামের বিলাসশয়নে ঘরে বসে থাকবে না। তিনি বলে দিয়েছেন, টানো, টানো—আমার এই মঙ্গলের রথ তোমরা সবাই মিলে টেনে নিয়েযাও! কোথায় মারী আছে, কোথায় দুর্ভিক্ষ, পীড়ন আছে, কোথায় বিদ্বেষ, হিংসা, লোভ, পাপ মানুষের মুখের ওপর ভ্রূকুটি ধরে আছে, কোথায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে চোখে ঠুলি পরানো? কোথায় তিমির রাত্রির আঁধার ছাপিয়ে হতভাগা মানুষ বুকফাটা কান্না কাঁদে?—চলো চলো, সে সব দগ্ধদেশে কল্যাণের সঞ্জীবনীধারা ঢেলে দিতে দিতে চলো, মঙ্গলের আলো জ্বালাতে জ্বালাতে চলো, এই তো মানুষের মতো বাঁচা—আর সবাই ব্যর্থজীবন বহন করে, মোঘং পার্থ স জীবতি।

কিন্তু হায়, আজকের মানুষ যে বিশ্বাস হারাতে বসেছে, মঙ্গল কি কোনোদিন সত্যি সত্যিই আসবে! এই যুগে দু-দুটো জগৎ-জোড়া যুদ্ধ ঘটে গেল, কেবল মার খাওয়াই কি সার হবে? কি ভয়ানক ঠকিয়েছে মানুষ মানুষকে! যুদ্ধোত্তর-মঙ্গলের কত রঙীণ পরিকল্পনাকেই আমরা অলীক হয়ে যেতে দেখেছি,—এবারও কি তাই হবে? বড় বড় বুলির মুখোষ পরে সেদিনও যেমন, আজও কি তেম্‌নি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্লেদসিক্ত স্বার্থপরতা তার লোলজিহ্ব লোভে যথাসর্ব্বস্ব চেটে খাবে? এত প্রাণ-বলিদান, এত রক্তপাত, দরিদ্রের এত দুঃখ, এত কষ্ট,—আবার সবই কি ব্যর্থ হবে? যারা অবহেলিত, পরিত্যক্ত, যারা কেবলই বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছে ধুলায়,—কেউ কি তাদের ভেতরে ডাকবে না, বসতে আসন দেবে না!! আজ তাদের মনের শ্রদ্ধা টলেছে, বিশ্বাস টলেছে। শাণিত তীক্ষ্ণ তাদের বিদ্রূপের হাসি, নতুন কিছুতে তাদের অবিশ্বাস, ভাবে আবার কোনো অভিনব ফাঁদ বুঝি এটা! কিন্তু বুঝে ভাখো, যখন মনের শ্রদ্ধা এম্‌নি ক'রে টলে, বিশ্বাস আর থাকে না, শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসকে তখন দ্বিগুণ জোরে আঁকড়ে থাকবার সেই যে ঠিক সময়! ঝড় যখন হালধরা হাতের মুঠিকে শিথিল ক'রে দিতে চায়, দ্বিগুণ জোরে হাতের মুঠিকে শক্ত করবার সেই যে একটিমাত্র ঠিক সময়। দীর্ঘদিন ধ'রে যে-লড়াই মানুষ এই অবহেলিতদের জন্যে লড়তে লড়তে এসেছে, এ লড়াই যে তাকে লড়তেই হবে, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত তাকে হতেই হবে, নইলে কেমন ক'রে চূর্ণ হবে পুঞ্জীভূত অমঙ্গল? আশা হারিও না, বিশ্বাস ভেঙো না, হে নিঃস্বার্থ মঙ্গলব্রতী, অরণ্যসঙ্কুল বন্ধুর পথে পথ কাটতে কাটতে এগিয়ে চলো, শ্রমের জলে, চোখের জলে চন্দনলিপ্ত হোক্ দেহ তোমার,—এ যে তোমারি কাজ, এ কাজে তোমারি যে অধিকার।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে,—অধিকার বলা হয়েছে কেন? কি বোঝায় অধিকার বলতে? এই কথাটীর মধ্যে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি আবার একটা ত্যাগের ঔদাসীন্য আছে, এতে শক্ত ক'রে চেপে ধরা হাতের মুঠি, আর নিবেদনে প্রসারিত হাতের অঞ্জলি—দুইই বোঝায়। তাই 'অধিকার' কথাটি এমন সুনির্বাচিত যে এর বদলে আর কোনো কথা বসানো যেত না। যে-মানুষ কোনোকিছুর সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে, তাতে তার কিসের অধিকার? যে দরকার হ'লে ছাড়তে পারে, তারি তো অধিকার। বিষয়ে অধিকার পাকা করে দানবিক্রীর ক্ষমতা, বিষয় যে ত্যাগ করতে পারে তারি থাকে বিষয়ের অধিকার। কাজের বেলাতেও তাই। ইতিহাসে দেখতে পাই কত সৎকাজ করে গেছেন কত রাজামহারাজ। পালরাজারা দীঘী কেটে জলকষ্ট ঘুচিয়েছেন, সের সা' রাস্তা তৈরি করেছিলেন ভারতের পূর্ব হ'তে পশ্চিম দিগন্তে, সম্রাট অশোকের চিকিৎসালয়, পান্থ-শালা, বৃক্ষরোপণ আর শিলালিপি আজও মানুষ ভোলে নি। কিন্তু এসব কাজ তো তাঁরা নিজের হাতে করেন নি, তবে কেন বলে এসব তাঁদেরি করা সৎকাজ? কিসে অধিকার জন্মাল তাঁদের? তাঁদের শুধু ছিল পরিকল্পনা, পর্য্যবেক্ষণ, অর্থব্যয়। আর মাটি কেটে, পাথর ভেঙে, ঘর্মাক্ত কলেবরে রৌদ্র বর্ষা শীতে সে-কাজ হাতে ক'রে তৈরি করেছিল কুলীমজুররা। তবে কেন বলে না এসব কাজ কুলীমজুরদেরই কাজ? তার কারণ কুলীমজুর কাজ দেয়নি, মজুরি নিয়েছে,—মজুরির অতিরিক্ত এক সিকিপয়সার কাজও দেয় নি। যা দিয়েছে, হাতে হাতে কড়ায় গণ্ডায় তা পরিশোধ হয়েছে। আর এঁরা কেবলি দিয়ে গেছেন—এঁদের কাজ প্রতিদানে কিছুই নেন নি, কাজ করেছেন, আর সেই কাজ দুহাতে সকলকালের মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। যাঁরা নিজের কাজকে নিজের দিকে আঁকড়ে রাখেন না, সকলের মধ্যে নিঃশেষে দান ক'রে দিতে পারেন, তাঁরাই কর্মী।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

—কর্ম ব্রহ্ম হ'তেই উৎপন্ন জেন। এই ব্রহ্মই অক্ষর, সম শান্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের এক বিভাব। তাই সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে অর্থাৎ মঙ্গল বিধানরূপ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এরূপ প্রবর্তিত মঙ্গল-যজ্ঞ-চক্রের যে অনুবর্তন না করে, সে অঘায়ু, পাপিষ্ঠ, সে ইন্দ্রিয়াসক্ত, সে ব্যর্থ জীবন বহন করে।

কর্ম ব্রহ্ম হতেই সমুদ্ভূত। তিনিই সকল কাজের কর্মী, তাঁর এই কাজের নাম যজ্ঞ। সে হল সেই বিরাট যজ্ঞ—যা তিনি অতন্দ্রিতে আচরণ ক'রে যাচ্ছেন,—য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ—তাঁর সেই অনাদি অনন্ত মঙ্গল যজ্ঞচক্র নিরন্তর এই পৃথিবীতে আবর্তিত।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,—মানুষে কি কাজ করে না, ব্রহ্মই সব কাজ করেন?—হাঁ। ভেবে ভাখো, তোমার হাত পা ইন্দ্রিয় সবই তো ভগবানের দান। তারা কাজ করে ঐশ্বরিক বিধানে, প্রকৃতিজ গুণে।

মানুষ ঐ রকম হাত পা মস্তিষ্ক তৈরি করুক দেখি! তা সে পারে না। এরা যে কাজ করে সে তো ঈশ্বরেরই কাজ, কেন না ঈশ্বর-সৃষ্ট এসব যন্ত্র। মানুষের তৈরি কলের কাজকে মানুষেরই কাজ বলে, কেউ বলে না এটা কলের কাজ। এও তেম্‌নি। তাই, কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—কর্ম ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন জেনো। কিন্তু তবু তো আমরা বলি, অমুক কাজ অমুক মানুষ করেছে। কেন বলি? ঈশ্বরের কলে আর মানুষের কলে এই একটি মস্ত প্রভেদ আছে, মানুষের কলের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই, ঈশ্বরের কলের আছে। মানুষের কল বলুক দেখি, আমি করব না একাজ!—তা সে পারে না বলতে। কিন্তু ঈশ্বরের কল এই যে মানুষ, সে যে-মুহূর্তে ইচ্ছা করবে, আমি অমুক কাজটি করব, অম্‌নি ঈশ্বর-সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো তার ইচ্ছা পালন করতে থাকবে। ঈশ্বর মানুষকে এই আশ্চর্য অধিকারটি দিয়ে রেখেছেন যে সে যখনি তার ইচ্ছাখাটিয়ে কোনো কাজ করবে, সে-কাজটি তারি হবে। ঈশ্বর মানুষের দ্বারে দ্বারে তার সেই স্বাধীন ইচ্ছাটি ভিক্ষা করছেন—তাঁর মঙ্গল কর্মে মানুষের যোগদান করার ইচ্ছাটি। একেই বলে এবং প্রবর্তিতং চক্রের অনুবর্তন করা। যে-মানুষ তা না করবে, সে পাপিষ্ঠ, সে ইন্দ্রিয়াসক্ত, সে ব্যর্থজীবন যাপন করে।

কেন তিনি মানুষকে ডাকলেন? তিনি তো একাই সব করতে পারতেন, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তো পশুকে ডাকেন নি, তবে মানুষকে ডাকলেন কেন তাঁর সাহায্য করতে? তিনি যে মানুষকে ভাল বাসেন,মানুষের সঙ্গে যে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক, তাঁর লীলার সম্পর্ক, তাই তিনি মানুষকে ডেকেছেন। আর সব সৃষ্ট-জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই দুটি হাত তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে দিয়ে বলেছেন তোমার ঐ দুটি হাত দিয়ে আমার কাজটুকু ক'রে দাও। পশুদের তিনি একথা বলেন নি, পশুদের হাত দুটিকে তো তিনি মুক্ত করেন নি। পশুরা মাটির দিকে মুখ করেই জন্মায়, সারাজীবন মাটির দিকেই তাদের মুখ ফেরানো।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩

জীবানি বিমানকেন্দ্রে দশ মিনিট বিশ্রাম করলাম। তারপর ওমান উপসাগরের তীরে সার্জ্জা নামক একটা বিমানকেন্দ্রে বিশ্রামের জন্য নামলাম। ভীষণ গরম স্থান। চারিদিকে উত্তপ্ত বালু। এক একটা খেজুর গাছ ভিন্ন জীবনের কোন চিহ্নই নেই। বহুদূর থেকে গাধার পিঠে করে জল আনা হয়। বিমানকেন্দ্রে বিশ্রামাগারে পৌঁছে আমরা দেখলাম—এই দুর্জ্জয় বালুকারাশি জয় করে মানুষ অতি সুন্দর গৃহ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছে। আমি প্রবেশ পথে দেখলাম—একটী বাঙ্গালী যুবক। আমাকে দেখে একটু এগিয়ে এলেন। সার্জ্জার পথে কোন অসামরিক বাঙ্গালী বৎসরাধিক কাল তিনি দেখেন নি। সাহস ক'রে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারছিলেন না, যদিও কথা বলবার খুব ইচ্ছা দেখলাম। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, —আপনি কি মিঃ সেন? তিনি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কথা সর্‌ছিলো না। আমি হেসে বল্লাম—আপনার ভাই করাচী এয়ার পোর্টে আপনার কথা ব'লেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভেতর থেকে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক বেরিয়ে এলেন। আমার খুব আনন্দ হ'ল। তাঁদের আনন্দ বোধ হয় আরও বেশী হল। গগন সেন (হুগলী), মণি মিত্র (ফরিদপুর), ক্ষিতীশ কর (ময়মনসিংহ)—তিনটী বাঙ্গালী যুবক বেতার অফিসে কাজ করেন। বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী পেয়ে তাঁরা যেন স্বদেশের অংশ বিশেষের সন্ধান পেলেন। পরম আত্মীয় জ্ঞানে অতি যত্নে আমাকে তাঁদের বাসগৃহে নিয়ে খাওয়ালেন। আমাকে কিছুতেই B. O. A. C.র লাঞ্চ খেতে দিলেন না, যদিও তাঁদের রেশন্ অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট তাঁরা বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম সংবাদ—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাচার সমস্ত জেনে নিলেন। কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা সামান্য সংবাদটুকুর জন্য। তাঁরা আমাকে ওমান উপসাগরের মণিমুক্তা ও ব্যবসার কথা ব'ল্লেন। অনেক দুঃখ ক'রলেন যে, বাঙ্গালী কোন যুবক ভাগ্য অন্বেষণে এদেশে আসে নি। বম্বের সঙ্গে ওমান উপসাগরের মুক্তা ব্যবসায়ীদের খুব লাভজনক কারবার চ'লছে। তারপর আবার বিমান সঙ্কেতে আমরা এগিয়ে চ'ল্লাম বাহেরিণের পথে। আমাদের পথ চ'লেছে—এক পাশে মরুভূমি, আর এক পাশে সাগর। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল যেন এক-খানি শ্বেতপট্টবাস ধরণীর বক্ষ আবৃত ক'রে র'য়েছে। ওমান উপসাগরের জলরাশি স্বল্প-তরঙ্গ, অতি শান্ত ও স্তব্ধ। মেঘের ছায়ায় কখনো কখনো জলের ওপর রঙ্গের খেলা ও বর্ণ চাতুর্য্য—ভারী চমৎকার, অতি অপূর্ব্ব। আমার কৌতূহল অপরিসীম। প্রকৃতির সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি—একদিকে রিক্তা বৈরাগ্যময়ী বসুন্ধরা, অপরদিকে প্রাচুর্য্যময়ী পূর্ণসলিলা অম্বুধি। প্রকৃতির কি অপরূপ রূপ! প্রায় সাড়ে তিনটার সময় অনুভব করলাম, অদূরে মনুষ্যাবাস। কারণ, খর্জ্জুরবৃক্ষ মরুভূমির বক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একটু দূরে দু'একটী ক্ষুদ্র বেদুইন কুটীর, আড়ম্বরবিহীন অথচ মনুষ্যাবাস সূচনা ক'রছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বাহেরিণের চিত্র দেখতে পেলাম। উপর থেকে মনে হ'চ্ছিল শুষ্ক মরুভূমির প্রচ্ছদ-

পটে সবুজ উদ্যান বাটিকা। পোতাশ্রয়ে বিশ্রামাগারে প্রথম আরব সেখের (Arab Chief) সাক্ষাৎ পেলাম। সুস্থ সবল দেহ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু, মস্তকের শুভ্র আচ্ছাদন জড়িয়ে র'য়েছে, কৃষ্ণবর্ণ আগালা (বেল্ট)। স্কন্ধদেশ থেকে লম্বমান গালাবাইয়া (আচকান), তার উপরে সোনালী সূতার কারুকার্য্য, আর পদযুগলে বিচিত্র কারুকার্য্যময় চপ্‌পল; হস্তে জপমালা। ইহাই সাধারণ আরব গোঠপতির বেশ। এরা বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলে। একজন বাঙ্গালীর সাথে দেখা হ'ল; তিনি সামান্য রঙ্গীণ পানীয়ের জন্য আহ্বান ক'রলেন। অক্ষমতা জানিয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রলাম। তিনি স্মিতমুখে ব'ল্লেন;—আপনার বিদেশ যাওয়া বৃথা। আমি উত্তর দিলাম —আপনার বিদেশবাস সার্থক জেনে আমি কৃতার্থ। তারপর এরোপ্লেনে ফিরে এসে দেখি—আমার সিগারেটের কৌটার অর্দ্ধেক শূন্য। পাশের তিনজন কানাডিয়ান সৈন্যের মুখে দেখলাম, আমারই কাভেণ্ডার সিগারেট। আমাকে দেখে তারা একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সিগারেট নেওয়াতে দুঃখিত হই নি, চুরি করাতে নিজেই লজ্জিত হ'লাম; আমি তাড়াতাড়ি কৌটাটা এগিয়ে তাদের আরো সিগারেট দিলাম। কম্পিত-হস্তে তারা সিগারেট নিল; কিন্তু মুখে বেশ অপ্রস্তুতের ভাব দেখলাম। ব'ল্লাম,—দরকার হ'লে আরও নেবে, লজ্জা কিসের?

তারপর বসরার পথে যাত্রা সুরু হ'ল। প্রায় ৭ হাজার ফিট উপরে উঠেছি; হঠাৎ অনুভব ক'রলাম, এরোপ্লেন খুব দুলছে। মাথা স্থির রাখতে পারছিলাম না। সামানের মহিলাটী তাঁর স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে অবশ হ'য়ে শুয়ে প'ড়লেন। আর অনবরত বমি। ক্রমশঃই এরোপ্লেনে দোলা বেশী হ'তে লাগল। সাত আট জন শুয়ে প'ড়ল। প্লেন একবার উঠেছে, একবার নামছে, কখনও কখনও পাশ কাটাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম ধূলির সমুদ্র। সমস্ত পাংশুবর্ণ। শিখ কাপ্তেন ব'ল্লেন,—ধূলির ঝড় উঠেছে! স্থির হ'য়ে থাকুন। মরুভূমিতে ধূলির ঘূর্ণিবায়ু অতি ভীষণ। আমরা অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কিন্তু মরুভূমির ধূলির ঝড়কে সানন্দে অভিনন্দন জানালাম। ভয়ঙ্করেরও অভিজ্ঞতা বরণীয়। আধ ঘণ্টা পর ধূলির ঝড় কেটে গেল। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্ম ও বেদুইনের কুটীর বসরার নৈকট্য জ্ঞাপন ক'রল। আমরা প্রায় সাতটার সময় বসরা এয়ারপোর্টে নামলাম। তখনও সন্ধ্যা হ'তে তিন ঘণ্টা দেরী।

আমাদের হোটেলে নিয়ে এল। শাত-ইল্-আরব-হোটেল (Shatt-le-Arab-Hotel) মধ্যপ্রাচ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ব'লে বিখ্যাত। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গমস্থলে মরুভূমি চাষ ক'রে নতুন উদ্যান তৈরী করা হ'য়েছে। সাদা বালি, সবুজ বিলাতী মুরশুমী ফুলের গাছ, নানা রঙের ফুল, জ্যামিতির সমস্ত চিত্র ও রেখা বৈজ্ঞানিকের কাজে লাগান হ'য়েছ। হোটেলের পশ্চাতেই র'য়েছে নর্ম্ম উদ্যান। সেখানে সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, নৃত্য সমস্ত আয়োজনই র'য়েছে। বিলাতী ব্যাণ্ড দিনে তিনবার তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। তাইগ্রিসে মেরিণ এয়ার পোর্ট হোটেলের পূর্ব্বদিকে, আর ল্যাণ্ড এয়ার পোর্ট হোটেলের পশ্চিমে। জলে ও স্থলে এই বিমানপোতের সঙ্গম অতি বিচিত্র। আমরা হোটেলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রবার পূর্ব্বে ইরাকীয় কাষ্টমস্ এবং পোর্ট অফিসার নানারকম প্রশ্ন ও সংবাদ নিয়ে আমাদের অব্যাহতি দিলেন। তারপর আমরা লাউঞ্জে ব'সলাম। কি মূল্যবান তৈজসপত্র। আমাদের একটু হট্ ও কোল্ড পানীয় (Hot and cold drink) এর ব্যবস্থা ক'রে প্রধান ওয়েটার ফরাসী ভাষায়—জানিয়ে দিলে,— বিভিন্ন যাত্রীর নির্দ্দিষ্ট কামরা। আমি ও কাপ্তেন সিং পাশাপাশি কামরায় গেলাম। কামরায় র'য়েছে সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাব, তদুপরি একটী রেডিও, আর একটী টেলিফোন। প্রত্যেক কামরার জন্য একটী ক'রে আলাদা ভৃত্য। আমি স্নান করে বেরিয়ে দেখি, আমার টেবিলে র'য়েছে পরের দিনের বাগদাদ যাত্রার ব্যবস্থা-বিজ্ঞপ্তি; আর এক থালা ফল ও এক গ্লাস লেমন স্কোয়াস। ভৃত্য ব'ল্লে— রঙীন পানীয় চাইলে ভিন্ন দাম দিতে হবে। আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম,— এই হোটেলের দক্ষিণা কত? উত্তর দিল,—প্রথম শ্রেণী ৪ পাউণ্ড ৫৫্ টাকা দৈনিক। বাস্তবিকই হোটেলের যা আয়োজন,—আসবাবপত্র, বিলাসের ব্যবস্থা, রেডিও, টেলিফোন, সিনেমা, নৃত্য—তার বিনিময়ে ৪ পাউণ্ড যুদ্ধের দিনে খুব বেশী নয়। তবে মহীশূরের মাউণ্ট পেলিরার হোটেলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে একটা বিশেষ মূল্য অথবা দার্জ্জিলিংএর মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য র'য়েছে, সেটা মানুষের হাতে গড়া শাত-ইল্-আরব হোটেলে ছিল না।

এই হোটেলের বিশেষত্ব এই যে, কোন বেয়ারা কোন কথা বলে না। অদৃশ্য শক্তির মন্ত্রবলে এরা চ'লেছে যন্ত্রের মতন। মাত্র প্রধান বেয়ারা কথা বলে। আমরা বেয়ারাকে ডেকে তাইগ্রিসের ওপারে একটী ট্যাক্সির বন্দোবস্ত ক'রে কাপ্তেন সিংএর সাথে বেড়াতে গেলাম। কাপ্তেন সিং রসিদ আলির বিদ্রোহের সময় প্রথম মালয় থেকে ইরাকে আসেন। সুতরাং বাসরা, বাগ্‌দাদ ও নিকটবর্ত্তী স্থান তাঁর পরিচিত। তিনি সঙ্গে থাকাতে অন্যান্য ভারতবাসীদিগের নানা সংবাদ জানতে পেলাম। বহু বাঙ্গালী বাসরায় র'য়েছেন, তাঁরা ব্যাঙ্কে, জাহাজে, পোর্ট অফিসে, একাউণ্ট বিভাগে কাজ করেন। যুদ্ধের বহু সামগ্রী বাস্‌রা বাগ্‌দাদের পথ দিয়ে তেহরাণ, চীন ও মস্কোতে যায়। যুদ্ধের সময় ব'লে কাপ্তেন সিং কোন কথা বল্লেন না, তবে চোখ থাক্‌লে অনেক কিছুই দেখা যায় ও বোঝা যায়।

আমরা প্রায় সাড়ে দশটায় ফিরে এলাম। তখন মাত্র ১ ঘণ্টা রাত হ'য়েছে। পাশে ব্যাণ্ড চলছে। একজন সামরিক কর্ম্মচারীর বিদায় উপলক্ষে নৃত্যের আয়োজন হয়েছে। তারপর ডিনার। ডিনার হলে দেখলাম হোটেলে দলে দলে বাসরার অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী— সুবেশা, সুবেশিনী ভোজনোদ্দেশে সমাগতা। রাজশেখর বসুর ভাষায় "পরণে বাঁদিপোতার গামছা, ঠোঁটে সিন্দুর," মুখে শুভ্ররেণু মণ্ডিত, ভ্রূ-চিত্রিত; পরিপূর্ণ ইউরোপীয়—সরমের বালাই নেই। পাশে র'য়েছে সুবেশ পুরুষ-সঙ্গী। এখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে শাত্-ইল্ আরব হোটেলের পান 'ভোজন আভিজাত্যের নিদর্শন।

ডিনারের পর হোটেলের আর এক পাশে বায়োস্কোপ হবে। আমি

যাব না, তবে আমার প্রকোষ্ঠ থেকে জানালা খুলে দিলে নৃত্যের অংশ বিশেষ দেখা যায়। ডিনারের পরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। হোটেলে পোষ্ট অফিস রয়েছে, ভারতবর্ষের পয়সার বদলে কিছু ইরাকীয় টিকিট ও মিশরীয় পয়সা কিনে নিলাম।

আমরা এবার ঘুমোব। বিছানায় শুয়ে আছি। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে। পাশের নৃত্যমঞ্চ চঞ্চল চরণাঘাতে রণিত, মাঝে মাঝে বিলাসের অট্টহাসি কানে এসে পৌঁছুচ্ছে; কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না—হঠাৎ ঘুমভাঙবার পর দেখি ৪টা বেজেছে; তখনও সঙ্গীতের রেশ চ'লছে। জানলার পাশে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দেখছি, ত্রয়োদশীর চাঁদ ও মুরসুমী ফুলের লুকোচুরি খেলা। আবার ঘুমিয়ে প'ড়লাম, কারণ ভোর পাঁচটায় উঠ্‌তে হবে। আমাদের বিমানে সাড়ে সাতটায় আমরা বাগ্‌দাদের পথে রওনা হবো। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভক্তের কল্পনা সে যে সাধারণ কল্পনা তো নয়।
তাঁর স্বপ্ন সত্য হতে কতক্ষণ লাগে বা সময়?
সকল আকাঙ্ক্ষা আশা তাঁর—
বহে ছাপ পরিপূর্ণতার,
আপনার করি লন তাঁর ইচ্ছা নিজে ইচ্ছাময়।

২

সুন্দর মন্দির শ্রেণী—সুবিশাল ওই দেবালয়,
কি গম্ভীর? কি বিপুল? চারুতায় কি মহিমাময়!
হৃদয়ের অলক্তকে আঁকা
কি প্রার্থনা রহিয়াছে ঢাকা—
শিল্পী তার অনুরাগ রেখে গেছে করিয়া অক্ষয়।

৩

আনন্দের গভীরতা প্রস্তরেতে দিয়ে গেছে ছাপ,
পুণ্যের নির্ম্মল করে গঠিত উহার প্রতি ধাপ।
কাব্য হেথা ভকতির সনে
গড়াগড়ি দিতেছে অঙ্গনে,
নিজেরে বিলায়ে অর্থ—করেছে ধর্ম্মের সঙ্গ লাভ।

৪

কাড়িয়া ভূখণ্ড এক, কে যেন অমৃতলোক হতে,
নিজ পুণ্যে আনিয়াছে ধরণীর এ ধূলার পথে।
গড়া নয়—সদা ভাবি আমি
এ মূরতি আসিয়াছে নামি—
সাধকের তপস্যায় করুণার হিরণ্ময় রথে।

৫

শিল্পী, কবি, ভক্ত তিনে—এ দেউল গড়েছে নির্জ্জনে,
ভাসি আনন্দাশ্রু নীরে—একসাথে বসি একমনে।
লাবণ্যের এইখানে শেষ,
অপরূপ ধরিয়াছে বেশ,
ধ্যান পেলে মূর্ত্তি হেতা—রূপ আসি লুটালো চরণে।

৬

জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, হে মোদের বুকের ঈশ্বর,
এই গুপ্ত পল্লী বুঝি তব প্রিয় গোয়ালার ঘর?
অনাদৃতে এইরূপ করি
অনন্ত গৌরব দাও হরি,
কৃপায় কোথায় এসো—মানব মনের অগোচর।

৭

সত্য দেব, তুমি সরস্বতী, ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমের রাগে
অঙ্কিত করিলে যাহা নিবিড় ভকতি অনুরাগে—
তাই সত্য, তাহাই বাস্তব,
অপ্রাকৃত মিথ্যা আর সব,
তোমারি আকাঙ্ক্ষা আজ মূর্ত্তি-ধরে এইখানে জাগে।

৮

এ শুধু দেউল নয়, মনশ্চক্ষে দেখিতেছি ঠিক—
অপূর্ব্ব ইষ্টকে গড়া—তব বীজমন্ত্র—তব ঋক।
সাধন জীবন ব্যাপি তব—
তব প্রেম অগাধ দুর্লভ,
আকার পেয়েছে হেথা—চেয়ে আছি আমি নির্নিমিখ।

৯

চক্ষু আসে আর্দ্র হয়ে, নমস্কার করি নমস্কার,
তুমি যে মিলায়ে আছ অঙ্গে অঙ্গে তব দেবতার।
তুমি মহাকবি, তুমি ধ্যানী,
সার্থক জীবন মম মানি
তোমার চরণ ধূলা শিরে তুলি লই বারম্বার।

১০

তুমি সবাকার বড়—বক্ষে তব রাজে বিশ্বম্ভর,
পড়ে তাঁর স্নান জল নিত্য তব মাথার উপর।
তাঁর পূজা পুষ্প নিজে হায়—
দেন হরি তোমার মাথায়,
তোমার অনন্ত পুণ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য হলো একত্তর।

আর্থিক দুর্গতি ও যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা

শ্রীউষাপতি ঘটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এতদিনে শেষ হইল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই বিজয়োৎসবে ভারতেরও বিশেষভাবে যোগদানের কথা; কারণ ভারত ইউরোপে এবং সুদূর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল বিশেষতঃ বাঙ্‌লা ও আসাম এই যুদ্ধে সত্য-সত্যই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; বাঙ্‌লার অগণ্য নরনারীকে অনশন-ক্লিষ্ট দেহে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে, প্রধানতঃ এই যুদ্ধের জন্যই। রণক্ষেত্রে যাহারা বীরত্বের সহিত মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বার অনলে ভস্মীভূত হইয়াছে—তাহাদের বীরত্ব অপূরণীয়।

বর্ত্তমান যুগের মহাযুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক অধিবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলে না। যে-যুগে আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ-করিয়া অসহায় নরনারী ও শিশু হত্যা করিয়া মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা সৃষ্টি করা চলে—সে যুগে সামরিক ও অসামরিক অধিবাসী বলিয়া কিছু নাই। যুদ্ধে যাহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা যাহাতে কর্ম্মহীন বেকার হইয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন—তেমনি এই মহাযুদ্ধের ফলে যাহারা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের কথাও আমাদের বিবেচনা করা অধিকতর আবশ্যক। এখন, প্রকৃত কাজের সময় উপস্থিত। বাঙ্‌লার দুর্গত অধিবাসীদের জন্য সাহায্যের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে সরকারের তাহা এখনই প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর সংগঠনে ভারতের শিল্পোন্নতি কোন পথে চলিবে, তাহা আজ পর্য্যন্ত প্রস্তাব, পরিকল্পনা ও আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বেকার-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি? কারণ পৃথিবীতে যেরূপ খাদ্যাভাব, তাহাতে অকস্মাৎ যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতে যাহারা বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদের ক্রয় শক্তির অপ্রাচুর্য্যতা হেতু খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না,—কারণ পৃথিবীতে খাদ্যাভাব হেতু খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। সুতরাং একদিক হইতে চাহিদা কমিলেও—অন্যদিক হইতে চাহিদা বাড়িতে থাকিলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবার আশা নাই।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের প্রধান সমস্যা হইতেছে,—বেকার সমস্যা। এই সমস্যা-সমাধানের একটা উপায় হইতেছে,—ভারতের শিল্পোন্নয়ন। কিন্তু,—বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানী করিয়া যাঁহারা ভারতের শিল্পোন্নয়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের স্বপ্ন দিবা স্বপ্নের ন্যায় নিরর্থক হইবে; কারণ পৃথিবীর অনেক দেশের যন্ত্র শিল্প বিধ্বস্ত। যে সমস্ত দেশের স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিবার ক্ষমতা ছিল,—তাহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানি ও গ্রেটব্রিটেন প্রধান। ইহার মধ্যে আমেরিকার অবস্থা ভাল। জার্ম্মানির শিল্প-সমূহ বিধ্বস্ত; আর যুক্তরাজ্যের ত কথাই নাই। যন্ত্রাদির জন্য এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকার পক্ষে প্রাচ্যের দিকে না চাহিয়া পাশ্চাত্য-জগতের শিল্পোন্নতির কথাই বিবেচনা করা স্বাভাবিক। আবার অনেকে বলিতেছেন,ভারতেই কলকব্জা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন; তাঁহারাও বিভ্রান্ত; কারণ যুদ্ধের সময়ে ভারত বিশ্ব-বাণিজ্য প্রতিযোগিতার হাত হইতে নির্ম্মুক্ত থাকায় সাময়িক শিল্পোন্নতি হয় তো এদেশে দেখা গিয়াছে; কিন্তু সেইজন্য যে অ্যাংলো-আমেরিকান জাতি ভারতে কলকব্জা উৎপাদনের সুযোগ দিবেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।* যুদ্ধে ভারতে যে সামান্য শিল্পোন্নতি দেখা গিয়াছে,—উহা যদি কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার দ্বারা রক্ষা করা না হয়,—তাহা হইলে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রবলস্রোতে উহা তৃণখণ্ডের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে। তা ছাড়া, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করা তাহাদের বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থী। হয়তো কোন সুদূর (?) ভবিষ্যতে অ্যাংলো-আমেরিকান জাতি সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতকে কিছু-কিছু যন্ত্র-শিল্পে উৎপাদন উপযোগী সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে দিতে পারে,—কিন্তু ভারতের কলকব্জা না থাকিলে

---

* "The highest that these···Anglo-American alli[es] can concede to the backward, colonies and dependenci[es] in the line of industrialisation is the production [of] consumption goods by modern machinistic method[s]. But they are opposed to the manufacture of mach[i]neries, tools, implements...investment goods by th[e] backward, colonies and dependencies"—The *Equation of world Economy* by Prof. B. K. Sarkar pp. 96.

সে প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অন্যান্য-দেশের ন্যায় এদেশেও বেকার সমস্যা দেখা দিবে। এই প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য ইংলণ্ডে "বিভারিজ পরিকল্পনা "(Beveridge Plan of Social Security) প্রস্তুত হইয়াছে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Capitalistic Socialism) যে দেশে প্রবল, সে দেশে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা * হইবেই; কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে শ্রমিক সরকার (Labour Government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—তাঁহারা শ্রমিকগণের জন্য জাতীয় বীমা বা জাতীয় নিরাপত্তা (National Insurance)—বিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। "বিভারিজ পরিকল্পনা" এই প্রকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সরকারী সাহায্যের সর্বনিম্ন পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ ও সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ প্রায় ৬১ ভাগের কাছা কাছি দেখানো হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এইরূপ কোন পরিকল্পনার দায়িত্বভার বহন করা সম্ভবপর কিনা তাহা এখন হইতেই বলা যায় না। তবে বিভারিজ পরিকল্পনা ১৯৪২—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিবার কথা। প্রায় ২২।২৩ বৎসর স্থায়ী একটী পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে সাফল্য মণ্ডিত হইবে না, এইরূপ নিরাশা আমরা পোষণ করি না। তবে ভারতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে:

প্রথমতঃ, এদেশে যাঁহারা জাতীয় শিল্পোন্নতির কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রত্যেক জাতীয় পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) অন্তর্গত,—তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Capitalistic Socialism) বা রুশিয়ার ন্যায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Communistic Socialism) হইতেও পারে; কিন্তু ভারতে এখনও সমাজতন্ত্রবাদ প্রসারিত হয় নাই। ভারতের শাসন ব্যবস্থা এখনো প্রাচীন আদর্শে গঠিত।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনা এদেশে সীমাবদ্ধ; আয়ের পথ নানাদিক হইতে অবরুদ্ধ হইলে ভবিষ্যতের যে কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে।

তৃতীয়তঃ যে কোন পরিকল্পনা করা যাউক না কেন, তাহার সহিত ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে জড়িত। ভারতের স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠিলে কোন পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবেনা।

আমাদের মনে হয়, ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আর্থিক দুর্গতি লাঘবের জন্য এখন হইতে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথমতঃ দ্রব্যমূল্য যাহাতে স্বাভাবিকভাবে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় তাহার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control System) তুলিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (Rationing System) বলবৎ রাখা যদি অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে ভারতের প্রধান শস্য চাউল, গম প্রভৃতির মূল্য যথাসম্ভব কমাইতে হইবে,—কারণ ইহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট। যাঁহারা বলিতেছেন যে অন্যান্য দ্রব্যের দাম না কমিলে চাউল প্রভৃতির দাম কমিবে না তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে যাহারা হাজার হাজার টাকা লাভ করিয়াছে, তাহাদের বর্দ্ধিত আয়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা ক্রমবর্দ্ধমান হারে (Most progressive rate) কর বসাইয়া সাধারণের উপর করভার লাঘব করা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধ জনিত আয় যেখানে নূতন নূতন আর্থিক পরিকল্পনায় বা লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধনে পরিণত করা হইয়াছে সেখানে ঐ প্রকার আয়কে করভার হইতে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়া আবশ্যক, কারণ আয়ের (Income) উপর করভার চাপান যাইতে পারে, কিন্তু মূলধনে পরিণত আয়কে (Capitalised Income) কর হইতে প্রথম অবস্থায় রেহাই দিলে সরকার পরে ঐ সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের আয় হইতে লাভবান হইবেন।

তৃতীয়তঃ সরকার হইতে ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা; সর্বসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাধারণকে আয়ের একটা অংশ জমাইবার জন্য প্ররোচিত করা উচিত; কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষার উন্নতি বিধান, প্রভৃতি অনেক পরিকল্পনা সরকারের আছে। ভারতীয়গণ অনেক সময়ে ঋণ লইয়া সরকারকে ঐ সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে সরকার ঐ সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। এখন এইসব জনহিতকর কার্য্যসাধনে সরকারের অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে অনেক শিল্পী, বিশেষজ্ঞ, কেরাণী এবং শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। ইহাতে বেকার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্থতঃ, এই মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ জলে, স্থলে ও আকাশে বিশ্ব-মুক্তির যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন

---

* "The Beveridge Plan in being assailed openly and by tricky insinuation. Diehards are pulling political strings"—*John Bull* (London) of November 2, 1942.

করিয়াছে। ভারত যাহাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপদাপন্ন না হয় তাহার জন্য ভারতে এক একটা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের প্রয়োজন আছে। এই সব কার্য্যেও অনেক ভারতবাসীর জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ মিলিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ সরকারের কাছে ভারত সরকারের যে টাকা পাওনা (Sterling Balances), উহা ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে উহা হইতেও সরকার কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য অনেক জন-কল্যাণকর কার্য্যে অনেক টাকা নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহার মধ্যে বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা প্রধান। ইহাতেও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

ভারতের শিল্পোন্নতির কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে কলকব্জা আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আপাততঃ আমাদের নির্দ্ধারিত পথে চলিলে ভারতের আর্থিক উন্নতি দেখা যাইবে, দ্রব্য-মূল্য কমিতে থাকিবে ও জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতির লাঘব হইবে। বেকার সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অনেক সমস্যার জটিলতা কমিয়া যাইবে।

আইন্‌ষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীর একদিক্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

ঋষি যখন বলেন অতি মানস স্তরের কথা, কবি যখন গান বিশ্বসত্তার পরশের বিষয়,

'জাগরণে
ধেয়ানে, তন্দ্রায়, বিরাম সমুদ্রতটে
জীবনের পরম সন্ধ্যায়'

তখন এই ইলেকট্রন্ প্রোটন্ আইসোট্রপ অণুপরমাণুর ঘূর্ণীর রহস্য ভেদ করা প্রচণ্ড বিজ্ঞানের যুগের আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা আমরা শুনি, এ সব হচ্চে বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রসূত নয়, শুধু ভাববিলাস, কল্পনার আতিশয্য, 'Hypostatised Sensation in the pit of the stomach, যুক্তি বিচার, যান্ত্রিক পরিমাপ, ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা বিশ্লেষণগ্রাহ্য নয়।

কথায় বলে বড় বৈজ্ঞানিক শুধু বড় জ্ঞান তপস্বী নন্, বীর সাধক, তাঁরা কবি। কল্পনা করুন সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নেই, নীহারিকা নেই, সীমাহীন, দিশাহীন শূন্য (যেন আচার্য্য আর্য্যদেব বা ভদন্ত নাগসেনের কথা মনে পড়ে) শুধু ইলেকট্রন প্রোটন্—স্তব্ধ সমাহিত নিষ্কম্প স্বয়ম্প্রকাশ—পজিট্রন্ বা যুগ্ম আলোককণার সন্ধান নেই—বহু লক্ষ বর্ষ পরে যোগনিদ্রা ভাঙ্গলো, চাঞ্চল্যের হয় সুরু, 'Potential wall' যায় চূর্ণ হয়ে 'nuclear bombardment'এ, জমাট্ বাঁধে সৃষ্টির স্তর—আসে গতির বেগ, নৃত্যের ছন্দ, নটরাজের তাণ্ডবে বিবশা বিশ্ব চেতনায় জাগে। তার কত শত যুগান্ত পরে জাগে এই সুন্দরী ধরণী, যে একদিন কায়াহীনা মায়াবিনী রূপে আকাশ পথে তূর্য্য বাজিয়ে সূর্য্যের পিছনে ঘুরে বেড়াত অভিসারিকার অন্তরের প্রচণ্ড দাহ নিয়ে। বৈজ্ঞানিক যখন এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন তখন একে কি বলব? "দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি" দেবতার যা কাব্য, যা মরেও না, যা জীর্ণ হয় না তারই সত্যস্বরূপ বৈজ্ঞানিকরা উদ্ঘাটন্ করেন। আজ তাই মনে হয় পৃথিবীর যাঁরা বড় বৈজ্ঞানিক, যাঁদের চিন্তার ও বীক্ষণের ধারা যুগান্তর আনে প্রকৃতির রহস্যদ্বার উন্মোচনে, তাঁদের ব্যক্তিগত দর্শনবাদ (Personal Phiilosophy) বা দৃষ্টিভঙ্গী আজ কোন দিকে? মনীষী আইন্‌ষ্টাইনের কথাই আলোচনা করা যাক। আলবার্ট আইন্‌ষ্টাইনের নাম জানেন না এবং তাঁর রিলেটিভিটি মতবাদের নাম শোনেন নি এমন শিক্ষিত মানুষ আজকের পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আইন্‌ষ্টাইন্ বলেন—আমরা পৃথিবীতে আসি কিছুদিনের জন্য—কেন তা জানি না—হয়ত এর ভিতরে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে—মাঝে মাঝে তা মনে যে হয় না তা নয় কিন্তু একটা কথা এর মধ্যে বড় হচ্চে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সেটা হোক্ মধুময়—অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যে যোগ সেটা হচ্চে নাড়ীর সম্পর্ক। শুধু যে আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের কাছে পেয়েছি

শত যুগান্ত আগে যে মানুষ যাত্রা করেছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ
জীবনে মরণে পথের শরণে
দুনিয়ার যত পদাতিকদের
একটি প্রণাম লহ

শুধু তাঁদের নয়—সেটা ত Biologyর সত্য—আমার পাশের মানুষ, সঙ্গের মানুষ—প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তারা আমাদের কত দিচ্চে—আমরা যত পাচ্চি তত কি দিতে পারছি—এই দেওয়া নেওয়ার ঋণশোধের অন্ত নেই। শোপেনহরের একটি বাণী আছে "A man can surely do what he wills to do, but he cannot determine what he wills" এই মতবাদ আইন্‌ষ্টাইনকে আকৃষ্ট করেছে ছেলেবেলা থেকে।

তিনি বলেন এই মতবাদের একটা সুফল হচ্ছে যে জীবনে ব্যর্থতা, দুঃখ কষ্টের জন্য দোষ দিতে হয় না অপরকে, উদার অনুভূতি আসে, সব দ্বন্দ্ব দোলা সংশয় আঘাতকে গ্রহণ করা যায় ক্ষমাসুন্দর চক্ষে, এক বিজ্ঞজনোচিত ঔদার্য্যসুলভ কৌতুকের ভঙ্গীতে। ব্যবহারিক প্রাত্যহিক জীবনে নিছক মূঢ়তা হচ্ছে গভীর তন্ময় দৃষ্টিতে কেবলই ভাব জীবনের অর্থ কি? তার রীতি নীতি কি? ধ্যানধারণা কি? কস্তং, কুতঃ আয়াতঃ—কেবলই কি চিন্তা করব রাত্রির কোন অদৃশ্য রহস্যলোক হতে জীবন তরী উত্তীর্ণ হয় প্রভাতের আলোয়, আবার বিলীন হয়ে যায় অন্ধকারের সীমাবিহীনে! কিন্তু তাই বলে জীবনের এ আদর্শ নয় যে খাব দাব কাঁসি বাজাব, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। জীবনের পিছনে থাকবে একটা আদর্শে নিষ্ঠা, যা দেবে কর্ম্মে প্রেরণা, জোগাবে চিন্তার খোরাক, আনবে যাত্রাপথে অমেয় উৎসাহ, বৈচিত্র্য ও আনন্দ।' তাই আইনষ্টাইন্ প্রাচ্যের ঋষিদের পুনরাবৃত্তি করে বললেন তাঁর জীবনের আদর্শ হচ্ছে goodness, beauty and truth শিব, সুন্দর ও সত্য। জীবনটা প্রাচুর্য্য ও বিলাস সুখে ভরিয়ে তুলতে হবে এই মোহ নয়—এ রকম জীবন মেষযূথের পক্ষেই শোভা পায়—আমার প্রচুর টাকা ও জিনিষ হবে, নাম ও খ্যাতি, বাইরের সফলতায় ভর্ত্তি জীবন আইনষ্টাইনের জীবনবেদের কাছে 'এহ বাহ্য' তুচ্ছ ও হেয়। সরল মুক্ত অনাড়ম্বর জীবন দেহও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী ত নয়ই, সহায়ক; কিন্তু তাই বলে মানুষের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে নয়।

যত বড় যোগক্ষেম ব্যক্তি হোন—দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, ভয় ক্রোধে বীতরাগ—মানুষ চায় সবার কাছে একটা স্নেহের পরশ, ভালবাসার ছোঁয়া যা মনকে রাঙিয়ে দেবে, রোসিয়ে দেবে এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যঘন মাধুর্য্যের রসে। তাই আইনষ্টাইন্ বলেন যে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত, এক চিন্তাধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার সৌভাগ্য যদি না পেতাম আমার যৌবন হত শূন্য। অথচ বহু মনীষীকে দেখা যায় যে তাঁরা মনে একক্ অনাত্মীয়, উদাসীন; বহু আত্মীয় স্বজন স্তাবক ভক্ত শিষ্য অনুরাগীর দল রয়েছে, জনসমারোহ, সমাজ কোলাহলের কথাই ছেড়ে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখি সেই আপন-ভোলা বৈরাগীকে, যার একতারাতে ঘর ছাড়া সুর ঝঙ্কার। আইনষ্টাইনের মধ্যেও সেই অনাসক্ত মন্, নিরাসক্ত ভোগীর প্রতীক্, দেশকালের অতীত। "I am a horse for single harness"। এক বৃহত্তর পটভূমিকায় এই মনীষীরা, দেশের গণ্ডী, পরিবারের পরিধি, সমাজের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন বলে সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় নিজের পরিবেশের উপর একটা ঔদাসীন্য, একটা বহির্বিমুখীনতা "সব দেশে মোর ঠাঁই আছে আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া"। "I have never belonged whole heartedly to a country or state or to my circle of friends or even to my own family" এটা শুধু আইনষ্টাইনের কথা নয়—বহু মনীষীর।

সমূহ জীবনে দেখা যায় যে অগণিত জনসাধারণ চায় না চিন্তা করতে নিজেরা, তারা চায় একজন 'চিন্তা' করুক্ দায়িত্ব নিক্। সমাজ জীবনে শ্রেণী বিভাগ এইজন্য, সেই বিভেদ দাঁড়িয়ে আছে জোরের উপর। অথচ একথাটাও সত্য যে, যা কিছু থাকবে শাশ্বত হয়ে, সেটা হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানব সত্তা "The creative and impressionable in dividuality, the personality" যে মানুষ গড়ে, চিরকালের অপরাজেয় অপরিমেয় মানুষ। আজ যা ঘটছে কাল তা ইতিহাসের অতীতে মিলিয়ে যাবে ছেঁড়া পাতায়, অনাগত দিনের লোকেরা ভাববে কি বোকা ছিলাম।

আমাদের জীবনে আমরা যা সব চেয়ে বেশী উপভোগ করি তা আমাদের কাছে রহস্যমাত্র, যা থাকে যবনিকার অন্তরালে। এই বিচিত্রের রহস্যভেদ, তার প্রকাশই হচ্ছে আর্ট ও বিজ্ঞানের প্রধান সূত্র। যে মানুষের মনে এই রহস্যোন্মোচনের কথা জাগেনা—যার মনে এর দোলা লাগেনা—সে মানুষ মৃতেরই সামিল। চক্ষুষ্মান হয়েও সে অন্ধ।

জীবনের রহস্যভেদের জন্য যে সৃষ্টি করা দৃষ্টির দরকার, তারই তাগিদ মানুষকে এগিয়ে দেয় ধর্ম্মবাদের দিকে। জানব, বুঝব, দেখব, সেই জিনিষকে যা অনির্ব্বচনীয়, যা অপরূপ, যা রসস্বরূপ রহস্যঘন, যার মধ্যে সন্ধান পাব অজানার বিচিত্র লীলার, অথচ যা আমাদের বুদ্ধির অতীত হবে না, যার সৌন্দর্য্য মনকে আচ্ছন্ন করবে—এই যে জ্ঞান, এই যে বোধি এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের দ্যোতক্। এই বোধশক্তিতে বিশ্বাসই হচ্ছে সত্য এবং সেই হিসাবে আইনষ্টাইন একজন সত্যসন্ধানী ধর্ম্মবিশ্বাসী। কিন্তু এ কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে আমি কখনও এমন এক ভগবানকে কল্পনা করিনি যিনি স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসনে বসে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ডেকে হাইকোর্টের মত বিচার করতে বসবেন। মানুষ এইরূপ কল্পনা করে ভয়ে ও অজ্ঞানে। এও বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে আমার এই দেহের বিনাশের সঙ্গে আমার বিশিষ্ট সত্তার বিনাশ হবেনা। আমি শুধু এইটুকু ধারণা করতে পারি যে যুগযুগান্তর ধরে সৃষ্টির মধ্যে একটা প্রাণবান ধারা বহমান্ হয়েছে। এই যে বিরাট বিপুল বিশ্বে আমরা চোখ মেলেছি তার কতটুকু আমরা জানি এবং কতটুকু বুঝি—কি অপূর্ব্ব এই বিশ্ব রচনা। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার অব্যক্ত রহস্য একটুও যদি ব্যক্ত করতে পারি তবেই সার্থকতা।

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

এতদিন আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল যে দেশ কাল এবং বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা এবং দেশ ও কাল বস্তুর আধার। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সূত্র ছিল কার্য্য কারণ সম্বন্ধ (causality) ও প্রকৃতির নিয়মানুগত্য (uniformity of nature)। তাঁরা আরও ধরেছিলেন যে ইথারই শক্তির আধার ও বাহন। কণাদের মত ড্যাল্টন্ বল্লেন যে জড়কণা (atom)ই হচ্ছে বিশ্বের গোড়ার জিনিষ। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করিতেন যে এই হচ্ছে বিজ্ঞানের শেষ কথা।

আইনষ্টাইন্ ও আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে দেশ

কাল ও বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, দেশ এবং কাল আধারও নহে, আধেয়ও নহে, Time and space are not containers nor are they contents—they are variants—তাহারা বস্তুর অবধারণ মাত্র, কারণ বস্তুর "primary qualities" মৌলিক গুণ কিছুই নেই তার গতি (motion) ব্যাপ্তি (Extension) বা জড়মান (mass) সবই আপেক্ষিক সমকালিক্ (simnltaneous) নয়। ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরেও দেখা দিল চতুর্থ Dimension —যার গতি ডিম্বাকৃতি নয় spiral (পাকানো)। তার পর আসিল জড়ের জড়ত্ব নাশ, অনিশ্চয়তা (Indeterminacy), ম্যাক্সপ্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম্ "তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং" সবই তেজ পদার্থমাত্রেই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক্ বিদ্যুৎকণার সমষ্টি—অতি পরমাণুর ঘূর্ণী ও লাফ। হাইড্রোজেন সম্বন্ধে নীলস্ বোহরের গবেষণা দেখাইল কেন্দ্রে প্রোটন্ চারিদিকে হালকা ইলেকট্রণের ঝড়। ঝড় উঠিল বৈজ্ঞানিক্ মহলে। অপরদিকে Applied Biologyর দিক থেকে বৈজ্ঞানিক্ ষ্ট্যানলি আনলেন virusকে জড় ও জীবনের মাঝখানে। ওদিকে Heiseenberg Schurodinger বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না, তারা দেখলেন শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গ-মালা (waves of probabilily) আধারবিহীন বৈদ্যুতিক ভরণের সমষ্টি, দেশ কাল সমবায়ে ঘটনাপুঞ্জ, যাহাদের গুণ নির্দ্দেশ করা যায় গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা (a system of spatio temporal entities whose qualities are exclnsively mathematical)। দার্শনিকরাও বসে নেই, তারাও (আঁরি বের্গস, লয়েড মর্গ্যান্, হোয়াইহেড প্রভৃতি) বলতে আরম্ভ করলেন বস্তু জড় নয়, চঞ্চল; তাহাদের ভিতর প্রবল আলোড়ন চলিতেছে বিরোধের, দ্বন্দ্বের (Dialectic) নব নব রূপের বিকাশ হচ্ছে চঞ্চলা নদীর মত, তাই পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে' কাল প্রবহমান্, ক্রমসঞ্চয়ী, ক্রমবর্দ্ধমান—গতিশীল সৃষ্টিশীল জগত (Emergent Evolution)।

আজ তাই দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিক্ ও চিন্তাশীলদের মনোরাজ্যে এক প্রবল আন্দোলন, সৃষ্টির মূল রহস্য কি? গতি কোন দিকে? অনেকে অভিযোগ করেন যে জীনস্ এডিংটন্ প্রমুখ অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানকে নিয়ে চলেছেন কল্পনারাজ্যের আশ্রয়ে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের বদলে সর্ব্বং খল্বিদং mathematical symbol এর মধ্যে তারা বাস্তবকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ অভিযোগ হয়ত সত্য নয়—কারণ রহস্যভেদের মূল কোথায় কেউ জানেনা, বাক্য ও চিন্তা নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসে। অনধ্যাত্মবাদী হ্যালডেনই বলেন যে প্রকৃতির পিছনে কিছু নেই এটা ধ্রুব সত্য, কিন্তু আমাদের যা জ্ঞান তাতে করে প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপকে জানা যায় না—তার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর চেয়ে ঢের বেশী। চিরকালের মানুষ রহস্যসন্ধানী—সে চায় উন্মোচন করতে, সত্যের মুখ আচ্ছন্ন অপাবৃণু 'হচ্ছে তার মন্ত্র। এই সম্পর্কে আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীই সত্য বলে মনে হয় তিনি বলছেন যে এই রহস্য উন্মোচনই আমাদের ব্রত, কিন্তু সেটা কিছু কল্পনাশ্রয়ী অতীন্দ্রিয় কিছু নয়।

"We try to find our way through the maze of observed facts, to order and understand the world of our sense impressions. We want the observed facts to follow logically from our concept of reality. Without the belief that it is possible to grasp the reality with our theoretical constructions, without the belief in the inner harmony of our world, there could be no science. This belief is and always will remain the fundamental motive for all scientific creation. Throughout all our efforts, in every dramatic struggle between old and new views, we recognise the eternal longing for understanding, the ever fine belief in the harmony of our world, continually strengthened by the increasing obstacles to comprehension."

শরণাগতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(সত্যঘটনা অবলম্বনে)

'—সে সন্ন্যাসী গুরুদেব সমর্পিল এ আশ্রম,—সেইজন কোথা কেবা জানে।
দিন-ধেনু চলিয়াছে অনন্তকালের গোষ্ঠে, ব্যথা পাই মোর ভগ্ন প্রাণে।
শূন্য জীবনের তীরে ছায়া দোলে নিরাশার, নেমে আসে সন্ধ্যা বুঝি মোর—
আমার আরাধ্য দেবী ! তুমিও দিলে না দেখা—কহে ভক্ত ঝরে আঁখিলোর।
পার্শ্বে তার সহচর, সম্মুখে বিগ্রহ শোভে, শীর্ষে উষা-সৌন্দর্য্য উদার,
শ্যামল কুটীর-প্রান্তে পুষ্পগন্ধে সমীরণ বহিতেছে শান্তি বসুধার।

পড়ে মনে দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির স্মৃতি যত,—যৌবনের উৎকণ্ঠিত আশা,
পড়ে মনে পিতৃহারা মাতৃহারা জীবনের প্রভাতের আশ্রয়-পিপাসা
স্বজনের দ্বারে দ্বারে। অত্যাচার নিষ্পেষণ পদে পদে নিয়ত লভিয়া
পথে পথে কেঁদে কেঁদে বাউলের করুণায় নামমন্ত্র প্রত্যহ জপিয়া
কবে কোন্ দিনে এলো জন্মভূমি বঙ্গভূমি ত্যজি, রহে তাহা বিস্মরণে,
দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে বাল্যজীবনের শেষে যৌবনের জন্মান্তর সনে

ভ্রমিয়াছে। বৃন্দাবনে তবু দেখা মিলিল না, জপে জপে মালা যায় ঘুরে,
সংসারের ঘাটে ঘাটে চলেছে জোয়ার ভাঁটা সুদূরের বাঁশরীর সুরে।'
'—ক'র শিষ্য বিগ্রহের নিত্য সেবা—' বৈরাগীর অশ্রু ঝরে কহিতে কহিতে,
কাঁপে মোর ব্যাকুলতা, পারি না সহিতে ব্যথা, লক্ষ্য মোর বিপুল মহীতে
অলক্ষ্যে হারায়ে যায়, লহ মোর মৃদঙ্গেরে, ভক্তিভরে নিশীথে প্রভাতে
মনপ্রাণ সঙ্কীর্ত্তনে সঁপিও সবার সাথে,—বিগ্রহের শুভ দৃষ্টিপাতে
সুন্দরের অভিসার হবে চিত্ত-যমুনায়—' শিষ্য তারে করিল প্রণাম,
আলিঙ্গন দিয়া কহে—'চলিলাম—শিষ্য মোর ত্যজিও না বৃন্দাবন ধাম।'

শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ধ্বনিতেছে নাম জপ, আঁখি হতে ঝরে অশ্রুজল,
পরণে কৌপীন বাস, কণ্ঠে দোলে জপমালা; নাহি কিছু পথের সম্বল।
দূরে রাখি শ্রীধামের জনতামুখর রাজপথ, তরুবীথি পুষ্পবন
গোপপল্লী পার হয়ে চলিয়াছে ক্লান্তিহীন রাত্রিদিন উদ্দীপিত মন।
শিহরে বৈরাগী সদা, আপনার মনে কহে—'এই ধ্বনি জীবনে শুনি নি—
রসের মূরতি যেন নয়নে মিলায়ে যায়, যেন কার বাজিছে কিঙ্কিনী!'

গহন অরণ্যপথে প্রবেশিল সে বৈরাগী সংসারের মায়া রাজ্য হ'তে
তখন জাগিছে উষা পূর্ব্ববনান্তরে। কহিল সে ভাবাবেগে—'কোনমতে
ত্যজিব না এ অরণ্য, শার্দ্দুল উদরে যদি যেতে হয় তাও যাবো আমি,
পাবো নাকি দরশন সাধিয়া দুঃসাধ্যব্রত কহ মোরে ওগো অন্তর্যামী!'
অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা বনাকীর্ণ স্তূপমাঝে জলাশয় বিরাজে সম্মুখে,
অতীতের স্মৃতিভরা যুগান্তের পদাবলী ছন্দে গাঁথা তরুবীথি বুকে।
পাতিল আসন সেথা, বটশাখা নুয়ে পড়ে জীর্ণ কক্ষ বাতায়ন 'পরে
চারিভিতে পক্ষীনীড়, দিনের আলোক ছটা কোনমতে ক্ষীণ হয়ে ঝরে।

অনিদ্রায় অনাহারে নাম জপে মগ্ন রহে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিরলে
কখন বহিছে অশ্রু, কখন বেপথু অঙ্গ, ভাবনেত্রে চিত্ত শতদলে।
হেরিছে উন্মত্ত ভৃঙ্গ; পলে পলে তনু ক্ষীণ, তবু নহে অলস হৃদয়,
উপচ্ছায়া সম আসে নব নব মূর্ত্তি কত, প্রাণে তার নাহি কোন ভয়।
দিনে দিনে দিল দেখা গ্রহণী উদরাময়, মালা জপ করে অহরহ,
অশ্রান্ত আবেগ লভি তন্দ্রা ক্লান্তি করি দূর সহিতেছে বেদনা দুঃসহ।

দীর্ঘদিন উদাসীন অরণ্যের মাঝে বসি বিকশিয়া তোলে আরাধনা,
আকুল হৃদয়খানি ছড়াইয়া দিল তার নাহি যায় প্রাণের যাতনা।
আপনার মনে কহে সে বৈরাগী—'এমনি হেলায় মোরে করিলে বঞ্চিত!
কই তুমি! এলে না তো! তোমার পরশ রাগে চিত্ত মম হোলো
না রঞ্জিত—'

একদা গোধূলিক্ষণে রাখাল বালক দুটি ছুটিতেছে উলসিয়া বন
ধেনু লয়ে তাহারি সম্মুখ দিয়া। বিস্মিত বৈরাগী—শিহরিল তনুমন;
ফিরে আসি জ্যেষ্ঠ জন দাঁড়াইল কক্ষে তার। স্নেহস্বরে কহিল—সন্ন্যাসী!
হেথায় রয়েছ কেন!—' দূর হতে শোনা যায়—'দাদা আয়'—
বাজে মেঠো বাঁশী।
কিবা অভিপ্রায় তব, এ কাননে রহিয়াছ—একি! বিষ্ঠামাখা কেন দেহ!'
কহিল বৈরাগী শেষে—'গম্ভীর কাননে কেন হে-কিশোর!
সঙ্গে নাহি কেহ?'

উত্তর না দিয়া কিছু, বিষ্ঠামাখা কৌপীনের প্রান্ত ধরি গেল জলাশয়ে,
ধৌত করি চীরবাস দিল তারে, কহিল সে—'কিবা হবে দুঃখ ব্যথা সয়ে!
নিবিড় কানন হ'তে চলে যাও'—বৈরাগীর কণ্ঠ হতে ধ্বনিল—'যাবো না—
কে তুই কিশোর এসে কলহ করিস্ মিছে, কেন তোর এতই ভাবনা.
আমি তো যাবো না, তুই চলে যারে, সন্ধ্যা নামে'—
সে কিশোর কহিল না কথা,
হোলো অন্তর্হিত। পরদিন তেমনি সময়ে আসি, করে ধরি পুষ্পলতা
কহিল কিশোর রোষে—'এখনো গেলে না তুমি? এই লহ, কর দুগ্ধ পান;
তুমি যদি নাহি যাও, মোরা যে খেলিতে এসে পাই ব্যথা, কেঁদে ওঠে প্রাণ
তোমারি লাগিয়া।' স্বর্গসুধা দুগ্ধ পিয়ে এলো ফিরে হৃতপ্রাণ বৈরাগীর
'—কি উদ্দেশ্যে আছ হেথা? ওরে ক্ষেপা, যাও চলে, যেথা রাজে
দেবতা মন্দির—'

পরদিন তেমনি সময়ে দুগ্ধ লয়ে আসি কহে—'যাও নাই হে বৈরাগী!'
'—আমি তো যাবো না কহিয়াছি বারে বারে'—কহিল কিশোর এসে—
'কার লাগি
বসে আছ এই বনে!' নিরুত্তর সে বৈরাগী, কিশোরের পাশে এল ছুটে
দূরের কিশোর। অগোচরে ডাকে—'দাদা, এসো দাদা,—
চারিভিতে আলো ফুটে।
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক হয়ে ভাবিল বৈরাগী—'এরা কেন আসে? দুইটি বালক
কণ্টকিত বনপথে করে খেলা ধেনু লয়ে, শিরে কেন শিখীর পালক
কনিষ্ঠ জনের? ভালো করে পারিনাক হেরিবারে শ্যাম অঙ্গ—অন্তরাল
হ'তে ওযে কহে কথা—কারা এরা?'—অন্ধকারে গুমরিছে চিত্ত চক্রবাল।

পরদিন আসি কহে' সে কিশোর—'তবুও রহিলে তুমি নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
মোদের খেলার বিঘ্ন কর কেন?—' কহিল বৈরাগী—
-দাও মোরে পরিচয়—'
'—গোপ বালকের রূপ এত মনোরম! নহে, নহে—যেন প্রাণের তুলিতে
জীবন-আলেখ্য আঁকা।' কহিল কিশোর তারে—'যার নাম জপের ঝুলিতে
অবিরাম চলিয়াছে, যার তরে কাঁদে প্রাণ পাবে তারে যাও নীলাচলে—'
'—শুধাই তোমারে আমি কহ তুমি কোন্ জন?
পাশে এসে কেবা কথা বলে?—'
বৈরাগীর প্রশ্ন শুনি অদৃশ্য সে দুটী প্রাণী শ্যাম ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে
কাঁদে সেই সাধুজন, কাছে পেয়ে হারাইনু—' বেদনায় মৌন অশ্রু ঝরে।
বিহ্বলা রজনী এলো মর্ম্মরিল বনভূমি রোমাঞ্চিত পল্লবমালিকা,
জ্যোছনা-তরঙ্গে সাধু গাহন করিয়া ধ্যানে সাজাইল ভক্তি-দীপালিকা।

কিছুই চিরস্থায়ী নয়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

যুদ্ধের বাজার। মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ অবদান—নতুন ইমারতে নতুন অফিস—ইউনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানী।

নতুনের একটা সম্মোহন শক্তি থাকে—যা দুর্নিবার; তার আকর্ষণী জালে বদ্ধ হয়ে একদিন বিনয় এলো এ অফিসে আরো পাঁচজনের মত।

বড়বাবু কালীকিঙ্কর রায় সার্থকনামা পুরুষ—যেমন মোটা তেম্নি কালো, অন্য কিছু বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোট ছোট পিটপিটে দুটি চোখে বিনয়কে লক্ষ্য করলেন বেশ কিছুক্ষণ। বয়স তো কাঁচা, বিয়ে করেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিনয়ের সলজ্জ উত্তর।

—বৌ তো তবে কচি খুকী, কি বললে লক্ষ্ণৌয়ে না, ছেড়ে থাকতে পারবে দিল্লীতে।

অন্ততঃ দিন কতক তো হবেই—বাড়ী যদ্দিন না পাওয়া যায়।

ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বড়বাবু বলেন, হ্যাঁ, আমাকেও হয়েছে। ওখানে কত পাচ্ছ—পঁচাত্তর? পারমানেণ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভ্রু কুঁচকিয়ে বলে চলেন তিনি, পারমানেণ্ট—বুঝলে কিনা পৃথিবীতে পারমানেণ্ট—মানে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। যুদ্ধের বাজার—এই তো সময়।' যতখানি গুছিয়ে নেওয়া যায়। আর এখানেও প্রসপেক্ট কম নয়। ডি-এ সমেত এখনই একশ' দেবে এরা! কি বল?

বলবার কিছুই ছিল না। প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে বিনয়ের মত কেরাণী, একসঙ্গে একশ' টাকা কল্পনাই করে নি—চোখে দেখা তো দূরের কথা।

অতএব পঁচাত্তরের পশ্চাৎ ধাপ ছেড়ে অগ্রবর্তী একশ'র ধাপে পা দিল বিনয়। এর পর একটানা কেরাণীর কলম চললো এগিয়ে গতানুগতিকতার বাঁধা পথে—না তাতে বৈচিত্র্য, না কোন বৈশিষ্ট্য—যার ইতিহাস রাখা যায়।

এর মধ্যে মাধুরীর চিঠি বিনয়কে যেটুকু মাধুর্য এনে দেয়। নতুন পদলাভে আনন্দ প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নাদির পর তার অবর্তমানে যে সব ছোটখাটো অসুবিধার উৎপত্তি হয়েছে খুঁটিনাটি সব উল্লেখ করে মাধুরী লিখেছে—একটা বাড়ী দেখ অল্প ভাড়ায়। যেমন করে পারো শীঘ্র নিয়ে যাও।

কথাটা বিনয় যে না ভাবছিল এমন নয়; মাধুরীর চিঠি আরো বেশী করে ভাবিয়ে তুললো তাকে—কিন্তু দিল্লীতে বাড়ী জোগাড় যে কি দুরূহ ব্যাপার তা কি মাধুরী জানে! অনেক রাত অবধি বসে বসে ভেবেচিন্তে সে গুছিয়ে লিখলো—বাড়ীর অভাব, না দেখলে বুঝবে না, মাধু। মাথা গোঁজবার এতটুকু জায়গা এখানে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমার চেষ্টা সমানে চলবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝচি, তবে সে কষ্ট চিরস্থায়ী থাকবে না স্থির নিশ্চয় জেনো।

আশ্বাস আশাতীত কাজ করলো। মাধুরীর চিঠির সুর গেল বদলে। সত্যিই তো সব দিন কি মানুষের সমান যায়!

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তব—দুয়ের সমন্বয় বুঝি অলৌকিক।

বিনয় কাজের মাঝে ডুবেছিল। তার সেক্শনের দু' দুজন অনুপস্থিত সেদিন। নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পর্যন্ত ছিল না। পিওন এসে বাড়িয়ে দিল একখানি তার।

তার—অর্থাৎ দুঃসংবাদের বাহক।

Wife Seriously ill. Come Sharp.

বড়বাবুর টেবিলে তারখানি রেখে বিনয় মিনতির সুরে বলে—অন্ততঃ চার দিনের ছুটি দিন। বাড়ীতে দেখাশুনো তদ্বির করবার কেউ নেই।

বড়বাবু হঠাৎ গম্ভীর মূর্তি ধারণ করলেন, বললেন—এই তো ক'দিনের কাজ। এদিকে আবার দু'জন নেই; এ অবস্থায় ছুটি দিই কেমন করে।

—কিন্তু না গেলে চলবে না, স্যার।

—মিছে ভাবো, বিনয়। কালীবাবু তাঁর বাঁধাগৎ মত বলে চলেন—একটু অসুখ বৈ তো নয়, সেরে যাবে—চিরস্থায়ী থাকবে কি। আচ্ছা, সাহেবকে বলে দেখি।

সাহেবকে বলে দেখি—এর অর্থ শুধু কেরাণীর অজানা নয়—চোখে ধুলো দেবার এমন পাকাপথ আর দুটি নেই। বিনয়ের ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা হল না। অবসরহীন কেরাণীর কলম অবাধে চললো এগিয়ে। কিছু টাকা ধার করে টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে পাঠিয়ে দিয়ে বিনয় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে পরবর্তী চিঠির প্রতীক্ষায় রইলো বসে।

এবারও এল চিঠি নয়—তার; তার—অর্থাৎ দুঃসংবাদের বাহক। Wife expired last evening.

বড়বাবু কালীকিঙ্কর রায় তাঁর সীট থেকেই জিজ্ঞাসা করেন, বৌ কেমন হে বিনয় ?

—মারা গেছে।

মারা গেছে—সীট ছেড়ে উঠে এলেন বড়বাবু। বিনয় টেলিগ্রামখানি কেবল এগিয়ে দিল। বড়বাবু পড়লেন। মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ করে প্রবোধ দিলেন—কিছুই চিরস্থায়ী নয়, বিনয়। মানুষ না বুঝে দুঃখ করে মরে পৃথিবীতে।

এর পর কালের চাকায় বছর গেল ঘুরে। বিনয়ের একশ টাকা বেতনের কেরাণীর জীবনে কিছুই পরিবর্তন আসে নি; যা কিছু পরিবর্তন এসেছিল তার দেহে এবং মনে—অবসাদ আর আকালবার্ধক্য।

কেরাণীর ভোঁতা কলম একটানা এগিয়ে চলে। গতানুগতিক। অনবদর কাজের মাঝে মনকে সব সময় ডুবিয়ে রাখতে চায় বিনয়, হারানোর বেদনা অভাবকে ভুলবার জন্যে। কাজ না পেলে অ-কাজ খুঁজে বার করে; একবারের করা কাজ দশবার করে করে; এতটুকু বিশ্রামও তার অসহ্য মনে হয়।

এমনি কর্মমুখর একটি দিন। বড়বাবু বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে বিনয়ের সম্মুখীন হন—মুখে উৎকণ্ঠা উদ্বেগের জমাট কালো মেঘ। কতকগুলি চিঠিপত্র রাখতে রাখতে বলেন, রইলো। দেরী হলে শেষে ট্রেণ ধরা যাবে না। ফোর্টিন ডাউনটা চারটের সময় না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথায় যাবেন ?

—বাড়ী।

—হঠাৎ! কবে ফিরবেন ?

—হ্যাঁ, হঠাৎ। ভগবান যেদিন ফেরান। কিছুই স্থির নেই। পনেরো দিন—একমাসও হতে পারে। বলতে বলতে অদৃশ্য। বিনয় হতভম্ব।

প্রকৃত পক্ষে পনের দিনও না, একমাসও না; সপ্তাহ অন্তে বড়বাবু ফিরলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের কিছু বলবার ভরসা হল না। বিষাদ আর অবসাদের নিবিড় ছায়া দুর্যোগ আর দুঃসংবাদের বার্তাই বহন করছিল।

ক্লান্ত ভগ্নস্বরে বড়বাবু নিজেই বলেন—ফিরে এলুম, বিনয়। যে জন্যে গেলাম তা হল কৈ। বৌকে বাঁচাতে পারলুম না।

—সেকি, কি হয়েছিল ?

—বোঝা গেল না। এ ক'দিন শুধু ডাক্তার আর ঘর করলুম, আর জলের মত পয়সা ঢাললুম। কি হল—কিছুই নয়। সান্ত্বনা এই যে চেষ্টা করতে পেরেছি শেষ সময় পর্যন্ত সামনে থেকে।

কতক কথা কাণে গেল, কতক গেল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে টলতে টলতে নিজের টেবিলে কাজে ফিরে এলো; কিন্তু যে এতদিন কাজের মধ্যে অকাতরে ডুব দিয়েছিল, শত চেষ্টা করেও সে আজ কাজে তেমন করে ডুবতে পারলো কৈ! সারা মনকে আচ্ছন্ন করে তার অতীতের স্মৃতি জেগে উঠলো—বিষাক্ত বৃশ্চিক দংশনের সুতীব্র জ্বালা।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল, খেয়ালও ছিল না; হঠাৎ তার খেয়াল হল ভুল হয়ে গেছে, মস্ত বড় ভুল—হিমালয়ের পরিধির মত বিরাট ভুল। বড়বাবুকে একটা কথা তো বলা হয়নি! শশব্যস্তে উঠে পড়লো বিনয়—বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট যেন; পাগলের মত গিয়ে উপস্থিত হল বড়বাবুর টেবিলের সামনে। কিন্তু দুরাশা! চেয়ার শূন্য বড়বাবু চলে গেছেন।

বজ্রাহত বসে পড়লো বিনয়। বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে, দেহের শিরায় শিরায় বিষের জ্বালা। নিজের ওপরেই আক্রোশ হয়ে ওঠে, কেন—কেন সে শোনাতে পারলো না বড়বাবুকে মুখ ফুটে শুধু একটীবার নিয়তির মত সত্যকঠোর, ভ্রুকুটীর মত ক্রূর-কুটীল সেই জ্বালামুখী কথা ক'টি—কিছুই চিরস্থায়ী নয় পৃথিবীতে!

পট পরিবর্তনের পালা এলো। কয়েক মাসও পেরুলো না—অনেকের আশার মুখে ছাই ঢেলে হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে যুদ্ধ গেল থেমে।

কুবেরের পূজারী দল কেউ প্রস্তুত ছিল না এর জন্য। বর্ষার জলে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা ব্যবসা গুলোয় এলো বিপর্যয় আর বিশৃঙ্খলা। ইউনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানীর দরজাও এমনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল একদিন—নতুন ইমারতের সেই নতুন অফিস।

বিনয়ের কিন্তু দুঃখ নেই—কিছুই চিরস্থায়ী নয় পৃথিবীতে।

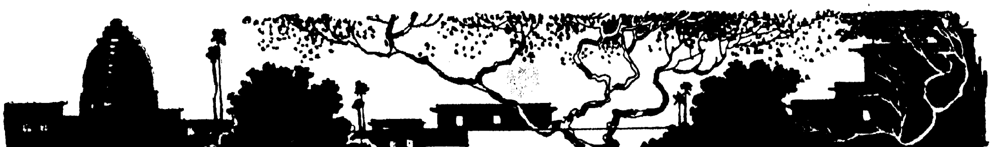

রসায়নী বিদ্যা ও সামগ্রিক স্বাধীনতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সভ্যতার ইতিহাসের কোন প্রভাতে শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল তাহা কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলেও চরম সত্য এই যে, শিল্পই বিজ্ঞানের জননী ও ধাত্রী। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুপ্রণালী-বদ্ধ বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া না গেলেও শিল্পী-মনের যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান দেখা যায়। আদিম মানবের মানসিক ক্ষুধার বিবর্ত্তনেই শিল্পের জন্ম; শিল্পী মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তাই বিজ্ঞান।

ইতিহাস আরও শিক্ষা দেয়—মানব সভ্যতার সূতিকাগার প্রাচ্য দেশ। কাজেই প্রাচীন শিল্পের বিকাশ ভারতবর্ষ, ইরাণ, চীন ও মিশর দেশেই সম্ভব হয়। য়ুরোপে সভ্যতা প্রবেশ করে অনেকটা ঐতিহাসিক যুগে গ্রীসীয় ও রোমক রাজত্বের প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানের অভিযানও প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বেদ, ষড়দর্শন ও ভাগবতে শিল্পের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাকালে ভারতীয় সকল বিদ্যাকেই কলা বলা হইত। দর্শন, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসশাস্ত্র, ধাতুর্ব্বিদ্যা, রঞ্জনবিদ্যা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি এক একটী কলা; এই রকম চৌষট্টি কলাতে বিদ্যার পরিধি স্থির হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রসায়নী বিদ্যাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য কলাবিদ্যার মতন রসশাস্ত্র ও ধাতুবিদ্যার প্রথম সূচনা পাওয়া যায় যজুর্ব্বেদে; পরিস্ফুটিত ভাবে পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে, উত্তরকালে পরিণতি লাভ করে বৌদ্ধ-ভারতে চরক ও সুশ্রুতে। ইহার পরে বহুযুগ ধরিয়া বহু ঋষির সাধনায় উত্তরোত্তর এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। কণাদ, নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, পাতঞ্জলি ও বৃন্দের সাধনায় ভারতীয় রসায়নের চরম উন্নতি সাধিত হয়। চরক, সুশ্রুত, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রসরত্নসমুচ্চয় ও রসার্ণবে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিখিত কিম্বা উল্লিখিত আছে। চরক রসায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহা মানুষের সুস্থতা, মেধাবৃদ্ধি, শক্তি ও পৌরুষত্ব বৃদ্ধি করে তাহাই রসায়ন। সুশ্রুত চরককে অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন আয়ুষ্কর পারদেই ইহা সম্ভব। বৃন্দ পারদকেই রসায়ন বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যঋষিগণ পারদের ব্যবহার অবগত ছিলেন। আসল চরক ও সুশ্রুতের পুস্তক লোপ পাইয়াছে। আমরা যে চরক ও সুশ্রুতের সহিত পরিচিত তাহা নাগার্জ্জুন নামক মহা-বৈজ্ঞানিকের সম্পাদিত টীকা মাত্র। ইহাতে পারদ ব্যতীত বহু রোগ ও রোগীর নিদানের ব্যবস্থা আছে। রসায়ন বলিতে আজকাল যাহা বুঝায় তাহার সূত্রপাত ইহাতে আছে; পরন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তৎকালীন ভারতের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার মান বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ের মধ্যে বহু বহু ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি স্থির হইয়াছে; কলাশালা ও রসশালার কতকটা আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ হইতেছে। লোমনাশক সাবান, চুলের কলপ, অঞ্জন তৈয়ারীর বিধি, নানারকম বিষ ও তাহার ক্রিয়া, সুবর্ণঘটিত রসায়ন, মকরধ্বজ ও পঞ্চলবণ তৈয়ারীর বিধি ব্যতীত মৃদুক্ষার ও তীক্ষ্ণক্ষার তৈয়ারী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, সুশ্রুতে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, মৃতদেহ পরীক্ষা, অম্লরস (acid) তৈয়ারীর বিধি লিপিবদ্ধ আছে। এখানে যে acid এসিড্ তৈয়ারীর বিধি লিখিত আছে তাহা Aqua Regia type, নাম দেওয়া আছে রসী। গন্ধক, লবণ, নিশাদল, সোহাগা এবং ক্ষার চুয়াইলে রসী তৈয়ারী হয়। ভাগবতে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) তৈয়ারী উল্লিখিত আছে। রসার্ণবে ফিটকারী চোয়াইয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী করার পদ্ধতি দেওয়া আছে। উত্তরকালে তামিল দেশীয় পণ্ডিতেরা গন্ধক ও সোরা শক্ত মাটীর পাত্রে পুড়াইয়া কিম্বা তুঁতে অথবা হীরাকস চোলাই করিয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী করিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। হীরাকস, তুঁতে ও ফিটকারী স্বাভাবিক প্রকৃতি-জাত দ্রব্য হিসাবে সৌরাষ্ট্রে, নেপালে, পঞ্চনদে কিম্বা রাজপুতানায় পাওয়া যাইত। অনেক সময় শিলাজতু জলে গুলিয়া পরিষ্কার রস জ্বাল দিয়া ফিটকারী প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রসশিল্প বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঔষধ প্রস্তুত ও পরীক্ষার জন্য রসশালা স্থাপিত হইয়াছিল। নানাবিধ সূত্র ও সিদ্ধান্ত মান নির্ণয়ের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল। বৃন্দের রসশালা নির্ম্মাণের পদ্ধতি, স্থান ও যন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যাখ্যান এখনও কিয়দংশে শিক্ষণীয়। বৃন্দের মতে যে রাজার রাজ্যে শান্তি বিরাজিত, রাজা শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী, রাজ্য ধন-জন, ধাতু-রত্নদ্রব্য জলাশয় এবং নানা ঔষধি গাছ-গাছড়ায় পরিপূর্ণ সেই রাজ্যে রসশালা নির্ম্মাণ বিধেয়। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ও ইষ্টগুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ, বহুভাষাভাষী, স্বল্প-আহারে তুষ্ট ব্যক্তিই রাসায়নিকের উপযুক্ত। পাঠক বিবেচনা করিবেন, খৃষ্টজন্মের সমকালীন পৃথিবীর পুরাতন জীবনাদর্শ বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিকেরও লক্ষ্য কিনা?

ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপ ক্রমে ক্রমে যেরূপে উনবিংশ শতাব্দীর জন্ম প্রদান করিল, ভারতে তাহা কেন অসম্ভব হইল ইহা বুঝিতে হইলে একমাত্র ইতিহাস ও জনশ্রুতি আমাদের অবলম্বন। মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞানচর্চ্চা ও অনুসন্ধিৎসার "দিবি আরোহণ"-এর কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসের এই শুষ্ক মন্তব্যে মন তৃপ্তি পায় না। ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘের পতনের পরে ভারতের এই রসশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় যে ধর্ম্মগোষ্ঠীর হস্তগত হইল তাঁহারা তান্ত্রিক। তান্ত্রিকের চক্রে প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসার স্থান ছিল না। মন্ত্র, চক্র ও সাধন সকলই গোপনীয় রাখা তান্ত্রিকের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। রসরত্নসার

সমুচ্চয়-এর ৭০সংখ্যক শ্লোকে রসবিদ্যার গোপনীয়তা সম্বন্ধে লিখিত আছে—প্রকাশ্য আলোচনায় রসবিদ্যার গুণ ও শক্তিহানি হয়। এই গোপনীয়তার ফলে প্রকাশ্য জ্ঞানচর্চ্চার স্থলে আধিভৌতিক ভাবধারা স্থান গ্রহণ করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব আসিলেন তন্ত্রাধিপতি হইয়া ;আমাদের প্রাচীন কিমিতি-শাস্ত্র তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া ঘোষিত হইল। রসরত্নসার সমুচ্চয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী রসরাজ পারদের জন্মবৃত্তান্ত মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের অপার্থিব শুক্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ, তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত পুস্তকে অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিতের উপাধি ধাতুবিদ, লোহাবিদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। মহাকবি বাণ স্বয়ং ধাতুবিদ্ ছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় সমাজের উচ্চ স্তরের শিক্ষিত পণ্ডিত লোকেরা সকল রকম শিল্পকলা শিক্ষা ও সমাদর করিতেন। প্রাচীন বৌদ্ধ-গাথায় কলাবিদ্যায় পারদর্শীদের উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। ইহার পরে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন এবং নূতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আবির্ভাব। এই সময়ের মধ্যে জনসমাজে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সমাজ-শাসনের ধারা বিভিন্ন খাতে চলিয়া যায়। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত চৌষট্টিকলা বিদ্যা বিভিন্ন গোষ্ঠার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়ে। নূতন সমাজব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমের সমাদর যথেষ্ট না থাকায় ধর্ম্মাচরণ ও যুদ্ধ ব্যবসা লোভনীয় হইয়া পড়ে। মন্বাদি ঋষিগণ সুশ্রুতসম্মত মৃতদেহ পরীক্ষা করার চিকিৎসা, সমুদ্র ভ্রমণ প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করায় দেশ ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও কূপমণ্ডুকতায় পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে অন্যান্য চৌষট্টিকলার মত রসায়নী বিদ্যা তান্ত্রিক এবং ভোজবাজীদের হাতে পড়িয়া প্রকাশ্যচর্চ্চার অভাবে সাধারণের অনধিগম্য হইয়া অবশেষে লোপ পাইতে লাগিল। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন ও বাণভট্ট যে রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রভৃতি মণীষীগণ যে জ্যোতিস ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, পাণিনি, কপিল, চার্ব্বাক ও শ্রীবুদ্ধ যেখানে স্বাধীন নব ন্যায় ও মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কি শুধু চর্চ্চা ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে লয়প্রাপ্ত হইল? ইহা জাতীয় গবেষণা ও সাধনার বিষয়। মরুভূমির অষ্ট্রিচ পাখী বালুকার ঝড় আগত বুঝিলে যেমন বালুকাভ্যন্তরে ঠোঁট গুঁজিয়া বাঁচিবার আশা পোষণ করে, সেইরূপ বাহির হইতে আগত বৈদেশিক ধর্ম্মপ্লাবন এবং আভ্যন্তরীণ মাৎস্যন্যায় এই দুই মহাশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সমাজ যে "নেতিবাচক" নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত না হইলেও দেশহিতকামী সকলেরই চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

ভারতের সৌভাগ্যাকাশের রবি যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলিয়া পড়িতেছে তখন য়ুরোপ ভূখণ্ডে সভ্যতার আলো সলাজ লজ্জার সহিত কুজ্ঝটিকা কাটাইয়া উঠিতেছে। এই সভ্যতার নূতন আলোকে যাঁহারা সারা য়ুরোপে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছেন সেই রোমক সাম্রাজ্যে স্বাধীন চিন্তার স্থান বিন্দুমাত্রও ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা রসায়নী শাস্ত্র সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিতেন লোকে তাঁহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক বা ডাইনী বলিত। খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ বৎসর পরেও কোপার্ণিকাস তাঁহার পুস্তক লিখিয়াও ৩৬ বৎসর ভয়ে ভয়ে জনসাধারণের নিকটে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার নূতন মতবাদ ৩৬ বৎসর পরে আলোর মুখ দেখিলেও নাকে খৎ দিয়া তাঁহাকে প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছিল। রজার বেকন তাঁহার সময়ের তুলনায় অসামান্য লোক হওয়া সত্ত্বেও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা আলোচনার জন্য অক্সফোর্ডের নিভৃত কক্ষে চতুর্দ্দশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন ; ইহার দুইশত বৎসর পরেও বৈজ্ঞানিক সত্য অকপটে বলিবার জন্য গ্যালেলিওকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। কিন্তু পুরাতন য়ুরোপে মার্টিন লুথার যেদিন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া মানুষের চিরন্তনী স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিলেন, য়ুরোপের জয়যাত্রা সুরু হইল সেইদিন হইতেই। মার্টিন লুথারের আন্দোলনের ঢেউ সারা য়ুরোপে সাড়া জাগাইয়া ইংলণ্ডে পেঁছিল পতিত জাতির মাভৈঃ বাণীরূপে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই রোমক সাম্রাজ্য ও রোমক ধর্ম্মের নাগপাশ হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া জাতির জীবনে যে-শক্তির সঞ্চার হইল তাহার ঘাত-প্রতিঘাতেই আমেরিকা ও ভারতের পথ আবিষ্কার, ফরাসী দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব, জনগণকর্ত্তৃক জনগণের জন্য জনশাসন প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিরাট বিরাট পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ডাল্টন, বয়েল, ল্যাবোয়াসিয়ে, বার্থেলো, ময়সান্ প্রভৃতি মণীষিগণের চেষ্টায় বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। গ্যালেলিওর আত্মাহুতির পরের দুই শত বৎসর য়ুরোপের শুধু একই বাণী "এগিয়ে চলো" "এগিয়ে চলো"—"সারা দুনিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো।"

ভারতের কনাদ ঋষির পরমাণুতত্ত্ব তাঁহার জীবনের সহিত লোপ পাইয়াছে কিন্তু ডাল্টনের পরমাণুবাদের শতবার্ষিক উৎসব সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার অবিভাজ্য পরমাণু বিভাজ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মিব্যতীত অন্য কোনও প্রকার রশ্মি উৎপাদিত হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা জানিতেন না। ১৮৯৬ সালে রঞ্জেন এক অদৃশ্য রশ্মির কাহিনী শুনাইলেন ; আজ তাহা মানবের কত উপকারে আসিয়াছে। ইহার পরে বেকারেল পিচ-ব্লেণ্ড হইতে ইউরেনিয়াম্ ধাতু আবিষ্কার করিলেন। এই ধাতু হইতে অবিরাম রশ্মি নির্গত হয় বলিয়া আবিষ্কর্ত্তার সম্মানার্থে ইহার নাম "বেকারেল রশ্মি" দেওয়া হইয়াছে। মাদাম কুরী দেখিলেন পিচ-ব্লেণ্ড হইতে যে ইউরেনিয়াম্ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বিকীরণ-শক্তি ইউরেনিয়াম্ হইতে অনেক বেশী, তখন তাঁহার ধারণা হইল পিচ-ব্লেণ্ড প্রস্তরে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী অপর সক্রিয় পদার্থ বর্ত্তমান আছে। দুই বৎসরের মধ্যেই মাদাম কুরী উক্ত পিচ-ব্লেণ্ড হইতে রেডিয়াম্ নামক অপর মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। অবিরত তাপরশ্মি ও বৈদ্যুতিক-কণা বিকীরণ করে বলিয়া ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম্। এই মহাযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বহুতর দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দান হইল ইউরেণিয়ামের পরমাণু বিশ্লেষণ, আণবিক বোমা। অপর দিকে সোভিয়েট রাশিয়া জাগতিক

রশ্মিকেও কাজে লাগাইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। গত দুই শত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলে স্বাজাতিক নিষ্ঠা এবং সামগ্রিক স্বাধীনতা।

দীর্ঘ হাজার বছরের তামসিক রজনীর শেষে ভারতের ইতিহাসেও পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে—সামগ্রিক স্বাধীনতা ভারতীয়ের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরাধীন ভারত দীর্ঘ দিন তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল-এর মীমাংসায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে। তারপরে কোন শুভক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য আসিয়াছিল প্রাচ্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে। রিক্ত ও দরিদ্র প্রাচ্য যখন স্বীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল তখনই প্রাচ্যের আকাশে নূতন রবির উদয় হইল। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে? রিক্ত ও জীবন্মৃত প্রাচ্যে ধর্ম্মের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, নর নারীর সামাজিক স্বাধীনতা, এক কথায় সামগ্রিক স্বাধীনতার দাবী যিনি নূতন করিয়া ঘোষণা করিলেন তিনিই আমাদের বরেণ্য রামমোহন রায়। তাঁহার প্রেরণায় মৃত জাতির প্রাণে আবার নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইল। ইহার পরে আসিলেন কত চিন্তাশীল, কত ভাবুক! নূতন ভারতের পত্তন হইল। দিকে দিকে কত দরদী মণীষী তাহাদের ত্যাগ ও জীবন আহুতি দ্বারা জাতির মরা গাঙ্গে নবযৌবনের জলতরঙ্গ সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পকলায় ভারত যে দেউলিয়া নহে—তাহারও গৌরবময় অতীত ছিল, বর্ত্তমানেও দেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে তাহা সগৌরবে ধ্বনিত হইল। দীর্ঘ অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারত তাহার সব কিছুই হারাইয়াছিল। এমন কি, দর্শন, গণিত, বীজগণিত, রসায়নীবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে ভারত যে এককালে অগ্রণী ছিল তাহাও পৃথিবীর লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল। যাঁহার যেদিকে দক্ষতা তিনি পুরাতন কীটদষ্ট জীর্ণশীর্ণ পুঁথি পত্র হইতে পুরাতন কীর্ত্তি পুনরাবিষ্কার করিতে লাগিলেন। রাসায়নী শাস্ত্রকে কীটদগ্ধ প্রাচীন পুঁথি-পত্র হইতে জগতের সাম্‌নে যিনি নূতন করিয়া ধরিলেন তিনি আমাদের প্রণম্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনিই নব্য রসায়নী শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতে ১৮৯২ সালে যে-শিশুর জন্ম হয়, এতদিনের মাতৃরসে সঞ্জীবিত হইয়া তাহাই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজ নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনা ও ত্যাগে রসায়নীবিজ্ঞান কলাশিল্প হিসাবে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।*

* প্রবন্ধ লিখিবার সময় লেখকের সামনে নিম্নলিখিত পুস্তক ছিল—
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry Vols 1 & 11.
" নব্য রসায়নীবিদ্যা
চরক সংহিতা—৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত।
সুশ্রুত সংহিতা—কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার অনুবাদিত।

বিচার-বিড়ম্বনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জেতা বা বিজিত, বীর্য্যের পায়ে নোয়ায় না যে-বা শির,
ভাগ্যের বরে শত জয়ে, তবু সে নহে কখনো বীর;
গৌরব তারই, দৈবের হাতে নহে যে-বা ক্রীড়নক,
স্বীয় শক্তির বলে যে সতত উন্নত মস্তক।

রথের চক্র গ্রাসিয়া মেদিনী করুক বলক্ষয়,
রক্ষাকবচ শত্রুরে সঁপি' ঘটুক না পরাজয়,
স্বর্গে মর্ত্তে ছলে-কৌশলে লুটাক্ ধুলার মাঝে,
কর্ণ-'বিজয়'-বীর্য্যের বাণী ত্রিলোক ভুলিল না যে।

নানা শক্তির সমাবেশে যার বিক্রম-পরিচয়,
স্বার্থবিচারে বিচারক সাজি' আজি যা'র অভিনয়,
ন্যায়ের বিধানে যে জন না মানে স্পর্দ্ধিত অবিচারে,
শেষ নাই তা'র কাপুরুষতার, ইতিহাস জানে তা'রে!

সাহায্যে আর সহযোগিতায় জয়ী সে যে আজি নিজে!
বীর্য্য অভাবে চিনে নাই তাই, কাহার মূল্য কি যে;—
চিরমানবের স্বাধীন মনের সহজাত অধিকার
খর্ব্ব যে করে, ধর্ম্মবিচারে লেখা তার ধিক্কার।

ব্যর্থ-কবিতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

সুরেন কাব্য লেখে। জীবনের ব্যর্থতা ও তিক্ততা, প্রশ্ন ও অভিযোগ তার অনেক আছে। কিন্তু তাই নিয়েই ত বেঁচে থাকা যায় না। একটা কিছু অবলম্বন চাই, যাকে ধরে মানুষ তার সংসারের ঘূর্ণীপাকে অন্ততঃ গা ভাসান দিয়ে চলতে পারে। কবিতা লেখা তার ছিল ঐ জাতীয় একটা অবলম্বন। সুখ্যাতি তাকে কেউ কেউ করতো, কেউ বা তার কবিত্ব রোগ নিয়ে টিপ্পনির কাণাকাণিও করতো।

শত্রুদের টিপ্পনিতে সুরেন তত বিরক্ত হ'তো না। তবে দরদী বন্ধুরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করতো যে সে লাইফ ইন্‌সিওরের দালালি না করে, লাউকুমড়া বা বেগুন পালংএর বাগান না করে শুধু শুধু কবিতা লিখে সময় নষ্ট করে কেন তখন সুরেন বলতো—

"এই কাব্য লেখাটাই হচ্ছে আমার জীবনের কঠিন জলযাত্রার পোতাশ্রয়। অশ্রুর নুন সাগরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে জাহাজ যখন গোপন পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়—তখন এই পোতাশ্রয়ের মধ্যেই আমাকে আশ্রয় নিতে হয়—আমার বুকের ঘা শুখাবার জন্য!"

এই জাতীয় কথা শুনে কেউ বা চুপ করে থাকতো, কেউ বা মুচকে হাসতো। সুরেনের তাতে লেখা বন্ধ হ'তো না।

সুরেন প্রকৃতির কবি ছিল না। মানুষের মনের হাসি-কান্নার খেলা, মান-অভিমানের লুকোচুরি, বিরহ মিলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এই সব নিয়েই তার কবিতা ফুটতো বেশী। কখনও কখনও সে জীবনের প্রশ্ন বা সৃষ্টির সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও কাব্য লিখতো, কিন্তু প্রকৃতি বা নারীর সৌন্দর্য্য নিয়ে সে কোনও দিনই মাথা ঘামাতো না।

রূপের শিল্পী সে ছিল না। তার প্রিয়াকে সে যথেষ্টই ভালবাসতো। কিন্তু কোনও দিনই তার রূপ নিয়ে "আদিখ্যেতা" করে কবিতা লিখতো না।

কিন্তু সেদিন কি একটা অঘটন ঘটে গেলো। সে তার প্রিয়ার রূপ নিয়ে শুধু যে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখলে তা নয়, সেই কবিতাটা তার প্রিয়ার কাছে পড়িয়ে শুনাবার জন্য একটা সনেট্‌ও লিখে ফেল্লে।

অরসিকের কাছে "রসস্য নিবেদনম্" এর ব্যর্থতাকে সে খুবই ভয় করে। তাই বন্ধু-বান্ধবের কাজের ব্যাঘাত করে তাদের অনিচ্ছুক কানের কাছে নিজের কবিতার আবৃত্তি কোনও দিনই সে করে না। মানুষের হাটে তার প্রিয় সৃষ্টিগুলো পাছে তার ন্যায্য মর্য্যাদা না পায় তাই সে সহজে সেগুলোকে হাটের মাঝে নিয়ে আসতেই সাহস করতো না।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই সাহিত্য যদি সহিতত্ব না জাগায়, আমার বুকের হাসি কান্নার ঢেউ যদি অপরের বুকেও হাসি কান্নার দোলা না লাগাতে পারে, তা হ'লে সেটা অনাদৃত বন কুসুমের মতই খানিকটা ব্যর্থ হয়ে যায়। তা ছাড়া তোমার জন্য যদি আমি একটা রসানুভূতি অনুভব করি, তোমার প্রেমে আমি যদি উন্মাদ হয়ে পড়ি, তাহলে তোমাকেই যদি সে কথাটা বলতে না পারি তাহ'লে আমার বুকের বোঝাটা বড্ড যেন ভারী হয়ে ওঠে—।

কাজেই যে প্রিয়াকে লক্ষ্য করে সুরেনের কাব্য লেখা—তাকে পড়িয়ে শুনাতে না পারলে সুরেন যেন তৃপ্তি পায় না। সে গৃহিণীকে ডাক দিলে।

গৃহিণী রান্না ঘর থেকে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বলছো"?

"কিছু কাজ আছে নাকি?" সুরেন জিজ্ঞাসা করলে।

"না বিশেষ কিছু নেই—কেন বলত"?

"একটা কবিতা লিখেছি শুনবে? তোমাকে নিয়েই লেখা।"

"পাগল—হঠাৎ আবার আমার এত আদর কেন? পড় শুনি—তোষামোদি করনি ত?"

"শোনো না আগে;—আচ্ছা—একটা গৌর চন্দ্রিকাও লিখেছি সেইটে থেকেই আরম্ভ করি কি বল?"

পাগল স্বামীটির আগ্রহ দেখে কবি গৃহিণী রাজী হয়ে বল্লেন "বেশ ত তাই পড়ো"—

অবশ্য এটা ঠিক কবিতা শোনবার সময় ছিল না, শীতের সকাল, সব কাজই থৈ থৈ করছে—ছোট বেলা, এক হাতে সব কাজই তাকে সামলাতে হবে। অন্য দিনও তাদের কাব্যালোচনা হয়। সেটা হয় দিনান্তে রাত্রির বিশ্রামের সময়, কাজকর্ম্ম শেষ হয়ে ছেলে-পুলেরা ঘুমিয়ে পড়লে।

আজ স্বামীর আগ্রহ দেখে সেও কাব্য শোনবার জন্য একটা আগ্রহ দেখালে; পাছে তা না করলে স্বামী ক্ষুণ্ণ হন। সে একটি হাতকে মুড়ে দেওয়ালের ওপর রেখে তারই ওপর পিঠটি ঠেশান দিয়ে দাঁড়ালো—স্বামীকে বল্লো "পড়—দেখি তোমার কাব্য!—এই নায়িকা নিয়ে আবার কাব্য! যেমন পাগল"!!

সুরেন তার গৌরচন্দ্রিকা থেকে আরম্ভ করলে—এর পরেই আসল কাব্যটা আরম্ভ করবে—

দেখেছো তোমার লাগি নূতন কবিতা
রচেছি যা ঢালি মন বসিয়া বিজনে,
শিল্পীসম তব রূপ ভাবি মনে মনে
ফুটায়েছি তব লাগি মোর ব্যাকুলতা।
পড়ায়ে শুনাবো তাহা ; এসো প্রিয়তম
কহিব বুকের বাণী ; তব আঁখি দুটি
শুনি সে কবিতা মম উঠিবে কি ফুটি
আলোক-মদিরা পানে প্রসূনের সম।
এসো কাছে ছাড়ি কাজ, দেখো না কেমন
আকাশে করেছে মেঘ, তারি কাল ছায়া
ফেলিয়াছে তব মুখে যেন কোন মায়া !
কাব্য ছাড়া ভাল কিছু লাগে কি এখন !

—এই ভাবে সুরেন তার কাব্য আবেদন করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার গৌরচন্দ্রিকার সনেট্টা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করা হলো না। কারণ. সুরেন যখন আবেশ ভরে তার কবিতা পড়ে যাচ্ছিল কবি-পত্নী তখন স্বামীর উপরোধে পড়ে কবিতাটি শুনছিল বটে কিন্তু তার মন পড়েছিল রান্না ঘরের দিকে। শেষ পর্য্যন্ত সে শুনে উঠতে পারলো না। কারণ সে উনুনে ভাত চড়িয়ে এসেছিল এবং সেটা প্রায় তৈরী হয়ে এসেছিল। সুরেন আবার ভাত ধরে গেলে তার গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারে না। ভাত পুড়ে গেলে তার খাওয়াই হবে না। কাজেই সুরেন যখন সনেটটির বারো লাইন পর্য্যন্ত পড়ে শুনিয়েছে তখন সুরেন গৃহিণী একটু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"একটু দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি। দেখে আসি ভাতটা পুড়ে গেলো কিনা—রাগ করো না লক্ষীটি"

সুরেন একটু আহত হয়ে চুপ করে রইলো। অরসিকের কাছে রস নিবেদনের ব্যর্থতা তাকে অভিভূত করে ফেললো। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আস্তে আস্তে সনেটের কাগজটিকে ছিঁড়ে ফেললে। বলা বাহুল্য তার সঙ্গে আসল কবিতাটিও বিনষ্ট হলো।

সনেটটির শেষের দুলাইনে কি ছিল ? আর আসল কবিতাটি বা কি ছিল ? এমন কি লিখেছিল সুরেন এখনি যেটা পড়িয়ে না শোনালে সে স্থির থাকতে পারতো না ? কবি গৃহিণীর উক্তিটাকে কবিতার ছাঁচে ফেলে আমরা না হয় সনেটটা পুরা চতুর্দ্দশপদী করলুম যথা—

"এখনি আসিব ফিরে রাগ করিও না—
দেখে আসি ভাতে জল ঠিক আছে কি না"—

কিন্তু আসল কবিতাটা যে কি ছিল সেটা ত আমরা বুঝতে পারলুম না ! শ্রোতাদের মনে কোন্ প্রশ্নটা বড় হবে ? কবির অরসিকের কাছে রস নিবেদনের ব্যর্থতার কথা ? ছিঁড়ে ফেলা সনেটটার শেষের দুলাইনের কথা ? না যে ব্যর্থ কবিতাটার কোনও সন্ধানই তারা পেলো না সেই ব্যর্থ কবিতাটার কথা ?

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বিভিন্ন জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে সম্ভবপর হইলে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় আসিবার চেষ্টা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এজন্য প্রথমে দেখা প্রয়োজন—নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন অংশ হইতে এইরূপ সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করিবার জন্য আবশ্যক তথ্য পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হয় বটে কিন্তু ইহা রসায়ন বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান-এর পদের বিজ্ঞান নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া মাল মশলা ব্যবহার করা হয় বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবী করা হয়। যাহা হউক, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এলাকায় কি কি বিষয়ের আলোচনা পড়ে দেখা যাউক। আলোচ্য বিষয় অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে Physical ও Cultural এই দুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে। Physical Authropologyর এলাকায় পড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরকঙ্কাল, করোটি (osteometry ও craniometry) প্রভৃতির বিচার ; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাপজোখ ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে (anthropometry) দৈহিক লক্ষণ হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বা নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর মনুষ্যের জাতিলক্ষণসমূহ (racial characteristics) নির্ণয়ের চেষ্টা ; racial biology cultural anthropologyর এলাকায় পড়ে শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণ, সমাজের গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রথা, বিধিনিষেধ, খেলাধুলা, কিম্বদন্তী, রূপকথা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচনা। প্রধানতঃ যাহাদিগকে primitive tribes বলা হয়, অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার বাহিরে এখনও যে সকল মনুষ্য গোষ্ঠী বা সমাজ বাস করে তাহাদের জীবনযাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। সভ্যসমাজের মধ্যে নানাপ্রকার প্রাচীন প্রথা, বিধিনিষেধ এখনও বর্ত্তমান। এই-গুলির মূল অনুসন্ধান করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রাপ্ত মাল-মশলার সাহায্যে প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির আলোচনা করাও নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অঙ্গ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক দিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দুইটি বিভাগ দেখা যায়। একটি বিভাগের লক্ষ্য পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রার—সমাজগঠন, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি—সকল অঙ্গের বিবরণ সংগ্রহ করা। এই কাজ কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগের কাজ Physical anthropologyর মধ্যে পড়ে। এই বিভাগে নৃতত্ত্ববিজ্ঞান Sociology, Physiology, Racial biology, Genetics প্রভৃতি বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া নূতন দিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই বিভাগে অন্য একটি দিকে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ পরে করা হইতেছে। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনের সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসক-জাতিসমূহের পক্ষে প্রয়োজন—যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনপ্রকার অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ না করিয়া ও অহেতুক বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া "সহানুভূতির সঙ্গে" শাসনকার্য্য নির্বিঘ্নে চালাইতে পারা যায়। colonial administrationএর এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত মনুষ্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য একথা কেহ বলিবে না এই অনুসন্ধান ও গবেষণার পশ্চাতে কিছুমাত্র জ্ঞানপিপাসা নাই, ইহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। ভারতবর্ষেও কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ ঐরূপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes ও Tribes সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে শাসন কার্য্যের সুবিধা করা এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু গোড়ায় উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে যে সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীরা কৃপণতা করেন নাই।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দুই অংশের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে মনুষ্যজাতির গোষ্ঠীবিভাগ বা 'racial classification. ইহার অর্থ কয়েকটি নির্ব্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (races) ভাগ করা। এই সকল নির্ব্বাচিত দৈহিক লক্ষণ হইল—চুল, মস্তকের গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠন, চক্ষুর রং ও গঠন, দেহের দৈর্ঘ্য, গাত্রবর্ণ প্রভৃতি। এই সকল লক্ষণের একটি, দুইটি বা সব কয়টির ভিত্তিতে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন ইউরোপীয়গণ সাধারণভাবে গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভাগ করেন—white and coloured races, কিন্তু তাঁহাদের শ্বেতজাতির তালিকায় মধ্যে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের, অর্থাৎ ইউরোপের শ্বেত জাতিগুলি এবং আফ্রিকার, আমেরিকার ও অন্যান্য স্থানের তাঁহাদের আত্মীয়গণ পড়েন, এশিয়ার অধিবাসী যে সকল সাদা জাতি আছেন তাঁহারা coloured raceএর অন্তর্ভুক্ত। গাত্রবর্ণ অনুসারে এই প্রকারের জাতির শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নয়, ইহা রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগ। যতগুলি বেশী দৈহিক লক্ষণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে পরীক্ষা করা হইবে সেই অনুপাতে গোষ্ঠীর বা racial typeএর সংখ্যা বেশী দেখা যাইবে। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে এই টাইপ নির্ণয় করিবার কাজ physical anthropologyর এলাকাভুক্ত। এই racial classification স্থির করিবার ব্যবস্থার কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এখন বিদেশী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যিনি ভারতবর্ষের বাসিন্দা হইয়াছেন, বলিতেছেন—"Our Science has been debased in the interest of false racial theories." এ বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

জাতি বা গোষ্ঠীর লক্ষণ নির্ণয় করিবার মাপজোখের ও পর্য্যবেক্ষণের মান ও প্রণালী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পৃথকভাবে কিছু বলা আবশ্যক, আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করিবার চেষ্টায় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে অনন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার পথে যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেহ, দৈর্ঘ্য, মস্তক, নাসিকা মুখমণ্ডল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি লোকের পরিমাপের ফল ভিন্ন। তারপরে দেখা যায় যে এই সকল পৃথক ফলের কতকগুলি পার্থক্য হয়ত উনিশ বিশের মধ্যে। যে সকল ফলের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়া যায়—সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মূল বা প্রধান টাইপ স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান হইতে ব্যতিক্রমগুলি সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী অঞ্চলের কোন টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্য নৃতত্ত্ব-

বিজ্ঞানীগণ ফরমুলা ধরিয়া অঙ্ক কসিয়া জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্যের বা পার্থক্যের পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করেন। এই সাদৃশ্য বা পার্থক্যের পরিমাণ অনুসারে সংমিশ্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যে প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেন সে প্রণালী কেবল জীবিত মনুষ্য গোষ্ঠীর বেলাতে যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত মাপ ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সকলক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংমিশ্রণ নির্ণয়করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, যে-প্রণালীতে লক্ষণগুলি নির্ণয় করিবার চেষ্টা হয় সে প্রণালীতে নির্ভরযোগ্য ফল সব সময়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তারপর racial type এর যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন, সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র বা বিশুদ্ধ race বা জাতি আদৌ আছে কিনা এবং টাইপ স্থির করিবার ফরমুলার ভিত্তিতে যে racial classification বা জাতির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রচলিত অনুসন্ধান প্রণালীর পরিপোষক হিসাবে blood grouping হইতে কোনরূপ সহায়তা পাওয়া যায় কিনা তাহা লইয়া কিছুকাল পরীক্ষার পর সন্তোষজনক ফল পাইবার আশা ত্যাগ করা হইয়াছে এবং Blood grouping পরীক্ষার ফল শরীরবিজ্ঞানের কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

সে যাহা হউক, যেখানে মাত্র করোটি বা কঙ্কালের অংশ লইয়া জাতির টাইপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা হয় সেখানে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে এনটমিষ্ট ও প্রত্নজীব-বিজ্ঞানীর palaeontologist উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্পূর্ণ কঙ্কাল করোটি হইতে জাতির টাইপ স্থির করিবার ফরমুলা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের আছে ; কিন্তু উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে, এই অনুমান বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহা ব্যক্তিগত মতামত মাত্র, বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে মূল্য দেওয়া হয় সে মূল্য উহাকে দেওয়া যায় না। একটু আগে বলা হইয়াছে যে racial theoryর ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই প্রয়োগের প্রণালী খুব সূক্ষ্ম। বৈজ্ঞানিক ঠাট আগাগোড়া বজায় থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক অনুমান কখন ব্যক্তিগত মতে রূপান্তরিত হয় এবং রূপান্তরের মূলে কি প্রকার উদ্দেশ্য কাজ করে তাহা ধরিতে অনেক সময় লাগে। মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে racial theory ব্যাখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। Racial theoryর অপপ্রয়োগ ও কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অবৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর চোখ এড়ায় নাই তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে; "...Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain Scholars and Politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of the census created the impression that science could be diverted to Political and communal ends...... But perhaps the chief thing that has disturbed nationalist opinion in India has been the creation of Excluded and partially Excluded Areas. It is an open secret that this move was largely the work of a distinguished anthropologist at the Round Table conference." (Dr. Verrier Elwin—Pres. Add. Indian Science Congress, 1944) ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ প্রভৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ কিভাবে প্রবেশ করিয়াছে পরে অন্যান্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাহা আলোচনা করা হইবে।

Racial theory মানিয়া লইবার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের সম্পর্কে আলোচনায় এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি নাই। চল্লিশকোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সাদা, কাল, পীত, নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথে মধ্য এসিয়া হইতে নানা জাতির নূতন নূতন প্রবাহ আসিয়া ভারতবর্ষের জন-সমুদ্রে মিশিয়াছে। চোখের উপর দেখা যাইতেছে যে উত্তরপূর্ব্ব হইতে পীত জাতির প্রবাহ এই সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। এই বিশাল জন-সমুদ্রকে বেওয়ারিশ দরিয়া বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে সেই সকল মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিরূপ পরে দেখা যাইবে। মোটামুটি এই সকল মতবাদকে বেওয়ারিশ দরিয়ায় দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে এইরূপ অভিযান ছাড়া বেওয়ারিশ দরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইবার সহজ উপায় নাই। কাজেই ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ে এইরূপ অভিযানের কাহিনী পাওয়া যাইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে গূঢ় আত্মপ্রচারের কৌশলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিয়া লোকে ভুল না করে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত, সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমাদিগের পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে তাহাদের প্রকৃত ভিত্তি কি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে স্তর-বিন্যাস (ethnic stratification) নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের মতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে এবং এ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কমূলক সমস্যাগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু এই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ কি ভাবে পৃথিবীর অধিবাসীকে বিভিন্ন গোষ্ঠিতে ভাগ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

অথচ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আত্মহত্যা!

কথাটি মনে হতেই তার রোমাঞ্চ হল। ভয়ে নয়। আনন্দেও নয়। হয়তো চরম দুঃখের নিরুপায়তার মাঝে একটা দিশে পাওয়ার উত্তেজনায়।

আত্মহত্যা ছাড়া তার মতো লোকের কি উপায়ই বা আর থাকতে পারে? জগতের কোথাও দাঁড়াবার মতো একফোঁটা ঠাঁই যার নেই, বিশাল ধরায় একবিন্দু ভরসা যার নেই, আত্মবিলোপই তার একমাত্র করণীয়। বেঁচে থাকার সহস্র দুঃখে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের নির্ধারিত সেই মৃত্যুপরিণতির দিকেই তো এগিয়ে যেতে হবে। তার আগেই এ-স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে সে শান্তি পাবে।

ভেবে দেখবার আর আছে কি? ভেবেছে তো অনেক দিন। লাভের মধ্যে ভাবনা শুধু বেড়েই চলেছে। আর ভাবনা নয়, আজই সে মরবে। মনে বেশ জোর পাচ্ছে সে। মনের কোনো কোণে একতিল দুর্বলতা নেই। উপেক্ষা করলে এমন শুভমুহূর্ত হয়তো আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। অতএব আজ রাত্রেই—এখনই।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। এর পর চরাচর জেগে উঠবে। নবসূর্য উঠবে তার আলোর উৎস নিয়ে। সে-আলোকে অন্তরের সব উৎসাহ সকল বলিষ্ঠতা নিভে যাবে হয়তো।

বিনিদ্র শয্যা ছেড়ে সে উঠে বসল।

এ ঘরেই—ওই কড়িকাঠের সঙ্গে! না, ঘরটাকে কেন কলুষিত করে যাবে? তার মৃত্যুপ্রেতায়িত এ ঘরে ভবিষ্যতে কেউ হয়তো থাকতে চাইবে না। আত্মহত্যার স্মৃতিমন্দির হয়ে না-ই রইল ঘরখানা।

লম্বা দড়িগাছা হাতে নিয়ে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে চাইল—আজন্মপরিচিত মহাকাশ। একটি দীর্ঘনিশ্বাসের উদ্গম বোধ করে সে সবলে গা ঝাড়া দিয়ে নিল। খিড়কিদরজা খুলে বরাবর এসে সে পুকুরধারে দাঁড়াল। বাড়িটির ছায়ামূর্তির দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। পিতামহের আমলের জীর্ণ বাড়ি দেখলে মায়া হয়। মায়া! সে মায়ার তার জন্য আছে শুধু দাবদাহের জ্বালা।

শুধু বাড়ি কেন, বিশাল বিশ্বের কোথায় আছে তার জন্য এক বিন্দু শীতলতা! সর্বত্র বহ্নিদাহ। রক্তমাংসের মানুষ এখানে বাঁচতে পারে কেমন করে?

দড়িটা কি খুব সরু হল? সরুই ভালো। বেশি মোটা হলে ফাঁস কষে পড়তে দেরি হয়ে কষ্ট দেবে। শক্ত আছে তো? দড়িটা সে টেনে দেখল, বেশ শক্ত আছে।

মোটা আমগাছের উঁচু ডালটাই পছন্দ হল। কিন্তু আমগাছটিকে সে কলঙ্কিত করে যাবে? তার মৃত্যুর পরে হয়তো ওর নাম হবে 'গলায় দড়ির আমগাছ'। কেউ হয়তো গাছটার আম খেতে চাইবে না। না-ই বা চাইল খেতে। তার নিজের যখন খাবার কোনো উপায় রইল না—বাঁচবার কোনো পথ রইল না জগতে, সে কেন ভাবতে যাবে জগত খেতে পেল, কি পেল না? শয়নগৃহের সেই কড়িকাঠেই গলায় দড়ি দিল না বলে তার আফ্‌সোস হতে লাগল।

এ আমগাছটাই তার পছন্দ হয়েছে—এ গাছের আম ভালো।

পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠছে। আর সময় নেই। আগত ঊষার আলো ধরায় নামুক তার মৃত্যুবার্তা নিয়ে।

গাছের তলায় গিয়ে সে দাঁড়াল। গাছে উঠে ডালের সঙ্গে দড়ি বাঁধবে. সে দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিচে ঝুলে পড়বে। কি জংগল গাছটার তলায়। দীর্ঘ ঘাসে একেবারে হাঁটু অবধি ঢেকে ফেলেছে।

ধরণীকে কি একবার শেষ-প্রণাম করে নেবে? নাঃ, ধরণী তার কে?

গাছের গুঁড়িতে পা তুলতে যাবে, হঠাৎ পায়ের কাছে ফোঁস্ করে একটা শব্দ উঠল। সে আঁতকে উঠল। সর্বনাশ! এক কৃষ্ণনাগিনী ফণা বিস্তার করে তার হাঁটু সমান উঁচু হয়ে দুলছে। সে পিছিয়ে আসবার চেষ্টামাত্র করতেই মহারোষে সেই কেউটে সাপ তার পায়ে ছোবল মারল।

সে আর্তনাদ করে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের দড়ি দিয়ে দংশনক্ষত স্থানের একটু উপরে কষে বাঁধল—

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের কয়েকজন মরমী কর্ম্মোপদেশক, কবি, ও নীতিবেত্তা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন। মজ্‌দদ্দিন অল্‌ বোগ্দাদী, ফরিদুদ্দিন আত্তর ও জালালুদ্দিন রুমী যথাক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পাদে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তর মরমী সন্তদিগের একখানি বিখ্যাত জীবনী সংগ্রহ রচনা করেন। জালালুদ্দিনের মস্‌নভি-ই-মা'নভি গ্রন্থ সুফিসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বায়জাদের আবির্ভাব কালে মরমীদিগের প্রভাব যে বিশেষ কোনও কারণে অন্তর্হিত

৬নং চিত্র

হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাসের হেতু দেখি না। যাহারই দ্বারা অঙ্কিত হউক না কেন, নীল আঙ্‌রাখায় আবৃত তনু এই উপবিষ্ট দরবেশ মূর্ত্তির কেবল রেখাচিত্র সাহায্যে যে অনুলিপি প্রদত্ত হইল তাহা বর্ণবিহীন হইলেও মূল-চিত্রের (১) বিশেষত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে। এ চিত্রখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। ইহা হিরাটে অঙ্কিত হইয়াছিল।

(১) মূলচিত্রখানি ফরাসীদের "জাতীয় গ্রন্থাগারে" রক্ষিত আছে।

উজির মীর আলিশিরের ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে লিখিত "রত্নমালা" নামক একখানি পুঁথি বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। মীর আলি শির সুফী মতাবলম্বী ছিলেন এবং শেষবয়সে নক্‌বন্দিয়া নামক এক দরবেশ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন হিতকর্মী পৃষ্ঠ-পোষকের প্রীতি সম্পাদনের জন্য বায়জাদের পক্ষে একজন দরবেশের মূর্ত্তি অঙ্কন অনুমানমূলক বলিয়া বিবেচিত হইলেও একবারে যে অসম্ভব এ কথা বলা যায় না।

হিরাটের চিত্রকরেরা অনেকেই সুফী সম্প্রদায়ের মতানুবর্ত্তী ও সমর্থক দিগের জন্য বহু ক্ষুদ্রক চিত্র অঙ্কন করিতেন। এ সম্পর্কে তৎকালীন পরিস্থিতির বিষয় একটু উল্লেখ প্রয়োজন। বিদেশী সৈন্য তখন দেশের ভিতর

১০নং চিত্র

আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে, আর দেশময় খণ্ডযুদ্ধের ফলে চারিদিকেই অশান্তি বিরাজিত। এ সময়ে যে মতবাদ মানসিক শান্তির সন্ধান দেয় সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মন যে সে দিকে আপনা হইতেই জীবিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বায়জাদ ছিলেন মতবাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল: সুফী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাই মীর আলি শিরের রত্নমালার চিত্রগুলি যে তাঁহারই রচিত কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আলিশির নিজেই একজন দক্ষ চিত্রক ছিলেন। অপর শিল্পের সাহায্যে লওয়ার তাঁহার কোনও প্রয়োজ ছিল না।

সে যুগের সুফীভাবাপন্ন চিত্রগুলিতে কোথাও দরবেশদিগের নানা ভঙ্গীর নৃত্য, কোথাও বা উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সভাস্থলীতে বাদানুবাদ বেশ স্বাভাবিকভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রকারের একখানি চিত্রের নিম্নভাগে পারসীতে লেখা রহিয়াছে—"দরবেশদিগের সংসর্গ সাক্ষাৎ স্বর্গ বা সতুল্য; তাঁহাদিগের সঙ্গ মিলিলে আর কিছুই অপূর্ণ থাকে না। এ সকল চিত্রপটের কোনও কোনও খানি বায়জাদের দ্বারা অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও এতৎসম্পর্কে কোনও নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৮নং চিত্র

পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলি যাহার দ্বারাই অঙ্কিত হউক না কেন, পারস্যের শিল্প ধারায় সুফী ভাবোন্মেষ যে বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছিল তাহার যথার্থ উপলব্ধি হয় আর এক শ্রেণীর চিত্র দেখিলে। এই সকল চিত্রপটে শিল্পী যেন দর্শকের হৃদয়ের উল্লাস ও তাঁহার নয়নোৎসবের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের জন্যই বদ্ধপরিকর। সুদৃশ্য কার্পেট, সুচিত্রিত টালি (tiles), খিলানের উপর সুকৌশলে উৎকীর্ণ, প্রসাধক অলঙ্কার স্থানীয়, সুন্দর সুন্দর লিপি, নানান্ ছাঁদের নক্সা কাটা শোভন কারুশিল্পের নিদর্শন, সব কিছুই চিত্রপটে স্থান পাইয়াছে। গাছ আছে, পাহাড় আছে, তাহার উপর গেজেল মৃগ আছে, আর আছে রূপালী কাণ্ডবিশিষ্ট চেনার বৃক্ষ। এ গুলিকে নিদর্গ চিত্র না বলিয়া সুন্দর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে আত্মসমাহিত হওয়ার আমন্ত্রণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (২) হাফিজের কবিতার ন্যায় এ সকল চিত্রের একটা গূঢ় অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে, চিত্রকর অনেকসময় হয়তো সে গূঢ়ার্থ নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। শিল্পের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং জীবনের সহিত ও সে সম্পর্ক স্বল্প নিবিড় নয়। যে প্রশান্তি যে সৌম্যভাব, আমরা জীবনে কাম্য বলিয়া মনে করি, শিল্পেও তাহার প্রস্ফুরণ সমভাবেই প্রার্থনীয়। শিল্পী চিত্রপটে যে সংযম (repression) স্বতঃই অবলম্বন করিয়া থাকেন, কতকাংশ অপ্রকাশ রাখিয়া দ্রষ্টার কল্পনা বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করেন, সেই নিরোধনকে শুধু শিল্পের নহে, জীবনেরও গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (৩)। শিল্পীর স্বাধীনতা যেখানে অব্যাহত থাকে সেইখানেই কেবল এ সত্যের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। শুধু ফরমায়েসী চিত্রের যোগান দিতে গেলে কৃত্রিমতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তখন এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের মর্ম্ম আর সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

আর একখানি ক্ষুদ্রক চিত্রশোভিত পুঁথির কথা উল্লেখ করিলেই সমকালীন পুঁথিতে বায়জাদের চিত্রসন্নিবেশের নির্ঘণ্ট একরূপ পরিসমাপ্ত হয়। ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত নিজামী কবির খাম্‌সা গ্রন্থের একখানি পুঁথি (Or. Ms. 6810)। নিজামী জীবিত ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১১৪২—১২০৩), আর এই পুঁথিখানি লিখিত হয় খৃঃ ১৪৯৪-১৪৯৫ অব্দে। ইহাতে বায়জাদ মিরেক্, ও কাশিম আলি এই তিনজন ওস্তাদেরই নামাঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র স্থান পাইয়াছে। ছবিগুলি দেখিলেই সেগুলি যে দুই তিন হাতের আঁকা তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। নামলিপনের ভঙ্গী সমকালীন লিপিরচনার অনুরূপ প্রধানতঃ এই হেতুবাদে আর্ টমাস্ আর্ণল্ড বায়জাদের নাম লেখা চিত্রগুলি তাঁহারই স্বহস্তে অঙ্কিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে একটা মতভেদও রহিয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এ বায়জাদ লোকপ্রসিদ্ধ কামালুদ্দিন বায়জাদ নহেন, বায়জাদ নামেরই অপর এক ব্যক্তি, যিনি ১৫০৭-৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট বাবরের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন এবং ১৫১০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভারত সম্রাট রূপে বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন খৃঃ অঃ ১৫২৬ হইতে ১৫৩০ পর্য্যন্ত।

বাবর যে শিল্পীশ্রেষ্ঠ বায়জাদের চিত্রাদির সহিত সুপরিচিত ছিলেন তাহা সন্দেহাতীত বলিয়াই মনে হয়। তিনি বায়জাদের অসামান্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম কলাকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আবার সমঝদারের ভঙ্গীতে বায়জাদ অঙ্কিত শ্মশ্রুসমাবৃত মুখগুলির যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেও তিনি চিত্রার্পিত শ্মশ্রুবিহীন মুখগুলির চিবুক রেখার আতিশয্য (exaggeration of the lines of the chin) দোষটিও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। যাউক সে কথা। (Or. Ms. 6810) প্রাগুক্ত পুঁথির ছবিগুলির মধ্যে যে কয়খানিতে বায়জাদের নাম অঙ্কিত আছে সেই কয়খানিই অধিক প্রাণবন্ত। কোন কোনও ছবিতে বায়জাদের নামছাড়া কাশিক আলির নাম ও সূক্ষ্মাক্ষরে লিখিত আছে—এই কারণে প্রকৃতরূপকারের সনাক্তকরণ লইয়া গোল করিয়াছে কিছু। হয় তো বায়জাদের এ কয়খানি চিত্র কাশিম আলিই সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন! একই কেন্দ্রে একই চিত্রশালার বিভিন্ন চিত্রকরের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

(২) এ, ইউ, পোপ, Introduction to Persian Art (1. 233) সুফী চিত্রের নমুনা স্বরূপ দুইখানি চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—একখানিতে চিত্রকর আত্মবিস্মৃতি হইয়া চিত্রাঙ্কন কার্য্যে নিরত, অপর চিত্রখানিতে কবি রম্য উদ্যানে উপবিষ্ট। উভয় চিত্রেই ভাবাতিকাষ্য, ও গাম্ভীর্য্য, ও অচাপল্য, অন্তর্নিহিত ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সমাবেশিত রহিয়াছে। শেষোক্ত চিত্রখানি (Poet in a garden) বষ্টনের ললিত শিল্প সংগ্রহাগারে (Museum of fine art Boston) রক্ষিত আছে। আমরা আলোকচিত্র হইতে উহার একখানি প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম।

(৩) Lionel de fonseka, La verite daus l'art, p, 82.

দড়ি

শ্রীকমল মৈত্র

সতীশকে ঠিক কোন নাটকের বিশিষ্ট গ্রাম্য চরিত্রের নিখুঁত সংস্করণ বলেই মনে হচ্ছিল যখন সন্ধ্যার সময় দুই হাতে দুই থলি নিয়ে শ্রান্তভাবে দরজায় সে মৃদু করাঘাত করল। পায়ে অবশ্য স্যাণ্ডাল ছিল, কিন্তু পথের ধুলা ঠেলে উঠেছে হাঁটুর উপর। কাপড়টাকে বাঁচাতে গিয়ে হাঁটুর উপর শক্ত করে বেঁধেছে। পরিচয় না দিলে বোঝবার উপায় নেই যে ও সতীশ নাগ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা ছাত্র, গ্রামের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক; বড় জোর মনে হবে সন্ত্রান্ত একজন চাষী।

দরজায় টোকা মেরে শান্তকণ্ঠে সে ডাকল—'মীনা'। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে একটী তরুণী শাড়ীর আঁচল জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে দেয়।

"ইস্, একি চেহারা হয়েছে তোমার!" সমবেদনায় মীনা ভেঙ্গে পড়ে, "চল—" থলি দুটো তার হাত থেকে নিয়ে রান্নাঘরে রাখতে যায়। জ্বলন্ত উনুনটার উপর চট্ করে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে এসে নিঃশব্দে পাখা করতে থাকে।

"মুখ হাত ধুয়ে নাও, সরবং এনে দি'—" হঠাৎ এক সময়ে মীনা বলে উঠে। ওদিকে জল নিশ্চয় ফুটে গেছে এতক্ষণ। চায়ের অভাব সে বিকাল থেকে বোধ কচ্ছে। গ্রাম সম্বন্ধে একটু বেশী রকম সচেতন, কারণ সব সময়ে চা পাওয়া যায় না, ভাল চায়ের তো কথাই নেই। মীনা সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে পারে চায়ের বিনিময়ে; এমনি নেশাখোর সে চায়ের ব্যাপারে।

সরবতের গ্লাসটা সতীশের হাতে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যায় ত্বরিতপদে। জল ফুটে গেছে। স্বামীর আনীত থলি থেকে চায়ের প্যাকেট বার করতে বসে। নানা রকমের সব্জী—আলু, পটল ইত্যাদি বেরিয়ে এল; কিন্তু চা কৈ? অপর থলিটাও অধীর আগ্রহে উপুড় করে দিল; না, চা আসেনি। সেখান থেকে সে জিজ্ঞাসা করল—"চা আননি নাকি?"

সরবতের গ্লাসে সবেমাত্র চুমুক দিতে যাচ্ছে সতীশ, মীনার প্রশ্নে তা আর সম্ভব হল না। তাইতো, চায়ের কথা সে একেবারেই ভুলে বসে আছে! বাজার যাবার সময় মীনা কতবারই না স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কি উত্তর দিবে সে? এর পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় বসে রইল।

স্বামীর এই অনিচ্ছাকৃত ভুলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মীনা উড়িয়ে দিতে পারত যদি এই ভুলটা চায়ের বেলায় না হত! তার উপর যখন সে দেখল চায়ের পরিবর্ত্তে এসেছে গজ ছয়েক দড়ি তখন সে উঠল জ্বলে! দড়ি কি হবে? একবারও সে দড়ি আনতে বলে'নি তাকে! দড়ি আনবার তবে কি উদ্দেশ্য? হঠাৎ তার মনে হল—তার স্বামী ইচ্ছা করেই চায়ের পরিবর্ত্তে 'দড়ি' এনেছে তার অতিরিক্ত চা প্রীতির উপর বিদ্বেষ দেখিয়েই। ভাবতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেল সে। সতীশের কাছ থেকে যখন সে গিয়েছিল সরবং দিয়ে, তখন ধীর, নম্র, কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শ স্ত্রীর মতই? কিন্তু ফিরে এল কলহপরায়ণা রণমূর্ত্তি হয়ে। কোমরে আঁচল জড়ানো যেন যুদ্ধং দেহী ভাবটা! অপরাধীর মত সতীশ চুপ করে বসে রইল, ভুলে যাওয়ার জন্য বেশ বিনয়ের সঙ্গে মার্জ্জনা ভিক্ষার কথাই ভাবছিল সে। তাকে বলবার সুযোগ না দিয়ে মীনা সামনে এসে দাঁড়ায়—"এটা কি জন্যে এনেছ বলতে পার?" রাগে মীনার স্বর পর্য্যন্ত বদলে গেছে যেন। সতীশ দেখে মীনার হাতে 'দড়ি'! দড়ি আনার ইতিহাসের কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করে সতীশ। তার বন্ধু গোবিন্দবাবু খানিকটা 'দড়ি' কিনে সতীশকে নিতে বলেছিলেন কারণ অমন শক্ত ও মজবুত দড়ি নাকি এ অঞ্চলে আর পাওয়া যাবে না। কিছু বিবেচনা না করেই সতীশ কিনে ফেলেছিল খানিকটা দড়ি। সত্য গোপন করে সতীশ উত্তর দেয়, "দড়ি! ওঃ—দড়ি? হ্যাঁ, কিনে আনলাম। —কাজে লাগবে।"

—"কি কাজে লাগবে বলত?" মীনা অধৈর্য্য হয়ে উঠে।

—"এই—ধর, কাপড় টাপড় শুকোতে দেওয়া—"

সতীশের মনে পড়ে যায়—মীনা তার খাটিয়েছে উঠানে কাপড় শুকোবার জন্যে। একটু ভেবে সতীশ আবার বলে, "আরে, বিছানা বাঁধতেও লাগতে পারে।"

—"কত টুর করেন উনি! তবু যদি দুটো হোল্ডল না থাকত!" তাইত! সতীশ আর ভাবতে পারে না। আর কিইবা প্রয়োজন আছে দড়ির?

মীনা নিজের ভাগ্যকে, নারীজন্মকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে যায় সেখান থেকে, স্বামীর এই প্রচ্ছন্ন উপেক্ষায় সে মর্ম্মাহত। ফুটন্ত জল রান্নাঘরের নালায় ফেলতে ফেলতে রাগ হল তার নিজের উপর; নিজের ঐ অতিরিক্ত 'চা প্রীতির' উপর, কেন

সে চা খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে না? স্বামী তো চা না খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছে।

সাময়িক মেঘ হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যেত, কিন্তু সতীশের সামান্য ভুলের জন্যই তা আর সম্ভব হল না; বরং আরো গুমোট হয়ে উঠ্‌ল, খেতে বসে সতীশ ব্যাপারটাকে পাকাপাকিভাবে চাপা দেবার জন্য খুব কোমল কণ্ঠে বললে, "মীনু, ও নিয়ে মন খারাপ কোর না; ছ' আনার জিনিষ! তাছাড়া বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ আছে তো? কোন জিনিষের কখন প্রয়োজন হয় আগে তা জানা যায় না। তবে সংসারে সব জিনিষেরই প্রয়োজন আছে।"

—"হ্যাঁ, আমার গলায় দড়ি দেবার সময় লাগবে বৈকি!" মীনা ভগ্নকণ্ঠে কথাটা বলে বাহিরে এসে চুপ করে বসে রৈল। সতীশ আর কোন কথা না বলে নীরবে আহার শেষ করে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে ঢুকেই কিন্তু তার মনটা আব'র ব্যাথায় ভরে উঠে। আজ তার বিবাহের তৃতীয় বার্ষিকী। সেই জন্য স্কুল থেকে বিকেলে কিছু ফুল এনেছিল সতীশ, মীনাও সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। আজকের এই স্মরণীয় রাতটা ব্যর্থ হয়ে গেল—সামান্য—অতি সামান্য ভুলের জন্য।

তুচ্ছ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মীনা এমন স্মরণীয় রাতটাকে উপেক্ষা করে অভিমান করে থাকতে পারে, আর সে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে আজকের ঘটনাটাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল। মীনা এল ঘরে। কোন কথা না বলে বিছানার এক পাশে সঙ্কুচিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সতীশের হঠাৎ একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায়; বিয়ের রাতের কথা! সেদিনও সে প্রথমে এইরকম ভাবে নির্ব্বাক ছিল। কিন্তু সেদিন আর আজ? সেদিনের নীরবতার পিছনে ছিল লজ্জা আর সঙ্কোচ, আর আজ রয়েছে রাগ ও দুর্জ্জয় অভিমান! পাশ ফিরে সতীশ—অযাচিতভাবে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—বেশ চাপা গভীর নিঃশ্বাস!···

শীতের স্তব্ধ রাত্রি। সতীশ ক্লান্ত—কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না। হঠাৎ সে উঠে বসে ঘুমের মাঝেই। স্বপ্ন দেখেছে সে—বিশ্রী একটা স্বপ্ন! স্কুলে সে পড়াচ্ছিল একজন এসে খবর দিল যে, মীনা গলায় দড়ি দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে একবার বিছানার দিকে তাকায়! না, মিনু ঘুমুচ্ছে। তাহলে স্বপ্নই। উঃ, ভীষণ ভয় হয়েছিল। শীতের রাত্রিতেও সে ঘেমে উঠেছে, স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবার পর সে ভাবে, মীনা যা অভিমানী মেয়ে, স্বপ্নকে সে সত্যে পরিণত করতে পারে। কাজ নেই ঐ দাড়িগাছাটা বাড়ীতে রেখে। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে। 'দড়ি'টা রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মীনাও স্বপ্ন দেখছে। সামান্য কারণে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার ফলে সে নাকি বিষ খেয়েছে। ঘুমের ঘোরেই মীনা বলে উঠে, "না গো না—আর কিছু বলব না—" পাশ ফিরে ঘুমের ঘোরেই হাতদুটো বাড়িয়ে দেয়—গিয়ে পড়ে সতীশের বুকের উপর।

সতীশ আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে। তাহলে মীনারও অভিমান ভেঙেছে। সাদরে তার কপালে চুম্বন এঁকে দিতে দিতে বলে, "ছাড় মীনু, চুলগুলো—" সতীশের কথা থেমে যায় হঠাৎ। মীনা ঘুমের ঘোরে কথা বলছিল; সে জাগ্রতা নয়!···

* * * *

পরের দিন স্কুলে যাবার সময় মীনা হাসতে হাসতে এসে বলে, "কালকের সেই দড়িটা কোথায় গো?"

—"কেন?" সতীশ ভয় পায় আবার দড়ির খোঁজ হওয়াতে।

—"ভয় নেই, গলায় দড়ি দেব না।" খিল খিল করে হেসে উঠে মীনা, "ইঁদারার দড়িটা ছিঁড়ে গেল এইমাত্র বদলাতে হবে। ভাগ্যিস কাল দড়িটা এনেছিলে—"

—"ওঃ, আমি তো জানিনা সেটা কোথায়।"—সতীশ জামাটা গায়ে দিয়ে পথে নেমে পড়ে।

সহজ পথে

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

এই দেশেতে মরি যেন, ইহা বলাই বৃথা,
অন্য দেশে মরতে হবে, অনর্থক এ-ভয়;
এই দেশেতেই হরিনাম, এই দেশেতেই গীতা;
দেশান্তরে গিয়ে মরার খরচ অতিশয়।
এই দেশেতেই মরা সহজ রোগে অনাহারে—
আঁত্‌কে' উঠে' অবাক্ হবে এমন ত' কেউ নাই;
বিপর্য্যস্ত হ'তে হ'তে অভাবে ও ধারে
মরে'ই আমরা অব্যাহতি ভূমানন্দ চাই।
এই দেশেতেই মরি যেন, অকারণেই বলা—
বাপ, পিতাম' রেখে' গেছেন বেঁচে থাকার কাল;
শৈশব থেকে স'য়ে আসছে মরার পথে চলা—
বাছাবাছির ধার ধারি না অকাল কি কাল!
এই দেশেতে একদা যে জন্ম নিলাম আমি—
সুখ সেটা নয়; সুখের বলে' মরণটাই দামী।

সভ্যতার বাইপ্রডাক্ট্

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

নিউরেসিস্ বা স্নায়বিক রোগ আমাদের সভ্যজগতে আজকাল প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। 'কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মুখে অসংখ্য সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব হ'য়েছে। এরি সম্মুখীন হ'য়ে মানুষের "মন" নামক পদার্থটী নানা ঘাত ও প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কত না অশান্তির জাল বুনে চলেছে। কত না বলিষ্ঠ নরনারী এ দ্বন্দের সম্মুখীন হ'য়ে অসহায় তৃণের মতো কোথায় ভেসে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এ অশান্তির আশ্রয়ে মনের অসুস্থতা ক্রমে মানুষের দেহকেও আক্রমণ করেছে, সহায়তা করেছে নানা রোগের সৃষ্টি করতে। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ শোক, দুঃখ বেদনাও যেন আনন্দ ও সুখ-স্বপ্নের মতোই ওতপ্রোতভাবে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। বাহ্যিক রোগকে দমন করতে নানা চিকিৎসার সুব্যবস্থা হ'য়েছে সন্দেহ নেই, বড় বড় ডাক্তার, ভালো ভালো ওষুধেরও অভাব নেই, কিন্তু মনকে ঘিরে যে তীব্র ব্যথা বেদনা গুপ্ত হ'য়ে প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষকে তুষানলের মতো দহন ক'রে চলেছে—তার প্রতিকারের পথ কোথায়? এ আত্মঘাতী মনের অসুখকে নিয়ে বিশেষ ক'রে যে দু'জন মনীষী তাঁদের গবেষণার ফলে আমাদের এ অন্ধকার থেকে আলো দেখিয়েছেন তাঁরা হ'লেন—প্রফেসর ফ্রয়েড্ (Prof. Freud) এবং ডাঃ জাঙ্গ (Dr. Jung). মনীষী ফ্রয়েড্ বলেন: মানুষের কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা যখন তার মনের কোণে দ্বন্দ্ব এনে দেয় এবং সে যখন তার অন্তরের একান্ত আশাটি তার অবচেতন মনে ঠেলে দিয়ে তাকে দমন ক'রে ভুলে যাবার চেষ্টা করে—তখন আসে বিরোধ। সে বিরোধের সম্মুখে প'ড়ে মানুষের অন্তর্জগতে হয় এক আলোড়নের সৃষ্টি। এই আলোড়নের ভিত্তি থেকেই মানুষের মনের এ অসুখের সৃষ্টি। Dr. Emanuel Miller তাঁর প্রবন্ধ Neurosis and civilization এও বলেছেন: "For Freud too, and more intensively, traces all human behaviour, both group and individual, from the operation of instinctual appetites and the way in which these instincts are aided and frustrated by the impact of human beings one upon another."

আমরা সাধারণতঃ মনে ক'রে থাকি যে, যে কোনো শোক-দুঃখের ঘটনা প্রবাহকে ভুলে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বিস্মৃতির অতলগর্ভে স্মৃতিগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েও আমরা নিস্তার পাইনে। ভুলে যাওয়া সে তো সহজ কথা নয়! আপাতঃ দৃষ্টিতে যাকে আমরা মনে-না-থাকার ভাণ করি, সে তো ভুলে যাওয়া নয়। মনের নিভৃত কোণে তার বিজয় বৈজয়ন্তী নিত্যকালের মতো উড্ডীয়মান। ক্ষণিকের বিস্মৃতির অন্তরালে মনের সান্ত্বনাটুকুই হয়তো আমাদের যাত্রাপথে শান্তি এনে দেয়। ভুলে যাওয়া মিথ্যা কল্পনার আবরণে মানুষ শুধু পথ চলে। মনীষী ফ্রয়েড্ (Freud) বলেন: An idea entered into the ego of the patient which proved to be unbearable and evoked a power of repulsion on the part of the ego, the purpose of which was a defence against the unbearable idea. The defence actually succeeded and the idea concerned was crowded out of consciousness and out of memory so that its psychic trace could not apparently be found *yet this trace must have existed*. বস্তুতঃ মনের অন্তরালে স্মৃতির চিহ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না,—সে তার আসন প্রদীপ্ত কোরে অনেক সম্ভাবনা নিয়েই প্রতীক্ষায় থাকে।

হয়তো মনের ঐকান্তিক সামঞ্জস্যের ফলে মানুষ চায়—কোনো একটা ঘটনা চক্রের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত ক'রে দিতে। কিন্তু সে ঘটনা হয়তো অপ্রীতিকর, সাধারণ সামাজিক আবেষ্টনের বিরুদ্ধাচরণ। তবুও মানুষ চায় তাকে একান্তভাবে পেতে। এ কল্পনাকে ব্যাহত করার পথেই আসে তার জীবনের চরম দ্বন্দ্ব। এখানে দু' একটি উদাহরণ দিয়ে এর স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো।

ধরুন,—একটি লোক প্রলুব্ধ হ'য়েছে আর একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি। সে চায় একান্তভাবে সে নারীকে জয় করতে, তার রঙিণ কল্পনা বলাকার মতো উড়ে চলে নানা আশার জাল বুনে। কিন্তু সমাজের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার দুঃস্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। একদিকে সমাজের বিধি নিষেধ, নীতি—আর একদিকে তার ভালোবাসা—এ দু'এর বিরোধ তার অন্তরকে ব্যথিয়ে তোলে, এনে দেয় অন্তরে এক সুতীব্র আলোড়ন, মনের পরে ধরে ভাঙ্‌ন।

*   *   *   *   *

একটি লোক শৈশব থেকে চুরি বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে। আকস্মিক পরিবর্ত্তন এলো তার মনে। চুরি ছেড়ে—ধর্ম্ম নিয়ে উঠ্‌লো সে মেতে। বছরের পর বছর অতীত হ'য়ে যায়। ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন তার উজাড় ক'রে দেয়; কিন্তু কোন্ অবসর ক্ষণে শৈশবের স্মৃতি তার মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে, ভুলতে পারে না সে তার অতীতের অসাধুতার আর কপটতার কথা। তার অন্তর জ্ব'লে যায় তীব্র অনুশোচনায়, অতীতের ইতিহাস অবচেতন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। তাকে ব্যথিয়ে তোলে।

*   *   *   *   *

অলকা ভালোবেসে তৃপ্তি পায় নীরেনকে। দিনের পর দিন অলকার ভালোবাসা গভীর হ'য়ে ওঠে। তার জীবনে নীরেনের আগমন একদিন মধুর হ'য়ে উঠ্‌বে—এ কল্পনা অলকাকে পাগল ক'রে দেয়। প্রতিদিন নীরেনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে অলকা। প্রেম তার পরিণয়ে সাঙ্গ হ'বে, অলকার এই আশা। হঠাৎ অলকার কল্পনায় বাধা এলো, নীরেনের বিয়ে হ'লো জনৈকা সুনন্দার সঙ্গে। অলকা তার পরাজয়কে ঢাকতে চাইলে নীরবে. তার অন্তরের বাসনা চেতন থেকে অবচেতন মনে দিলে ফেলে, বিস্মৃতির মাঝে সে চাইলে মুক্তি। কিন্তু অবচেতন মনে তার অন্তরের যে ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইল, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তা' তাকে পাগল ক'রে দিতে চাইলে।

* * * * *

একটি হোটেলে থাকেন একটি তরুণী। তারি পাশের ঘরে থাকেন একটি সুন্দর তরুণ। উভয়ের দৃষ্টি উভয়কে এড়ায়নি। তরুণীর ভালো লাগে তরুণটিকে। কথা বলতে আনন্দ পায়। তরুণের চলা-ফেরা তরুণীকে প্রচুর তৃপ্তি দেয়। তরুণ একদিন গিয়ে প্রবেশ করেন তরুণীর ঘরটিতে। তরুণী তাকে অভ্যর্থনা করেন মনের আনন্দে। তরুণীরই হাতের তৈরী একটি সুন্দর টেবিল ক্লথের (Table Cloth) উপর নজর পড়ে তরুণের। খুশিতে ভরে ওঠে তরুণীর বুক, হাতের তৈরী টেবিল ক্লথটি উপহার দেন তরুণটিকে। তারপর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে উভয়ের অবাধ ভ্রমণ চলে। একের সান্নিধ্য অপরের কাছে মধুময় হ'য়ে ওঠে। একদিন তরুণ নিখোঁজ হ'য়ে উধাও হ'লেন। তরুণীর মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—তবু অন্তরে ফল্গুধারার মতো ভালোবাসা তাঁর বেঁচে রইলো। তিনি চাইলেন সব মুছে দিয়ে, আবার নতুন ক'রে বাঁচতে। কিন্তু অবচেতন মন থেকে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে দিলে আঘাতের পর আঘাত।

মনের ভেতর যে অশান্তির আগুন ক্ষণে ক্ষণে তরুণীকে অশান্ত ক'রে বিমর্ষ ক'রে তুললো, তাতে তিনি পাগল হ'য়ে গেলেন। দেখা যেতো এরপর থেকে তিনি নীরবে বসে একান্তে শুধু টেবিল ক্লথ বুনতেই ভালোবাসতেন।

* * * * *

এ তো গেল সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এমনি কতো ঘটনা আরও ঘটে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া কারো প্রিয়পাত্রের বা আত্মীয়-স্বজনের আকস্মিক মৃত্যুতে এমনি মনের উপর প্রক্রিয়া চল্‌তে পারে, যার ফলে মানুষের মনে এক অসুখের সৃষ্টি ক'রে তাকে উন্মাদ ক'রে দিতে পারে।

অনেক ছেলে ও মেয়েকে আজকাল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হ'য়েই পথ চল্‌তে হয়। ভালোবাসা মানুষের মানসিক ধর্ম্ম। বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে ও বয়স্ক অবিবাহিত ছেলে অনেককেই স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় চিরন্তনী অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভালোবাসাকে অন্তরের মণি কোঠায় উপেক্ষা ক'রেই পথ চল্‌তে হয়। তাদের প্রেম ও ভালোবাসার এ অপমৃত্যু অন্তরের নিভৃত কোণে যে দ্বন্দ্বের ও আলোড়নের সৃষ্টি করে—তা বলা বাহুল্যমাত্র। এ দমননীতির (repression) ফলে তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন আসে তা' অবর্ণনীয়। দেহ শিথিল হ'য়ে আসে, অন্তরে প্রেরণা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, ভগ্ন আর রুগ্ন দেহে মানুষকে শুধু হাহাকার করে ফিরতে হয়—অশান্তির বোঝা নিয়ে। নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা যেখানে মর্য্যাদা পায় না, সেখানে নারীর সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও রুক্ষ হয়ে আসে। স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যেখানে মনের বাসনা চরিতার্থের পথে আসে বাধা, সেখানেই আসে দ্বন্দ্ব। সভ্যতার যাত্রা পথে এ সমস্যা ও জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যখন মনের অসুখ প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তখন এ মনের অসুখই বাইরে এসে আর একরূপ ধারণ করে। হয় তো হিস্‌টেরিয়া, পঙ্গুতা, হাত পা ফোলা কিংবা মাথার বিকৃতি একটা না একটা রোগ এসে আমাদের শরীরকে ধরে আঁকড়ে।

মনীষী ফ্রয়েড্‌ আরও বলেন যে, এ repression বা দমনই আবার অনেক সময় projection এ এসে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় অনেক অবিবাহিত পুরুষ বা নারী—পাখী, বেড়াল, কুকুর এমনি কতো কি লালন পালন ক'রে থাকেন। আর তাঁদের ভালোবাসা দিয়েই ওগুলোকে আদর যত্নে প্রতিপালন করেন। যে অন্তরের প্রেম ও ভালোবাসাকে তাঁরা অন্তরে জমাট ক'রে বেঁধে রেখেছেন—এ তারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। এটাই হ'লো Projection এর ফল। এর ভেতরই নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তাঁদের হয় তো কতকটা সান্ত্বনা পাওয়ার প্রচেষ্টা।

মনীষী ফ্রয়েড্‌ মনের এ রোগের প্রতিকারের জন্য মনস্তত্ত্বের সাহায্যে আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন। মানুষের অবচেতনার গোপন ভাবধারাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে চেতনায় পুনরায় ফিরিয়ে এনে, মানুষের এ গভীর আত্মঘাতী রোগ থেকে তাকে হাল্কা ক'রে মুক্ত ক'রে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আন্‌তে কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন।

নিউরেসিস্‌ রোগে আক্রান্ত হ'লে মানুষের ভেতর তিনটি উপসর্গ বিশেষ ক'রে দেখা দেয়। প্রথমতঃ মানুষ চিন্তান্বিত হ'য়ে নানা ভাবনায় হ'য়ে পড়ে বিমর্ষ, দ্বিতীয়তঃ ঘুমের ব্যাঘাত মনকে ক'রে তোলে বিদ্রোহী, তৃতীয়তঃ আহারে জন্মায় অরুচি। অতএব চিন্তাভাবনা, ঘুমের ব্যাঘাত ও অরুচি,—এ তিনের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হ'য়ে চলতে হ'বে বিশেষ ক'রে। পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের প্রতি খুব নজর রাখতে হ'বে। আজিকার সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে—তারি বাইপ্রডাক্ট রূপে এমনি কত রোগ শোক দুঃখের অধিকারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। জীবনের চলার পথে প্রতিপদে নানা পরিবর্ত্তন এসে তীব্রভাবে মনের গণ্ডীটিকে দেয় আঘাতের পর আঘাত। আমরা অসহায় হ'য়ে পড়ি। কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে এগুলোও আমাদের জীবনের পুরস্কার হ'য়েই দাঁড়িয়েছে।

শহরতলীর স্মৃতি

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দানীং পল্লী-অঞ্চলের পাঠাগারগুলির প্রচেষ্টায় শহরবাসী সাহিত্যিকগণ ামাঞ্চলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রায়ই দেখি, দেশবরেণ্য নীষীদের স্মৃতি-পূজা, বার্ষিকোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিকে উপলক্ষ্য করে প্রত্যেক পাঠাগারের পক্ষ থেকেই সাহিত্য-সভার আয়োজন হয়, আর সই সূত্রে শহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহচর্য্যে ভাকে জাঁকিয়ে তোলবার ধুম পড়ে যায়। এর ফলে, কস্মিনকালেও য-সব শহরবাসী সাহিত্যিক পল্লীর সংস্পর্শে বড় একটা যেতে চাইতেন না, এক্ষেত্রে দায়ে পড়ে বা ভক্তবৃন্দের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই পল্লী-অঞ্চলে পদার্পণ করে রথ-দেখার আনন্দের সঙ্গে কলা-বেচার সুযোগটুকু পেয়ে তাঁরা নতুন পুঁজি নিয়েই শহরে ফিরেছেন, এমন উদাহরণও বিরল নহে। তা ছাড়া বহু পল্লীর সঙ্গে পরিচিত অনেক সাহিত্যিক-বন্ধুকে এই-ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন পল্লীর সংস্পর্শে গিয়ে নূতনতম কিছু দেখার আনন্দে অভিভূত হয়ে মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করতেও শুনেছি। 'আমরা একটু সুযোগ পেলেই নতুন কিছু দেখার আনন্দে বাংলার বাইরে ছুটে যাই ব্যয়ের ঘটা করে, কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলির কোন খবর রাখি না, অথচ বাংলা দেশে এমন অনেক বিশিষ্ট অঞ্চল আছে—যেগুলি দর্শন করে আনন্দ-লাভের সঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেতে পারে।'—এই ধরণের অনেক কথাই সকলকে বিভিন্ন সভায় বলতে শুনেছি। সুতরাং সাহিত্য-সভাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামাঞ্চলের সহিত শহরবাসী সাহিত্যিকদের এই মিলনী-ব্যাপারে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পক্ষান্তরে এই মিলনী বৃহৎ সংহতিপুষ্টির প্রতীকরূপে আমাদের সামনে আশার আলোকপাতও করে। সংযোগ ঘনীভূত হলেই সংহতিতে পরিণত হয়, একের কল্যাণ তখন অন্যের কল্যাণকে আশ্রয় ক'রে পরিপুষ্ট হতে থাকে, একের সমস্যা অন্যের সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে জাতীয় কল্যাণের প্রকৃত রূপ দেখবার জন্য প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। সঙ্ঘশক্তি ক্রমশঃ যতই পরিণত ও উৎকৃষ্ট হতে থাকবে, ব্যষ্টির কল্যাণ ততই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হবে। এর ফলে গোটা বাংলার ভিন্ন ভিন্ন পাঠাগারগুলি এইভাবে সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে একদা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ হয়ে এক বিরাট দেহের অংশরূপে পরিণত হয়ে উঠবে, এমন আশাও করা যেতে পারে।

পাঠাগার সম্পর্কে উচ্চতম আশার কথা বলে এবার আলোচ্য প্রসঙ্গে আশা যাক—যে সূত্রে এর অবতারণা। কিছু পূর্ব্বে এমন এক পাঠাগারের বার্ষিকোৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাওয়া গেল—কলকাতা শহর থেকে যার দূরত্ব বত্রিশ মাইলের বেশী নয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানটিতে পৌঁছুতে দিনমানের প্রায় অর্দ্ধাংশ পথেই কাটবে এবং সেই দিনই শহরে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই।

স্থানটির নাম বুড়ুল, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট নদীমাতৃক অঞ্চল। স্থানীয় যুবমঙ্গল পাঠাগারের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষ্যেই এই আমন্ত্রণ। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের আগ্রহে সভায় পৌরোহিত্য করবার ভার নিতে হয়। সাথী হন—শ্রীমান সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী এবং শ্রীমান বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। পাঠাগারেরপক্ষ থেকে স্থানীয় কর্মী শ্রীমান অক্ষয়কুমার কয়াল এসে আমাদের নিয়ে যান। কথা থাকে, আর্ম্মেনিয়ান ঘাট থেকে হোরমিলার কোম্পানীর ঘাঁটালগামী ষ্টীমারে আমরা রওনা হব। সকাল সাড়ে আটটার সময় উক্ত ষ্টীমার জেটি থেকে ছাড়ে। পূর্ব্বে এই ষ্টীমার প্রত্যহই যাতায়াত করতো, যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে এক দিন অন্তর ছাড়ে ও ফেরে। সেই জন্যই যাতায়াতের এরূপ বিড়ম্বনা। এই ষ্টীমার ছাড়া ও গন্তব্য স্থানটিতে পৌঁছবার আরো ত্রিবিধ উপায় আছে। যথা—ট্রেণে উলুবেড়িয়ায় নেমে সেখান থেকে নৌকাযোগে; বজবজ থেকে বাসে আছিপুর নামক নৌঘাটায় নেমে সেখান থেকে নৌকায় এবং কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলে ফলতায় নেমে সেখান থেকে নৌকায় যাওয়া। কিন্তু আরমেনিয়া ঘাট থেকে ষ্টীমারে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধাজনক। কথায় আছে—একা নদী বিশ ক্রোশ। ত্রিশ বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাই ঝঞ্ঝাট এতো। যাই হোক, শহরের পথের ঝঞ্ঝাট—বিশেষ রকমের লরিগুলির উৎপাত কাটিয়ে আমরা যখন আরমেনিয়া ঘাটের জেটিতে এসে পৌঁছলাম, তখন ষ্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলো সরকারী লটবহর নেবার জন্য ষ্টীমারকে আটকে রাখা হয়। স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ষ্টীমারের রেলিংয়ে ঝুঁকে সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন, দেখতে পেয়েই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। আমরাও ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। ষ্টীমার ধরতে না পারলে অপর তিনটি পথের যে কোন একটি অবলম্বন করে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হোত।

প্রায় এক ঘণ্টা লেট করে ষ্টীমার ছাড়লো। দেখলাম, আমাদের মত আরো অনেকগুলি যাত্রীর পক্ষে এই অপ্রিয় ব্যাপারটি 'শাপে বরে'র পর্য্যায়ে পড়ে প্রীতিপ্রদ হোয়েছে। ষ্টীমার পেয়ে মুখে হাসি যেন ধরে না। ষ্টীমারখানির নাম "উর্ব্বশী"। এই লাইনের নাকি এখানিই ভালো ষ্টীমার। দেখলাম, নিচের ডেক এবং উপরের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসবার পাটাতন ভরে গিয়েছে—পা বাড়াবারও যো নেই। এখানে কাঠের পাটাতন ছাড়া বসবার কোন আসন নেই। ইণ্টার এবং সেকেণ্ড ক্লাসে একই ধরণের খানকয়েক বেঞ্চি, উভয় শ্রেণীর মাঝখানে এক গাছা

মোটা দড়ির ব্যবধান। রেলিংয়ের গায়েই একখানি বেঞ্চি আমাদের জন্যে রাখা ছিল! সেখানে বসে তীরবর্তী স্থানগুলি ভালো ভাবেই দেখা যায়।

ষ্টীমার ছাড়তেই দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরগুলিও আনন্দে দুলে উঠলো যেন। নদীর জলের সঙ্গে মানুষের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের মানুষের মনের বুঝি একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে, তাই নদীর সংস্পর্শে এলেই তার জলের তালে তালে মনের মধ্যেও আনন্দ যেন উছলে উঠে। ষ্টীমার থেকে কলকাতা ও হাওড়ার শহরতলীর দৃশ্যগুলি চিত্রপটের মত চোখের উপর ভাসতে লাগলো। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, খিদিরপুরের ডক পেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টীমার এসে মেটিয়াবুরুজের জেটিতে ভিড়লো। অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজিদ আলী শার নির্ব্বাসিত জীবন যাত্রার নিদর্শনগুলি বুকে ধরে আজও এই অঞ্চলটি দর্শনীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজ্যহারা নৃপতি দুর্ভাগ্যকে বরণ করেও নির্ব্বাসিত জীবনে যে অসাধারণ স্থাপত্য-কীর্ত্তির প্রভাবে এই অখ্যাত পতিত অঞ্চলটিকে বিখ্যাত নগরীতে পরিণত করতে সমর্থ হন—তার নিদর্শনস্বরূপ হর্ম্ম্যরাজি বিস্ময়ের সঙ্গে অন্তরকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে!

মেটিয়াবুরুজের পরেই রাজাবাগান। শহরের এলাকা পেরিয়ে আমরা এখন চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলে এসেছি। শোনা যায়, ভূ-কৈলাসের রাজাবাবুদের একখানি বাগানকে উপলক্ষ্য করে অঞ্চলটি রাজাবাগান আখ্যা পায়। কলকারখানার প্রাদুর্ভাবে এই স্থানটি শহরের মতই জমে উঠেছে। রাজাবাগানের বিপরীত দিকে নদীর অপর তীরে রাজগঞ্জের জেটি। স্থানটি হাওড়া জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখান থেকেই আন্দুল ও মৌড়ী যাবার পথ। কলকারখানা, গঞ্জ, হাট এবং আন্দুলের রাজা ও মৌড়ীর কুণ্ডুচৌধুরীদের জন্য রাজগঞ্জের প্রসিদ্ধি।

হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ থেকে ষ্টীমার এবার চব্বিশপরগণার প্রসিদ্ধ অঞ্চল আকড়ার দিকে পাড়ি দিল। পূর্ব্বোক্ত রাজাবাগানের কয়েক মাইল তফাতে এই আকড়া। এখানে জেটি নেই। এ অবস্থায় উপকূল থেকে খানিক তফাতে ষ্টীমার নোঙ্গর ফেলে দাঁড়ায়, তীর থেকে বরাদ্দ নৌকায় যাত্রীরা ষ্টীমারে ওঠে, স্থানীয় যাত্রীরাও ঐ নৌকায় উঠে তীরে নামে। যাত্রীদের ওঠা-নামায় সহায়তাকারী এই ধরণের নৌকা 'ছাঁদি' নামে পরিচিত।

আকড়ার কূলে ষ্টীমার ধরতেই অতীতের বহু স্মৃতি ছবির মত মনের পাতায় পর পর ফুটে উঠলো। এই অঞ্চলেই মণিখালি-কৃষ্ণনগর, বড়তলা, জৈঁতে, কাণখুলি, জালখুরা, চটামহেশতলা প্রভৃতি গণ্ডগ্রামগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতিষ্ঠাপন্ন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মুকুজ্যে বংশ এককালে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূস্বামী ছিলেন। মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, বেহালা প্রভৃতির বহু অংশ তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণনগরের মুকুজ্যে বাবুদের সাত মহল 'বড় বাড়ী' এ অঞ্চলের বিস্ময়ের বস্তু; তার ভগ্নদশা আজও লোকচক্ষুকে অবাক করে দেয়। অধুনা এই বংশের অনেকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠাপন্ন। স্বনামধন্য গৌর মুকুজ্যে এই বংশেরই এক কৃতী পুরুষ ছিলেন। কলকাতার সিমুলিয়ায় তাঁর নামের রাস্তাটি স্মৃতিটুকু এখনো বজায় রেখেছে। এককালে এই সুবিস্তীর্ণ বড় বাড়ী, বিশাল দিঘী, বাগান, আকড়ার এই নদীতীরবর্তী স্থান ও ইটখোলাগুলি ছিল আমাদের ছেলেবেলার খেলাধুলার আস্তানা। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ই-বি-আরের বজবজ শাখার রেল-ষ্টেসনটিও আকড়া নামে সুপরিচিত। এই অঞ্চলের ইটখোলা এবং কাটা কাপড়ের কারখানাগুলি কলকাতার স্থাপত্য ও সীবন-শিল্পের ব্যাপারে প্রধান সরবরাহকার।

আকড়া থেকে মাইল পাঁচেক তফাতে বাটানগর ষ্টেসন। এখানেও জেটি নেই, যাত্রীদের ওঠা নামায় ছাঁদির ব্যবস্থা। ষ্টীমার থেকেই বাটা সু কোম্পানীর নবনির্মিত নগরীর ইমারতগুলি দেখা যায়। এই অঞ্চলটি পূর্ব্বে নঙ্গী বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাটানগরীর এলাকায় পড়েছে। বিখ্যাত বার্ণ কোম্পানীর বিস্তীর্ণ ইটখোলা এবং সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রগুলি উচ্চমূল্যে ক্রয় করে আমেরিকার পদ্ধতিতে বাটানগর নির্মিত হয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ অখ্যাত অঞ্চল আজ সুরম্য নগরীর রূপ ধরে বাণিজ্য-জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বাটানগরের কয়েক মাইল দূরেই বিখ্যাত বজবজ জেটি। কলকারখানা এবং কেরসিন তেলের ডিপোর জন্য বজবজ আজ চব্বিশ পরগণার একটি সমৃদ্ধ স্থান। বজবজের পর ষ্টীমার পুঁজালী নামক স্থানে এসে ধরলো। পুঁজালীর অপর পারে উলুবেড়িয়া; বামে চব্বিশ পরগণা, ডাইনে হাওড়া জেলা; উলুবেড়িয়া এই জেলার একটি বিশিষ্ট মহকুমা। এখানেও তীর থেকে অনেকটা তফাতে ষ্টীমার থামতে বিস্মিত হলাম। কারণ, উলুবেড়িয়ার জেটি, আর জেটি সংলগ্ন সারিবন্দী দোকানগুলির বাহার ছিল এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, সে জেটির চিহ্ন নেই, দোকানগুলিও অদৃশ্য হয়েছে; কয়েকখানি নৌকা ছুটে আসছে ষ্টীমার লক্ষ্য করে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, গত বছরে ভূগর্ভস্থিত পেট্রোলের পাইপে অগ্নিস্পৃষ্ট হওয়ায় যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, সেই বিভ্রাটে সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এক স্থানে জেটির দগ্ধাবশিষ্ট একটা অংশ পড়ে আছে দেখালেন। ষ্টীমার থেকেই সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যান্য বিশ্রী নিদর্শনগুলিও চক্ষুকে পীড়া দিচ্ছিল। এখনও স্থানটি সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেনি। স্থানীয় ব্যাপারীরা ছোট ছোট ডিঙ্গি করে পণ্যাদি ষ্টীমারের যাত্রীদের কাছে ফেরি করতে এনেছে দেখলাম।

উলুবেড়িয়া ছেড়ে খানিকটা যেতেই প্রেমচাঁদ জুট মিল দেখে চিত্ত যেন আনন্দে উৎফুল্ল হলো। হবারই কথা; কেননা, বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিচালিত জুট মিলের গৌরবরশ্মি এর ধূম্ররাশির সঙ্গে বিকীর্ণ হচ্ছিল; ঢাকা ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রায়বাবুদের অমরকীর্ত্তি এই প্রতিষ্ঠানটি। ষ্টীমার আবার চব্বিশ পরগণার উপকূল লক্ষ্য করে গতি ফেরাতে লাগলো। দূর থেকেই ছবির মত একটি নূতন নগরীর রূপশ্রী আমাদের চক্ষুকে আকৃষ্ট করছিল; ষ্টীমার তীরে ভিড়তেই জানা গেল, এইটিই ভারতের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বিখ্যাত বিরলাব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠিত

রলাপুর। আগে এই অঞ্চলটি শ্যামগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল, এইখানে রলা মিল স্থাপিত হবার সঙ্গে নূতনভাবে নগরপত্তন করে বিরলা াদার্স এর নামকরণ করেছেন বিরলাপুর। এখান থেকে আধুনিক ণালীতে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করে বজবজ-বাখ্‌রা রোডের সঙ্গে মিলিয়ে দওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাই স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, াতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত করে নব নগরীকে সর্ব্বপ্রকারে ার্থক করে তোলা হয়েছে।

বিরলাপুরের পর রায়পুর। এখানেও ষ্টীমার ধরলো, আর জেটি া থাকায় নৌকায় যাত্রীদের ওঠা-নামার পর্ব শেষ হোল। এর পরেই নলদাড়ি ষ্টেশন। শুনলাম, এখানেই আমাদের নামতে হবে। এই নলদাড়ি থেকে মাইল দেড়েক তফাতে বুড়ুল গ্রাম—যেখানে আমরা ভা উপলক্ষে চলেছি।

ষ্টীমারে বসে বসেই এতক্ষণ জেটি ও ছাঁদির সুবিধা অসুবিধা কৌতুকে লক্ষ্য করে আসছিলাম, তখন ভাবিনি ষ্টীমার থেকে নৌকায় নেমে তীরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁদির ব্যাপারটা হাতে-কলমে উপলব্ধি করতে হবে। নলদাড়িতে জেটি না থাকায় অগত্যা ছাঁদির আশ্রয় নেওয়া গেল। কিন্তু তীরভূমি কর্দ্দমাক্ত থাকায় জুতা খুলে কাদা ভেঙ্গে তীরবর্তী রাস্তায় উঠতে হোল। সাথীরা জানালেন, পাল্কীর ব্যবস্থা আছে; কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে পাল্কীওয়ালারা আটকা পড়েছে, বর-ক'নে পৌঁছে দিয়েই তারা সত্বর আসছে। হেসেই বললাম, পাল্কীর কোন প্রয়োজন নেই, পল্লীপথে আমরা হেঁটেই যাবো। আমাদের জিদ দেখে তারা অগত্যা সম্মত হলেন। দীর্ঘকাল পরে বাংলাদেশের সত্যিকারের পল্লীর সংস্পর্শে এসে তৃপ্তির সঙ্গে এমন একটা অপরিসীম অথচ সুপরিচিত মাধুর্য্যের আস্বাদ পেলুম যে, পথশ্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ কোথায় তলিয়ে গেল।

ষ্টীমার থেকেই একটি সুউচ্চ অদ্ভুতাকৃতি ইষ্টকালয় লক্ষ্য করি, জানতে পারি, সেটি এ অঞ্চলের বিখ্যাত প্রাচীন বাতি-ঘর। নলদাড়িতে নেমে এই ঘরটির নিকট দিয়েই যাবার রাস্তা। ঘরটি প্রায় ২৫।৩০ হাত উঁচু; উপরের দিকে দুটি গবাক্ষ, নিম্নে তিনটি দরজা, মেজের ব্যাস ৬ হাত গোলাকার। মোগল আমলে এই ঘরটির আয়তন নাকি আরও বড় এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুদের একটি আস্তানা ছিল, পরবর্তীযুগে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘরটিকে ভেঙ্গে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করেন। তাঁদের ব্যবস্থাতেই এখানে আলোর নিশানা দেবার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে যে সব জাহাজ কলকাতার অভিমুখে আসত, এই বাতিঘরের

নলডাঙ্গার বাতিঘর

আলো দেখে নাবিকগণ জাহাজ নিয়ন্ত্রণে অবহিত হতেন। বতির্ঘরের ওঠবার সিঁড়িটি অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। এরূপ জনশ্রুতি যে, এক ইংরেজ দম্পতি এই বাতিঘরে বাস করতেন, তাঁরাই আলো দিতেন। কিন্তু একদা মহিলাটি সরস্বতীর জলে স্নান করতে গিয়ে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর সাহেবও নিরুদ্দিষ্ট হন। সেই থেকে বাতিঘরে আর আলো পড়েনি।

বাতিঘরের গল্প শুনতে শুনতে আমরা যখন বুড়ুল গ্রামে প্রবেশ করলাম তখন মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। গ্রামের প্রথমে স্থানীয় ভূস্বামী ঘোষ মহাশয়দের সুবৃহৎ ভবন। বাড়ীর সামনেই বৃহৎ পুষ্করিণী, বাঁধানো ঘাটের গায়ে শিবমন্দির। এই বাড়ীর কর্মী শ্রীমান নিখিলনাথ ঘোষ যুবমঙ্গল পাঠাগারের সম্পাদক। এঁদের আলয়েই আমাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা ছিল। তরুণ কর্মীবৃন্দের সহিত প্রবীণ গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়ন এবং সময়োচিত সুব্যবস্থার সকল শ্রান্তির অবসান হলো। আগাগোড়া প্রত্যেক ব্যাপারেই এঁদের উদ্যোগে আয়োজনে এমন ফাঁকটুকু কোথাও ছিল না যে 'পান থেকে চুণটুকু খসতে পারে!' বরং আড়ম্বরের আতিশয্যে আমরাই বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়ি। আতিথেয়তায় এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বাংলার পল্লীতেই সম্ভব।

বড়ুল গ্রামখানি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিম প্রান্তেই সরস্বতী-বা হুগলী নদী। ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে অদূরবর্তী ফলতার পাশ দিয়ে নদী

হুগলী নদীর তীরবর্তী—বুড়ুল গ্রাম

বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গ্রামের লোক সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়। ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, মাহিষ্য এবং কাওরা এই চারি জাতির সমাবেশ দেখা যায়। সদ্গোপরাই এখানে বর্দ্ধিষ্ণু। গ্রামে মুসলমানও আছে, তাদের পল্লী আলাদা; এদের অধিকাংশই কৃষীজীবী ও দর্জ্জী। দেখে সুখী হলাম, সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া এখনো এ গ্রামে প্রবেশ করে নি। অন্যান্য স্থানের বিশ্রী ঘটনা সব শুনেও এরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। কপাটি যে খাঁটি, এক মুসলমানী প্রৌঢ়াকে গান গেয়ে সুবচনী পূজার জন্যে

পয়সা সংগ্রহ করতে দেখে উপলব্ধি করা গেল। চুবড়ীর মধ্যে দেবী সিন্দূর চর্চ্চিত মূর্ত্তি, ফুল পাতা পট, কড়ির চুবড়ী, উপরে রক্তবর্ণ বস্ত্রের আচ্ছাদনী। শুনলাম, এঅঞ্চলে মুসলমানীরাই সুবচনী পূজার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমানের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পূজার উপচার সংগ্রহ করে, দেবীর মাহাত্ম্য শোনায়, গান গায়, ছড়া পড়ে।

গ্রামের মধ্যে যেগুলির প্রয়োজন, কোনটির অভাব দেখলাম না। হাইস্কুল, মেয়েদের শিক্ষালয়, প্রগতিমূলক স্থায়ী সমিতি, পাঠাগার, বাজার, গঞ্জ, হরিসভা, ডাক্তারখানা প্রত্যেকটি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিচ্ছে। সমিতির এলাকায় এসে মনে হলো যেন কোন পবিত্র তপোবনের সংস্পর্শে আসা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ফল ফুলের গাছগুলি প্রাচীরের মত আশ্রমটিকে ঘিরে রেখেছে, মাঝ খানে খানিকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ; এটিকে বজায় রেখে ঘরগুলি সুষ্ঠুপরিকল্পনায় নির্ম্মিত হয়েছে। পল্লী-মাটির পুরু উঁচু দেওয়াল, সারি সারি বড় বড় দরজা ও জানালা, মাথায় উলুর ছাউনি, দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ঘরখানি এত বড় যে দুশো লোক নিয়ে একটা মিটিং বসানো চলে। দেওয়ালে দুধ-মাটির পলেস্তারা এমন সুশ্রী ও মসৃণ যে পংখের কাজকেও হার মানিয়ে দেয়। ঘরে ঢুকলেই এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নির্য্যাতীত দেশসেবক ৺ অনুরূপ চন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি চোখে পড়ে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুইখানি ছোট ঘরে সমিতির পাঠাগার ও শিক্ষাভবন। পল্লী-

নির্য্যাতীত রাজবন্দী—অনুরূপ সেন

জাত সহজলভ্য উপাদানে নির্ম্মিত ঘরগুলির শান্ত রূপশ্রী দেখে এবং গ্রাম ও গ্রামবাসীদের কল্যাণকল্পে সমিতির কর্মীদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেমন মুগ্ধ হলাম, সেই সঙ্গে যে ত্যাগী মণীষীর বিপুল গঠন-শক্তি ও অনুপ্রেরণা ওতঃপ্রোতঃভাবে এর মূলে নিহিত, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্তগুলি ভরে উঠলো।

১৯২১ অব্দের অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ যখন বন্যার মত সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে, এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটির উপরেও তার সাড়া পড়েছিল। ফলে, ছেলেরা চাঁদা তুলে চরকায় সুতো কেটে তাঁত চালাবার ব্যবস্থা করে, সেই সঙ্গে স্থানীয় হাইস্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করতে আন্দোলন চালাতে থাকে। এই সময় উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

বুড়ুল যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে সুধীবৃন্দ

হয়ে গ্রামে এলেন চট্টলবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অনুরূপ সেন। ছেলেরা তাঁর মুখে শুনলো এক অভিনব সুর, ছাত্রদের সধানার মন্ত্র; সেই সঙ্গে পেলো তারা পথের সন্ধান। অমনি তারা এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী দৃঢ়বাক্ সত্যনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে শিক্ষাদাতার সঙ্গে প্রিয়তম নেতার স্থানে বসিয়ে তাঁর অনুবর্ত্তী হোল। যারা স্কুল ছেড়েছিল, তাঁর আহ্বানে আবার ক্লাসে গিয়ে বসলো; যারা আন্দোলনের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে বিপথে ভেসে যাচ্ছিল তিনি তাদের ফিরিয়ে এনে সাফল্যের পথটি দেখিয়ে দিলেন। প্রথমেই তিনি ছেলেদের নৈতিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলেন। তাঁরই উদ্যোগে স্কুলে একটি লিটারারী এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হোল, ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে চললো চরিত্রগঠন, নৈতিক উন্নতিও সদাচারের সাধনা। সমিতি ভবনে শিল্প শিক্ষার সঙ্গে ব্যবস্থা দিলেন তিনি ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক এবং প্রার্থনা ও ধর্ম্মালোচনার সাহায্যে মনের উৎকর্ষ সাধন

করা চাই। ফলে, সমিতির বড় ঘরখানির পিছনে আলাদা একখানি ঘর তৈরী হোল—ছেলেরা যেখানে শুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করে আত্মোপলব্ধির সুযোগ পেতো। এইভাবে আদর্শ কর্ম্মযোগীর নেতৃত্বে ছেলেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং গ্রাম খানি উন্নত করবার সুযোগ পায়। কিন্তু হায়, এই সাধনায় সিদ্ধির পূর্ব্বেই সব ওলটপালট হয়ে যায়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই যখন সরকার অর্ডিন্যান্সের বলে অসহযোগীদিগকে কারারুদ্ধ করে আন্দোলনের কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর, তখন এই নীরব কর্ম্মীকেও অর্ডিন্যান্সের নাগপাশে বেঁধে এ অঞ্চলের ভাবী শ্রীবৃদ্ধির একটা সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা হয়। ১৯২৬ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর প্রচণ্ড শীতের প্রত্যূষে পুলিস তাঁর ঘরে খানাতল্লাস করে; তারপর অন্তরীণ অবস্থাতেই এইকর্ম্মযোগীর আশাময় জীবনের অবসান হয়। আরো দুঃখের কথা এই যে, বাঙ্গালাদেশের পল্লীউন্নয়ন ছিল যাঁর প্রাণের কামনা, বাঙ্গালা মায়ের সেই দরদী সন্তানকে কর্ত্তৃপক্ষ আর বাঙ্গলার মাটি স্পর্শ করবার সুযোগ দেন নি—বাঙ্গালার বাইরে অন্তরীণ অবস্থায় কঠিন ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

যথাসময় সভার কাজ আরম্ভ হলে সম্পাদকের বিবৃতি এবং স্থানীয় উৎসাহী কর্ম্মীদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি সম্পর্কে এই অখ্যাত গ্রামখানি নানা দিক দিয়ে প্রগতির পথে যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, আর এই অগ্রগতির মূলে কর্ম্মযোগী মনীষী অনুরূপ সেনের সাধনা যে কি গভীর প্রেরণা ও নৈতিক উপাদান যুগিয়েছে—তার একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। কাজেই সভাপতির অভিভাষণে সাহিত্য ও পাঠাগার প্রসঙ্গে এই নির্য্যাতীত কর্ম্ম সাধকের প্রশস্তি কীর্ত্তন করে নিজেকেও ধন্য মনে করি। সেদিনের উৎসব সভামূলে শহরতলীর স্মৃতির সঙ্গে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বাংলার এ স্মরণীয় মানুষটির কাহিনী।

ট্রাজেডী*

ইন্দ্রযব

সেদিন ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুয়াশায় সমস্ত শহরটা ঢাকা ছিল।

অফিস হইতে ফিরিয়া তিন বন্ধু ঠিক করিল কোনও একটা "বার" রেস্তোরা হইতে গরম হইয়া আসা যাউক, তাহারা যখন গরম হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা। নেশায় তাহাদের চোখ ছোট হইয়া আসিয়াছে,—পা' টলিতেছে।

হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের ঘরের চাবি চাহিতেই ম্যানেজার চাবটা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"দেখুন লিফ্‌টটা আজ খারাপ হ'য়ে গ্যাছে; ইচ্ছা করলে এখানেই থাকতে পারেন, বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

নেশার ঘোরে এক বন্ধু বলিল—"কুছপরোয়া নেই! পায়দলমেই যায়েগা!"

তাহারা থাকে চব্বিশ তলার একটা ঘরে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে এক বন্ধু বলিল—"দেখ্‌, প্রথম আটতলা আমি ভূতের গল্প বলব, তার পরের আটতলা তুই "কমেডী"র গল্প বলবি, আর তার পরের আটতলা ও ট্রাজেডীর গল্প বলবে, তাহ'লে আর সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্ট গায়ে লাগবে না।"

প্রস্তাবে তিনজনেই রাজী!

ভূতের গল্প চলিতে চলিতে তাহারা আটতলায় পৌঁছিল। পালা বদলাইল। দ্বিতীয় বন্ধু এবার কমেডী আরম্ভ করিল। গল্পের আমেজে তাহাদের বেশ হাঁটার গতিবেগ আসিয়া গিয়াছে। তাহারা ষোলতলায় যখন ঢুলিতে ঢুলিতে পৌঁছিল তখন রাত্র দেড়টা।

এবার তৃতীয় বন্ধুর পালা; ট্রাজেডী!

তাহারা তিনজনে আগেকার চলার গতিতে মৌনভাবে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছে; সহসা প্রথম বন্ধু প্রশ্ন করিল—"আরে তোর ট্রাজেডী!" ততক্ষণে তাহারা আঠারতলা পার হইয়াছে।

—"দাঁড়া বলছি—একটু ভেবে নি!"

আবার প্রায় তিন তলা পার হওয়ার পর বলিল—"কিরে বলবি না?"

—"দাঁড়া একটু চিন্তা করতে দে।"

এমনি ভাবে তাহারা যখন চব্বিশ তলায় পৌঁছিল তখন প্রথম বন্ধু বলিল—"না ভাই—এটা তোর অন্যায়, একটাও ট্রাজেডীর গল্প বললি না!"

হঠাৎ কি মনে হইতেই তৃতীয় বন্ধু প্যান্টের পকেটে হাত চালাইয়া দিল; তাহার মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বলিল—একান্তই ছাড়বি না, তাহলে শোন্ ট্রাজেডীর গল্প—আমাদের ঘরের চাবিটা ভুলে ম্যানেজারের টেবিলেই ফেলে এসেছি।"

পাশের ঘরে ঢং করিয়া রাত্রি আড়াইটা বাজিল।

* বিদেশী গল্প।

৮

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১০)

সভান্তে জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল।

ডলিরা বড়লোক। নিজেকে কিছুই তদারক করিতে হয় না, উর্দ্দীপরা বেয়ারারাই পরিবেশন করিতেছিল। অপর্ণা চা'য়ের বাটি হাতে লইয়া ডাকিল,—মিস্ মিত্র, অত দূরে কেন? আসুন ভাল করে পরিচয় ক'রে নি। আসুন আপনি ত ভারি লাজুক।

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়া বলিল—লাজুক দেখ্‌লেন কোথায়?

—তবে আসুন।

রমলা উঠিয়া আসিল। অমল ও অপর্ণা যেখানে বসিয়াছিল তাহার সামনে আসিয়া বসিতেই অপর্ণা একটা কাপ তুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন, একটু চা আগে হোক।

রমলা চা'র কাপটি হাতে করিয়া বলিল—বলুন—

অপর্ণা সমিতির খাতা বাহির করিয়া বলিল—আপনি ত রেবা বসুর বন্ধু, না?

—হ্যাঁ।

খাতার একটি শূন্য কলমে আঙুল রাখিয়া অপর্ণা বলিল,—আপনার বাসার ঠিকানা ত এর মাঝে এন্‌ট্রি করা হয় নি। বলুন—

যথারীতি নতুন সভ্যার ঠিকানা লেখা হইল। অপর্ণা ফাউনটেন পেনে ক্যাপ লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—আপনার কবিতাটি বেশ হয়েছে, আশা করি সামনের অধিবেশনেও আপনার একটি কবিতা থাকবে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপর্ণা একটু মৃদু হাসিল,—অমল জানে এটা ব্যঙ্গ।

রমলা অপর্ণার মুখের পানে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিষ্ঠ ভাষায়ই বলিল—মানুষের অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করার মাঝে মহানুভবতা নেই, এ কথা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন।

অপর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—তার মানে? আপনি এটাকে কেন ব্যঙ্গ মনে ক'রেছেন জানি না,—সেটাও আমার ভাষার অক্ষমতা বলে কি ক্ষমা ক'রতে পারেন না?

রমলা ম্লান হাসিয়া বলিল,—ভাষার অক্ষমতা নয় সেটা। আপনাদের মুখ, চোখ, চাপা হাসি সমবেতভাবে আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রেছে, এ কথাটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

অমল চা'এর কাপ তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—এ কথাটা কি আমার উদ্দেশ্যেও বলা চলে মিস্ মিত্র?

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়াই কহিল,—না,—অবশ্য যদি আপনার 'চমৎকার' কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয়।

অপর্ণার উদ্দেশ্যে অমল কহিল—কবিতা না বুঝে যদি কেউ তাকে ব্যঙ্গ ক'রে তবে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, এটা নির্ভয়ে আমি ব'লতে পারি। মিস্ মিত্র এটা আপনি মনে রাখবেন—এখানে যাঁরা আছেন বা আসেন, তাঁরা সকলেই কবিতার উৎকৃষ্ট সমালোচক একথা বলা চলে না—

অপর্ণা অপাঙ্গে অমলকে দেখিয়া লইয়া বলিল,—সে গর্ব্ব তোমার মত কেউ করে না।

অমল কহিল,—তা নিয়ে তোমার মত ঝগড়াও রোজ রোজ কেউ করে না।

অমলের বলিবার ভঙ্গিতে তাঁহারা তিনজনই হাসিয়া উঠিল। ডলি আসিয়া কহিল,—অমলবাবু, চা' পেয়েছেন?

—পেয়েছি কিন্তু খেতে পারি নি?

ডলি আতিথেয়তার ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া প্রশ্ন করিল,—কেন কি হ'য়েছে?

—ঝগড়া ক'রতে ক'রতে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আর ঠাণ্ডা চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।

ডলি হাসিয়া বলিল—ঝগড়া কার সঙ্গে ক'রলেন?

—আপনাদের মাননীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া, তাঁকে কর্ম্মভার দিলে এরকম ঝগড়া অনিবার্য্য।

ডলি বলিল,—বেশ, আবার চা দিচ্ছি, আবার ঠাণ্ডা হ'লে, না হয় আবার দেব—

অপর্ণা কহিল,—না ডলি, আর দিতে হবে না। অমলের পানে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আর চা খায় না।

অমল হতাশার সুরে হাত দোলাইয়া বলিল—এই দেখুন, ঝগড়া কি থাম্‌কা বাধে।

রমলা একটু কটাক্ষের সঙ্গেই বলিল—এ শাসন না মেনে ত পারবেন না, কেন আর পৌরুষ দেখাবার বৃথা চেষ্টা!

—অর্থাৎ?

রমলা হাসিয়া জবাব দিল—অর্থাৎ আদেশ।

অপর্ণাকে অমল বলিল,—আমাকে আদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা তোমার থাকা উচিত নয়।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নেই, ওঠো। রাত্তির হ'লো,

আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি বাসায় যাবে। আর মা তোমাকে যেতে বলেছেন।

ডলি চা লইয়া আসিয়া বলিল—কই, অমলবাবু এর মধ্যে চ'ল্‌লেন ?

—হ্যাঁ।

—এ কি অপর্ণাদি ! জানি আপনি ব'ল্‌লে অমলবাবুর থাক্‌বার সাধ্যি নেই, কিন্তু একটু পরে গেলে ক্ষতি কি ?

অপর্ণা এ খোঁচায় চটিয়া গিয়াছিল. বলিল—কেন, ও কি আমার বাহন না'কি ?

ডলি বলিল—বাহন বলা ঠিক হবে না. তবে—

অমল কহিল—বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান না ক'রলেও পারতেন মিস্ মিত্র। কথাগুলো আমার পক্ষে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছে না।

ডলি তবুও বলিল—অপর্ণাদির বাহন হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। একথা আপনার জানা উচিত।

অমল বলিল—পুরুষ মানুষ হলেই কেবল বুঝ্‌তেন সেটা কত বড় দুর্ভাগ্য এবং অপমানকর।

অপর্ণা একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিল,—সৌভাগ্যই হোক, আর দুর্ভাগ্যই হোক, এ নিয়ে আলোচনা করাটা আমার কাছে খুব সুরুচির পরিচয় বলে মনে হয় না।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা চাহিয়া দেখিল, সেখানা প্রায় জনহীন। সে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—একটা সত্যি কথা ব'লবে ?

—কেন ব'লবো না ? মিথ্যে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

—তুমি রমলা মিত্রকে আগে থাক্‌তে চিন্‌তে ?

—হ্যাঁ চিন্‌তুম।

—তবে আজ সভা-ক্ষেত্রে সে কথা স্বীকার ক'রলে না কেন ?

—ও করে নি তাই। এর মাঝে ওর হয়ত কোন উদ্দেশ্য আছে।

—কি ক'রে তোমার সঙ্গে পরিচয় ?

—তোমার সঙ্গে কেমন ক'রে পরিচয়—এর কোন জবাব হয় ? কোনও সুত্রে দেখা হ'য়েছে, আলাপ হ'য়েছে এই পর্য্যন্ত। এখনও এত আলাপ হয়নি যে সর্ব্বত্রই তাকে চেনা দরকার। সে যদি আমাকে চিনতো আমিও পুরাতন পরিচয় স্বীকার ক'রে নিতাম।

অপর্ণা কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পরে একটু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কি যেন একটা কথা তুমি গোপন ক'রলে—থাক তা আমি শুনতে চাই না, তবে এটা আমি বুঝেছি যে তোমার নিশ্চয়ই কোথায়ও ওকে কেন্দ্র করে দুর্ব্বলতা আছে।

—যদি কোন কিছু গোপনই ক'রে থাকি তবে তাকে গোপনই থাক্‌তে দাও। এ সন্দেহ যে তোমার কেন হ'লো জানি না, তবে ভবিষ্যতে একদিন তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব, আজ নয়। তোমার মা কি সত্যই ডেকেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—জানি না. সম্ভবতঃ তোমার কাছে আমার বিয়ে সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন ক'রবেন। তাঁর ধারণা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমি বেশী সুখী হব।

—সে সংবাদ আমার চেয়ে তুমিই বেশী সঠিকভাবে দিতে পারবে আশা করি। তুমিই তাকে সব জানিয়ে দিও। আমার সঙ্গে এ আলোচনার কোন প্রয়োজনই দেখি না।

অপর্ণা বলিল—আমার মতামত যে তোমার চেয়ে. আমিই ভাল জানাতে পারবো এ কথা আমি জানি, কিন্তু তোমার মতামতটা ত আমি জানাতে পারবো না।

—বলা বাহুল্য মাত্র—তবে আমরা একমত হ'য়ে যদি তাঁকে আমাদের যুগ্ম মত জানাই তবে সেইটেই ভাল হয় না কি ?

—ভাল হয় সন্দেহ নেই. তবে সেটা কি তুমি আমাকে জানাবে ? জানাতে পারবে ?

অমল বলিল—অবশ্যই পারবো, তোমার মতটা পাওয়া যাবে ত ?

—তাও যাবে।

—তবে চল পার্কে নেমে, সভার অধিবেশনে আমাদের প্রস্তাব পাশ ক'রে নিয়ে, পরে উপরে পেশ ক'রবো।

—চল।

পার্কে প্রবেশ করিয়া অমল প্রথম আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল,—দূরে চারতলা বাড়ীর পরে আকাশের গায়ে একটা ঝাকড়া নারিকেল গাছের মাথা জ্যোৎস্নাস্নাত উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিকার সাম্‌নে চীনে কালো রংএর মত নিবিড় কালো হইয়া রহিয়াছে। তার মাথার উপরে এক ফালি চাঁদ শূন্য পার্কের পানে চাহিয়া আছে। অমলের কবি প্রাণ সহসা যেন নূতন পুলকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—এস এখানে ঘাসের উপরেই বসি অপর্ণা।

দুইজনে বসিয়া পড়িল। অমল জ্যোৎস্নাস্নাত অপর্ণার মুখের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ ?

—আজ ? হঠাৎ—

—হঠাৎ-ই, এত সুন্দর তোমাকে কোনদিন দেখিনি—এই পরিবেশ, এই জ্যোৎস্না রাত, এরমাঝে তোমার দেহশ্রী মাদকতাময়, মোহময় হ'য়ে উঠেছে। অমল আস্তে অপর্ণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—তোমার মতটা তা হ'লে ব'লো—

অপর্ণা বলিল—কোন ইতিহাসে পুরাণে কোনদিন শুনেছ যে মেয়েদের মনের কথা পাওয়া যায়—আর পাওয়া গেলে পুরুষের আগে পাওয়া যায়! এই বুঝি তোমার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান!

—জ্ঞান আমার ক্রমেই সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে. সেটা বুঝেছি। তা হ'লে আমার কথা কয়েকটিই বলতে হবে?

—হ্যাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে যে কথাটা গোপন ক'রেছ সেটা আগে বলতে হবে।

অমল মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল,—ব'লবো, তবে সেটা শুনবার পরে আর আমার মতামত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না মনে করি।

অপর্ণা অকস্মাৎ যেন কিসের শঙ্কায় ব্যাকুলভাবে শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের মত অমলের মুখের দিকে চাহিল। একটু পরে, অমলের চোখের দিকে চাহিয়া বলিল—বল, প্রয়োজন অপ্রয়োজন সে বিচার আমার।

—আমাদের সমিতিতে এত লোক থাকতে, মানে এত মেয়ে থাকতে কেবলমাত্র রমলার সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন ব'লতে পারো?

—পারি. রমলা আজ সভার মাঝে বার বার কেবল তোমাকেই ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য ক'রছিল এবং আমিও সেজন্য লক্ষ্য করেছিলাম। তার চাহনি দেখে আমি বুঝেছি, সে তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাদের মাঝে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তোমার কবিতা প'ড়বার সময় সেটা আরও ভাল ক'রে বুঝেছি।

—শেষেরটা ভুল না হলেও প্রথমটা ভুল—অর্থাৎ ভালবাসার কথাটা।

—আমাদের চোখে তোমরা ধুলো দিতে পারো কিন্তু মেয়েরা পারে না।

—পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই।

—আমি বিশ্বাস ক'রলুম না। তার পরে বল—

অমল একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল—মার্জ্জনা ক'রো, সিগারেট খাই তা জানো। তুমি ও তোমার মা উভয়েই প্রশ্ন ক'রেছ,—তথা অনুমান ক'রে নিয়েছ যে আমার দেশে জমিদারী আছে। তার টাকা প্রতি মাসে আসে এবং আমি আনন্দে তাই খরচ করি আর পড়ি—কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তেমন সরল নয়। আমি এ কথা স্বীকার করিনি এবং প্রতিবাদও করিনি, কাজেই তোমাদের ধারণা হ'য়েছে জমিদারী আছে। আমি যেমন মিথ্যা বলিনি, তেমনি তোমাদের এ কল্পনাকেও আমি ভাঙ্গি নি। এর কারণ এই নয় যে আমি আমার দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত, কোন দিন নিজের অবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়নি তাই। এখানে আমি ছাত্র পড়িয়ে, বেনামে চুরি-করা রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে আমার খরচ চালাই এবং বাড়ীতে কয়েক বিঘা পৈতৃক খামার জমি আছে তার ফসলে বিধবা মায়ের একবেলার হবিষ্যান্ন কোনমতে চলে। সংসারে আমি আর মা, এ ছাড়া কেউ নেই। বি-এ পড়া পর্য্যন্ত মামা ও দুই একজন আত্মীয় ফি দেওয়ার সময় কিছু সাহায্য ক'রেছেন এইমাত্র। আর রমলা হ'চ্ছে আমার বর্ত্তমান ছাত্রের দিদি। সেখানে পড়িয়ে আমি মাসিক ১৫৲ টাকা অর্জ্জন করি, তার সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, সেখানে তোমার অনুমান অর্থাৎ ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব। এবার সম্ভবতঃ বুঝেছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে কি তোমার এইটুকু পরিচয় মাত্র?

—না, আর একটু। ও কবিতা লেখে এবং তার অহঙ্কার করে, এ কথা প্রথমদিনেই ও জানিয়ে দেয়, তাই আমিও কবিতা বুঝিনা এবং অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পড়ি এই ভাণ ক'রে এতদিন অভিনয় করেছি। সভায় অকস্মাৎ আমার অন্য পরিচয় পেয়ে ও হয়ত অবাক হ'য়েছে, হয়ত ভেবেছে আমি বড্ডো চালিয়াৎ—অন্ততঃ মিথ্যাবাদী ব'ললে আমার অস্বীকার করার উপায় নেই। ও আমার নাম দিয়েছে কাপালিক।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কাপালিক! নিখুঁত নামটি!

—সম্ভব! কিন্তু এখন কি আর তোমার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার মতামতের কোন প্রয়োজন আছে?

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া কহিল—কেন নেই?

—আমি গরীব, একথা শুনলে। এখনও কি তুমি আমার মত ছেলেকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ? সম্ভবতঃ নেই, কাজেই তোমার একার মত জানালেই তোমার মা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন—

অপর্ণা সহসা কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তার পরে মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমি কি মনে কর, আমরা তথাকথিত শিক্ষা পেয়েছি এবং কতকটা স্বাধীনভাবে ক'লকাতা সহরের বুকে চলাফেরা করি বলেই আমাদের বিয়ে ব্যাপারে একমাত্র আমার মতামতই গ্রাহ্য হবে! তা নয়,—মা বাবার মতকে উপেক্ষা করার শিক্ষা এখনও পর্য্যন্ত পাইনি আমরা—

অমল বলিল,—তুমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে ক'রতে পারো, তবে তোমার বক্তব্য মা বাবার জবানিতে বলে নিজেকে ছোট ক'রো না। শ'র সুপার ম্যান পড়েছ—এর পরেও কি মা বাবার উপরে নিজের মতামত চাপাতে চাও?

অপর্ণা বলিল,—তুমি হঠাৎ অমন মরিয়া হ'য়ে আমাকে আঘাত ক'রছো কেন? তোমার দারিদ্র্য নিয়ে আমি ব্যঙ্গ ক'রবো এ ধারণাই বা তোমার হ'লো কেমন ক'রে? তুমি এটুকু অন্তত: মনে রেখো যে মোটর, টেলিফোন, রেডিওকেই আমি জীবনের মাপকাঠি করিনি, সংসারে নিজের পায়ে ভর দিয়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে। প্রমাণ হয়নি বটে, তবে সময় এলে প্রমাণ হ'বে।

অমল সহসা কহিল—চল তোমার মার কাছে সমস্ত বলে আসি, এটা তার মতামত ঠিক ক'রতে সহায়তা ক'রবে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল,—না, তোমাকে আজ যেতে হবে না। অন্যদিন দেখা ক'রো।

—কেন?

—কারণ আছে, পরে জানাব।

—তুমি ডেকে এনেছ মনে আছে?

—আছে আমিই ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাসায় যাও, আমি এটুকু একা একাই যেতে পারবো। চল তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

অমল কিছু না ভাবিয়াই বলিল—চল।

ট্রামে উঠিয়া অমল একটা মানসিক শূন্যতা অনুভব করিল—বহুদিনের যুদ্ধান্তে আজ যেন সহসা সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ মুহূর্তে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ আশা করিবার কিছু নাই, ভয় করিবার কিছু নাই, দুঃখেরও কিছু নাই অমল তাই জানালার ভিতর মুখ দিয়া কেবল দূরে গড়ের মাঠের নিবিড় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

মানুষ যতদিন বিপদের আশঙ্কা করে, প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে সে দ্বিধা শঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে—কিন্তু যখন বিপদ আসিয়াই পড়ে তখন রুদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়—আজ অমলও তাই একটা তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। অপর্ণার কাছে চাহিবার কিছু নাই, বলিবার কিছু নাই, আজ সব সন্দেহের অবসান হইয়াছে। এখন যাহা কিছু করিবার, যাহা কিছু দিবার সবই অপর্ণার। সে যদি কোন দিন ডাকিয়া লয় তবে সেদিন স্বেচ্ছায় সানন্দে সে হাত প্রসারিত করিয়া দিবে। ক্রমশঃ

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মহাজাতি সদন

সাজ-সজ্জা করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। ঠাণ্ডার দেশ, সমাগত সন্ধ্যা, সাজ-সজ্জার দরকার।

ফটক সন্নিকটে আসিতে দেখি, একটি গাছের পাশে দাঁড়াইয়া একটি পাঞ্জাবী তরুণী ক্যামেরা 'চার্জ্জ' করিতেছে। আমরা তাহার পানে চাহিতে সে বোধ করি একটু 'লজ্জা' পাইয়া গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা তিনজনেই হাসিলাম। সুভাষচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, এরকমটা নিত্যই হয়। আমি মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইলাম। বলিলাম, হিন্দীতে, (আমার হিন্দীতে) আমরা তিনজন আছি, তুমি কাহার ছবি তুলিতে চাও? মেয়েটি হাসিল (আমার হিন্দী শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে এমন লোক ত দেখি না); হাসিয়া নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে কহিল, বসুজীর তসবির। আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, কেন, আমাদের ছবি লইবে না? মেয়েটিকে লাজুক ভাবিয়াছিলাম, সে কিন্তু আদৌ লাজুক নহে। বেশ দৃঢ়স্বরে কহিল, নেহি জী। আমি 'হতাশভাবে ফিরিতেছি, তরুণী সুভাষবাবুর উদ্দেশে শুদ্ধ ও স্পষ্ট ইংরাজীতে কহিল, আপনি একবার এদিকে চাহিবেন কি? সুভাষচন্দ্রের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। তরুণীর ক্যামেরা ক্লিক্ করিয়া উঠিল; তরুণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মিতহাস্যে কহিল, থ্যাঙ্কস্।

তাহার বয়স কতই বা হইবে? তেরো-চোদ্দ, বড় জোর পনেরো-ষোল হইতেও পারে, তার বেশী কিছুতেই না। ঐ বয়সে বাঙ্গালীর মেয়ে আমার আবেদন ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে এবং তাহার নিজস্ব অভিলাষ এমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারিত কি? অন্য দেশের খবর জানি না, বলিতেও পারি না, তবে আমার বাঙ্গলা দেশের কথা জানি। বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে বয়সটা অত্যন্ত মারাত্মক—বিকাশের বাসনা ও প্রকাশের কামনা অপরিসীম, অথচ আত্মগোপনের প্রবল প্রচেষ্টা আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরিতে চাহে; দৈহিক অবস্থাও তদনুরূপ, কুসুমিত উপবনের মত তরুণ অঙ্গ পত্রে পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া বিকাশ-ব্যাকুল, অথচ লোকচক্ষু কি তীব্র, কি অন্তর্ভেদী বলিয়াই না বোধ হয়। লোক সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া, লোকচক্ষুকে এড়াইতে পারিতে

যেন বাঁচে। এই তরুণীটি বঙ্গদেশের মাটিতে জন্মে নাই, বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাকে স্পর্শ করে নাই, বঙ্গবালার সহজাত লজ্জা সঙ্কোচের সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। তাই যখন আমরা কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছি, দ্রুতপদে হাঁটিয়া আবার আমাদের কাছে আসিয়া, আমার পানে প্রপন্ননয়নে চাহিয়া, ইংরাজীতে অকুণ্ঠকণ্ঠে সে কহিতে পারিল, আপনারা দু'জন একমিনিট দাঁড়াইয়া পড়ুন, আপনাদেরও একখানি ছবি লইতে পারি। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, না, আমাদের জন্য তোমার ফিল্ম অপব্যয় করা সঙ্গত হইবে না।

তরুণী হাসিমুখে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া আর একবার তাহার আরাধ্য বীরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, সৌখীন ডালহাউসীর পর্ব্বতীয় বনে সরু একটা পথ ধরিয়া অরণ্য মধ্যে সৌখীন বনদেবীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে অন্তর্দ্ধান করিল।

ডালহাউসী পাহাড়টা ঠিক দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরীরই মত। উচ্চতায় কোথায় সাত, কোথায় বা আট হাজার ফুট; প্রকৃতিটাও পুরাপুরি পার্ব্বতীয়। আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি আসিতে পারে; আবার তখনই দিনকরকিরণে দশদিশি প্রভাসিত হইতেও পারে। আমরা পথের মধ্যে এক পশলা জোর বৃষ্টি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম। শীতের দেশ, আসন্ন সন্ধ্যা, তায় মুষলধারা! তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া, জামা জুতা কাপড় বদলাইয়া, বারান্দায় আরাম কেদারায়, পায়ের উপরে কম্বল চাপাইয়া কেহ চা, কেহ কফি পানান্তে গরম হইয়া বসা গেল। আমার সিগারেটের খরচটা এখন কিছু বেশী হওয়ারই কথা, রসিকজনমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন; কিন্তু 'অরসিক' ধরমবীর মহাশয় স্বীকার ত করিলেনই না, অধিকন্তু গালিগালাজ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন; বলিয়া গেলেন, তাম্রকূট ধূম্র সহসীমা অতিক্রম করিয়াছে। আসলে তাহা নহে; কোনও দর্শনপ্রার্থীর আগমন ঘটিয়াছিল। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের কথা পথে সুরু হইয়াছিল, বৃষ্টির আক্রমণে কথা শেষ হয় নাই। তাহারই সূত্র ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে, আটাশ সালের কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ছিলেন—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক; ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রধান সম্পাদক; যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ; কংগ্রেস অধিবেশনে পতিত্ব করিয়াছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। গান্ধীজী অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তরুণ ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে বিরাট শক্তিধর বলিয়া বুঝিবার সুযোগ সেইদিনই প্রথম ঘটিয়াছিল। পৃথিবী প্রায়শঃ ভ্রান্ত দৃষ্টি; কিন্তু এক্ষেত্রে অভ্রান্ত-দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছিল, আজ সমগ্র জগৎ বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে তাহাই অবলোকন করিতেছে। আজিকার বিশ্বে জওহরলালজীর স্থান চিন্তানায়কগণের সর্ব্বাগ্রে, সকলের পুরোভাগ বলিলে বেশী বলা হইবে না।

আমার স্মরণশক্তি কোনকালেই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবু যতদূর মনে আছে, এখানে নবীন সুভাষকে লইয়া প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অতি মাত্রায় অস্থিরতা ও অধীরতা, দ্রুত অগ্রগমনের জন্য প্রবল চাঞ্চল্য আমার মনে হইতেছে, এই অধিবেশনের কালে সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নবীনে ও প্রবীণে মতবিরোধের সূচনা কোথায়, কেমন করিয়া, অথবা কি কারণে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, রাজনীতির সহিত আত্মীয়-কুটুম্বিতাসম্পর্কলেশশূন্য আমার পক্ষে, সে কাহিনী এতকাল পর্য্যন্ত মনে রাখা কঠিন; মনে রাখিতেও পারি নাই; না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছিনা। আমি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের টেক্সট বুক লিখিতে বসি নাই যে ব্ল্যাকহোল্ ট্র্যাজিডি অসত্য লিখিলে অনুমোদনে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু বেশ ভাল করিয়াই মনে আছে যে নবীনে প্রবীণে সঙ্ঘর্ষটা এক সময়ে দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং মিটমাটের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। আর মনে আছে, মিটমাটের উদ্দেশ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ছুটাছুটি। একবার প্রবীণের শিবিরে, একবার নবীনের ক্যাম্পে অহরহ তাঁহার সেই 'প্রায় সাত ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গমনাগমন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে কি? বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৃন্দা-দূতীর ভূমিকা অভিনয়ের বিশেষ কারণ ছিল।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন, অত্যন্ত রাশভারী, একগুঁয়ে লোক। একবার যে কথায় 'না' বলিতেন, অনন্তকালেও তাহা 'হাঁ' হইত না; একবার যে লোককে ভাল চোখে না দেখিতেন, সে লোক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া অথবা লঙ্কেশ্বর দশানন হইয়া সামনে চলাফেরা করিলেও চক্ষু ফিরাইতেন না। সকলেই জানিত তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন কদাচিৎ সম্ভব হইত। সেদিনের এবং আজিকার দিনের কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয় মধ্যেও মতিলালজীর মত ঋজু, স্পষ্ট, সরল, অমায়িক অথচ অত্যন্ত দৃঢ় কুলিশকঠোর এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সত্যই বিরল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। নবীন ও প্রবীণে বিরোধ যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, পণ্ডিত মতিলাল নবীনের কথা কাণে তুলিবেন না, তাহাদের 'মুখদর্শন' করিবেন না, এই অব্যক্ত সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল; অথচ অবস্থা এমন যে সন্ধি না হইলেই নয়। কিন্তু কঠিন-

কঠোর-অপরিবর্ত্তনীয় 'না' শুনিবার জন্য কে যাইবে ? কাহার এমন অকুতো সাহস ?

বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় অসমসাহসিক ব্যক্তি, সর্ব্বজনে সুবিদিত, অধিকন্তু তিনি স্বয়ং নবীনদলভুক্ত। যদিচ বর্ত্তমান বিরোধে তাঁহার মত প্রবীণেরই অনুকূল, তথাপি স্বগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি পূর্ণমাত্রাতেই ছিল। মিলনাকাঙ্খী হইয়া তিনি নিজেই দৌত্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিধানের উপর মতিলালজীর স্নেহ গভীর ; বিশ্বাস অসীম ; শ্রদ্ধা অনন্ত। মতিলালজী প্রায়ই বলিতেন, আমার দেহখানার তত্ত্বাবধানের ভার বিধানের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি পরম নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিয়া যাই। শুনিয়াছি, পরবর্ত্তীকালে বিধানচন্দ্রের প্রসারিত বাহুর উপরে দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া পণ্ডিতজী প্রশান্তচিত্তে শান্তির রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। মতিলালজীর দরবারে বিধানচন্দ্রের ওকালতী বিফলে গেল না ; সুকঠোর 'না' অতি সহজেই সু-কোমল 'হাঁ' হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য বলিবার প্রয়োজনাভাব। কংগ্রেসের ইতিহাসে সে কাহিনী অবশ্যই লিপিবদ্ধ আছে। মোট কথা এই যে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চেষ্টায় তখনকার মত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কংগ্রেসী মহলে সুভাষচন্দ্রের (এবং আরও কয়েকজনের) উপর একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘোদয় হইয়াছিল। অনেক দিনের কথা সে, ভুলভ্রান্তি অসম্ভব না হইতেও পারে, তবে মনে হইতেছে, জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের অন্তরের বেগ এবং আবেগ, গতি এবং প্রকৃতি অতি মাত্রায় অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুত, অতএব সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং নীতির বিচারে কংগ্রেসের অনেকের কাছেই অসঙ্গত ও অশোভন বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। শৃঙ্খলিত মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির অত্যুগ্র কামনাই যে উত্তরকালে একদা সুভাষচন্দ্রকেই স্বদেশ, স্বজনপরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরদেশে লইয়া গিয়া সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া স্বয়ং সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিবে—করিতে পারিবে, অথবা করিতে পারা সম্ভব হইবে সেদিন, সেকালে ইহা যে অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল ! শত শত বৎসরের পরপদানত, আপাদমস্তক-শৃঙ্খলিত, নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামন্ত্রদীক্ষিত ভারতবাসী যে কোনও কালে, কোনও অবস্থায় অসম্ভব সম্ভব করিতেও পারে ইহা সেদিন সুদূর কল্পনারাজ্যেরও বহির্ভূত ছিল ! সেদিন সুভাষের অন্তরে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবীণেরচক্ষুতে আলেয়া রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। অনেকে বিরুদ্ধ মনোভাব গোপন রাখিতেও অক্ষম হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর উক্তিতেও বিদ্রূপের করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, আজও, এতকাল পরেও তাহা বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ও বাহিনীর অধিনায়কের যোদ্ধ্বেশ ও যোদ্ধাসম্ভব কুচকাওয়াজ দর্শনে সার্কাসের অভিনয়ের সহিত ব্যঙ্গাত্মক তুলনা গান্ধীজীই করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব ছিল না। বহুদিন পর্য্যন্ত যাঁহারা রঙ্গভরে অথবা ব্যঙ্গভরে সুভাষবাবুকে জেনেরাল অফিসার কম্যাণ্ডের অপভ্রংশ "গক্" (G.O.C) আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বক্র কটাক্ষ না করিয়াও বলিতে পারি (অন্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধর্ত্তব্যই নহে !), সুভাষের সেদিনের সেই সমরনায়কের বেশ বঙ্গীয় তরুণের চিত্তপটে যে চিত্রখানি বিচিত্র বর্ণে, আপন গর্ব্ব গৌরবে, আপনার মহিমায় মুদ্রিত—অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, আজও দুই যুগান্তেও তাহার ঔজ্জ্বল্য ও মাহাত্ম্য অমলিন ও অপরিম্লান। মলিন হওয়া দূরের কথা, আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে জাতির জীবন প্রভাতরূপে বন্দিত করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। একদিন যাহা খড়কুটায় সজ্জিত কাঠামো মাত্র ছিল, কালে তাহাই দশপ্রহরণধারিণী দনুজদলনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূজামণ্ডপ আলোকিত করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন, আপনারা ত খবর রাখেন না, হার্দেকার যখন প্রথম স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়তে লেগেছিল, কেউ তার কথা তখন কাণেও তোলে নি। হার্দেকার নাছোড়বান্দা, অক্লান্ত পরিশ্রমে বাহিনী গড়ে তুললো। গোড়ার দিকে যাঁরা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই করেন নি, তাঁরাও হাঁ হয়ে গেলেন। কংগ্রেস বাহবা দিলে ; স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ক্রমে কংগ্রেসের অঙ্গ হয়ে গেছে।

"আমি বরাবর তার দিকে ছিলাম ; জওহরলালেরও কতকটা সহানুভূতি হার্দেকারের দিকে ছিল। কলকাতা কংগ্রেসে আমি হার্দেকারের চেয়ে আর একটু অধিক দূর অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম। আমার বরাবরের মত এই যে, জাতীয় সৈনিকবাহিনী গড়তে হলে তাদের সামরিক পোষাকও পরাতে হবে, সামরিক শিক্ষাও দিতে হবে ; তা না দিলেও হবে না।" এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় বলিলেন, আমরা ভাগ্যদোষে (সুভাষচন্দ্র ভাগ্য বিশ্বাস করিতেন দেখা যাইতেছে) নিরস্ত্র, আমাদের অস্ত্র নাই, সে অবশ্য দুঃখের কথা ; কিন্তু অস্ত্র ছাড়া যেটুকুর প্রয়োজন, তা কেন না করবো !

আমি হাসিয়া বলিলাম, হাতি ঘোড়ার পাত্তা নাই, আগেই চাবুকের সন্ধান ?

সুভাষচন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ম্লান দীপালোকেও সুগৌর সুন্দর বদনমণ্ডল রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কহিলেন ভুল, দাদা বিষম ভুল। হাতী ঘোড়া আমাদের আছে, নাই চাবুক। একটু থামিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, চাবুক বলি আমি ট্রেনিংকে। ট্রেনিং না পেলে, 'ডিসিপ্লিন' না শেখালে

জাতীয় বাহিনী কি কেবল পোষাকের শোভা দেখিয়েই লোককে চরিতার্থ করবে? একদিন তারাই হবে দেশের সৈন্য, দেশের যোদ্ধা। তাদের যদি সেই ভাবে গড়ে তুলতে না পারি, আমরাই ঠকবো। সুভাষ থামিলেন। অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটিল। আজ মনে হইতেছে, দেশের সৈন্য, জাতির যোদ্ধা সংগঠনের পরিকল্পনায় তাঁহার দূরদৃষ্টি সেই সময় অনেক দূরে—সম্মুখে প্রসারিত, দিগন্ত হইতে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘময় হিমালয় পর্ব্বতমালার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের পরপারে, হয় ত বা ভারত সীমান্তেরও পারে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সিগারেটের প্রবল ধূম্রবাষ্পেও তাঁহার চিন্তা ক্ষুণ্ণ হইল না।

কিয়ৎপরে কহিলেন, দাদা, সামরিক বেশভূষা ও আদব কায়দার ওপর আমাদের মত দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও পরাধীন দেশের লোকদেরও যে কতখানি সম্ভ্রম ও সমীহ তা বোধহয় আপনারা কল্পনা করতেও পারেন না (এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়! পারি না আবার! খুব পারি! নাইলে রাস্তা দিয়া মিলিটারী বীরপদভরে মেদিনী দলিত করিয়া যায় যখন, ছাদে উঠি কেন?) অন্য পরে কা কথা, মহাত্মা গান্ধী যখন সামনে দিয়ে যান, তখন লোকের মনে শুধু ভক্তি জেগে ওঠে, পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—এই মাত্র! কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যখন নিয়মবদ্ধ সারিবদ্ধ হয়ে কদমে কদমে চলে যায় তখন জনতা দুধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে কি ভাবে, জানেন? ভাবে, আমিও কেন স্বেচ্ছাসেবক হই নি? হোলে আমিও ত অমনি বীরদর্পে কদমে কদমে হাঁটতে পারতুম। দাদা, এর মূল্য, আমার কাছে অনেক—অনেক;—অমূল্য, মহামূল্য।

এইখানে একটি প্রলাপ উক্তি পাঠিকা এবং পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। আমার জীর্ণকায় ছিন্নপত্র রোজনামচার পৃষ্ঠায় বারম্বার **কদম কদম** শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অধুনা জনগণবন্দিত, সুভাষগঠিত আই এন্ এ'র সমর সঙ্গীতের প্রথম কলিটি আমার মনে পড়িতেছে। কলিটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম:

কদম কদম বাড়ায়ে যা।
খুসী কে গীত গায়ে যা।

চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার হইতে ঝিঁঝির অশ্রান্ত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছে; দূরের, নিকটের, সম্মুখের, পার্শ্বের পাহাড়ের অন্ধকারের মধ্য হইতে শৈলগাত্রপরিশোভিত গৃহগবাক্ষবিনির্গত আলোকবিন্দুগুলি অন্ধআকাশে নক্ষত্রের মত খচিত হইয়া উঠিয়াছে, বারান্দার নীচের রমিত পুষ্পোদ্যান হইতে অতি মৃদু সুরভি-শীতল বায়ুর সঙ্গে কখনও কখনও ভাসিয়া আসিতেছে। অল্প আলোকে ও স্বল্প অন্ধকারে আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া আছি, হঠাৎ সুভাষচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, কাউকে এখনও বলি নি, আজ আপনাকেই প্রথম বলছি, কলকাতায় আমার একটা কংগ্রেস ভবন গড়বার ইচ্ছা আছে। কংগ্রেস হাউস্ নাম হলেও তাতে শুধু যে কংগ্রেসের কাজই হবে তা নয়! আসলে হবে সেটা জাতীয় বাহিনীর প্রধান শিবির! তার সঙ্গে লাইব্রেরী, ষ্টেজ, জিমনেসিয়াম, কংগ্রেস আফিস থাকবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি (Institutionটা) মূলত: সৈনিক কেন্দ্র হবে। অনেক দিন থেকেই প্ল্যানটা মাথায় আছে, এইবার কলকাতায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করবো।

আমি বলিলাম, বললেনই যদি, আরও 'বিবরিয়া কহ শুনি?'

সুভাষবাবু প্রশান্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অন্তত: এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী আমি এক কলকাতাতে, এক বৎসরের মধ্যেই গড়ে তুলতে পারবো বলে আশা করছি। হাডুডু খেলা থেকে তীর ধনুক চালানো, সমস্তই শেখানো হবে।······আমাদের দেশ যেদিন স্বাধীন হবে—হবেই একদিন—সে একদিন খুব দূর বলে আমি মনে করি না—সেদিন আমাদের এই প্রদেশে প্রদেশে গঠিত স্থায়ী জাতীয় বাহিনী দেশ রক্ষা করবে; দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রাখবে। কলকাতায় হবে, তার প্রথম প্রতিষ্ঠা!

আমার তখন কথা শুনিবার পালা, কথা বলিবার সময় নহে, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুভাষচন্দ্র বর্দ্ধিতোৎসাহে কহিতে লাগিলেন, কলকাতায় কিছু করতে গেলে, কর্পোরেশনের সহায়তা ছাড়া করা যায় না। (মৃদু হাসিয়া) সেই জন্যেই কর্পোরেশনে আমার যাওয়া দরকার। যেতেই হবে, নৈলে নয়। আমার প্ল্যান তৈরী, ফণ্ডের জন্য আবেদন প্রস্তুত, গিয়েই কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে পারবো। তখন কিন্তু আপনাদের সাহায্য দরকার হবে, ফাঁকী দিতে পারবেন না।

আমি সহাস্যে কহিলাম—পাঠ্যাবস্থাই সে সুনাম ছিল বটে; এখন বোধহয় সে সুনাম কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

সুভাষ কহিলেন, কলকাতায় কাজ সুরু ক'রে দিয়ে প্রত্যেক প্রদেশে ঘুরে বেড়াবো (টুর করবো), প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় বাহিনীর কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। আপনি হাসছেন নাকি? হাসছেন, হাসুন—কিন্তু তখন প্রশংসা না ক'রে পারবেন না, তা আমি ব'লে রাখছি।

তাহার পর বোধ করি বা রঙ্গভরেই কহিলেন, ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে ১ লক্ষ ক'রে ১১ লক্ষ সৈনিক গড়ে উঠলে, সে কি আনন্দেরই হবে! না?

আপনি কি আমাকে এতই ধৃষ্ট মনে করেন যে আমি সে কথাও অস্বীকার করবো?

আপনাকে ধৃষ্ট বলতে পারি? বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

পর মুহূর্তে পুনরায় প্রদীপ্তকণ্ঠে কহিলেন, বড় জোর এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের জাতীয়বাহিনী গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন—ভারতীয় জাতীয়বাহিনী জাতীয় সম্পদ ব'লে (an asset) ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

আজ ভাবি, এ কি দৈব বাণী? ভবিষ্যদ্বাণীর মতই উচ্চারিত হইয়াছিল? তবে এক বৎসর পরে নহে, ন্যূনাধিক আট বৎসর পরে, কংগ্রেসের বাহিরে, ভারতেরও বাহিরে যে বিরাট ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সুভাষচন্দ্র গঠিত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীর চিত্তে কি শ্রদ্ধার স্বর্ণসিংহাসনেই না তাহা অধিষ্ঠিত হইয়াছে! সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ সুভাষের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নামটি জপমালা করিয়াছে বলিলেও বোধ করি বেশী বলা হইবে না। কামনার কুসুমকাননের সুরভিত শ্রদ্ধাকুসুম অবচয়ন করিয়া অপরিসীম বিস্ময়ের স্বর্ণসূত্রে মাল্য গ্রন্থন করিয়া ভক্তিচন্দনবিলেপিত করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে সুনির্মল করে জাতীয় বাহিনীর কণ্ঠে দোলাইতে আজ চল্লিশ কোটি নরনারী লালায়িত। ভারতীয় জাতীয়বাহিনী ভারতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়াই ক্ষান্ত নহে, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, আরব সাগর হইতে বঙ্গসাগর উদ্দীপনার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রভাসিত করিয়া নবীন ভারতবর্ষকে নবীন ছন্দে, নবীন মন্ত্রে, দীক্ষিত করিতে চাহিতেছে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সম্মিলিত কণ্ঠে জয় হিন্দ্‌ গাহিতেছে। ভারতের ইতিহাসে এমন সাম্য অভিনব এবং অতুলনীয়।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব। আমি অন্ধকার ধরণীর পানে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্রের মধুর-গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"একটি ভাল দিনক্ষণ দেখে জয় মা ব'লে নেমে পড়ি। কি বলেন?" (সুভাষচন্দ্র কি শাক্ত, কালী মা ভক্ত? এ মা কোন্‌ মা? জগজ্জননী মা, না জননী-জন্মভূমি মা? আরও এক কথা? সুভাষবাবু পাঁজী পুঁথি যাত্রা অযাত্রা জানিতেন, তাহার সাক্ষী আমার এই দুই কর্ণ।)

তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলাম, আদৌ দিয়াছিলাম কি-না মনে নাই। বোধ করি উত্তর দিই নাই। অপাত্রে প্রশ্ন এবং উত্তর অনাবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন—জয় মা বলে দিই সুরু করে!

আবার জয় মা!

গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী প্রকাশ হইয়া জানাইলেন, আহার্য্য প্রস্তুত।

আমরাও অপ্রস্তুত ছিলাম না, সভা ভঙ্গ হইল।

এইখানে পরিকল্পিত কংগ্রেস-ভবনটির কথা বলি। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট (!) মাসে কলিকাতায় একটি "জাতীয় ভবন" ("কংগ্রেস-ভবন") নির্ম্মাণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় প্রথম আলোচিত হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপরে বৃহৎ একখণ্ড জমি ৯৯ বৎসরের জন্য নামমাত্র, বার্ষিক এক টাকা খাজনায় সুভাষচন্দ্র বসুকে জমা দিবার প্রস্তাব, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধতা ব্যর্থ করিয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই জমির উপরে সুভাষচন্দ্র সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। তন্মধ্যে একটি রঙ্গালয়, একটি বক্তৃতামঞ্চ, একটি বহুগ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রস্তাবনায় এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। সহর ও সহরবাসীর স্বাস্থ্য, জ্ঞান, চিত্তরঞ্জন বিষয়ক কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হয়। কথা ছিল, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যালয়ও ঐ ভবন মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে। তখন পর্য্যন্ত কংগ্রেস-হাউস নামেই ভাবী ভবনটির পরিচিতি ঘটিয়াছিল।

১৯৩৮ সালের সে কথা; আজ ১৯৪৬। ইত্যবসরে দীর্ঘ আটটি বৎসর বিগত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই কংগ্রেস-ভবন? সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা কি তাঁহার কল্পলোকেই রহিয়া গেল? কলিকাতা সহরে যে কয় লক্ষ লোক বাস করেন, তাঁহারা ঐ প্রশ্ন না করিতেও পারেন, কিন্তু কলিকাতাই বঙ্গদেশ নহে এবং বঙ্গদেশই ভারতবর্ষ নহে। ভারতবর্ষ জানিতে চাহিতে পারে, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-ভবন এই দীর্ঘকালের মধ্যেও রূপায়িত না হইল কেন? "ভারতবর্ষ" মারফৎ এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব এবং বলিব যে কল্পলোকে নহে, এই মর্ত্ত্যলোকেই তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশাল বঙ্গদেশ ও বিরাট ভারতবর্ষের নিকট সানুনয় নিবেদন, ভবন আমি দেখাইব। উদ্ধত উন্নত উচ্চ শিরে নহে—লজ্জাবনত মস্তকে সঙ্কোচধিক্কৃত ধীর পদে আসিতে হইবে, আমিও নতশিরে পথ প্রদর্শন করিব। দেখিয়া লজ্জায় হতবাক্‌ হইতে হয়—হইবেন; জাতির জীবনে ধিক্কার জাগে, উপায় নাই!

নামটি আজ আভাষেই বলিয়া রাখি—মহাজাতিসদন। আগামী মাসে ইতিহাস বিবৃত করিব।

ইঙ্গ—মার্কিণ আর্থিক চুক্তি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যখন ঋণ ও ইজারা চুক্তিকে একাণ্ডভাবে যুদ্ধকালীন নীতি বলিয়া বাতিল করিয়া দিলেন, তখন দেউলিয়া ব্রিটিশসরকারের মাথায় হইল বজ্রাঘাত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহনে ব্রিটেন নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের খরচ চালাইতে ব্রিটেনকে অন্যদেশস্থ সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিতে হইয়াছে; আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ ও ইজারা নীতিতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—ঋণ হিসাবে বহু পরিমাণ মাল; ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, মিশর প্রভৃতি দেশের নিকট জমিয়া উঠিয়াছে ব্রিটেনের পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ। যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠে যে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার চিন্তায় তাহার পক্ষে জয়ের আনন্দ পর্য্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হয় নাই। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রিটেন একমাত্র আমেরিকার সাহায্যেই উদ্ধার পাইবার আশা রাখে। কিন্তু সেই ধনী ও মিত্ররাষ্ট্র আমেরিকা পর্য্যন্ত যখন যুদ্ধ থামিতে না থামিতেই ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থানুসারে লেনদেন বন্ধ করিয়া দিল, তখন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপরিচালকবর্গ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালীন নীতি যুদ্ধাবসানে বাতিল হইবে ইহা অতি সহজ বুদ্ধির কথা। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যখন এই নীতি বাতিল হইবার কথা ঘোষণা করেন তখন কাহারও অবাক হইবার কিছুই ছিল না! কিন্তু তবু আত্মকেন্দ্রিক অনেক ব্রিটেনবাসী এমন কথাও ভাবিয়াছে যে, হয় তো চার্চ্চিল-পরিচালিত টোরী সরকারের সমর্থক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের নবগঠিত শ্রমিক সরকারকে বিপন্ন ও জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাইবার জন্যই এই চুক্তি বাতিল করিয়া দিল। যাহা হউক চুক্তি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য-লাভের আশা ছাড়িতে পারিল না। শ্রমিকসরকার সমস্ত অসম্মান মাথা পাতিয়া লইয়া শেষপর্য্যন্ত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেসের অধীনে একদল প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন। কথা রহিল, ব্রিটেনের চরম দুরবস্থা সালঙ্কারে বিবৃত করিয়া এই প্রতিনিধিমণ্ডলী ব্রিটেনকে যে কোনভাবে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ সেনেটকে অনুরোধ করিবে। যুক্তরাষ্ট্রস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হালিফ্যাক্সও এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে যোগ দিলেন।

তারপর কিনেস-হালিফ্যাক্স মিশন দীর্ঘকাল যাবৎ মার্কিণ সেনেটের সহিত আর্থিক চুক্তি সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চালান। উভয়পক্ষ হইতেই নানাভাবে চুক্তিটি সপক্ষে রাখিবার জন্য নানা চেষ্টা চলে। মার্কিণ সেনেটের একদল সদস্য ব্রিটেনের নিকট আমেরিকার পাওনার কথা ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের কাছে ব্রিটেনের পর্ব্বতপ্রমাণ দেনার কথা উল্লেখ করিয়া ব্রিটেনকে নূতন কোন ঋণপ্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আর একদল সদস্য খোলাখুলিভাবে বলেন যে, যে পর্য্যন্ত ব্রিটেন অটোয়া চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক সুবিধা গ্রহণের নীতি চালু রাখিবে, সে পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে কিছুতেই আর্থিক সাহায্য করিতে পারে না; কারণ বাণিজ্যব্যাপারে ব্রিটেন কোন অন্যায় সুবিধা পাইলে শিল্পের উপর নির্ভরশীল অপর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র আমেরিকার তাহাতে সমূহ ক্ষতি। যাহা হউক, এইরূপ সর্ত্তাদি লইয়া অনেকদিন দড়ি টানাটানি চলে।

তবে এই দড়ি টানাটানিতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনেরই জয় হইয়াছে। কিনেস-হালিফ্যাক্স মিশন শেষ অবধি মার্কিণ সেনেটকে ব্রিটেনকে ঋণপ্রদানে রাজী করাইয়াছে এবং রাজী করিতে সাম্রাজ্যিক সুবিধার নীতি বাতিল করার মত ব্রিটেনকে কোন স্বার্থত্যাগ করিতে হয় নাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৪৪০ কোটি ডলার বা ১৪৬৬ কোটি টাকা ঋণস্বরূপ লাভ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে ব্রিটেনকে ব্যবসা-বাণিজ্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হইবে ১২৫০ কোটি টাকা এবং বাকী টাকা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় ব্রিটেন কর্ত্তৃক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে গৃহীত মালের দাম চুকাইবার জন্য খরচ করিতে হইবে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিণ শাসন পরিষদের অনুমোদন হইলেই ব্রিটেন দেনার টাকা পাইয়া যাইবে, কিন্তু এই দেনা তাহাকে শোধ করিতে হইবে ১৯৫১ সাল হইতে ৫০টি বাৎসরিক কিস্তিতে। এই ঋণের দরুণ শতকরা ২ ডলার হিসাবে সুদ ধার্য্য হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, দেনার টাকা হাতে পাইবার এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটেন ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশসমূহ হইতে গৃহীত দেনার একাংশ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সময় এই সব পাওনাদার দেশের ব্রিটেনের সহিত কারবারে যদি কোন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সমস্ত পাওনা ব্রিটেনের মারফৎ সেই দেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের মুদ্রায় লাভ করিতে পারিবে। হিসাবে দেখা গিয়াছে ব্রিটেন যদিও ১৪৬৬ কোটি টাকা ধার করিতেছে, সুদে আসলে তাহাকে শোধ দিতে হইবে মোট ১৯৮৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৩১৯ কোটি টাকা সুদ হিসাবে দিতে হইবে।

আগেই বলা হইয়াছে, ব্রিটেন যুদ্ধের দায়ে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধোত্তর সমস্যা যুদ্ধকালীন সমস্যার চেয়ে অনেক বড় এবং যুদ্ধের পরে অন্তর্দ্দেশীয় সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিয়া দেশের আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটেনের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে তাহার শিল্পবাণিজ্য পুনর্গঠিত করিতে হইবে, কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন বিপুল

পরিমাণ অর্থের। এই অর্থবিহনে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও হয় তো সহজ হইত না। কাজে কাজেই যে কোন ভাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিয়া ব্রিটেন যে এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। ঋণের সুদের হার ব্রিটেনের অবস্থার তুলনায় খুব চড়া হইয়াছে, ব্রিটেনে অনেকে এ ধরণের অভিযোগ করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান ফাঁপাবাজারে সুদের হার একটু চড়া বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দুইটি কথা আছে। প্রথমতঃ ব্রিটেন অধমর্ণ দেশ; কাজেই মহাজন হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি একটু সুবিধা গ্রহণ করে তাহাতে বলিবার কিছু নাই। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনও সমালোচকদের স্তব্ধ হইবার নির্দ্দেশ দিয়া এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The fact is we are to borrow and we are not in a position to dictate terms" (আসল কথা, আমরা অধমর্ণ এবং সর্ত্ত স্থির করিবার অধিকার আমাদের নাই।) তাছাড়া বর্ত্তমান দুঃসময়ে ব্রিটেন এই আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়া ব্রিটেনের পক্ষে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হইবে। এদিক হইতে সুদের হার একটু বেশী হইলেও তাহাতে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদিও শতকরা ২ ডলার হিসাবে সুদের হার স্থির হইয়াছে, তবু আসলে সুদ দিতে হইবে ১৯৫১ সাল হইতে, এখন হইতে নয়। এই ছয় বৎসর বিনাসুদে ব্রিটেন যে ১২৫০ কোটি টাকা ভোগ করিবে, তজ্জনিত সুবিধা সে পাইবে যথেষ্ট এবং এই ছয় বৎসরের হিসাব ধরিলে বাস্তবিক সুদের হারও শতকরা বার্ষিক ২ টাকা অপেক্ষা হিসাবে অনেক কম হইবে। যদিও চড়া সুদে ধারের ব্যাপারে ব্রিটেনে অনেকে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তবু এই চুক্তির পরিণাম ভাবিয়া যাহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদই ভাবিতেছেন যে এই চুক্তির ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বাণিজ্য বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিবে। এক তো ব্রিটেনকে দেনদার করিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই তাহার উপর কতকটা মাতব্বরী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে, তা ছাড়া চুক্তি অনুসারে এম্পায়ার ডলার পুল তুলিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাও ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে সম্ভবতঃ মহাক্ষতির কারণ হইবে। ইতিপূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ও ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটারী দেশসমূহকে লইয়া ষ্টার্লিং এলাকা যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত, তাহাতে উদ্বৃত্ত ডলার সম্পদ বিভিন্ন দেশ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিত না এবং যুদ্ধের মধ্যে এম্পায়ার ডলার পুলের মারফৎ ব্রিটেনই বলিতে গেলে বিভিন্ন দেশের ডলার লিজ-হিসাবে গ্রহণ করিয়া মার্কিণ পণ্যে অন্তর্দ্দেশীয় পণ্য চাহিদার মীমাংসা করিয়াছে। ব্রিটেনের এই স্বার্থপর নীতির জন্য ভারতবর্ষের ন্যায় অনুকূল বাণিজ্যিক গতিসম্পন্ন দেশের পাওনা ডলারগুলি বেহাত হইয়া গিয়াছে এবং পরিবর্ত্তে জুটিয়াছে সমমূল্যের কাগজী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। ইহার ফলে মার্কিণ যন্ত্রপাতি আনিয়া ভারতে শিল্পসমৃদ্ধি ঘটাইবার অথবা মার্কিণ পণ্যে ভারতের প্রচণ্ড অভাব মিটাইবার যে সম্ভাবনা ছিল, প্রয়োজনীয় ডলারের অভাবে সে সুবিধা ভারতবর্ষ পাইতেছে না। ইঙ্গ মার্কিণ আর্থিক চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর সাম্রাজ্যিক ডলার তহবিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশকেই বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত তহবিল পৃথিবীর যে কোন দেশের মুদ্রায় ব্যবহার করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশ এতদিন ব্রিটেন হইতে মাল আমদানী করিত নিছক প্রয়োজনের তাগিদে, ব্রিটেনকে ভালবাসিয়া নয়। এখন যন্ত্রপাতির ও নানাবিধ শিল্প পণ্যের দিক হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই ব্রিটেন অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় যদি যে কোন বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব একচেটিয়া এই সকল বাজারে পণ্য রপ্তানী অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে। যদিও ৪৪০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ায় ব্রিটেন আশা করিতেছে যে, তাহার পক্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা অতঃপর সম্ভব হইবে, তথাপি এইভাবে প্রবল মার্কিণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে সেই রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুবিধা ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত কতটা কাজে লাগাইতে পারিবে সে বিষয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদগণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নন। যাহা হউক, সমস্ত ভাল মন্দ জানিয়া শুনিয়াও ব্রিটেনের হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডস নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি মানিয়া লইয়াছে। ব্রিটেন জানে, বিরাট স্বর্ণসম্পদশালী আমেরিকার মতলব শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনকেও স্বর্ণমান প্রবর্ত্তনে প্ররোচিত করিয়া পৃথিবীর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রাখা; কিন্তু স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাওয়া ব্রিটেনের পক্ষে অসম্ভব-প্রায় হইলেও অবস্থা বৈগুণ্যে ব্রিটেনের পক্ষে মার্কিণ সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না।

ব্রিটেনের অবস্থা যাহাই হউক, ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, সে কথা চিন্তা করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে ধারে যে সকল পণ্য জোগাইয়াছিল, মূলতঃ তজ্জন্যই ব্রিটেনের নিকট তাহার প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ব্রিটেনের আর্থিক বনিয়াদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধের দক্ষিণা হিসাবে ভারতবর্ষকেও বড় কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় নাই। তাছাড়া যুদ্ধের চাপে ভারতবর্ষ আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ দৈন্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। এই দৈন্য হইতে রেহাই পাইতে হইলে ভারতবর্ষকেও প্রাথমিক ব্যয় রূপে বহু অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। ভারতের চলতি নোটের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ১২ শত কোটি টাকা, অথচ ইহার বিপরীত দিকে জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার সোনা। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষে আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে ব্রিটেনের নিকট পাওনা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটির

উপর। এই পাওনা টাকা যদি ভারতবর্ষ আদায় করিতে পারে তবেই তাহার পক্ষেও অদূর ভবিষ্যতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুনর্গঠন করিয়া অন্তর্দ্দেশীয় আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে। এতদিন ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা স্পষ্টতর হতাশাজনক ছিল, ইচ্ছা করিলেও ব্রিটেন যে আমাদের দেনা শোধ দিতে পারিত না, তাহা আমরা ভালভাবেই জানিতাম। প্রকৃতপক্ষে গত ব্রেটন-উডস সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড ফিনেস খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, নীতি হিসাবে ভারতের পাওনা প্রত্যর্পণ করাই ব্রিটেনের উচিত, কিন্তু ব্রিটেনের পক্ষে চরম আর্থিক দুরবস্থার জন্য বর্ত্তমানে সেই কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। আলোচ্য ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ব্রিটেন যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারণের আশা করিতেছে; তাহার এইভাবে আর্থিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে ভারতের ন্যায্য পাওনাও যে অপ্রত্যর্পিত থাকিবে না, ইহা আমরা সহজেই আশা করিতে পারি। তাছাড়া চুক্তি অনুসারেই ব্রিটেন এক বৎসরের মধ্যে ষ্টার্লিং এলাকাস্থ দেশগুলির পাওনার একাংশ পৃথিবীর যে কোন মুদ্রায় ফিরাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে, এদিক হইতে ভারতের জলে পড়িয়া যাওয়া পাওনা ফিরিয়া পাইবার কতকটা নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিতেছে বলিয়া এই চুক্তি সম্বন্ধে ভারতবাসী অনেকখানি আশা পোষণ করিতেছে।

কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ অন্ততঃ একাংশ ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এইভাবে একাংশ ফিরাইয়া দিয়া বাকী পাওনার বেলায় ব্রিটেন যদি ফাঁকী দিবার মনোভাব দেখান, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসীই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পাওনার একটি বড় অংশ ফাঁকী দিবারও যে কিছু কিছু সম্ভাবনা আছে, তাহা ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তিটি মন দিয়া পড়িলে স্বতঃই মনে হয়। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের ষ্টার্লিং দেনাকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে পাওনার যে অংশ ব্রিটেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে তাহা হইবে প্রথম শ্রেণী; ১৯৫১ সাল হইতে কিস্তিবন্দীভাবে ব্রিটেন যে অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে তাহা হইবে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং যুদ্ধকালীন পাওনা-দেনার হিসাব-নিকাশেরও মজুত তহবিলের জন্য পাওনার যে অংশ সরাইয়া রাখা হইবে তাহা হইবে তৃতীয় শ্রেণী। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মত দেশের পাওনা জমিয়াছে দারুণ দুঃখবরণের বিনিময়ে। বিপদের সময় ব্রিটেন ভারতের যে অর্থ হাত পাতিয়া লইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, আজ উপায় থাকিলে তাহা পুরোপুরী শোধ দিয়া ভারতের বাঁচিবার ব্যবস্থা করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ব্রিটেন যে এইভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তির মারফৎ তাহার ন্যায্য পাওনা ফাঁকী দিবার না হইলেও প্রত্যর্পণে অযথা বিলম্ব করিবার ব্যবস্থা করিল, তাহা ভারতের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। বাস্তবিক প্রথমতঃ ব্রিটেন এক বৎসরের মধ্যে কতটা দেনা শোধ করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়তঃ ১৯৫১ সালে কিস্তি আরম্ভ হইলেও দেনার কতটা অংশ কিস্তিবন্দীতে পরিশোধিত হইবে তাহাও এখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাছাড়া এই কিস্তি যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিবে, ততই ভারতের আর্থিক বনিয়াদের পুনর্গঠনে বিলম্ব দেখা দিবে। সব শেষে ব্রিটেন যুদ্ধকালীন দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য দেনার কতক অংশ মজুত রাখার ও কতক অংশ বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় স্বার্থের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকুল ব্যবস্থা। ব্রিটেন দরকারের সময় সোজাসুজি দেনা করিয়াছে, পরিশোধের সময় সেই দেনার একাংশ বাতিলের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সম্প্রতি ভারতের পাওনা ফাঁকি দিবার, অথবা অন্ততঃ কমাইবার জন্য ব্রিটেনে একটি আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একশ্রেণীর ব্রিটিশ সংবাদপত্র প্রচার সুরু করেন যে, ভারতবর্ষ নাকি যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরবরাহকরা মালপত্রের অন্যায় দর লইয়াছে, কাজেই ন্যায্য হিসাবে তাহার পাওনা কমিয়া যাওয়া উচিত। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তথ্যাদি সহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের সততা সম্পর্কে এইরূপ অভিযোগ মিথ্যা। সম্প্রতি আবার কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র আন্দোলন করিতেছে যে, ভারতবর্ষ নাকি যুদ্ধের জন্য তেমন কোন স্বার্থত্যাগ করে নাই, কাজেই এই অল্পতর স্বার্থত্যাগের বিবেচনায় তাহার পাওনা কমাইয়া দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য, এই অভিযোগও যে একান্ত মিথ্যা, তাহা ভারতের সম্বন্ধে সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যুদ্ধের জন্য ভারতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, পণ্যাভাবে এদেশের ৩৫ লক্ষ হতভাগ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বে-সামরিক ভারতবাসী সামরিক বিভাগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল দিক হইতে যে অভাব বরণ করিয়া লইয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। ভারত হইতে যুদ্ধের মধ্যে এক সময় মাসে ৭০ হাজারের বেশী লোক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিবার পর ভারত-সরকারের যুদ্ধ জয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ছিল না, কাজেই বেসামরিক ভারতবাসীর বা ভারতের সাধারণ উন্নতি সাধনের দিকে তাঁহারা নজর দিবার পর্য্যন্ত অবকাশ পান নাই। এই ভাবে নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নামে যদি যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ না করিবার অভিযোগ আনা হয়, সেই অভিযোগের যথার্থতা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ব্রিটেন-বাসী বা ব্রিটিশ সংবাদপত্র নয়, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অক্ষশক্তির হাতে নিষ্পেষিত হইতে না দিয়া ভারতবর্ষকে সম্মিলিত শক্তি প্রাণে বাঁচাইয়া দিয়াছে, এই সৌভাগ্যের বিনিময়ে তাহার উত্তমর্ণত্ব কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। হাউস অফ কমন্সে ভারতের পাওনা কমাইবার উদ্দেশ্যে চার্চ্চিল স্পষ্টই বলেন:—"We are told we owe £ 1,200,000,000 to the Government of India and £ 400,000,000 to Egypt. Egypt would have

been ravished and pillaged by German arms. Is there to be no recognition of that? The same argument applies to the Government of India." (আমাদের বলা হয় যে, আমরা নাকি ভারত সরকারের নিকট ১২০ কোটি পাউণ্ড এবং মিশর-সরকারের নিকট ৪০ কোটি পাউণ্ড ধারি। জার্ম্মানীর অভিযানে মিশর ধ্বংস হইয়া যাইত। সে কথা কি মনে রাখিবার মত নয়? ভারত সরকার সম্বন্ধেও এই একই যুক্তি উপস্থাপিত করা চলে।) বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী একান্ত স্বার্থবাদী দৃষ্টিকোণ হইতেই এই কথা বলিয়াছেন। ১৯৪০ সালের চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ভারতের যুদ্ধ-ব্যয়ের একাংশ যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ অনেক ব্রিটেনবাসীর বক্তব্য এই যে, যুধ্যমান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য এবং যুদ্ধজয়ের গৌরব তাহার নিজস্ব বলিয়া যুদ্ধব্যয়ের অংশীদার হইবার জন্য তাহার কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। কথাটা কিন্তু আমাদের দিক হইতে যুক্তিসহ নয়। ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় করে নাই। অপ্রস্তুতির জন্য হিটলারের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ মুসোলিনীর ইটালী ৯ মাস যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে পারে, ব্রিটেনের একান্ত আপন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৭ মাস নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে, স্পেন বা আয়ার্লণ্ড বরাবর উভয় পক্ষকে হাতে রাখিয়া চলিতে পারে, আর অতি দুর্ব্বল অষ্টাদশ শতাব্দীর সমরায়োজন-সম্পন্ন ভারতবর্ষের কি এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া চলিত না? যুদ্ধে ভারত সরকার যোগ দিয়াছেন ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গুলি হেলনে, তজ্জন্য ভারতবাসীকে তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যে যুদ্ধের জন্য তাহার ধনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য নয়, ব্রিটেনকে বাঁচাইবার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। কাজেকাজেই ভারতের সমরায়োজনে ব্রিটেন যেটুকু সাহায্য করিয়াছে, তাহা করিয়াছে সম্পূর্ণভাবে আপন স্বার্থে; ভারতবর্ষ ব্রিটেনের আত্মরক্ষাসংক্রান্ত যুদ্ধে যেটুকু আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহা করিয়াছে তাহার পরাধীনতার দক্ষিণা প্রদান হিসাবে। এদিক হইতে যাহারা ইঙ্গ-ভারতীয় সমরব্যয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে আসেন, তাঁহারা ভারতের স্বার্থ চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিবার দৃঢ়সংকল্প লইয়াই আসিয়া থাকেন। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, ব্রিটেন বিজয়ী হইয়াছে; যুদ্ধজয়ের গৌরব একা ভোগ করিবার লোভে ও ক্ষমতার অহঙ্কারে আজ যদি সে ভারতের সমস্ত সাহায্যের কথা ভুলিয়া বসে এবং তাহার সর্ব্বনাশের বিনিময়ে পাওনা ষ্টার্লিং পাওনা কমাইতে মনস্থ করে, তাহা কোন দিক হইতেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের বিদেশী দেনা কমাইয়া দিতে পারিলেই খুসী হয়, কারণ তাহাতে ব্রিটেনের পক্ষে মার্কিন দেনা শোধ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবই ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তিতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক দেনা সম্বন্ধে অবলম্বিত বিধিব্যবস্থার মূলে কাজ করিয়াছে। বাস্তবিক ইতিপূর্ব্বে যখন ব্রিটেনকে ধার দেওয়ার কথা মার্কিন সেনেটে আলোচিত হইতেছিল তখন বামপন্থী সেনেটর ইম্যানুয়েল সেলার পরিষ্কারই বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটেন যদি তাহার বিদেশী দে[না] কমাইবার ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে তাহাকে আর নূতন ঋণ প্রদ[ান] করা চলে না। ভারতের পাওনার একাংশ হইতে ব্রিটেনকে মুক্তি দিব[ার] মতলব যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে, ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তি ভালভা[বে] অনুধাবন করিলে ইহা স্বতঃই মনে হয়। আর্থিক চুক্তির অন্তস্থ ভারতে[র] ক্ষতিসাধনের এই ষড়যন্ত্র অনুমান করিয়াই ভারতের আর্থিক অবস্থ[ার] উন্নতিকামী অনেকে এই চুক্তির কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির ফলে ডলার এলাকার সহিত ষ্টা[র্লিং] এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু পরিমাণ সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং সমৃদ্ধিশ[ালী] রাষ্ট্র আমেরিকা এই চুক্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য-বাজারের উ[পর] একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিবে। ব্রিটেনও এই চুক্তির সুযো[গ] সুবিধা পাইবে তাহার ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠন করিবা[র]। সংক্ষেপে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির ফলে পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আ[র্থিক] মাতব্বরীর অধিকার কায়েমী করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ... শোষিত দেশ হিসাবে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ব্রিটেনের [হাত] হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গেলে ভারতের বিশেষ কিছু আসে [যায়] না। তবে জলে পড়িয়া যাওয়া ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাওয়া সম্বন্ধে চুক্তিতে যে সামান্য হদিশ মিলিয়াছে, পরমুখাপেক্ষী ভারতের নিকট তা[হাই] সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তবে কথা হইতেছে, ভারত সরকার ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের চিরাচরিত উদাসীন মনোভাব পরি[ত্যাগ] করেন, তাহা হইলে এই চুক্তি অবশ্যই এদেশের আর্থিক সৌভাগ্য [সৃষ্টি] করিতে পারে। ষ্টার্লিংয়ের কত অংশ প্রত্যর্পণ করা হইবে, কোন ... সেই প্রত্যর্পিত ষ্টার্লিং গ্রহণ করা হইবে, বাকী ষ্টার্লিং কত কম কি[স্তিতে] আদায় করা সম্ভব, ভারতের অতি ন্যায্য পাওনার এক ভাগ কেন বাতিলের কথা উঠে;—ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি যদি ভারত স[রকার] সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করেন এবং ভারতের প্রকৃত শাসনের ম[ত] মনোভাব লইয়া এ-সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনায় অ[গ্রসর] হন, তাহা হইলে চুক্তির ফলে ভারতের কোনরূপ ক্ষতি নাও [হইতে] পারে। আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়যুক্ত হইবেই এবং অদূর ভ[বিষ্যতে] ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। এই নূতন গভর্ণমে[ণ্ট] বর্ত্তমান ভারত সরকারের ন্যায় এদেশের স্বার্থ উপেক্ষা করিবে না, [ইহা] বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখন অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, ... জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই ব্রিটিশ সরকারের নি[র্দেশে] ভারত সরকার হাত-ধরা কোন ভারতীয় কর্ম্মচারীর মারফৎ ষ্টার্লিং প[াওনা] সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া লইবেন। বাস্তবিক ব্রিটেনেও অনতি[বিলম্বে] ভারতের পাওনা সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার বিশেষ তোড়[জোড়] দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইভাবে অনিবার্য্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট [প্রতিষ্ঠিত] হইবার আগেই যদি ভারত সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা [স্বতন্ত্র] কথা। জাতীয় সরকার গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের আর্থিক পুন[র্গঠনের] একমাত্র আশা—এই ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে শেষ আলোচনা কি[ছুতেই] বর্ত্তমান ভারত সরকারের চালানো উচিত নয়। বলা নিষ্প্রয়ো[জন]

ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ভারত সরকার যদি আগামী গভর্ণমেণ্টের পদগ্রহণের আগেই ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেনের নিকট পাওনা সম্পর্কে মীমাংসা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে নূতন গভর্ণমেণ্ট দারুণ বিপদে পড়িবেন এবং জনমত এই দুর্নীতিমূলক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক ভারত সরকারের বোঝা উচিত যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় জনমত প্রথম মহাযুদ্ধের পরের জনমত অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ তহবিলে দানের নামে ভারতের ১৯০ কোটি টাকা ব্রিটিশ সরকার ফাঁকি দিয়াছিলেন, সেই ক্ষতি ভারতবাসী একরূপ নিঃশব্দেই সহ্য করিয়াছিল ; এবার কিন্তু সেই লোভী মনোভাবের পুনরাবির্ভাব দেখা গেলে ভারতের জাগ্রত জনমত কিছুতেই শোষণকারী শাসকের সেই জুলুম সহ্য করিবে না।

শ্রীশ্যামসুন্দর

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল

গঙ্গাতীরে খড়দহে বীরভদ্র কি বিরহে,
নিত্য করে নাম সংকীর্ত্তন,
নাহি ছিল ভেদাভেদ, সদাই অন্তরে খেদ,
প্রভু হেথা হও প্রকটন।
নামরসে কি মত্ততা মুখে সদা হরি কথা,
ক্ষণে ক্ষণে ঝরে আঁখি লোর—
ভক্তগণ লয়ে সাথে কীর্ত্তন আনন্দে মাতে
এ সুখের নাহি বুঝি ওর।
অন্বেষিয়া মনে মনে, গোপন আরাধ্য ধনে
একদিন গেলা গৌড়পুর,
পাৎসাহ সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, পরে
সুধাইল কুশল সাধুর।
কি কারণে আগমন হে পণ্ডিত মহাজন,
শুনিয়াছি ফকিরালী কিছু—
জানা আছে হে ঠাকুর, পথ ক্লান্তি কর দূর,
অন্য কথা হবে সব পিছু।
আমার গৃহেতে আজি ভোজনে হউন রাজী
শুনি প্রভু বীরভদ্র হাসে,
যদি তব অন্ন খাই ভিন্ন ধর্ম্মী কহি তাই
আমি হিন্দু—তা'তে জাতি নাশে।
তবে যদি ভালবেসে তুমি নবাবের বেশে
পাশে বসে হেথা খানা খাও,
শীঘ্র তবে কর ত্বরা ইচ্ছামত পাত্রভরা
খাদ্য কিছু হেথায় আনাও।
পাৎসা' নির্দ্দেশ পেয়ে কিঙ্কর ছুটিল ধেয়ে
বাবুর্চ্চী করিল আয়োজন,
বীরভদ্র ইষ্টদেবে স্মরিয়া কহিল, এবে
বন্ধন করহ উন্মোচন।
সদ্যধৌত বস্ত্রে বেঁধে বাবুর্চ্চী এনেছে রেঁধে
নিজ হস্তে খাদ্য নবাবের,
পাৎসাহ হাসিমুখে কহিল সমুখে ঝুঁকে,
কি এনেছ? দেরী হ'ল ঢের!
খুলিয়া ঢাক্‌নীখানি চোখে না প্রত্যয় মানি
কোথা খাদ্য এ যে পুষ্প রাজি!
মালতী মল্লিকা নানা নাহি নবাবের খানা,
একি ফকিরের কারসাজি!
বারবার তিনবার একই কাণ্ড ব্যবহার
তিনবারই বাহিরিল ফুল,
ক্ষুদ্র বীজে মহীরুহ যাঁর সৃষ্টি এ দুরূহ
কাণ্ড তারি নাহি বিন্দু ভুল।
নবাব বিস্ময় মানি' কহিল বিনয় বাণী
সাধু দান করহ গ্রহণ,
কিসে তুমি খুসী হবে কি আছে কিইবা লবে
লহ যাহা যাচে তব মন।
বীরভদ্র যুক্ত করে কহিল মধুর স্বরে,
কৃপা যদি কর পাৎসাহ,
ঝলমল করে শোভা মুনিগণ মনোলোভা
ও তেলুয়া পাথরে আগ্রহ।
লভিয়া প্রস্তরখানি খড়দহে শিলা আনি
গড়াইল মূর্ত্তি মনোহর,
নয়নে মধুর হাসি করেতে মোহন বাঁশী
হের হোথা শ্রীশ্যামসুন্দর!

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৬

"অসুখ করবে কেন? গাড়ী থামাতে বলব? জল চাই?—"

পুরন্দরবাবু ভয় পেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পাপিয়া তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ—চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

"কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

"খুব ভাল জায়গা, দেখবে খুব ভাল লোক তারা। চমৎকার ফাঁকা বাড়ি, অনেক সঙ্গী পাবে, কত খেলা করবে তারা তোমার সঙ্গে। ভয় কি, তোমার ভালর জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। রাগ কোরো না, পাপিয়া"

পুরন্দরবাবুর পরিচিত কেউ এ সময় তাঁকে দেখলে বিস্মিত হতেন।

"উঃ—কি—কি ভয়ঙ্কর লোক আপনি"—ক্ষোভে দুঃখে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল শুধু।

"পাপিয়া, আমি—"

"আপনি পাজি, পাজি, পাজি, পাজি!"

নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল সে। পুরন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

"পাপিয়া-মা—কেন এমন করছ, কেন এ কথা বলছ—"

"বাবা কি কাল আসবেন? সত্যি আসবেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে নিয়ে আসব তাঁকে।"

"না, ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন তিনি"

"তোমার বাবা কি ভালবাসেন না তোমাকে?"

"না, মোটেই না"

"দুর্ব্যবহার করেন তোমার সঙ্গে? বল"

পাপিয়া নীরব। তারপর তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন পুরন্দরবাবু, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত কি বললেন, কত বোঝালেন, পাপিয়া শুনল বটে, কিন্তু মনে হল কিছু বিশ্বাস করছে না সে। কিন্তু সে যে শুনছে এতেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষ মদ খেলে যে কি হয় তা-ই বোঝাতে লাগলেন তাকে। কোন ভয় নেই, তিনি তার আর তার বাবার যাতে কোন বিপদ না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। পাপিয়া কি বুঝতে পারছে না যে তিনি তাদের কত আপন লোক, তাকে কত ভালবাসেন! পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। তিনি গল্প করতে লাগলেন যে তার মায়ের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, তাদের বাড়িতে কতবার গেছেন তিনি এ কথা শুনে পাপিয়ার মন একটু ভিজল মনে হল। ক্রমশ সে দু একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগল, যদিও খুব সাবধানে এবং দু' এ কথায়। কিন্তু যা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কিছুতে বললে না সে বাবার কথা একটি বললে না। পুরন্দরবাবু তার হাতখানা কথা বলতে বলতে ধরলেন এবং ধরেই থাকলেন। হাত সে টেনে নিলে না। নান কথার মধ্যে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল—বাবাকে সে মায়ের চে বেশী ভালবাসত। বাবাই তাকে বরাবর বেশী স্নেহ করেছেন, মা তা দিকে ফিরেও চাইতেন না। কেবল মরবার আগে চুমো খেয়ে অনেকক্ষ কেঁদেছিলেন তিনি…অনেকক্ষণ…এখন সে মাকে খুব ভালবাসে, রো রাত্রে মনে পড়ে তাকে। পুরন্দরবাবু দেখলেন মেয়েটির আত্ম-সম্মা জ্ঞান খুব আছে, কথায় কথায় এত কথা বলে ফেলে হঠাৎ যেন ত হুঁস হ'ল যে সে অন্যায় করছে—চুপ করে' গেল আবার। কান্নাকা আর করলে না, কিন্তু চুপ করে' রইল। বুনো জানোয়ারকে ক করলে সে যেমন চুপ করে থাকে ঠিক তেমনি। একটা অচেনা জায়গ যাচ্ছে বলেই যে তার কষ্ট হচ্ছিল তা ঠিক নয়। অন্য আর এক কারণ ছিল।

পুরন্দরবাবু অনুভব করলেন সেটা। বাবার ব্যবহারে লজ্জায় মা কাটা যাচ্ছিল যেন তার। এত সহজে তিনি আসতে দিলেন তা একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। মনে হল তার বোঝাটা পরের ঘা কোন ক্রমে তুলে দিয়ে বাঁচলেন যেন।

"মেয়েটা অসুস্থ"—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন—"খুবই অসুস্থ…ভ ভাবনায় আরও কাবু হয়ে পড়েছে। মাতালটা করেছে কি! এতক্ষ বুঝতে পারছি সব" কোচোয়ানকে জোরে হাঁকাতে বললেন তিনি যাদবপুর জায়গাটা ফাঁকা, বাগানও আছে ভদ্রলোকের একটা, ছে মেয়েগুলিও ভাল, নতুন জায়গায় গিয়ে শরীরটা সেরে যেতে পা তারপর…। তারপর যে কি হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল ন তাঁর মনে—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতকে রঙীণ করে তুলেছিলেন মনে মনে আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলেন তিনি, এখন যা তঁ মনে হচ্ছে তা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নি, এ মনোভাব জীব বদলাবেও না আর কখনও।

"আঁকড়ে ধরবার মতো এই তো একটা পেয়েছি কিছু—সম জীবন একটা" সানন্দে ভাবছিলেন তিনি।

অনেক চিন্তা তাঁর মনের উপর দ্রুতবেগে খেলে যাচ্ছিল, কি একটাকেও আমোল দিলেন না তিনি—পরে ভাল করে' ভেবে দে যাবে সব। ভাল করে' ভেবে না দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটিকেই চমৎক

নে হচ্ছিল,. একেবারে অকাট্য—এ ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব! এই রতে হবে।

ভাবছিলেন—"সবাই মিলে বুঝিয়ে মাতালটার হাত থেকে উদ্ধার রতে হবে একে। যাদবপুরে ওদের বাড়িতেই থাকবে। দেবে না? াল করে' বোঝালে ঠিক দেবে। প্রথমে কিছুদিনের জন্য যাদবপুরে খে চলে যাক...তারপর ক্রমশঃ আমি আমার কাছে নিয়ে নেব। ইটিই আমার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর তো আমি কিছু চাই না। ন্তু যুগলও হয় তো ওকে চায়। ওই হয় তো ওর জীবনের একমাত্র খ—তা হলে ওকে যন্ত্রণা দেয় কেন! যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায় বোধ হয়।"

অবশেষে এসে পৌঁছল তারা। ভবেশবাবুর বাড়িখানা সত্যিই ৎকার। গাড়ি থামতেই, একদল ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে সে অভ্যর্থনা করল। পুরন্দরবাবু অনেকদিন আসেন নি। তাঁকে খে সবাই মহা খুশী—সবাই ভালবাসে তাঁকে। ওরই মধ্যে যারা বড় ড়ি থেকে নামতে না নামতেই তারা চীৎকার করে' উঠল—"আপনার কার্দ্দমার কি হল কাকাবাবু—কত বাকী আর—"

বড়দের অনুকরণে ছোটরাও তাই বলতে লাগল—মহা সোর গোল লে সবাই মিলে। নীলিমা দেবী বেরিয়ে এলেন, ভবেশবাবুও। রাও স্মিতমুখে মকোর্দ্দমার বিষয়ে জানতে চাইলেন।

নীলিমা দেবীর বয়স বছর সাঁইত্রিশ। একটু মোটা হয়ে গেছেন, তবু এখনও সুন্দরী বলা চলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ টা সজীবতা আছে। ভবেশবাবুর বয়স বছর পঞ্চান্ন, চালাক চতুর মান এবং সর্ব্বোপরি সদাশয় ব্যক্তি। পুরন্দরবাবুর মতে এঁরাই র্শ গৃহস্থ। এই পরিবারটির প্রতি পুরন্দরবাবুর অনুরাগের আর টি বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে, পুরন্দরবাবুর ছাত্র-ন শেষ হয় নি তখনও, এই নীলিমা দেবীকে বিয়ে করবার জন্যে ল হয়েছিলেন তিনি। নীলিমা দেবীই তাঁর জীবনের প্রথম প্রণয়। , হাস্যকর এবং চমৎকার। নীলিমা দেবী কিন্তু বিয়ে করেছিলেন শ মল্লিককে। পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল আবার। সেই উদ্দাম ক্রমশঃ রূপান্তরিত হল শান্ত স্নিগ্ধ বন্ধুত্বে। বন্ধুত্বের মধ্যে একটু ষ্টা ছিল অবশ্য। এক অনির্দ্দিষ্ট ফল্গুধারার গোপন রসে তা সঞ্জীবিত ত যেন। কোন কালিমা ছিল না, গ্লানি ছিল না, শুভ্রতা ছাড়া কিছু ছিল না এ বন্ধুত্বে। তাঁর জীবনে পবিত্র প্রণয়ের একটি নিদর্শন বলে' বোধ হয় এর বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে। পরিবারের সংস্পর্শে এলে তাঁর সমস্ত মুখোস, সমস্ত বহিরাবরণ খসে' যেন। সরল, উদার-সহৃদয় পুরন্দরবাবু আত্মপ্রকাশ করতেন ভাবে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের আদর করতেন, নিজের দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতেন, কোন রকম ভড়ং থাকত প্রায়ই বলতেন যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এদের কাছেই এসে বেন এবার। মুখের কথা নয়, সত্যিই ইচ্ছে ছিল তাঁর।

পাপিয়ার কথা সব খুলে বললেন। বেশী বলবার দরকার ছিল না দরবাবুর অনুরোধই যথেষ্ট এ পরিবারের কাছে। নীলিমা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে' নিলেন মাতৃহীন পাপিয়াকে এবং ছেলেমেয়েরা যখন পাপিয়াকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল তখন তিনি পুরন্দরবাবুকে বললেন যে তার যথাসাধ্য তিনি করবেন, পাপিয়ার কোন কষ্ট হবে না, পুরন্দরবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধঘণ্টা পরেই তিনি বললেন—"এবার আমাকে যেতে হবে।" সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কতদিন তিনি আসেন নি, এসেই বলছেন যেতে হবে। আধঘণ্টা পরেই! কিন্তু পুরন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর অধৈর্য্য দেখেও অবাক লাগল সকলের। পুরন্দরবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিনই আবার আসবেন, আজ কিন্তু যেতেই হবে। সকলেই লক্ষ্য করল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন তিনি। হঠাৎ উঠে তিনি নীলিমা দেবীকে বললেন—"শোন, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, চল ও ঘরে চল।"

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন—"অনেকদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? তোমাকেই বলেছিলাম খালি, ভবেশবাবু এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। আমার সেই বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা?"

"মনে আছে বই কি, প্রায়ই সে গল্প করতেন যে"—মৃদু হেসে নীলিমা বললেন।

"গল্প নয়, সত্য কথা, আর তোমাকেই কেবল বলেছিলাম তা। তার পরিচয় তোমাকে দিই নি। সে এই যুগল পালিতের স্ত্রী। সে এখন মারা গেছে—পাপিয়া তারই মেয়ে—মানে আমারই মেয়ে!"

"সত্যি!"

"সত্যি—কোন ভুল নেই এতে"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে সংক্ষেপে যতটা পারলেন বললেন আবার—সবটাই বললেন।

অপর্ণার নামটি ছাড়া নীলিমা সবই শুনেছিলেন আগে। পুরন্দরবাবু নামটা আগে বলেন নি—কারণ তাঁর ভয় ছিল যদি কখনও অপর্ণা পালিতের সঙ্গে নীলিমার দেখা হয়ে যায় তখন সে হয়তো ভাববে—পুরন্দরবাবুর মতো লোক—এই মেয়েকে এত ভালবেসেছিলেন! কি আশ্চর্য্য! নীলিমাকে পর্য্যন্ত নামটা বলেন নি তাই।

"ওর বাপ কিছু জানে না?"—নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

"তা, মানে—হ্যাঁ—সন্দেহ—জানেই ধরতে হবে। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি এখনও আমার কাছে। হ্যাঁ জানে বই কি—কাল আজ দু'দিনই যা লক্ষ্য করলাম তাতে তাই তো মনে হয়। কিন্তু কতটা জানে তাই আমাকে জানতে হবে। তাই আমি যেতে চাইছি এখুনি, আজ রাত্রে তার আসবার কথা আছে আমার বাসায়। আমি কিছুতে বুঝতেই পারছি না জানলে কি করে'—সমস্তটা জানা কি করে' সম্ভব! কিন্তু জেনেছে। পূর্ণ গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে যে জেনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই! কিন্তু আমার কথা জানলে কি করে? অপর্ণা খুব চতুর মেয়ে ছিল—কারও নাম বলবার পাত্রী সে নয়। তা ছাড়া জানই তো—স্বামীদের অদ্ভুত একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে স্ত্রীদের সম্বন্ধে। স্বর্গের দেবতাকে তারা বরং অবিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রীকে নয়। যুগলের তো কথাই নেই।

না, না, মাথা নেড়ো না—আমারই ষোল আনা দোষ তা আমি স্বীকার করছি। শুধু এখন নয়—বহুদিন থেকে স্বীকার করছি আমিই দোষী।··· সে যে সব জানে একথাটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ সকালে যে, তার কাছে আমি প্রায় স্বীকার করে' ফেলেছিলাম সব। কাল রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে এমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, এমন অভদ্র ব্যবহার করে বসেছিলাম—ছিছি কি যেন হয়ে গেল একটা! মদ খেয়ে এসেছিল লোকটা বুঝলে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়েছিল বলেই এসেছিল, বুকের জ্বালাটা চাপতে পারে নি—তার প্রতি কত বড় অন্যায় যে করা হয়েছে তাই জানাতেই এসেছিল—মানে, না এসে পারে নি। অন্যায়টা কে যে করেছে তা-ও সে জানে···সেই কথাটাই বলতে এসেছিল ···তা না হলে রাত দুপুরে অমন করে' আসার মানে হয় না কোনও। দোষ দিচ্ছি না তার···আমি হলেও ওই করতুম। কাল আজ দু'দিনই আমি গোপন করতে পারি নি নিজেকে। হড়বড় করে' কি সব যে বলে' বসলাম···আঃ! আর ঠিক এমন সময় এল যখন আমার মাথার ঠিক নেই। পাপিয়াকেও ঠিক যন্ত্রণা দেয় ও। আমার মনে হয় মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে···মেয়েটার ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে! হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে পারে ও···যদিও মানুষ নয়, একটা কীট-বিশেষ···কিন্তু বিষটুকু ঠিক আছে। আগে লোকটা ভদ্র ছিল—যদিও মেরুদণ্ড বলে' কিছু ছিল না। এই ধরণের লোকরাই উচ্ছন্ন যায় শেষ পর্য্যন্ত। আমি কোন অন্যায় করতে চাই না ওর ওপর—ওর যথাসাধ্য উপকার আমি করব। আমিই দোষী···আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে' দিলাম হয় তো। লোকটা সত্যিই বন্ধু বলে' ভাবত আমাকে। একবার বর্দ্ধমানে হাজার দুই টাকার দরকার হয়েছিল আমার—চাইবামাত্র দিয়ে দিলে একটা রসিদ পর্য্যন্ত চায় নি···বুঝলে···"

"আপনি বড্ড বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন"—নীলিমা বললেন—

"আপনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে আমার। পাপিয়াকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করব আমি—সে বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। কিন্তু অনেক কিছু গড়াতে পারে এর থেকে, আপনি সাবধানে কথাবার্ত্তা কইবেন তাঁর সঙ্গে—উচ্ছ্বাসের মুখে যা তা বলে' বসবেন না যেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

পুরন্দরবাবুকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও পাপিয়াকে নিয়ে এল বাগান থেকে। পাপিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে তাদের। পুরন্দরবাবুকে দেখে পাপিয়া মাথা নীচু করলে—লজ্জায় বোধহয়। পুরন্দরবাবু সকলের সামনে তার মুখচুম্বন করলেন, বারবার বললেন যে কালই তিনি যুগলবাবুকে নিয়ে আসবেন। পাপিয়া চুপ করে' মাটির দিকের চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে' সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে, মনে হল কি যেন বলবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

"কি, পাপিয়া"—

পাপিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তারপর তাকে নিয়ে ঘরের কোনে চলে গেল একেবারে।

"কি বলবে, কি হয়েছে—"

চুপ করে' রইল সে, যেন কথা বলতে পারছে না। নির্নিমেষে কালো চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে সমস্ত ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল ভয়—কিসের একটা আতঙ্ক।

"গলায় দড়ি দেবে···" চুপি চুপি বললে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

"কে গলায় দড়ি দেবে।"

"বাবা। কাল রাত্রে গলায় দড়ি দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে···কাল আমি দেখেছিলাম—"

"কি বাজে কথা বলছ"—মুখে একথা বললেও পুরন্দরবাবু মনে মনে বিস্মিত হলেন। হঠাৎ পাপিয়া তাঁর পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল··· কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি···কি করবেন ভেবে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে সে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পাপিয়ার এই মূর্ত্তিই আঁকা হয়ে রইল তাঁর মনে···ভবিষ্যতে স্বপ্নে জাগরণে এই মূর্ত্তিই দেখতে পেতেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর হিংসে হল। মেয়েটা সত্যিই কি বাপকে এত ভালবাসে? সমস্ত রাস্তা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এলেন। বুকটা পুড়ে যেতে লাগল। আজ সকালেই তো বললে যে সে মাকে খুব ভালবাসত। তাঁকে? তাঁকে বোধহয় ঘৃণা করে! বাবা গলায় দড়ি দেবে মানে? মাতালটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে না কি।···না, ব্যাপারটা জানতে হবে। আদি অন্ত তলিয়ে সব জানতে হবে—দেরি করলে চলবে না।

(ক্রমশঃ)

নয়নে তব প্রেমের দীপ জ্বলে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

পরাণ মোর পাগল করে একি তোমার হাসি
ফুলের মত ঝরছে অবিরল;
হৃদয় মূলে ছড়াও তুমি একি মুক্তা-রাশি,
এ কোন রূপে করছ ঝলমল্।
কেশ গুচ্ছে মেঘ-নিবিড় একি শীতল ছায়া
আঁখি আলোর একি অরুণ শিখা,
ঊষার মত জ্বলিছ তুমি, জ্বালছ মোর কায়া,
তরুণ চোখে একি নবীন শিখা।
হৃদয় মোর হারিয়ে গেল তোমার মাঝখানে,—
অন্তহীন মহাসিন্ধু তলে,
যেদিকে চাই আপন তব পরাণ মোর টানে,
নয়নে তব প্রেমের দীপ জ্বলে।

হসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

মাণিক আমাদের পরিচিত নন্দকে সঙ্গে করে' ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার। কি হে, কি খবর নন্দ?

নন্দ। আজ্ঞে—খ-খ-খবর ভালই। আপনার চি-চি-চিঠি পড়ে, চে চে চেয়ারম্যান সাহেব খু খু খুব খুশী। ত তখুনি ক্লা ক্লা-র্ককে ডে ডেকে, একটা ভা-ভালো দেখে টে টে টে—

ডাক্তার। হ্যাঁ বুঝেছি—টেথিস্‌কোপ আনতে হুকুম করলেন, —তারপর?

(নন্দর কথাগুলো যথাসম্ভব সোজাভাবেই বলে যাই)

নন্দ। কাগজে বেশ পরিষ্কারভাবে মোড়া একটি প্যাকেট এনে দিয়েই ক্লার্ক ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—"যেওনা দাঁড়াও, ওটা দেখবো,—খোলো।"

ক্লার্ক বললে—"কাজ ফেলে অমন সুন্দর করে বাঁধলুম Sir,—আবার—"

চেয়ারম্যান বললেন—"হ্যাঁ, আবার বাঁধলেই হবে।"

ক্লার্ক অগত্যা অনিচ্ছায় খুললে। একটা পুরোণো বাতিল (rejected) জিনিষ দেখেই সাহেব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মূর্ত্তি বদলে গেল।—"কোন্‌ দিয়া?"—

কম্পমান ক্লার্ক তখন কাঁপছে।—"হুজুর রামপ্রসাদবাবু।"

শুনে সাহেব বললেন—"রহিমবাবু হোনেসে ভি রেহাই নেহি হায়। চলো" বলেই উঠে পড়লেন। গিয়ে, দেখে শুনে এই নতুন যন্ত্রটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—"আপ লে যাইয়ে।"

—"সে মূর্ত্তির সামনে লম্বা সেলাম ঠুকে, পালিয়ে এসেছি মশাই। বুঝলুম—আগুন যখন লেগেছে তখন এ বোম ফাট্‌বেই"—

ডাক্তার বললেন—"আপিসের অভ্যাসের দোষ ভিন্ন আর কি বলবো। কারুর অনিষ্ট না হলেই ভালো। যাক্‌ আমার বড় উপকার করলে ভাই"—

নন্দ বললে,—"যা চে-চে-চেহারা দেখলুম, তা-তা-তার মধ্যে ই-ই ইষ্ট থাকতে পারে না মশাই। যাক্‌ এখন চ চ চললুম"—

(নন্দ চলে গেল)

মাণিক বললে—"রামপ্রসাদ একদিন যে ফ্যাসাদে পড়বে তা আমি জানতুম। ওষুধেও ভেজাল চালায়, ওর দেওয়া কুইনিন্‌ কাজ করে না,—কাজ করে বাজারে—"

"থাক্‌ মাণিক। ডাক্তারী পাস্‌ করে কি ভুলই করেছি। এখন না পারি হাঁড়ি বেচতে, না পারি বিড়ি পাকাতে। নোকরির চেয়ে বকরি বেচা ছিল ভালো।"

"এ আবার কোথায় এসে পড়লেন!"

"না ও একটা by product—ভাবতেই জগতে আসা কিনা। দেখছ না ছেলের আর তেলের নাম রাখতেই আকাশ পাতাল ভাবনা,—শব্দ-কল্পদ্রুমেও টান পড়ে। রবিবাবুও রেহাই পেতেন না, রামপ্রসাদ নামটী তো মন্দ নয়, কিন্তু ফ্যাসাদ ছাখো!"

"যার ফ্যাসাদ সে বুঝবে মশাই, আপনি বৃথা ভাববেন না"…

"বৃথা কি হে, যন্ত্র তো এলো—এ আবার কি মন্ত্র শোনাবে কে জানে। পোকার যে অন্ত নেই।"

"যত বাজে দুর্ভাবনা আপনার। শোনাবে আবার কি! সেবার যে সাইলেণ্ট ভাউয়েল ছিল—এবারে সে 'হাউয়েল' শোনাবে—দেখে নেবেন। এখন বরং একটা দুধওলা গায়ের সন্ধান করুন।"

"তুমিও যে বাজে কথা আনলে। জগতে 'গরুর' অভাব পেলে নাকি? তাদের সর্ব্বত্র পাবে। আমাদের তো গোকুলেই বাস। তুমি গরুর জন্যে ভেবনা। Grow food মানে ঘাস ছাড়া আর কি। মাড়োয়ারীদের বাড়ীর দু তিনটে case হাতে আছে—জীবনরামের জরুর কলেরিক ডায়েরিয়া, ভাবনা কি? গরু ঘরে বাঁধাই আছে।"

"তবে আর কি, আপনি একটু স্থির হোন, আমি রান্নাঘরে চললুম…" (মাণিক চলে গেল)

ডাক্তার একলা পড়ে গেলেন।—"এখন বসে বসে করি কি? মাণিক বোঝেনা, ভাবতে বারণ করে। আরে—ভাবনা আছে তাই বেঁচে আছি, Gold flake আর কতক্ষণ, ধরালেই শেষ। ভাবনার কি মাথা মুণ্ডু থাকে, তবু সে সঙ্গীর কাজ করে। সব কথার কি অর্থ থাকে! নাইবা রইল, তবু কইতে হয়। এই যে, আমরা রোগীদের বলে আসি—total rest নিতে। ওর চেয়ে অর্থহীন কথা আছে কি? গরীবের মাথায় তখন—মুদীর পাওনা ঘুরছে। বাড়িতে লিলিটে লাউডগার মত নিত্য বাড়ছে। বেতনের বাড় বছরে দরাজ দু টাকা! আপিসের মিষ্টার মিলারের 'কিলারের' মত মূর্ত্তি দাঁড়িয়েছে। নিজের ১০৩ ডিঃ জ্বর। কত ছুটাই বা দেবে! তার ইত্যাদি চিন্তা কি কথায় রুকবে!—Total rest,

বিশ্রাম তার মৃত্যুর পূর্ব্বে নেই। ওটা jest ছাড়া আর কিছু নয়। তবু তো বলি—বলতে হয়। কিন্তু অর্থহীন।"—

ওদিকে রন্ধনশালে গালে হাত দিয়ে মাণিক ভাবছে—"আশ্চর্য্য মানুষ, একটু চেষ্টা করলে কত টাকাই আনতে পারে, সে খেয়াল নেই। কিছু এলেও যা—না এলেও তাই। বোঝেন সব, ভাবেনও দিনরাত,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। টাকার কথা কি রোজগারের কথা কইতে তো একদিনও শুনলুম না। চাকরী করাটা যেন একটা কিছু নিয়ে থাকা মাত্র। এমন আত্মভোলা সরল খোলসা লোক তো দেখিনি। সামলে নিয়ে চলবার লোক সঙ্গে থাকা দরকার বলেই মনে হয়। দু'হাজারের ওপর এসে গেছে—খোঁজ নেই! ওসব কথা কইবার সুযোগও দেন না। আমি যে কি করবো—ভেবে পাই না। আমাকেও এমন করে ফেলেছেন, ওঁকে একঘণ্টা না পেলেই ছটফট করি, শান্তি পাই না। দেখছি ভগবানও এঁদের ভার নিজে না নিয়ে থাকতে পারেন না—তা না তো চলছে কি করে"—

মাঝে দুদিন ডাক্তার কেবল রুগী দেখেই বেড়িয়েছেন। খুঁজে খুঁজে দূরে দূরেও ঘুরেছেন,—তাদের সাহায্যও করেছেন। রোগীর সংখ্যাও ক'মে আসছে,—মাথাটাও ভাল আছে। বিনোদীকে মাছের ঝোলও খাইয়েছেন। বেলায় ফিরে এসে বললেন—"বুঝলে মাণিকলাল চোখ কেবল দেখেই না, দেখার জন্যেই নয়। কথাও কয় হে"—

"কোথায় দেখলেন মশাই? দেখলেন না শুনলেন?"

"একসঙ্গে দুইই হয়ে গেছে হে! সেই ১০ বছরের দুঃখী মেয়েটার চোখে কৃতজ্ঞতার নীরব ভাষা পেলুম। যারা দুধে ভাতে মানুষ, তাদের সহজলভ্য এডুকেশন আর উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট-গুলো অলঙ্কারের মত প্রায়ই ঝঙ্কার আর টঙ্কার দেয়। যাত্রায় রাণী কৈকেয়ীর অঙ্গে মুখর I mean 'খসখসে' বেনারসী। বেমানান বলছি না। তবে পরের বেড়ার বা বুদ্ধির মধ্যে বন্দী। মন্থরার কথা শিল্প-চাতুর্য্যেই সে সফল। কিন্তু যাদের কেতাবী খেতাব নেই—অভাবে, দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—মানুষ হয়—তারা ভগবানের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতি—নির্ভর করে দুর্ভর জীবন বেয়ে চলে, তাদের Educationএ শিক্ষার ভেজাল নেই—আপ্ত বাক্যের মত খাঁটি। জগৎকে তাদের হাতে হাতড়ে পাওয়া কিনা! দুঃখ যে পেলে না, তার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই মাণিক,—তার জন্মটাই বৃথা হয়ে"···

মাণিক অতিষ্ঠের মতো বলে উঠলো—"ডোবালেন ডাক্তারবাবু—ঝোলে যে মাছ ছেড়ে এসেছি। একদম ভুলিয়ে দিয়েছেন! এতক্ষণে বোধহয়—'ঝালদে মাছ' দাঁড়ালো।"

"ওঃ—সে খুব চলবে—বেশ চলবে। পুড়ে না গেলেই হোল।"

"দেখে আসি" বলে' মাণিকলাল চলে গেল।

ডাক্তার (আপন মনে)—"আশ্চর্য্য, বাসায় যখন ফিরলুম—পেট খাই খাই করছে, খিদেয় দাঁড়াতে পারছি না!—তারপর (ঘড়ি দেখে) তিন কোয়াটার কেটে গেছে,—সে কথা ভুলে গেছি! এই পেটের জন্যেই তো সব—চিন্তা, চেষ্টা, চাকরি, এস্তোক্ চুরি ডাকাতি খুন পর্য্যন্ত। সে খিদে গেল কোথা?"

মাণিকলাল হাঁকলে—"আর নয় মশাই, মাথায় একটু জল দিয়ে আসুন।"

"এই যে—এলুম বলে। আজ আর পুরো স্নান চলবে না। যাঁকে ভুলেছিলুম, তাঁকে বেড়ানেড়ে জাগিয়ে দিয়েছ দেখছি! খিদেটা আবার সবেগে এসে পড়েছেন।"

পাঁচ মিনিটেই তোয়ালে পরে এসে—আসন নিলেন। দু'চার গ্রাস মুখে দিয়েই—

"তুমি মিছে ভয় করছিলে মাণিক—ঝোলটার জল মরে আস্বাদ বেড়ে গেছে।"

"এখন তো তাড়া নেই—খা'ন ভাল করে।"

"হ্যাঁ তুমিও বসে যাও, বেলা আর নেই।"

"তা বসছি, কিন্তু বাজারে যে কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না মশাই"—

"ও অমন হয়, মাঝে মাঝে ডুব মারে। ডুব না মারলে যে রত্ন আসে না। পরে কালো বাজার আলো করে। মরুভূমে জল পাওয়া যায় না, কিন্তু উটের গলায় লুটের মাল পাওয়া যায় হে। মাড়োয়ারী ভায়ারা বেঁচে থাকুন, বলেছি তো—তাঁদের বাড়ি case আছে—মা ভালো করে দিন—ভেব না। চাল রাখবে কোথায়?"

"আজ্ঞে—পেলে তার উপায় হয়েই যায়।"

"না হে, ও জিনিস দশ সের করে আনাই ভালো, দুটো পেট বই তো নয়। বহু সাধু 'X' Ray নিয়ে ঘুরছেন—তাঁদের পাহাড়-ফোঁড়া দূরদৃষ্টি! শেষ half প্যাণ্ট না হারাতে হয়।"

"ভালো কথা, এদিকে যে আমার প্যাণ্টের খোল ভরাট! এইবার আপনার পালা"—

"তবেই হয়েছে! কোথায় ফেলে আসবো!"

"পেণ্টুলেন আবার ফেলে আসবেন কি?"

"হয়—হয়, সময়ে সবই হয়। আমার মায়ের মরজি হলেই হয়। পোড়া শোল পালায়, পড়নি? মনে করনা—মিছে। মিছে কথা লেখবার জন্য ব্যাসের মাথাব্যথা ধরেনি।—না হয় অনেকের জানা একটা ঘটনা, খেতে খেতেই বলি, শুনবে? বেশী দিনের—কথা নয়—"

"শুনব না?—বলেন কি হুজুর! শিক্ষা দীক্ষাও হয়নি, জানিও না কিছু। সত্য বলতে কি,—আপনাকে পেয়েই তো আমার শিক্ষা সুরু হয়েছে। কত কথাই শুনলুম, কত কি জানলুম। এ সুযোগ আমার ভাগ্যে আর কবে মিলেছে! প্রকাশ্যেই কি আর মনে মনেই কি, আপনাকে গুরু বলেই জেনেছি। আপশোষ হয়—সর্ব্বক্ষণ শুনতে পারি না—সময়ে কাজগুলো না সারতে পারলে আপনাকে যে ভোগাবার জন্যই আমার থাকা হয় মশাই"—

ডাক্তার—"তুমি না থাকলে আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকতো না, সেটা আমাকে একদিনও জানতে দাওনি মাণিক। তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দেই আছি। যাক্—এখন তবে শোন, আমি সংক্ষেপেই বলবো"—

—"হরিদ্বারে কুম্ভমেলা,—সেবারে পূর্ণকুম্ভ। হিমালয়ের উচ্চ শিখর ছেড়ে—বড় বড় সাধুরা, অর্থাৎ জীর্ণ, শীর্ণ, উলঙ্গ মহাত্মারা সব গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। তাঁদেরও বিধিমত সঙ্কল্প করে ডুব দিতে হয়। পাণ্ডারা তাঁদের কাছেও কিছু নিয়ে সঙ্কল্প করাচ্ছেন। দক্ষিণা না দিলে নাকি স্নানের ফল হয় না। একটি সাধুর কাছে কিছুই ছিল না। তিনি বলেন—"আমার যে কিছুই নেই বাবা।" পাণ্ডার সেদিন Mail day সক্ষিক্ষণ দেখবার শোনবার ফুরসুৎ নেই, অন্যের কাজ করাতে ব্যস্ত। সাধুর দিকে না চেয়েই বললে, "ঢুঁড়কে দেখিয়ে না—কুছ মিল্ যায়গা।" সাধু উলঙ্গ,—না ট্যাক না পাকিট্,—ঢুঁড়কে কি? বললেন—"পয়সা রাখকে হাম ক্যা করেঙ্গে,—হায় নেই বেটা।"—পাণ্ডা শেষ বিরক্ত হয়ে বললে—"কুছ দেনাই হ্যায়—পাত্তি, পাথর যো মিলে কুছ দিজিয়ে।"—"তোমার মঙ্গল হোক্"—বলে সাধু এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে তার হাতে দিলেন। পাণ্ডা বোধহয় সেটার মানরক্ষার্থে সেটা পকেটে ফেলে, সাধুকে সঙ্কল্প করিয়ে দিলে, তিনি ডুব দিয়ে উঠে গেলেন। পাণ্ডার পকেটগুলি পয়সার ভার আর সইতে পারছিল না, আগন্তুক আমদানিরও স্থানাভাব। সাধুও চলে গেছেন। পাণ্ডা তখন সাধুর দেওয়া সেই হাবাতে পাথরখানা তাড়াতাড়ি বার করে—"দূর হো" বলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—লোক্‌সেনে ভার কমিয়ে বাঁচলো। যখন সুবিধে হয় তখন সকল দিক থেকেই হয়। পাণ্ডা খোলসা হবার আরো একটা সুবিধে পেলে। একজন স্নানার্থী এসে—টাকা বার করে ভাঙানি পয়সা চাইলে,—সঙ্কল্প করবে।—পাণ্ডা হালকা হবার আশায় তাড়াতাড়ি পয়সা দিতে গিয়ে দেখে পয়সা নেই, সব সোনা যে! একি! তখন পাগলের মত সেই সাধুকে খুঁজতে ছুটোছুটি! তাঁকে আর কোথায় পাবে! শেষ সারাদিন, পরে কয়েকদিন পর্য্যন্ত, সেই পাথরখানি খুঁজতে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরে। সে কি আর মেলে!"

শুনে মাণিক আশ্চর্য্য! "পাণ্ডারা দিনরাত সাধু দেখে, সাধু একখানা বাজে পাথর দিতে পারেন কি, এটা তার মাথায় আসেনি!"

"তবে আর একটু শোন। ও অহঙ্কার কেউ করতে পারেন না। জানা জান্তো জিনিষও অনেকে ফেলে দিয়েছেন। মহারাজা দুষ্মন্তের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিশারদ রাজাও—দুর্লভ প্রেম বিনিময়ে পাওয়া শকুন্তলাকে দেখে যিনি পাগল হয়েছিলেন, দু'দিন পরে সেই প্রাণসমা পত্নীকে দেখে তিনি চিনতে পারেন নি। সভার মধ্যে তাঁকে অকথা কুকথা বলে, অপমান করে ফেলে দিয়েছিলেন। পাথরকে নয়, জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমাকে—নীরবে নয়, পূর্ব্বকথা সব শুনেও?—কি বলবে? প্যাণ্ট ফেলতে কতক্ষণ হে! জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নয় মাণিক।"

মাণিকলাল মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"গ্রহের কাজ ছাড়া আর কি বলবো।"

"Yes—come round—পথে এসো। গ্রহ মানো তো? তাঁকে তো আমরা আন্দামানে ফেলে আসিনি,—তিনি সঙ্গেই আছেন। যাক্—কথা বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আহারটাও। আবার তুমি শুনিয়েছ—চাল বাড়ন্ত! থাক—আমাদের চিঠির কথা ফুরোয় নি, সে ফ্যাসাদ সম্বন্ধে যা করবার তুমি যা ভাল বোঝ কোরো, আমাকে জড়িও না। হ্যাঁ,—এখনো কি যুধিষ্ঠির দিচ্ছে নাকি? কি সত্যবাদী হে! মা বাপ ছেলের নামকরণে ভুল করেন না দেখছি। ভেব না, এখানে আমাদের স্থিতি আর কর'দনই বা, প্যাণ্টের বোঝা বাড়াবার ভয় নেই"—

মাণিক মনে মনে আওড়ালে—"সব উলটো বোঝেন।" বললে—"আজ্ঞে আর দু'তিনটে instalment হলেই"—

"হলেই যুধিষ্ঠির বাঁচে বুঝি!"

"আজ্ঞে না হুজুর,—একটু কারণ হয়েছে কি না—তাই"···

ডাক্তার ব্যস্ত ভাবে,—"Loss দিতে হচ্ছে নাকি?"

"রসের কারবারে Loss আবার কি মশাই"

"বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে নাকি?—ওদের বাড়িতে আবার ডাকাতি করবে কারা?—ওরাই তো সর্দ্দার"—

"আজ্ঞে না, সে সব নয়।"

"তবে আবার কেনো?"

মাণিকের ইচ্ছা ছিল না কথাটা—কি মুস্কিল, এমন মানুষও দেখিনি—টাকা রোজগারে আবার 'কেনো' থাকে নাকি?—শেষ বলতেই হোল—"আজ্ঞে কুমারসম্ভবের খবর পেয়েছে কিনা। বলে—ডাক্তার সাহেবের যে খরচ রয়েছে অনেক।"

"এ খবর তাকে কে দিলে?—তারই বা এত দুশ্চিন্তা কেনো! কী পাপ—"

"পাপ কি মশাই! সুসংবাদ যে হাওয়ায় ফেরে, দেবার লোকের কি অভাব আছে?"···

সে তো মথি লিখিত সুসংবাদ হে—যা হাটে বাজারে নেচে ঘোরে। সে সব দেবতাদের কথা, যাঁরা সবার হিতার্থে আসেন··· মাণিক। "ভাগ্যবান ছেলেরাও বাপমাকে কষ্ট দিতে, দুর্ভাবনায় ফেলতে আসে না মশাই। তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে আসে বেশী নয়, যুধিষ্ঠির মাত্র গোটা দুই Instalment বাড়াতেই বলে। বিষয়ী লোক সব দিক ভাবে কি না। তারও তা'হলে এখানকার Contract বোধকরি শেষ হয়।"

"হলে যে বাঁচি, কি জালেই জড়িয়েছে!—বেশ ছিলুম, আবার মাথাটা ঘোলালে দেখ্‌ছি। এতো ভবিষ্যৎও তোমরা ভাবতে পারো!"

"মাপ করবেন হুজুর, আপনার চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎটা অনেকটা খাটো।—একখানা চালা বাড়ানো, না হয় রান্নাঘর সারানো পর্য্যন্ত। বিশ বছর পরে ছেলেকে ভিয়েনায় না কোথায় পাঠিয়ে সার্জ্জন বানাবার কথা মাথায়ও আসে না মশাই।"

ডাক্তার হো হো করে হেসে বললেন,—"ওসব শোন কেনো,—আমারি কি আসে! ওটা মধ্যবিত্তের বাঁচবার বিত্ত—আত্মপ্রসাদ হে! লম্বা লম্বা খেয়াল ভেঙ্গে বেশ থাকা যায়। কারুর অনিষ্টকর কিছু না হলেই হল। কিন্তু তাও হয় মাণিক! পরিবার তাতে বিগড়ে থাকেন—সুখী হন না। তাঁদের কাছে বসে—সংসারের কথা, অভাবের কথা শুনতে পারলেই খুশী। তখন বলেন—"অমুকের বৌভাতে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না—কি দেবে বলো দিকি!—ওদের জামাই এসেছে, কি মিষ্টি গলা! তাই কি ছাই বাড়ীতে একটা হারমোনিয়ম আছে, একদিন খেতে বলে শুনতুম।" ইত্যাদি শোনা যায় বলো!—থাক্, মনে আছে তো—কাল আবার সেই ক্ষুধিত পাষাণের ভাষা শুনতে যেতে হবে। নতুন T. E. টা রাখলে কোথায়? তোমার অইপোকা না আবার আঁতুড়ে খোঁজে!—উঠে একটু rest নিতে হবে—load আহারটা বেশী হয়ে গেল। হ্যাঁ, তোমার ঐ ও কথাটা—Instalment এর হে—পাষাণ ভেদের পর হবে—কি বলো!

(উঠে পড়লেন)

মাণিকের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হাত গুটিয়ে ভাবতে লাগলো—"কি অদ্ভুত লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে! যুধিষ্ঠিরের Contract শেষ হচ্ছে শুনে বলেন "বাঁচা গেল"! টাকা আসাটা যে বাঁচবার মহৌষধ, সে খেয়াল নেই। প্যাণ্ট যখন খালি পেটে ঝল্ ঝল্ করে ঝুলবে, তখন যেন আরাম পাবেন! এ লোক নিয়ে পরিবার সুখী হবেন কি—পাগল যে হয়ে যান না—সেইটাই আশ্চর্য্য! আমরাই সামলাতে পারি না!—"

"—বোঝেন কিন্তু সব—নিজেও সামলাতে পারেন না। ভাবেন সবই ঝঞ্ঝাট। কথা কিন্তু একটিও ভুল বলেন না,—লাগেও বেশ। থাক্—এখন রইলো। অনেক কাজ, আমিও সামলাতে পারছি না।"

* * * * *

পরদিন প্রভাতে মাণিক ঘুম ভাঙালে।—"এখনো ঘুমুচ্ছেন নাকি? উঠে মুখটা ধুয়ে ফেলুন—চা প্রস্তুত।"

ডাক্তার উঠে পড়লেন—"তুমি দেখছি একটি wonder—কখন শুলে তাও জানি না, কখন উঠলে তাও জানি না—আবার চা'ও প্রস্তুত। স্বপ্ন নাকি!—দেখ মাণিক—আগে আগে চা'টা খেতুম, এখন ভাবছি ওটা খাবার জিনিষ নয়, ঘুম ভাঙাবার একটা উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়ে যে কি হয়, তা আজো বুঝলুম না, একটা বদ অভ্যাস মাত্র। ছেড়ে দেওয়াই ভালো, উচিতও।"—

"আজ তো খান,—করে ফেলেছি।"

পাতলা প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস টেনে ডাক্তার বললেন,—"বুদ্ধিমানেরা কেমন পাতা সেদ্ধ খাইয়ে মাথা খেয়ে দিয়েছে—না হলেও একদিন চলে না! জঙ্গলের মধ্যে তো বাস, দেশে পাতার তো অভাব নেই—অভাব কেবল বেস্পতির দশার, তিনি পশ্চিম মুখো!—দূর হোক্—দাও, খেতে তো হবেই।" মুখ ধুতে গেলেন।—

মাণিক মনে মনে হাসতে হাসতে—"ঘুম না ভাঙতেই ডাক্তার বক্তার হলেন! কতক্ষণে থামবেন—জানি না।" আনতে গেল।

ডাক্তার। "এই যে এনেছ,—দাও।"

সন্ধ্যাকালে প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি

প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এক সন্ধ্যাকালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহ প্রথম সাক্ষাৎ। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৎকালীন ক্ষুদ্র কারখানার দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র গৃহে। উহাই তাঁহার শুইবার, খাইবার ও পড়িবার ঘর। পাশের একটা অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে কতকগুলা আলমারি ও টেবিল চেয়ার ছিল। সেটী কারখানার মিটিং গৃহ। মিটিংর সময় বাদ উহা প্রফুল্লচন্দ্রেরই অধিকারে থাকিত। এ সময়ে তিনিই কারখানার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। অধ্যক্ষ গিরিশ বসু মহাশয়ের দত্ত পরিচয়-পত্র সঙ্গে ছিল, দেখা করিতে কোনও অসুবিধা হয় নি। বলিলেন, যখন আসবে এই সময়েই আসবে। এইটা আমার লোকের সহ গল্প করিবার সময়। সকালে এলে মার খাবে। সেদিন—আসিয়াছিল দেখা করিতে, সকালে,

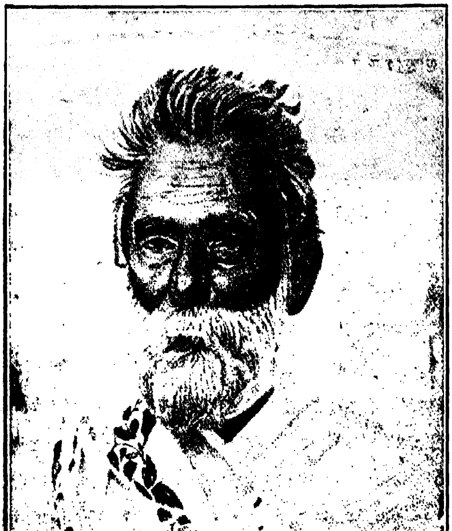

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

তাকে দূর দূর করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম! সকাল বেলাটাই আমার কাজের সময়—পড়া ও লেখার সময়। যদি রোজ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৩ ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিয়া যাও—দেখিবে কয়েক বৎসর পর অনেক কাজ হইয়া গিয়াছে। আমরা দুজনে ছিলাম—আমি ও সতীশ মুখোপাধ্যায় (পরে প্রফেসার)।

কিছুকালের মধ্যেই আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধ ময়দান ক্লাবে ভর্ত্তি হই এবং প্রায় ২০ বৎসরের উপর উহার সভ্য ছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়—অতি দুর্য্যোগ ব্যতীত সেখানে যাইতাম। ঐ সভায় প্রফুল্লচন্দ্রই সকলের প্রধান আকর্ষণ; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করা বা তর্ক করা পরম উপভোগ্য ছিল। অপর দুই প্রধান পাণ্ডা ছিলেন অধ্যক্ষ গিরিশ বসু, রাজনীতিক সত্যানন্দ বসু। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মাঝে মাঝে নিয়মিত আসিতেন, আবার মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হইতেন। বলিতেন কাজের জন্য আসিতে পারেন না। হেরম্ব মৈত্র মহাশয় দুই একবার আসিয়াছিলেন। একজন তাঁহার সহিত বার্ণার্ডশর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা ক'রে। মৈত্র মহাশয় যেন তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। বার্ণার্ডশ তৎকালে নিম্ননীতিক সাহিত্যিকের মধ্যে গণ্য হইতেন অনেকের কাছে। এখন অবশ্য নীতির তৌলদণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই একবার আসিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প সকলেই উপভোগ করিত। তাঁহার একটি কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালা দেশের সকল বড় লোকেরই ধুরধুরি নেড়েছি, কেবল তিনজনের নিন্দা চেষ্টা করিয়াও পারি নাই, সে তিনজন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী ও কিশোরী চৌধুরী।

মতিলাল ঘোষ মহাশয় দু একবার আসিয়াছিলেন। একবার তিনি অহিফেনের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। তিনি নিজে আফিং খাইতেন, বলিতেন একটু বয়সে আফিং ধরিলে শরীর ভাল থাকে। আমরা তখন তাহার খুব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন এই সভার একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহার শরীরটা তখন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মনের খুব বল ছিল—এবং স্বদেশপ্রীতি ছিল। নিবারণ রায় (অধ্যাপক) কথন কখনও আসিতেন। তিনি একজন মডারেট রাজনীতিক ছিলেন। সেন মহাশয়ের সহিত তাহার ভীষণ তর্ক আমাদের আনন্দ দিত। নারীশিক্ষা সমিতির কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ও একজন স্থায়ী সভ্য ছিলেন। আর সকল ছোকরার দল ছিল। ইহারা এখন সকলেই নানা বিভাগে খুব বড় বড় লোক:—নীলরতন ধর, দেবপ্রসাদ ঘোষ, জ্ঞান ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান মুখার্জী, হেমেন সেন, প্রিয়দারঞ্জন রায়।

উপেন সেন ও গিরিশবাবু নিজ নিজ মোটরে আসিতেন। ডাক্তার রায়ের এক ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আমরা তখন তাহাকে ডাক্তার রায় বলিয়াই ডাকিতাম। পরে সার পি সি রায় এবং আরও পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নাম প্রচলিত হয়। ডাক্তার রায়ের অশ্বটি আমাদের কৌতুকের ও কৃপার পাত্র ছিল। কৌতুকের পাত্র—রায়ের মতই তাহার শীর্ণ দেহ এবং কৃপণ জীবন যাত্রাপ্রণালী ছিল। সায়াহ্ন কলেজের ঘাস-মাঠে তাহার বার আনা আহার্য্যপ্রাপ্তি হইত। কৃপার পাত্র—ডাক্তার রায়ের মাঝে

মাঝে এত সাঙ্গোপাঙ্গ তাহাকে বহন করিতে হইত যে তখন সকলেই তাহাকে কৃপা করিত।

ডাক্তার রায়ের জীবনে আমরা দুইটি বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিয়াছি। একদিকে দানশৌণ্ডতা, অপরদিকে নিষ্কপট কার্পণ্য। কথাটা লিখিতে একটু সঙ্কোচ হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত লিখিবার সময় অত্যন্ত অত্যুক্তি করা হয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির জীবনে এরূপ অত্যুক্তি দেখিয়াছি। সাহিত্যিকরা বোধ হয় প্রথাটা সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। পণ্ডিত কোনও ভূস্বামীর নিকট কিছু অর্থের প্রার্থী হইয়া গমন করিয়া একটি শ্লোক পাঠ করিতেন। তাহাতে জমিদারকে পৃথিবীপতি, ভীষ্মের মত চরিত্রবান, ভীমের মত বাহু-বলযুক্ত, অর্জ্জুনের মত প্রচণ্ড বীর এবং কর্ণের মত দাতা এইরূপ বর্ণনা থাকিত। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট পৃথিবীপতি ও দাতাকর্ণের নিকট হইতে ৫।১০ টাকা পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়া প্রস্থান করিত। এরূপ অত্যুক্তির নমুনা হঠাৎ বররুচি কৃত পত্র কৌমুদিতে (শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত) পাইলাম ;—সবটা দিবার স্থানাভাব, সামান্য একটু দিলাম। রাজাকে—স্বস্তি গীর্ব্বাণচয় চূড়ারত্নরাজি রোচিশ্চুম্বিত চন্দ্রচূড়চরণনখেন্দু……বিষমসমরসঙ্করৎ…বিদ্বদ্দারিদ্র্য বিদ্রাবণ দ্রবিণরাশি বিশ্রাণনসমুপার্জ্জিতোর্জ্জিত যশোমালাবলি…।

উপন্যাস সাহিত্যেও এই অত্যুক্তিবাদ আসিয়াছে। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যেও এই অত্যুক্তি বাদ ছিল না। নিজেকে সিংহের কাছে বা পক্ষির কাছে বলি দেওয়া ছিল ; পুত্রকে বধ করা বা দাসত্বে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুরাণ সাহিত্যে উপসংহারে ঐ উৎকট কর্ম্মগুলির ভাল পরিণাম দেখান হইত। বর্ত্তমান যথার্থবাদ (realistic) যুগে মৃত মানুষকে ফিরাইয়া আনা যায় না—কাজেই ত্যাগের বা ক্লেশ স্বীকারের বীভৎসতাই থাকিয়া যায়, পুরস্কারের মাধুর্য্য থাকে না। একখানি নব-যুগের উপন্যাস পড়িতেছিলাম। তাহার ভাল চরিত্রগুলির ভাগ্যে বিশ্বের যত দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়িয়াছে—পুত্রের নিধন, স্ত্রীর মৃত্যু, গৃহদাহ, বন্যা ইত্যাদি। আদর্শগুলি যদি অত্যুৎকট ত্যাগ ও ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন হয়, কি অলোকসামান্য গুণাবলিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করা যায় কিন্তু তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার স্পৃহা দমিয়া যায়।

মনোরঞ্জন গুহের স্বদেশী আমলের বহু গল্প ছিল। উর্দ্দীপরা এক পাহারাওয়ালা এক মোট লইয়া থানার দিকে যাইতেছিল। পথে এক চাষাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ব্যাটনের খোঁচা দিয়া নিজের মোট বাহকের কার্য্যে বাহাল করিল। চাষা বলবান, কিন্তু পাহারাওয়ালার পাগড়ী, জামা, জুতা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। পথিমধ্যে এক পুষ্করিণী দেখিয়া পাহারাওয়ালার স্নানের ইচ্ছা হইল। স্নান সারিয়া পোষাক পরিয়া সে চাষাকে মোট লইতে হুকুম করিল। চাষা সমস্ত দেখিয়াছে। বলিল আর তোমার হুকুম মানিব না—দেখিলাম তুমিও ত একটা আমারই মত মানুষ। পাহারাওয়ালা রুল দিয়ে তাহাকে মারিতে গেল, চাষা তাহাকে এক ধাক্কায় ভূপতিত করিয়া চম্পট দিল।

মহাপুরুষদের চরিত যদি অত্যুক্তির ভাষায় লেখা হয় তাহাতে লোকের তাহাকে পূজা করিবার স্পৃহা হয়, অনুকরণের চেষ্টা হয় না। আর শেষোক্ত চেষ্টা দ্বারাই দেশের অধিক উপকার হয়। অত্যুক্তি একপ্রকার মিথ্যা ভাষণ—মিথ্যা দ্বারা স্থায়ী শুভ হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই টিকিয়া যায়। শ্রেয় সত্যের দ্বারাই লব্ধ হয়।

ডাক্তার রায়ের যে কার্পণ্য দোষের কথা লিখিলাম তজ্জন্য যাহাতে ভক্ত ক্ষুব্ধ না হয় সে উদ্দেশ্যেই এইটুকু লেখা। তিনি নিজেও স্বীয় কার্পণ্যের কথা বলিতেন এবং তৎসম্বন্ধে সমালোচনায় কৌতুক অনুভব করিতেন। একটা গল্প নিজেই বলিতেন। এক সময় মফঃস্বলে একটা রেলষ্টেসনে ওয়েটিং-রুমে ইজিচেয়ারে শায়িত আছেন। শীতের রাত, গায়ে তাঁহার অতি পুরাতন জীর্ণ একটা ওভারকোট। এক সাহেবের চাপরাশি মালপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া ডাক্তার রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার শ্যামল শীর্ণদেহ, দাড়ি, ও জীর্ণ ওভারকোট দেখিয়া তাহাকে নিজের সমব্যবসায়ী ঠিক করিল। পাশের চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা সাব কব আয়েগা। রায়ের কৌতুক লাগিল। তিনি তাহার ভ্রম না ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন।

ডাক্তার রায় অসাধারণ মানুষ ছিলেন। আবার তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাহার মত বিদ্যা বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন বহু লোক ও ছাত্র দেখিয়াছি। অথচ তাহাদের এত উর্দ্ধে তিনি উঠিয়া গিয়াছেন কি প্রকারে? তাঁহার অসাধারণত্ব ছিল ইচ্ছা শক্তিতে। গীতায় বলে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ"। মানুষের ইচ্ছা যখন একদিকে কাজ করে তখনই তাহার ফল দেখা যায়। পরস্পরবিরোধী বহু ইচ্ছা যাহাদের, তাহারা আর সময়ের বুকে নিজেদের পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। তিনি প্রথমেই আমাদের বলিয়াছিলেন যে কোনও একটা উদ্দেশ্য লইয়া যদি প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা কাজ করিয়া যাও, কয়েক বৎসর পরে দেখিবে অনেক কাজ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া যাইব এই দুর্দ্দান্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে এত বড় করিয়াছিল। আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সকল সময়ই দণ্ডায়মান হইতেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা তিনি একটা বিরাট অন্যায় ভাবিতেন। আর্থিক পরাধীনতা নিবারণের জন্য তিনি ছাত্রগণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রবৃত্তি আনিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ-জীবনে দরিদ্রের দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হইতে দেখিয়াছি। তাহার নিজের উপর বিবিধ কার্পণ্য-পরীক্ষা দরিদ্রের শিক্ষার জন্যই হইত। কেবল শরীর অপটু ছিল বলিয়া বিবিধ খাদ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ যাহা তিনি দিতেন নিজের উপর চালাইতে পারেন নাই।

দেশের সামাজিক রীতি-নীতি অন্যায় ভাবিয়াই তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে তিনি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া তাঁহার মাঝে মাঝে কবিরাজের সঙ্গে তর্ক বাধিত। কবিরাজ বলিতেন—আপনি যা বলুন না কেন ব্রাহ্মণরা যেস্বার্থপর ছিলেন

একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্রাহ্মণরাই তথনকার ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিল। যা কিছু অর্থ বা ক্ষমতার কার্য্য তারা অন্যদের দিয়াছিল। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়দিগকে রাজকার্য্য—বৈশ্যদিগকে ব্যবসা—বৈদ্যদিগকে অর্থকরী চিকিৎসাবিদ্যা দিয়াছিলেন। নিজেদের জন্য ত রেখেছিলেন ভিক্ষা। যাই বলুন—বেদ বেদান্ত অন্য কেউ পড়তে যেত না—কারণ তাতে টাকা ছিল না। ব্রাহ্মণরাই দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়া ঐ সকল জ্ঞান যে পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া আমাদের জন্য এ যুগ পর্য্যন্ত আনিয়াছেন তজ্জন্য সকলেরই উঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ডাক্তার রায়ের এক শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলাম। এক ভদ্রলোক তাঁহার ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এই অত্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। আমরা—যারা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাহাদের কাছে সমস্তটা যেন কেমন খাপছাড়া লাগিল। সুদীর্ঘদিন তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। স্বদেশভক্তির বক্তৃতা দিয়াছেন, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কর বলিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, সমাজ সংস্কার কর বলিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন কিন্তু কোনও ধর্ম্ম বক্তৃতা—ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা তাহার কাছে শুনি নাই। একবার যেন তাহাকে Martineaur এক ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে দেখিয়াছিলাম; তার চেয়ে ঢের বেশী পড়িতে দেখিয়াছিলাম —Leckyর History of Rationalism in Europe এবং Bucklea History of Civilisation. ঐ দুই বই ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক রাখে না—উল্টোভাবে ছাড়া।

গড়ের মাঠে তাহার সহিত অনেক সন্ধ্যা কাটিয়াছে। তাহাদের বেশীর ভাগই মনের উপর এখনও (২০।২৫ বৎসর পরে) স্মৃতির ছাপ রাখিয়া যায় নাই। কিন্তু একটি সন্ধ্যার স্মৃতি—উজ্জ্বল রহিয়াছে। সে স্মৃতি এখন মধুর—কিন্তু তখন ভয়াবহ ছিল। যে বিপদ কাটিয়া যায় তাহার স্মৃতি মধুরই থাকে। সেদিন গিরিশবাবু বোধ হয় আসেন নি। ডাক্তার রায় ও কবিরাজ আসিয়াছিলেন। যুবকদের কে কে আসিয়াছিল ঠিক মনে পড়িতেছে না। ৪।৫ জন ছিল। সহসা আকাশে মেঘ ও ঝড়ের আবির্ভাব। এরূপ স্থলে সময় থাকিলে বড়রা নিজ নিজ গাড়ির দিকে এবং অন্যরা ট্রামের দিকে ধাবিত হইত। তা না হলে একটা খেলার তাঁবুতে আশ্রয় লওয়া হইত। ঝড়ের বেগ এত বেশী এবং এত ধুলা উড়িল যে চলা দুর্ঘট হইয়া পড়িল। কবিরাজের শরীরটা ভাল ছিল না; তিনি কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া টেন্টে লইয়া যাওয়া হইল; রায়কে কোনও সাহায্য করিতে হয় নাই। এখন ভীষণবেগে ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল। উপরে গাছের ডাল যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাঁবু যেন উড়িয়া যায় মনে হইতে লাগিল। ছিন্ন তাঁবুর ছিদ্র দিয়া দুই একটা শিলও আসিতে লাগিল। কবিরাজ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল। দুইটী বালতী যোগাড় করিয়া বড় দুইজনের মাথায় দেওয়া হইল এবং পরে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান ভাবিয়া দুটি টেবিলের তলে বসান হইল। আমরা মুখসাপট করিতে লাগিলাম—হালকা তাঁবু যদি ভেঙ্গে পড়ে ত কয়েকজনে মিলিয়া ধরিয়া থাকিব। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হয় নাই। খানিকক্ষণ পরে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল। একটি যুবক সিক্তদেহে ও বসনে ধীরে ধীরে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে অক্ষতদেহ দেখিয়া পরমানন্দিত হইলাম। সে একটা নালার মধ্যে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত দেহ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া শিলাবৃষ্টি ভোগ বা উপভোগ করিয়াছে।

গাড়ীতে না উঠা পর্য্যন্ত কবিরাজের আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল। নিরাপদে সেখানে উঠিয়া তিনি পরম আনন্দলাভ করিলেন। এই বিপদে অব্যাহতি পাইয়া (কারণ পরদিনও তাঁহার পীড়ার কোনওরূপ উগ্রতা বৃদ্ধি হয় নাই) কবিরাজ আমাদের উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে একদিন সন্ধ্যায় প্রচুর খাদ্যসম্ভার মাঠে আনিয়া সকলকে পরিপাটিভাবে খাওয়াইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ইহা তাঁহার বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

প্রণমি তোমায়

শ্রীশান্তশীল দাশ

গভীর তিমির রাত্রি, নিস্তব্ধ ধরণী,
রুদ্ধ কারাগার হ'তে ক্রন্দনের ধ্বনি
ভেসে আসে, মিশে যায় আকাশে, বাতাসে,
কাতর সে আর্তনাদ; ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে
জানায় বন্দিনী নারী—'শৃংখলের ভার
মুক্ত কর্—সহিতে যে পারি না ক' আর !'
কত যাত্রী আসে যায়, নীরবে কেবল
বন্দিনী জননী লাগি' ফেলে আঁখিজল,
লৌহ শৃংখলের ভার নয়নের জলে
ছিন্ন হ'ল না ক' হায়, গেল সে বিফলে।

সহসা কে তুমি বীর ! ভাস্বর বয়ান,
অমার আঁধার ভেদি হ'লে আগুয়ান;
দীপ্তমুখে এলে যেথা বন্দিনী জননী
আপন দুর্ভাগ্য বহি' যাপেন রজনী
নীরবে আনতমুখে; পরশি' চরণ
কহিলে, "মা তোর দুঃখ করিব হরণ
শপথ করিনু আমি; ও লৌহ শিকল
মুক্ত ক'রে দেব মাগো, মুছ আঁখিজল !"
জননী নীরবে শুধু চাহি' তার পানে
বর্ষিলেন স্নেহাশীষ প্রসন্ন নয়ানে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভ্যানের ভিতরাংশ। পরদিন সকাল দশটা। গাড়ীর ভিতরে দু'ধারে বসবার সীট। সীটের ওপরে একটা পুরোনো সুটকেশ। একধারে দরজা, তার উল্টো দিকে জানলার মত কাটা। আর সব বন্ধ। সেই জানলা দিয়ে ভিতরকার লোক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে পারে। গাড়ীর মধ্যে চালের সঙ্গে ফিট করা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে।

একটু পরে ফণী ঢুকল। হাতে একটা ব্যাঙ্কের ব্যাগ।

ব্যাগটা সীটের উপর রেখে দিল

ফণী। উঠে আসুন গিরীনবাবু। দেরী করছেন কেন?

আর একটা ব্যাঙ্কের ব্যাগ নিয়ে গিরীন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীতে উঠল

গিরীন। এই যে—

(সীটের উপর ব্যাগ রেখে দিল)

ফণী। কি হ'ল?

গিরীন। উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে।

মুখ বিকৃত করে পায়ে হাত বুলোতে লাগল

ফণী। খুব লেগেছে?

গিরীন। ভয়ানক।

ফণী। (ভ্যানের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে) আপনার আজ কি যে হয়েছে—

গিরীন। কে জানে কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলুম—

ফণী। (জানলার কাছে গিয়া) শোভা সিংহ—

শোভাসিং। (জানলা দিয়ে মুখ বার করে) জী—

ফণী। তুমি এইবার চলো। একবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কা সামনে দাঁড়ায়েগা, বুঝা?

শোভাসিং। জী হুজুর।

মুখ টেনে নিয়ে শোভাসিং জানলা বন্ধ করে দিলে। এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করল

ফণী। যাক্, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে—

গিরীন। (পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) ভয়ানক লেগেছে—

ফণী। (শ্লেষের সঙ্গে) ভাঙ্গে নি তো!

গিরীন। ভাঙ্গো ভাঙ্গো হয়েছিল—

ফণী। সামান্য একটু ছড়ে গিয়ে থাকবে।

গিরীন। কালসিটে পড়ে গেছে।

ফণী। ক্রমাগত পা নিয়ে টানাটানি করবেন না। ওতে ব্যথা আরও বাড়বে। ব্যাঙ্ক অর্ডারটা সঙ্গে এনেছেন তো?

গিরীন। এনেছি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফণীকে দিয়ে আবার পায়ে মন দিল

ফণী। খালি পা ঘষছেন কেন? একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকুন, ব্যথা অনেক কম মনে হবে। আমার দাঁতে ব্যথা হলে তাই করি।

গিরীন। কিন্তু এতো দাঁতে ব্যথা নয়, এ যে পায়ে ব্যথা।

ফণী। (কাগজ দেখে) ত্রিশ হাজার পাঁচশ সত্তর—

গিরীন। ব্যাগ খুলে চেক করা হ'ল না তো?

ফণী। ব্যাঙ্কের লোক করে দিয়েছে।

গিরীন। তবুও আমাদের একবার—

ফণী। ভুল পেমেণ্ট কেউ করে না। ওরা ব্যাগে ভরবার আগে চেক করে দেয়। ওয়ার্কশপে গিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে।

গিরীন। যদি সেখানে গিয়ে দেখা যায় শর্ট পড়েছে।

ফণী। পড়বে না। (কাগজটা পকেটে রেখে) ত্রিশ হাজার! এত টাকা কোন সপ্তাহে আমরা নিয়ে যাইনি।

গিরীন। না।

ফণী। বড় ঝুঁকির কাজ। এই শেষবার—তার পর আর নয়।

গিরীন। শেষবার!

ফণী। হ্যাঁ। এরপর থেকে ওয়ার্কশপ নিজেদের টাকা নিজেরা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। এতে আমাদের মেহনত বাঁচবে, আর রিস্কও কমে যাবে। এতগুলো টাকা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার মধ্যে দিয়ে আনাগোনা—তার ওপর হাওড়ার পুলে যা ভীড় থাকে, প্রায়ই ট্যাক্সি জ্যাম হয়ে যায়—

গিরীন। আচ্ছা, যদি কখন কিছু হয়, মানে এই চুরি—

ফণী। হওয়া শক্ত। আজ এগারো বছরের ওপর আমি এ কাজ করছি—

গিরীন। তা জানি, তবুও কিছু বলা তো যায় না।

ফণী। কেউ একাজে হাত দিতে সাহস করবে না। তা ছাড়া, দেখেছেন?

পকেট থেকে একটা জিনিষ বার করল

গিরীন। কি?

ফণী। নাম জানি না। চোরাবাজার থেকে কিনেছি। তারা বললে "জেপ্পো"।

গিরীন। এ দিয়ে কি হবে?

ফণী। কাউকে মারলে এটার মাথায় চাপ পড়বে। ভেতর থেকে ছুরীর মত বেরিয়ে তখুনি ফুটে যাবে।

গিরীন। আমি এ রকম জিনিষ তো আগে কখনও দেখি নি—

ফণী। এর এক ঘা খেলে যে কোন লোক একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

গিরীন। ওটা কি সব সময় সঙ্গে থাকে?

ফণী। না। যেদিন টাকা নিয়ে যাই, শুধু সেই দিন সঙ্গে নিই।

গিরীন। ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু থাকে না?

ফণী। এ রকম কিছু না থাকলেও সীটের তলায় একটা স্প্যানার আছে। তাতে যে কোন লোককে এক ঘায়ে খুন করে ফেলা যায়।

গিরীন। হ্যাঁ, একদিন স্প্যানার দেখেছিলুম বটে। চাকা খোলবার সময়—

ফণী। হ্যাঁ। তা ছাড়া লোকটার গায়ে যা জোর আছে—

গিরীন। তা আছে। শিখ কিনা!

ফণী। তার ওপর আবার আমাদের গাড়ীর পিছন পিছন একটা পুলিশকার—

গিরীন। (চমকে) পুলিশকার!

ফণী। হ্যাঁ।

গিরীন। কেন, পথে কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা—

ফণী। না, না। সে রকম কিছু নয়। এ তো বহুদিন থেকেই চলে আসছে—

গিরীন। কই, আমি তো জানতুম না!

ফণী। এ কথা তো সকলকে বলে বেড়ানো হয় না। সেই একবার ড্রাইভার বলেছিল আমাদের গাড়ী কয়েকজন লোক ফলো করছিল, সেই থেকেই এই বন্দোবস্ত।

গিরীন। সেই থেকে প্রত্যেকবারই পুলিশের গাড়ী পিছনে থাকে?

ফণী। হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক থেকে ওয়ার্কশপ পর্য্যন্ত। গাড়ী ফটকের ভেতর ঢুকে গেলে তারা ফিরে যায়। অবশ্য কোম্পানী এর জন্য পুলিশকে মোটা রকম টাকা দেয়।

গিরীন। সে তো বটেই।

ফণী। আপনার পা এখন কেমন আছে?

গিরীন। এখনও বেশ ব্যথা রয়েছে। (মাটীতে পা রেখে দাঁড়াতে গিয়ে) উঃ! এখনও দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

ফণী। বাড়ীতে গিয়ে এক ডোজ আর্ণিকা খেয়ে নেবেন, আর চুণ-হলুদ লাগাবেন। ওসব টিংচার আয়োডিনের কর্ম্ম নয়।

গিরীন। আচ্ছা।

ফণী। আপনি কি আজ দেশে যাবেন?

গিরীন। হ্যাঁ। শনিবার শনিবার যাই।

ফণী। দেশে তো কেউ নেই বললেন? তবে প্রতি সপ্তাহে যান কেন? কিছু মাল টাল—

গিরীন। না, না, ফণীবাবু কি যে বলেন?

ফণী। কিছু বলছি না। তবু সাবধান—

গিরীন। (ভীত ভাবে) সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—

ফণী। (হেসে) ঠাট্টা বোঝেন না গিরীনবাবু। আর থাকলেই বা ক্ষতি কি! অ্যাঁ, গাড়ী থামল যে? দেখি— (জানালা খুললে) শোভাসিং; কেয়া হুয়া?

শোভাসিং। রিজার্ভ বন্ধ হুজুর।

ফণী। গিরীনবাবু, চট করে এই চিঠিটা ওদের দিয়ে আসুন—

ফণী পকেট থেকে চিঠি বার করে গিরীনকে দিল। গিরীন চিঠি হাতে দাঁড়াতে গিয়ে একটা আর্ত্তনাদ করে আবার বসে পড়ল

গিরীন। উঃ, বাপরে!

ফণী। কি হ'ল?

গিরীন। পায়ে যেন কেউ সূচ ফোটাচ্ছে। (আবার দাঁড়াতে গিয়ে) ওরে বাপরে—(ভ্যানের দেয়াল ধরে) অসম্ভব। এক পা নড়তে পারব না

ফণী। আচ্ছা ড্রাইভারকে বলি। ড্রাইভার—

শোভাসিং। (জানালায় মুখ এনে) জী হুজুর।

ফণী। এই চিঠি টো ম্যানেজারকে অপিস মেঁ দে কে আও তো।

ফণী গিরীনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ড্রাইভারকে দিতে গেল

শোভাসিং। গাড়ী ছোড়কে ম্যাঁয় নহী জা সকতা হুজুর।

ফণী। আরে কত দেরী লাগেগা। জায়গা আওর আয় গা।

শোভাসিং। হুকুম নহী হ্যায় হুজুর।

ফণী। এক মিনিট মে কেয়া হো জায় গা।

শোভাসিং। নহী হুজুর, গাড়ী ছোড়কে এক মিনট ভী ম্যাঁয় নহী জা সকতা। শোভাসিং জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিল

ফণী। কি ফ্যাসাদ! গিরীনবাবু, আপনি কি একটুও হাঁটতে পারবেন না।

গিরীন। ভীষণ ব্যথা করছে।

ফণী। আপনাকে নিয়ে তো ভারী বিপদে পড়লুম দেখছি।

গিরীন। আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু কি করব—দাঁড়াতে পারছি না—

ফণী। যত সব—আচ্ছা, আমিই নিজেই যাচ্ছি। (ভ্যানের দরজা খুলল) আমি নেবে গেলেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে নেবেন। না আসা পর্য্যন্ত খুলবেন না। বুঝলেন?

গিরীন। আজ্ঞে হাঁ—

ফণী নেমে গেল। গিরীন দরজা বন্ধ করে জানলার দিকে একবার ভাল করে দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চাবী বার করে ব্যাঙ্কের একটা ব্যাগ খুলে নোটের তাড়া বার করে নিজের সুটকেশে ভরল এবং সুটকেশের কতকগুলো ছেঁড়া খবরের কাগজের তাড়া ব্যাগে ভরে দিল। এমন সময় জানালা খুলল। গিরীন তাড়াতাড়ি সব সামলে অন্য দিকে চেয়ে বসল—

শোভাসিং। (জানালায় মুখ রেখে) উও খুদ জানা নহীঁ চাহতে থে।

গিরীন। না। ইচ্ছা নহীঁ থা।

শোভাসিং। ম্যাঁয় তো গাড়ী ছোড়কে নহীঁ জা সকতা। হুকুম নহী হ্যায়।

প্রায় াদের যোগ্য উপপাদিক। অন্য প্রতিপাদয়ামঃ (মূল)—ইঁহার স্থানে নিবেশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিব। এই মর্ম্মে যে অমাত্যকে ভাঙ্গান দরকার, তাঁহার নিকট গুপ্ত সংবাদ পাঠান হইবে। ঐ অমাত্য যদি এই প্রকারে উপজাপিত হইয়াও 'না, আমি এরূপ করিব না' বলিয়া দূতকে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে রাজা বুঝিবেন—উক্ত অমাত্য নির্দ্দোষ ও বিশ্বাসযোগ্য। ইহার নাম 'ধর্ম্মোপধা'—ধর্ম্ম-স্থাপনের অনুকূল বচোভঙ্গী দ্বারা ছলনা। পুরোহিত যে রাজাকে পদচ্যুত করিতে চাহিতেছেন—ইহাতে তাঁহার রাজার উপর ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নাই; রাজা যখন তাঁহাকে অধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া চাহিয়াছেন, অতএব রাজা অধার্ম্মিক; অধার্ম্মিক রাজার উচ্ছেদ-কামনায় পুরোহিত এই ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন—ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই—কেবল ধর্ম্মস্থাপনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ধর্ম্মোপধা' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্যামশাস্ত্রীর religious allurement'—অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং this allurement is based on the religious plea (of dethroning an unrighteous king and establishing a righteous substitute' বলা চলে।

মূল:—সেনাপতি অসৎপ্রগ্রহহেতু অবক্ষিপ্ত হইয়া সত্রিগণ দ্বারা এক একজন অমাত্যকে লোভনীয় অর্থ দ্বারা রাজ বিনাশের নিমিত্ত উপজাপিত করিবেন (এই মর্ম্মে)—'ইহা আমাদিগের মধ্যে অন্য সকলেরই রুচিকর, আপনারই বা কেমন (লাগে)? প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই অর্থোপধা।

সঙ্কেত:—অসৎপ্রগ্রহ—ইহারও অর্থ সুনিরূপণযোগ্য নহে। শ্যামশাস্ত্রীর অর্থ—'dismissed from service for receiving condemnable things'—অর্থাৎ কুৎসিত দ্রব্য গ্রহণ করা হেতু। অবশ্য পাঠান্তরও আছে—অসৎপ্রতিগ্রহেণ। কিন্তু ইহাই যদি অর্থ হয় যে—সেনাপতি নিন্দিত দ্রব্য (কিংবা উৎকোচ) গ্রহণ করার অপরাধে বিতাড়িত হইলেন, তখন আর তাঁহার সহিত ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিতে অমাত্যগণ চাহিবেন না। এক তিনি যদি প্রভূত অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিতাড়িত হন, আর সেই অর্থের অংশবিশেষ প্রদানের লোভ দেখাইয়া অমাত্যবর্গকে ভাঙ্গাইতে চাহেন তাহা যে একেবারে অসম্ভব একথা আমরা বলি না। তথাপি অমাত্যবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণের নিমিত্ত সেনাপতিকে অসৎ দ্রব্য গ্রহণকারী বলিয়া বর্ণনা না করাই ভাল। গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ—অসৎপ্রগ্রহ অর্থাৎ অপূজ্য-পূজার নিমিত্ত অবমানিত; রাজা সেনাপতিকে আদেশ দিলেন—পূজার অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে পূজা কর—সেনাপতি ইহা অপমানজনক মনে করায় রাজাদেশ পালন করিলেন না। ফলে তিনি অর্থ ও মান উভয়ই হারাইলেন। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পুরোহিতের ন্যায় তিনিও সহানুভূতির প্রত্যাশা করিতে পারেন। অবমানিত ও পদচ্যুত হইয়া তিনি চর পাঠাইয়া অমাত্যবর্গকে একে একে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। পুরোহিত শপথপূর্ব্বক ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করেন; কারণ তাঁহার ছলনা—ধর্ম্মোপধা। পক্ষান্তরে, সেনাপতি কেবল শপথমাত্র সহায়ে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন না—তিনি লোভনীয় অর্থের প্রলোভনও দেখান—ইহাই পার্থক্য; কারণ—এ ছলনা যে 'অর্থোপধা'। গঃ শাঃ উপজাপের (অর্থাৎ ভাঙ্গাইবার) পদ্ধতিরও উল্লেখ করিয়াছেন—'এই রাজা অপথে প্রবৃত্ত; ইঁহার স্থানে সৎপথবর্ত্তী ইঁহারই বংশোদ্ভূত, অবরুদ্ধ বা ঐরূপ অন্য কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করা যাউক'।

যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মস্থাপনের প্রলোভন দেখাইয়া ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবেন পুরোহিত। যাঁহারা অর্থলোভী, তাঁহাদিগকে লোভনীয় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবেন সেনাপতি। শ্যামশাস্ত্রী অর্থোপধার ভাষান্তর দিয়াছেন—monetary allurement.

মূল:—লব্ধবিশ্বাস ও অন্তঃপুরে প্রাপ্তসংকারা পরিব্রাজিকা এক একজন মহামাত্রকে প্রলোভিত করিবেন (এই মর্ম্মে)—'রাজমহিষী তোমায় কামনা করেন—সমাগমের উপায়ও কৃত হইয়াছে। আর (ইহাতে) মহান্ অর্থও হইবে'। প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই কামোপধা।

সঙ্কেত:—পরিব্রাজিকা—ভিক্ষুকী (গঃ শাঃ)—সন্ন্যাসিনী বলাই ভাল। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা অবশ্য 'ভিক্‌খুনী'—কিন্তু 'ভিক্ষুকী' বলিলে সাধারণ ভিখারিণী বুঝায়—সন্ন্যাসিনীর ভাবটা বুঝায় না। A woman spy in the guise of an ascetic (SH)—এ অর্থ সঙ্গত। লব্ধবিশ্বাসা—শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজী দেন নাই; যিনি (রাজার বা রাজমহিষীর) বিশ্বাসভাজন। অন্তঃপুরে কৃতসৎকারা—অন্তঃপুরবাসিনী মহিষী ও অন্যান্য পুরনারীগণ কর্ত্তৃক পূজিতা। মহামাত্র—(১) মাহুত (এ স্থলে সে অর্থ নহে); (২) অমাত্য। শ্যামশাস্ত্রী ভাষান্তর করিয়াছেন—prime minister. মহামাত্রের—'মহা' শব্দটি থাকার দরুণই কি 'prime' minister অর্থ করা হইল? তাহা হইলে 'একৈকং মহামাত্রং'—এই বাক্যাংশের সঙ্গতি থাকে না। শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজীও করিয়াছেন 'each prime minister.' কিন্তু prime minister ত একের অধিক থাকিতে পারে না। অতএব, ইহা অসঙ্গত। বস্তুতঃ 'মহামাত্র' বলিতে অমাত্যমাত্রকেই বুঝায়। কৃতসমাগমোপায়া—সমাগম অর্থে রাজান্তঃপুরে সমাগম অর্থাৎ গমন, অথবা সমাগম অর্থে সঙ্গম বা মিলন; সমাগমের উপায়; তাহা করা হইয়াছে। রাজমহিষীই অন্তঃপুরে প্রবেশ ও তাঁহার সহিত মিলনের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। এ মিলনে যে কেবল কামোপভোগ চরিতার্থ হইবে তাহা নহে—পরন্তু অর্থও প্রচুর আসিবে। অতএব, কামের প্রলোভন ইহাতে মুখ্য—আর অর্থের প্রলোভন গৌণ। কাম-প্রলোভন মুখ্য বলিয়া ইহা 'কামোপধা' (love allurement (SH)।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোচীন

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনেও গণদেবতার রুদ্ররোষ জ্বলে উঠেছে। এই আগুন কিন্তু নূতন নয়, বহুকাল ধরেই ইহা ধূমায়িত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এই অঞ্চলে ফরাসীরা বেপরোয়াভাবে শোষণনীতি চালাতে আরম্ভ করলে গণশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বহু পূর্ব্ব থেকেই প্রায় শতবর্ষকাল ধরে ফরাসী ইন্দোচীনের দেশপ্রেমিকগণ ফরাসী উপনিবেশ প্রথার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। ফরাসী সরকারের নির্ম্মম দমননীতিকে উপেক্ষা করে কি ভাবে এই সংগ্রাম চলে আসছে এই প্রবন্ধে তারই একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করবো।

ইন্দোচীনে আজ দেখতে পাই যে আনামীদের গণঅভ্যুত্থানকে দমন করবার জন্য বৃটীশ ও ফরাসীদের পাশাপাশি জাপানীরাও লড়াই করছে। আশ্চর্য্য লাগে! ১৯৩৯ থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল বৃটেন যে শক্তিকে ফ্যাসিষ্ট, পররাজ্যলোভী ও বর্ব্বর বলে অভিহিত করে এসেছে আজ তারই সাহায্যে আনামীদের স্বাধীনতার দাবীকে গলা টিপে মারার চেষ্টা সত্যই অভিনব! ইন্দোচীনে যতক্ষণ জাপশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল ততক্ষণ আনামের সিংহাসনে এক সম্রাট অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রীরা 'ভিয়েটনাম' গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। আনামীরা ইন্দোচীনকে ভিয়েটনাম নামে অভিহিত করে থাকে। এই ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের পেছনেই ভিয়েটমিন বা আনামীদের সম্মিলিত দলগুলি শক্তি জোগাচ্ছে। কম্যুনিষ্টগণও এই দলে আছে। আনামের এই নূতন গভর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খলেই দেশের শাসন চালাচ্ছিলেন। বৃটীশ সৈন্যদের ইন্দোচীনে আগমনের পর থেকেই গোলযোগ সুরু হয়। বৃটীশ সেনানায়ক মেজর-জেনারেল গ্রেসির হাতে সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। গ্রেসি পৌঁছিয়াই এক ঘোষণা জারী করলেন যে কোনরূপ ইস্তাহার বিলি করা চলবে না এবং পথে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি লাঠি নিয়ে চলাও নিষিদ্ধ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভিয়েটনামকে তাদের অধীনস্থ পুলিশ ও সৈন্যসংখ্যা, ঘাঁটীগুলির অবস্থিতি, এমন কি অস্ত্রশস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যন্ত জানাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হল। ভিয়েটনামের ধারণা ছিল যে মিত্রপক্ষ তাদের আনামীদের প্রতিনিধিস্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বলে গ্রহণ করবেন। কিন্তু গ্রেসির ভাবগতিতে তাদের নিরাশ হ'তে হ'ল। তা সত্ত্বেও তাঁরা নির্দ্দেশ পালনে কোন ত্রুটী করলেন না। ভিয়েটনামের ঘরবাড়ী আনামীদের প্রহরাধীন থাকলেও জাপানী ও গুর্খা সৈন্যেরা রাজপথে টহল দিতে লাগল। ১৯৪৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়ায়—জাপানীদের যেখানে যেখানে ঘাঁটী ছিল সেইখানগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত জায়গায় আনামীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাজধানী সাইগনের অসামরিক শাসনকার্য্যও আনামীরাই চালাতে লাগল—সামরিক কর্ত্তৃত্ব রইলো বৃটীশের হাতে। আপোষের জন্য গ্রেসি ও ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। এমন সময় ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসীদের অভিযান অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুরু হয়। ভোর রাত্রেই রাস্তায় রাস্তায় গুলি গোলা চলতে লাগলো। তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু বৃটীশ ও গুর্খা সৈন্যরা রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। আনামীরা সবিস্ময়ে দেখলে যে ফরাসীরা লরীযোগে সহরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বৃটীশের নিকট টমিগান, জাপানীদের মেসিনগান, রিভলবার—এমন কি ছুরি পর্য্যন্ত নিয়ে ফরাসীরা অস্ত্রসজ্জা করে। সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত ফরাসীরা অভিযান চালিয়ে ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ভবন ও পুলিশ ঘাঁটী দখল করে বসে, যাকে সামনে পেলে তাকেই বন্দী করে। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে আনামীরা সহজেই পর্য্যুদস্ত হয়। যে সকল আনামী বন্দী হল—ফরাসীরা তাদের প্রতি বর্ব্বর আচরণ করতে লাগলো। স্ত্রী-পুরুষ শিশু সকলকে বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখা হল। কেউ একটু নড়াচড়া করলেই ফরাসী প্রহরীরা তাদের সবুট পদাঘাতে পুরস্কৃত করতে লাগল। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবাদ করা হলে উত্তর এল—"নেটিভদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহারই আমাদের প্রাচীন রীতি।"

ফরাসীদের এই আকস্মিক অভিযানে যে বৃটীশের গোপন সম্মতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তা না হ'লে গ্রেসির হাতে সামরিক কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ফরাসীদের পক্ষে অভিযান চালান সম্ভবপর হ'ত না। বৃটীশের পক্ষ থেকে তারস্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আনামীদের এই অভ্যুত্থানে জাপানীরা প্ররোচনা দিয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত যে জাপ-ফরাসী মৈত্রী ইন্দোচীনে বলবৎ ছিল আজ বৃটীশের সম্মতিক্রমে তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত জাপ-লরীতে চড়ে আনামীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বৃটীশ ও ফরাসীরা আনামীদের জাপ তাঁবেদার বলে চিত্রিত করবার চেষ্টা করছে এবং নির্ম্মম ভাবে দমন ও শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অবলীলাক্রমে আনামীদের হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না। তা সত্ত্বেও এখানে স্বাধীনতার যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা নির্ব্বাপিত হচ্ছে না এবং হবেও না কোনদিন।

এখন ইন্দোচীনের ভৌগোলিক অবস্থা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাক। ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দোচীনও একটা দেশ নয়, কয়েকটী দেশের সমষ্টি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ফরাসী-অধিকৃত দেশগুলির সমষ্টিগত নাম ইন্দোচীন। পাঁচটী স্বতন্ত্র দেশ নিয়ে ইহা গঠিত—কোচিন-চীন, আনাম, কাম্বোডিয়া, টনকিং ও লাওস। ইন্দোচীনের সমগ্র ভূভাগের পরিমাণ ২৪৬০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ ফ্রান্সের প্রায় দেড়গুণ। ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এখানের জনসংখ্যা

প্রায় ২৩ কোটী ৪৫ লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত। এই জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪১ হাজার ফরাসী। মঙ্গোলবংশীয় আনামীরাই আনাম, টনকিং ও কোচিন-চীনে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। আনামীদের ভাষা চীনা ভাষার অনুরূপ এবং চীনা হরফেই লিখিত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ চীন থেকে চীনারা এসে এইখানে বসবাস সুরু করে। কোচিন-চীন ও কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদের কাম্বোডীয় বলা হয়। খৃষ্টীয় সভ্যতার জন্মের বহুপূর্ব্বেই এরা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ আনামে চাম, টনকিংয়ে থাই এবং লাওসে খাস প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এখানে একটা মহান উপকার সাধন করেছে এই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।

ইন্দোচীন পৃথিবীতে চাল উৎপাদনের সর্ব্ববৃহৎ কেন্দ্রসমূহের অন্যতম। গম এবং ভুট্টাও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। স্বর্ণ, টিন, তাম্র, দস্তা, লৌহ ও কয়লাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার এই অখ্যাত দেশগুলি অতি প্রাচীনকালেই হিন্দুদের উপনিবেশ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনকালে হিন্দুরা কাম্বোডিয়াকে কাম্বোজদের রাজ্য বলেই জানতেন। প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা আধুনিক কোচিন চীন ও দক্ষিণ আনামের ভূভাগকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল। আঙ্কর নগরী ও পার্শ্ববর্ত্তী আঙ্কর বট মন্দির হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলগুলি চীনের প্রভাবাধীন হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এক আনামী বংশের ভূপাল চীনাদের বিতাড়িত করে আনামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আনামীরাই দেশ শাসন করে। তারপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এখানে আসন পাতে।

ইন্দোচীনে ফরাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে ছিল প্রাচ্যখণ্ডে বৃটীশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত। ভারতে ফরাসীরা ইংরাজদের কূটনীতির নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। তখন স্বভাবতঃই তারা এমন একটি অঞ্চলের সন্ধানে ব্যাপৃত হয় যাতে করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে তারা বৃটেনের বাণিজ্যেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলটীকেই তখন তারা যোগ্যস্থান বলে নির্ব্বাচিত করে। জনৈক ফরাসী পাদরীর বুদ্ধি ও পরামর্শ ক্রমেই এখানে ফরাসী সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। এই পাদরীটির নাম—বিশপ-পিগন্যু-ড্য-বিহেন। এই বিশপ তদানীন্তন ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের নিকট এক স্মারকলিপিতে জানান—"ভারতে শক্তিদ্বন্দ্বে ইংরাজরা যেরূপ অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয়েছে তাতে করে ফ্রান্সের পক্ষে সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোচীন্-চীনে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে বলে মনে হয়। ভারতে ইংরাজদের ধ্বংস কত্তে হলে তার বাণিজ্য হয় ধ্বংস, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে। আমরা যদি এখানে উপনিবেশ স্থাপন করি তাহ'লে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা বিশেষ লাভবান হতে পারবো এবং ইংরাজরা চীনের বাণিজ্যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধের সময় আমরা মাত্র কয়েকখানা ক্রুজারের সাহায্যে চীনের পথ বন্ধ করে শত্রুর বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারবো। আমাদের সৈন্যের রসদ এবং অন্যান্য উপনিবেশের জন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা এখান থেকেই সরবরাহ করতে পারবো। প্রয়োজন হলে এখানকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহও করা যাবে। কাজেই এইখানে যদি আমরা ঘাঁটী স্থাপন করি তাহ'লে ইংরাজরা আর পূর্ব্বদিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হবে না।" (১৮৮৬ সালের সি-বি নর্ম্ম্যানের 'কলনিয়াল ফ্রান্স' হইতে)

এই পত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মুখোস উন্মোচনের পক্ষে অতি মূল্যবান দলিল। ইংরাজ বা ফরাসীরা প্রাচ্যখণ্ডে যে সভ্যতা বিস্তারের মহান উদ্দেশ্যে আসে নাই—এর থেকে তা বেশ ভাল করেই বুঝা যায়। ফরাসীরা পূর্ব্ব থেকে পরিকল্পনা করেই ইন্দোচীনে এইভাবে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। তার উদ্দেশ্য হল ইংরাজদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। আসলে ফরাসীরা এখানে জলদস্যুদের একটা ঘাঁটী স্থাপন করে বৃহত্তর জলদস্যু ইংরাজদের সায়েস্তা করতে চেয়েছিল।

ফরাসী সম্রাট সানন্দে এই সাম্রাজ্য প্রয়াসী বিশপের পরিকল্পনায় সায় দিলেন। কোচিন-চীনে এক গৃহ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা ইন্দোচীনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। আনামের সিংহাসনের দুই দাবীদারের একপক্ষ নিয়ে ফরাসীরা উপনিবেশের পত্তন করে। গুয়েন-ফুয়া-আন নামক আনাম রাজ ফরাসীদের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে সিংহাসন দখল করেন এবং সমগ্র আনাম, টনকিং ও কোচীন-চীনে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। ১৭৮৭ সালে ফরাসী সম্রাট ও আনাম রাজের মধ্যে যে চুক্তি নিষ্পন্ন হয় আনাম-রাজ তাতে ফরাসীদের হাতে কয়েকটী স্থান ছেড়ে দেন। এই ভাবে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর সাম্রাজ্যবাদীদের চির পরিচিত কূট কৌশল একে একে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রাজা গুয়েন-ফুয়া আনের বংশধরদের সঙ্গে ফরাসীদের বনিবনা হল না। খৃষ্টীয় মিশনারিদের প্রচার কার্য্য তাঁরা পছন্দ করলেন না এবং তাদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলেন। অবশ্য এর ফলভোগও তাদের করতে হ'ল। মিশনারীদের প্রতি অত্যাচারের সুবিধা নিয়ে ফরাসী রাজ আনামীদের সায়েস্তা করতে অগ্রসর হলেন। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা রবি এইবার অস্তমিত হল এবং ১৮৬২ সালের চুক্তিবলে ফরাসী শাসন সুরু হল। ফরাসী নৌ-সেনানায়কদের দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালিত হতে লাগল। এইভাবে প্রায় ১৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হল। ফরাসীরা অবিশ্রান্তভাবে একের পর একটী করে ইন্দোচীনের বিভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এইভাবে সমগ্র ইন্দোচীনে ফ্রান্সের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ফ্রান্স ও বৃটেন এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেও আপোষ হয়ে গেল। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী সুদূর প্রাচ্যে উভয় শক্তির প্রভাবাধীন এলাকার সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হ'ল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মিরাটে বড়দিনের ছুটিতে এ বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন হ'য়ে গেছে। সত্যি ক'রে গুণ্‌তে গেলে এটি ত্রয়োবিংশ নয়, চতুর্বিংশ অধিবেশন হয়। মধ্যে এক বছর সম্মেলন বসেনি, কিন্তু তার বার্ষিক বৈঠক এলাহাবাদে বসেছিল। এই কারণে পরের বছর লক্ষ্ণৌ সহরে সম্মেলনের জুবিলি অর্থাৎ পঞ্চবিংশ অধিবেশন হবে স্থির হয়েচে।

কয়েকটি কারণে এ বছরের সম্মেলন খুব সার্থক হয়েচে ব'লে আমার মনে হয়। এই রকম সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য আর যাই হোক্, প্রধান উদ্দেশ্য জাতির মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করা, জাতির ক্রমশঃ ক্ষীয়মান প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং সঞ্জীবিত ক'রে তোলা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েচে—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি এবং ভাষণে। অনুপ্রাণনার সৃষ্টি হয় পরস্পর মিলনে এবং যাঁদের মধ্যে প্রাণশক্তি সতেজ এবং দেশের কল্যাণ-ইচ্ছা জাগ্রত তাঁদের সাহচর্য এবং উপদেশ লাভে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র ক'রে সেই দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল। বাংলা দেশের গৌরব এবং বাঙালীর কৃতী সন্তান অনেকে একত্র হ'য়েছিলেন এবং প্রতিনিধি-নিবাসে একত্র থাকার ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হ'য়েছিল।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে সম্মাননা প্রদর্শন করার জন্য মিরাটে বাঙালী এবং হিন্দুস্থানী মহলে প্রতিযোগিতা পড়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে মিরাটের অ-বাঙালী অধিবাসীরা তাঁকে এতটুকু পর ব'লে মনে করে নি। এইটিই ত ভারতের সর্বনিধিত্বের পরিচায়ক, যে বাঙালীর নেতাকে তারা কেবলমাত্র বাঙালীর ব'লে মনে করছে না, মনে করছে সমগ্র ভারতবাসীর নেতারূপে। যদিচ আচার্যদেব প্রতিনিধি নিবাসেই অবস্থান করছিলেন, তবু তাঁর স্নানাহার যে কোথায় সম্পন্ন হ'ত আমরা জান্‌তে পেতুম না। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতুম কেউ তাঁকে চা খাওয়াতে বাসায় নিয়ে গেছেন, কেউ স্নান করাতে, কেউ বা মধ্যাহ্ন-ভোজনে। সকলে শান্তভাবে অপেক্ষা করতেন, তারপর যাঁর ভাগ্যে যে সুবিধাটুকু জুট্‌তো তিনি তার সুযোগ গ্রহণ করে ধন্য হ'তেন। আর মহিলাবৃন্দ ত তাঁকে সর্বদা ঘিরে ব'সে থাকৃতেন—কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সতরঞ্চির উপর রোদে পিঠ ক'রে ব'সে তাঁদের অপরাহ্ণ-সভা জমে উঠ্‌তো—আচার্যদেব সকলের মাঝখানে ঠাকুর্দার মত ব'সে হাস্য পরিহাস সহযোগে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন এবং উপদেশ দিতেন।

এই সর্বনিধিত্বের গুপ্ত কারণ বা সিক্রেট্ কি আমি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছি। মনে হয়েচে এর একমাত্র কারণ নিজের মনোমত আদর্শকে পূজা করবার শক্তি। যৌবনে আদর্শ হয়ত সকল বাঙালীর ছেলের মনেই একটা থাকে, কিন্তু সাধনার দ্বারা শতকরা নিরানব্বই জন আমরা সেটাকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারি নে। আমাদের ত্যাগ এবং তপস্যা নেই—তাই আমরা সাধারণের গতিপথ অবলম্বন করেই চলি—আমরা অসাধারণ হ'তে পারি নে। ক্ষিতিমোহনবাবুকে জানি—আমি তাঁর ছাত্র। যৌবনে একদা কাশ্মীর ষ্টেটের বড় চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষকতার কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন—আজও সেই কার্যে নিযুক্ত আছেন। তফাতের মধ্যে এই হয়েচে যে—আজ তাঁর শিক্ষকতার ক্ষেত্র কেবলমাত্র বিশ্বভারতীতে সীমাবদ্ধ নয়—সে ক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েচে। একথা অনুমান করা শক্ত নয় যে মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা বহুবার তাঁর দুশ্চর তপস্যাকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল, নিষ্ঠা এবং নির্লোভিতার দ্বারা সকল বাধা জয় করেচেন। তাই আজ ৬৭ বছর বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ, কর্ত্তব্য-বোধ অটুট এবং দেশের মঙ্গলকামনা অমোঘ। তা না হ'লে নীচু রক্তচাপের (low blood pressure) ভগ্নস্বাস্থ্য রোগী—উত্তর ভারতের দুঃসহ শীত সহ্য করতে শান্তিনিকেতন থেকে মিরাটে আসতে পারতেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলুম নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়কে। ইতিপূর্বে জামসেদপুর অধিবেশনে তাঁকে দেখেছিলুম কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। এবার তাঁকে দেখে এবং ভাষণ শুনে বুঝলুম তিনি prince among man হ'য়েও gem among the Bengalis. "Dawn' ম্যাগাজিনের আমল এবং স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে তিনি তাঁর জীবন-কথা আরম্ভ করলেন। লৌহ-শিল্পে তাঁর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ দিলেন এবং কি ক'রে ওকালতি করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েও তাঁকে ইঞ্জিনিয়ার লাইনে আসতে হ'ল তার গুপ্ত কথা বর্ণনা করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর যে পরমাশ্চর্য বিদ্যাবত্তা (encyclopaedic knowledge) এবং দরদভরা প্রাণের পরিচয় পাওয়া গেল সেটা যে-কোন জাতির পক্ষেই আদরের সামগ্রী। জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়ই জগতে দুর্লভ—রক্ষিত মহাশয়ের চরিত্রে সেই সমন্বয় ঘটেছে। পণ্ডিত হ'য়েও তাঁর চরিত্রে শুষ্কতা আসে নি। সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েও তাঁর পরিধানে প্যাণ্টকোট দেখলুম না, চরিত্রে দম্ভ দেখলুম না। অপর পক্ষে বাঙালী জাতির জন্য সমবেদনার অন্ত নেই—বাঙালী জাতির ইতিহাসে এবং তাদের ভবিষ্যতে কি জ্বলন্ত বিশ্বাস। স্পষ্টই বললেন যে আপনারা আমাকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিযুক্ত মানুষই বলুন বা আর যাই বলুন, আমি বাঙালী ছাড়া অন্য জাতকে চাকরি দিই নে। তাঁর অধীনে দেড় হাজার টাকা বেতনের কর্মচারী পর্যন্ত আছেন। এ কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে আমি দেখেচি বাঙালীর সাধারণ মনোবৃত্তি হ'ল আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বমৈত্রীমূলক স্বাজাতিক এবং বাঙালীমৈত্রীমূলক নয়। এটা আদর্শ হিসাবে যত বড়ই হোক্ দৈনন্দিন জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে এর

ফল মারাত্মক। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিত মহাশয়ের এই বাঙ্গালী প্রীতি মধিকথিত সুসংবাদের মত স্বাগতম্। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত উদ্দাত্ত স্বরে সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, "হে বাঙ্গালী যুবক, তুমি মনে ক'রো না যে ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির তুলনায় তোমার জীবিকার্জনের শক্তি অল্প। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অদ্বিতীয়—তুমি রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ—তুমি চেষ্টা করলেই তাঁদের মত শক্তিমান হ'তে পারবে। শুধু মতান্ধতা পরিহার কর—নিজের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্যে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সংস্কারগত বৈরাগ্যকে (chronic apathy to the world) অবলম্বন ক'রে দধীচি মুনির মত অস্থি দিতে প্রস্তুত হ'য়ো না। তা যদি দাও তবে তার ঔষধ আমি বল্‌তে পারবো না। কিন্তু যদি মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে চাও তবে তার শত পন্থা আমি চেষ্টা ক'রে দেখার জন্য ব'লে দিতে পারবো।"

"শিল্প ও বাণিজ্য" শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। ২৩ বছর আগে তাঁকে বোম্বাই সহরে দেখেছিলুম—এই দীর্ঘ দিন পরে মিরাটে পুনরায় দেখা হ'ল। চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি—শুধু চুলে সামান্য পাক ধরেছে মাত্র। আগের মতই সদানন্দ, তেমনি কর্মঠ। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি তখন হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকসান কোম্পানীর জন্ম হয় নি—তখন তিনি হীরাচাঁদ ওয়ালচাঁদ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। স্যর বিঠলভাই থ্যাকারসের "পর্ণ-কুটীর" নামক প্রাসাদ পুণায় তখন ওঁদের কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে তৈরী হচ্চে। তার কাজ পরিদর্শন করতে প্রায় প্রতি শনিবার তিনি বোম্বাই থেকে পুণা আসতেন এবং আমাদের সেল্টার (The shelter) নামক মেসে থাকতেন। সেই দু'দিন যে কত আনন্দে কাটতো তার স্মৃতি এখনো অম্লান আছে। নিজের জীবনের কত কাহিনী তখন বলেছেন, আসামের ডিব্রুগড় সহরে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘটনা এখনো মনে আছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি নিজেকে গ'ড়ে তুলেছেন, বাঙ্গালী জাতিকেও সেই মন্ত্রে তিনি গড়তে চান। তাঁর অভিভাষণ প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের অভিজ্ঞতার কথা—তাতে সাহিত্যের সৌন্দর্য নেই। তাঁর মতের সঙ্গে অনেকের হয়ত মতদ্বৈধ হবে কিন্তু তাঁর মন্তব্যগুলি সব চিন্তাশীল লোকের প্রণিধানযোগ্য। তিনি সকল বাঙ্গালী ছেলের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নন, চাকুরীরও তিনি বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ে তাঁর সম্মতি আছে। ব্যবসায়ের নানা পন্থা তাঁর নখদর্পণে।

শিববাবুর ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের সব কৃতিত্ব আমরা জানতুম না। রক্ষিত মহাশয় এবার তাঁর মৌখিক ভাষণে সেটা জানিয়ে দিলেন। সিন্ধু নদীর জলবন্ধন, সিঙ্গাপুরের অতুলনীয় ডক্ সব শিববাবুর ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার কীর্তি। ভারতবর্ষে যতগুলি বড় টানেল্ (tunnel) তৈরি হয়েচে সব শিববাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে। সেই কারণে মনে হয় বাঙ্গালীর এই কৃতী সন্তানের অভিমত প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে চিন্তা ক'রে দেখবার যোগ্য।

"শিল্প ও বাণিজ্য" নাম দিয়ে একটা শাখা মিরাটে এইবার সম্মেলনের নতুন অঙ্গস্বরূপ খোলা হয়েচে। এর মধ্যে বিজ্ঞানশাখাকে মিশিয়ে দেওয়া চলে এবং শিল্প অর্থাৎ Industryকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েচে। সেই কারণে এই শাখার নেতৃত্ব করবার ভার অর্পণ করা হয়েছিল এমন ব্যক্তির হস্তে যিনি শিল্প বা Industry সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন এবং বাঙ্গালী যুবকদের জীবিকার্জন সমস্যার সমাধান কল্পে হদিশ বাত্‌লাতে পারেন।

দেখা গেল মহিলা-শাখা দ্বারা সম্মেলন বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েচে। আমাদের সমাজের অর্দ্ধাংশ কি ধারায় চিন্তা করছেন, তাঁদের অভাব অভিযোগ কি, সেটা জানার প্রয়োজন ছিল। সত্যই ত তাঁদের সমস্যা এবং পুরুষদের সমস্যা এক নয়। বিশেষ এটা এমন একটা সময় যখন আমাদের বাঙ্গালী-সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার কাজে এক প্রবল ধাক্কা খেয়েচে, কোথাও কোথাও সেই আঘাতের প্রবলতায় তার অন্তঃপুরের ভিৎ খ'সে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশে দেখতে পাচ্ছি—নারী নিপুণভাবে পুরুষের অনুকরণ প্রয়াসী—তাঁর পরণে পাঁতলুন, মুখে সিগ্রেট। জীবনেও তিনি সন্তান পালনের চেয়ে সভাসমিতি পরিচালনাকে বড় কর্ত্তব্য বলে গণ্য করছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ভারতীয় সমাজেও দেখা দিয়েচে—সেখানে নারী পাঁত্‌লুন না পরুন, সভাসমিতি নিয়ে মত্ত থাকাকে অন্তঃপুরিকার বৈচিত্র্যহীন জীবনের চেয়ে মূল্যবান ব'লে মনে করছেন। এর প্রমাণ খানিকটা দেখতে পাওয়া যায় আ্যারিস্টোক্র্যাটিক সমাজ-জীবনে, খানিকটা প্রবোধকুমার প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে। এরকম অবস্থায় ভারতীয় নারীর কল্যাণ কোথায়—এবিষয়ে একটা authoritative নির্দ্দেশ পাওয়ার প্রতীক্ষা ছিল। মহিলাশাখার সভানেত্রী দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা প্রভা সেনগুপ্তা সেই নির্দেশ দিয়েচেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রত্যেক দায়িত্বশীল নারীকে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্তা সেন-গুপ্তার অভিভাষণের সারমর্মকে সমর্থন করলেন আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন। আচার্য্যদেব বল্‌লেন, দিন এবং রাত্রি যেমন সময়ের দুইটি ভাগ তেম্‌নি পুরুষ এবং নারী একই পুরুষ থেকে উদ্ভূত। এঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরঞ্চ Complimentary, এঁদের দুইয়ের ধর্ম এক নয়, যেমন নিরবচ্ছিন্ন দিনও ভাল লাগে না, নিরবচ্ছিন্ন রাত্রিও ভাল লাগে না। দুইয়ের সম্মেলনে পরম কল্যাণ। পুরুষ সর্বত্র বীজদাতা, প্রকৃতি তাকে রূপদান করে। তাই প্রকৃতির বা নারীর কাজ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, তাকে পোষণ করা, তাকে রূপদান করা। এ নারী পুরুষের replica নয়। সন্তান যদি বাপের কাছে তাড়া খায় তবে মায়ের আঁচলে গিয়ে মুখ লুকোয়, কিন্তু সব জননীও যদি পুরুষালি ধর্ম অবলম্বন ক'রে পিতা হ'য়ে বসে থাকেন, তবে সন্তানের পক্ষে মহা দুর্দৈব হবে।

সম্মেলনের আর একটি আকর্ষণ ছিল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তন। অনুকূল-বাবু একাধিক বার সম্মেলনের দর্শনশাখার সভাপতিত্ব করেছেন, কিন্তু সভাপতি না হ'য়েও যে তিনি প্রতিনিধি হ'য়ে আসতে পারেন, এবার তার প্রমাণ দিলেন। বাস্তবিক এমন নিরভিমান, স্বভাবভদ্র, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বেশি দেখা যায় না। তাঁর সুকণ্ঠের কীর্ত্তন সমবেত সমস্ত শ্রোতার

মনোহরণ করেছিল। সম্মেলন শেষ হ'য়ে গেলেও মিরাটের লোক তাঁকে ছাড়লো না—তাঁর কীর্ত্তন শোনবার জন্য তাঁকে রেখে দিল।

সম্মেলনের সার্থকতা কি, সম্মেলনে কি কাজ হচ্চে, এ বিষয়ে কারোর কারোর মুখে প্রশ্ন শুনেছি। সম্মেলনের নাম থেকে "সাহিত্য" শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাবও শোনা গেছে। এর একটা উত্তর আমার মনে হয় এই যে, সম্মেলনের বয়ঃক্রম পঁচিশ বছর হ'ল—এর মধ্যে যদি একটা অন্তর্নিহিত সার্থকতা না থাক্‌তো তবে এর মৃতদেহকে এত দীর্ঘ দিন ধ'রে লোকে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াত না। কোন বস্তুই তার অন্তরগত সত্য ব্যতীত কেবলমাত্র প্রোপাগ্যাণ্ডা বা লোকের হাততালির জোরে বেঁচে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু এর একটা আরো সদুত্তর হঠাৎ কাণে এল। দিল্লী সহরের আদুবাবুর নাম উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। তিনি প্রতিবারের মত এবছরও মিরাটে প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন, "সম্মেলনে এসে আমি যা শিখি দশবছর ধ'রে বাইরের জীবনে আমি তা শিখতে পারি নে। ক্ষিতিমোহনবাবুর অভিভাষণ, যক্ষিত মহাশয়ের অভিভাষণ শুনে আমি যা শিখেচি, দশবছর ধ'রে বাইরে বেড়ালেও আমি তা শিখতে পারতুম না।" আমার মনে হয় আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করি তবে এই উত্তরই পাব। আদুবাবুর মত উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য—আদুবাবু সেন্টিমেণ্ট্যাল টাইপের মানুষ নন, তিনি নীরব কর্মী। তাঁর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালীর অনেকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমি কেবলমাত্র একটা উদাহরণ দেব। একবার দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনে হঠাৎ খবর না দিয়ে এক রাত্রে ১২০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হন। আদুবাবু প্রতিনিধি নিবাসের অধিনায়ক ছিলেন—এমন সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা তখুনি করলেন যে মনে হ'ল তিনি যেন পূর্ব্বাহ্ণেই এই লোকগুলিকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

এই লেখার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পারসন্যালিটির কথাই বলেছি, কেননা সম্মেলনের সার্থকতা তার পারসন্যালিটির উপরই নির্ভর করে। সম্মেলনের কাঠামোখানাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুল্‌তে পারেন একমাত্র এই পারসন্যালিটি।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ফ্যাসিজমের সহিত লড়ে নাই—লড়িয়াছে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সব রাষ্ট্রকে চূর্ণ করার প্রয়োজন ঘটে। এই প্রয়োজনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বহু বিষোদ্গীরণ করা হইয়াছে; ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস হইবার পর জগৎ হইতে ফ্যাসিস্ত প্রথা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবে বলিয়া আশ্বাসবাণী শুনানো হইয়াছে। যুদ্ধের সময় আমরা আট্‌লাণ্টিক সনদের আট দফা স্বাধীনতার কথা শুনিয়াছি; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চতুর্ব্বর্গ মোক্ষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। এই সব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি যে কতদূর অন্তঃসারশূন্য, তাহা যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই আজ চারি দিকে বীভৎসভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র চূর্ণ হইলেও ফ্যাসিজম্ এখনও মরে নাই। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানরা যে নীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া চেকোস্লোভাকিয়ার একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল, সেই নীতি অনুসারেই বৃটিশ সৈন্য এখন যাভার গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিতেছে। ফ্যাসিজমের সমাধি হয় নাই—তাহার জাত্যন্তর ঘটিয়াছে মাত্র।

ফ্যাসিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ মূলতঃ অভিন্ন। গণতান্ত্রিক ভণ্ডামীর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা অসম্ভব হইলে তখন কৃত্রিম মুখোস অপসারিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের যে নগ্ন রূপ প্রকট হয়, তাহাই ফ্যাসিজম্। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, তাহা সাম্রাজ্যবাদীদের মিষ্ট কথায় আর শান্ত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিকতার ছদ্ম আবরণে শত বর্ষ ধরিয়া যে জগদ্দল পাথর গণ-শক্তির বুকে চাপিয়া ছিল, তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য এই শক্তি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যের সহিত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ প্রত্যক্ষ। তাই, আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ প্রকাশ পাইতেছে; এই রূপই ফ্যাসিজম্ নামে অভিহিত।

মস্কো-সম্মেলন

তিন মাস পূর্ব্বে লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন ব্যর্থ হইবার পর হইতে আমেরিকা ও তাহার অনুগৃহীত বৃটেনের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক মনোমালিন্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বল্‌কান্ অঞ্চলের সোভিয়েট প্রভাবাধীন কয়েকটি রাষ্ট্রের নব-গঠিত গভর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না। ইতালী সম্পর্কে সন্ধি-চুক্তি লইয়া দুই পক্ষে কোনওরূপ মীমাংসা অসম্ভব মনে হইতেছিল। প্রধানতঃ এই সম্পর্কে মতদ্বৈধতার জন্যই লণ্ডন বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। জাপানে জেনারল ম্যাক্-আর্থারের ডিক্টেটারী বজায় রাখিবার জন্য আমেরিকা জিদ্ করিতেছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী জাপান সম্পর্কে একটি চতুঃশক্তির (আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীন) নিয়ন্ত্রণ-কমিশন নিয়োগ করিতে আমেরিকা অস্বীকার করে। ইরাণে সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থনে আজারবাইজানের অধিবাসীরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ায় বৃটেন তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। চীনে প্রতিক্রিয়াপন্থী চুংকিং কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থনে মার্কিণ

সামরিক বিভাগের তৎপরতায় সেখানে বড় রকমের মার্কিণ-সোভিয়েট বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠে। আণবিক বোমার গোপন তথ্য সোভিয়েট রুশিয়াকে না জানাইবার সিদ্ধান্তে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি এংলো-স্তাক্শান শক্তির অবিশ্বাস কতখানি, তাহা বিশ্রীভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কূটনৈতিক বিরোধ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস যখন এইভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, স্বার্থান্বেষীর দল যখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতেছিল, সেই সময়—ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমেরিকার পক্ষ হইতে পররাষ্ট্র সচিবদের আর একটি বৈঠক আহ্বানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রধান তিনটি শক্তির পররাষ্ট্র-সচিব মস্কোয় এক বৈঠকে মিলিত হন।

আমেরিকার পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশের প্রধান কারণ চীনের পরিস্থিতি বলিয়া মনে হয়। শ্রমশিল্পে অনুন্নত চীনের বিশাল বাজারে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য আমেরিকা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। এখানে প্রচুর কাঁচামাল ও কলকব্জা বিক্রয়ের স্বপ্ন সে দেখিতেছে। এই জন্য চীনের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও সমরনেতাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটানো তাহার স্বার্থ। এই দিক হইতেই আমেরিকা চীনের কম্যুনিষ্টদের গণতান্ত্রিক নীতি কতকটা সমর্থন করে। কিন্তু চীনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের বল্গা সে চুংকিংএর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতেই রাখিতে চায়। ইহার প্রধান কারণ—কম্যুনিষ্টরা আপাততঃ সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী না হইলেও তাহাদের প্রভুত্বাধীন চীনে কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোড়লী যে বেশী দিন চলিবে না, তাহা আমেরিকা জানে। চীনে আমেরিকার এই স্বার্থের কথা স্মরণ রাখিলে এক দিকে সেখানকার রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা মীমাংসার জন্য দৃশ্যতঃ আমেরিকার আগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিণ্টাংকে তাহার সামরিক সাহায্য দানের প্রকৃত কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রুশিয়া চুংকিং গভর্ণমেণ্টকে চীনের একমাত্র গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে; চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে কোনও কথাও বলিতেছে না। কিন্তু সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার তৎপরতায় বোঝা গিয়াছে যে, চীনে আমেরিকার অভিসন্ধি সম্পর্কে সে মোটেই উদাসীন নয়। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এমন কথাও বলিয়াছে যে, মাঞ্চুরিয়ায় যেমন লালফৌজ রহিয়াছে, তেমনি উত্তর চীনেও মার্কিণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। চীনের ব্যাপারে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সন্দেহজনক নীরবতা এবং রুশ সংবাদপত্রের এই বক্র উক্তি ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল; তাহার সহিত মনোমালিন্য বাড়াইয়া তুলিতে তাঁহারা আর সাহস পাইতেছিলেন না। বিশেষতঃ চীনের কম্যুনিষ্টদের শক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে,সামরিক বলে চিয়াং-কাই-সেক্ কোম্পানীকে চীনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেখানে বড় রকমের সামরিক তৎপরতা প্রয়োজন হইবে। ইহার পর সোভিয়েট রুশিয়া যদি প্রকাশ্যে চীনে মার্কিণ নীতির বিরোধিতা আরম্ভ করে, তাহা হইলে এই চীনকে কেন্দ্র করিয়াই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সোভিয়েট রুশিয়াকে আপাততঃ খুসী রাখিয়া আমেরিকার মোড়লীতে চীনের গৃহ-বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করিবার জন্য মার্কিণ ধুরন্ধরদের কিছু সময় লাভের প্রয়োজন হইয়াছিল। চীনের প্রসঙ্গ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না। বরং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশিয়া হাত দিবে না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই কুকার্য্য আমেরিকাও যে করিতেছে না, তাহাই বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল।

মস্কোয় ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিন্ল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি-চুক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে যে শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারাই কেবল সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। এই সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে মস্কোর আলোচনা অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য পররাষ্ট্র সচিবদের প্রতিনিধিদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, পূর্ব্বের যে সুদূর প্রাচ্য পরামর্শ কমিশনে যোগ দিতে রুশিয়া আপত্তি করিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন সুদূর প্রাচ্য কমিশন গঠন করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জাপানের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে টোকিওয় একটি কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সম্পর্কে রুশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল। উত্তর কোরিয়ার সোভিয়েট কম্যাণ্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিণ কম্যাণ্ড লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিশন কোরিয়ার গণতান্ত্রিক দলগুলির সহিত আলোচনা করিয়া সেখানে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনে সচেষ্ট হইবে। এই কমিশন কোরিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিতপরামর্শ করিয়াঐ দেশ সম্পর্কে ৫ বৎসরের জন্য চতুঃশক্তির (আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীন) ট্রাষ্টিসিপ্ স্থাপনের প্রস্তাব চারিটি দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকটউপস্থাপিত করিবে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিমূলক নহে বলিয়া আমেরিকা ও বৃটেন পূর্ব্বে এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে চাহে নাই। ইহাদের সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, সহকারী সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব এবং মস্কোস্থিত বৃটিশ ও মার্কিণ দূত অবিলম্বে ঐ দুইটি দেশে যাইবেন। তাঁহারা যদি মনে করেন—সেখানকার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধিমূলক দলের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা হইলে তাহারা এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ঐ দুই দেশের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। এই ত্রুটির সংশোধন হইলে বৃটেন ও আমেরিকা ঐ সব গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবে।

উল্লিখিত মস্কো সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, এই পর্য্যন্ত এই সম্মেলনে সোভিয়েট রুশিয়ার জয় হইয়াছে। আণবিক শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি বৃটিশ, আমেরিকা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গোপন রাখিবার যে সিদ্ধান্ত ট্রুম্যান-এট্লি-কিং স্থির করিয়াছিলেন, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের প্রস্তাব সোভিয়েট রুশিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ইরাণের গোলযোগ

ইরাণের গোলযোগ সম্পর্কে মস্কোয় কোনওরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বৃটিশ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। মস্কোয় নাকি এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল এবং এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিতেই নাকি তাহা সম্ভব হয় নাই।

ইরাণের গোলযোগ সম্পর্কে নানারূপ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই—উত্তর ইরাণের আজারবাইজান্ প্রদেশের অধিবাসীরা জাতিতে তুর্কি; তাহাদের ভাষা ও জাতিগত সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। ইহারা রাজনৈতিক চেতনায় ইরাণের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর। তাহার পর, আজারবাইজানের সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অংশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় এই অঞ্চলে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

ইরাণের অধিবাসীর সংখ্যা দেড় কোটীর মত; ইহার অধিকাংশ লোকই চরম দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। দুই হাজার সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ইরাণের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য করে; মজলিস্ নামক আইন পরিষদটি প্রকৃতপক্ষে চালায় তাহারাই। শাসনযন্ত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা চালাইবার জন্য খরচ হয়; সমাজহিতকর কাজের জন্য কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাক না। ইরাণ তৈলসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। এই খনিজ তৈলের গন্ধ পাইয়া বৃটিশ বণিকরা বহু পূর্ব্বে এখানে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ইরাণের মধ্যযুগীয় দুর্নীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহাদের স্বার্থ।

আজারবাইজানের অধিবাসীরা ইরাণের এই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। গত অক্টোবর মাসে সেখানে টুডে পার্টি বা পিপ্‌ল্‌স্ পার্টির নেতৃত্বে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই নির্ব্বাচনের পর সেখানে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজারবাইজানের অধিবাসীরা ইরাণ হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে চাহে নাই; তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধরণের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে, একথা ঠিক যে, আজারবাইজানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের চেষ্টায় সোভিয়েট রুশিয়া পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ডাণ্ডা মারিয়া এই আন্দোলন থামাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর ইরাণের সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহা করিতে দেয় নাই।

ইরাণ তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার আগ্রহ স্বাভাবিক। এই অঞ্চলে গত কিছুকাল সোভিয়েট-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আমরা দেখিয়াছি—সীরিয়া-লেবাননের ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েট রুশিয়াকে আমন্ত্রণ জানাইতে বৃটেন্ ও আমেরিকা আপত্তি জানাইয়াছিল। প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আমেরিকা মোড়লী করিবার অধিকার পাইল; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখা হইল!

তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে মধ্য-প্রাচ্যের এই দেশগুলির সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। প্রাচ্যের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বৃটেন্ এই অঞ্চল সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। ইহা ছাড়া, ইরাণ ও ইরাকের খনিজ তৈলে বৃটিশ বণিকদের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকা সৌদী-আরবে তৈল আহরণের অধিকার পাইয়াছে। সেবার তেহরাণ হইতে ফিরিবার সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিনা কারণে রাজা ইবন্ সৌদের সহিত মোলাকাৎ করেন নাই। এই সব কারণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়াকে এই অঞ্চল হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্য পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির গুরুত্বও তেমনি। সুতরাং এই অঞ্চল সম্বন্ধে সে উদাসীন থাকিতে পারে না। ইরাণে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ রহিয়াছে। সমগ্র ইরাণে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষপাতী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইরাণকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইতে পারে।

বৃটেন্‌কে আমেরিকার ঋণ

ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় আমেরিকার নিকট বৃটেনের ঋণের একটা বিরাট অঙ্ক মার্কিণ গভর্ণমেন্ট মকুব করিয়াছেন এবং বৃটেন্‌কে নূতন করিয়া মোটা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই ঋণের কতকাংশ দিয়া বৃটিশ রাজ্যে অবস্থিত মার্কিণ পণ্য বৃটেন্ ক্রয় করিবে; অবশিষ্টাংশ সে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে। এই ঋণের সুদ নামমাত্র; ১৯৫১ সালের মধ্যে ইহা পরিশোধের কোনও দায়িত্ব নাই। ইহার পর ৫৫ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে পরিশোধ করিতে হইবে। আমেরিকার এই ঋণ প্রদানে কোনও উদারতা নাই—গূঢ় অভিসন্ধি লইয়া সে বৃটেনকে এই ঋণ দিয়াছে।

প্রথমতঃ বৃটেন্ আমেরিকা হইতে কাঁচা মাল ও কলকব্জা কিনিবার জন্য এই ঋণ ব্যবহার করিবে। এইভাবে বৃটিশ শ্রমশিল্প ও বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া তোলাই বৃটেনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই ঋণে মার্কিণ ব্যবসাই পরোক্ষে উপকৃত হইতে যাইতেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন ষ্টার্লিং অঞ্চলে বাণিজ্যের সুবিধা পাইল। বৃটিশ সাম্রাজ্য, বৃটিশের ম্যাণ্ডেটেড্ রাজ্য প্রভৃতি লইয়া এই ষ্টার্লিং অঞ্চল। এখনকার ব্যবসা এতদিন বৃটেনের মারফৎ চলিত; অর্থাৎ এখানকার বহির্ব্বাণিজ্যেও বৃটেন্ মোড়ল ছিল। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি যেখানে ইচ্ছা সেখানে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। এই সর্ত্তটি বৃটেনের অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে সজোর আঘাত করিয়াছে। এই কারণেই ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ-চুক্তি সম্পর্কে বৃটিশ রক্ষণশীল মহলে আমরা এত আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি, তাহাদের একচেটিয়া অর্থ-নৈতিক প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আমেরিকা এবার ভাগ বসাইল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া

বৃটিশ সঙ্গীণের সাহায্যে ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায় ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও চলিতেছে। ইন্দোচীনে এই কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এখানে ফরাসীদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশের পক্ষ হইতে বলা হয় যে,

জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য এবং বেসামরিক বন্দীদিগকে নিরাপদ স্থানে অপসারণের উদ্দেশ্যে তাহারা ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করিতেছে না। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে "সমুচিত শিক্ষা" দিবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিতেছে। গত ১৫ই নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে রয়টার সংবাদ দেয় যে "...radio reports that the Japanese soldiers were fighting shoulder to shoulder with the Allies. রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, জাপ-সৈন্য মিত্র-পক্ষের সৈন্যের পার্শে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইন্দোচীনে প্রাগযুদ্ধ-কালীন কর্তৃপক্ষ এবং ফরাসী "বড় সাহেবের" দল জাপানের সহিত পুরাপুরি সহযোগিতা করিয়াছিল। বৃটিশ সঙ্গীনের সাহায্যে তাহাদিগকে আবার ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে জাপ সৈন্যের সাহায্য লওয়া হইতেছে। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। জাপানীরা এশিয়াবাসী এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বগোত্র।

বৃটিশ সামরিক বিভাগ ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার চালাইয়াছে; বিমান হইতে নিরস্ত্র অধিবাসীদের প্রতি বোমা বর্ষণ, হিংস্র ট্যাঙ্ক নিয়োগ, নিরস্ত্র গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া—কিছুই বৃটিশ সৈন্য বাদ দেয় নাই। তাহাদের এই ফ্যাসিস্ত বর্ব্বরতার অন্যতম সহায়ক ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈন্য। কিন্তু এত করিয়াও ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করা সম্ভব হয় নাই। যাভার সুরাবায়া ও বাটাভিয়া বৃটিশ সৈন্যের অধিকারে আসিয়াছে বটে; কিন্তু এই দুইটি সহরে গুপ্ত প্রতিরোধ এখনও অত্যন্ত প্রবল। যাভার অবশিষ্টাংশে ইন্দোনেশিয়ান্ কর্তৃপক্ষের প্রভাব এখনও অটুট রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ানদের সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব ওলন্দাজ শাসক ভ্যান্-মুক্ ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই আলোচনার ফল কি হইবে, তাহা এখন বলা যায় না। তবে, এ কথা সত্য যে, ইন্দোনেশিয়ানরা পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পাইলে শান্ত হইবে না।

চীনের গৃহযুদ্ধ

চীনে কম্যুনিষ্টদের সহিত চুংকিং গভর্ণমেণ্টের মীমাংসার চেষ্টা আবার আরম্ভ হইয়াছে। এবার মার্কিণ প্রতিনিধি জেনারল জর্জ্জ মার্সালকে চিয়াং-কাই-সেক মুরুব্বি ধরিয়াছেন; এই বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিণ দূত হার্লি গোঁসা করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসন্তুষ্টির কারণ—চীনের কম্যুনিষ্টদের দমন করিবার জন্য আমেরিকা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। জর্জ্জ মার্সাল তাঁহার স্থানেই নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেনারল মার্সালের মধ্যস্থতা কম্যুনিষ্টরা মানিয়া লইবে কি না, তাহা এখনও বোঝা যাইতেছে না। জেনারল মার্সাল কম্যুনিষ্ট নেতাদের সহিত রুদ্ধদ্বারকক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাইতেছেন। এই আলোচনার ফলাফল কি হইবে, তাহা বোঝা যাইতেছে না। কম্যুনিষ্টদের নিকট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান দাবী—স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। কম্যুনিষ্টদের যুক্তি—সম্মিলিত কম্যাণ্ডের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না। চুংকিংএর প্রচারকারী কম্যুনিষ্টদের এই যুক্তিটি চাপা দিয়া জগৎকে কাঁদুনী শোনায় যে, এক রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি সেনাবাহিনী কেমন করিয়া থাকিতে পারে? বেসরকারী সেনাবাহিনী কেমন করিয়া থাকা সম্ভব? ৩।১।৪৬

নয়ী পলাশী

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

রাতের আকাশে সূর্য্য দেখেছ' কেউ?
নগরে হঠাৎ তেপান্তর—নির্মেঘ নভে ঝড়:
মাঠে সাগরের ঢেউ?
আঁধারেও রাঙা রৌদ্র ওঠে যে—ভুলেও ভেবেছ' কেউ?
আমি ত' দেখেছি ভাই—
বুলেটের ঘায়ে কিশোরের খুলি জ্বালালো কী রোশনাই!
একুশে রাত্রি নভেম্বর, তন্দ্রামগন মহানগর
সবুজ-রক্তে হঠাৎ দেখি সে লাল:
সারা পথে পথে ছড়ানো-ছিটানো কুসুমের কঙ্কাল!
শুনেছি কাঁদন রোল: কত না মায়ের খালি হ'য়ে গেল কোল!
ঊর্দ্ধ আকাশে শনির বলয় পুড়ে পুড়ে হ'লো ছাই:
তবুও সংজ্ঞা নাই—
ধূলার তীর্থে কিশোর-দেবতা কী মহামন্ত্রে ঠায়—
দু'টী রক্তের মিলন-মেলায় রজনী পোহালো, হায়!

সে কবে মনে যে পড়ে—
অস্ত-গোধূলি কালো হ'য়ে ওঠে পলাশীর প্রান্তরে।
ছলোছলো গঙ্গায়:
মীরমদনের শোণিত ঘনালো মোহনলালের গায়।
সে মহাপ্রাণের ঢেউ? মনে কি রেখেছে কেউ?
তারি ধারা এ যে পাক খেয়ে ওঠে দেড়শ' বছর পর:
এ কোন নভেম্বর
কঠিন শীতের রাত্রিকে করে সূর্য্য-স্বয়ম্বর!
সেই সূর্য্যেরি রৌদ্রে দেখিতে পাই:
কুয়াশা ছিঁড়েছে ভাই!
কচি হাড় আর রক্তে জমাট পথ ছুটে গেছে কোন
দিগন্তে জানা নাই—
শুধু, আছে আছে জানি—এ' পথেরি শেষে ঈপ্সিত প্রাঙ্গন:
আরো, আরো পদাতিক চাই।

সাময়িকী

বোলপুর ও রামপুরহাটে গান্ধীজি—

১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় সোদপুর হইতে যাত্রা করিয়া মহাত্মা গান্ধী সন্ধ্যা ৬টার সময় একটা স্পেশাল ট্রেনে করিয়া বোলপুরে পৌছেন। ষ্টেশন হইতে মোটরে ভুবনডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি পদব্রজে শান্তিনিকেতন আশ্রমে গমন করেন। তিনি মনে করেন যে শান্তিনিকেতন তাঁহার নিকট তীর্থক্ষেত্র—কাজেই তীর্থক্ষেত্রে তিনি গাড়ী চড়িয়া যাইবেন না। সোদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনটিকে প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে থামাইতে হয় কারণ প্রতি ষ্টেশনে গান্ধী দর্শনের জন্য জনতা অপেক্ষা করিতেছিল, লাইনের উপর শুইয়া তাহারা গাড়ীপর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিল। ৬ বৎসর পরে গান্ধীজি আশ্রমে গমন করিলেন। এইবার লইয়া গান্ধীজি ৬ বার শান্তিনিকেতন দর্শন করিলেন। অধ্যাপক তান-ইয়েন-সেন গান্ধীজিকে দর্শন করিবার জন্য বিমানযোগে চুং কিং হইতে আশ্রমে আসিয়াছিলেন—তিনি, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুত নন্দলাল বসু প্রভৃতি গান্ধীজিকে ফটকে অভ্যর্থনা করেন। আশ্রমে পৌছিয়াই গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন ও বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। প্রতি বুধবার প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতন আশ্রম মন্দিরে যে উপাসনা হয় গান্ধীজি বুধবার প্রাতঃকালে তাহাতে যোগদান করিয়া জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির সহিত শ্রীযুত পিয়ারীলাল, ভারতকুমারাপ্পা, মণিলাল গান্ধী, পরশুরাম জী, রাজকুমারী অমৃতকুমারী, রামকৃষ্ণ বাজাজ, কানু গান্ধী, ডাঃ সুশীলা নায়ার, আভা গান্ধী, প্রভাবতী সেন, আপতুস সালাম, কাঞ্চন বেন, সুধীর ঘোষ ও বিজয় ভট্টাচার্য্য তথায় গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপসনার পরে অধ্যাপক তান-ইয়েন সেন গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা হইয়াছিল।

বুধবার বিকালে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। খ্রীষ্টান ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তথায় এণ্ডরুজ মেমোরিয়াল হল নির্ম্মিত হইবে। ১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মৃত্যুর পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই স্মৃতিভবন নির্ম্মিত হইবে। প্রখর রৌদ্র সত্ত্বেও গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের মৃণ্ময় কুটীর 'শ্যামলী' হইতে পদব্রজে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী আম্রকাননস্থ ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে গান্ধীজি শ্রীনন্দলাল বসুর সহিত কলাভবন দেখিতে যান—কলাভবন হইতে পদব্রজে উত্তরায়ণে রবীন্দ্রভবন দর্শন করেন। ১৯৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন ও উহাতে তিনি বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের জন্য যথাশক্তি চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তার সময় মহাত্মা গান্ধী ইংরাজি ভাষা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা হিন্দী জানেন না, গান্ধীজি তাঁহাদের বাঙ্গালা কথাই শুনিয়াছেন। বাঙ্গালা ধীরে ধীরে বলা হইলে তিনি বেশ ভালই বুঝিতে পারেন। মাঝে মাঝে তিনি বাঙ্গালায় ২।৪টি কথা বলিয়া থাকেন।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টার সময়ও গান্ধীজি প্রভাতী প্রার্থনায় যোগদান করেন ও তাহার পর শিল্পী শ্রীযুত মুকুল দে'র চিত্রশালা দর্শন করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে সদলে গান্ধীজি স্পেশাল ট্রেনে রামপুরহাটে গমন করেন। শান্তিনিকেতনে এবার গান্ধীজি শ্যামলীতেই বাস করিয়াছিলেন। বেলা আড়াইটায় রামপুরহাটে পৌছিয়া প্রথমে তিনি বীরভূম জেলার কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা মায়া ঘোষের বাড়ীতে যান। তাহার পর তাঁহাকে টাউন হলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সম্বর্দ্ধনার পর তিনি রামপুরহাট পার্কে গমন করেন ও এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। বেলা সাড়ে ৪টার পর তিনি স্পেশাল ট্রেনে রামপুরহাট ত্যাগ করিয়া রাত্রি ১০টায় সোদপুরে ফিরিয়া আসেন। পথে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

এক বৎসরে স্বরাজ লাভ—

মহাত্মা গান্ধী এখনও প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত ৪ প্রকার কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, তবে এখনও এক বৎসরের মধ্যে দেশ স্বরাজ লাভ করিতে পারিবে। (১) একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক কোটি টাকা সংগ্রহ (২)

দেশব্যাপী চরকার প্রচার (৩) শক্তিশালী করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও (৪) অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন। কিন্তু কে সে কথা শুনিবে।

ভারত-সচিব ও ভারতের ভবিষ্যৎ—

ভারত-সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স গত ১লা জানুয়ারী লণ্ডন হইতে এক বক্তৃতায় ভারতবাসীদের লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতকে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অধিকারে অংশীদার করিয়া পূর্ণ ও স্বাধীন অবস্থা দান করিতে উৎসুক। সে বিষয়ে ভারতকে সাহায্য করিতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করা হইবে।" নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ হইলেই ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট হইবে।

নারী জাতির কর্ত্তব্য—

২রা জানুয়ারী কাঁথিতে এক মহিলার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি কথা বলিয়াছেন—"যে নারীর স্বামী দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সে নারী যদি তাহার সন্তান সন্ততিকে যথোপযুক্তভাবে পালন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত দেশ সেবা করিবেন, কেন না তাঁহার সন্তান-সন্ততিও উত্তর কালে দেশের সেবায় তাহাদের পিতার মতই আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে। তাহাদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মও যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা ও সূতা কাটিয়া পরিবারের বস্ত্রের সংস্থান করা কর্ত্তব্য।"

সুভাষচন্দ্রের সংবাদ—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কয়েকজন মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা লাহোরে ফিরিয়া যাইয়া ২৬শে ডিসেম্বর সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—নেতাজীর সহিত মিঃ ষ্ট্যালিনের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং রুশিয়ার নেতা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। জাপান আত্ম-সমর্পণ করার পর সুভাষচন্দ্র রুশিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম সীমান্তে রুশীয় সৈন্যগণ আজাদ-হিন্দ ফৌজের সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল—নেতাজী তাহাদের সহিত রুশিয়ায় বাস করিতেছেন ও উপযুক্ত সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন—অধিকাংশ মুক্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজ-সদস্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গীত—

গত ২৫শে ডিসেম্বর পাটনা বাঁকীপুরের ময়দানের সভায় এক যুবকের মুখে—কদমকদম বাড়ায়ে যা—আজাদ-হিন্দ ফৌজের এই রণসঙ্গীত শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ছুটিয়া মাইক্রোফোনের নিকট যাইয়া কি ভাবে রণসঙ্গীত গাহিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য ক্রমোচ্চসুরগ্রাম ও তেজের সহিত রণ-সঙ্গীতটি গান করেন এবং বলেন যে, ইহা একটি রণসঙ্গীত – ঠিক রণসঙ্গীতের মত করিয়াই ইহা গাহিতে হইবে।

সমগ্র বিশ্বে বিদ্রোহানল—

মিস্ পার্ল বাক খ্যাতনামা লেখিকা, তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। তিনি গত ১লা জানুয়ারী নিউইয়র্কে এক ভোজ-সভায় বলিয়াছেন—আমেরিকার প্রতি এসিয়ার অবিশ্বাস ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণতি লাভ করিতেছে। চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন ও কোরিয়ায় গণ অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিতেছে—যুদ্ধ পূর্ব্বকালের মতই সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আগুন। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রাচ্যে আজ যে ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিদূরিত করিয়া আস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর—কিন্তু তজ্জন্য আমেরিকাকে প্রাচ্য-জগতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে ও উক্ত স্বাধীনতাকে নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

কর্ণেল জগন্নাথরাও ভোসলা—

আজাদ হিন্দ-ফৌজের অন্যতম নেতা কর্ণেল জগন্নাথরাও ভোসলা এখন দিল্লী লাল কিল্লায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ১৯০৬ সালে মহারাষ্ট্রে প্রসিদ্ধ ভোসলা পরিবারে তাহার জন্ম হয়—সিন্ধিয়া রাজবংশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। তিনি ডেরাডুনে ও স্যাণ্ডহার্ষ্টে সামরিক কলেজে সমরবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ভারতীয় সেনাবিভাগে কমিশন লাভ করেন ও জাপানের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি পরে আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী হন ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তিনি রুশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

মালয় ও ব্রহ্মে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা—

নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ ডি মানি সম্প্রতি মালয় ও ব্রহ্মের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—ব্যাঙ্কক-রেঙ্গুন রেল নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া ৮০ হাজার ভারতীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ সকল হতভাগ্যদের পরিবারবর্গ মালয়ে দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। মালয়ে চট পরিহিত ভারতীয় মহিলাদের প্রায়ই পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। মালয় ও ব্রহ্মে ভারতবাসীর অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। এখনই তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করার ব্যবস্থা হওয়া

প্রয়োজন। মালয়ে ভারতীয়গণ যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়ের লোকের কষ্ট হয় নাই। এখনও বহু ভারতীয়কে পুলিসের হেফাজতে রাখা হয় ও তাহাদের উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হয়।—আমরা ভারতবাসীরা এই সংবাদ জানিয়াও কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব?

বাঙ্গালোরে দীপালী উৎসব—

অন্যান্যবারের মত এবারও বাঙ্গালোরের প্রবাসী বাঙ্গালীরা একত্র হইয়া দীপালী উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই প্রসঙ্গে নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহার পর প্রীতিভোজনের আয়োজন উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে।

কংগ্রেসের হীরক জুবিলী—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের সর্ব্বত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হীরক জুবিলী উৎসব সোৎসাহে সম্পাদিত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ এলেন অক্টেভিয়াস হিউমের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জন্ম হয় ও প্রথম বৎসর বোম্বায়ে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। এখন সেই কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম রাজনীতিক গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পরে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রূপ পরিবর্ত্তিত হয় ও তদবধি গত ২৫ বৎসরকাল কংগ্রেসের নূতন স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে।

গান্ধী-গভর্ণর সাক্ষাৎ—

গত ২২শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট হইতে রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল উভয়ের আলোচনা চলিয়াছিল। এইবার লইয়া কলিকাতায় ৫ বার গান্ধীজি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্ধীজি বাঙ্গালা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

পণ্ডিত নেহরুর সফর—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসাম সফর শেষ করিয়া ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৮টায় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। ট্রেণ ৬টায় কলিকাতায় আসবার কথা ছিল—কিন্তু দুই ঘণ্টা পথে বিলম্ব করে। পণ্ডিতজী ষ্টেশন হইতে সরাসরি কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় গমন করেন—তথায় প্রায় দুই লক্ষ লোক পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পণ্ডিতজী সে সভায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন শনিবার সারা দিন তাঁহাকে নানা সভায় বক্তৃতা করিতে হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রদের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন কালিকা থিয়েটারে পণ্ডিতজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এক মর্ম্মর মূর্ত্তির উদ্বোধন করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে পণ্ডিতজী ১০নং রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীটে শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সে সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত বীণা সিনেমাতে 'আমীরী' চলচ্চিত্র দেখিতে গিয়াছিলেন—ঐ চিত্রে বস্তীজীবনের দুরবস্থা চিত্রিত করা হইয়াছে। ঐ দিন বেলা তিনটায় বড়বাজার গিরিশ পার্কে এক সভায় পণ্ডিতজীকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও ৪৮ হাজার টাকা পূর্ণ একটি থলি পণ্ডিতজীকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। শনিবার রাত্রিতে ট্রেণ না থাকায় পণ্ডিতজী মোটরযোগে কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে চলিয়া যান। রাত্রি ১টার সময় তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছেন ও 'উদীচী' নামক যে গৃহে রবীন্দ্রনাথ বাস করিতেন, তথায় রাত্রিযাপন করেন। ২৩শে ডিসেম্বর সকালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় পণ্ডিতজী সভাপতিত্ব করেন। সভার শেষ দিকে পণ্ডিতজী সভাস্থল ত্যাগ করায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ সভায় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। রবিবার অপরাহ্নে চীন-ভারত সংস্কৃতিক পরিষদের বার্ষিক সভায়ও পণ্ডিত নেহরুকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সভা হইতে পণ্ডিতজী সরাসরি পাটনার পথে বর্দ্ধমানে গমন করেন। পণ্ডিত নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁহার দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্র রাজীব শান্তিনিকেতনে ছিলেন—তাঁহারাও পণ্ডিতজীর সহিত পাটনা যাত্রা করেন। পণ্ডিতজী সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেখানেও পণ্ডিতজীকে টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

২৪শে ডিসেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পাটনায় যাইয়া তথায় সহিদনগরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। পাটনা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রগণ নিজেদের রক্তে এক অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সম্মিলনে পণ্ডিত নেহরুকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে বিহার প্রদেশ যাহা করিয়াছে তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিহারের সকল অংশেই ঐ আন্দোলন দেখা গিয়াছিল—তাহার তীব্রতা বালিয়ার আন্দোলন অপেক্ষা ভীষণতর ছিল—১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ অপেক্ষা বিহার সেদিন অধিকতর

সায়েন্স কলেজের সভায় পণ্ডিতজীর বক্তৃতা ফটো—ডি-রতন

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে পণ্ডিতজী ফটো—ডি-রতন

কলিকাতার এসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স অফ্ কমার্শের সভায় লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (বাঙ্গালা কংগ্রেসের সভাপতি) ফটো—তারক দাস

আচার্য্য কৃপালানী ফটো—পান্না সেন

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব (উড়িষ্যার নেতা) ফটো—পান্না সেন

কলিকাতায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ফটো—পান্না সেন

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করিতেছেন ফটো—ডি-রতন

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ যাইতেছেন
ফটো—পান্না সেন

পণ্ডিতজীর সহিত সংবাদপত্রপ্রতিনিধিবর্গ

সম্মুখে (বাম দিক হইতে) শ্রীশম্ভু চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও শ্রীতারক দাস (অমৃতবাজার পত্রিকা পিছনে বাম দিকে—শ্রীমণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) দক্ষিণে-শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন (অমৃতবাজার পত্রিকা)

ওয়ার্কিং কমিটির সভা ভঙ্গে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের গৃহ পরিত্যাগের সময় মহাত্মাজী ও মৌলানা আজাদ্ শ্রীমতী আভা গান্ধীর সহিত পরিহাস করিতেছেন ফটো—তারক দাস

কন্যা ও পৌত্রীসহ নাগরদোলায় পণ্ডিতজী ফটো—তারক দাস

যাদবপুরে পণ্ডিত নেহরু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফটো—তারক দাস

ওয়ার্কিং কমিটির একটি দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

সংগ্রাম করিয়াছিল। লোক সে সময়ে আত্মার নির্দ্দেশে কাজ করিয়াছে—কাহারও নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে নাই—উহাই সেদিনের আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মিঃ আসফ আলী ফটো—পান্না সেন

গৌহাটীর পথে পণ্ডিতজীর ভাষণ ফটো—তারক দাস

বাঙ্গালার কংগ্রেসকর্ম্মী ও গান্ধীজি—

গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার বিকালে বাঙ্গালার প্রায় একশত কংগ্রেসকর্মী সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সম্পাদক কালীপদ মুখোপাধ্যায়,

নেতাজীর চিত্র
শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত অঙ্কিত

ঈশ্বরদী ষ্টেশনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা ফটো—তারক দাস

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, বীণা দাস প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি সেদিন বক্তৃতা করেন নাই—সকলের

প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থান মজদুর সংঘের প্রায় ২৫০ জন কর্ম্মীও গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে এম-দত্ত প্রভৃতি শ্রমিক কর্ম্মীদের

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও গান্ধীজি—

গত ২রা জানুয়ারী মেদিনীপুর কাঁথিতে এক কর্ম্মী সভায় মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস সুভাষ বসু এখনও জীবিত

আগড়পাড়ায় মুক্ত রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী ফটো—তারক দাস

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পণ্ডিতজী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ কে চক্রবর্ত্তী ফটো—ডি-রতন

সহিত উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি সকলকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আছেন ও কোথাও লুকাইয়া আছেন। আমি তাঁহার সাহস ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করি—কিন্তু তিনি যে উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার আস্থা নাই। ভারতবাসীরা তরবারি দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না।" এতদিন পরে গান্ধীজি যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন, ইহাই সান্ত্বনার কথা। সুভাষচন্দ্র যে অবস্থায় পড়িয়া নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে অবস্থায় লোকের অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।

গঠনমূলক কার্য্য—

মহাত্মা গান্ধী দেশের কর্ম্মীবৃন্দকে বার বার গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হইতে আবেদন জানাইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"গঠন কর্ম্মের তালিকা আমার ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের গঠন কর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুস্তিকাখানি আমার পুস্তিকারই ব্যাখ্যা স্বরূপ। একথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, আমরা যে সকল রকম কাজের কথা বলিয়াছি তাহা নয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে—এই মুদ্রিত কর্ম্ম তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই, এমনতর অনেক কাজের কথা মনে হইতে পারে। স্থানীয় কর্ম্মীদিগকে এই সকল কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" গান্ধীজির ঐ আদর্শ অনুসারে হুগলী জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে ভূয়েড়া ও গোপালদহে বাঁধ নির্ম্মাণ করেন—প্রথমবারে ঐ কার্য্য বিফল হইলে পরে ১৫টি স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া ঐ অঞ্চলের ৫খানি গ্রামের মাঠে জল দিবার ব্যবস্থা হয়। ফলে ১১ হাজার বিঘা জমীতে সেচের জলে ৫৫ হাজার মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। ঐ ধানের মূল্য ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তাহা ছাড়া জল পাইয়া ঐ অঞ্চলে পিঁয়াজ, আলু, আখ, তিল প্রভৃতিরও ফসল বাড়িয়া যায় ও কৃষকগণ কমপক্ষে অধিক এক লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল পায়। জল বিল ও দিঘীতে যাওয়ায় মৎস্য চাষেরও সুবিধা হয়। ৬০৭জন কংগ্রেস সেবক অবৈতনিকভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঐ কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই কার্য্যে মোট ৪২ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। জলকর বাদে ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও বাকী টাকা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে হুগলী হইতে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুকুমার দত্ত, শ্রীরাধানাথ দাস ছাড়াও কংগ্রেস-

ওয়ার্কিং কমিটির পথে ফটো—স্বপনকুমার সেন

সোদপুরের পথে একখানি যাত্রীপূর্ণ স্পেশ্যাল ট্রেণের দৃশ্য

ফটো—পান্না সেন

সেবক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, গৌরহরি রক্ষিত, শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সিংহ রায় প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টা ও অর্থব্যয় দেশের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। বোরো ধান সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বল্পমাত্র সংগঠন শক্তি ঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে বাঙ্গালার বহু স্থানে নদীনালার সামান্য সংস্কার-সাধন বা সাময়িক বাঁধ নির্ম্মাণ প্রভৃতির দ্বারা শস্যোৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের ২০ গুণ পর্য্যন্ত অধিক মূল্যের ফসল পাওয়া যায়। কৃষকরাও স্বেচ্ছায় খরচের টাকা আদায় দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, শুধু নিঃস্বার্থ কর্ম্মচেষ্টার দ্বারা তাঁহাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে হয়। এই পথে কৃষক সংগঠন ও আর্থিক কল্যাণ এই উভয় দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়। পল্লী উন্নয়নকামী কর্ম্মিদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে দেশ প্রকৃত উপকার লাভ করিতে পারিবে।

বিহার প্রাদেশিক বীমা সম্মিলন—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পাটনা টাটা হলে বিহার প্রাদেশিক বীমা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বাঙলা দেশের খ্যাতনামা কবিকে বীমা-কর্ম্মী ও বীমা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও বক্তা হিসাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পাটনার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণ দেন। বদ্রীদাস বর্দ্ধন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। বিহারে এই প্রকার বীমা সম্মেলন এই প্রথম।

স্কুল কলেজে প্রার্থনা ও গান্ধীজি—

১লা জানুয়ারী মেদিনীপুর কাঁথিতে প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী সকল স্কুল, মক্তব, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতির কর্তৃপক্ষকে প্রত্যহ প্রার্থনার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—প্রার্থনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে স্কুল কলেজে প্রার্থনার প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিয়াছি। ভারতে নীতি ও ধর্ম্মহীন শিক্ষা ভারতবাসীকে বিপথগামী করিয়াছে। স্কুল কলেজে প্রার্থনার ব্যবস্থা হইলে তাহার মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অভ্যন্তরে ঘুরিয়া আসিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়—বাঁকুড়ার লোক ইতিমধ্যেই শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে ২।৩ মাসেই অবস্থা আরও খারাপ হইবে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইতিমধ্যেই গৃহস্থালীর বাসনপত্র ও গহনা বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে বা করিয়া ফেলিয়াছে। সামান্য চাউল ও জঙ্গল হইতে আহরিত শাকপাতার উপর তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করিতে হইতেছে। একটি কুটীরে যাইয়া আমি দেখি, ঘরে খাদ্য নাই—রান্নার ভান করিয়া শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য শুধু জল ফোটান হইতেছে। প্রকাশ, এই বাঁকুড়া হইতেই কয়েক মাস পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ১২ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া প্রায় লক্ষ মণ চাউল বিদেশে পাঠাইয়াছেন। যে চাল বাঁকুড়ায় ১২ টাকা দরে কেনা হইয়াছিল, তাহাই কলিকাতা অঞ্চলে রেশনের দোকানে ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে, মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অবস্থা বাঁকুড়ার অবস্থা অপেক্ষা একটু ভাল। তবে ঐ সকল অঞ্চলে অন্য জেলা হইতে চাউল প্রেরণ করা প্রয়োজন। চিনি, সরিষার তেল, কাপড় প্রভৃতির অভাব তিনি সর্ব্বত্রই দেখিয়া আসিয়াছেন। এখন হইতে যদি সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে হয় ত দুর্ভিক্ষ নাও হইতে পারে।

নূতন পরিষদের অধিবেশন—

আগামী ২১শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে নব নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস

দলের সদস্য সংখ্যা ৫৮ জন ও লীগ দলের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। ১০২ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৬৮ জন নূতন লোক। প্রকাশ এবার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। পুরাতন পরিষদে বাঙ্গালার সার আব্দার রহিম সভাপতি ছিলেন।

রায়-ভট্ট সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে ১০৬ বৎসর বয়স্ক বৈষ্ণব পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব

শ্রীঅমূল্যধন রায়-ভট্ট

সাহিত্যিক ও পাণিহাটী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়-ভট্টকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল এবং নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইয়াছে। বহু কবি ও সাহিত্যিক পত্র দিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রায়-ভট্ট মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনা তাঁহাকে বৈষ্ণব জগতে অমর করিয়া রাখিবে।

আজাদ-হিন্দ ভাণ্ডারে দান—

কলিকাতা সিমলা ৯নং জগদীশনাথ রায় লেন নিবাসী খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীলমাধব সেনগুপ্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া এক মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধাইয়া আজাদ-হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল উহা কলিকাতায় অবস্থানকালে গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডারে দান করা হইবে।

শিল্পী শ্রীপান্না সেন—

খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী শ্রীমান পান্না সেন গত ২২শে ডিসেম্বর বেতারে সঙ্গীত দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা তিনি রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। রেডিওর সঙ্গীত বিভাগে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এইভাবে অর্থদান করিলেন। গত ৩

শ্রীপান্না সেন

বৎসর নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে 'পোষ্যপুত্র' 'পথের সাথী' ও 'বসুমাতা' চিত্রে তিনি সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কার্য্য করিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর সম্বর্দ্ধনা—

আজাদ-হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন সুশীলকুমার গাঙ্গুলী কিছুদিন পূর্ব্বে নীলগঞ্জ বন্দীনিবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার অধিবাসী। গত ১৫ই পৌষ উত্তরপাড়ার অধিবাসীরা এক বিরাট সভা করিয়া ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জ্জি গ্রেপ্তার—

গত ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হানয়ে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুরে আনা হইয়াছে। ঐ দলে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জ্জি আছেন। তিনি লাহোরনিবাসী সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও নিজে কিছুদিন আগে বাঙ্গালার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করিলে তিনি উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে ভারতে আনয়ন করা হইবে।

শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—

এবার বাঙ্গালার রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি রাজসাহীর খ্যাতনামা

শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর ৺কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও নিজে আজীবন দেশহিতব্রতী। এ দেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়াছিলেন ও পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। গত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সুবক্তা বলিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রীয় পরিষদেও তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

সেনানীত্রয়ের মুক্তিলাভ—

দিল্লীর লাল কিল্লায় আটক আজাদ হিন্দ-ফৌজের সেনানীত্রয় ক্যাপ্টেন সা-নওয়াজ, লেপ্টেনাণ্ট ধীলন ও ক্যাপ্টেন সাইগলকে ৩রা জানুয়ারী মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। লাল কেল্লার সামরিক আদালত কর্ত্তৃক তাঁহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের জঙ্গীলাট উক্ত দণ্ড মকুব করিয়াছেন। সেনানীত্রয়ের অন্য দণ্ড মকুব হইলেও জঙ্গীলাট তাহাদের পদচ্যুতি, বকেয়া বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্তির দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে আনুগত্য ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কোন অফিসার বা সৈন্যের পক্ষে গুরুতর অপরাধ।" মুক্তিলাভের পর তাঁহারা তখনই লালকিল্লা হইতে দিল্লীতে এক বন্ধুগৃহে গমন করেন। দেশবাসীবৃন্দের সমবেত দাবী স্বীকার করিয়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতৃত্রয়কে মুক্তি দান করিয়া জঙ্গীলাট বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন।

আগড়পাড়ায় রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই ডিসেম্বর ২৪ পরগণা আগড়পাড়া গ্রামে বিবেকানন্দ সমিতির মাঠে বারাকপুর মহকুমার মুক্ত রাজবন্দীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করেন। পাণিহাটীর অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র, কামারহাটীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দমদমের শ্রীযুক্ত কানাই দাস ও শ্রীযুক্ত গৌরদাস, বরাহনগরের শ্রীযুক্ত গণপতি দত্ত ও হালিসহরের শ্রীযুক্ত গৌর গাঙ্গুলী সকলেই সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী—সভায় উপস্থিত ছিলেন। সোদপুরের শ্রীরজনী মুখোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

অক্ষয় শতকোৎসব—

গত ১০ই ও ১১ই পৌষ হুগলী চুঁচড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের জন্মের শত বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সকালে চুঁচড়া কদমতলায় সাহিত্যাচার্য্যের পৈতৃক গৃহে পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের পৌরহিত্যে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উহাতে অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র, গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্নে হুগলী মহসীন কলেজে চন্দননগরনিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অক্ষয়চন্দ্রের গৃহটি ভারতীয় পুরাতন স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষণ আইনানুসারে যাহাতে রক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনেও হুগলী কলেজেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রবীণতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ উৎসব উপলক্ষে চুঁচড়ার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়কে যে পত্র দিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিলাম—তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী যদি অক্ষয় শতকোৎসব না করে, সে কাজ পাপের মত তার সঙ্গ নিয়ে থাকবে—সে কলঙ্ক দুরপনেয়। বাঙ্গালার ইতিহাস তা লজ্জানত শিরে বহন করবে। বাঙ্গালায় যাঁরা সাহিত্যের জন্মদাতা, বঙ্কিম যুগের স্বর্ণস্তম্ভ, বঙ্গদর্শনের রক্ষকগোষ্ঠী, তাঁদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী অক্ষয়চন্দ্রের শতবার্ষিকী যোগ্যতম সম্মানে সুসমাধা না হলে যে গুরুহন্তা হয়ে থাকতে হবে। তিনি নামেই অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন না, আমাদের সাহিত্যেও অক্ষয় হয়েই থাকবেন। * * একটি কথা সসঙ্কোচে বলছি। অক্ষয়চন্দ্রের নিজের কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রেখে যান নি—অন্ততঃ আমার জানা নেই। তাঁর 'সাধারণী' পত্রিকাই তাঁর পরিচয় বহন করে। তাহাও এখন সাধারণের অগোচরে গিয়ে

পড়েছে। ইংলণ্ডে আজিও কিন্তু এডিসনের স্পেক্‌টেটার পত্রিকার সংস্করণের পর সংস্করণ দেখা দিচ্ছে। আমাদের সময় সাধারণীকেই আমরা স্পেক্‌টেটারের মতই দেখতুম ও সম্মান দিতুম। তাই প্রস্তাব কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—এমন কেহ কি নাই, যিনি অক্ষয়চন্দ্রের সেই অমূল্য প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচনান্তে পুস্তকাকারে প্রকাশের ভার নেন। সুখের বিষয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা অক্ষয়চন্দ্রের "জীবনী—জীবনপঞ্জী—পুরাতন প্রসঙ্গ সূক্তিসমুচ্চয়-সঙ্কলন" করে 'তর্পণ' নাম দিয়ে উৎসব উপলক্ষে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের কথা দেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালা দেশের সকল পুস্তকাগার ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে আমরা আগামী এক বৎসরের মধ্যে একদিনও অন্ততঃ সভাদি করিয়া অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

ইন্দুপ্রভা দেবী—

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইন্দুপ্রভা দেবী গত ২রা পৌষ সোমবার রাত্রিতে

ইন্দুপ্রভা দেবী

তাঁহার কাশীর বাড়ীতে ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বামী সতীশচন্দ্র ও পুত্র রামচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি ২৪পরগণা রহড়া বালকাশ্রম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ও বেলিয়াঘাটায় উপেন্দ্র মুখার্জ্জী মেমোরিয়াল হাসপাতালে দশ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ কন্যা (একজন অবিবাহিতা), বিধবা শাশুড়ী, বিধবা পুত্রবধূ ও ৪ বৎসর বয়স্কা পৌত্রী বর্ত্তমান।

প্রাচ্য বাণীমন্দিরে ঈদ্-বিজয়া উৎসব

সম্প্রতি প্রাচ্যবাণীমন্দিরে সম্মিলিত ঈদ্ বিজয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কোরাণ ও উপনিষদ্ পাঠ, ইসলামীয় ও ভারতীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি ও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা সকলের চিত্তাকর্ষণ করে। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মুসলমান রাজগণের সংস্কৃত-প্রীতি ও সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানগণের দান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ মিলন সভার অত্যাবশ্যকতার কথা আলোচনা করেন।

ডাক্তার অজিতমোহন বসু—

কলিকাতা ৮৬ বালীগঞ্জ প্লেস নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার অজিতমোহন বসু গত ২৮শে ডিসেম্বর ৬২ বৎসর বয়সে

ডাঃ অজিতমোহন বসু

পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এদেশে প্রথম ইলেকট্রো-হাইড্রোপ্যাথী চিকিৎসা ব্যবসা করেন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ঐ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি স্বর্গত সার জগদীশচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

ক্যাপ্টেন প্রতুলপতি গাঙ্গুলী—

গত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ক্যাপ্টেন প্রতুলপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ আমরা গত মাসে প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে আই এম এস হইয়া পরে ৮ বৎসর ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ও ৬ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ খুব বেশী ছিল—সেজন্য তিনি কয়েকবার লণ্ডন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসা বিষয়ক সকল সাময়িক পত্র পাঠ করিতেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা মেডিকেল রিভিউ পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

ডাঃ প্রতুলপতি গাঙ্গুলী

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—

গত ১২ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৫বি মহানির্ব্বাণ রোডে নিজবাসগৃহে ৬২ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বিচারক হিসাবে কাজ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিকও ছিলেন এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন ও 'লোকান্তর' নামে একখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'পারায়ণ' নামে অপর একটি ধর্ম্মগ্রন্থ এখনও যন্ত্রস্থ। তিনি স্বামী শিবানন্দের শিষ্য ছিলেন। পবিত্র, পরোপকারী, ধর্ম্মপরায়ণ ও অমায়িক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—

বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২০শে ডিসেম্বর সকালে ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার হাওড়ার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করিতেন ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অঘোরনাথ অধিকারী—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা বালীগঞ্জ ২৫ হিন্দুস্থান পার্কে স্বগৃহে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

খেলা-ধুলা

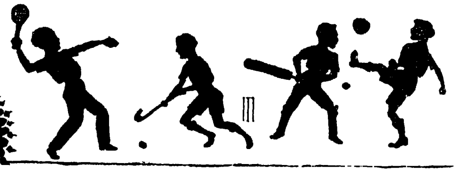

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ান্স ক্রিকেট ঃ

সাউথ জোন ঃ ১৫৯ ও ২৩৩

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ১৯৫ ও ১৯৮ (৮ উইকেট)

তিনদিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্স দল ৬ উইকেটে সাউথ জোন একাদশকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষে এই জয়ই তাদের প্রথম। সাউথ জোন টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করে! প্রথম ইনিংসের ১৫৯ রানে আইবারার ৪৯ এবং পালিয়ার ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য। এলিস ২১ রানে ৪ এবং প্রাইস ৩৩ রানে ৪ উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ হ'ল। বেশী রান করলেন জে ওয়ার্কম্যান ৭৬। তি'ন ১৫৭ মিনিট উইকেটে খেলেছিলেন। মোট রানে ১টা ছয় এবং ৪টা বাউণ্ডারী ছিল; গুলমহম্মদ ৫৬ রানে ৪ এবং রাম সিং ৫৭ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে সাউথ জোন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। দলের ৪৯ রানে প্রথম উইকেট পড়লো। লাঞ্চের সময় দলের ঐ রানই রইলো। তখন জনষ্টোনের ২১ রান এবং আইবারা তখন শূন্য। লাঞ্চের পর দলের মোট রানে আর কিছু যোগ না হয়েই দ্বিতীয় উইকেট পড়লো। আইবারের সঙ্গে আস্তার আলি জুটী হয়ে খেলার অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে দিলেন। এর পর তৃতীয় এবং চতুর্থ উইকেট ১১৮ রানে পড়লো। চায়ের সময় ১৪৭ রান দেখা গেল ৫ উইকেটে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাউথ জোনের ৮ উইকেটে ২১৩ রান উঠলো। আইবারা ৪৫, রামসিং ৪২ এবং গোপালন ৪১ রান করে আউট হলেন। তৃতীয় দিনের খেলায় আর মাত্র ১০ রান যোগ হলে পর সাউথ জোনের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৩ রানে শেষ হ'ল। এই ইনিংস শেষ হ'তে ২০০ মিনিট সময় লাগে।

খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্সদের জিততে হ'লে ১৯৮ রান দরকার। হাতে সময় প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের এই রান তুলতে আর বেগ পেতে হ'ল না। চার উইকেটে প্রয়োজনীয় রান উঠে গেলে পর তারাই বিজয়ী হ'ল। এই ইনিংসে ওপনিংস ব্যাটস্ম্যান ডি কার্মোডী ৮৭ রান করে নট আউট রইলেন। ডি ক্রিষ্টোফানীর নট আউট ৫৭ রানও উল্লেখযোগ্য। গোলাম মহম্মদ একাই ৫৯ রানে ৪টে উইকেট নিলেন।

অলিম্পিক ঃ

ইউনাইটেড ষ্টেট্স অলিম্পিক কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ গষ্টাভাস কির্বে এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, পরবর্ত্তী 'অলিম্পিক গেম' ইউরোপেই অনুষ্ঠিত হবে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় দল পাঠানো ব্যয় বাহুল্য বলেই লণ্ডন কিম্বা সুইজারল্যাণ্ডে অলিম্পিক গেম বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড ঃ

ইংলণ্ডের অন্যতম ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াল্টার হ্যামণ্ড ১৯৪৭ সালে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে এক সংবাদ পাওয়া গেছে। নিমন্ত্রণ পেলে তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়াগামী এম সি সি দলে যোগদান করবেন বলে জানা গেছে। ঐ বছরের খেলাই তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার শেষ অধ্যায় হবে। হ্যামণ্ডের বয়স বর্ত্তমানে ৪৪ বছরের কাছাকাছি। ভারতবর্ষের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় তিনি ইংলণ্ড দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করবেন।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ৩৬৯ ও ২৭৫

ভারতীয় একাদশ ঃ ৫২৫ ও ৯২ (৪উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়ান্স সার্ভিসেস একাদশ দলের সঙ্গে শেষ—তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়লাভ করে।

মাদ্রাজে ৭ই ডিসেম্বর তৃতীয় টেষ্ট খেলা সুরু হ'ল! অষ্ট্রেলিয়ান্স দল টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং ক'রে দিনের শেষে ৭

উইকেটে ৩১৫ রান করে। এ এল হ্যাসেটের নট্ আউট ১৩৩ রান এবং পেপারের ৮৭ রান উল্লেখযোগ্য। সি সারভাতে ৯২ রানে ৩টে উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করলেন। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ২৫ মিনিট খেলা হ'লে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস্ মোট ৩২০ মিনিট খেলার পর ৩৩৯ রানে শেষ হ'ল। সর্ব্বোচ্চ রান করলেন হ্যাসেট। তাঁর মোট ১৪৩ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী ছিল এবং ২২৮ মিনিট তিনি উইকেটে খেলেছিলেন। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য রান ৮৭ পেপারের। ব্যানার্জি ৮৬ রানে এবং সারভাতে ৯৪ রানে উভয়েই ৪টে উইকেট পেলেন।

ভি এম মার্চেন্ট এবং মুস্তাকআলি ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। মার্চেন্ট নিজে ১১ রান ক'রে দলের ৩১ রানে প্রথম আউট হলেন। মুস্তাক আলির সঙ্গে লালা অমরনাথ খেলতে নামলেন। মুস্তাক দলের ৫০ রানে নিজস্ব ২৮ রানে হ্যাসেটের কাছে ধরা পড়লেন। এর পর হাজারী এবং হাফিজ অমরনাথের সঙ্গে খেলে যথাক্রমে ১১ এবং ৮ রান ক'রে আউট হলেন। আর এস মোদী অমরনাথের সঙ্গে খেলতে নামলেন, তখন অমরনাথ ৬৮ মিনিট খেলে ৫১ রান করেছেন। মোদী খেলার প্রারম্ভে বেশ সুবিধা করতে পারেননি, রান খুবই ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। দলের ১৭০ মিনিট খেলার সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল মোট ১৫২ রান উঠেছে—অমরনাথের তখন ৮০ এবং মোদীর ১৩ রান। অমরনাথ উইকেটের চারপাশে একাধিক দর্শনীয় বল মেরে ১২৯ মিনিট খেলে নিজস্ব শত রান পূর্ণ করলেন। এবারের টেষ্ট খেলায় অমরনাথের এই প্রথম সেঞ্চুরী। দলের মোট ১৮৭ রানের সময় অমরনাথ ১০৩ রান করেছেন, তার মধ্যে বাউণ্ডারী বারটা। নিজস্ব ১১৩ রানের মাথায় অমরনাথ প্রাইসের বলে ক্যাচ তুলে কার্মোডীর হাতে ধরা দিলেন। এই রান তুলতে তাঁর ১৪১ মিনিট সময় লাগে। মোট বাউণ্ডারী ১৪টি। এদিকে মোদী ৯৬ মিনিট খেলে ৫৩ রান করেছেন, বাউণ্ডারী ৬টা, দলের রান ২৩৫। গুল মহম্মদ তাঁর জুটী হ'লেন। চা-পানের সময় দলের রান হ'ল ২৪০। মোদী বেশ স্বচ্ছন্দভাবে খেলে রান তুলতে লাগলেন। দিনের শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৫ উইকেটে ৩০১ রান উঠেছে। মোদী ৮৫ এবং গুল মহম্মদ ৩৮ রান করে নট আউট আছেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় গুল মহম্মদ ৯৫ মিনিট খেলে ৫৫ রান করে আউট হলেন। এর মধ্যে ৭টা বাউণ্ডারী। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীতে তিনি এবং মোদী ১১৯ রান তুলেছিলেন। সারভাতে মোদীর জুটী হলেন। মোদী ৩ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে তাঁর শত রান পূর্ণ করলেন। প্রতিনিধিমূলক খেলায় এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। এদিকে সারভাতে মাত্র ২ রান করে আউট হলেন। তাঁর স্থানে সি এস নাইডু এসে মোদীর জুটী হলেন। দলের ৪৪৭ রানে ৪ ঘণ্টা খেলে মোদী ১৫০ রান করলেন। এই রানে মোট ১৬টা বাউণ্ডারী ছিল। সি এস নাইডু করলেন ৫০ রান ৬৫ মিনিট খেলে যখন দলের রান ৪৪৯। নাইডু ৬৭ রানে প্রাইসের বলে স্লিপে উইলিয়মসের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁর ৮ম উইকেটের জুটীতে ৮০ মিনিটে ১৪০ রান উঠেছিল। মোদীর সঙ্গে ব্যানার্জি খেলতে লাগলেন। লাঞ্চের সময় দলের রান ৮ উইকেটে ৫০৪। মোদী ১৮৬ এবং ব্যানার্জী ৫। লাঞ্চের পর খেলার মাঠে দর্শক সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার দাঁড়াল। মোদীর খেলা দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হ'ল। দলের ৫২০ রানে ব্যানার্জী ৮ রান করে আউট হলেন। এ সময় মোদীর রান ১৯৯। শেষ খেলোয়াড় মাকা মোদীর জুটী হ'লেন। ৩০৭ মিনিট খেলে মোদী ২০৩ রান করলেন, মোট বাউণ্ডারী ২২; দলের রান তখন ৫২৪। এলিসের বলে ড্রাইভ মারতে গিয়ে মোদী বোল্ড হ'লেন। মোদী অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় নট আউট ২০৩ রান করে রেকর্ড করলেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের রিগসের ২০০ রানের। মাকা এক রান করে নট আউট রইলেন। পেপার ১১৮ রানে সব থেকে বেশী ৪টে উইকেট পেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। সূচনা খুবই ভাল হ'ল। দিনের শেষে ১৪৮ রান উঠলো এক উইকেটে। হুইটিংটন ৬২ রান করে আউট হলেন। ডি কার্মোডি ৭২ এবং পেটিফোর্ড ২ রান করে নট আউট রইলেন।

চতুর্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ২৮০ মিনিট খেলার পর ২৭৫ রানে শেষ হ'ল। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ৯০ রান প্রয়োজন। হাতে সময় ১৩০ মিনিট। অষ্ট্রেলিয়ান্স দল খুব সতর্কতার সঙ্গে ফিল্ডিং করতে লাগলো। প্রথম উইকেট ৫৯ রানে, দ্বিতীয় ৭৬ রানে এবং তৃতীয় ৮৮ রানে এবং ৪র্থ ঐ রানে পড়ে গেল। ৪ উইকেটে ৯২ রান উঠলে পর ভারতীয় দল বিজয়ী হ'ল। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন মার্চেন্ট ৩৫ এবং মুস্তাক আলি ৩৭।

ভারতীয় দল : ভি এম মার্চেন্ট (অধিনায়ক), এস মুস্তাক-আলি, এল অমরনাথ, আব্দুল হাফিজ, ভি এস হাজারী, আর এস মোদী, গুল মহম্মদ, সি-টি সারভাতে, সি এস নাইডু, এস এন ব্যানার্জী, ই এস মাকা।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দল : এ-এল হ্যাসেট, ডি-কে কার্ম্মোডি, আর

হুইটিংটন, জে পেটিফোর্ড, সি প্রাইস, কে মিলার, সি পেপার, ডি ক্রিষ্টোফানী, উইলিয়ামস, এস সিস্‌মে, আর এলিস।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান (Highest Total)—অষ্ট্রেলিয়ান্স: ৫৩১ রান, ভারতীয় দলের বিপক্ষে বোম্বায়ের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে: ৫২৫ রান। মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় একাদশ এই রান করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কম রান (Lowest Total)—অষ্ট্রেলিয়ান্স: ১০৭ কলকাতায় পূর্ব্বাঞ্চল একাদশের বিপক্ষে। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে: ১৩১ রান। কলকাতায় পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দল এই রান করেন।

ব্যক্তিগত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান—অষ্ট্রেলিয়ান: এ এল হ্যাসেট ১৮৭, দিল্লীতে প্রিন্সেস একাদশের বিপক্ষে। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে: আর এস মোদী ২০৩ রান, মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় একাদশের পক্ষে।

শতাধিক রান: অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের পক্ষে—এ এল হ্যাসেট: ১৮৭ রান এবং ১২৪ দিল্লীর প্রিন্সেস একাদশের বিরুদ্ধে এবং ১৮৩ রান মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে। পেটিফোর্ড: ১২৪ রান বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্টম্যাচে এবং ১০১ রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে। কার্মোডী: ১২৪ রান বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে। মিলার: ১০৬ রান বোম্বাইয়ের ওয়েষ্ট জোন খেলায়। উইলিয়ামস: ১০০ রান* দিল্লীর প্রিন্সেস একাদশের বিরুদ্ধে। হুইটিংটন: ১৫৫ রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে শতাধিক রান: রেগ—২০০ রান* পুণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। আব্দুল হাফেজ—১৭৩ লাহোরে নর্থ জোনের পক্ষে। আর-এস মোদী—১৬৮ রান বোম্বাইয়ের ওয়েষ্ট জোনের পক্ষে এবং ২০৩ রান মাদ্রাজে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে। অমরনাথ—১৬৩ দিল্লীতে প্রিন্সেস একাদশের পক্ষে এবং ১১৩ রান মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে। ভি-এম মার্চেণ্ট—১৫৫ * রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে। * নট আউট।

অষ্ট্রেলিয়ান দলের ব্যাটিং এভারেজ

পর্য্যায়ক্রমে পাঁচজন খেলোয়াড়ের ব্যাটিং এভারেজ

	ইনিংস	বেশীরান	মোট রান	এভারেজ
হ্যাসেট	১১	১৮৭	৮৬৪	৮৬'৪
কার্ম্মোডী	১৪	১১৩	৫৯২	৪৫'৫
পেপার	১০	৯৫	৩৬৪	৪০'৫
হুইটিংটন	১২	১৫৫	৩৯৬	৬৬'০
পেটিফোর্ড	১৩	১২৪	৪১৭	৩৪'৭

অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন ঃ

বোম্বাইয়ে অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান দেবীন্দরমোহন পাঞ্জাবের চ্যাম্পিয়ান প্রকাশনাথের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ১৫-৯, ১-১৫ এবং ১৫-১২ পয়েণ্টে দেবীন্দরমোহনকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস মমতাজ চিনোয় এবং মিস এফ তলায়ার খাঁ (বোম্বাই) ১৫ ১০, ৬-১৫ এবং ১৫ ৬ পয়েণ্টে মিস সুমন দেওধর এবং সুন্দর দেওধরকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে জি লুইস এবং দেবীন্দরমোহন (পাঞ্জাব) ১৫ ৫ এবং ১৫ ৯ পয়েণ্টে ভি ম্যাডগাওকার ও ডি জি মণ্ডুইকে (বোম্বাই) হারিয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মমতাজ চিনোয় (বোম্বাই) ১১ ৬ এবং ১২ ৯ পয়েণ্টে মিস সুন্দর দেওধরকে (পুণা) হারিয়েছেন।

মিক্সড ডবলসে প্রকাশনাথ এবং মিস্ সুমন দেওধর (পাঞ্জাব পুণা) ১৮-১, ৮-১৫ এবং ১৫-১০ পয়েণ্টে দেবীন্দরমোহন ও মিস সুন্দর দেওধরকে হারিয়েছেন।

বেঙ্গল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডবলসের ফাইনালে এ বছর প্রথম বাঙ্গালী খেলোয়াড়দ্বয় বিজয়ী হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ম্যানমোহন ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩, ৫ ১ গেমে ঈরসাদ হোসেনকে পরাজিত করেছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের ডবলসের ফাইনালে দীলিপ বসু ও খসু সেন ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে সুমন্ত মিশ্র এবং ম্যানমোহনকে হারিয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসে মিস ডি সানসোনী ৬ ৪, ৬ ২ গেমে মিস নোলানকে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলসে দীলিপ বসু ও মিস্ স্যানসোনী ৬ ২, ৬ ৪ গেমে ঈরসাদ হোসেনকে হারিয়েছেন।

অল ইণ্ডিয়া টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঘস্ মহম্মদ ৭-৫, ৬-৩, ৬ ৩ গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস স্যানসোনী ৬-১, ১০-১২, ৬ ২ গেমে মিসেস এস-আর মোদীকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে জে এম মেটা ও সুমন্ত মিশ্র ৭ ৫, ৬-৩, ৬-৩ গেমে ঘস্ মহম্মদ ও এস-এল-আর সোহানীকে পরাজিত করেন।

সি-জে-এডি ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট বোলার সি-জে-এডি পরলোকগমন করেছেন। তিনি ১৮৯৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। ঐ বছরের অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টদলের আর মাত্র একজন খেলোয়াড় জীবিত আছে তাঁর নাম জো ডাবলিং।

আন্তঃপ্রাদেশিক স্কুল ক্রিকেট ঃ

ক্রিকেট খেলার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে আন্তঃপ্রাদেশিক স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমান বছরে আটটি প্রাদেশিক স্কুল টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। খেলা এইভাবে হয়েছিল—(১) বোম্বাই বনাম হায়দ্রাবাদ; (২) মাদ্রাজ বনাম বিহার, (৩) বাঙ্গলা বনাম সিন্ধু; (৪) বরোদা বনাম মহারাষ্ট্র।

প্রতিযোগিতার ফাইনালে সিন্ধু প্রদেশ বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে খেলেছিল, সিন্ধু প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় কুচবিহার ট্রফি বিজয়ের প্রথম সম্মান পেয়েছে।

ফাইনাল ফলাফল ঃ

সিন্ধু ঃ ৯৯ ও ৩৯৪ (এ যোগাসিয়া ১৫০, সার দিনসা ৮৪, এইচ মাবেদ ৫৪; ১৩১ রানে ৯ উইকেট বি ইরাণী)

বোম্বাই ঃ ১৫৭ (বি ইরাণী নট আউট ৬৭) ও ১৯৩ (বি ইরাণী ৫৩)

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হোলকার ঃ ৪৩৩ (বি নিম্বলকার ১০৬, জে এন ভাস্না ৮৯, মুস্তাকআলি ৫০, সি টি সারভাতে ৪৮, সি-এস নাইডু ৬০)

বিহার ঃ ১৪২ ও ১০৪

হোলকার এক ইনিংস ও ১৮৭ রানে বিহার প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

মহীশূর ঃ ১৫৮ ও ২৯২ (বি ফ্রাঙ্ক ৮৩, কে তারাপুর ৬৬, পি শ্যামসুন্দর ৫২; রঙ্গচারী ১০৪ রানে ৫ উইকেট)

মাদ্রাজ ঃ ১৭২ ও ১৬৬ (রামারাও ৩৯ রানে ৫ উইকেট)

দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে মহীশূর ১১২ রানে বিজয়ী হয়েছে।

বরোদা ঃ ৩২৮ (এইচ অধিকারী ১২৯, এম এম নাইডু ৬৬; ম্যানসিং ৭৯ রানে ৪ উইকেট) ও ৩৬৫ (অধিকারী নট আউট ১৫১; ভি, হাজারী ৮৭)

নওনগর ঃ ২১৮ (যাদবেন্দ্র সিং ৫৮; আমীর ইলাহী ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

প্রথম ইনিংসের ১১০ রানে অগ্রগামী থেকে বরোদা নওনগরকে পরাজিত করেছে।

বাঙ্গলা প্রদেশ ঃ ১২৬ ও ২৩৯

যুক্তপ্রদেশ ঃ ৯৮ ও ২২২

বাঙ্গলা প্রদেশ ৪৪ রানে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করেছে।

হায়দ্রাবাদ ঃ ৩৩৯ (আইবারা ১২৮, হোসেন ৮৫, গুলাম মহম্মদ ৭৬)

স-পি এবং বেরার ঃ ১৫৪ (গুলমহম্মদ ৬৫ রানে ৭ উইকেট) ও ১২৭

দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় হায়দ্রাবাদ এক ইনিংস এবং ১১৮ রানে সি পি এবং বেরারকে পরাজিত করেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সতীকুমার নাগ সম্পাদিত স্বাধীন ভারতের ইতিহাস "আজাদ হিন্দ ফৌজ"—১৷৹

হরিপদ পাণ্ডে প্রণীত উপন্যাস "অভিসার"—১৷৹

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত নাটক "রামচন্দ্রের নরক দর্শন"—১৷৹, উপন্যাস "প্রিয়া ও জননী"—২৷৹

শ্রীপ্রভাত হালদার প্রণীত "ভয়ঙ্করের সাধনা"—৷৵৹

মনসা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নতুন সূর্য"—৸৵৹

শ্রীসন্তোষকুমার পাল প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যুগান্তরের গান"—১৲

শ্রীসুকুমার রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবজাতক"—২৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ দমদম · বোম্বাই মাদ্রাজ · দিল্লী · লাহোর

VR—207

এগারোটা বাজে

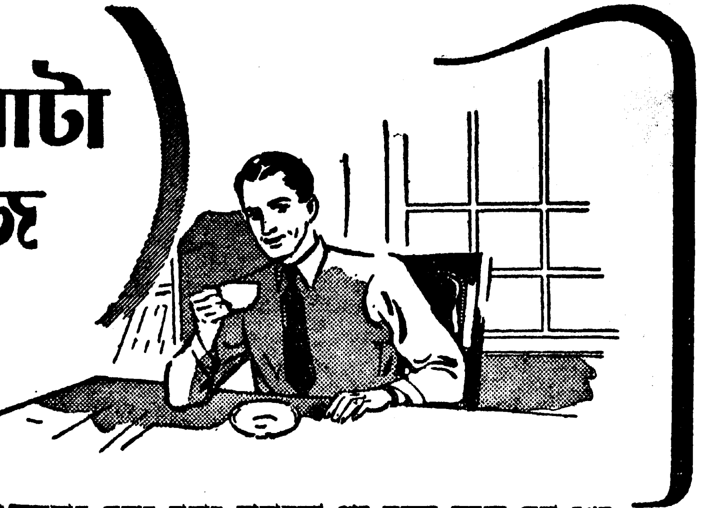

সকাল বেলার হাজার তাড়াহুড়ো শেষ করতে করতে বেলা যখন এগারোটার কাছে গড়ায়, তখন এক কাপ গরম চা ভালোই লাগে। বুদ্ধিজীবী কি শ্রমজীবী, অফিসের বাবু কি বাড়ির গিন্নী—সকলের পক্ষেই ঐ সময়ে এক কাপ চা আনন্দ ও উৎসাহের বাণী বহন করে' আনে। চা শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করে' কাজকর্মে নতুন উদ্যম এনে দেয়।

চায়ের যাঁরা ভক্ত, যাঁরা এর গুণাগুণ বোঝেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই চা-পানের পুরোপুরি উপকারটা পান না। এর কারণ তাঁরা চা তৈরি করার সহজ নিয়মগুলির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেন না। যখনি চিন্তার ভারে শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়, তখনি চায়ের স্মরণ নিন, কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন চা-টা যেন ভাল ভাবে তৈরি হয়।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

১। জল ফোটাতে ও চা ভেজাতে আলাদা আলাদা পাত্র ব্যবহার করবেন।

২। যে পাত্রে চা ভেজাবেন সেটা যাতে বেশ গরম ও শুকনো থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

৩। প্রত্যেক কাপের জন্য এক চামচ চা নিয়ে তার ওপর আর এক চামচ চা বেশি নেবেন।

৪। টাটকা জল টগবগিয়ে ফুটিয়ে নেবেন। একবার ফোটানো হয়েছে এমন জল আবার ব্যবহার করবেন না। আধ ফুটন্ত বা অনেকক্ষণ ধরে ফুটেছে এ রকম জলেও চা ভালো হয় না।

৫। আগে চায়ের পাত্রে পাতাগুলো ছাড়বেন এবং পরে গরম জল ঢেলে অন্তত পাঁচ মিনিট ভিজতে দেবেন।

৬। দুধ ও চিনি চা-টা কাপে ঢালার পর মেশাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

চা

সব সময়েই চলে

IK 247

ভারতবর্ষ

ফাল্গুন—১৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

STATE LIBRARY

অর্থই অনর্থের মূল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এ

স্বর্ণমান সমস্যা

(ক) ইংলণ্ড

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমরা স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার প্রধান প্রধান দুই একটি দেশের স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাক। প্রথমেই ইংলণ্ডের স্বর্ণমানের উত্থান পতনের ইতিহাসের একটা আভাষ দেওয়া হলো।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের জন্ম হয়। পূর্ব্বে ওদেশের স্বর্ণকাররা জনসাধারণের অর্থ নিজেদের কাছে গচ্ছিত রেখে তার বদলে যে রসিদ বা সার্টিফিকেট দিত; সেইটাই অনেক সময় এখানকার কাগজী-মুদ্রা বা নোটের মত একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে চলাফেরা করতো। তৃতীয় উইলিয়ম যখন ইংলণ্ডের রাজা তখন আর্থিক টানা-টানির জন্য তাঁর হঠাৎ কিছু টাকার বিশেষ দরকার হয়ে পড়ায় এই স্বর্ণকাররা তাঁকে শতকরা বার্ষিক আট টাকা সুদে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ দেয়। এর পরিবর্ত্তে রাজা মহাজনদের একটি চার্টার বা আজ্ঞা-পত্র দান করেন এবং তাতে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে তাদের ঐ পরিমাণ নোট ছাপাবার অনুমতি দেন। এই ব্যাঙ্কের নামই হয় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড এবং এই ব্যাঙ্ককে অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কের (Joint stock Banks) থেকে মুক্ত করে উত্তমরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্ককে নোট ছাপবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ছোট ছোট প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অবশ্য নোট প্রচলনের অধিকার রইলো। ১৯২১ সনে একমাত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড ব্যতিরেকে আর সমস্ত ব্যাঙ্কের ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক এক্ট অনুযায়ী নোট প্রচলন করা বন্ধ হয়ে গেল।

নেপোলিয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার বড়ই শোচনীয় পরিণতি হতে থাকে এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল সেই সময় প্রায় নিঃশেষ হতে চলে। তারপর ফরাসীরা দেশে অবতীর্ণ হয়েছে—এই রকম একটি গুজবে ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিলে হঠাৎ চাপা পড়ে এবং অনুপায় হয়ে সরকারী এক ঘোষণানুযায়ী ব্যাঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে প্রচুর

পরিমাণে নোট বার করতে থাকে। এতে দেশে নোট বা টাকার মূল্য কমে গেল, সোনার দাম ভীষণ ভাবে বেড়ে চললো এবং স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে একরকম উধাও হয়ে গেল। এই অবস্থায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে আবার সুদৃঢ় করার জন্য ১৮১০ খৃষ্টাব্দে হাউস অফ্ কমন্স কমিটী (House of Commons Committee) নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁরা বুলিয়ন রিপোর্ট (Bullion Report of 1810) নামে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করেন। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের ক্যাশে টাকার পরিবর্ত্তে নোট দিবার নীতিকে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরা এই মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে নোটের পরিবর্ত্তে যে কোন মুহূর্ত্তে একমাত্র স্বর্ণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকলেই নোটেও অত্যধিক ও স্বেচ্ছাচারী প্রচলন বন্ধ করা যায়।

রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড বুলিয়ন কমিটির রিপোর্ট মত কাজ করেনি, কিন্তু শীঘ্রই তাদের ফলভোগ করতে হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির পর দেশব্যাপী একটা আর্থিক অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয় ও সেই গণ্ডগোলে দেশের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক-মামলা করে। এতে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন বন্ধ হয়ে দেশে আর্থিক সঙ্কোচন দেখা দেয় এবং পণ্যমূল্য ও সোনার দাম আবার বাড়তে আরম্ভ করে। এই সময় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান প্রথা অবলম্বন করে এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড পুনরায় নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে স্বীকৃত হয়।

ছোট খাট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময়ই ফেল করতে থাকায় এবং নোট প্রচলন সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি নিয়ম না থাকায় ইংলণ্ডের আর্থিক জগতে প্রায়ই অনিশ্চয়তা দেখা দিতে থাকে এবং অনেক সময়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নোট বাজারে দেখা দিতে আরম্ভ করলো। এই সময় ওদেশে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের সৃষ্টি হয় (Currency school ও Banking school)। একদল বলে যে ব্যাঙ্ক যে কাগজীমুদ্রা ছাপায়—তা শুধু ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত্তে, সুতরাং প্রত্যেকটি নোটের পশ্চাতে সমপরিমাণ সোনা ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত থাকা প্রয়োজন। ভিন্ন দলের মত ছিল যে নোটের মোট পরিমাণ স্থির করার ভার ব্যাঙ্কের উপরই একেবারে ছেড়ে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে ব্যাঙ্ক নিজ নোটের মোট পরিমাণ স্থির করবে। এতে প্রত্যেকটি কাগজীমুদ্রার জন্য তহবিলে সম পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখার প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমান কালে একের পর এক দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করে যে উপায়ে দেশের কাগজী মুদ্রার পরিমাণ আজ স্থির রাখছে, তার গোড়া পত্তন হয়েছিল দেখা যায় এই সময়ই। কিন্তু প্রথম দলেরই সেদিন জিৎ হয় এবং এই কারেন্সী স্কুলের মতানুযায়ী ১৮৪৪ সনের সুবিখ্যাত ব্যাঙ্ক আইন (The Bank charter act of 1844) গঠিত হয়। এই আইনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নোট, পশ্চাতে শুধু মাত্র সরকারী কাগজ (Securities) জমা রেখেই বার করবার অনুমতি দেওয়া হয়। এর জন্য স্বর্ণ জমা রাখার কোন প্রয়োজনই নেই। এর উপর আর যা কিছু নোট প্রচলন করা হবে তার প্রতিটির পশ্চাতে অবশ্য সমপরিমাণ সোনা জমা রাখতে হবে। এই রকম নোট প্রচলনের প্রথাকে ফিডিউ-সিয়ারী ইস্যু প্রথা (Fiduciary Issue system) বা প্রচ্ছন্ন প্রথা বলা হয়।

বিনা সোনায় যে কাগজীমুদ্রা বার করা যাবে তার সীমা এত কম থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের বাড়তির জন্য প্রয়োজন হলে বা যতক্ষণ আর সোনা না আসছে, ততক্ষণ ব্যাঙ্ক কোনক্রমেই আর নোট ছাপাতে পারবে না। কাজেই মুদ্রার অল্পতা বা মুদ্রাকৃচ্ছতা দেখা দেবার কথা। কিন্তু ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক এক্টের এই প্রধান ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে এই এক্ট কাগজী মুদ্রার অত্যধিক বৃদ্ধি ও তৎজনিত মুদ্রার অবচয়ের (depreciation) হাত থেকে ইংলণ্ডকে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা করে চলেছে। উপরোক্ত ত্রুটী সংশোধনের জন্য ১৯১৪ সনের আর একটি এক্ট (The currency and Bank notesAct of 1914) গভর্ণমেণ্টের অনুমতিতে বিশেষ প্রয়োজনের সময় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে প্রয়োজনানুযায়ী নোট ছাপাবার ক্ষমতা দেয়। পূর্ব্বে অনেক বারই ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনের তাগিদে আইন ভেঙ্গে সোনা ছাড়া নোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং অনেক বারই আবার নূতন আইন করে এই বাবদ নোট ছাপাবার সীমাকে ক্রমশই উর্দ্ধে উঠান হয়েছে। অবশেষে ১৯২৮ সনের আর একটি এক্ট দ্বারা (The Currency and Bank act of 1928) বিনা সোনায় শুধু সরকারী কাগজ (Securities) তহবিলে রেখে ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ডের নোট ছাপাবার অধিকার ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়লে সরকারী অনুমতি নিয়ে প্রথমে মাত্র ছয় মাসের জন্য এর চেয়েও বেশী নোট—সরকারী কাগজ পশ্চাতে জমা রেখে বার করা চলবে। এই বাবদ নোট বার করার এই সংখ্যাকেও অনেকে কম বলে মনে করেন এবং ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে ম্যাক্ মিলিয়ান কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেন (The Report of the Macmillian committee) যে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে এই বাবদ ৩৮০,০০০,০০০ পাউণ্ডের নোট ছাপাবার অধিকার দেওয়া হোক এবং এই নোট ছাপাবার উর্দ্ধতম সীমাকে ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে রাখা হউক। এই কমিটী এও বলেন যে, ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিল যেন কিছুতেই ৭৫,০০০,০০০ পাউণ্ডের নিচে সচরাচর না নামে। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে সরকারী অনুমতি নিয়ে সাময়িক ভাবে কিছু কমান যেতে পারে। তারপর ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থার চাপে পড়ে ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হয় এবং যদিও তার স্বর্ণও সরকারী কাগজের তহবিল ও প্রচলন সম্বন্ধে মোটামুটি পূর্ব্বের নিয়ম কানুনই রয়ে গেল কিন্তু স্বর্ণমান ত্যাগ করায় নোটের পরিবর্ত্তে চাওয়ামাত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের স্বর্ণ দেওয়ার আর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না।

গত যুদ্ধের সময় আবার অবস্থার চাপে পড়ে ইংলণ্ডকে সাময়িকভাবে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হয়। যুদ্ধের অন্তে পরে বিশ্বের যার যা কিছু ইংলণ্ডের কাছে পাওনা ছিল সকলেই তা চেয়ে বসলো এবং ইংলণ্ড থেকে

হু হু করে সোনা বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগলো। সেই সময় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড তার সুদের হার (Rank Rate) দশ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেয়, যাতে করে বিদেশীরা বেশী সুদের আশায় ও দেশেই টাকাটা জমা রাখে। আইন দ্বারা সোনা ছাড়া নোট প্রচলনের সীমাকে আরো উর্দ্ধে উঠিয়ে দেওয়া হলো এবং ট্রেজারী নোটের প্রচলন আরম্ভ হলো। এই ভাবে ইংলণ্ড সেদিন দুর্দ্দিনকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের পর স্বর্ণমানে ফিরে যাবার জন্য আবার আন্দোলন আরম্ভ হোলো। ১৯১৮ সনে কান্লিফ কমিটি (The cunlif committee) ইংলণ্ডকে স্বর্ণমানে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে অনুমোদন করে এবং এই জন্য আমেরিকার ডলারের সঙ্গে যুদ্ধ পূর্ব্বকার বিনিময় হারে পাউণ্ডকে নিয়ে যেতে বলে; কারণ যুদ্ধে ইংলণ্ডে অতিরিক্ত মুদ্রা বার হওয়ায় পাউণ্ডের মূল্য অনেক কমে যায় এবং এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে কাজেই যুদ্ধ-পূর্ব্বাপেক্ষা কম ডলার পাওয়া যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে ওই সময় দুইটি দল হয়। একদল কান্লিফ কমিটির মতানুযায়ী ইংলণ্ডে স্বর্ণমানে ফিরে যেতে বলে এবং আর একদল বলে যে স্বর্ণমানের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রথম দলকে sound currency school বা লণ্ডন স্কুল বলা হয় এবং দ্বিতীয় দলকে Managed currency school বা ক্যাম্ব্রিজ স্কুল বলা হয়। অবশেষে লণ্ডন স্কুলেরই জয় হয় এবং ১৯২৫ সনে ইংলণ্ড আবার স্বর্ণমানে ফিরে যায় এবং আমেরিকার ডলারের সঙ্গে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের যুদ্ধ-পূর্ব্বকার বিনিময় হার (Exchange Rate) স্থির হয়। কিন্তু এতে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার ঘোরতর ক্ষতি হয় এবং তার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এই ভুলেরই সাক্ষ্য দেয়।

১৯২৫ সনে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার ডলারের যুদ্ধ-পূর্ব্বেকার যে বিনিময় হার স্থির হয়, পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে তা ঠিক না হয়ে বেশী হারে ধার্য্য হয়েছিল। অর্থাৎ এক পাউণ্ড ৪.৮৬ ডলারের সমান, এই হারের চেয়ে আসলে এক পাউণ্ড তার চেয়ে কম ডলারে ধার্য্য করা অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সম্মত হতো। কিন্তু না হওয়ায় ইংলণ্ডের ঘোরতর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্রকৃত হারের চেয়ে যদি কোন মুদ্রা বেশী হারে স্থির করা হয় তবে সে দেশের রপ্তানী কমে গিয়ে আমদানি বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে হুহু করে দেশের টাকা বিদেশে চলে যায়। যেমন, এক পাউণ্ড যদি প্রকৃত ৩ ডলারের সমান হয়, অথচ ভুল বশত ৪.৮৬ ডলারের সমান বলে স্থির করা হয়—তাহলে বিলাতের ব্যবসায়ী আমেরিকা থেকে এক পাউণ্ড দিয়ে ৩ ডলারের স্থানে ৪.৮৬ ডলারের সমান বেশী মাল নিজ দেশে আমদানি করে প্রচুর পরিমাণে লাভ করতে পারবে, এমন কি নিজ দেশের মালের দামের চেয়ে কিছু কম দামে মাল ছেড়ে দিলেও তার যথেষ্ট লাভ থেকে যায়। কাজেই বিদেশী মালে দেশ ভরে যাবে। ঠিক বিপরীতভাবে আমেরিকার ব্যবসায়ী ইংলণ্ড থেকে মাল আমদানি করতে বিশেষ চাইবে না, কারণ তাতে তাকে ৩ ডলারের পরিবর্ত্তে ৪.৮৬ ডলার অর্থাৎ বেশী দাম দিয়ে বিলাতের মাল কিনতে হবে। কাজেই এ দিকে যেমন বিলাতের আমদানি বাড়বে, অন্যদিকে তার রপ্তানি খুবই কমে যাবে এবং দেশের টাকা বিদেশে চলে যেতে থাকবে। ১৯২৫ সন থেকে ইংলণ্ডের সেই অবস্থাই হলো। তারপর ১৯২৯ সনে দেখা দিল বিশ্বব্যাপী ঘোরতর আর্থিক দুর্দ্দিন (Economic depression)। এই অবস্থায় ৬ বৎসর টানা হিঁচড়ার মধ্য দিয়ে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে করতে ১৯৩১ সনে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়। ১৯৩১ সনের সেদিনকার সেই আর্থিক ওলোটপালোটের মধ্যে ইংলণ্ডের স্বর্ণমান ত্যাগ আর্থিক জগতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ বিষয়ে তাই আমাদের কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

১৯১৪-১৮ সনের মহাসমরের পর থেকেই ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছিল। ইংলণ্ডকে বাঁচতে হয় অন্য দেশের উপর নির্ভর করে। অন্য দেশের কাঁচা মাল কিনে এনে তার দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্য তৈরী করে বিশ্বের হাটে সে তা আবার বিক্রি করে। এইভাবে বহির্বাণিজ্যের লাভ দ্বারা ইংলণ্ডবাসী তাদের ঠাটবাট বজায় রেখে চলে আসছে। ঐ যুদ্ধে অবরোধ প্রথার জন্য অনেক দেশ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মাল না আসায় নিজেরাই সে সব মাল প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দেয়। সুতরাং যুদ্ধের পর ইংলণ্ড দেখলো যে বাহির বিশ্বে তার মালের কাট্‌তি অনেক কমে গেছে। ভারতে তাদের এক চেটিয়া বাজার, কিন্তু এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বিশেষ করে বিলাতী কাপড় চোপড় বিক্রী বহুল পরিমাণে কমে গেল। এই সব কারণে মাল আমদানী ও রপ্তানী দ্বারা পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যে প্রচুর লাভ থাকতো তা ক্রমেই কমে আসতে থাকে। ১৯২৯ সনে আমদানি থেকে রপ্তানি শতকরা মাত্র ১৩৮ পাউণ্ড বেশী ছিল; ১৯৩০ সনে সেটা দাঁড়ায় ৩৯ পাউণ্ডে; অবশেষে ১৯৩১ সনে রপ্তানির থেকে আমদানিই বেশী হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের পর পরাজিত জার্ম্মানীর উপর এত অধিক করের বোঝা (Reparation) চাপান হয় যে তাতে তার প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিজীত দেশকে অত টাকা কর দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জার্ম্মাণী যাতে নিজেদের শিল্পোন্নতির দ্বারা এই কর দিতে পারে এই আশায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্ম্মাণীকে টাকা ধার দিয়ে তার শিল্পের মূলধন যোগাতে থাকে। জার্ম্মাণী এই টাকা কর্জ্জ পেয়ে আর্থিক অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতিও করে ফেললো। কিন্তু সুদের হার বেশী থাকায় তার লাভ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। ১৯২৮ সনের শেষে নিজেদের দেশে আর্থিক গোলযোগের জন্য আমেরিকা জার্ম্মানীকে আর নূতন করে টাকা ধার দিতে রাজী হয় না। ফলে জার্ম্মানীর বিশেষ করে অর্দ্ধসমাপ্ত শিল্পগুলির অবস্থা টাকার অভাবে সঙ্গীন হয়ে উঠে। জার্ম্মানীর আর্থিক ভাঙ্গনে ইংলণ্ডের সমস্ত টাকা জলে যায়, সুতরাং ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে প্রচুর অর্থ ধার দিতে আরম্ভ করে। এতে তার লাভও ছিল প্রচুর। আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদেশের লোকের টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিন টাকা সুদের সেই সব টাকা ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে ৮ টাকা সুদে ধার দিয়ে যথেষ্ট

পরিমাণে লাভবানও হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধ ঋণের বোঝা (war debts) এত অধিক চাপান হয়েছিল যে জার্ম্মানী এত টাকা কর্জ্জ পেয়েও কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী একটা ঘোরতর আর্থিক মন্দার ছায়াও ক্রমেই পৃথিবীর উপর এগিয়ে আসছিল। সব যায় দেখে ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে আরো কর্জ্জ দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। আমেরিকা ও ফ্রান্স ইংলণ্ডের এই বেপরোয়া ভাব দেখে সতর্ক হয়ে উঠে। ১৯২৫ সনে স্বর্ণমানে ফিরে যাবার পর ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের বিনিময় হার উচ্চে রাখার দরুণ (পূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে) ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থাও ক্রমেই অবনতির দিকে ধাবিত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে উপর্যুপরি কয়েকবার ইংলণ্ডের বাজেট ঘাট্‌তি দেখা দেয়। দেশের আয়ের থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হলে এই অতিরিক্ত ব্যয় নোট ছাপিয়ে পরে মিটান হবে এবং তাইতে হয়তো ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হবে ও তার পাউণ্ডের মূল্য কমে যাবে, এই আশঙ্কায় অন্যান্য দেশের মহাজনরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি পাউণ্ডের মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা কমে যায় তবে পূর্ব্বে এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যতগুলি ডলার বা ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্সের মুদ্রা) পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যাবে না, সুতরাং তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেলে কম ডলার বা ফ্রাঙ্ক নিতে হবে, এই ভয়ে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক থেকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মহাজনদের টাকা তোলার হিড়িক্ পড়ে গেল। ইংলণ্ডে তখন স্বর্ণমান, সুতরাং টাকার বদলে সোনা দিতে সে বাধ্য, তাই হু হু করে সোনাগুলি দেশ থেকে বার হয়ে যেতে লাগলো। এই রকম একটা দুর্য্যোগ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে তখন ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু সে আরো কিছুদিন দেখি দেখি ভাব করে কাটিয়ে দেবার পর যখন দেখলো যে আতঙ্ক বা অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না, এবং তার স্বর্ণ তহবিল এক রকম খালি হতে চলেছে তখন ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩১ সনে ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৫০ মিলিয়ন ডলার; অথচ সে যায়গায় আমেরিকার ৪৬০০ মিলিয়ন ও ফ্রান্সের ছিল ২৩০০ মিলিয়ন ডলার। আরো কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্ণমান ত্যাগ করলে, ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল এতটা খালি হতো না। ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুদেশও একের পর এক স্বর্ণমান ত্যাগ করে। আমেরিকা কিছুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের গোঁ ধরে রাখে। কিন্তু ১৯৩৩ সনে এপ্রিল মাসের এক দুর্য্যোগের ধাক্কায় সেও স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

স্বর্ণমান ত্যাগ করে সোনার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর ইংলণ্ডের মুদ্রা পরিমাণ দেশের আর্থিক প্রয়োজনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো। অন্যান্য কতকগুলি দেশ—যাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের লেন দেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তারাও স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর ইংলণ্ডের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। নিজেদের মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার যাতে স্থির রেখে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করা যায় সেইজন্য এরা সকলে মিলে একটি ষ্টার্লিং দল (sterling group) তৈরী করলো। ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর সঙ্গে নিজ নিজ মুদ্রার একটা স্থির সংযোগ স্থাপন করে এই সব দেশ নিজ নিজ দেশের মুদ্রাকে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এই দলের সকলেই একই মুদ্রানীতি অনুসরণ করবে, নিজের প্রয়োজন বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেউই কোন নিজস্ব পন্থা অনুসরণ করতে পারবে না—এইভাবে ষ্টার্লিং দলের সৃষ্টির দ্বারা এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে—যা কি স্বর্ণ বা রৌপ্য কারো উপর নির্ভর-শীল নয়।

ইংলণ্ড স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর খুব সফলতার সঙ্গেই নিজ দেশের মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এমন কি গত ঘোর দুর্দ্দিনের সময় যখন স্বর্ণমানে অবস্থিত বহুদেশের দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত উঠা-নামা করছিল, সেই সময় ইংলণ্ড এবং তার ষ্টার্লিং দলভুক্ত দেশগুলি নিজ নিজ মুদ্রাকে একটানা স্থির ভাবে রক্ষা করে চল্‌তে সক্ষম হয়। এইজন্য বিশ্বচক্ষে এই ষ্টার্লিং দল শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেকে এই দলে যোগদান করারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। সোনার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়েও যে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিদেশের মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় হার স্থির রাখার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারে, ষ্টার্লিং দল গত দুর্দ্দিনে অনেকটা তাই প্রমাণ করেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাসীর মধ্যে মুদ্রানীতি সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি দলের উদ্ভব হয়েছে। একটী স্বর্ণদল (gold block)—অর্থাৎ যারা স্বর্ণমান কায়েমের দ্বারাই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে; দ্বিতীয় আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত ষ্টার্লিং দল (sterling block)—যাদের প্রকৃতই একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামান (International standard) বলা যেতে পারে। আর তৃতীয় হলো, আমেরিকার নিজ দেশের ডলার সম্বন্ধে অনুসৃত নীতি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য দেশের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ব্যথা নেই, সে তার ডলারের মূল্য কম করে কি উপায়ে দেশের পণ্য মূল্যের বৃদ্ধি করা যায়, কেবল সেই চিন্তায়ই দুর্দ্দিনের সমস্ত বৎসরগুলি ধরে বিভোর ছিল। প্রথম দুইটি দল, অর্থাৎ স্বর্ণদল ও ষ্টার্লিং দল অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পক্ষপাতী, কারণ তা নইলে তাদের মুদ্রা প্রথা কায়েম রাখা দুষ্কর।

কিন্তু যে যে প্রথাই অবলম্বন করুক, মুদ্রানীতিতে অন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ভিন্ন মুদ্রামানকেই স্থির রাখা সম্ভব নয়। এই জন্যই গত-বৎসর আমেরিকার বৃটন উডস (Bretton woods) নামক স্থানে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ লোকেরা মিলে যুদ্ধোত্তর কালের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা পরিকল্পনা করেছেন (International currency plan)। আমেরিকা এখন চাইছে সকল দেশকে আবার স্বর্ণমানে ফিরিয়ে নিতে। কারণ তা হলেই তার কাছে যে রাশি রাশি সোনা জড়ীভূত রয়েছে, তার একটা সদ্‌গতি হয়। কিন্তু ইংলণ্ড এবিষয়ে একেবারে নিরুত্তর, কারণ বর্ত্তমানে স্বর্ণ সম্বন্ধে সে একরকম দেউলিয়া। কাজেই অনেক আলাপ আলোচনার পর ঐ আন্তর্জ্জাতিক সভায় যে পরিকল্পনা স্থির হয়, তাকে অনেকটা জগাখিচুড়ি বলা চলে,—অর্থাৎ, স্বর্ণের সঙ্গে

মুদ্রার কিছু সম্বন্ধ অবশ্য রাখা হয়েছে, তার আবার স্বর্ণমানে না থেকেও এই পরিকল্পনায় যোগদান করা যায়। ভারতবর্ষ এ পরিকল্পনায় যোগদান করবে কিনা এখনও স্থির হয় নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তা স্থির করা হবে। বারান্তরে এবিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন মুদ্রানীতির সাফল্যের জন্য যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মনোভাবের কথা বলছিলাম, আজ দুনিয়ার হাটে সে জিনিষটিরই অভাব সবচেয়ে বেশী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধে তো মিত্রপক্ষীয়রা জয়লাভ করলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকা আজ প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালীও হলো। কিন্তু বিশ্ব বলতেতো শুধু এই দুই দেশই বোঝায় না। অথচ তাদের মনোভাব যেন অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ, তারা যা বলবেন তাইতেই বিশ্বের মঙ্গল হবে, এইরকম একটা ভাবের ধোঁয়া যেন ইতি-মধ্যেই উঠে পড়েছে। ভারতের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, কারণ পরাধীন দেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন কথাই আসতে পারে না। কিন্তু আরও তো দেশ আছে। তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলিও একবার দেখা দরকার। তারপর বিজিত দেশগুলি আজ শক্তিহীন হয়ে পড়লেও চিরদিনই যে তারা সে অবস্থায় থাকবে তা কখন হয় না। সুতরাং তাদের সুখ সুবিধাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত শোষণ কার্য্য চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এর ফল কখনও ভাল হবে না। গতযুদ্ধের পর জার্ম্মানীর পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা লাভ করতে হলে আন্তর্জ্জাতিক সহানুভূতির প্রয়োজন। আর তা নইলে আন্তর্জ্জাতিকতার মূলে কুঠারাঘাতই করা হবে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রতুল চৌধুরীর বসবার ঘর। এক ধারে ঈজেলের ওপর মল্লিকা বসুর ছবি রয়েছে। আর একধারে টেবিলের ওপর ট্রেতে সাজান মদের বোতল, ডিক্যাণ্টার, গেলাস ইত্যাদি। একটা দেরাজযুক্ত টেবিলের ওপর পুরোণো একটা সুটকেশ রয়েছে। ঘরের জানালাগুলো খোলা। ঘর সোফা, আলমারি ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত)

প্রতুল। (নেপথ্যে) চলুন গিরীনবাবু, ভেতরে চলুন—

গিরীন। (নেপথ্যে) আচ্ছা, ধন্যবাদ!

(গিরীন ও সুটকেশ হাতে প্রতুলের প্রবেশ। টেবিলের ওপর সুটকেশটা রেখে প্রতুল ঘরের সমস্ত আলোগুলো জ্বেলে দিলে। বাহিরে যাবার দরজায় চাবী লাগাল)

গিরীন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমরা কার্য্যো-দ্ধার করেছি।

প্রতুল। (হেসে) কিন্তু করেছি এটা তো দেখতে পাচ্ছেন।

গিরীন। কেউ পিছু নেয় নি তো?

প্রতুল। (জানালার পর্দা টেনে দিতে দিতে) না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

গিরীন। আপিসে গিয়ে ব্যাগ খুলে ফণীবাবুর যে কি অবস্থা হবে—

প্রতুল। একটু ড্রিঙ্ক—(একটা গেলাসে একটু মদ ঢেলে আনলে)

গিরীন। কখনও খাই নি

প্রতুল। খান। নার্ভসে যা ষ্ট্রেন পড়েছে—

(গিরীনকে মদের গেলাস দিল)

গিরীন। (খেয়ে) আপিসে যা হৈচৈ পড়ে যাবে—

প্রতুল। তাদের সঙ্গে আপনার আর কি সংস্রব! আপনার সুটকেশের চাবীটা?

গিরীন। (চাবী বার করে) এই যে। (প্রতুলকে চাবী দিল) ফণীবাবু প্রথমে আমাকে পাঠাতে চেষ্টা করলেন। পায়ে চোট লেগেছে বলে কাটিয়ে দিতে ড্রাইভারকে যেতে বললেন। যখন সেও গেল না, তখন নিজেকেই যেতে হ'ল।

প্রতুল। কোন গণ্ডগোল হয় নি তো?

গিরীন। না। ছেলে খেলার চেয়েও সোজা। (মাথাটা নেড়ে) উঃ মাথাটা ভয়ানক ঘুরছে—

প্রতুল। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আপনি একটু চুপ করে বসে রেষ্ট নিন। দাড়ান, আপনাকে আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি—

(দেরাজ খুলে একটা শিশি বার করলে)

গিরীন। দিন। আমার কাপড় জামা—

প্রতুল। (এক গেলাস ব্র্যাণ্ডিতে শিশির ওষুধ মিশিয়ে) আপনার জন্য সাহেবী পোষাক পাশের ঘরে রেখেছি। নতুন নাম এবং নতুন পোষাক—

গিরীন। ভারী সুবিধা হবে। বিশেষ করে আমি চিরকাল ধুতি পরি, সুট পরলে কেউ চিনতেই পারবে না।

প্রতুল। এই নিন ওষুধ। ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে দিলুম। বলকারক হবে। (গেলাস দিল)

গিরীন। (গেলাস হাতে) কাল সকালের, হয়ত আজকের বিকেলের কাগজেই ব্যাঙ্ক ভ্যান লুটের সন্ধান বেরোবে। "সকাল সাড়ে দশটায়, দিনের আলোতে সকলের চক্ষে ধূলি দান—" খুব গরম খবর হবে—

(গেলাস মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় নিরঞ্জন ঘরে ঢুকল)

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু—

গিরীন। (চমকে গেলাস নামিয়ে) কে?

নিরঞ্জন। আমি। চিনতে পারছেন না?

গিরীন। (গেলাস হাতে) প্রতুলবাবু, আপনি যে বলেছিলেন বাড়ীতে কেউ নেই!

প্রতুল। তোমার দশটার সময় যাবার কথা ছিল না? বললে, আমি বেরোবার পরই তুমি যাবে—

নিরঞ্জন। কথা তাই ছিল বটে, কিন্তু যাওয়া হয় নি। আমি যাই নি।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। পরে বলব।

গিরীন। (গেলাস হাতে ভীত ভাবে) উনি কি সব জানেন?

নিরঞ্জন। জানি। কিন্তু আমাকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। দেখি গেলাসটা—(গিরীনের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল)

আপনার পক্ষে এখন আর মদ খাওয়া ঠিক নয়—

প্রতুল। তুমি যাও নি কেন?

নিরঞ্জন। আমি তো বলেছি, পরে বলব। (গিরীনের প্রতি) আপনি যান, আর দেরী করবেন না—

গিরীন। (ভীত ভাবে) কেন? ভয়ের কিছু ঘটেছে নাকি?

নিরঞ্জন। না।

গিরীন। সত্যি বলুন।

নিরঞ্জন। সত্যিই বলছি, এখন আর আপনার ভয়ের কারণ নেই।

গিরীন। আমি জানতুম না যে আপনিও এর মধ্যে আছেন।

নিরঞ্জন। আপনি গিয়ে কাপড় জামা বদলে ফেলুন—যত তাড়াতাড়ি পারেন।

গিরীন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কোথায় যেতে হবে প্রতুলবাবু।

প্রতুল। এই পাশের ঘরে। (একটা দরজা দেখালে)

গিরীন। বেশীক্ষণ লাগবে না। (দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে) সত্যি কোন ভয়ের কারণ নেই তো?

নিরঞ্জন। না, না।

প্রতুল। যান, কাপড় জামা বদলে আসুন। আমি ততক্ষণ ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলি।

গিরীন। আচ্ছা। (নিরঞ্জনের প্রতি) যখন ফিরে আসব আমায় আর চিনতে পারবেন না।

নিরঞ্জন। বটে। দরজাটা বন্ধ করে দেবেন তাহলে এফেক্ট আরও ভাল হবে।

গিরীন। আচ্ছা। এলুম বলে। (গিরীনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। লোকটা কাপড় জামা বদলে নিক—যদিও তোমার তা ইচ্ছা ছিল না।

প্রতুল। এ সবের অর্থ কি?

নিরঞ্জন। (মদের গেলাস দেখিয়ে) আমার ইচ্ছা ছিল না যে তুমি এ কাজ কর।

প্রতুল। এই জন্যই বুঝি তুমি যাও নি?

নিরঞ্জন। এটাও একটা কারণ বটে।

প্রতুল। যাক, তুমি যে থেকে গেছ ভালই হয়েছে। আমাদের সব প্ল্যান বদলাতে হবে।

নিরঞ্জন। বেশ। সব প্ল্যানই বদলাবে। প্রতুল, আমাকে রেহাই দিতে হবে—

প্রতুল। রেহাই দিতে হবে মানে?

নিরঞ্জন। দিল্লীতে যখন তুমি এই কাজে প্রথম ব্রতী হও, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলুম যে চিরকাল তোমায় সাহায্য করব—

প্রতুল। (চমকে) তবে কি বম্বেতে তুমি যাবে না?

নিরঞ্জন। না। আই অ্যাম সরি—

প্রতুল। কিন্তু তুমি না থাকলে—

নিরঞ্জন। আমি না থাকলেও চলবে।

প্রতুল। না। চলবে না। চলতে পারে না। নিরঞ্জন, আমার এইখানটায় কিছু গোলমাল হয়েছে। (পিঠের একটা স্থান দেখালে)

নিরঞ্জন। কি হয়েছে?

প্রতুল। গ্ল্যাণ্ডস্ বড্ড তাড়াতাড়ি ফেল করছে—

নিরঞ্জন। ফেল করছে?

প্রতুল। হ্যাঁ। কয়েকঘণ্টার মধ্যে বদলে ফেলা প্রয়োজন!

নিরঞ্জন। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এখনও মাস খানেক—

প্রতুল। তখন তাই ছিল বটে, কিন্তু এ ক'দিনের ভাবনায় আর আপসেটে—

(গম্ভীরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। মুখে চিন্তার রেখা)

নিরঞ্জন। নার্ভাস ষ্ট্রেনে ভয়ানক ডিজেনারেট করে—

প্রতুল। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে, তোমাকে দেখে আমি চমকে উঠলুম—সেই শকের পরে কি রকম বোধ করতে লাগলুম আর এইখানে একটা ব্যথা—

দু'হাতে কোমর চেপে ধরল

নিরঞ্জন। কি করবে?

প্রতুল। কিছু করবার নেই বন্ধু। যে বছরগুলিকে আমি ঠকিয়ে দূরে ঠেলে রেখেছি তারা উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবেই।

নিরঞ্জন। মানে তোমার কি মনে হচ্ছে যে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—

প্রতুল। এগজ্যাক্টলি!

নিরঞ্জন। এখুনি না বদলাতে পারলে—

প্রতুল। আর কয়েকঘণ্টা মাত্র বাঁচব। হয়ত' লোলচর্ম্ম শক্তিহীন বৃদ্ধের মত স্থবির হয়ে দিন দশ পনেরো টিকেও থাকতে পারি।

নিরঞ্জন। (একটু পরে ধীরে ধীরে) হয় ত' তাই ভাল—

প্রতুল। (অবাক হয়ে) নিরঞ্জন, তুমি-তুমি এই কথা বলছ!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এবং ঠিকই বলছি। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়াতে সুখ অথবা শান্তি কিছুই নেই।

প্রতুল। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। প্রতুল, আজ আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি তোমার এ সাধনা কতখানি নিষ্ফল।

প্রতুল। নিষ্ফল? কেন?

নিরঞ্জন। তোমার শরীরটাকে তুমি অমরত্ব দিয়েছ, কিন্তু তার জন্য দাম দিতে হয়েছে অনেক। দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব সব।

প্রতুল। আমার তা মনে হয় না।

নিরঞ্জন। হয় না কারণ তুমি অন্ধ, ভ্রান্ত। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ছাড়া আর তোমার কি আছে? কতগুলো লোকের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে তুমি তাদের পঙ্গু করে দিয়েছ, কতগুলো নিরীহ ব্যক্তিকে তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছ, ঘুষ, চুরি, খুন তোমার জীবন পথের অপরিহার্য্য অঙ্গ করে তুলেছ—অথচ তোমার মনে কখনও আঘাত দেয় নি, তোমার প্রাণ কখনও কেঁদে ওঠেনি, তোমার চোখে কখনও এক ফোঁটা জল আসে নি। এই কি জীবন! এরই জন্য কি তোমার মনুষ্যমেধ যজ্ঞ। নিজের আত্মাকে হত্যা করে শরীরকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ!

প্রতুল। আমাকে বাধ্য হয়ে ওসব করতে হয়েছে।

নিরঞ্জন। সৃষ্টির নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি সৃষ্টিছাড়া হয়েছ। মানুষকে ধ্বংস করে তুমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছ। তুমি বেঁচে থেকেও মরে আছ। তুমি সাধারণ মানুষের মত হাসতে পার না, মিশতে পার না, ভালবাসতে পার না। এমন কি অন্ধকারকে পর্য্যন্ত তুমি ভয় কর—(প্রতুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গিরীনের মদের গেলাস তুলে ধরে) আর যে চির অন্ধকারে তুমি গিরীনকে পাঠাবার মতলবে ছিলে, সে অন্ধকারকে যে কত বেশী ভয় কর তা প্রকাশ করা যায় না—

প্রতুল। এ ছাড়া যে আমার উপায় ছিল না!

নিরঞ্জন। আগে যা উপায় ছিল না বলে আরম্ভ করেছিলে ক্রমে এখন তা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিষ, মৃত্যু তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী হয়ে পড়েছে। নিজেকে মানুষের হাত থেকে, পুলিশের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি অবলীলা ক্রমে গিরীনের মত কত লোককে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছ। প্রতুল, তুমি মানুষ নয়—মানুষরূপী দানব।

প্রতুল। আমি এ সব শুনতে চাই না নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। কিন্তু আমি বলতে চাই। আমি বৃদ্ধ, প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃদ্ধ—

প্রতুল। আর আমি প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ যুবা—বৃদ্ধ হয়েও যুবা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। তোমার গবেষণা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ত' পারে, তার দেহ এবং ফাঁকা জীবন নিয়ে। কিন্তু তারমধ্যে জীবনের সব চেয়ে বড় রত্ন আত্মা—তা থাকবে না।

প্রতুল। তুমি আজ মত বদলেছ বলে আমি আমার পথ বদলাব এ ধারণা তুমি মনেও স্থান দিও না। তুমি সাহায্য কর আর নাই কর নিরঞ্জন, আমার সাধনার পথে আমি অগ্রসর হবই।

নিরঞ্জন। আমার আর কিছু বলবার নেই প্রতুল। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমায় ক্ষমা করেন।

প্রতুল। যদি ভগবানও ত্যাগ করেন তবু—তবু আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করে যাব। মর জগতে আমিই প্রথম অমর!

নিরঞ্জন। তোমার অগাধ সাহস—

প্রতুল। সাহস নয় বন্ধু, বিশ্বাস।

নিরঞ্জন। হয় ত' তোমার কথাই ঠিক। তোমার বিশ্বাস, আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, আমি তোমার বন্ধুই থাকব। তোমার প্রতি আমার প্রীতি কোন অংশেই কমবে না। চিরবিদায়ের আগে আমাদের এই মনোমালিন্য মনকে সত্যই পীড়া দিচ্ছে—

প্রতুল। (হেসে) মনোমালিন্য কিসের?

নিরঞ্জন। (হেসে) তা বটে। একটু তর্ক বিতর্ক মতের পার্থক্য—কি বল?

প্রতুল। তা ছাড়া আর কি!

সুটকেস খুলে নোটের তাড়া বার করতে লাগল

নিরঞ্জন। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করব—

প্রতুল একটা প্যাকেট ছিঁড়ে অবাক হয়ে গেল। আবার একটা ছিঁড়তে লাগল

নিরঞ্জন। তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াও ভয়ানক শক্ত। তোমার মত বন্ধু আর আমার নেই—

প্রতুল। (নোটের দিকে চেয়ে বিস্মিত ভাবে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। কি হল?

প্রতুল। এই দেখ! [নিরঞ্জনের দিকে নোট এগিয়ে ধরলে

নিরঞ্জন। কি হয়েছে?

প্রতুল। এ সত্যকারের নোট নয়—জাল!

নিরঞ্জন। জাল?

প্রতুল। হ্যাঁ জাল। (আর একটা প্যাকেট ছিঁড়ে) বাহিরে জাল নোট আর ভেতরে শাদা কাগজ!

নিরঞ্জন। এ কি কথা!

প্রতুল। প্রত্যেক বাণ্ডিলটা তাই। (হতাশ ভাবে সুটকেসের দিকে চেয়ে) এখন উপায়!

নিরঞ্জন। সত্যকারের নোট মোটে নেই?

প্রতুল। না। একটাও নয়। (নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে) কেউ এই ব্যাপারটা জানত!

নিরঞ্জন। কি করে জানল?

প্রতুল। জানি না। যখন সত্যকারের নোটের বদলে এই সব ব্যাগে পুরে দিয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই কোন রকমে জানতে পেরেছিল। কিন্তু টাকা না পেলে আমার কি হবে? কি হবে নিরঞ্জন—কি হবে—

বলতে বলতে প্রতুল পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি টেবিলের কোনটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

নিরঞ্জন। (কাছে গিয়ে) প্রতুল—বস। এই শকের জন্য—

প্রতুল। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডি দাও।

নিরঞ্জন। কিন্তু তাতে তো তোমার কোন উপকার হবে না।

প্রতুল। তবু দাও, দেখি। (নিরঞ্জন একটা গেলাসে মদ ঢালতে লাগল) তারা জানত আজ আমরা টাকা সরাব তাই বদলে দিয়েছিল—

নিরঞ্জন। এই নাও। (গেলাস দিল)

প্রতুল। (খেয়ে গেলাস টেবিলে রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে) না, এতে কোন উপকার হবে না।

নিরঞ্জন। একটা ইঞ্জেক্‌শান দিয়ে দেব?—

প্রতুল। না, এখন থাক। (আরও কয়েকটা তাড়া তুলে) সব সেই—জাল নোটে মোড়া শাদা কাগজের বাণ্ডিল।

প্রতুলের হাত কাঁপতে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না

নিরঞ্জন। এ কি করে সম্ভব হ'ল?

প্রতুল। বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই—(পাশের ঘরের দরজার দিকে চেয়ে) ওর কাজ! নিশ্চয়ই ওর চালাকি—(দরজার কাছে গিয়ে) গিরীন বাবু—

গিরীন। (নেপথ্যে) হয়ে গেছে। আসছি—

দরজা খুলে গিরীনের প্রবেশ। সুট-পরা, চোখে চশমা। হাতে লাঠি আর টুপি।

গিরীন। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। প্রতুলবাবু, আমার যা প্রাপ্য—

নিরঞ্জন। (অবাক হয়ে) গিরীনবাবু!

গিরীন। ভুল করছেন, আমি গিরীনবাবু নয়। (টুপি ও লাঠি টেবিলে রেখে) তারপর মিষ্টার চৌধুরী, এইবার আমাদের কণ্ট্রাক্টের শেষ অংশটা কমপ্লীট হোক।

প্রতুল। (নোটের তাড়া এগিয়ে দিয়ে) দেখুন—

গিরীন। ডাক্তার গুপ্ত, কি রকম মানিয়েছে? বাড়ীতে এই পার্টটা অনেকদিন অভ্যাস করেছি।

প্রতুল। এই গুলো দেখুন—

গিরীন। (চশমা খুলে নোটগুলো নিয়ে) অ্যাঁ, এ কি!

প্রতুল। কেন, আপনি জানেন না?

গিরীন। এ তো স্রেফ শাদা কাগজ, আর জাল নোট।

প্রতুল। হ্যাঁ।

গিরীন। (আরও কয়েকটা নোটের তাড়া খুলে) সব তাই—শুধু কাগজ!

প্রতুল। হ্যাঁ, শুধু কাগজ! আমার সঙ্গে চালাকি—

গিরীন। এত মেহন্নতের পর শুধু কাগজ—

প্রতুল। এ আপনার কাজ?

গিরীন। (অবাক হয়ে) আমার কাজ!

প্রতুল। আমাকে ঠকিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতলব?

গিরীন। কি বলছেন আপনি! আমি এ কাজ করতে যাব কেন? (একবার প্রতুলের—একবার নিরঞ্জনের দিকে ভীত ভাবে চেয়ে) এ কাজ আমি করতে পারি না—

প্রতুল। না, আমি জানি আপনি পারেন না।

গিরীন। তবে কি করে এ হ'ল?

প্রতুল। সেইটাই তো আমিও জানতে চাইছি!

গিরীন। আমি নিজে হাতে এর মধ্যে টাকা ভরেছিলুম—কোথায় গেল?

প্রতুল। আপনি যে রকম এনেছেন সেই অবস্থায় রয়েছে।

গিরীন। আমি সোজা ব্যাঙ্কের ব্যাগ থেকে সুটকেসে ভরেছি—নিজের হাতে—(এক পা পেছিয়ে প্রতুলের দিকে চেয়ে) এ আপনার কাজ!

প্রতুল। না, না—

গিরীন। হ্যাঁ, আপনার। চোরের ওপর বাটপাড়ি!

প্রতুল। মাথা গরম করবেন না গিরীনবাবু।

গিরীন। সত্যকারের টাকা কোথায় বলুন? কি করেছেন? কোথায় রেখেছেন? বাগে পেয়ে—

প্রতুল। আপনি কি সত্যিই ভাবছেন যে আমি আপনাকে ঠকাব?

গিরীন। তবে টাকা কই?

প্রতুল। ব্যাঙ্কের ব্যাগ থেকে টাকা নেবার সময় দেখেছিলেন?

গিরীন। দেখেছি বলা চলে না। তাড়াহুড়ো করে বাণ্ডিল বার করেছি আর সুটকেসে পুরেছি—(একটা বাণ্ডিল হাতে নিয়ে) চট করে দেখে তো বোঝবার উপায় নেই যে এর মধ্যে কোন কারসাজি আছে।

প্রতুল। ব্যাঙ্ক থেকে যখন টাকা দেয় সে সময় উপস্থিত ছিলেন?

গিরীন। না, ব্যাগ একেবারে ভরা চাবী লাগান অবস্থায় ছিল—(একটু ভেবে) তাই তো! এ কথা তো এতক্ষণ ভাবি নি। চিরকাল টাকা আমাদের সামনে গুণে ব্যাগে ভরা হয় কিন্তু এবার তারা আগে থেকে রেডী করে রেখেছিল।

প্রতুল। (ভীতভাবে) আগে থেকে রেডী করে রেখেছিল?

গিরীন। হ্যাঁ। এ নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের কাজ!

নিরঞ্জন। তার মানে তারা আপনাদের প্ল্যান সম্বন্ধে জানত'।

গিরীন। জানতে পারে না।

প্রতুল। জানতে যে পেরেছিল তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই রয়েছে।

গিরীন। কিন্তু কি করে জানল?

প্রতুল। কাউকে কিছু বলেছিলেন?

গিরীন। কই না তো !

প্রতুল। ঠিক ?

গিরীন। মাইরি বলছি কাউকে কিচ্ছু বলি নি। (প্রতুলের আর নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে) টাকা না হলে আমি যেতে পারব না। আমার একুল ওকুল দু'কূলই গেল। আপিসেও যাওয়া চলবে না—

প্রতুল। না, সেখানে ফেরা চলবে না—

গিরীন। আমি তবে কি করব। আমার কি হবে ? উঃ কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—(নিজের মদের গেলাস তুলে) মদ, শুধু মদ—

প্রতুল। (হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে) না—এখন নয়।

নিরঞ্জন। এখন নয় ?

প্রতুল। না। (টেবিলে গেলাস রেখে দিল)

নিরঞ্জন। ওটা ফেলে দাও প্রতুল।

প্রতুল। দেব, কিন্তু এখন নয়…(দরজায় খট খট ধ্বনি)

গিরীন। (চমকে) কে ? (সকলে দরজার দিকে চেয়ে রইল)

প্রতুল। জানি না। (আবার খট খট ধ্বনি)

গিরীন। আপনি বলেছিলেন বাড়ীতে কেউ নেই !

প্রতুল। আমি তাই জানতুম। তাড়াতাড়ি নোটগুলো স্যুটকেসে পুরে ফেলুন।

গিরীন। (তাড়া ব্যাগে রাখতে রাখতে) কে এল ?

প্রতুল। স্যুটকেসটার ডালা বন্ধ করুন।

গিরীন। (ভীতভাবে) কি হবে ?

প্রতুল দরজার চাবী খুলল। রেজা ঘরে ঢুকল

রেজা। মাফ করবেন স্যার— (দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল)

প্রতুল। তুমি ! কি করে এলে ?

রেজা। বাড়ীর পিছনের গলির দিক দিয়ে। খিড়কী দরজার একটা চাবী আমার কাছে ছিল। (চাবী দেখাল)

প্রতুল। কি চাও ?

রেজা। ভাবলুম যদি আপনার কোন কাজে লাগি। (একটু এগিয়ে চাপা গলায়) ফটকের সামনে দু'জন পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বাড়ীর ওপর নজর রাখছে।

প্রতুল। অ্যাঁ !

গিরীন। (ভীতভাবে) পুলিশ ?

রেজা। জানলা দিয়ে দেখুন না। (সকলে জানলার কাছে গেল)

নিরঞ্জন। কই ?

রেজা। ঐ দেখুন। একজন পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে, আর একজন ঐ গাড়ীটার পাশে। (সকলে জানলা থেকে সরে এল)

প্রতুল। তুমি কি করে জানলে যে তারা এই বাড়ীর ওপর নজর রাখছে—

প্রতুল যেন পড়ে যেতে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নিল

রেজা। আপনার এখানে পুলিশের আনাগোনা দেখে। খগেনবাবু, লোকেনবাবু এরা সব ঘোড়েল লোক—

প্রতুল। তা বটে—

প্রতুলের মাথাটা নুয়ে পড়ল, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল

নিরঞ্জন। প্রতুল !

প্রতুল। ও কিছু না—

সোজা হবার চেষ্টা করল, পারল না। নিরঞ্জন দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

রেজা। আপনার কি শরীর খারাপ ?

প্রতুল। না, বিশেষ কিছু নয়।

গিরীন। (রেজার প্রতি) ওরা বাইরে কতক্ষণ থেকে আছে ?

রেজা। সমস্ত সকালটা—

গিরীন। তা হলে আমাদের ওপর নজর রাখবার জন্য নয়। আমরা তো এই এলুম !

রেজা। কিন্তু কালও সমস্ত দিন ছিল—

প্রতুল। কালও ছিল ?

রেজা। হ্যাঁ।

গিরীন। (ভীতভাবে) প্রতুলবাবু, কি হবে ?

প্রতুল। ভয় পেলে চলবে না গিরীনবাবু।

গিরীন। কিন্তু ওরা যে আমাদের ধরতে এসেছে।

একটা শিশি ও হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ হাতে নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। কি আনলে ?

নিরঞ্জন। হাইপোডার্মিক—

প্রতুল। না, না, দরকার নেই।

নিরঞ্জন। এখনই যদি একটা ইন্জেকশন নাও—

সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না

প্রতুল। না, না—

নিরঞ্জন। তুমি ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছ !

প্রতুল। জানি। আমার যখন প্রয়োজন হবে তোমায় বলব।

(ক্রমশঃ)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মূল :—একজন অমাত্য প্রবহণের নিমিত্ত সকল অমাত্যকে আবাহন করিবেন। তজ্জনিত উদ্বেগবশতঃ রাজা তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিবেন। পূর্ব্বে অবরুদ্ধ কাপটিক ছাত্র অর্থমানাবক্ষিপ্ত সেই সকল (অমাত্যের) এক একজনকে প্রলোভিত করিবে—'অসৎ (পথে) প্রবৃত্ত এই রাজা, ইঁহাকে হত্যাপূর্ব্বক (ইঁহার স্থানে) অন্যকে সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিব। (আমাদের মধ্যে অন্য) সকলেরই ইহা রুচিকর, আপনারই বা কিরূপ (লাগে)'? প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই ভয়োপধা।

সঙ্কেত :—প্রবহণ—নৌকা, বড় বড় ভড়—বজরা, জাহাজ। পূর্ব্বকালে প্রবহণ-সাহায্যে সমুদ্র-যাত্রা করা হইত। শ্যামশাস্ত্রী উত্তরাধ্যায়ন-সূত্র-টীকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সামুদ্রি কাব্যাপারিণঃ মহাসমুদ্রং প্রবহণৈস্তরন্তি" (seafaring merchants cross the high seas by means of Pravahanas). শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকাতেও প্রবহণে সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—(১) নৌবিশেষ, (২) কর্ণীরথ (ছোট ছোট রথ—শিবিকা বা পাল্‌কী? আপ্তে মহোদয়ও এই দুই প্রকার অর্থ দিয়াছেন। জাহাজে করিয়া জলযাত্রা ও জলবিহার; আর কর্ণীরথে স্থলযাত্রা, উদ্যানবিহার ভোজন ক্রীড়াদি সম্ভব। প্রবহণের যে অর্থই ধরা যাউক, ক্ষতি নাই। একজন অমাত্য প্রবহণে করিয়া আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে যদি অপর সকল অমাত্যকে নিমন্ত্রণ করেন, আর সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যদি গোষ্ঠী-প্রমোদার্থ একত্র মিলিত হন, তখন রাজার মনে স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইতে পারে—অমাত্যেরা একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে না ত? এইরূপ আশঙ্কা প্রচারিত করিয়া তিনি অমাত্যগণকে কারারুদ্ধ করিবেন। অবশ্য এই ব্যাপারে গোড়া হইতেই সবটা রাজার গড়াপেটা। একজন অমাত্যকে দিয়া রাজা সকল অমাত্যকে আবাহন করাইবেন—সকলে মিলিত হইলে ষড়্‌যন্ত্রের আশঙ্কা রটাইয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিবেন। এইরূপে বিনা অপরাধে অবরুদ্ধ হইলে অমাত্যবর্গের মন সম্ভবতঃ রাজার উপর বিরূপ হইবে—এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। অতএব, এই সুযোগে তাঁহাদিগের মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উচিত। একজন ছাত্রবেশী চর (কাপটিক) অমাত্যবর্গের প্রত্যেক্যের নিকট একে একে যাইবে—প্রত্যেকের নিকট যাইয়া এরূপ ভাণ করিবে যেন সেও পূর্ব্বে এই রাজার দ্বারা বিনা কারণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এ কারণে সে রাজার বিরোধী। অন্য অমাত্যগণের নিকটও সে গিয়াছিল—সকলেই তাহার সহিত যোগ দিয়া রাজার বিরুদ্ধতা করিতে চাহেন। অতএব, অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত এই রাজাকে হত্যাপূর্ব্বক অন্য একজন সদাচারী যোগ্য ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনে স্থাপন করা যাউক। অন্য সকলেরই ইহাতে সমর্থন আছে—এখন ব্যক্তিগতভাবে সেই বিশিষ্ট অমাত্যের (যাঁহার নিকট কাপটিক প্রস্তাব করিতেছে তাঁহার) কি মত? যদি তিনি রাজবিদ্রোহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন,তবে বুঝিতে হইবে, তিনি নির্দ্দোষ—শুদ্ধ। রাজনিগ্রহের ভয়েও তিনি প্রলোভিত হইবার পাত্র নহেন। ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক এই ছলনার নাম 'ভয়োপধা' (allurement under fear—SH)।

আবাহয়েৎ—আবাহনপূর্ব্বক একত্র আনয়ন ও মিলিত করাইবেন। তজ্জনিত উদ্বেগ—অমাত্যবর্গের মিলনে রাজার উদ্বেগ (অক্ষমা, আশঙ্কা) জন্মান স্বাভাবিক। অবরুদ্ধ করিবেন—গ্রেপ্তার করিবেন; অর্থহরণ করিবেন, পদচ্যুত করিয়া অবমানিত করিবেন, কারারুদ্ধ করিবেন ইত্যাদি নানারূপ অর্থ সম্ভব। কাপটিক—ছাত্রবেশী চর; 'গূঢ়পুরুষোৎপত্তি' প্রকরণে ইঁহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে অবরুদ্ধ—শ্যামশাস্ত্রী যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অতি সঙ্গত—'pretending to have suffered imprisonment; কেবল to have previously suffered বলিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। 'পূর্ব্বে অবরুদ্ধ হইয়াছিল'—এইরূপ ভাণকারী। বস্তুতঃই যদি পূর্ব্বে অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে ত আর রাজার চর হইয়া অমাত্যগণের শুচিতা পরীক্ষায় সাহায্য করিতে পারে না। রাজার নিযুক্ত চর ছাত্রের ছদ্মবেশে প্রত্যেক অমাত্যের নিকট যাইয়া বলিবে—'এই রাজা বড় দুষ্কর্ম্মান্বিত; আমাকেও পূর্ব্বে অবরুদ্ধ করিয়াছিল—আসুন সকলে মিলিয়া ইহার বধসাধন করি—সকলেরই মত আছে—কেবল আপনার মত কি—বলুন'। অসৎপ্রবৃত্ত (মূল)—অসৎপথে প্রবৃত্ত, অশোভন কর্ম্মে প্রবৃত্ত (গঃ শাঃ); betaken himself to an unwise course (SH); evil course বলাই উচিত ছিল। রাজকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার ভয়-বশতঃ এই প্রকার প্রলোভনে স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। ভয়প্রদর্শন দ্বারা এইরূপ ছলনা; তাই ইহার নাম—'ভয়োপধা'।

মূল :—এই (সকলের) মধ্যে ধর্ম্মোপধা-শুদ্ধ (অমাত্যগণকে) ধর্ম্মস্থীয় কণ্টকশোধনাদি (কর্ম্মসমূহে) স্থাপিত করিবেন। অর্থোপধাশুদ্ধগণকে সমাহর্ত্তা সন্নিধাতা প্রভৃতির (কর্ম্মসমূহে) স্থাপিত করিবেন)। কামোপধাশুদ্ধগণকে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিহার-রক্ষা কার্য্যে (নিযুক্ত করিবেন। ভয়োপধাশুদ্ধগণকে রাজার কর্ম্মসমূহে (নিযুক্ত করিবেন)। সর্ব্বোপধাশুদ্ধগণকে মন্ত্রী করিবেন (আর) সকল বিষয়ে অশুচিগণকে খনি দ্রব্য-হস্তি-বন-কর্ম্মান্তে নিযুক্ত করিবেন।

সঙ্কেত :—**ধর্ম্মস্থীয় কণ্টকশোধন—তৃতীয় ও চতুর্থ অধিকরণ দ্রষ্টব্য।**

ধর্ম্মস্থীয়—দাওয়ানী আদালতের কার্য্য (civil court) ; কণ্টকশোধন—ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার (criminal court)। সমাহর্ত্তা—রাজস্ব-সংগ্রহ-কর্ত্তা (revenue collector)। সন্নিধাতা—ধনরক্ষক ; শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজী দিয়াছেন—chamberlain ; Lord Chancellor of the Exchequor বলা ভাল। বিহাররক্ষা—গঃ শাঃর মতে 'বিহার' অর্থে বিহার-সাধনভূতা রাজান্তঃপুরনারীবর্গ ; তাঁহাদিগের রক্ষা। শ্যামশাস্ত্রী 'বিহার' অর্থে—বিহার-স্থান (pleasure-grounds) বুঝিয়াছেন। যে কোন একটি অর্থ লইলেই অপরটি আপনি আসে—বাদ দেওয়া যায় না। বাহ্য বিহার—কেবল ভোগিনী নারীগণ ; আভ্যন্তর বিহার—দেবী (অভিষিক্তা মহিষী)গণ—(গঃ শাঃ) ; pleasuregrounds, both external and internal (SH)। আসন্ন কার্য্য—রাজার শরীর রক্ষাদি, যাহাতে ভয়-জয়ের প্রয়োজন (গঃ শাঃ) ; immediate service (SH) সর্ব্বোপধাশুদ্ধ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভয়-চতুর্ব্বিধ প্রলোভনে অপ্রলুব্ধ শুদ্ধচিত্ত। ঈদৃশ ব্যক্তি 'মন্ত্রী' হইবার উপযুক্ত। আর এক একটি মাত্র উপধাশুদ্ধ 'অমাত্য' পদের যোগ্য। মন্ত্রী ও অমাত্যে ভেদ ইহাই। আর যাঁহারা চারিটির কোন একটিও প্রলোভন জয় করিতে পারেন নাই, খনি প্রভৃতির কার্য্যে তাঁহাদিগের উপযোগ কর্ত্তব্য। শ্যামশাস্ত্রী বলিয়াছেন যাঁহারা এক বা সব কয়টি প্রলোভনে অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন (who are proved impure under one or all of these allurements)—এ অর্থ কোথা হইতে আসিল ? মূলে আছে 'সর্ব্বত্রাশুচীন্'—অর্থ সুস্পষ্ট। খনি—mine, দ্রব্য—গঃ শাঃ ; 'বন' শব্দটির সহিত যোগ দিয়াছেন 'দ্রব্যবন'—দারুযোগ্য বৃক্ষবহুল বন ; timber (SH)। হস্তী—গঃ শাঃর ব্যাখ্যায় গজ-বন—'বন' শব্দের সহিত এস্থলেও যোগ—গজবহুল অরণ্য। শ্যামশাস্ত্রী 'বন' শব্দ পৃথক্ ধরিয়াছেন। কর্ম্মান্ত—manufactories (SH) ; গঃ শাঃর মতে—খনি—দ্রব্যবন-গজবন—এতৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্মান্ত অর্থাৎ ব্যাপারস্থানে—শরীরের আয়াসজ কর্ম্মস্থানসমূহে অশুদ্ধ অমাত্যগণের নিয়োগ কর্ত্তব্য।

মূল :—ত্রিবর্গ-ভয়-সংশুদ্ধ অমাত্যবর্গকে যথাশৌচ নিজ নিজ কর্ম্মসমূহে অধিকারী করিবেন—ইহাই আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত।

সঙ্কেত :—ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম (মনু ২।২২৪ দ্রষ্টব্য) ত্রিবর্গ—ভয়-সংশুদ্ধ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভয়—এই চতুর্ব্বিধ উপধা-শুদ্ধ। যথাশৌচ—যিনি যে বিষয়ে শুদ্ধ—তৎ তৎ শুদ্ধির অনুকূলভাবে। অধিকারী করিবেন—অর্থাৎ রাজা নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে আচার্য্যগণ ব্যবস্থিত—ইহাই আচার্য্যগণের ব্যবস্থা।

মূল :—অমাত্যগণের শুচিতা (পরীক্ষার) নিমিত্ত রাজা আপনাকে অথবা দেবীকে লক্ষ্য (স্থানীয়) করিবেন না—ইহাই কৌটিল্য-দর্শন।

সঙ্কেত :—অমাত্যের শুদ্ধি-পরীক্ষার্থ রাজা নিজেকে অথবা তাঁহার মহিষীকে লক্ষ্য (বা বিষয়) কদাপি করিবেন না—ইহাই কৌটিল্যের অভিমত। ঈশ্বরঃ (মূল)—রাজা। দেবী—মূর্দ্ধাভিষিক্তা মহিষী, পাটরাণী। লক্ষ—লক্ষ্য—উপলক্ষ, নিমিত্ত ; butt, object (SH)। শ্যামশাস্ত্রীর মুদ্রিত মূলে আছে—'লক্ষ্মীশ্বরঃ'—উহা নিশ্চিত মুদ্রাকর-প্রমাদ—'লক্ষমীশ্বরঃ' (গঃ শাঃ)—যথার্থ পাঠ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদে 'laksham' আছে।

মূল :—বিষ দ্বারা জলের (দূষণের) ন্যায় অদুষ্টের দূষণ করিবেন না ; যেহেতু কদাচিৎ প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইলে তাহার ঔষধ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সঙ্কেত :—স্বভাবতঃ দোষশূন্য যে অমাত্য—উপধা-প্রয়োগ-দ্বারা তাঁহার প্রলোভন অকর্ত্তব্য ; তিনি প্রলোভন জয় করিতে সমর্থ হইলেও প্রলোভন দেখান উচিত নয় ;—এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—স্বভাবতঃ নির্ম্মল জীবন-হেতু যে জল, নিশ্চিত-মৃত্যুকারণ বিষ-দ্বারা তাহার দূষণ অনুচিত। অতঃপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে—স্বভাবতঃ অদুষ্ট হইলেও ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় যদি অমাত্য প্রলোভিত হইয়া দোষযুক্ত হন, তখন আর তাহার প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না—তিনি তখন অনর্থ-কারণ হইয়া দাঁড়ান। কদাচিৎ—প্রদুষ্টের সহিত অন্বয় (গঃ শাঃ) ; পাইবার সম্ভাবনা নাই (নাধিগম্যেত)—ইহার সহিত অন্বয় (শ্যাম)।

মূল :—সত্ত্ববান্ (অমাত্যগণের) বুদ্ধি (স্বভাবতঃ) ধৃতিতে অবস্থিত (হইলেও) উপধাসকল দ্বারা চতুর্ব্বিধ (উপায়ে) (একবার) কলুষীকৃতা হইলে অন্ত পর্য্যন্ত গমন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

সঙ্কেত :—May not, when once vitiated and repelled under the four kinds of allurements, return to and recover its original form—শ্যামশাস্ত্রীর এ অনুবাদ নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল। সত্ত্ব—প্রকাশময়ী বুদ্ধিবৃত্তি। সত্ত্ববান্—প্রজ্ঞাবান্। ধৃতিতে অবস্থিত—ধৃতি-ধৈর্য্য—প্রলোভন উপেক্ষার উপযোগী ধৈর্য্য। ধৃতিতে অবস্থিত অর্থাৎ ধৃতি (ধৈর্য্য) যুক্ত। অন্ত পর্য্যন্ত না যাইয়া—নিজের অভিপ্রেত বিষয়-সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (গঃ শাঃ) ; বাঙ্গালায় যাহাকে বলে—'ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি—এখন এর শেষ না দেখে ফিরছি নি'—পাপ একবার করিতে আরম্ভ করিলে কত নিম্নস্তরে পৌঁছান যায়, তাহা দেখিবার উৎকট স্পৃহা পাপীর মনে জন্মে—ইহাই তাহার তৎকালীন মনোবৃত্তি। অতএব অদুষ্টকে দূষিত করা অনুচিত। একবার দূষিত হইলে তাহার অসাধ্য আর কিছুই থাকে না—ইহাই তাৎপর্য্য।

মূল :—সেই হেতু চতুর্ব্বিধ চার্য্যে বাহ্য আধষ্ঠান (স্থাপন) করিয়া রাজা সত্রিগণ-দ্বারা অমাত্যগণের শৌচাশৌচ পরীক্ষা করিবেন।

সঙ্কেত :—চার্য্যে—উপধাপ্রয়োগে। বাহ্য—রাজা ও রাণী ছাড়া

অঙ্গ-বহিরঙ্গ লক্ষ্য। অধিষ্ঠান—লক্ষ্য, উপলক্ষ, নিমিত্ত, butt (SH)। মার্গেত (মূল)—'মার্গ' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা, যাচ্ঞা করা। এস্থলে অর্থ—পরীক্ষা করা, জানিতে ইচ্ছা করা—shall find out (SH)।

রাজা নিজেকে বা মহিষীকে এইরূপ পরীক্ষা-বিষয়ে উপলক্ষ করিবেন না। কে জানে? মানুষের মন না মতি!—বুঝা কঠিন। অতি বিশ্বাসী অমাত্যও যদি হঠাৎ প্রলোভনে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তখন রাজার জীবন অথবা রাণীর চরিত্র রক্ষা করাও কঠিন হইতে পারে। এই কারণে কৌটিল্যের সিদ্ধান্ত—অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের প্রলোভন, অথবা অন্য কোন নারীর প্রলোভন দেখান উচিত। ইহাতে রাজার আত্মরক্ষা, অন্তঃপুর-রক্ষা ও অমাত্যের শুচিতা-পরীক্ষা—সবই একযোগে হইতে পারে।

॥ ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে 'উপধা-দ্বারা অমাত্যগণের শৌচাশৌচ-পরিজ্ঞান'-শীর্ষক দশম অধ্যায় (ষষ্ঠ প্রকরণ) ॥

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোচীন

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ইন্দোচীনে ফরাসীদের শাসন পরিকল্পনা বেশ খানিকটা জটিল। কোচিন-চীনকে প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী-শাসিত উপনিবেশে পরিণত করা হয়; জনৈক ফরাসী গভর্ণর এখানকার শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। আনাম ও কাম্বোডিয়াকে ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হল। এই উভয় স্থানেই নামে একজন ক'রে রাজা রইলেন বটে, কিন্তু ফরাসী রেসিডেণ্টই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। টনকিং ও লাওসকে ফরাসী রেসিডেণ্টের শাসনাধীন করা হ'ল। সমগ্র ইন্দোচীনের শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একটী পরিষদ গঠিত হল। গভর্ণর জেনারেল হলেন এর সভাপতি এবং সেনা ও নৌ-বিভাগের সেনাধ্যক্ষদ্বয়, ইন্দোচীনের সেক্রেটারী জেনারেল, কোচিন-চীনের গভর্ণর, আনাম, কাম্বোডিয়া, টনকিং ও লাওসের রেসিডেণ্ট চতুষ্টয় এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তারা হলেন এর সদস্য। কোচিন-চীন উপনিবেশ বলে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে এখানকার ফরাসীরা একজন ডেপুটী নির্ব্বাচন করে পাঠাতেন। ২৪ জন সদস্য দ্বারা গঠিত এক পরিষদও স্থাপিত হয়। এই পরিষদে ইন্দোচীনের ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি ১০ জন প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইন্দোচীনে কোন দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বেচ্ছাচার-মূলক ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত হয় এবং দেশে যাতে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে না পারে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কুশাসনের চরম দৃষ্টান্তস্থল ইন্দোচীন। দেশবাসীদের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেই শাসনকর্ত্তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না, ফরাসী বণিকদের স্বার্থের খাতিরে দেশবাসীদের বৈষয়িক উন্নয়নের সমস্ত দ্বারও রুদ্ধ করা হয়। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা যাতে কৃষি ছাড়া অন্য কোন প্রচেষ্টায় লিপ্ত না হয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তার প্রতিই নজর দিলেন। এতে ফ্রান্সের পক্ষে কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামাল প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়। ইন্দোচীনের রপ্তানী-যোগ্য মালপত্রের অধিকাংশই—চাল, ভুট্টা, রবার ও কয়লা—ফ্রান্সে যেতে লাগল। তখন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কৌশলে শুল্কের হার এমন ভাবে বেঁধে দিলেন যে ইন্দোচীনের পক্ষে অন্য কোন দেশের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত শিল্পোন্নয়নের কোন প্রশ্নই উঠে নি। ১৯৩৮ সালে কেবল দেশ রক্ষার খাতিরেই শিল্প উন্নয়নের কথা উঠে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন বা কলকারখানা স্থাপন করলে পাছে লভ্যাংশের হ্রাস পায় সেই ভয়ে ফরাসীরা ইন্দোচীনে শিল্পোন্নয়নের বিরোধিতাই করে আসছিলেন। ফরাসীরাই ইন্দোচীনের বাজার একচেটে করে রাখে এবং ইন্দোচীনের আমদানী বাণিজ্যের অর্দ্ধেক পণ্য ফ্রান্স থেকেই সরবরাহ হয়। এইভাবে ফরাসী শাসন ইন্দোচীনের বৈষয়িক উন্নতির পথ বন্ধ করে রাখে।

ইন্দোচীনরা উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নিকট দেশকে বিক্রয় করলেও ইন্দোচীনবাসীদের স্বাধীনতা লাভের অত্যুগ্র কামনাকে মেরে ফেলতে পারেন নি। ১৮৬২ সালেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা দেখা দেয় এবং সে আগুন আজও নেভেনি। ফরাসীদের দমন ও তোষণনীতি এইখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ফরাসী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করবার পর এই বহ্নি নির্ব্বাপিত হবে, তৎপূর্ব্বে নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীন দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। বহু আকারে এই সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করেছে। মাঝে মাঝে এই সংগ্রামের তীব্রতার অভাব পরিলক্ষিত হলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয়নি। ১৮৮৫ সালে এক চুক্তির সর্ত্তবলে আনাম ফ্রান্সের হাতে যায়। সেই বৎসরেই আনামীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং হিউয়ের সেনানিবাসে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফরাসীদের তাঁবেদার আনামরাজ পলায়ন করেন। ১৮৮৬ সালে উত্তর আনামে ফান-দিন-ফুইং এবং টন্‌কিংয়ের ব-দ্বীপ অঞ্চলে গুয়েন-থিয়েন-থুয়াট নামক দুই দেশপ্রেমিক বীরের নেতৃত্বে আনামীরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের

স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ টনকিংয়ের অভ্যন্তরে হোয়াংহোয়াথাম ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালান এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে ফরাসীরা জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। ১৯০৭ সালে সমগ্র এসিয়ায় নূতন করে গণজাগরণ দেখা দেয়। ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনে জিজিয়া-করের বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনের অভ্যুদয় হয়। এই সময় সংস্কৃতির দিক থেকেও ইন্দোচীনে এক আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাসমরের আমলে ফরাসী শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে পর পর কয়েকটা বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র চলে এবং রাজনৈতিক দলগুলি দানা বাঁধিতে থাকে। রাজন্যবর্গও এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৬ সালের ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন প্রিন্স ডুই-থান। ফরাসীরা কঠোর হস্তে এই সকল বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করে। ফরাসী শাসকগণ শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বৃটীশের মতই তারাও এই সকল প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই রাখেন নি। ইতিমধ্যে ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। প্রাচীনদের হাত থেকে নেতৃত্ব আসে নবীনদের হাতে। পাশ্চাত্য মনোভাবসম্পন্ন এই সকল নবীন নেতা পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলার নীতি গ্রহণ করেন। একটী, 'নবীন আনামী দল' ও 'বিপ্লবী আনামী যুবসঙ্ঘ' গঠিত হয়। উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন এই সকল রাজনৈতিক নেতা প্রাচ্যের অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ফলে ইন্দোচীন, দক্ষিণচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী বিনিময় হয় এবং ১৯২৭ সালে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ডুয়ং-ভ্যান-গিউ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহযোগিতায় নিপীড়িত জাতিবর্গের লীগ সংগঠন করেন। ডুয়ং ১৯২৯ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন হয়। ১৯৩০-৩৪ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিষাণদের এক বিরাট বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ফরাসীরা এর প্রতিবিধানে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অবতারণা করে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইন্দোচীনে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ান গঠন, সংবাদপত্র প্রকাশ আইনতঃ সিদ্ধ করা হয়। এককালীন বিদ্রোহীরা ইন্দোচীন শাসন পরিষদ ও হানয়ের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে স্থান লাভ করলেন। কিন্তু ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্টের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই সকল সুবিধা প্রত্যাহৃত হয়।

১৯৪০ সালে ইন্দোচীন জাপানের করায়ত্ত হয় এবং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আনামীরা ফরাসীদের পরিবর্ত্তে জাপানীদের অধিকার স্বীকার করে নেবার পক্ষপাতী নয়। তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য রচনার ভার গ্রহণে সমুৎসুক। তাই ইন্দোচীনে জাপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর গেরিলা তৎপরতা দেখা দেয় এবং দুবার বিদ্রোহ ঘটে। ১৯৪১ সালে ইন্দোচীনের সবগুলি দল মিলে স্বাধীনতা লীগের পত্তন করে। ১৯৪৪ সালে লীগ গণপরিষদ গঠন ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে এবং সমগ্র জনসাধারণকে গেরিলা বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানায়। স্বাধীনতা লীগের মূলঘাঁটী আনাম ও টনকিং, তবে কোচিন চীন সমেত সমস্ত ইন্দোচীনেই লীগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপ সামরিক শক্তির অবসান ঘটায় ইন্দোচীন দীর্ঘ ৮০ বৎসরের সংগ্রামে যে সুযোগ পায় নি আজ সেই সুযোগ দেখা দিয়েছে এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যও আনামীরা প্রস্তুত। জাপানী শক্তির উচ্ছেদের পর তারা ফরাসী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে চায় না। তারা ফরাসী উপনিবেশের অবসান এবং দেশের সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আনামীরা সাইগনে এক স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আনামের শক্তিহীন রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেছে। আনামীদের জনপ্রিয় দল ভিয়েটমিন এই গভর্ণমেণ্টের সমর্থক। টনকিংয়ের প্রধান দুই দলের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তারও অবসান হয়েছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হো-চি-মিন ও ভিয়েটমিন দলের নেতা গুয়েন হাইথানের মধ্যে আপোষ হয়েছে। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য ফরাসী শোষণের অবসান।

দুঃখের বিষয় সদ্য নাৎসীকবলমুক্ত ফ্রান্স নিজ তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইন্দোচীনে প্রভুত্বের অবসান করতে চায় না। ফ্রান্সের বর্ত্তমান কর্ণধার দ্য-গলে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হন নি যে ইন্দোচীনে ফরাসী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় তিনি বিরত হবেন না। আজ তাই ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় অপূর্ব্ব শক্তি সম্মিলন দেখা যায়—বৃটীশ, ফরাসী ও জাপানী সৈন্য আনামীদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। বিপদ কালে এম্নি আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটে থাকে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হয়েছে।

সুন্দরবনের নদীপথে

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম্-এ

সমুদ্র আর পাহাড়। দুয়ের মধ্যে কোনটীর সৌন্দর্য মানুষকে বেশী টানে জানি না। দুয়েরই রহস্যের অন্ত নেই, অসীম মায়ায় দুই-ই হাতছানি দিয়ে ডাকে। সমুদ্রের ধারে সকাল হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে সকাল বসে থাকলেও তার রূপের অন্ত পাওয়া যায় না। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে, চেহারা বদলাচ্ছে, জোয়ার ভাটার খেলা চলছে। তেমনি পাহাড়ের রহস্যের অন্ত নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে কাঞ্চনজংঘার রূপ বদলানো দেখুন—সকাল হবার ঠিক আগেটীতে কাঞ্চনজংঘা ফ্যাকাশে শাদা হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে তার চেহারা বদলে গেল, মনে হল যেন রক্ত ফেটে পড়ছে, তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সোনালি কমলা রঙ্ হয়ে শেষকালে উজ্জ্বল শাদায় ঝক্‌ঝক করতে লাগল। তেমনি, বিকালবেলায় কাঞ্চনজংঘার চূড়ায় রঙের মূর্চ্ছনাটুকু ধীরে ধীরে লক্ষ্য করুন—সূর্য তার গায়ে কত রং ফলিয়ে তোলে, তারপর যখন সমস্ত পাহাড়ে গম্ভীর ছায়া নেমে আসে তখনও

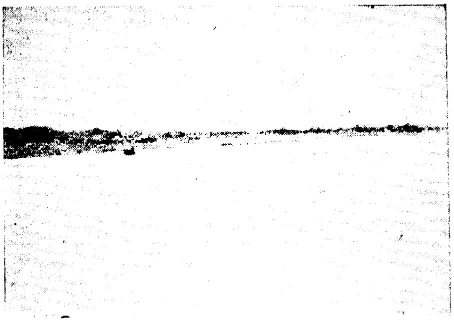

পদ্মার দৃশ্য

ংটুকু ওখানে লেগে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক মুহূর্তে মিলিয়ে ায়, সমস্ত উপত্যকাময় নেমে আসে অন্ধকার। এই দুই অজানার ানে মানুষ পাড়ি দিয়েছে, গিয়েছে সাতসমুদ্র পারে, চড়েছে দুর্গম াহাড়ের চূড়ায়। সাগরের ঢেউ আর পৃথিবীর ঢেউ—এর মধ্যে ার মায়া বেশী তা স্থির করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি যখন কয়েকদিনের জন্য ছোটনাগপুরে গিয়েছিলুম তখন গাধিরাজের মহিমার সঙ্গে পরিচয় হোলো না বটে, কিন্তু তবু ৃথিবীর ঢেউ এর সঙ্গে আবার খানিকটা পরিচয় হোলো। ওখানের াহাড় বড় নয়, কিন্তু বড় না হওয়াতেই তার সৌন্দর্য। যেন রোয়া। ভীষণ নয়, দেখে স্তম্ভিত হতে হয় না। মনে মনে আলাপ করা চলে। গভীর জঙ্গল নয়, ছোট বড় মাঝারি শালবন, তলাটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছোটো ছোটো নদী—এমন কি দামোদরও সেখানে বালির উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। সেখান থেকে ফিরে স্বতঃই সমুদ্রের কথা ভাবা চলে না। সাগরের সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র হিমালয়েরই। মন চাইছিলো খুব একটা ঘরোয়া নদীপথে যেতে, যার বিস্তার সাগরের মত নয়, অনেকটা ঘরোয়া, যার সঙ্গে মনে মনে সম-সপ্তকে সুর মেলানো যায়, মুদারা-তারায় নয়।

এ হেন সময়ে শোনা গেলো, সুন্দরবন ডেসপাচ সার্ভিস আবার চলছে। এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে? শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে এই নদীপথের পরিচয় ঘটানোর পর হতেই এই নদীপথের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ করবার দারুণ ইচ্ছা ছিলো। তার উপর খবর পাওয়া গেলো যুদ্ধকালীন প্রতিবন্ধক দূর হওয়ায় এই ডেসপ্যাচ সার্ভিস আবার পুরোণো কালের মতই চলতে শুরু হয়েছে। কেবল খাবার জিনিষ এবং রান্নার ব্যবস্থা যাত্রীদের নিজেদের করতে হয়। এর চেয়ে ঘরোয়া নদীপথ আর কি হতে পারে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা হতেই বাংলা দেশের উদ্ভব, আদিম অরণ্য আজও নিবিড় শ্যামল স্নেহে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, পুষ্ট করেছে তার প্রাণশক্তি—এর চেয়ে ঘরোয়া কথা বাঙালীর পক্ষে সত্যিই কিছু নেই। অতএব স্থির করা গেলো কলকাতা হতে সুন্দরবন হয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত গঙ্গা, সুন্দরবন ও পদ্মার বিচিত্র আস্বাদ নিয়ে আসা যাক্।

হাওড়া পুলের তলায় জগন্নাথঘাট থেকে ডেসপাচের ষ্টীমার ছাড়ে। আমাদের জাহাজের নাম কোহিস্থানী। নামের অর্থ বোঝা গেল না। শুক্রবার সকাল ন'টায় জাহাজ ছাড়ার কথা। সেই অনুসারে ঠিকঠাক হয়েছি, এমন সময় খবর পাওয়া গেল জাহাজ ছাড়বে বৃহস্পতিবার রাত্রে, সুতরাং সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে চড়লেই চলবে। সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে এসে শোনা গেল, সময় আবার বদলেছে—পরের দিন দশটা নাগাৎ ছাড়ার সম্ভাবনা। সমস্ত রাত্রি অকারণে জগন্নাথঘাটে থাকা নিরর্থক ভেবে বাড়ী যাওয়া গেল, বাড়ীর লোকেরা তো অবাক! পরের দিন আবার খবর মিললো যে ষ্টীমার ছাড়তে সন্ধ্যা সাতটা—অতএব তাড়াতাড়ি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যথারীতি সময় আবার বদলালো। তাড়াতাড়ি করে জাহাজে উঠলাম শুক্রবারই তিনটার সময়, সাড়ে তিনটার সময়

জাহাজ ছেড়ে দিল। ভাবলাম, এইবার যা হোক্ যাত্রা শুরু হল। কিন্তু তখনও এই নদীপথের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় হয় নি। জাহাজ ঘাট ছেড়ে মধ্য গঙ্গায় গিয়ে ভালভাবে নোঙর করল। কি ব্যাপার? ভাটার জল আরও না কমলে হাওড়াপুলের তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। সন্ধ্যার মুখে হাওড়া পুলের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে পার হয়ে আমরা দক্ষিণের দিকে এগোতে লাগলাম। নতুন কাস্টমস্ হাউস্, হাইকোর্ট, স্ট্র্যাণ্ড রোড, খিদিরপুর পার হয়ে জাহাজ বোট্যানিকেল গার্ডেনের সামনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল দুখানি ফ্ল্যাট নেবার জন্য। হিরুনোদা এবং জাঞ্জিরা নামে দুখানি ফ্ল্যাট বাঁধা হয়েছে। কিন্তু তারপরে জাহাজ চলবার কোনই লক্ষণ নাই। অবশেষে শোনা গেল, আজ রাত্রে জাহাজ আর চলবে না, কাল ভোরে প্রকৃতই রওনা। বৃহস্পতিবার থেকে টানাপড়েন করে শনিবার ভোর না হলে আসল যাত্রা শুরু হবে না।

কি করা যায়। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার চেষ্টায় যদি বা হাওড়া পুল থেকে বোটানিকেল গার্ডেন পর্যন্ত আসা গেল সেখানেই আবার বারো ঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। নিরুপায়। অগত্যা বসে বসে গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণরূপ বাধ্যতা-মূলক কর্তব্য পালন ছাড়া অন্য কিছু করবার রইলো না। কিন্তু যা ছিল বাধ্যতামূলক কর্তব্য, কিছুক্ষণ বাদেই তা হয়ে উঠল আনন্দের উৎস। গঙ্গার এত কাছে থেকেও গঙ্গার বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। একটা বয়ায় আমাদের জাহাজ বাঁধা ছিল, উত্তরমুখে। ভাটার জল কলকল শব্দ করতে করতে নেমে চলেছে, হড়হড় করে ষ্টীমারের গায়ে আওয়াজ করছে, বয়াটা ঘুরছে, শেকলে টান পড়ে আওয়াজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে জলের সঙ্গে তার টানাটানি। কিন্তু ক্রমে জোয়ার এলো, সমস্ত গঙ্গার জল স্থির হয়ে দাঁড়াল, কেমন একটা থমথমে ভাব! এমন সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। ফ্ল্যাটসমেত গোটা জাহাজ সেই জলের চাপে নিঃশব্দে বয়াকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কন করে ঘুরে দাঁড়াল দক্ষিণমুখে। সামনে খিদিরপুর ডকের অজস্র রকমারি আলো। লালচে শাদা, মার্কারি বাষ্পভরা নীলচে শাদা, তাছাড়া লাল সবুজ রকমারি আলো। তার দীর্ঘ প্রতিফলন হয়েছে জোয়ারের টলমল জলে, হাজার ছোট ছোট ঢেউয়ে সেই প্রতিফলনের শিখা কেঁপে উঠছে, ভেঙে যাচ্ছে—অপরূপ পিকাসোর ছবি। জলে যে বিপুল আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হোলো জাহাজ যেন তার সাড়া পেয়েছে। জোয়ারের জলে আওয়াজ নেই। রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনছি, আবার যখন ভাটা এলো, জলের আওয়াজ বদল হোলো, আবার সেই একটানা হড়হড় শব্দ।

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সারেং এলো। নাম মদন মিয়া, বাড়ী মুন্সীগঞ্জ। পঁয়ত্রিশ বছর এই কোম্পানীতে কাজ করছে সে। বললে, আজ রাত্রি এখানেই নোঙর করে থাকবে, ভোরবেলায় খোদাতালার দীলা হলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে সে। তাহলে কাল সন্ধ্যা নাগাৎ নামকানা পৌছান যেতে পারবে, সেখান থেকে সুন্দরবন আরম্ভ।

শনিবার।

ভোর পাঁচটা। ডেকে আলো জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়েছি, দেখি বয়া থেকে শিকল খোলা হচ্ছে। দুটী লোক, চিকণ কালো সবল বলিষ্ঠ পাথরে-কোঁদা চেহারা, বয়ার উপর লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরল শিকলটাকে। মোটা লোহার খিল খুলে এলো, উন্মত্ত বেগে বয়াটা ঘুরে গেল, ষ্টীমারে ধাক্কা লাগে লাগে। মধ্যে লোক দুটী, ধাক্কা লাগলে পিষে যাবে। তেতলা হতে ঠিক সেই সময়ে সারেং হাঁকল হুঁশিয়ার, লোকদুটী লাফিয়ে পড়ল ষ্টীমারে। ছোট ঘটনা, কিন্তু রোমাঞ্চকর।

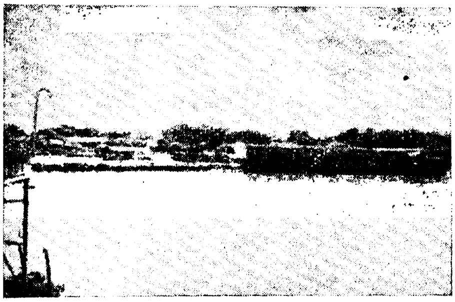

চরমুণ্ড

এইবার আমাদের প্রকৃত যাত্রা শুরু হল। ভাটার টানে এবং পুরো ষ্টীম দক্ষিণে চলেছি। ক্রমে ক্রমে পরিচিত এবং স্বল্প পরিচিত জিনিষ পিছনে সরে যেতে লাগল। বেলা আটটায় বজবজ পৌছলাম। বড় বড় পেট্রোল ট্যাঙ্ক, চমৎকার কোয়ার্টার্স—বজবজ চিনতে দেরী হয় না। সাড়ে আটটায় প্রেমচাঁদ জুট মিলস্-এর সীমানা ছাড়ানো গেল। কলকাতার গঙ্গা চারপাশের কলকারখানার চাপে মলিন। এখানে তার সে চেহারা নয়। সবুজ মাঠ, পাড় অনেক জায়গায় বাঁধান, মধ্যে মধ্যে বাড়ী—যেন সাজান বাগান। কোথাও কোথাও নৌকোর সার, ছোট ছোট ষ্টীমারগুলো ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। তার মধ্যে 'রাম' বলে একটা চেনা ষ্টীমার চোখে পড়ল, রাজগঞ্জ ফেরী সার্ভিসের ষ্টীমার। আমরা তাতে চড়ে একবার তক্তাঘাট থেকে রাজগঞ্জ অবধি গিয়েছিলুম। এবার আর ঐ ছোট ষ্টীমার নয়, আমাদের ষ্টীমারের বিপুল বপু

ফ্ল্যাট জুড়ে আরও বিরাট্ হয়েছে। একটা ছোটখাটো জাহাজের মতই চলেছি। এমন সময় আমাদের দর্পচূর্ণ হোলো। দেখা গেলো, পিছনে দুটী বড় সমুদ্রগামী জাহাজ অত্যন্ত জোরে আসছে, দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। সারেং-এর মুখে শোনা গেল, তবু তারা অর্দ্ধেক ষ্টীমে যাচ্ছে, সমুদ্রে পড়লে পুরো জোরে যাবে। যে জাহাজটী ওর মধ্যে বড় সেটার থেকে অনেক বস্তা আটা ও চিনাবাদাম ফেলে দিল, কাছের নৌকাগুলি আঁকশি দিয়ে টেনে তুলে নিলো। এর অর্থ কি বুঝলাম না।

সাড়ে দশটায় উলুবেড়ের কাছাকাছি এসে দুটী কলকাতাগামী ডেসপাচের সঙ্গে দেখা হল, কাথিয়াবাড় ও মাদ্রাস। কয়েকটা বড় জাহাজও কলকাতার দিকে গেল।

আরও ঘণ্টাখানেক চলবার পর দেখা গেল ডান দিক হতে একটা বেশ বড় নদীর মত স্রোত যেন গঙ্গায় মিশেছে। খালাসিদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে ওটা মেদিনীপুরের খাঁড়ি, ওদিকে ষ্টীমার চলে না। কিন্তু অত বড় জলস্রোত কি একটা খাঁড়ি? বিশ্বাস হয় না। অবশেষে খবর পাওয়া গেলো যে ওটা যে সে জলস্রোত নয়, দামোদর নদ। কোথায় রাণীগঞ্জের দামোদর, কোথায় এখানকার দামোদর। বিপুল জলরাশি গঙ্গায় ঢালছে। আরও কিছুক্ষণ চলার পর রূপনারায়ণের সঙ্গম পাওয়া গেল। বিরাট্ নদী। যেখানে মিশেছে সেখানে বহু বর্গমাইল অতল জল থই থই করছে। দুই চারটা নৌবহর দাঁড়াতে পারে, এত জায়গা। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর বিখ্যাত কবিতা মনে পড়ল।

রূপনারাণের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে

* * * * *

কোথা তীর। চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।

সত্যি তাই! এখন ভরা গঙ্গা, বালুচরের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু শীতকালেও এই বিরাট্ জলরাশি যে কোনও মুহূর্ত্তেই উন্মাদ নৃত্যে করতালি দিয়ে উঠতে পারে, মনে হোলো—তীরের নাগাল পাওয়া আমাদের জাহাজেরই পক্ষে শক্ত হবে, নৌকার দূরের কথা। যেদিকে তাকাই শুধু জল, তীর চোখে পড়ে না। রূপনারায়ণ ও গঙ্গার সঙ্গমের ঠিক মুখে একখানি দোতলা বাড়ী, লাল টালির চিলেকোঠা—একটু দূরেই সারি সারি কয়েকটা টিনের ঘর, সম্ভবতঃ গুদাম, দেখা গেল।

কলিকাতার তলায় গঙ্গার জল কার্তিকের শেষেও লাল, তবে তাতে ঢেউ নেই—বাঁধা পাড়ের মধ্য দিয়ে বওয়ায় তার উদ্দামতাও কিছু নেই। রাজগঞ্জের বাঁক ফিরতেই নদী চওড়া হতে শুরু হোল এবং জলের চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। জলের রং আরও লাল, ঢেউগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। দামোদর সঙ্গম পার হতে দেখা গেল নদী কূলে কূলে ভরা, কিন্তু জলের রং হোল ঈষৎ ফিকে। রূপনারায়ণ পার হতে জলের রং হয়ে দাঁড়াল ফিকে গেরুয়া; চমৎকার নরম রং, কূলে কূলে ভরা অতল জল থই থই করছে, দূরে তটভূমি দুটী নীল অর্দ্ধচন্দ্রের রেখার মত দেখা যাচ্ছে, দুএকটা পাল-তোলা নৌকো কচিৎ দেখা যাচ্ছে, বড় বড় জাহাজ যাওয়া আসা করছে।

বেলা একটা নাগাত ডায়মণ্ডহারবারের সীমানায় পৌছলাম। নদীর ধারে বাড়ীঘর, সেই ভাঙ্গা কেল্লা, তার শেষে লোহার টাওয়ার, বোধ হয় হাওয়া-আফিসের। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়বার পরই আড়কাটী (Pilot) তুলে নেওয়া গেল। আড়কাটীর নাম মাণিক আলি, এইখানে জাহাজ পাইলট করবার ভার তার উপরে। তার নির্দ্দেশমত আমরা গঙ্গায় আরও কিছুদূর গিয়ে হুগলী পয়েন্ট পার হয়ে বড়তলা বলে একটা খালে পৌছলাম। এ জায়গাটাতে চড়া পড়ে যথেষ্ট, সেইজন্য পাইলটের হিসেব মত চলতে হয়। বড়তলায় নাকি বারটী নদী, অর্থাৎ খাল, এসে মিশেছে। বড়তলা ছাড়িয়েই আমরা বাঁয়ে চ্যানেল ক্রীক নামে একটি খাঁড়িতে এসে ঢুকলাম। খাঁড়িটী বেশ চওড়া, কিন্তু অগভীর। আমাদের সঙ্গের দুটী ফ্ল্যাটের খালাসিরা জল মেপে মেপে চড়া আছে কিনা দেখতে লাগল এবং দরকার মত সুর করে ও-ও ও ও বাম্ দিকে এ এ এ-এ নাই, ও-ও ও-ও ডান্ দিকে এ-এ এ এ নাই, হাঁকতে লাগল। চ্যানেল ক্রীকে একটু এগোনোর পর আরও একটা খাঁড়ি ডান দিকে বেরিয়েছে দেখা গেল। এ খাঁড়িটা নাকি সাগর দ্বীপের ওপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। আমরা চ্যানেল ক্রীক দিয়ে অগ্রসর হতে হতে বাঁয়ে কাকদ্বীপ ও ঘুঘুডাঙ্গা পেলাম, ডাইনে দূরে কচুবেড়ে ও সাগরথানা দেখা গেল; পাইলট সাগর মেলার স্থানও বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দূরবীণের সাহায্যেও তা বোঝা গেল না। কাছেই অবশ্য কাঁকড়ামারীর চর বলে একটা চর পড়ল; বেশ জঙ্গল,—শোনা গেল হরিণ এবং বাঘ আছে। তার সামনেই একটা ফ্ল্যাটের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। বহু বছর আগে অ্যাণ্ড্ ইউল কোম্পানীর 'লণ্ডন' নামে একটা পাট-বোঝাই ফ্ল্যাটে আগুন লাগে, তাতে সেটী ডুবে যায়, আর তোলা যায় নি। এটী সেই নিমজ্জিত লণ্ডন।

কাঁকড়ামারীর চরের সামনে একটী সরু খাল এসে চ্যানেল ক্রীকে পড়েছে, সারেংরা তাকে বলে নামকানার খাল, স্থানীয় নাম

তিনটি ভাল ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান যাদুকর আর্ণোল্ড ফাষ্ট´ (Arnold Furst) সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আর্ণোল্ড ফাষ্ট´ সাহেবের নাম এদেশে বিশেষ পরিচিত না হইলেও ওদেশের যাদুকর সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি আছে। মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে মার্কিনদিগের খুব বড় বড় ঘাঁটি (base) করা হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র মার্কিন সৈন্য সেখানে থাকিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধরত সৈন্যদিগকে আনন্দ পরিবেশনের জন্য U. S. O. show বিভাগ খোলেন এবং এই U. S. O. Camp showsএর পক্ষ হইতে ওদেশের বহু খ্যাতনামা যাদুকরদিগকে এদেশে পাঠান হয়। প্রথমে

যাদুকর আর্ণোল্ড ফাষ্ট´ ও পি-সি সরকার

(Arnold Furst & P. C. Sorcar)

আসেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন (Jack Gwynne), যাদুকর জ্যাকগুইন হস্তকৌশলজাত (manipulative) ম্যাজিকে বিশেষ দক্ষ এবং তিনি বহু নূতন নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়া জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আমি যে Box, Tray and Screen Illusion খেলাটি দেখাইয়া থাকি—উহা এই যাদুকর জ্যাকগুইন সাহেব কর্ত্তৃকই আবিষ্কৃত। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি মুঙ্গেরে আনন্দভবনে মুঙ্গেরের রাজা ও বিহারের লাট সাহেব স্যার রাদারফোর্ডের সম্মুখে এই খেলাটি বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। একটি 'ট্রে'র উপর কয়েক খণ্ড টুকরা তক্তা পড়িয়াছিল—সেই টুকরা টুকরা তক্তাগুলি দিয়া 'ট্রে'র উপর একটা বাক্স তৈয়ার করা হইল এবং সেই বাক্স হইতে একটি একটি করিয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি নানা রংএর সিল্কের রুমাল বাহির করা হইল। বাক্সটির মধ্যে ঐরূপ রুমাল দুই ডজনের বেশী কিছুতেই স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত না। এর পর একটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণরঞ্জিত খদ্দরের ভারতীয় জাতীয় পতাকা বাহির করা হইল। সপারিষদ লাট সাহেব ইহা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। এর পর আরও ফ্লাগ, তারপর

যাদুকর আর্ণোল্ড ফাষ্ট´ ও যাদুকর লেভান্তে

(Arnold Furst & Levante)

জীবন্ত কবুতর ঐ বাক্স হইতে বাহির করা হইল। এই খেলার মধ্যে যে কোন সময় বাক্সটিকে খুলিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে খালি দেখান চলে। খেলাটি খুবই চমৎকার। ইহা ছাড়া Temple of Benares, Colour Changing Rabbit, Flipover Dove Vanish Box প্রভৃতি সমস্তই যাদুকর জ্যাকগুইনের আবিষ্কৃত। জ্যাকগুইন ভারতবর্ষে আসিয়া উত্তর

ক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি ভারতীয় যাদুবিদ্যা দর্শনে খুবই প্রীত হন এবং আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আসামে আমার খেলা দেখেন—আমি তখন শিলং, সিলেট, গৌহাটি অঞ্চলে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছিলাম। যাদুকর জ্যাকগুইন আমাকে তাহার ফটোচিত্র দিয়া যান এবং তাহাতে লিখেন To my friend Sorcar, the best Magician I saw in India এবং মুখে খুবই হিসাবে আমার কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আমার যাদুবিদ্যা সম্পর্কে তিনি নিউ ইয়র্কের Bill Board পত্রিকায় এবং পৃথিবী বিখ্যাত মাসিক Sphinx পত্রিকায় বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাদুকর জ্যাকগুইন সাহেবের পর আসেন যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট। আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট সাহেব Fresh fish sold here today নামক একটি খেলা আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই খেলাটি বিগত Pacific Coast American Magiciansএর আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করে এবং আমেরিকার ও লণ্ডনের বহু লব্ধপ্রসিদ্ধ যাদুকরের প্রশংসা লাভ করে। বর্ত্তমানে বহু খ্যাতনামা যাদুকর পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই খেলা প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন যাদুকর (Arnold Furst) আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট কলিকাতায় আমাকে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন এবং দুই তিন দিন আমরা যাদুবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করি। আমি তাঁহার খেলা দেখি এবং আমার খেলা তাঁহাকে দেখাই। তিনি আমাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর বলিয়া অভিহিত করিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিতে নারাজ হন এবং পৃথিবীর যাদুকর সমাজের পংক্তিতে তুলিয়া "A Great Magician" বলেন। চিত্রে যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট ও অষ্ট্রেলিয়ান যাদুকর লে ভান্তে (Levante) সাহেবকে দেখা যাইতেছে। লেভান্তে সাহেবও পৃথিবীর একজন "Great Magician." অপর চিত্রটি আমি যখন আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট সাহেবের খেলা দেখিতে যাই তখন তোলা হইয়াছিল। আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট তাঁহার খেলা দেখাইবার

মার্কিন যাদুকর জন মুলহল্যাণ্ড (John Mulholland) টুপী হইতে খরগোস বাহির করিতেছেন

প্রশংসা করেন। আমি ইহাতে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করি, কারণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকরের নিকট হইতে এইরূপ প্রশংসা পাইবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এর পর যাদুকর জ্যাকগুইন আমেরিকায় যাইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট এবং তদ্দেশীয় যাদুকর সম্মিলনীতে ভারতীয় যাদুবিদ্যার কথা এবং ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়দাতা সময় কতকগুলি ভারতীয় খেলা দেখান এবং ভারতীয় খেলা তিনি পছন্দ করেন এ কথা স্বীকার করেন। তাঁহার প্রদর্শিত খেলাসমূহের মধ্যে ডিম, রুমাল, শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ, পাগড়ী ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া, Fresh fish sold here প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সকল যাদুকরই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা সর্ব্বশেষে দেখান—যাদুকর

Arnold Furst সাহেবও তাঁহার সর্ব্বশেষ খেলা টুপী হইতে খরগোস বাহির করা (Rabbit out of a hat) দেখান। যখন তিনি টুপীর মধ্য হইতে একটি জীবন্ত সাদা খরগোস টানিয়া বাহির করেন তখন তাঁহাকে অপর একজন পৃথিবী-বিখ্যাত যাদুকরের মত মনে হইল। তাঁহার নাম জন মুল হল্যাণ্ড (John Mulholland) যাদুকর জন মুল হল্যাণ্ড পৃথিবীতে ম্যাজিক বিদ্যার ইতিহাস এবং ম্যাজিকের খেলা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখেন। Mulholland—world's greatest Authority in the History of Magic এই নামে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত। যাদুকর মুল হল্যাণ্ড সাহেব ওদেশের পত্রিকাদিতে প্রায়ই যাদুবিদ্যা সম্পর্কে লিখেন, নিজেই একটী পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি

গভর্ণমেণ্ট মেডেলিয়ন (ভারতীয় যাদুকরদের মধ্যে পি-সি-সরকারই সর্ব্বপ্রথম এই 'বিশেষ পদক' লাভ করেন)

কয়েকবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং শেষবারে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। পাঁচ মিনিটে আমগাছ তৈয়ারী করা তাঁহার একটি বিশেষত্বপূর্ণ খেলা। এই খেলাটি তিনি ভারতবর্ষ হইতেই শিখিয়া গিয়াছিলেন। আমেরিকায় তিনি Ching Ling Foo চিং লিং ফুঃ অথবা মহম্মদ দি বক্স হিন্দু Mohammad Bux the Hindoo এই নাম লইয়া খেলা দেখান। মার্কিন যাদুকরগণ এই ভাবে ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ লইয়া খেলা দেখাইতে খুবই ভালবাসেন। U. S. O. Showর পক্ষ হইতে John Platt নামক অপর একজন খ্যাতনামা মার্কিন যাদুকর ভারতবর্ষে আসেন—তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় নাম লইয়া ভারতীয় পোষাকে খেলা দেখাইয়া থাকেন। Johnny Platt সাহেবও আমার খেলা দেখিয়া খুবই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাকে আমেরিকায় লইয়া যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় Johnny Platt সম্পর্কে এক্ষণে বেশী লিখিব না, বারান্তরে তাঁহার কথা আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে কয়েকটি সহজ ও সুন্দর ম্যাজিকের খেলা প্রকাশ করিব যাহা দেখাইয়া আমার পাঠকবর্গ অনায়াসে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে অবাক করিয়া দিতে পারিবেন।

মনের কথা বলা

ছোটদের মহলে 'থটরিডিং'এর খেলা খুব ভাল জমে। ইতিপূর্ব্বে থটরিডিংএর নানারূপ খেলাই বহুস্থানে প্রকাশিত করিয়াছি, (রেডিওতে বলিয়াছি, পত্রিকায় লিখিয়াছি এবং পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি)। কিন্তু এক্ষণে যেটি বলা হইতেছে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহাতে যাদুকর তাঁহার দর্শকদের একজনকে তাঁহার কত টাকা আছে মনে মনে ধরিতে বলিবেন, তারপর কয়েকটা যোগ বিয়োগ পূরণ করা—ব্যস যাদুকর বলিয়া দিলেন কত টাকা ধরা হইয়াছে। এক্ষণে খেলাটির কৌশল

চিকাগোর সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর জন প্লাট (John Platt) মুসলমানবেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন।

বলিয়া দেওয়া যাইতেছে। যাদুকর তাঁহার দর্শককে বলিলেন—"আপনার পকেটে যত টাকা আছে মনে মনে ধরুন। আমাকে বলিবেন না—উহাকে ডবল করুন। এক্ষণে উহাকে পাঁচ দিয়া গুণ করুন। কত হইল আমাকে জানান।" ভদ্রলোক যত বলিবেন তাহার পিছন হইতে শূন্যটি বাদ দিলেই তাহার মনের সংখ্যা বাহির হইল। উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে :—মনে করুন ভদ্রলোকের ২৫৲ পঁচিশ টাকা ছিল, উহাকে ডবল করাতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইল এক্ষণে এই ৫০কে ৫ দ্বারা গুণ করাতে ৫০×৫=২৫০ হইল। যাদুকর এই ২৫০ শুনিয়া দুই শত পঞ্চাশের ০ বাদ দিলেন এবং ২৫ পাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন

তাহার ২৫৲ আছে। এই খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অতিশয় সহজ, অথচ কেহ সহজে ধরিতে পারে না।

পয়সাকে আধুলি করা

পয়সাকে আধুলি করার খেলাটা খুবই সহজ অথচ খুবই সুন্দর এবং যে কেহ অতি সহজে এইটি করিতে পারিবেন। আমি যখন স্কুলের

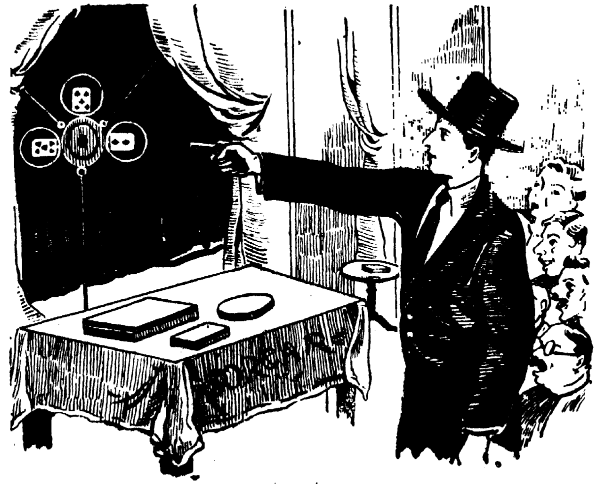

বেলুন টারগেট খেলা

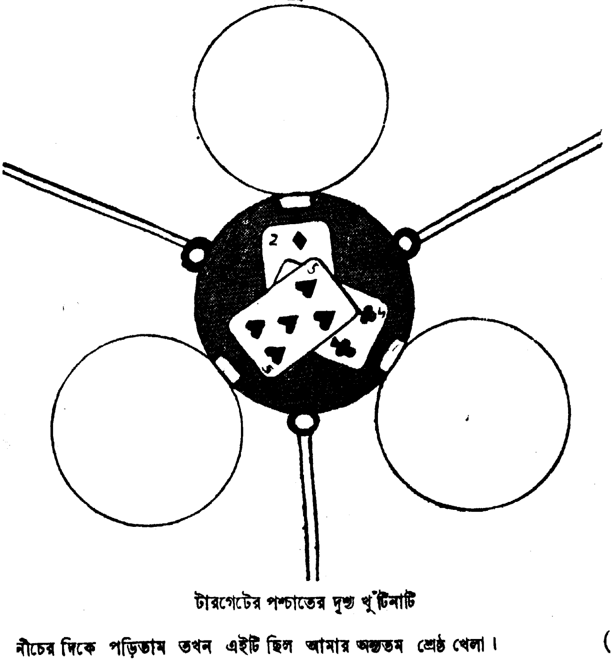

টারগেটের পশ্চাতের দৃশ্য খুঁটিনাটি

নীচের দিকে পড়িতাম তখন এইটি ছিল আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা। সে কথা মনে হইলে আজকাল হাসি পায় সত্য, কিন্তু নূতন প্রণালীতে এই খেলা আমি বর্ত্তমানেও দেখাইয়া থাকি। একটা নূতন পয়সা লইয়া এই খেলা করিতে হয়। আধুনিক মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত পয়সা নহে ঠিক ইহার পূর্ব্বকার পয়সা যাহা আকৃতিতে আধুলির ঠিক সমান ছিল। পয়সাটির যেদিকে রাজার মাথা আছে সেইদিকে রূপার গিল্‌টি বা সিলভারিং বা নিকেল প্লেটিং করাইয়া লইতে হইবে। কলিকাতায় যে কোন ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এর দোকানে দিলেই তাহারা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কয়েক মিনিটের মধ্যে এইটি করিয়া দিবে। তবেই সমস্ত প্রস্তুত হইল। এক হাতে সন প্রভৃতি লেখা দিকটা বাহির করিয়া সকলকে দেখাইতে হইবে যে সেটা একটি সাধারণ পয়সা মাত্র। এইবার পয়সাটি একজন লোকের হাতে ধরিতে দিয়া তাহাকে বলিতে হইবে যে পয়সাটি হাতে দেওয়া মাত্র যেন তিনি হাত বন্ধ করেন। এর পর হাত খুলিলেই দেখা যাইবে যে তাঁহার হস্তস্থিত পয়সাটি আধুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কি মজা! তৎক্ষণাৎ ঐটি তাঁহার নিকট হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লওয়া মাত্র এবং হাত মুঠা করা মাত্র উহা পুনরায় পয়সা হইয়া যাইবে। ব্যাপারটা কিছুই নহে, একজনের হাত হইতে অপর জনের হাতে পয়সা লওয়ার ব্যাপারে আপনা আপনিই পয়সাটি উল্টা হইয়া যাইতেছে এবং দর্শকগণ গিল্‌টি করা পয়সার পিঠ দেখিয়া আধুলি ভ্রম করিতেছেন। মফঃস্বলের লোকেরা যাহারা পয়সার উপরে অনুরূপ গিল্‌টি করাইবার সুযোগ বা সুবিধা পাইবেন না, তাঁহারা পয়সার উপর পাতলা আঠা মাখাইয়া তাহার উপর সিগারেট বাক্সের রাংতা (রাঙ্) লাগাইয়া জোরে চাপিয়া আঁটিয়া দিতে পারেন। তাহাতেও খেলাটা ভাল ভাবেই হয়। দুইটা পয়সা এইভাবে তৈয়ার করিয়া লইলে এই খেলাটা অন্যভাবেও দেখান যাইতে পারে। যেমন ডান হাতে পয়সার পিঠ এবং বাম হাতে আধুলির পিঠ দেখান হইল। ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া দুই হাত মুঠা করিয়া পুনরায় খুলিবামাত্র বাম হাতে পয়সা যাইবে এবং ডান হাতে আধুলি যাইবে—অর্থাৎ এহাত ওহাত যাতায়াত করিল। খেলাটা খুবই সহজ নহে কি? অনেকে পয়সার পিছনে আধুলি আঠা দ্বারা আটকাইয়া লইয়া এই খেলা দেখাইয়া থাকেন। আমার উহা পছন্দ হয় না, কারণ অতিরিক্ত পুরু বলিয়া ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে।

বেলুন টারগেট

(SORCAR'S BALLOON TARGET)

আমার আবিষ্কৃত 'বেলুন টারগেট' খেলাটি অতি অল্পকালের মধ্যে

পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা আমি আমার বিখ্যাত বেলুনের মধ্যে তাস খেলাটির কৌশলেই তৈয়ার করি। সে খেলাতে একটি মাত্র বেলুন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এইটিতে তিনটি বেলুন এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইবে। চিত্র দেখিলে এই খেলা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। যাহারা যাদুবিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই অভিজ্ঞ তাঁহারা দেখিবেন যে, এই খেলাটি বহুলাংশে পুরাতন খেলা 'কার্ডষ্টার' (card star) এর অনুরূপ হইলেও বহুগুণে উন্নত। রঙ্গমঞ্চে খেলা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে হইতেই রঙ্গিন সিল্কের ফিতা দ্বারা একটি চাঁদমারি (target) টাঙ্গান আছে। উহাতে তিনটি রিং ফিট্ করা আছে। এক্ষণে যাদুকর এক প্যাকেট তাস লইয়া দর্শকদের নিকটে গেলেন এবং উহার মধ্য হইতে যে কোন তিনটি তাস টানিয়া লইতে বলিবেন। তিনটি তাস বাছিয়া লইবার পর দর্শকগণ উহা পুনরায় প্যাকেটে ফিরাইয়া দিলেন কিম্বা বন্দুকের নলের মধ্যে ভরিয়া নিলেন অথবা ঐগুলি পুড়াইয়া ছাই করিয়া, সেই ছাই বন্দুকের নলের মধ্যে ভরিয়া দিলেন। তারপর সকলের পরীক্ষিত তিনটি বেলুন সর্ব্বসমক্ষে ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া ঐ রিংটির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইল। এইবার ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র বেলুন তিনটি যুগপৎ ফাটিয়া যাইবে এবং সে স্থলে দর্শকদের মনোনীত তাস তিনটিদেখা দিবে। এই খেলাটি বিশেষভাবে ব্যবসায়ী যাদুকরদের জন্য প্রযোজ্য, কারণ তিনটি তাস দর্শকদিগের দ্বারা নিজের ইচ্ছামত টানান কষ্টকর, তবে অভ্যাস করিলে জগতে কিছুই অসাধ্য নহে। তিনটি তাস 'ফোর্স' করার জন্য "সেল্‌ফ ফোর্সিং" তাসের ব্যবহার করা চলে। তখন খেলাটি নবাগতদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে। প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে যে রঙ্গমঞ্চের 'বেলুন টারগেট' ফিতা দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে এবং যাদুকর বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র বেলুনগুলি ফাটিয়া যথাক্রমে চিড়াতনের পাঁচ, হরতনের পাঁচ ও রুহিতনের দুই—এই তিনটি তাস উঠিয়াছে এবং দর্শকগণ ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রে ও তৃতীয় চিত্রে যথাক্রমে টারগেটের পশ্চাতের দৃশ্য এবং খেলার শেষে সম্মুখের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। তাসগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য ছোট ছোট 'স্প্রীং ক্লিপ আছে—'স্প্রীং ক্লিপের' মধ্যে উক্ত তাস তিনটি আটকাইয়া দিয়া—পিছন দিকে ভাঁজ করিয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে কিভাবে রুহিতনের দুই, তৎপর চিড়াতনের পাঁচ এবং তৎপর হরতনের পাঁচ ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে রাখিলে ওপিঠ হইতে একটি তাসও দেখা যাইবে না এবং এইভাবেই এই বেলুন টারগেট রঙ্গমঞ্চে পূর্ব্ব হইতে টাঙ্গান থাকে। তাসগুলি ভাঁজ করিয়া অপর একটি 'স্প্রীং ক্লিপ' দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হয় এবং এই ক্লিপের সংযুক্ত সূতা পর্দ্দার অন্তরালে সহকারীর নিকট থাকিবে। যাদুকর ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র সহকারী পশ্চাৎ হইতে সূতা ধরিয়া টান দিবেন এবং দর্শকদের মনোনীত তাস

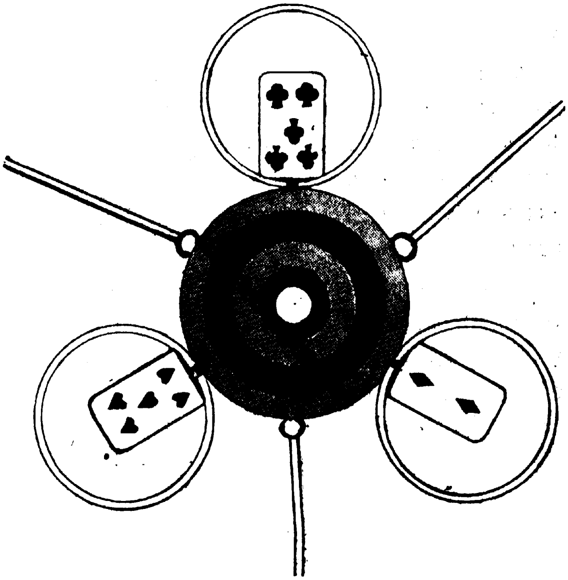

সম্মুখে দৃশ্য (খেলা হইবার পর)

ঘুরিয়া যাইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইবে। তাসের এবং স্প্রীংএর আঘাত লাগিয়া বেলুনগুলি আপনা আপনি ফাটিয়া যাইবে। তবে বেলুনগুলি শক্ত রবারের প্রস্তুত হইলে সহজে না ফাটিতেও পারে। সেক্ষেত্রে বেলুন ফাটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যেমন প্রত্যেকটি স্প্রীং-এর সহিত ছোট ছোট আলপিন ঝালাই করিয়া রাখা ইত্যাদি। খেলাটি ব্যবসায়ী যাদুকরদের পক্ষে খুবই ভাল—বর্ত্তমানে আমেরিকার বহু যাদুকর আমার এই খেলা দেখাইতেছেন এবং তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন 'Sorcar's Balloon Target', কিছুদিন পূর্ব্বে বিগত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমার এই বেলুন টারগেট খেলাটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে Abbotts Magic Capital of the Worldর মুখপত্র জগৎ প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাতে বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে নির্দ্দেশ ছিল যে যাদুকরগণ যেন ইহা 'Sorcar's Balloon Target' নামে ব্যবহার করেন। একজন ভারতীয় যাদুকর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত খেলা পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় যাদুকরগণ প্রদর্শন করিতেছেন শুনিলে মনে আনন্দ হয়। আশা করি উপরোক্ত খেলা তিনটি আমাদের দেশের ছোট বড় সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দশ

মণিমোহন তখনও যেন সম্মোহিত হইয়াই আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি ? দেখিতেছে অসংলগ্ন খেয়াল ? দশ বছর আগে যা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যা নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তেঁতুলিয়া নদীর কূল-ভাঙা প্রচণ্ড জোয়ারের তরঙ্গে উন্মাদ স্রোতোধারার সঙ্গে, তাহা কি আবার এমন ভাবে ফিরিয়া দেখা দিতে পারে কোনো উপায়ে, কোনো সম্ভব বা অসম্ভব স্বপ্নেও ?

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কিছুই নয়। যাহা দেখিবার তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত সত্য এবং বাস্তব এই পৃথিবী। নৌকার নীচে তীক্ষ্ণধারায় খালের জল বহিতেছে—নৌকা দুলিতেছে ক্রমাগত। মশাগুলি কানের কাছে তেমনি গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। খাল হইতে পচা কচুরি এবং সদ্যোবর্ষণের পরে পৃথিবী হইতে পিচ্ছল কাদার গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে। মাঝিদের লণ্ঠনের আলোর চারিদিকে একটা প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে, দারোগা বেদনা-বিমর্ষ মুখে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিকার জাল হইতে চম্পট দিয়াছে এবং তাঁহার ইন্‌সপেক্টর হইবার সযত্ন-লালিত স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কৈবল্যধাম লাভ করিয়া বসিয়া আছে।

আর দারোগার টর্চের আলো যাহার মুখে পড়িয়াছে—সে কে, সে কী ?

শাদা পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। জীবনে কত কীর্তিই সে করিল তাহার শেষ নাই। সে কীর্তির একটা অধ্যায়ের সঙ্গে মণিমোহন নিজেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টির বিচারে, সমাজের চোখে তাহার স্থান কোথাও নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল বন্য জীবন—একটা আগুনের মতো তীব্র তপ্ত লালসা। কিন্তু এই মুখখানা দেখিলে সে কথা কাহার মনে হইবে। নির্মল, পবিত্র, কোনোখানে মলিনতার একবিন্দু চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে কথা কহিল। বলিল, থাক আলো নিবিয়ে দিন। আমি দেখছি দারোগা বাবু।

মেয়েটি তাহাকে চিনিল কি ? তাহার নীলার মতো চোখে পরিচয়ের কোনো আভাস কি ঝলক দিয়া উঠিল ? কিন্তু সে সব স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে হইবার আগেই দারোগার টর্চের আলোটা নিবিয়া গেল। শুধু মাঝিদের লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল শিখার যে রক্তাভাটুকু জাগিয়া রহিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কোনো জনহীন নিবিড় বনের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাঙা একটি দেবমূর্তির ওপরে বনের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলোকের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মণিমোহন বলিল, আমি কাল ওর সঙ্গে কথা বলব। আজ থাক। আপনি কি ওকে থানায় নিয়ে যেতে চান ?

নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দারোগা যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন না, সে শুধু মণিমোহন সম্মুখে ছিল বলিয়াই। বলিলেন, থানায় নিয়ে যাবোনা মানে ? চালান দেব। কি আপনি বলেন স্যার ? এই বেটিই সব জানে, সব গণ্ডগোলের গোড়াতেই—

—প্রমাণ করতে পারবেন তো ?

—নিশ্চয়। সাক্ষীর অভাব হবেনা। বলেন কি মশাই, আমার এতদিনের আশা, বুড়োবয়েসে কোথায় একটু ভালো রকম পেন্সন পাবো তা নয়—

গলার সুরে মনে হইল যেন কান্না উচ্ছলাইয়া পড়িতেছে।

—বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে আমি একবার কাল আপনার আসামীর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখব। হয়তো আপনার তাতে সুবিধেই হবে।

—বেশ তো, বেশ তো স্যার। দারোগা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন : তা হলে কালই আপনার কাছে হাজির করব সকালে। কখন নিয়ে যাব ? আটটা—নটা ?

—আচ্ছা।

মণিমোহন চোখ বুজিয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার আর ভালো লাগিতেছে না, কথা বলিতেও যেন সে শ্রান্তি বোধ করিতেছে।

দারোগা কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, স্যার বোঝেন তো, আমাদের সবই আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর করছে। দু চারটে কথা যদি বার করে দিতে পারেন, তাহলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অবশ্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবনা, তবুও—

—আচ্ছা—আচ্ছা—মণিমোহন যেন ধমক দিল একটু : সে আপনার ভাবতে হবেনা। আমি যতটুকু ভালো বুঝি করব।

—না, তাই বলছিলাম আর কি স্যার। আচ্ছা আপনি ঘুমোন—সন্ত্রস্ত দারোগা নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ যাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কালকের মতো

আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে অস্ত চাঁদের উপরে, ভোরের দিকে বৃষ্টি নামিবে কিনা কে জানে। নৌকার গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড়, দূরে শিয়ালের ডাক—কোথা হইতে হিস্‌হিস্ করিয়া একটানা একটা অদ্ভুত শব্দ। যেন নৌকার আকস্মিক উপদ্রবে বিব্রত হইয়া কতকগুলি সদ্য ঘুমভাঙা সাপ একসঙ্গে ফণা তুলিয়াছে—শত্রুকে ছোবল মারিবে।

মণিমোহন ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিল কিন্তু ঘুম আসিলনা। চোখের পাতায় যেন হাজার হাজার পিন ফুটিতেছে—মাথার মধ্যে ফুলঝুরির মতো অবিশ্রাম কতকগুলি আগুনের তারা ঝরিয়া চলিয়াছে। কাকে দেখিল সে—কী দেখিল! দশবছর ধরিয়া যাহার জন্য সে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, অনেক শান্ত কোমল রাত্রে চাঁদ-ডুবিয়া-যাওয়া স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন শুধু দূরের রেল লাইনের কলিকাতাগামী ট্রেনের চাকার তলায় মরা-নদীর ব্রীজ হইতে ঝমঝম করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, আর ঘুমন্ত রাণীর বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে বালিশের উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—সেই সময় চলন্ত একটা অন্ধকার ট্রেণের জানালা হইতে একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের মতো মনের সামনে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কাহার মুখ? এবং সেই মুখকে এখানে এইভাবে যে দেখিবে এমন কল্পনা সেকি করিয়াছিল কখনো?

আশ্চর্য মুখখানি। এত ঝড় এত ঝাপটা বহিয়া গেছে। সর্বোপরি বহিয়া গেছে সময়—তেঁতুলিয়ার স্রোতে নতুন ডাঙা, নতুন উপনিবেশ জাগাইয়া তোলা সময়। অথচ সে স্রোত এতটুকুও দাগ কাটে নাই, একটি শামুক ঝিনুকের চলার দাগেও সে মুখ এতটুকু রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে নাই। আশ্চর্য!

কাল দেখা হইবে। দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা কি ফিরিয়া আসে? আর কি ফিরিয়া আসে কখনো? জীবনের গতি বৃত্তাকার নয়, কখনো সরল, কখনো সরীসৃপ। সেদিনও মনটা নিজের বাঁধা পথ খুঁজিয়া পায় নাই—মনে রোমান্সের নেশা ছিল—এই নতুন দেশ, অদ্ভুত নদী সেদিন বিচিত্র রোমাঞ্চ কল্পনা আর স্বপ্ন কামনা জাগাইয়া তুলিত। সেদিন আজ আর নাই। সব চেনা হইয়া গেছে, জানা হইয়া গেছে, প্রতিদিনের অতি পরিচয়ে নেশা কাটিয়া গেছে। দীর্ঘ নদীপথ ক্লান্তিকর মনে হয়,—নতুন জাগা বালির চর দেখিয়া তিনশো বছর আগেকার পর্তুগীজদের স্বপ্ন ফিরিয়া আসে না—দুপুরের রোদে ঝিকমিকি বালির তাপে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

সর্বোপরি রাণী। সেদিনও উজ্জ্বল মন তাকে মানিয়া লয় নাই—সেদিনের প্রেম ছিল আকারহীন একটা অর্ধ তরল পিণ্ডের মতো, যেমন খুশি তাহাকে রূপ দেওয়া চলিত, আকার দেওয়া চলিত। আজ অনেক সুখের তাপে সেই তরলতা জমাট বাঁধিয়াছে—জীবনের যাহা কিছু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমান একটা কঠিন ভিত্তির উপর। আজ সেখানে আলোড়ন জাগাইতে গেলে ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে—সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে। সে ভাঙন আজ আর মণিমোহন কামনা করেনা—সে ভাঙনকে মনের মধ্যে মানিয়া লইবার স্পৃহা বা দুঃসাহস কোনোটাই তাহার নাই। আজ রাণীই ভালো—আজ পিণ্টুর মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের রূপায়ন। তাহার চাকরীর ভবিষ্যৎ একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিয়াছে।

না—দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা আর ফিরিবেনা।

* * *

কিন্তু সুখ ছিলনা বলরাম ভিষক্‌রত্নের। ভগবান তাঁহার কপালে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই কি আর তাহাতে এক বিন্দু সুবিধা হইবে।

মনে মনে ডি সিলভা আর ক্রুজার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বলরাম ফিরিলেন। জননী মেরীর এত দয়া, আর এই সন্তানগুলিকে তিনি কি মর্ত্যলোক হইতে তুলিয়া তাঁহার স্নেহময় স্বর্গীয় কোলে স্থান দিতে পারেন না? তাহা হইলে পৃথিবীর না হোক, অন্তত বলরামের ভাজা-ভাজা হাড়গুলি তো জুড়াইয়া যায়।

রাধানাথ তাঁহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পড়িয়াছে কুম্ভকর্ণের মতো, কাণের কাছে এখন তাহার প্রবল বেগে কাড়া-নাকাড়া বাজাইলেও সে ট্যাঁ কোঁ করিবেনা। বলরামের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সে নিরিবিলিতে এবং নিভৃতে তাঁহার মদনানন্দ মোদক কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া থাকে।

হাত পা ধুইয়া বলরাম খাইতে বসিলেন। রাত্রে তিনি ভাত খান না—খান সামান্য রুটি আর তরকারী। কিন্তু রুটি মুখে দিয়াই মনে হইল, ইহার চাইতে জুতোর শুকতলা চিবাইয়া হজম করা সহজ। টানের চোটে মুখের বাঁধানো গোটাকয়েক দাঁত একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার বাসনা করিল।

—জুতোর—

জোর করিয়া কয়েক টুকরা রুটি দাঁতে ছিঁড়িয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। হতভাগা দিনের পর দিন কী রান্নাই যে রাঁধিতেছে আজকাল। গৃহিণীহীন সংসারের চিরকাল যা হইয়া থাকে ঠিক তাই, এ জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, রাগ করাটাও সমান মূল্যহীন এবং অবান্তর।

কিন্তু দোষ শুধু রাধানাথেরই নয়। সাবাস একখানা যু বাধিয়াছে বটে। মানুষকে একেবারে বেহদ্দ করিল, ত্রিভুব

দেখাইয়া ছাড়িল বলিলেই চলে। ধান চালের যাহা হইবার তাহা-তো ষোলো আনাই হইয়াছে, আর আটা যা আমদানি হইতেছে ইদানিং তাহার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও মিলিবেনা। করাতের গুঁড়া এবং ধানের তুঁষ মিলাইয়া যে কোনোদিন আটা নামক একটি খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আর তাহা মানুষের পেটে ঢুকিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিতে পারে, কবিরাজী শাস্ত্রের কোনো পুঁথিতেই তাহার উল্লেখ নাই। এ কী ব্যাপার এবং কী বস্তু?

বলরাম নিজেই উঠিয়া গড়গড়াটা ধরাইলেন। তারপর আসিয়া বসিলেন বাহিরের ঘরটাতে। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও আজকাল অত্যন্ত হালকা হইয়া উঠিয়াছে। ছানী কাটানো চোখ দুইটা মাঝে মাঝে জ্বালা করে, এক একদিন মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া যায়, কপালের দু'পাশে রগগুলি রক্তের চাঞ্চল্যে লাফাইতে থাকে—ঘুম আসে না। আজও ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বসিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

কিছু কিছু মশার উপদ্রব বোধ হইতেছিল, দুহাতে সেগুলি মারিতে মারিতে কখন যে তন্দ্রার আবেগ আসিয়াছে বলরাম ভালো করিয়া তাহা টের পান নাই। অস্পষ্ট হইয়া আসা চেতনার মধ্যে তিনি দেখিতেছিলেন—ডি সিল্‌ভা মেজের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দুর্গন্ধ বমিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে, আর—

কড়াং—কড়াং—

দরজার কড়া নড়িল। কড়—কড়াং—

তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাকিয়ায় পিঠ খাড়া করিয়া ক্ষুব্ধ বিরক্ত বলরাম উঠিয়া বসিলেন—আঃ, এই রাত্রে আবার জ্বালাইতে আসিল কে? অসুখ বিসুখ কী দিনই যে পাইয়াছে—রোগীদের অত্যাচারেই এবারে বলরামকে চর-ইসমাইল ছাড়িয়া তল্পী-তল্পা গুটাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ডাক্তারখানার শিশিতে তো খানিকটা লাল-নীল জল, অতএব—

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়িতেছে অধৈর্যভাবে।—কে?

কোনো সাড়া আসিল না।

—কে ডাকে এখন?

তবুও সাড়া নাই। সহসা একটা আশঙ্কায় বলরামের মন ভরিয়া গেল। চারদিকে যে একটা অশান্তি এবং বিক্ষোভের চাপা আগুন ধোঁয়াইত হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ধান নাই, চাল নাই। চর-ইসমাইলের মানুষগুলির রক্তে বিদ্রোহ জাগিতেছে। তাহারা এখানে ওখানে জমায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে যেমনভাবে হোক ধান চাল সংগ্রহ করিবেই। মহাজনের গোলা কিম্বা আড়তদারের গুদাম—দরকার হইলে লুট তরাজ করিয়া লইতেও তাহাদের আপত্তি নাই। তাহাদের লক্ষ্য বস্তুর ভিতরে তিনিও যে একজন আছেন, একথাও বলরাম ভালো করিয়াই জানেন।

সুতরাং আতঙ্কে তাঁহার বুকের ভেতরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। উঠিয়া দরজা যে খুলিয়া দিবেন এমন শক্তি রহিল না, শুধু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া চলিলেন।

কিন্তু কড়—কড়াং! কড়—কড়—কড়াং—

কড়া নাড়া চলিতেছে তো চলিতেছেই। বলরাম কাণ পাতিয়া শব্দটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। যে নাড়িতেছে সে খানিকটা সংশয়-গ্রস্ত এবং ভীত। খুব সম্ভব ডি ক্রুজা বলিয়া মনে হইতেছে! তবু বিশ্বাস নাই—সাড়া দেয় না কেন?

মরিয়া হইয়া বলরাম হাঁকিলেন: কে?

একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন পাওয়া গেল। কিন্তু কী শব্দ? বলরাম কাণ পাতিলেন। একটা চাপা কান্না—কেউ যেন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নাই, কান্নার শব্দই বটে। কিন্তু কার কান্না, কিসের কান্না?

আর বসিয়া থাকা অসম্ভব।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—খুলছি—মরিয়া হইয়া একটা হাঁক দিয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। যা হওয়ার হোক। এই অশ্রান্ত কড়ানাড়া, রহস্যময় নীরবতার সঙ্গে কান্নার শব্দটা তাঁহাকে পাগল করিয়া দিতেছে। বলরাম আলোটার তেজ বাড়াইয়া দিলেন, তার পরে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দ্বিধা কম্পিত হাতে দরজার হুড়কাটা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। কে জানে, কোন্ ভয়ানক একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিকই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিল অন্তত সে সম্ভাবনার জন্য মনের দিক হইতে তিনি এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাকে নির্বাক স্থবির করিয়া দিয়া একটি লোক ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কিন্তু সে কী এবং কে বলরাম বুঝিতে পারিলেন না।

তাহার সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। সেই বোরখার এখানে ওখানে কাঁচা রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে মাতালের মতো টলিতেছে।

ব্যাপার কী? ভৌতিক ঘটনা নাকি? না বলরাম ঘুমাইয়া আছেন এখনো?

কিন্তু বোরখায় ঢাকা রহস্যময় মূর্তিটি তাঁহার সামনেই তো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের দাগগুলি সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশই

পাতাটার উপর না পড়লেও আমাদের মনে হবে যেন আলো পড়েচে সমস্ত পাতাটা জুড়েই। আমরা যেমন পড়বার সময় বাঁ দিক থেকে ডানদিকে পড়তে পড়তে এগোই, আবার একটা লাইন পড়া শেষ হলে দ্বিতীয় লাইনের বাঁদিক থেকে সুরু করি, তেমনি স্থির আলোর বদলে ছোট একটা টর্চ্চ বাতি দিয়ে এক একটা লাইনের উপর বাঁদিক থেকে সুরু করে ডানদিকে আলো ফেলা হতে লাগল। প্রথম লাইনের শেষ পর্য্যন্ত আলো ফেলা শেষ হ'লে, ফের দ্বিতীয় লাইনের বাঁদিক থেকে আলো ফেলা আরম্ভ করতে হবে। তার পরে তৃতীয় লাইন। এই রকম করে যখন সমস্ত দিকে যখন আলো পড়েছিল তখনকার ছবি চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই টর্চ্চের বাতিটা সমস্ত লাইনগুলির উপর আলো ফেলা শেষ করে ফের গোড়ার জায়গায় এসেচে—নতুন করে ঘুরে আসবার জন্য তাহ'লে আমরা চোখে দেখে বুঝতেই পারবো না যে একটা চলন্ত আলো দিয়ে পাতাটার উপর আলো ফেলা হচ্চে। মনে হবে একটা স্থির আলোতেই সমস্ত পাতাটা আলো হয়ে রয়েছে। কারণ যেখানেই তাকাই সেখানেই আলোর একটা ছাপ মেলাতে না মেলাতেই আবার সেখানে আলো এসে যাচ্ছে আর তার ছাপও পড়ে যাচ্ছে চোখের ভিতর। তাই মনে হবে

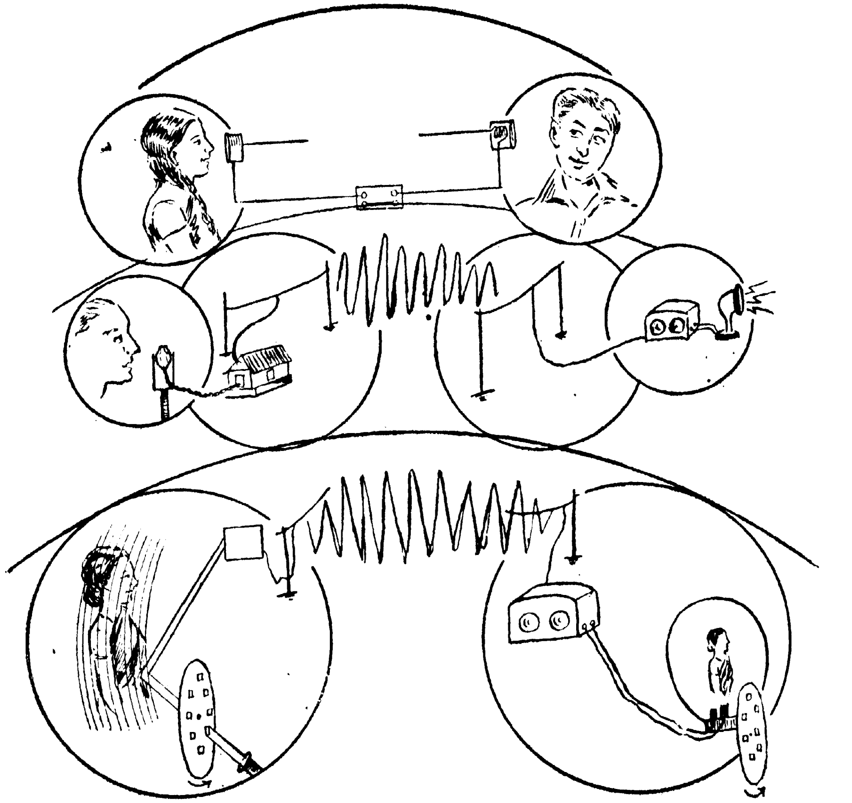

[টেলিফোন, বেতার এবং টেলিভিশনের তুলনা দেখানো হইয়াছে। টেলিফোনে 'তার' বাহিয়া কারেণ্টের ঢেউএর উপর ভর দিয়া শব্দ যাইতেছে। বেতারে শব্দ যাইতেছে ইথার তরঙ্গের মাথায় চাপিয়া আর টেলিভিশনে ছবি যাইতেছে ইথার তরঙ্গের মাথায় পা দিয়া]

পাতাটা শেষ হয়ে গেল, তখন আবার গোড়া থেকে সুরু হ'ল এই আলো ফেলা। টর্চ্চের আলোটা যদি খুব ধীরে ধীরে নড়তে থাকে তাহ'লে গোটা পাতাটার উপর একসঙ্গে আলো দেখতে পাবো না। যখন যে জায়গাটিতে আলো গিয়ে পড়বে সেই জায়গাটিই শুধু আলোকিত দেখব। কিন্তু বাতিটা যদি এত তাড়াতাড়ি চলে' বেড়ায় যে প্রথম লাইনের গোড়ার বরাবরই সেখানে আলো রয়েছে। কোনও একটা জায়গার ছাপ আমাদের চোখে এক সেকেণ্ডের বারো-তেরো ভাগের একভাগ সময় ধরে থাকেই। তাই আলোটা যদি সেকেণ্ডে অন্তত বারো-তেরো বার গোটা পাতাটার উপর দিয়ে ঘুরে আসে তাহ'লেই হ'ল। শুধু এই কেন, যে কোনও জিনিষই এই রকম চলন্ত আলোতে দেখলে বোঝা যাবে না

যে আলোটা সত্যি সত্যিই চলে বেড়াচ্ছে কিনা। আলো নিয়ে এত যে খেলা হচ্ছে, সে কথা মনেই হবে না।

এইখানেই হ'ল টেলিভিশনের সুরু।

আমরা যে সামনের জিনিষ দেখতে পাই তার কারণ হ'ল তাদের কাছ থেকে আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে। তবে সব জিনিষেরই যে নিজেরই আলো আছে এমন নয়। অনেকের নিজেরই আলো রয়েছে, যেমন সূর্য, পৃথিবীর প্রদীপ, এই সব। আবার অনেকের আলো ধার করা। জগতে এদের সংখ্যাই বেশী। সামনে যে বইখানা দেখছি তার নিজস্ব আলো বলতে কিছু নেই। কিন্তু সূর্য বা অন্য কোন বাতি থেকে আলো এসে পড়চে বইএর উপরে এবং সেখান থেকে তখন আলো ঠিকরে আসে আমাদের চোখে। তাই আমরা দেখতে পাই। যেখান থেকে যেরকম আলো আসচে সেইখানটিকে সেইরকম দেখবো। যেখান থেকে লাল আলো আসচে সে জায়গা মনে হবে লাল, আবার যেখান থেকে সাদা আলো আসচে সেখানটা মনে হবে সাদা। যেখান থেকে আলো আসচে খুবই কম সেই জায়গা মনে হবে কালো। আমরা রংএর কথা এখানে বাদ দিয়ে শুধু সাদা-কালোর কথাই বলব। যেমন আমরা দেখি বায়োস্কোপের ছবি সাদায়, কালোয়। এই রকম একটা ছবির কথাই

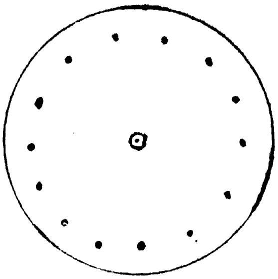

চোদ্দটা ফুটো-ওয়ালা ডিস্ক

ধরা যাক। এর চুল থেকে আলো আসচে বেশী, তাই কপাল মনে হয় ফর্সা। ছবির প্রত্যেকটি জায়গা সম্বন্ধেই এই একই কথা। ছবির বিভিন্ন অংশ যেমন নাক, কান, চোখের তারা এই সব থেকে বিভিন্ন পরিমাণ আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে তাই আমরা এই সব আলাদা আলাদা বলে বুঝতে পারি। যদি কপাল আর চিবুক থেকে অবিকল একই আলো এসে পড়ত আমাদের চোখে, তাহ'লে আর চিবুক-কপালের পার্থক্য বোঝা যেত না—সব একাকার হ'য়ে যেত। আসল কথা হ'ল এই যে, শুধু বিভিন্ন পরিমাণ আলো বিভিন্ন অংশ থেকে আসচে বলেই তাদের পৃথক পৃথক করে চেনা যাচ্ছে। কোনও হাফ্‌টোন ছবি দেখলে এই কথাটি সহজেই বোঝা যাবে। সেখানে নাক-চোখ—সবই কম-বেশী কালো-ফুটকির সমন্বয় নিয়ে আঁকা হয়। যেখানে ফুটকিগুলি যত ঘন সেখান থেকে আলো আসবে তত কম।

হয়ত আমরা একটা মানুষের ছবি দেখছি—স্থির আলোতে নয়, সন্ধানী (চলন্ত) আলোয়। বইএর পাতায় যেমন পর পর লাইন সাজান রয়েছে, মনে মনে ছবিটাকেও সেই রকম লাইনে ভাগ করে ফেলা হ'ল। তারপরে একটার পর একটা করে লাইনের উপর দিয়ে ফেলতে হবে সন্ধানী আলো—খুবই তাড়াতাড়ি। সবগুলি লাইন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ফের আলো ফেলা সুরু হবে সবার উপরের লাইন থেকে। ছবির যে কোন জায়গা থেকে যে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে লাগে, আসলে এই আলোই সেই অংশটুকুর ছবির অনুভূতি জাগায়। ছবিটাকে মনে মনে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেললাম। মনে মনে নম্বর দিলাম—এক নম্বর অংশ, দু নম্বর অংশ—এই রকম। প্রত্যেক অংশ থেকে যে আলো আসচে তাকে চালান করে আনতে হবে দর্শকের সামনে পর্দ্দার উপরে। কিন্তু পর্দ্দার উপরে যে কোন জায়গায় এনে ফেললেই তো হবে না। আসল ছবির এক নম্বর অংশ থেকে যে আলো আসচে তাকে

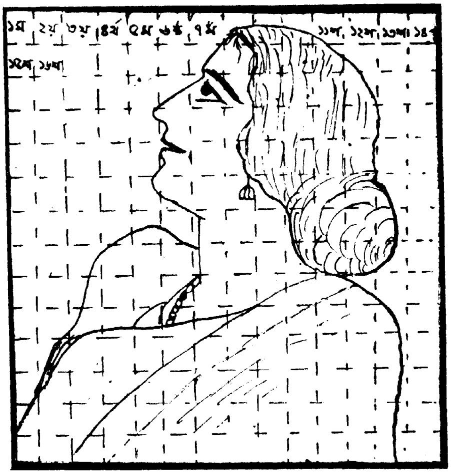

[যে ছবি দূরে পাঠাইতে হইবে তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ fig III করা হইয়াছে]

আনতে হবে পর্দ্দার উপরে যেখানে এক নম্বর অংশের থাকা উচিত। ছবির ডান চোখ হয়ত দশ নম্বর অংশে রয়েচে। তাই পর্দ্দার উপরে সেখান থেকে আলো এনে ফেলতে হবে যেখানে দশ নম্বর অংশের থাকার কথা অর্থাৎ যেখানে ডান চোখ ফুটে ওঠা উচিত। আসল ছবির যেখানকার আলো, পর্দ্দার উপরেও তাকে অনুরূপ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, এই-ই হ'ল দরকারী কথা। এ যেন আসল ছবির টুকরোগুলিকেই পর্দ্দার উপর এনে ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে দেওয়া।

ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে আসার কাজ কিন্তু অন্য এক কৌশলেও করা যায়। পর্দ্দার সামনে বসাতে হবে একটা ডিস্ক,—তার ভিতরে একটি ফুটো। ছবির যে কোন অংশ থেকে যে আলো আনা হচ্ছে তাকে ঠিক মত জায়গায় না ফেলে সমস্ত পর্দ্দাটার উপর ফেলতে হবে। আর ঐ

ফুটোটিকে আনতে হবে দরকার মত জায়গায়। কারণ ফুটোর ভিতর দিয়ে গোটা পর্দাটাতো আর দেখা যাবে না। দরকারী জায়গাটাই শুধু দেখা যাবে। আমরা উদাহরণ দেবার বেলা বলেছি যে দশ নম্বর অংশের ভিতর রয়েছে ছবির ডান চোখ। সেখান থেকে যে আলো আসচে তাকে সমস্ত পর্দার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এখন ডিস্কের ফুটোটিকে আনতে হবে এমন জায়গায় যেখানে দশ নম্বর অংশের ছবি পড়া উচিত পর্দার উপরে, তাহলেই সেখানে ডান চোখ দেখা যাবে। তাই এক অংশের আলো পর্দার উপরে অনুরূপ জায়গায় না এনে, তার বদলে ফুটোটিকে অনুরূপ জায়গায় আনা হচ্ছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে সন্ধানী আলো যেমন ছবির বিভিন্ন অংশের উপর পড়চে তখনতখনই সেই সেই অংশ থেকে ঠিকরে-পড়া আলোকে কি করেই বা পর্দার উপরে আনা যায়, আর কি করেই বা ডিস্কের ফুটোটিকে ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা যায়? কিন্তু তার আগে বেতারের সাধারণ দু'একটা কথা বলা দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথা বললে বা শব্দ করলে বাতাসে ঢেউ উঠতে থাকে, আর সেই ঢেউ যখন আর একজনের কানে গিয়ে লাগে তখন সে শুনতে পায়। এটা জানা কথা। কিন্তু এই শব্দকেই যদি অনেক, অনেক দূরের লোকের কাছে চালান করে দিতে হয় তাহ'লে একটু কৌশল করতে হ'বে। নিতে হ'বে কোন যন্ত্রের সাহায্য।

প্রথমেই মনে পড়ে টেলিফোনের কথা। টেলিফোনের ভিতরে থাকে দু'টি অংশ—একটা কথা-বলা কৌটো—মাইক্রোফোন, আর দ্বিতীয়টা শুনবার যন্ত্র—রিসিভার। মাইক্রোফোনের ভিতরে থাকে ছোট একটা ইবোনাইটের কৌটো, কারবনের গুড়োতে ভর্ত্তি। তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একটা ষ্টিলের চাকতি দিয়ে। এই চাকতিটির সামনেই কথা বলতে হবে এবং কথা বললেই বাতাসের ধাক্কায় চাকতিটা কাঁপতে থাকে। তারই ফলে ভিতরকার গুড়োগুলি কখনও জমাট বেঁধে যায়, আবার কখনও বা যায় আলগা হয়ে।

এদিকে রিসিভারও ঠিক ঐ রকম একটি ইবোনাইটের কৌটা। তবে তার ভিতরে কারবন গুঁড়োর বদলে রয়েছে একটা তার-কুণ্ডলী। সেই কুণ্ডলীর ভিতরে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একখণ্ড লোহা। এরও মুখ বন্ধ করা হয়েছে একটি ষ্টিলের চাকতি দিয়ে। জড়ানো তার কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে যদি ইলেকট্রিক কারেণ্ট বইতে সুরু করে তাহ'লে লোহাটা যায় চুম্বক হয়ে। কারেণ্ট বেশী গেলে এর জোর হয় খুব বেশী। আবার কম কারেণ্ট গেলে জোরও যায় কমে। এবারে মাইক্রোফোন আর রিসিভার জুড়ে দিতে হবে। প্রথমেই নেওয়া হ'ল ব্যাটারী। তার এক মাথা থেকে তার এনে জুড়ে দেওয়া হ'ল মাইক্রোফোনের চাকতিটির সাথে। আর একটা তার নিয়ে, তার একপ্রান্ত মাইক্রোফোনের কারবন গুঁড়োর ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর অপর প্রান্ত জুড়ে দিতে হবে রিসিভারের ভিতরকার জড়ানো তার কুণ্ডলীর এক প্রান্তের সাথে। সেই তার কুণ্ডলীর আর একপ্রান্ত এইবারে জুড়ে দিতে হবে ব্যাটারীর অপর প্রান্তের সঙ্গে। তাহ'লে, কারেণ্ট ব্যাটারী থেকে প্রথমে মাইক্রোফোনের কারবন গুঁড়োর ভিতর দিয়ে তার বেয়ে চলে যাবে রিসিভারের জড়ানো তারে। সেখানে তার কুণ্ডল পেরিয়ে ফের চলে আসবে ব্যাটারীতে। এই হ'ল কারেণ্টের পথ। এখন দেখা যাক, কথা বললে কী ব্যাপার দাঁড়ায়। আগেই বলেছি যে কথা বললে বা শব্দ করলে কারবন গুড়োগুলি কখনও বা জমাট বেঁধে যায়—আবার কখনও বা যায় আলগা হয়,

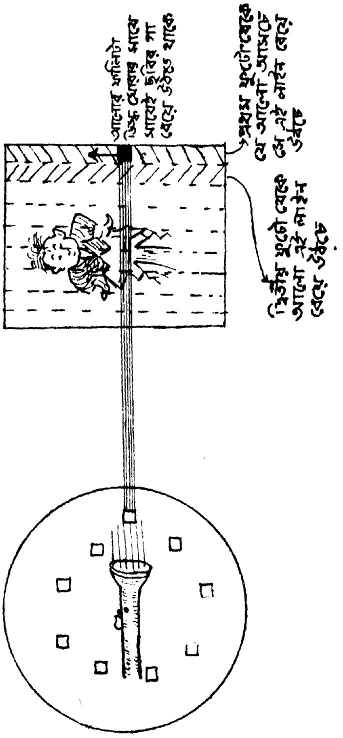

[এখানে যে ফুটাটি টর্চ্চের সামনে পড়িতেছে তাহার মধ্য দিয়াই শুধু আলো গিয়া ছবির উপর পড়িতেছে। ডিস্কটি ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছবির উপর আলোর ফালিটিও একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে]

চাকতিটির ধাক্কায় ধাক্কায়। জমাট বাঁধা কারবনের ভিতর দিয়ে কারেণ্টের যেতে ভারী সুবিধা, আর আলগা গুঁড়োর ভিতর দিয়ে যেতে অসুবিধার একশেষ। তাই কথা বলার সাথে সাথে এই জমাট বাঁধা আর আলগা হবার দরুণ কারেণ্ট বেশী-কম হতে থাকে। সোজা কথায় বলা যায় কারেণ্টের মধ্যে ঢেউ উঠতে থাকে। এই ঢেউ অর্থাৎ কম-বেশী-হওয়া ইলেকট্রিক কারেণ্ট, তার বেয়ে চলে যায় রিসিভারের জড়ানো তারের মধ্যে। কিন্তু সেই তার কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে কম-বেশী কারেণ্ট যাওয়াতে চুম্বকের জোরেও কম-বেশী হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের চাকতিটির

উপরের কম-বেশী টান পড়তে থাকে। এই কম-বেশী টানের পাল্লায় পড়ে চাকতিটি কাঁপতে থাকে। বাতাসে ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ যখন কানে এসে লাগে তখনই কথা শোনা যায়।

দেখা যাচ্ছে টেলিফোনের ভিতরে বাতাসের ঢেউ দিয়ে কারেণ্টের ঢেউ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই কারেণ্টের ঢেউকে তারের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে দূরে। সেখানে আবার কারেণ্টের ঢেউ থেকে বাতাসের ঢেউ সৃষ্টি করে নেওয়া হচ্ছে।

এর পরে এলো বেতার। এখানেও মাইক্রোফোন রয়েছে। আর শোনবার প্রান্তে রয়েছে রিসিভার, হয় টেলিফোন, নয় লাউড্‌স্পীকার। এখানেও কথা বলার সাথে সাথেই কারেণ্টের ঢেউ সৃষ্টি হ'তে থাকে ঠিক টেলিফোনেরই মত। তবে এখানে সেই কারেণ্টের ঢেউ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোনও তার নেই। তখন খুঁজতে হ'ল অন্য কোন রকম বাহক। ইথারের ঢেউই হ'ল এই বাহক। ইথারের ঢেউ কারেণ্টের ঢেউকে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারে না। কারেণ্টের ঢেউ দিয়ে তার গায়ে ছাপ মেরে দিতে হয়। সেই ছাপ মারা ইথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সব দিকে। শ্রোতা সেই ঢেউকে ধরে তার আকাশ তার দিয়ে। তার পরে তার রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে এর কাছ থেকে ঠিক আগের মতই কারেণ্টের ঢেউ সৃষ্টি করে নেয়। আর সেই কারেণ্টের ঢেউ থেকেই টেলিফোনের রিসিভার বা লাউড্‌স্পীকার বাজতে সুরু করে।

এখানে দরকারী কথাটা হ'ল কারেণ্টের ঢেউ দিয়ে ইথারের ঢেউকে ছাপ মেরে দেওয়া। টেলিভিশনেও এই একই ব্যাপার। সেখানে শুধু শব্দের বদলে আলো থেকে প্রথমে কারেণ্টের ঢেউ সৃষ্টি করা হয়। তারপর সেই ঢেউ দিয়ে ছাপ মেরে দেওয়া হয়, ইথার ঢেউএর গায়ে। দর্শক সেই ছাপ মারা ইথার ঢেউ থেকে প্রথমে কারেণ্টের ঢেউ সৃষ্টি করে, তার পরে সেই ঢেউ থেকে আবার সৃষ্টি হয় আলোর—শব্দের নয়।

এই হ'ল টেলিভিশনের মূল কথা।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস্‌-এস্‌, এফ-আর্‌-ই-এস্‌

(১৯)

উপসংহার

বর্ত্তমান প্রস্তাবটি সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে উমেশচন্দ্রের চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিব।

উমেশচন্দ্র তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের একটি সুন্দর সমন্বয় করিয়াছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা ও অনুকরণীয় নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত অনন্যসাধারণ ত্যাগ, নির্ভীক তেজস্বিতা ও অসীম উদারতা তাঁহার মহান চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ, অতিথির প্রতি বাৎসল্য, দেশের প্রতি অসীম অনুরাগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শরণাগতকে আশ্রয় দান, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছিল। মাতা পিতা পিতামহ প্রভৃতির অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল। তখন এদেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোমতের ধ্রুবদর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (যাঁহার পত্রে প্রিন্সিপ্যাল এস্‌-লব, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, স্যর হেনরী কটন প্রভৃতি মনীষিগণ ধ্রুবদর্শনের আলোচনা করিতেন,) ইঁহাদের ন্যায় উমেশচন্দ্রের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপরেও কোমতের অসাধারণ প্রভাব পতিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। কিন্তু তিনি অন্তরের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, কখনও হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করেন নাই। তিনি পিতৃপিতামহ প্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের পূজার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতেন। যে ইংলণ্ড মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, সমাজহিতৈষী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও স্বদেশপ্রেমিক উমেশচন্দ্রের চিতাভস্ম ধারণ করিয়া ভারতবাসীর নিকট তীর্থ-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে, সেই ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্রের সমাধির উপর খোদিত আছে—

"Here lives W. C. Bonnerjee, a Hindu Brahmin, who on his way home fell a victim to Bright's disease & etc" অথচ উমেশচন্দ্র এত উদার ছিলেন যে কাহারও ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে তিনি হস্তক্ষেপ অনুচিত মনে করিতেন। এমন কি যখন তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকেও উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন তখন উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না, ইচ্ছা করিলে তাঁহার পত্নী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি মনে করিতেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" হেমাঙ্গিনী দেবী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মহান স্বামীর শ্রদ্ধা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের বাসভবন বিক্রয় করিয়া এদেশে আসিয়া হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও একাদশীব্রত প্রভৃতি পালন করিতেন বলিয়া শুনা যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু হয় এবং লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ইঁহার দেহ সমাহিত হয়। উমেশচন্দ্রের পরিচিত বন্ধুগণ, এমন

কি, অপরিচিতগণও তাঁহার অপূর্ব্ব আতিথেয়তার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রগণ বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট অকৃপণভাবে অর্থসাহায্য ও সৎপরামর্শ লাভ করিত। এদেশে উমেশচন্দ্রের অবস্থানকালে কেহ মাতৃদায় বা পিতৃদায় জানাইলে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কিন্তু বিবাহে পণপ্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং কন্যাদায় জানাইলে তিনি সাহায্য না করিয়া কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি স্বয়ং পুত্রকন্যাগণকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন

সুশীলা এনিটা বনার্জী

এবং বিবাহ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্বাধীন মতামত কখনও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার চারিপুত্র ও চারি কন্যা হয়। যথাক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) কমলকৃষ্ণ শেলী—ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল অফিসিয়াল রিসিভারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি গার্ট্রুড নাম্নী এক ইংলণ্ডীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার এক পুত্র এডুইন শেলী প্রিভিকৌন্সিলের ব্যারিষ্টার হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল কমলকৃষ্ণ শেলী দেহরক্ষা করেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। ইঁহার শিশুকন্যা ডলি (জন্ম ৩রা জুলাই ১৮৯৬, মৃত্যু ৬ই জুলাই ১৮৯৬) ও নিকটে সমাধিস্থ আছে।

(২) নলিনী হেলইস—ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ইনি জর্জ্জ ব্লেয়ার নামক ইংলণ্ডীয় এক ব্যারিষ্টারকে বিবাহ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জর্জ্জ ব্লেয়ার যোগদান করিয়াছিলেন এবং কর্ণেলের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে জর্জ্জ ব্লেয়ার এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী নলিনী দেহত্যাগ করেন এবং উভয়েই লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন।

(৩) সুশীলা এনিটা—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয় এবং লণ্ডনে এম-বি উপাধি লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ—লক্ষাধিক মুদ্রা—তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র লাহোর হাসপাতালে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর ইনি দেহরক্ষা করেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন।

(৪) কালীকৃষ্ণ উড—ইনিও ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং রেঙ্গুন হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি উমেশচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন এবং কখনও ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন নাই। বিক্রমপুরের কুলীন বংশসম্ভূতা শ্রীযুক্তা মৃণালবালা গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়ীতে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার পত্নী হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পাদন করেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা কুমারী সাধনা দেবী বর্ত্তমান

মিষ্টার ও মিসেস এ-এন-চৌধুরী

বৎসরে কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি উমেশচন্দ্রের একখানি ইংরাজী জীবনী প্রকাশিত করিয়া ইঁহার সর্ব্বজনপূজ্য পিতামহের তর্পণ করিয়াছেন।

(৫) সরলকৃষ্ণ কীটস্—ইনি অকালে পিতার জীবদ্দশাতেই ইংলণ্ডে পরলোকগমন করেন।

(৬) শ্রীযুক্তা প্রমীলা ফ্লোরেন্স—ইনিও অক্সফোর্ডে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এম্-এ উপাধিধারিণী। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য (ফেলো) এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ আগ্রহশীলা। কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এ-এন্-চৌধুরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহাদের তিনপুত্র ও এক দুহিতা। সকলেই অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত সৈন্য

মিষ্টার ও মিসেস পি-কে-মজুমদার

বিভাগে কার্য্য করেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারস্থ এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র সৈন্যসংক্রান্ত বিমান বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তৃতীয় পুত্র দিলীপও সৈন্য-বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা মিসেস অমিতা মুখার্জী লক্ষ্ণৌ নিবাসী পবিত্রকুমার মুখার্জীকে বিবাহ করেন। মিষ্টার মুখার্জী নৌবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

(৭) রতনকৃষ্ণ কার্য্যাণ—ইনিও ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কণ্ট্রোলার-জেনারেল রজনী রায়ের কন্যা অমিয়া রায়ের সহিত ব্রাহ্মমতে ইঁহার বিবাহ হয়। ইহার দুই পুত্র ভরত ও প্রতাপ। প্রতাপ মার্টিন এণ্ড কোংএর অধীনে কায করিতেন। রতনকৃষ্ণের চারিটী কন্যাও উচ্চশিক্ষিতা—

(ক) শ্রীযুক্তা মৃণালিনী এমার্সন এম-এ—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করেন।

(খ) শ্রীযুক্তা শীলা অভার,—চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী।

(গ) শ্রীযুক্তা অনিলা গ্রেহাম, এম্-এস্-সি—সরবরাহ বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্তা আছেন।

(ঘ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা টালিয়ান খাঁ। ইনি বোম্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একজন সম্ভ্রান্ত পার্শীকে বিবাহ করিয়াছেন।

(৮) জানকী আগ্‌নিস্। দার্জিলিঙ্গের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার (ইসলামপুরের জমীদারবংশীয় মিঃ প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদারের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহাদের এক পুত্র জয় প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন এবং অপর এক পুত্র করুণকুমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিমান-বহরে উইং কম্যাণ্ডারের সম্মানজনক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উচ্চতর সম্মান লাভ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ইঁহাদের এক কন্যা তারা দেবীর সহিত অক্সফোর্ড

তারাদেবী ও জয়পাল সিং

বিদ্যালয়ে শিক্ষিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড় জয়পাল সিংহের বিবাহ হইয়াছে।

উমেশচন্দ্রের সন্তানগণের মধ্যে মিসেস এ-এন-চৌধুরী এবং মিসেস পি-কে-মজুমদারই এক্ষণে জীবিতা আছেন।

উমেশচন্দ্রের অন্যতম খুল্লতাত শিবচন্দ্রের পুত্র—ইংলণ্ডের অন্যতম ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড পিট বনার্জী উমেশচন্দ্রের-বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি একবার পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ষ্টীফেন বনার্জী 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ানে'র সম্পাদকীয় চক্রে আছেন। ষ্টীফেনের পত্নী মার্জ্জরীও উক্ত পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। রেভারেণ্ড পিট বনার্জীর

ভ্রাতা ভার্ণন ম্যাকাই বনার্জীও উমেশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার শাসন বিভাগে কায করিতেন। শ্রীযুক্তা সাধনা দেবীর

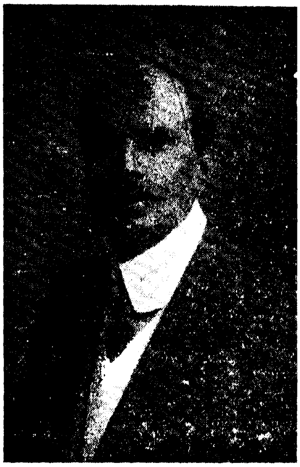

রেভারেণ্ড পিট বনার্জী

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট পিট বনার্জীর স্মৃতিকথা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতেন এবং তাঁহার সন্তানগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ষ্টীফেন বনার্জী

সকলেই ইঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে বিলাতে উমেশচন্দ্রের একটা ছোট-খাটো লাইব্রেরী ছিল, তাহাতে হাজার দুই বহি ছিল—অধিকাংশই ইতিহাস ও জীবনচরিতবিষয়ক। প্রাচীন সৎসাহিত্যের গ্রন্থ বেশী না থাকিলেও মোটামুটি তৎসম্বন্ধে তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি মিল্টন হইতে ভাল ভাল অংশ আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু মানব-হৃদয়ের গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সেক্সপীয়র ও ডিকেন্স তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। উমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁহার চরিত্রের সকল গুণকে অতিক্রম করিয়াছে। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং দেশবাসী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সেইজন্য বিভিন্ন প্রদেশ-

ভার্ণন ম্যাকাই বনার্জী

বাসীর আচার, ব্যবহার, অত্যধিক রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার সত্ত্বেও কেহই তাঁহার উদার হৃদয় হইতে দূরে যাইতে পারে নাই। কংগ্রেসের জন্য, বিশেষতঃ উহার ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটীর জন্য তিনি যে কত দূর অর্থ সাহায্য ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ কখনও জানা যাইবে না। রায় বাহাদুর আনন্দ চার্লু একটী প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

"উমেশচন্দ্র একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল যে বাক্য কেবল অসার পাতা এবং কার্য্যই ফল। তিনি দৃশ্যতঃ ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইলেও অনুভূতি, প্রেম ও মনোভাবে ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারতীয় ছিলেন। তিনি নেতার আসন অধিকার করিবার দাবী না করিলেও তিনি প্রকৃত-পক্ষে সকলকে পরিচালিত করিতেন এবং যখন পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিত এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যের

জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিদৃষ্ট হইত ; তখন তিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারিত করিয়া সকলকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেন। তাঁহার দান অসংখ্য ছিল কিন্তু উহা গোপনে অনুষ্ঠিত হইত, যেন প্রকাশ পাইলে তাঁহার বিশেষ লজ্জার কারণ ঘটিবে। এতদ্দ্বারা তিনি আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞা দৃঢ়ভাবে পালন করিয়াছিলেন—যে নয়টী গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে দান একটী। তিনি বৈদিক মন্ত্রের আদেশ "মাতৃ দেবো ভব"—"মাকে' দেবতার মত পূজা করিবে'—অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে তিনি হৃদয়ের কপাট মুক্ত করিয়া সকল কথাই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেন।"

কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক সমিতি প্রভৃতিতে উমেশচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ অভিমত যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত তৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরণ্ পিল্লাই তদীয় Indian Congressmen নামক পুস্তকে যে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনেকটা আলোকপাত করে। তিনি লিখিয়াছেন :—"একদিনের ঘটনার কথা আমার স্মরণ আছে। পুণায় কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে মিষ্টার মেটা ও মিষ্টার বনার্জী ছিলেন। একটা বিষয়ের আলোচনায় কংগ্রেস নেতৃগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া যথাশক্তি ওজস্বিতা ও বাগ্মিতাসহকারে তাঁহার অভিমত প্রকটিত করিলেন ও সভ্যগণের করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া পুনরুপবেশন করিলেন। তারপর মিষ্টার মেটা উঠিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি সহাস্য মুখে বিশ্লেষণ করিলেন, স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসরসিকতা দ্বারা সভ্যগণের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমিতির সদস্যগণকে তাঁহার স্বপক্ষাবলম্বী করিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদে উত্তেজিত হইয়া পুনরায় গাত্রোত্থান করিলেন এবং অধিকতর ওজস্বিতার সহিত বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার অপূর্ব্ব অলঙ্কারপূর্ণ উপসংহারাংশ শুনিয়া সদস্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরিশেষে উমেশচন্দ্র উঠিলেন এবং সরল সদ্যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথের অভিমত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। এই তর্ক-বিতর্ক প্রাণময়, উদ্দীপনাময়—প্রথম শ্রেণীর বিতর্কের মধ্যে গণ্য। ইহা যেন সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের মধ্যে যুদ্ধ। আর একজন উপস্থিত থাকিলে ইহা আরও প্রাণময় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—যদি আর্ডলি নর্টন উহাতে উপস্থিত থাকিতেন! কংগ্রেসের ইতিহাসে একবার মাত্র এক স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে কংগ্রেসের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি কংগ্রেস পতাকাতলে সমবেত হইয়া প্রতিভার লীলা দেখাইয়াছিলেন। সেটী বোম্বাই কংগ্রেস। তথায় ব্রাড্ল উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে বিতর্ক হইয়াছিল। বাস্তবিকই উহাতে প্রতিভা ও মনীষার অপূর্ব্ব লীলা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, মেটার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি, উমেশচন্দ্রের সরল অথচ ন্যায় ও যুক্তিসমন্বিত অভিমত এবং সর্ব্বশেষে নর্টনের তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী আক্রমণ!"

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে উমেশচন্দ্র অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সমাজে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রভাব, সমস্ত অর্থ প্রয়োজন হইলেই তিনি দেশের জন্য নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য সুপণ্ডিত রাজনীতিবিদ্ শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের খরচের জন্য ৭৫০০৲ ঘাট্‌তি হয়। এটর্ণি ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উহা পূরণ করিবার জন্য কয়েকজন ধনীর দ্বারস্থ হইবার সংকল্প করেন। উমেশচন্দ্রকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ৭৫০০৲ টাকার চেক সহি করিয়া দিয়া বলেন এই সামান্য টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার প্রয়োজন নাই। উমেশচন্দ্র

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

লেখক

নীরবে দেশসেবা করিতে ভালবাসিতেন, তিনি সেই Last infirmity of a noble mind—মহৎ ব্যক্তিগণের একমাত্র দুর্ব্বলতা—যশাকাঙ্ক্ষা

হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। আমাদের স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বন্ধু নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যে সুন্দর সনেটে এই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের 'তর্পণ' করিয়াছেন তাহাই পুনরুচ্চারিত করিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি :—

"বিধিদত্ত প্রতিভায় করি আরোহণ,
কৃতিত্বের—সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়,
ব্যবহারাজীব কার্য্যে তুমি বাঙ্গালায়
লভিলে অতুল যশ, প্রতিপত্তি ধন।
উৎসাহে তোমার পন্থা করিয়া গ্রহণ,
জয়ী হ'য়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতায়
লভিয়াছে শ্রীসৌভাগ্য ইষ্ট সাধনায়
তোমার স্বদেশবাসী আজি কতজন।

স্মরণীয় সদাশয় হিউমের সাথে
ভারতে 'জাতীয় মহাসমিতি' গঠনে,
ভারতবাসীর প্রাণে একতা জাগাতে—
বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে কায় মনে ধনে
দেশের যে হিত তুমি সাধিলে, তাহাতে
তব নাম চিরদিন গাঁথা রবে মনে।"

সমাপ্ত

সিঁড়ি

শ্রীভবেশ দত্ত

বড় সাহেব পার্শোনাল এ্যাসিষ্টাণ্টকে ধমক দিলেন—তোমার কাছ থেকে এ ধরণের ভুল হিসাব পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয়—একটা responsible post নিয়ে আছো—আর তোমারই কাজে এত ভুল, যাও clear out।

পার্শোনাল এ্যাসিষ্টাণ্ট বড় একটা সেলাম দিয়া নিজ অফিসে আসিয়া ফোন করিলেন বড়বাবুকে।

বড়বাবু কাছা আঁটিতে আঁটিতে ত্রস্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া মিলিটারী ভঙ্গীতে স্যালুট দিয়া দাঁড়াইলেন।

পি-এ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আপনার কাজ মোটেই প্রশংসনীয় নয়, কাজে এত ভুল—সামান্য হিসাবেই আপনার এত ভুল You are going to be a worthless day by day—যান আমার সামনে থেকে, মন দিয়ে কাজ কোরতে হয় কোরুন, না হয় resign দিন।

বড়বাবু কাঁচুমাচু হইয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন।

পি-এ ধমক দিলেন—Get out from my Chamber।

বড়বাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অফিসে আসিয়া ডাক দিলেন ছোটবাবুকে, ছোটবাবু অনাদি সবেমাত্র নস্য নাকে লইয়াছিল রুমাল দিয়া নাক মুছিতে মুছিতে বড়বাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বড়বাবু বলিলেন—তুমি একটা idiot বুঝেছো—তোমাকে আমি Discharge কোরব—সামান্য যোগ বিয়োগ তুমি কোরতে পারো না, আমি report কোরব সবায়ের নামে—নোতুন staff recruit কোরব।

অনাদি অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—Get out, সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

অনাদি তাহার জামার আস্তিন গুটাইয়া বাহিরে আসিয়া অফিস বয় ইব্রাহিমকে ডাক দিলেন।

ইব্রাহিম কাছে আসিতেই অনাদিবাবু তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুটো চড় মারিয়া বলিলেন—তোমার বড় বাড় হোয়েছে, তাই নয়, কোন কথাই কানে যায় না। অফিসটা এমন অপরিষ্কার হোয়ে রয়েছে, চোখে দেখতে পাও না।

অনাদি বেগে অফিসে চলিয়া গেলেন।

ইব্রাহিম ঝাড়ুওয়ালা বংশীকে চীৎকার করিয়া ডাকিল—বংশী কাছে আসিতেই ইব্রাহিম বলিল—তোমার হাজরী আজ বাবুদের চোখে কাটিয়ে দেবো—কোন কাজই তুমি করো না।

বংশী হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হুজুর, মারা যাবো। হাজরী কাটিয়ে দেবেন না।

ইব্রাহিম গম্ভীর হইয়া বলিল—ভাগো হিয়াসে—

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পরের ইতিহাস কলঙ্ক ও বেদনার ইতিহাস। ১৯৩৯-৪০ সাল বিগত। মাঝখানে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ দুর্য্যোগে বঙ্গদেশ, তাই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি বিপর্য্যস্ত—পর্য্যুদস্ত। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজি কর্ত্তৃক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত (মনোনীত?) হইয়াছিলেন। আমাদের মনে আছে এই বৎসরে সর্ব্বকনিষ্ঠ সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী রাষ্ট্রপতি সম্বোধনে সমাদৃত করিয়াছিলেন; তদবধি রাষ্ট্রপতি অভিধানটিই সুপ্রচলিত। ১৯৩৯ সালে, সুভাষবাবু গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চ মণ্ডলের মতের বিরুদ্ধে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদ অধিকারের চেষ্টা করেন এবং নির্ব্বাচনে, হাইকম্যাণ্ডের গান্ধীজী মনোনীত 'শ্লথগতি' প্রবীণ পট্টভি সীতারামিয়ার পরিবর্ত্তে ঝঞ্ঝাগতি নবীন সুভাষচন্দ্রের জয়ের এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ থাকিতে পারে না। গান্ধীজী স্বয়ং এই পরাজয়কে তাঁহার ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী কাহিনী অত্যন্ত বিরস ও তিক্ত। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গান্ধীজী মহামানবের প্রাপ্য পূজা পাইতেন, এখন হইতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে পদে পদে পূজার অঙ্গহানি ঘটিলেও বাঙ্গালীর মনস্তাপ জন্মিল না।

১৯৩৯এর কংগ্রেস অধিবেশন হইল, জব্বলপুর সন্নিকটস্থ ত্রিপুরীতে। কংগ্রেসে না আসিয়া গান্ধীজী সেই সময়ে রাজপুতানার

কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষুদ্র বৃহৎ তুচ্ছ মহৎ সর্ব্বকার্য্যে সুভাষচন্দ্রের আন্তরিক সংযোগ ঐতিহাসিক সত্য। কর্পোরেশনের ক্ষুদ্র একটি ব্যাঙ্কের উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্র, মধ্যস্থলে চীফ ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর বি, এন্, দে ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা জে, সি, মুখার্জ্জি (পার্শ্বে)

দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চমণ্ডল-সহিত গান্ধীজীর পরাজয় এবং সুভাষচন্দ্রের বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উচ্চমণ্ডলের ধীরমন্থর গতির বিরুদ্ধে দেশের জনমত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল এবং একটা বিশাল ও বিস্তৃত অংশ সুভাষচন্দ্রের অধীর, অস্থির ও দ্রুতগতিকেই পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক গতি মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করিতেছিল। সংখ্যায় তাহারাই অধিক, সেই সংখ্যাধিক্য সুভাষকে জয়মাল্য দান করিয়াছিল। রাজকোট নামক এক ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্পর্কে রাজ্যের সীমান্ত দ্বারের লৌহ কপাটে মাথা ঠুকিতে সুরু করিয়া দিলেন; আর তাঁহার অনুচরবর্গ—উচ্চমণ্ডল—ত্রিপুরীতে অভিমন্যু-বধের পুনরভিনয়ের আসর পাতিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিসদৃশ পরিস্থিতি এতই দুষ্পাচ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে আমার মনে আছে, আমি আমার দুইজন রাজনৈতিক বন্ধু সমভিব্যাহারে ত্রিপুরী পরিহরি বহুবারদৃষ্ট নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও মদনমহল দর্শনও

স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করিয়াছিলাম। ত্রিপুরীর তুলনায় মর্ম্মরমণ্ডিত নর্ম্মদা স্বাদু ও হৃদ্য বোধ হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রকে চিরকাল প্রবল ও সবল জননায়করূপেই আমি (সকলেই) দেখিয়াছি। কিন্তু এই সময়ে যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা, তখনকার দিনে বহু বাঙ্গালীকে ব্যথিত করিয়াছিল। কংগ্রেসের একটি কর্ম্ম পরিষদ আছে, সাধারণতঃ ওয়ার্কিং কমিটি নামে খ্যাত। সদস্য সংখ্যা ১৩ কিম্বা ১৫। সভাপতি সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তাঁহার কর্ম্ম-পরিষদ গঠন করিতে পারিতেন, করা তাঁহার উচিত ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ ও উচ্চমণ্ডলের সহযোগিতা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। কলহ আবর্ত্তিত আবহাওয়ায় ঐ দুইটি বস্তুই অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য, সকলেই তাহা জানিত; সুভাষচন্দ্রও যে না জানিতেন, তাহাও নহে। তথাপি কেন যে তিনি মনোনীত কর্ম্মী লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বিরত রহিলেন, বুঝি নাই। ত্রিপুরীর সপ্তরথী রচিত দুর্ভেদ্য বূ্যহ ভেদ করিয়া যখন সুভাষচন্দ্র, জামাডোবায় তাঁহার অন্যতম অগ্রজের (শ্রীযুত সুধীর বসুর) গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেইখানে এক সুদীর্ঘ পত্রে ঐ পরামর্শ দিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও আমাদের বাধে নাই। কয়েকদিন পরে, কার্শিয়ঙের গিদা পাহাড়ে পরম শ্রদ্ধেয় (মেজদা') শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পার্ব্বত্য বিরাম মন্দিরে চা বৈঠকে, শরৎবাবুকেও আমি সাধারণ (অর্থাৎ আমাদের মত গোলা) বাঙ্গালীর বাসনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। কিন্তু না, কাল-বৈশাখী অত্যাসন্ন, গতি রোধে কাহার সাধ্য?

অমোঘ অদৃষ্ট—যাহাকে আমরা নিয়তি বলি—কেমন কদমে কদমে সুভাষচন্দ্রকে দূর হইতে দূরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনকার দিনে তাহা দুনীরিক্ষ থাকিলেও, এখন চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নিয়তির বিধান যে অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতার আদৌ অবসান ঘটে। ঝড়ে আপন ঘরখানি উড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই না সুভাষচন্দ্র সমগ্র এসিয়া মহাদেশকেই আপনার ঘর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন? ভারতীয় কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়াই না অভিনব এবং অভাবনীয় কংগ্রেস সৃজিত হইতে পারিয়াছিল! পৃথিবীর যে ইতিহাস রচিত ও পঠিত হইয়া থাকে আর যে ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই, ভবিষ্যকালের নরনারী যে ইতিহাস পাঠ করিবার ভরসা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমি ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ইতিবৃত্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য। নিয়তি অদৃশ্য, অদৃষ্ট ও প্রবল পুরুষকার যেন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ—সঙ্গের সাথী হইয়া সুভাষের সঙ্গে পথে প্রান্তরে, অরণ্যে, রণে, বিজয়ে পরাজয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এমন অন্ধ কে আছে যে যাহা দেখিতে পায় না?

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পতন ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যুত্থান। তৎসঙ্গে "বন্দেমাতরম"-এর অঙ্গচ্ছেদ। দুইটার কোনটাকেই বাঙ্গালী সুস্থচিত্তে অথবা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিটাই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে, আজ, স্মরণ করিতেও দুঃখ ও লজ্জা হয় যে ক্ষোভের আধিক্য অত্যন্ত অশোভন হইয়া অতিথিপরায়ণ বঙ্গদেশের শুভ্র অঙ্গ দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমায় মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক পরিতাপ এই যে, মহান হইতে মহীয়ান্ মহাত্মা গান্ধীকেও ক্ষোভাগ্নির উত্তাপ স্পর্শবিরত হয় নাই। অগ্নি চিরদিন অন্ধ। এই দৃষ্টিহীন অন্ধ অগ্নি বহুদিন ধরিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত সেই কংগ্রেস ভবনটিও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল।

জমি পাওয়া গিয়াছে, আগেই বলিয়াছি। কর্পোরেশনে সুভাষের ভক্তবৃন্দ প্রস্তাব করিলেন, ঐ জমিতে গৃহনির্ম্মাণকল্পে নগদ এক লক্ষ টাকা সুভাষচন্দ্রকে প্রদত্ত হোক। কর্পোরেশনে সুভাষ-চন্দ্রের অমিত প্রতাপ, সামান্য বিরোধিতা ব্যর্থ করিয়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল; কিন্তু টাকা বাহির হইল না। কেন, তাহা এখনই বলিতেছি।

পাঠিকা ওপাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন যে ঠিক নয় মাস পূর্ব্বে, ডালহাউসী পর্ব্বতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র যে পরিকল্পনা আভাষে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ব্লু প্রিণ্টে—বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ, মহোচ্চ পরিকল্পনার কি শোচনীয় পরিণতি!

কর্ম্মবীর স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতায়, বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া কর্পোরেশনের সভায় যাঁহারা লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া দেশাত্ম-বোধের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কয়েক ঘণ্টা পরে, তাঁহারাই অনেকে দল বাঁধিয়া, ঘোঁট পাকাইয়া প্রস্তাবটিকে পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার শরণ লইলেন, লাখ না হয় ফাঁক। তাঁহাদের কাজটা নিশ্চয় নিন্দার্হ। কিন্তু কারণও কিছু ছিল; অকারণ বলিতে পারিব না। ডালহাউসী (পাহাড় নহে পুকুর) তটোপরি অবস্থিত প্রাসাদাভ্যন্তরে চির বিদ্যমান জুজুর ভয়ে অনেকের হৃদয় বিকম্পিত ছিল। জুজুর ভয় কবে বা কোথায় নাই? তখনকার মন্ত্রিবর্গের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণের

হইলেও, মন্ত্রিমণ্ডলের মনিবগণের চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত। বিশ্ববিধাতার বিশ্ববিধানে বিধি এই যে, শ্বেত আদেশ দিবে, কৃষ্ণ পালন করিবে। গোরোচনা গৌরী মান করিবে, কৃষ্ণকায় কৃষ্ণ মানভঞ্জনের পালা গাহিবে। কৃষ্ণকায় পরিচালিত কৃষ্ণবর্ণ কর্পোরেশনের উপর শ্বেতবর্ণের নীল নয়ন কোনদিনই প্রসন্ন ছিল না। কাণাঘুষায় কথা রটিল যে শ্বেত, কালো মাথায় মাথট, বসাইয়া লুণ্ঠিত লক্ষ মুদ্রা পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্প। "অমন অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মত বদলায়।" আর একটা গৌণ কারণও ছিল। সুভাষের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর হইতে, সগান্ধী কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের যে ঘূর্ণিবাত্যা বঙ্গদেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রবল বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া,পুরাণের বিশ্বা মত্র ঋষির অনুসরণে নবীন কংগ্রেস

রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন। মাইকে সুভাষচন্দ্র ; কবির বামদিকে মৃত্তিকাসনে সুভাষাগ্রজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

[কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে]

গঠন করিয়াছেন, নাম দিয়াছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক। নব্য কংগ্রেসের চেলা চামুণ্ডারা বৃদ্ধ কংগ্রেসকে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ করিয়া ফেলিয়া তবে শান্ত হইবে, বাজার এমন গরম। প্রাদেশিকতার ভূতপ্রেত দক্ষযজ্ঞান্তে নন্দী ভৃঙ্গীর মত তাণ্ডবের ধুয়া-নাচ নাচিতেছে। প্রাদেশিকতার ভূতটি বাঙ্গলার স্কন্ধে আর প্রেত মহোদয় বিহারের ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছে। ঢিলের আঘাত ও পাটকেলের প্রত্যাঘাতে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে গালাগালির যে গ্যাস ছুটিতেছিল, নিতান্তই গ্যাস-প্রুফ বলিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ সে যাত্রা পরিত্রাহি ডাকিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। নতুবা নিধন নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বর্ণে বর্ণে ও অক্ষরে অক্ষরে কথাগুলা রূঢ় হইলেও আমার এই কথা সত্য। কর্পোরেশনে এক দল লোক ধুয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, রাধাও নাচিবে না, তেলও পুড়িবে না অর্থাৎ লক্ষ টাকায় জাতীয় ভবনও হইবে না, জাতীয় বাহিনীও গঠিত হইবে না, টাকাগুলি গান্ধী মারণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেই শেষ হইয়া যাইবে! তাহারা আইনের প্যাঁচে ফেলিয়া চীফকে আটকাইয়া দিল। গভীর রাত্রে, ক্যামাক ষ্ট্রীটে চীফের ভবনে আসিয়া, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সাধ্যসাধনা-রোষক্ষোভ সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। আমাদের স্নেহভাজন কাউন্সিলার শ্রীমান সুধীর রায়চৌধুরী বিজয়সিং নাহার, মৃগেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুভাষ ভক্তগণও ব্যর্থমনোরথ হইলেন। শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহারা সুভাষচন্দ্র ও চীফের সাক্ষাৎ আলাপের ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন প্রভাতে 'গুহক মিলন' হইবে সেইদিন অতি প্রত্যূষে, কাক কোকিল শয্যা ত্যাগ করিবারও পূর্ব্বে, আমার ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল; টেলিফোন কাণে দিতেই, বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের "অগাধ জলে সাঁতার" শীর্ষক পরিচ্ছদের গুটি কয়েক ছত্র অন্তরে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিল।

"প্রতাপ ডাকিল, শৈবলিনী—শৈ"—

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল, হৃদয় কম্পিত হইল। * * * কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী কত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, সেই এক মন্বন্তর। * * * চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ, আজিও মরা এই গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

কতকাল পরে! সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়াছেন কিন্তু আনন্দে নিরানন্দ। তাঁহাকে সে কথা বলিলাম। সুভাষচন্দ্র বলিলেন, তা বললে হবে না, টাকাটা চাই। মিঃ মুখার্জ্জি আমার এখানে আসবার আগে আপনি তাঁকে বলুন।···ডালহাউসী পাহাড়ে সাহায্য করবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন, মনে আছে?

"বসি সেই শিলাতলে
নির্ঝরিণী কোলে
বলেছিলে কত কথা
ভুলিলে কেমনে?"

ভুলি নাই! ভুলি নাই!!

হাতী ঘোড়া উট সব তলাইয়া গিয়াছে, মশা পারিবে জল মাপিতে? মিঃ জে সির মত বন্ধুবৎসল বন্ধু বিরল এবং আমার সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল (আজ পর্য্যন্ত) আমার এই উচ্চহৃদয় সুহৃদের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহসম্ভোগের সুযোগ হইলেও, কর্পোরেশনের ব্যাপারে, যেখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সেখানে উলুখাগড়ার করণীয় কিছু থাকিতে পারে না জানিয়াও, কাঠবিড়ালীর ভূমিকা অভিনয় করিতে পশ্চাদপদ হওয়াটা ভাল মনে হইল না। কিন্তু আমি ত তৃণাদপি সুনীচেন, সুভাষচন্দ্রকেও ব্যর্থ হইতে হইয়াছিল। জে সির আবার —ইহাও বলি যে, দোষ ছিল না। কর্পোরেশনের প্রায় চল্লিশজন সদস্য লিখিতভাবে অনুরোধ (অর্থাৎ নির্দ্দেশ, কেন না, তাঁহারা মনিব) করিয়াছিলেন, তাঁহারা লক্ষ টাকা খয়রাত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সভাধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত চীফ যেন টাকা না দেন। জে-সি সুভাষবাবুর গৃহে চা খাইতে খাইতে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। 'এই অনুরোধ পত্র প্রত্যাহার করাইয়া দিন, অথবা গোটা কুড়ি নাম উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা করুন, আমি চেক্ দিবার আদেশ দিতে এক মুহূর্ত্তে বিলম্ব করিব না।' ইহা সম্ভব হয় নাই। ইত্যবসরে হাইকোর্ট ইঞ্জাংসন দিয়া বসিল। আশা অতলে ডুবিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিতে আসিয়া ভবনটির নামকরণ করিলেন, মহাজাতি সদন; "A house of Nation."

আজও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর কবিদত্ত নাম ও বিশাল সৌধের কঙ্কালখানি বক্ষে ধারণ করিয়া সুভাষের মহাজাতি সদন পথচারীর মনে অতীতের করুণ স্মৃতি জাগাইবার জন্য বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে।

সেদিনের সেই বিফলতা, সেই ব্যর্থ প্রয়াস যে কিছুকাল পরে শত সহস্র গুণ বলশালী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে কথা আজ আর কাহার অবিদিত? কলিকাতা মহানগরীর মহাজাতি সদন ঘটনাচক্রে কঙ্কালই রহিয়া গেল, কিন্তু দেশান্তরে, ক্ষেত্রান্তরে, প্রকারান্তরে যে মহাজাতি সজ্ঞ সৃজিত হইয়া ভারতের স্থলজলগগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, কোমল ও করুণ কণ্ঠের সাম গানকে চিরবিদায় দিয়া সমর সঙ্গীতে বৃহত্তর ভারতের নদনদী নগরনগরীগিরিপর্ব্বতরাজি

প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় সংযোজন করিয়া দিল, তাহার তুলনা কোথায় ?

ইতিহাস শিবাজীকে দস্যু সর্দ্দার চিত্রিত করিয়াছে, সিরাজদ্দৌলাকে লম্পট নরঘাতকরূপে অঙ্কিত করিয়াছে ; সুভাষচন্দ্র ও সুভাষ-সৃষ্ট আই এন্-একে পরস্বাপহারী নরপিশাচ জহ্লাদ করিয়া কাঠগড়ায় খাড়া না করিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত ! ইতিহাসের ত এই মূল্য ।

ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, বৃহত্তর এসিয়া খণ্ডে ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতিবর্ণধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারী সমন্বয়ে সেই যে মহাজাতির গান সুভাষচন্দ্র রচিয়াছিলেন, আমরা আজ যাহা স্বকর্ণে শুনিয়া ধন্য হইতেছি, আমাদের পরে আমাদের বংশধরগণ তাহা শুনিয়া চরিতার্থ হইবে এবং তাহারও পরবর্ত্তীকালে, যুগযুগান্তে, শতাব্দীর শেষে যে অনাগত জাতি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও তাহা শুনিয়া গৌরববোধ করিবে। ইতিহাসের হেন সাধ্য হইবে না যে তাহার বিলোপসাধন ঘটায় ।

সুপ্তিহীন স্তব্ধ নিশীথে অন্ধ আকাশের পানে চাহিয়া প্রহরের পর প্রহরের অবসানে চিন্তার রশ্মি যখন অসংযত বেগে অনন্তের অন্তহীন পানে প্রধাবিত হয়, তখন সুভাষচন্দ্রের অপরিম্লান গৌরবদীপ্ত সাফল্যের বিরাট ব্যর্থতার তুলনায় আমাদের অসীম শক্তিশালী কংগ্রেসও যেন স্কুল কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মত ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া যায় । চন্দ্রমা ও খদ্যোতের উপমাটাই মনে করাইয়া দেয় ! এই কথা বলিলাম বলিয়া, কংগ্রেসের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অথবা আনুগত্যের অভাব আছে এরূপ মনে করিবার কাহারও কোন কারণ নাই । ভারত মহাসমুদ্রের বালুবেলায় কংগ্রেসের সংখ্যাহীন অগণিত ভক্তের মাঝে লেখকও একটি নগণ্য বালুকণা—সাগর-সৈকতে সবই বালি, সেখানে ভেজালের স্থান নাই । আজিকার ভারতবর্ষে কংগ্রেস যাহার হৃদয়াসন অধিকার করিতে না পারিয়াছে, হয় তাহার হৃদয় নাই, না হয় রোগাক্রান্ত হৃদয়ের স্পন্দন ও অনুভূতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । আমার হৃদয়াবেগ আমার অজ্ঞাত নহে, কিন্তু তথাপি একথা না বলিয়া পারি না যে সুভাষচন্দ্র অনাগত অনন্ত কালের জন্য অনন্তকাল সমীপে যে বজ্রগর্ভ বাণী প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনায় সবই ম্লান, সমস্তই ধূসর ।

হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব, অস্ত্রযুদ্ধ অথবা সত্যাগ্রহের কলহ ভারতবাসীর চিত্ততলে বহুকাল যাবত যে অন্তর্বিরোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় বিবর্ত্ত তাহাদেরও মূক স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে । পথের কলহ নির্ব্বাণ করিয়া দুর্নীরিক্ষ্য লক্ষ্যকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে । কে কোন্ পথ ধরিয়া, কোন্ যানবাহনে আরোহণ করিয়া দূর লক্ষ্যে পৌঁছিবে সে তর্ক-বিচার আজ অতীত হইয়া গিয়াছে । লক্ষ্য এবং লক্ষ্যবোধের প্রশ্নই আজ একমাত্র প্রশ্ন ! যেন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলে পূর্ণিমার চাঁদ ।

সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা লোকান্তরিত, কেহ জানে না । আই-এন্-এর দৃঢ় বিশ্বাস সুভাষচন্দ্র জীবিত ; গান্ধীজী বলেন, সুভাষের জন্য নীরবে প্রার্থনা কর ; সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী মনে করে, পরাধীন ভারতের চিরজাগ্রত আত্মার মত ভারতের মুক্তিকামী সুভাষচন্দ্র ও মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর । কিন্তু জীবিত অথবা মৃত, কিছু আসে যায় না । গ্যারিবল্ডি কি মরিয়াছেন ? শিবাজী কি মৃত ? রাণা প্রতাপসিংহ যে চিরদিন অমর । জর্জ ওয়াশিংটনের কি বিনাশ আছে ? সুভাষচন্দ্রও চিরজীবী । শুধু ভারতে নয়, শুদ্ধ এসিয়ায় নয়, পৃথিবীর যেখানে যে দেশে, যে কোণে যে পরাধীন জাতি আছে, সেইখানে, সেই দেশে, সেই মানবসমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সুভাষচন্দ্রের নামের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইবে । যে সঙ্গীত একদিন বীর সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত বীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠে সেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইবে আমরা শুনিতেছি । ঐ শোন সেই গান ।

"ঐ দূরে—অতি দূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ পর্ব্বতমালার পর-পারে, ঐ ঘন বনানীর অপর পারে—ঐ দেখা যায় আমাদের মাতৃভূমি—আমাদের সাধনার মহাতীর্থ—আমাদের ভারতবর্ষ—আমাদের কামনার ধন, আমাদের বাসনার স্বর্গ, আমাদের আরাধনার নন্দনকানন, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ । একদিন আমরা ঐখান হইতে এই সুদূরে আসিয়াছিলাম । আবার আজ আমরা সেইখানে ফিরিয়া যাইব । ঐ শোন ভারতবর্ষের আহ্বান, ঐ শোন জন্মভূমির আহ্বান ! কি মধুর, কি স্নেহপবিত্র সে আবাহন । ঐ শোন । চলো……"

জাগ্রত ভারত অনন্তকাল ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া ঐ গান শুনিবে । চন্দ্রমা-আকর্ষিত সাগর জলের মত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ঐ গান মানব-হৃদয় আলোড়িত করিবে ।

বন্দে মাতরম্ । জয় হিন্দ্ ।

প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

সহরের লোক সব অবাক হয়ে গেল যখন রায় বাহাদুর সারদা উকীলের মেয়ে যূথিকা বরমাল্য অর্পণ করলো জেলখাটা চরকাকাটা খদ্দরধারী অহীনের গলায়। সবাই জানে উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী যূথিকা সিভিলিয়ান মিঃ টি, রয়কে বিয়ে করবে। দুই পক্ষে বহুদিন ধরেই বিয়ের কথা চলছিল। মিঃ রয় ও যূথিকা প্রায়ই তখন এক সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বের হোত, আর তাদের কলহাস্যে মুখরিত হতো রায় বাহাদুরের "রোলস্রয়স্" গাড়ী। হঠাৎ সে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় পাড়ার নিষ্কর্মাদের পক্ষে ঘোট পাকানো স্বাভাবিক। তবে মোটের উপর তাঁরা তৃপ্তিলাভই করেছেন, কারণ, বিবাহ হোয়েছে সনাতন হিন্দুধর্ম মতে—প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবেরা তৃপ্ত হয়েছেন ভূরিভোজনে। এ সব ছাড়া—অহীনকে দেখে তারা সবাই একবাক্যে প্রশংসাও করেছে; সদাহাস্য স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র।

যূথিকার বান্ধবী মিনতি হেসে বললে, "আচ্ছা যূথী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী না হ'য়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকীরের শিষ্য অহীনের বধূ হলি কেন? তুই তো চিরটাকাল গান্ধীর নাম শুনে ক্ষেপে উঠ্‌তিস্—তোর বুলিই ছিলো ঐ মহাত্মাই বাংলার শত্রু।" যূথিকা এক ঝলক হেসে উত্তর করলো কবির ভাষায়, "অমন অবস্থাতে পড়লে সকলেরই মত বদলায়!"—মিনতি চটুল পরিহাস্যে বললে, "আজ উঠি ভাই—নমস্কার বাংলার বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত!"—"তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"—বলে সহাস্যে যূথিকা বান্ধবীর নিকট বিদায় নিলো।

এই বিবাহের কিছু পরে রায় বাহাদুর তাঁর বিরাট বাগানবাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমিতে গড়ে তুললেন বৃহৎ কাপড়ের কল লোহালক্কড়ের কারখানা ও জুট মিলস—গঙ্গাতীরে বৈদ্যুতিক আলোকসম্ভারে কারখানার কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দের বাসস্থান তৈয়ারী হ'লো—দেখতে দেখতে সেখানে এক বিরাট নগরী গড়ে উঠ্‌লো। ইহার অনতিদূরে স্থাপিত হলো এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, তার পার্শ্বে আদর্শ গ্রাম—সেখানে খোলা হলো চরকার শিক্ষাকেন্দ্র—তার সন্নিকটে বহু বিঘা জমিতে পোতা হলো অসংখ্য কাপাশ গাছ। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশ হতে আনা হলো বহুদর্শী 'এক্সপার্টস' মোটা বেতনে। রায় বাহাদুর জামাতা অহীন ও কন্যা যূথিকার উপরে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করে নির্দেশ দিলেন তাদের বুঝতে ও শিখতে বিদেশী অভিজ্ঞের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের সব ফিকির বা সিক্রেট্স।

অহীন আত্মনিয়োগ করেছে সম্পূর্ণ ভাবে কলকারখানায়, আদর্শ গ্রামোন্নয়নে। তার মুহূর্ত অবসর নাই; ইহার উপর নিজের পরিকল্পনায় সে শ্রমিকদের জন্য এক নৈশ বিদ্যালয় খুলে তাদের

শিক্ষার পথে আলোকপাত করেছে। তার পূর্বের অনেক সহকর্মীকে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেছে। যূথিকা ছায়ার ন্যায় তার পার্শ্বে আছে অবিরাম। রায় বাহাদুর পেয়েছেন অপার আনন্দ কন্যা জামাতার আন্তরিকতায় ও তাদের শিক্ষা দীক্ষায়; বুঝেছেন, মেয়ে হয়েছে দাম্পত্য সুখে সুখী। অহীনের বহুমুখী প্রতিভায় ও অদ্ভুত ধীশক্তিতে—তার সুমধুর সরল ব্যবহারে রায় বাহাদুর মুগ্ধ হয়েছেন। অহীনের পোষাক পরিচ্ছদ চালচলন অনাড়ম্বর, পরিধানে খদ্দর।

কয়েক বৎসর পরে। ১৯৩৯ সনে ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হ'লো। ১৯৪১ মহাযুদ্ধ সংক্রামিত হ'লো সমগ্র পৃথিবী যুড়ে। ১৯৪২ সনের মে মাসে বাংলার চট্টগ্রামে জাপানীরা বিমান আক্রমণ করলো। ডিসেম্বর মাসে জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে জাপানীরা কলিকাতায় বোমা ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সহর হ'তে লোক পালাবার পালা সুরু হলো—সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! ভয় সংক্রামক ব্যাধি—লোকের মুখে সামান্য ঘটনা রূপায়িত হয় ভীতিব্যঞ্জক রূপে—গভর্ণমেণ্ট নির্বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করলেন যুদ্ধের যাবতীয় খবর; তার ফলে জনসাধারণের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হ'লো—সহরময় অদ্ভুত গুজবের ফলে সহরবাসী হ'লো শঙ্কিত সন্ত্রস্ত; দেখতে দেখতে সহর হ'য়ে গেল জনশূন্য। যে লোক কখনও সহরের বাইরে যায় নি তাকে ছুটতে হলো অজানার সন্ধানে—অপরিচিত পাড়াগাঁয়ে জীর্ণ পর্ণশালায় আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি পেলো—পরিণামে তাকে হারাতে হয়েছে তার ধন দৌলৎ—প্রিয়জন। কলিকাতার অধিবাসীরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে এই ভীতির পরিণাম—সর্বস্বান্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার।

যূথিকা রায়বাহাদুরকে বৈদ্যনাথধামে তাদের নিজ বাড়ীতে পাঠাতে চাইলে। রায় বাহাদুর হেসে বললেন, "তোকে আর অহীনকে 'বোমার' মুখে রেখে আমি পালাবো দেওঘর, ক্ষেপেছিস?" তিনি কোথাও যেতে রাজী হলেন না দেখে যূথিকা তাদের গৃহের চারিদিকে তুললো "ব্যাফ্‌ল ওয়ালস"—কারখানার চারিদিকে এয়ার রেড সেণ্টারস, ট্রেঞ্চ, ব্যাফ্‌ল ওয়ালস আরো কত কি। অহীনের উৎসাহে ও অভয়বাণীতে কারখানার অধিকাংশ কর্মচারী ও মজুর পালাল না বোমার ভয়ে। সেই সময়ে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হ'লো এসিয়া বাহিনীর কেন্দ্রস্থল—সমর উপকরণের চাহিদা মিটাতে আবশ্যক হ'লো বহুবিধ সাজ সরঞ্জাম, লোক লস্কর, হরেক রকম জিনিষপত্র। ফলে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টস মিললো অসংখ্য। রায় বাহাদুরের কারখানা দিবারাত্রি চলতে লাগলো সেই চাহিদা মিটাতে; তাঁর প্রতিষ্ঠান আরো বাড়াতে হ'লো। অহীন খুসী করলো কর্তৃপক্ষকে তার অদ্ভুত কর্মকুশলতায়। মোটা টাকার বিমান ঘাঁটীর কণ্ট্রাক্ট পেলো সে—মা লক্ষ্মী করলেন তাকে তাঁর বর-পুত্র। সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়লো অহীনের যশঃসৌরভ ও প্রতিভা।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে ইংরেজ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না এরূপ সর্বনাশা সমরের জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিটলারের সর্বনাশা অভিসন্ধি পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করলো—জাপানের দুরাশাও এই পঙ্কে নিমজ্জিত হ'ল। ব্রিটীশ ভারতের নিকট থেকে সকল রকমের সাহায্য চাইলেন। কংগ্রেস তার বিনিময়ে যুদ্ধশেষে জগৎ সমক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন। কিন্তু ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় অস্বীকৃত হলেন! মহাত্মা গান্ধীও এই সূত্রে অসহযোগিতার প্রতীক "Quit India" (ভারত ত্যাগ কর) বাণী প্রচার করলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের মাথায় ভূত চাপল, ভারতে চণ্ডনীতি চললো, কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হ'লেন বিনা বিচারে, আমলাতন্ত্রের মুখোস গেল খুলে।

আগুন জ্বলে উঠলো দিকে দিকে। ৮ই আগষ্ট মোকামা জংশনে এসে দাঁড়াল একখানি ট্রেণ। কংগ্রেস সেবকগণ এঞ্জিনের সামনে ঝুলিয়ে দিলে একটী কংগ্রেস পতাকা। বিদেশী ড্রাইভার ধৈর্য হারিয়ে রেগে জাতীয় পতাকা দিলে এঞ্জিনের অগ্নিগর্ভে ফেলে। কংগ্রেস সেবকগণ আর্তনাদ করে উঠলেন এই বর্বরোচিত কার্যে। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো সেই খবর চারদিকে। অসংখ্য লোক এসে জড় হলো সেখানে—দাবী করলো ড্রাইভারের অন্যায় কার্যের বিচার। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই দাবী অগ্রাহ্য করে ডাকলো পুলিশ। জনতা গেল ক্ষেপে। ড্রাইভার ছুটলো প্রাণভয়ে তার কোয়াটারে। উন্মত্ত জনতা মুষ্টিমেয় পুলিশ ফোর্সকে কাবু করে পশ্চাদনুসরণ করলো সেই ড্রাইভারের। তার দরজা ভেঙ্গে তাকে করলো প্রহার,—নষ্ট করলো তার তৈজসপত্র। তারপর সরু হলো গুণ্ডা বদমাইসদের অনাচার। তারা সেই সুযোগে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ করতে লাগলো। গভর্ণমেণ্টও দমন নীতির চূড়ান্ত দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু জনমন তাতে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হলো। ভারতের নেতৃবৃন্দ তখন কারারুদ্ধ; কংগ্রেসের অহিংস নীতি সংরক্ষণের নির্দেশ দেবার নেতা ছিল না কেহ বাইরে। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত আগষ্ট আন্দোলনের ঢেউ বইল। সারা ভারতে অশান্তির তাণ্ডব নৃত্য সুরু হ'লো। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় সেই গণ-অভ্যুত্থানের জের ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হলো।

মিঃ টি, রয় বিলাত থেকে আই সি এস হয়ে ফিরে এসে বাংলায় পৌছিলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতা ভ্রাতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। প্রগতিশীলা আধুনিক মহিলারা স্বেচ্ছায় এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে—মিঃ রয় মনের আনন্দে মেলামেশা সুরু করলেন মহিলা-মহলে। মেয়ের অভিভাবক ছেড়ে দিলেন মেয়েকে অবাধে মিঃ রায়ের সকাশে, সিভিলিয়ান জামাই পাবার আশায়। মিঃ রয় গভীর জলের মৎস্য—তিনি নিরাশার বাণী শোনান কি কাউকে। বরং তাঁর ব্যবহারে মনে ধরিয়ে দিতো রঙীণ নেশা। এমনি করে হঠাৎ এক পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল যূথিকার সঙ্গে মিঃ রয়ের—সেই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মিঃ রয় সুন্দরী শিক্ষিতা অথচধীর, স্থির ও অচঞ্চলা; যূথিকাকে দেখে এবং তার পিতার অগাধ সম্পত্তির সন্ধান পেয়ে ভবিষ্যতের আশায় এদিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তাঁর একদিনের একটু অসাবধানতার জন্য শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায়। যূথিকা কানা ঘুষা অনেক কিছু শুনেছিলো মিঃ রয়ের চরিত্র সম্বন্ধে, কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন শহরের কোন সিনেমা হাউসে পিতাপুত্রীর চক্ষুসমক্ষে সেটা সুস্পষ্ট হওয়ায় তাঁরা তিক্ত হয়ে ওঠেন, আর সেইদিন থেকেই রায় বাহাদুরের গৃহে মিঃ রায়ের গমন নিষিদ্ধ হয়। যূথিকা বিদ্রোহী হলো সিভিলিয়ানের পত্নী হতে। সম্বন্ধ বিচ্ছেদের ইহাই হেতু।

বিপত্নীক থাকাটা অসুবিধাজনক দেখে মিঃ রয় হঠাৎ স্কুলের মিষ্ট্রেস মিস্ মিনতিকে বিবাহ করেন। লোকে সেই বিবাহ নিয়ে অনেক গুজব তোলে। কিছুদিন পরে তিনি বদলী হলেন মেদিনীপুরে—অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে। তখন সেই জেলার কাঁথী ও তমলুক মহকুমায় আগষ্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার তাণ্ডবলীলা চলছিলো। মিঃ রয় এই সুযোগে তাঁর আগেকার 'ব্লাক রেকর্ডস্' গুলো মুছে ফেলবার অভিপ্রায়ে আন্দোলনকারীদের উপর পীড়ন-নীতি চালালেন চূড়ান্তভাবে। মেদিনীপুরবাসী আতঙ্কিত হলো তাঁর বর্বরোচিত অত্যাচারে। সেই সময়ে জাপানী সেনা আসামের সীমান্তে হানা দিলো, মাঝে মাঝে হতে লাগলো বোমা বৃষ্টি। গভর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হয়ে ডোবালো নৌকা—নিয়ন্ত্রিত করলো যানবাহন, চালের দর বেড়ে চললো, ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হোল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছাপিয়ে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ভয়াবহ মৃত্যুলীলা চললো বাংলার বুকে—লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরতে লাগলো। সেই সময় দৈবদুর্বিপাকে বাংলার কতক অংশে হলো জলপ্লাবন, হতভাগ্য গ্রামবাসীরা হলো গৃহহীন, অন্নহীন—পথের ভিক্ষুক। মিঃ রয় হুকুম দিলেন, আগষ্ট আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিজনদের যেন কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া না হয়। ফলে, হতভাগ্য ভিক্ষুকেরা শেয়াল কুকুরের ন্যায় মরতে লাগলো। বুভুক্ষু মুমূর্ষু দল ছুটে এলো কলিকাতা নগরীতে। অলিতে গলিতে তাদের করুণ আর্তনাদে অতিষ্ঠ হলো সহরবাসী—রাস্তায় রাস্তায় নগ্ন অর্দ্ধনগ্ন নর-কঙ্কালের মিছিল মহানগরীর বুকে শিহরণ তুললো।

রায় বাহাদুর জামাতা অহীনকে ডুবিয়ে রেখেছেন অসংখ্য কার্য্যের চাপে। বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণ হচ্ছেন অহীন, দায়িত্ব-তার অসীম। তবু মাঝে মাঝে ভারত জননীর পরাধীনতার আর্তনাদ ধ্বনিত হয় তার হৃদয় মন্দিরে—ব্যথিত হয় তার প্রাণ। মহাত্মার "ভারত ছাড়" মন্ত্র যখন প্রচারিত হলো সাম্রাজ্যবাদীদের আমলাতন্ত্রের মুখোস খুলতে অহীন চাইলো ছুটী, মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করবে ব'লে। রায় বাহাদুর প্রমাদ গণলেন। কিন্তু সারদাবাবু বললেন, "বাবা, আমি তোমাকে যে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার দিয়েছি—তার প্রত্যেকটী মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক। মহাত্মা গান্ধী বাস্তববাদী; তিনি জানেন ভারতবাসী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারিবে না, অহিংসা বা আত্মিক বলের অমোঘ শক্তি দ্বারা তিনি পরাজিত করতে চান সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে, তাই হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব ত্যাগ করতে হবে, আত্মশুদ্ধি দ্বারা জয় করতে হবে আসুরিক শক্তিকে। তাঁর "ভারত ত্যাগ কর" শ্লোগ্যান গভীর ভাবব্যঞ্জক; তিনি জানেন শক্তিশালী ইংরেজকে চলে যাও বললেই চলে যাবে না, তাঁদের চলে যেতে বাধ্য করতে হবে আমাদের অহিংসনীতি অবলম্বন করে। তাই গড়ে তুলতে হবে ভারতকে সর্বতোভাবে স্বাধীন। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিরাট কারখানা, উন্নতি করতে হবে বিবিধ শিল্পের, বর্জ্জন করতে হবে বিদেশী পণ্য। দেশকে স্বাধীন করতে হলে তাকে শিল্প বাণিজ্যে করতে হবে শক্তিশালী—স্বাবলম্বী হয়ে যে মুহূর্তে আমাদের দেশ বিশ্বের শক্তি সমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে শিল্প বাণিজ্যে, জয়যুক্ত হবে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম—সরে যাবে ভারত থেকে বিদেশী রাজা বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ফাঁকা বক্তৃতা বা অনাবশ্যক কারাবরণ করে স্বরাজ লাভ হতে পারে না, চাই প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। আমি সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই এই প্রতিষ্ঠান গড়েছি। এখন একে স্বরাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তোমার কাজ। অহীন বিস্মিত হলো রায় বাহাদুরের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আত্মনিয়োগ করলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে, গ্রামোন্নয়নে, খাদী প্রতিষ্ঠানে। কিছুদিন পরে সুজলা সুফলা বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখে অহীনের হৃদয় কেঁদে উঠলো হতভাগ্য বুভুক্ষুদের জন্য। সে আত্মনিয়োগ করলো দারিদ্র নারায়ণের সেবাব্রতে। খুললো অন্নসত্র প্রতি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে। যূথিকা স্বেচ্ছায় এসে

দাঁড়ালো স্বামীরপার্শ্বে অন্নপূর্ণা মূর্তিরূপে—খুলে দিলো অন্নসত্র বাংলার বিভিন্ন স্থানে ; গভর্নমেণ্ট ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করলো এই সদনুষ্ঠানে। অহীন ও যূথিকা ঘুরে বেড়াতে লাগলো বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। তারা উভয়ে একবার গেলো মেদিনীপুর অঞ্চলে। স্তম্ভিত হ'লো নিরীহ পল্লীবাসীদের প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী শুনে। অন্নহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, সরল পল্লীবাসীকে তারা দিলো বস্ত্র, চাউল দুগ্ধ ইত্যাদি। মৃতকল্প গ্রামবাসীদের মুখে হাসির রেখা ফুটলো—তারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলো। অহীন প্রতি বাড়ীতে বিতরণ করলো চরকা ও তুলা। অর্থ দিলো সংস্কার করতে তাদের বাসগৃহ। অহীনের দরিদ্রনারায়ণের সেবা কাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র।

মিঃ টি, রয় অহীন ও যূথিকার আগমন বার্তা পূর্বেই অবগত ছিলেন। তাঁর মনে জাগলো প্রতিহিংসা ; পুলিশ সাহেবকে লিখলেন, জেলায় ঢুকেছে এক গান্ধীর চেলা, "ভয়ানক লোক—দাগী বিপ্লবপন্থী।" জেলার কর্তার 'নোট' পেয়ে সাহেব ছুটলেন অহীনের স্থানে। গোপনে তাদের কার্যাবলি সংগ্রহ করে যে রিপোর্ট পাঠালেন, তা পড়ে মিঃ রয়ের পিত্ত জ্বলে গেলো—একটা জেল ফেরৎ বিপ্লবীকে করেছে প্রশংসা!—পুলিশ সাহেবের রিপোর্টের উপর লিখলেন, "আমি সন্তুষ্ট হইনি তোমার তদন্তে—আমি স্বয়ং যাচ্ছি তদন্ত করতে।" সাহেব 'নোট' পড়ে মুচকী হাসলেন, তিনিও যাবার জন্য তৈরি হলেন।

মিনতি মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করেছিলো। আই সি এস স্বামী পেয়ে বাইরে সে পাচ্ছে সম্মান,—পার্টিতে নিমন্ত্রণ—প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনের পৌরোহিত্যের পদ, আরো কত কি—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলায় ঢুকে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র—অসভ্য ব্যবহারে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে ভাবে এই কি বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষার ফল!—এরাই দেশের রক্ষক—দশের আদর্শ? সেদিন রাত্রে পানাসক্ত অবস্থায় মিঃ রয় প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর মনের গোপন উদ্দেশ্য, মিনতি জানালো যে, প্রতিহিংসা নিতে তার স্বামী অহীন ও যূথিকার উপর আমলাতন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করতে ক্ষেপে উঠেছে! শিউরে উঠলো সে স্বামীর নীচপ্রবৃত্তি দেখে। মিনতিভরা কণ্ঠে স্বামীকে বললো, "ওগো দোহাই তোমার, তুমি করো না এমনি অন্যায় অত্যাচার যূথীদি ও অহীনবাবুর ওপর। তাঁরা যে দেশের বরণীয়, পূজ্য।" উন্মত্ত রয় (সে কথায়) কুৎসিত বাক্যে গালাগালি করলো মিনতিকে।

রাজীবপুরে আজ বিপুল সমারোহ। পার্শ্ববর্তী পঞ্চাশটী গ্রামের অধিবাসী হিন্দুমুসলমান—ধনীদরিদ্র মিলিত হ'য়েছে আজ অভিনন্দিত করতে অহীন ও যূথিকাকে তাদের বিদায়ের প্রাক্কালে। পৌরোহিত্য করছেন জেলার ডিষ্ট্রীক বোর্ডের চেয়ারম্যান—খান বাহাদুর মামুদ খাঁ! সভার উপস্থিত হয়েছেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিদেশী মিলিটারী বৈমানিক উচ্চ কর্মচারী প্রভৃতি। সভাভঙ্গের পূর্বাহ্নে হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রয়কে উপস্থিত দেখে সভাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হলেন। মিঃ রয় 'ব্যুরোক্রাটিক' চালে ভ্রূভঙ্গী করে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, "সভা বন্ধ করুন, খান বাহাদুর আপনি পৌরোহিত্য করছেন এই সভায়, একটা জেলখাটা দাগী বদমাসকে দিচ্ছেন আসন, আমি ওকে এখুনি "আ্যারেষ্ট" করবো।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই উদ্ধত ব্যবহারে খানবাহাদুর ব্যথিত হলেন, তিনি মঞ্চোপরি উঠে সাহেবের আদেশ ও তাঁর বাণী সভাস্থ লোককে শুনিয়ে তাদের অভিপ্রায় জানাতে চাইলেন ; সমগ্র জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, "মানবো না আমরা হাকিমের অন্যায় হুকুম ; সভার কাজ চালান হোক।"—সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো—সাহেব অধৈর্য হয়ে ডাকলেন পুলিশ। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর নিমগ্ন করে অমনি অসংখ্য জনতা সরোষে ঘিরে ফেললো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে। তিনি ভীত চকিত নেত্রে তাকিয়ে দেখলেন—পুলিশ এসে তখনো পৌঁছয় নি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন 'রিভলভার' নেই। অসীম সমুদ্রে নিমজ্জিত নিঃসহায় ব্যক্তির ন্যায় তিনি ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে অবিচলিত ভাবে দ্রুতপদে অহীন এসে দাঁড়ালো মিঃ রয়কে পিছু করে। জনতা হলো স্তব্ধ। সে কোমল নম্রকণ্ঠে বললো, "ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি অহিংসবাদী, আমি করযোড়ে অনুরোধ করছি এই রাজ কর্মচারীকে আপনারা কোন প্রকার অবমাননা করবেন না—আপনারা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জন্য বিপদ বরণ করবেন না।"—বলেই অহীন দু' বাহু প্রসারিত ক'রে দাঁড়ালো। জনতা শান্তভাব ধারণ করলো—বিস্মিত হলো তারা অহীনের অদ্ভুত সংযম ও অহিংসনীতিতে। জনতা সরে গেলে অহীন মিঃ রয়ের দিকে ফিরে বিনয় নম্রভাবে বললেন, "আসুন মিঃ রয়, এই মঞ্চের ওপরে বিশ্রাম করুন ; আসুক আপনার পুলিশবাহিনী—আমি স্বেচ্ছায় চলে যাবো তাদের সঙ্গে, আমায় বিশ্বাস করুন।"—মিঃ রয় বিস্মিত হলো অহীনের সরল অনাড়ম্বর ব্যবহারে। কি মনে করে একবার তাকালেন তীক্ষ্ণভাবে অহীনের দিকে। কিছুক্ষণ পরে কৌতূহলের সুরে মিঃ রয় প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মিঃ এ, চৌধুরী—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন, ভাল বক্তা ছিলেন?" অহীন একটু হেসে ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "হাঁ,—আপনি বরাবরই ছিলেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ; আমিই "কাউ কোর্টে'ন্ট ওকালতি করে ছাড়িয়ে এনেছিলুম আপনাকে কয়েদখানা থেকে, মনে পড়ে কি মিঃ রয়,

সেই মিস্ লেসীকে ?"—মিঃ রয় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন অহীনকে ; উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু,— আমায় ক্ষমা করো।" পুলিস সাহেব দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য

দেখছিলেন এতক্ষণ ; মুচকি হেসে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছ ঘেঁষে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "সার, এবারে আমি আসামীকে গ্রেপ্তার করি ?" মিঃ রয় অহীনকে আলিঙ্গনমুক্ত করে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "না ? তুমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে যাও, সভার কার্য এখন চলবে।" পুলিশ সাহেব মুখের হাসি চেপে সেলাম ঠুকে প্রস্থান করলেন। সভায় লোক হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

যুদ্ধোত্তর ভারতের দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তো শেষ হ'য়ে গেলো।

যুদ্ধ-কালীন এই ছয় বছর আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে জিনিষ-পত্তরের দামের কথা। বর্তমানে জিনিষ-পত্তরের যা' দাম, তা' ছয় বছর আগে আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। মোগল আমলের টাকায় আট মণ চাউল, আর ১৯৪৩ সনে বাংলাতে ত্রিশ বত্রিশ হতে আরম্ভ করে একশত টাকা চাউলের মণ—দুই-ই কিছুদিন আগে সমান অবিশ্বাস্য ছিল। বর্তমানে চাউলের দর অনেকটা সম্ভবের মধ্যে নেমে এসেছে, কিন্তু অন্যান্য জিনিষ-পত্তরের দামের কিছুমাত্র কম্‌তি হওয়ার লক্ষণ নেই। কাপড়, কয়লা, তেল, তরকারী, ঘি—হয় নেহাৎ দুষ্প্রাপ্য, আর যদি বা পাওয়া যায়, নিতান্তই দুর্মূল্য।

এখন আমাদের মনে আশা জাগ্‌তে পারে ও সে আশা-জাগরণটা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সংগে সংগে জিনিষপত্তরের দাম আবার সেই আগের মত সস্তা হ'য়ে যাবে, অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামানোর জন্য দু'পয়সা দামে ভাল ব্লেড পাওয়া যাবে, চা' খাওয়ার সময় অল্প খরচে পাওয়া যাবে প্রচুর কেক্, বিস্কুট,

ডিম, আর ছুটী এলে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সামান্য খরচেই বাইরে যেয়ে অনেক দেশ ঘুরে আসা যাবে। এই ছয় বছর জিনিষপত্তরের দাম যে হারে বেড়েছে, আমাদের মধ্যবিত্ত লোকদের আয় সে অনুপাতে বাড়েনি। সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সব সুখ-সুবিধাগুলোকে বাদ দিয়ে গত দু'বছর কোন রকমে কালাতিপাত করে এসেছি—মনে মনে মস্ত আশা যে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হলে আমাদের সকল ক্ষতিগুলোকে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

কিন্তু এখানে আমাদের জেনে রাখা ভাল যে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরেও জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হবে না—অন্ততঃ যাতে সস্তা না হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

কথাটা একটু হেঁয়ালীর মত শোনায়, কিন্তু আসলে উহা নিছক সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমরা হয় ত সকলেই সস্তা জিনিষ চাই, দশ টাকার বদলে তিন টাকাতে একজোড়া ধুতি পেলে খুবই খুশী হই। কিন্তু আসলে ব্যক্তির সুখের সমষ্টি নিয়ে সমাজের সুখ নয়, অর্থাৎ সমষ্টিগত সুখের সংগে ব্যক্তিগত সুখের কোথায় একটা বিচ্ছেদ আছে। তাই তুমি আমি সস্তা কাপড় পেয়ে সুখী হলেও সমাজের পক্ষে সেটা কল্যাণকর নয়। বিষয়টা আর একটু খোলসা করে বলা যাক্।

আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানে ধনোৎপাদন করা হয় লাভের আশায়, অর্থাৎ এই ধনবাদের যুগে কাপড়-ব্যবসায়ী আমাদের কাপড় পরিয়ে লজ্জা নিবারণের সহায়তা করছেন বলে কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করেন না। তিনি বড় রকমের প্রসাদ লাভ করেন—যখন লাভের অঙ্কটা বড় হয়ে উঠে, আর আপন বিরাট প্রাসাদে বিলাস প্রমোদের অভাব ঘটে না। জিনিষপত্তরের যখন দাম কমতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই বড় বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফার অংশটাও কমে যেতে থাকে। ফলে তারা উৎপাদন কমিয়ে দেন—আর উৎপাদন যত কম্‌তে থাকে, জিনিষের দাম আরও কম্‌তে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে জিনিষের দাম যদি আরও কমে যেতে থাকে, সে তো আরও ভাল কথা। কিন্তু আসলে বিপদটা হলো আর একটু অন্যরকম। ধনোৎপাদন কমে যাওয়া মানেই বড় বড় কলকারখানাগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তার ফলে প্রথম চোটেই শত শত, বরং আরও বেশী, সহস্র সহস্র শ্রমিক মজুর বেকার হ'য়ে পড়ে। তাদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সমাজের দুর্গতি বাড়বে বই কম্‌বে না। শুধু যে শ্রমিক দলই বেকার হয়ে পড়বে, তা' নয়—মধ্যবিত্ত লোক যারা কল-কারখানায় কাজ করেন—তাদেরও অনেক সময় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে, তারাও বেকার হয়ে এসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তোলেন।

সমস্যাটা শুধু এইখানে এসে যে শেষ হয়ে যায় তা' নয়। বিপদ এই যে একজন বেকার আরও দশজন বেকার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একবার বেকার সমস্যা সুরু হলে তার শেষ নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। কারণ যে মানুষ বেকার তার কোন রোজগার নেই। ফলে, সে অনেক জিনিষই কিন্‌তে পারে না এবং যে সব জিনিষ সে কিন্‌তে পারে না, সে সব জিনিষের চাহিদাও কমে যায় ও বিক্রী কম হতে থাকে। তখন সে সব ব্যবসাতেও লাভের অংশে ঘাটতি পড়ে যায় এবং সেখানেও আবার বেকার সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং একবার যদি হঠাৎ কাপড় সস্তা হয়ে যায়, তবে যে শুধু কাপড়ের ব্যবসাতেই মুনাফা কমে যায় তা নয়, চিনি, জুতো, লোহা, সিমেন্টের ব্যবসাতেও ক্ষতি সুরু হবে ও আর্থিক সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠ্‌বে।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য, যুদ্ধের পরে জিনিষপত্তরের দাম যাতে হঠাৎ কমে না যায়, সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা এবং মোটামুটী ভাবে আশা করা যায় যে রাতারাতি জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, বর্ত্তমানে আমাদের সকল রকম প্রয়োজনীয় জিনিষেরই নিতান্ত অভাব। যুদ্ধ থেমে গেলে সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা কিছুমাত্র কমে যাবে না, বরং বেড়েই যাবে। যেমন ধরা যাক কাগজ, কাপড়, স্পিরিট, টুথপেষ্ট, এ সব জিনিষের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাবে। বাড়ীঘর তৈয়ার করার জন্য সিমেন্ট, চূণ, লোহা ইত্যাদি জিনিষেরও চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে লোকের হাতে অনেক টাকা আস্‌বে, টাকা এলেই আবার অন্য জিনিষের চাহিদা বেড়ে যাবে এবং এমনি করেই বেকার সমস্যাটাকে থামিয়ে রাখা যাবে।

যুদ্ধের পরে নিজেদের হাতে টাকা জমিয়ে না রাখাই ভাল। টাকা জমিয়ে রাখা মানে কোন একটা জিনিষ না কেনা এবং সমষ্টিগতভাবে কোন জিনিষ না কেনা মানেই সেই ব্যবসাতে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করা। ব্যবসাতে ক্ষতি হলেই জিনিষপত্তরের দাম কমে যাবে ও সংগে সংগে বেকার-সমস্যা দেখা যাবে। সস্তা জিনিষ পেয়ে আমাদের যা' লাভ হবে, বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদের সমাজে তা'র চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হবে।

পথের সম্পদ

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

সুন্দরী সেই মেয়ে
পথে চলে গেল ক্ষণেকের তরে দেখেছিনু আমি চেয়ে।
আজিকে আমার হৃদি মেঘ বনে বিজলী খেলিয়া যায়
নীপ-নিকুঞ্জে শতদল মেলি কুসুম ফুটিল হায়!

আজিকে আকাশে খণ্ড মেঘেতে ভাসিছে পত্র-লেখা
নভমণ্ডলে উড়িছে বলাকা ছুঁয়ে দিগন্ত রেখা—
বিনা বাতাসেতে বাজিতেছে বাঁশী স্মরিয়া আমার নাম
পথে যেতে আজ কি পাইনু আমি—কি জানি বা হারালাম!

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

চা এক চুমুক পেটে যেতেই—

ডাক্তার। "আঃ বাঁচলুম! ওদের পাতা বাছায়ের বাহাদুরি আছে বটে। 'কালকাসুন্দে' পাতা কি আর এ আস্বাদ দিতো? তাই না এখন তিন গুণ দাম দিয়েও ওদের rejected—ঝেঁটিয়ে খেলা কাটিকুটি গুলো সবাই খাচ্ছি—

মাণিক। তবে যে বলছিলেন…

ডাক্তার। সাধে কি বলি মাণিকলাল! দেশে লোক ঘর ঘর ম্যালেরিয়ায় মরছে—আমাদের চিরকেলে মহৌষধ পাঁচনটা পেলেও বাঁচতো। সেও তো পাতা সেদ্ধ হে! গ্রে ষ্ট্রীটে তার গর্ব্ব কতো। কিন্তু বড় বড় কবিরাজ মশাইরা অন্দর মহলে "সুগন্ধী তৈল" বানাতে ব্যস্ত। পীলে বাড়লেই বা, কেশ না বাড়লে দেশ যে কৃতার্থ হবে না! আবার নাকি সে কোঁকড়াবে—ঢেউ খেলাবে! তাঁরা তেলের নাম খুঁজে হায়রাণ। বিদেশী নামে টান্ পড়েছে। কেউ ভাবছেন—'প্রেটি নাইট', কেউ ভাবছেন 'বেড্ বিউটি'। এদিকে দীর্ণ দাওয়ায় শুয়ে উত্থানশক্তিরহিত জ্বরক্লিষ্ট কঙ্কালেরা যদি তাঁদের দয়ায়—দু'বেলা দু ভাঁড় পাঁচন দু' পয়সায় সহজে পেতো, অনেকে বাঁচতে পারত! কুবেরেরা এ কাজটি অনায়াসে করতে পারেন। না হয় পঞ্চকুবের মিলেই করুন। তা'তেও পয়সা নেই—তা নয়, —মশায়রাও মরে না। দেশে সখের "প্রভাত ফেরি" চলে, পাঁচনের ফেরি চলে না কি। মুখে মুখে মৃত-কবি রঙ্গলালকে টানাটানিও চলে। তাঁর "স্বাধীনতা হীনতায়" আর সবই তো বেশ চলছে! যাক্—দাও, আর একটু দাও মাণিক—

মাণিক। (দুঃখের হাসি চেপে)—এই যে—নিন না। তার পর কি করবেন বলুন!

ডাক্তার। করব' আর কি! ওষুধ তো আর নেই, —ডাক্তারিই আছে। আমাদেরও রূপ দেখানো 'ফেরি' চালাবো। চলো একবার ঘুরে আসি। যার প্রমাই আছে, অর্থাৎ বহু কষ্ট আছে—সে বাঁচবে।

সপ্তাহ তিনেক এই রুগী দেখা কাজটি তিনি নিয়মিত করে' যাচ্ছেন। যত্ন করে' দেখছেন, ব্যবস্থাও করছেন। অনেকে ভালো হয়েছে, হচ্ছেও। মাণিককে কয়েকটা ওষুধ সঙ্গে নিতে বলে' এগিয়ে পড়লেন। মাণিক সে সব গুছিয়েই রেখেছিল।

ডাক্তার। ওহে—সে ঝঞ্চাটটা আছে তো? I mean আংটীটা। আজ একবার চাই যে।

মাণিক। এই গলায় বাঁধাই রয়েছে হুজুর!

ডাক্তার। ও কি আমাদের জন্যে! দিয়ে কেবল বিপন্ন করেছেন, দুর্ভাবনা বাড়িয়েছেন।

রোগীদের দেখে, ব্যবস্থা করে', হালকা হয়ে বেরুচ্ছেন, —বিনোদীর খবরটা নিয়ে বাসায় ফিরবেন। হঠাৎ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা! "কি পাপ"!

যুধিষ্ঠির একটা গলিতে হাত জোড় করেই অপেক্ষা করছিল। চোখোচোখি হতেই—"দাস কি অপরাধ করেছে হুজুর? অত বড় সুখবরটা শুনতেও তার মানা! আমাকে অত' পর ভাবলেন কেনো দেবতা?"

ডাক্তার আশ্চর্য্য! "আরে না না যুধিষ্ঠির। তোমাকে যে চিনেছি, তাই সাবধান হ'তে হয়। বিদেশে রোজগার করতে এসেছ, না লুটতে এসেছ? অবাস্তরের খোঁজ্ কেনো। যা "প্রত্যক্ষের বাহিরে", তার কথা ছেড়ে দাও। সত্য হলে, আমরা মধ্যবিত্ত, ও সব নমঃ নমো করে' সারাই উচিত। দু' একদিন আগে তোমাকে জানাতুম। তুমি শুনে বসে' আছ দেখছি!"

যুধিষ্ঠির। লুটের কথা বলবেন না হুজুর। এতো কারো দাবী নয়, এ আমার মা জননীর কাজ। এর প্রেস্‌ক্রিপসন্ আমরা লিখব'।

ডাক্তার। বিদেশে আর আমাদের অবস্থায়, বাড়াবাড়ি করা ভালো হবে না যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির। আপনি কি বলছেন হুজুর, মাপ করবেন, এখন ভালো যে কিসে হয়, আপনার সে খবর নেই দেখছি। এখন চুনো-পুঁটিরাও রাঘব বোয়াল গিলছে! ষষ্ঠী পূজোতেও পাঁচ হাজারের কম প্রণামী নেই। যাক্‌ —সে সব আপনার শোনবার দরকার নেই…

ডাক্তার। না যুধিষ্ঠির—আমার শুনে কাজ নেই। যা ভালো হয় মাণিকলাল করবে বলেছে, তুমি ও নিয়ে ভেব না। এখন আমি রুগী দেখতে চললুম—

যুধিষ্ঠির। আপনার চেষ্টায় আর ব্যবস্থায় রোগ আর বাড়তে পারছে না। আরো দিন কতক থেকে নির্ম্মূল করে' যান হুজুর। কিছু খরচ তো আছেই—

ডাক্তার। আজ সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে' দেখি।

মাণিকলাল চোখ টিপে ইঙ্গিত করায়, যুধিষ্ঠির ডাক্তারের পায়ের ধুলো নিলে।

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বেরিয়ে পড়লেন। বিনোদীকে দেখে বাসায় ফিরবেন।

দেখেন বিনোদীলাল বাইরে বেরিয়েছে, মাকে প্রণাম করছে। বড় খুশি হলেন, বললেন—"হ্যাঁ, এখন ওই তোমার ওষুধ, ওটি নিত্য কোরো। ওর ওপর আর ওষুধ নেই। আমাদের ওষুধ আর খেতে হবে না। বল্‌ পেলেই ৩/৫র সঙ্গে দেখা কোরো।

দুঃখীরাণীকে বললেন—"তুমিই এখন মায়ের মা। তাঁর সেবা কোরো—সুখী হবে"। সে নীরবে চোখ মুছলে।

অন্ধী-মায়ের সঙ্গে দু'চারটি কথা কয়ে', তাঁকে অভয় দিয়ে ফিরলেন। অন্ধের চক্ষে পরদা পড়ে গেলেও অশ্রু আটকায় না—আশীর্ব্বাদের স্রোত অবাধ থাকে। তাই নিয়ে ফিরলেন।

মাণিক অনেকক্ষণ কথা কয় নি। বিমর্ষমুখে বললে —"মা থাকতে অ্যাতো বুঝিনি ডাক্তারবাবু। এখন আর মা নেই, আজ মনে হচ্ছে যেন কেহই নেই—কিছুই নেই"।

মাণিকের চোখে জল ভরে' আসছে দেখে, ডাক্তার আরম্ভ করলেন—"কেই বা ভাবে, কেই বা বোঝে! ওহে—আমরা তাঁকে বুঝি না বুঝি, তাঁর পুঁজি ওই সন্তান, তাঁর সবটাই সন্তানের তরে—সন্তানই তাঁর সত্ত্বা—প্রভেদ-হীন সমতা-মমতা। আর কোথাও কারো কাছে তা পাবে না। শোননি—উদ্ধব মা যশোদাকে যখন বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ ভালো আছেন, তাঁর তরে ভেব না। তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান—জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন" ইত্যাদি। শুনে মা যশোদা বিরক্ত ভাবে বলেছিলেন—"ওরে আমি তোদের চিন্তামণির কথা জিজ্ঞাসা করছি না।—চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি—চিন্তামণি না—আমার গোপাল। মায়েই এ কথা বলতে পারেন। ছেলেকে ভগবান বলাতে মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় না, অনেকখানি রয়ে যায়। সে অনেকখানির কথা বুঝবে কে?"

উভয়ে বাসায় পৌঁছে গেলেন। মাণিক তখনো অন্যমনস্ক। ডাক্তারকে বর্ত্তমানে নেবে আসতে হল'—"একটু চা খাওয়াবে মাণিক!"

নিজেকে সামলে মাণিক বললে—"আজ্ঞে এখুনি। ভাতের জল চড়ানই আছে।"—পাঁচ মিনিটেই চা এসে গেল।

ডাক্তার। তখন চায়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছি—প্রায়শ্চিত্ত করি—বলেই হাসিমুখে চুমুক দিলেন। দেখো ভগবানের সৃষ্টির কোনো কিছুই ছোট নয়। গরীব দেশের পয়সা হু হু করে বাইরে চলে যাচ্ছে—তাই লাগে। মশা কামড়াচ্ছিল তো চিরকাল, কারো টনক নড়েনি। যেই প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে "মস্‌কিটো কয়েল" (মশার ধূপ) আমাদেরি মতো মরা চীন থেকে এলো, আমরা বাহবা দিয়ে নিলুম। দক্ষদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিলুম। বস্তুটি কিন্তু ওই পাতা-ছ্যাঁচা বই অন্য কিছু নয়। বোধ করি আমাদের আনাচে-কানাচে জন্মায়—খুবই পরিচিত—কিন্তু পরিচয় নেবে কে?

মাণিক। কেবল কামড়ের কথাই বললেন—ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক উৎসবটা—মড়কটা বাদ গেল যে।

ডাক্তার। ভুল নয় মাণিক। পশ্চিমের বড় বড় বিদ্বান মুরুব্বিরা—খাম্বাজে আওয়াজ দিচ্ছেন—ম্যালেরিয়াই (অর্থাৎ মরাই) আমাদের বাঁচবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। এখানকার কোনো কোনো মোসাহেবও তাঁদের দোয়ারকি করছেন। আমাদের নাকি ভাত কাপড়ের বড় অভাব

নেই, অভাব হয়েছে লোক কমাবার। আমাদের লোক সংখ্যা যে অসম্ভব বাড়ছে! ম্যালেরিয়া তবু কতকটা সাহায্য করে। এ অকাট্য যুক্তির ওপর আমার উক্তির স্থান কোথায়? খুড়োরিয়া, জ্যেঠারিয়ারা বেঁচে থাকলেই মঙ্গল। সুতরাং থাক্—পাগলা-গারদের ফটক আর খুলিয়ে কাজ নেই।

মাণিক চাঙ্গা হয়েছে দেখে বললেন—"এইবার নেয়ে ফেলি, কি বলো?"

মাণিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা করাই ভালো।

ডাক্তার হাসি টেনে উঠলেন।—"মনে আছে তো—আমাকে আবার"...

"আজ্ঞে খুব আছে। আপনি খেয়ে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন—rest নিন্।"

ডাক্তার। rest? ভুলে যাও কেনো! মনটা যে বাবুইপাখীর জাত। ঝড় ঝাপটা এলেই বাসার মধ্যে আর থাকে না, বাইরে গিয়ে বসে। নাইতে গেলেন।

মাণিক আপন মনে—"কাজের সময় বিরক্তও হই, কিন্তু ভালও লাগে। ইনি যে কি রকম সংসার করলেন তা ভেবে পাই না। সায়েস্তা খাঁ আসছেন—সেই ঠিক্ করবে।"

মাণিক রন্ধনশালে ঢুকলো!

ডাক্তার আহারাদির পর শুয়েছিলেন। আদ ঘণ্টা পরেই ব্যস্তভাবে—"মাণিক কোথা গেলে হে?"

মাণিক। এই যে, আপনার 'হাফ্-প্যাণ্টের' থাপ্ ঠিক কর্‌ছি।

"আরে ও এখন থাক্। এদিকে যে চারটে বাজে!"

"এখনো ১০ মিনিট বাকি, ঢের সময় আছে মশাই।"

"তুমি তো বললে ঢের সময় আছে! আমার রাজবেশ করাও তো আছে। সঙ্গে নিতে হবে আবার দুটো বকাল। দুনিয়ার মজা দেখো—ফুটো জিনিস্ লোকে ফেলে দেয়—অকেজো বলে'। সে দিন কিন্তু টেথিসকোপে ফুটো ছিল না বলে' কি ঝুঠো অভিনয়ই করে' আসতে হয়েছে! বিধাতাকে নমস্কার। তাঁর ভুল যেন কখনো ধরতে যেও না"—

অন্ত পথে গিয়ে পড়েছেন দেখে মাণিক বললে—"কিন্তু এখন তো আপনি সময়ের দিকে দেখছেন না?"

ডাক্তার। ইস্ তাই তো—thank you—আর দেখছো—সময়টি কেমন তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টি? তার না মোটর, না ট্রেণ, না প্লেন—তার পা'ও দেখিনি, আবার না ঘুম না বিশ্রাম। সৃষ্টির মুহূর্ত্ত থেকে সেই যে চলেছে তো চলেছে। ওকে থামাবে কে?

মাণিক। ঘড়ি—

ডাক্তার। তার মধ্যে নেই মাণিক। সে কেবল—দাসেদের I mean চাকুরেদের থামায়, থামায় না—ছোটায়—

মাণিক। আপনি থামচেন কই?

ডাক্তার। তাও তো বটে। আর কথা বাড়িও না, এ দিকে চারটে কুড়ি। মাথা খেলে! দাও—দাও সেই দুষমন্ দুটো।

মাণিক T. C. আর আংটী বার করতে বসলো'। ডাক্তার বেশ বদলালেন।—"ওই যাঃ খেউরি হওয়া হল' না তো!"

"এই তো পরশু কামিয়েছেন!"

ডাক্তার। দিন গুণে কি ঘণ্টা গুণে কলের মজুরির মাপ হয়, আবার কাজ দেখে, কাজের গুরুত্ব দেখতেও যে হয়। পরশুর কথা আর কোথাও ব'ল না। আজকাল না কামিয়ে ছেলেরা শবদাহ করতেও যেতে পারে না, তা'তে মৃতের অসম্মান আছে। আর আমি যাচ্ছি সাহেব বাড়ী!

মাণিক। মাপ করবেন, শুনেছি নবকেষ্ট বাহাদুরও যেতেন, বিদ্যেসাগর মশাইও যেতেন।

"সে সব পূর্ব্বের কথা, সে দিন আর নেই। এখন পশ্চিমের কথা কও। বড়াল কবি লিখে গেছেন—বোধ হয় এইরকম—

"সকলেই পুরবেতে চায়,
দেখেনা পশ্চিমে চেয়ে—কি ডুবিয়া যায়।"

এখন পশ্চিমকে সামলাও। Excuse me—বাড়ী ফিরে না দেখো—তিনি Bob ক'রে (বাবরি-চুলো হয়ে) বসে' আছেন! যাক্, আর সময়ও নেই, তোমারি জিত্। কিন্তু মুখের দিকে চাইলে কি বলব?"

আমাদের মুখ কেউ চাইবেনা, এঁর এখনো গুরু মেলেনি বোধ হয়—

—"বলবেন—বাজারে ব্লেড্ (blade) পাওয়া যাচ্ছে না Sir."

"বেশ বলেছ—Very appropriate—দেখ একজন সব্-জজের বিপদের কথা মনে পড়ছে"...

"এখন থাক্ মশাই, পরে শুনব', নিজের বিপদটা—"

—"ইস্—সেইটাই তো আগে বটে"—

ফুঁ দিয়ে দেখে "টেথিসকোপটা" পকেটে ফেললেন—আংটীটা বুড়ো আঙুলে গলাতে গলাতে—"তবে দুর্গা বলি।"

বেরিয়ে পড়লেন।

মাণিকলাল চিন্তিত ভাবে নিজের কথা ভাবতে বসল'। নিজের কথা মানে—বাড়ির কথা—স্ত্রীপুত্রের কথা। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথাই এসে গেল —"ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়েও স্বস্তি নেই। কি করে' যে কাজ করে' চলেছেন—ভেবে পাই না! নিশ্চয়ই ভগবান সহায় না হয়ে পারেন না। আমার মিছে ভাবা। থাক্—

—"বাড়ির যে খবর পেয়েছি, মাথা খারাপ করতে তাই যথেষ্ট। ভিটে কি মিঠে জিনিস্!"—

—"ভাগ্যে ডাক্তারবাবুকে পেয়েছিলুম, তাঁর দুটো কথা শুনলেই সব ভুলে যাই। সে দিন বললেন—বিদেশে যারা চাকরি করে, সামর্থ্য থাকতে দেশে ফেরা সম্ভব নয়, দেশে তাদের অতিরিক্ত বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি বাড়ানো, কেবল চিন্তা আর অসুখ বাড়ানো। ছেলেদের চোষা বা খাওয়া আমের আঁটি দেখেছ তো, কসিতে না দাঁত ঠেকলে ছাড়ে না। আমাদের মালিকেরাও এমন হিসিবি,দেহে মাস থাকতে আমাদের রেহাই নেই। রসের কথা বলছি না—retire করবার দিন কাছিয়ে এলেই চিন্তায় সব রস শুকিয়ে যায়। যিনি প্রভুদের হাতে-পায়ে ধরে ষাট বছরের সনন্দ পান I mean চেয়ারে বসতে পান ও ড্যাম, ডেভিল, শোনবার সৌভাগ্য পান, তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকে না। ভাগ্যদোষে বেঁচে থাকেন তো, ভুরুর চুল পাকিয়ে, উৎসাহহীন কুব্জদেহে দেশে ফেরা তখন যেন বিদেশে ফেরাই হয়। গ্রামের তখন সবই বদলে গেছে। শ্রীনাথ জ্যেঠার সে গুলজার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় যে ছিল বুঝতে পারা যায় না। নিজের জমিতে লাগানো সাতটা নারকোল গাছ সাবালক হয়ে কখন চলতে শিখে প্রতাপ খুড়োর বাগানের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে' বেশ ফল দিচ্ছে, কেউ তা জানে না। শতকরা ৯৫ জন চিনতে পারে না—পুরাতনকে নূতন দেখে বলে'—"ইনি আবার কোথাকার কে এলেন?" তার পর সে অনেক কথা। সে মুখরোচক আলোচনা এখন থাক। তাঁদের আর দোষ কি?—আমাদের ভাগ্যেও তাই আছে মাণিক—

শুনে বলেছিলুম—"সত্যই বড় ভাবালেন—এখন উপায়?" ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—"উপায় তিনটি—(১) সব সয়ে মিলে মিশে তাঁদের আপন করে' নেওয়াই সব চেয়ে ভালো। পয়সা থাকলে সকলে তা করে না বা পারে না, (২) বালীগঞ্জ তাঁকে টানে, এই তো দেখছি। বিলম্বে বোধ হয় সেখানেও মিলবে না। আর পয়সা না থাকে (৩) কাশী আছেন। যেবা ইচ্ছা হয়। তাও বেশী দিন নয়—বাঙ্গালিটোলায় ঘুন ধরেছে, দ্রুত উত্তর বাহিনী।"

ডাক্তারবাবুর একটি কথাও ফেলতে পারি না। বাড়ির চিঠির কথা সেদিন শুনিয়েছেন—খুললেই স্বর্গ নরক দুই ভোগ করায়, আবার দু'দিন না পেলেই দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না!

মাণিক দুদিন পূর্ব্বে পরিবারের একখানি সত্তনত্ত-বর্জ্জিত দীর্ঘ পত্র পেয়েছে, এ সব তারি ফুট। বানান বিশুদ্ধ হলে' বিপদ বাড়তো।—খিড়কির পুকুরটা, যার পঙ্কোদ্ধার করতে গরীবের সেভিংস্ অঙ্ক ফুরিয়ে যায়, যাতে মাছের ছানা ফেলিয়ে আসে, সে পুকুরটি যেতে বসেছে—unemploymentএর দুঃখ নাই। তাঁর এখন নিত্যকর্ম্ম ছিপ-ফেলে মাছ ধরা, পুকুরটিও নাকি রাজু জেলেকে, নিজের বলে' জমা দিয়েছেন। সে মাছ ধরছিল, ছোট ছেলেটা একটা মাছ চায়। পেয়েছিল খুড়োর এক ধমকানি। বালক ভয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে' নাক থেঁতো করেছে—জ্বর হয়েছে!—মাণিক যতই বাদসাদ দিয়ে ভাবতে যায়—খুড়োকে চেনে, তাই ভুলতে পারছে না। দেশের সম্পত্তির এই বিপত্তি!

ভাবছে "এখন উপায় কি? বিদেশীর তরে দেশের কারই বা দুর্ভাবনা। আমার হয়ে তাঁরা কেনই বা কথা কবেন? সেটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। ভেবে আর কি করব! এখন ডাক্তারবাবু এলে যে বাঁচি।"

ভগবান বিপন্নের কথা শুনলেন। সহসা মশ্ মশ্ শব্দ। "মাণিকলাল" বলেই হাসিমুখে ডাক্তারবাবুর প্রবেশ। —"মা দুর্গার দয়ায় কেল্লা ফতে।"

মাণিক। আঃ বাঁচালেন মশাই। আপনাকে ছেড়ে আর একা একদণ্ড থাকা আমার চলবে না। একটা না একটা দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়—

ডাক্তার সবিস্ময়ে—আবার কি হোলো? যুধিষ্ঠির ধাওয়া করেছিল বুঝি! সেই ডোবাবে দেখছি—

মাণিক। কি যে বলেন! ওই একটিই তো সত্যিকার বন্ধু বলে' পেয়েছি মশাই। সে কথা এখন থাক। সেই যে বলেছিলেন "বাড়ির চিঠি"—তা পেয়েছি এবং তার মধ্যে খুড়োর practical অভিনয়,—ছোট ছেলেটার নাক থেঁতো, পত্নীর অনুতাপ প্রভৃতি নরক ভোগও পেয়েছি ও করছিলুম। ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন।—মার সে পাপ কথা, এখন আপনার কথা শুনি। O/C আর T. C.র কথা আগে বলুন। এখানকার চ্যাপটার প্রায় শেষ—আজকের কথাগুলো তাই ভালকরে শুনতে ইচ্ছা হয়; পরে যা আছে তা তো আর নতুন পড়া নয়—

ডাক্তার। তাই ত' বড় ভাবছো দেখছি—ভাববারই কথা বটে।—মুখ বদলে গিয়েছে, বোলে দিয়েছে। এর পর সেই দুষমনদের দুঃশাসনী পেসন্ বাড়বে বই কমবে না, সেটাও ঠিক্। উপায় কি? চাকুরি যে আমাদের অদৃষ্ট-লিপি মাণিক। ভেব না, দেখবার একজন আছেন—

মাণিক। নাঃ, আর ভাবছি না! আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গেই বল্ পেয়েছি। দেখবার একজন আছেন তার পরিচয়ও পেয়েছি। কিন্তু—

ডাক্তার। "কিন্তুটা" এখন থাক মাণিক। পূর্ব্বে কখনো সবিস্তার শুনতে চাওনি, আজ সবিস্তারের কথা শুনেই আমি চমকে গিয়েছি, বোধ করি তোমার চিন্তার "আগামী"টা অনুমান করতেও পেরেছি। ভেব না, কিন্তু মনে রেখো মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না—

মাণিক। স্বীকার করি হুজুর, কিন্তু তা হলে' মাণিকের এ চাকরি করাও আর হয় না—

ডাক্তার স্তব্ধ বিমর্ষে মিনিটখানেক থেকে বললেন—ও সম্বন্ধে কথা দু-কাপ চা খাবার পর হবে,—এখন থাক।

মাণিক। বড় ভুল হয়ে গেছে—মাপ করবেন, আগে চা-টা আনি।

মাণিক চা আনতে উঠল। কিন্তু পূর্ব্বের মত ছুটল না।

"তাই তো, মাণিক বড় ভাবছে। ভাবনাও-অযথা নয়। কেনো জানি না,—কর্ত্তারা আমাদের দুজনকে তফাৎ করবেই। তার আঁচও পেয়েছি। অন্যের প্রতি সাহেবের একটু সুনজর দেখলেই ওঁদের কুনজরে তাকে পড়তেই হয়। তখন তার জন্যে worse (আঁটকুড়ো) ষ্টেসনের খোঁজ চলতে থাকে, যেখানে মোটর পৌঁছয় না, আমাদের উভয়ের জন্যে—তাই চলছে শুনেছি। উপায় কি? মাণিককেই বা বলব' কি?"

মিশরের ডাইরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(৪)

পাঁচটার সময় বি-ও-এ-সির লোক এসে দরজায় আঘাত ক'রে যাত্রার ইঙ্গিত জানাল। স্নান সেরে এসে দেখি পালঙ্ক-চা (Bed-tea) প্রস্তুত। যাত্রার পোষাক প'রে জিনিষপত্র বেয়ারার জিম্মায় দিয়ে আমরা ব্রেক-ফাষ্টের জন্য ডিনার হলে উপস্থিত হ'লাম। খাদ্যসামগ্রী প্রচুর; পাশের টেবিলে তিনজন সামরিক কর্ম্মচারী খা' খেল, দেখে মনে হ'ল যেন তাদের এই জীবনের শেষ খাওয়া।

ঠিক সাতটার সময় এয়ারপোর্টে এলাম। আমাদের সঙ্গে একজন যুবক—নতুন যাত্রী, চ'লেছে বাগদাদে; সঙ্গে এসেছে তার মা, ভাই-বোন তাকে তুলে দিতে। সবার কি কান্না! কারণ তার এই প্রথম এরোপ্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা। পিতা তাকে সমস্ত বিষয়ে সাবধান ক'রে দিলেন এবং নানা খুঁটিনাটী উপদেশ দিলেন। মা, বোন কয়েকবার চুমু দিল। তারা সবাই পোর্টের সীমানার বাইরে। শেষ মুহূর্ত্তে ছোট্ট বোনটি তার অশ্রুসিক্ত রুমালটী দূর থেকে ছুঁড়ে দিল। ভাইটী দৌড়ে গিয়ে রুমালখানি কুড়িয়ে নিল। সব ঘটনাটা দেখে মনে হ'ল ইউরোপীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে এখনও সুপ্ত র'য়েছে প্রাচ্য মন—স্নেহ, মমতা,

দিয়ে ঢাকা। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় আমাদের এরোপ্লেন চ'ল্লো বাগদাদের পথে।

এবার সত্যিকারের মরুভূমির উপর দিয়ে চ'লেছি। ডানপাশে তাইগ্রিস, বামপাশে দিকচক্রবাল রেখার পানে ছুটছে সীমাহীন মরু। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় র'য়েছে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী—কৃষকের অতি নিপুণ হস্তে সাজান। দেখে বোঝা যায় যে কৃষিবিভাগ এই বনবীথির রিচালনায় হস্তক্ষেপ করে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর আবার আমরা 'ড়লাম ধূলির ঝড়ে; বসরার পথে যে ঝড় দেখেছিলাম, আরবের রুপ্রান্তে এই ঝড়ের গতি, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। চারিদিকে কাল-লির ঝঞ্ঝা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—অবশ্য সেই বালুকা সমুদ্রের াতের মত বিরামবিহীন। ধূলি আমাদের স্পর্শ ক'রতে পারে নি, রণ সমস্ত কাঁচের জানালা। মনে হ'ল বিরাট শূন্য ধূলি দিয়ে তৈরী 'য়েছে। বসরা থেকে বাগদাদ বিমানপথে ৩০০ মাইল। তার মধ্যে য় ২০০ মাইল পথ ধূলিতে ঢাকা ছিল। বাগদাদ এসে নামলাম প্রায়

ইজিপ্ট

ঘণ্টা পরে। এত বিলম্বের কারণ, ধূলির এবং বিমানপোতের যোগিতা।

বাগদাদ এরোড্রম বিশেষ চমৎকার নয়। তবে খুব বিরাট। এখান ক একটী রেললাইন চ'লেছে কারবালার দিকে, আর একটী লাইন তেহরাণের দিকে, তৃতীয়টী চ'লেছে উত্তর আরবে মরুভূমির সীমান্ত ক'রে এলেপ্পোর পথ দিয়ে তুরস্ক অতিক্রম ক'রে ইউরোপ পর্য্যন্ত। প্লেন থেকে নেমে আমরা পাসপোর্ট, মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে 'মাগারে প্রবেশ ক'রলাম; এখান থেকে সহর প্রায় ছয় মাইল। রতবাসী নানাপ্রকার যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত র'য়েছে এই বাগদাদে। দেখার সুযোগ হ'ল না। আধঘণ্টা পরে আমাদের যাত্রা সুরু হবে ষ্টাইনের দিকে।

এবার চ'লেছি বাগদাদ থেকে উত্তর আরবের মরুভূমির উপর দিয়ে ষ্টাইনের পথে। এরোপ্লেন প্রায় ১০,০০০ হাজার ফিট উপর যা'চ্ছিল। নীচে ঘন কৃষ্ণ বালুকার স্তূপ, মাঝে মাঝে ধূলির ঝড়ে স্তূপীকৃত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত হ'য়েছে। ক্বচিৎ ও সমান্তরাল বালুকাক্ষেত্রের ভিতরে রেখার মতন পথ চ'লেছে।

বোধ হয় মানুষের পায়ে চলা পথ। কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই কোথায় পথ আরম্ভ, কোথায় পথ শেষ। বালুকারাশি তীব্র হিংস্ররূপ পরিগ্রহ ক'রে যেন মানুষের তৈরী বসতিক্ষেত্রের প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। একবার পথ হারিয়ে গেলে পথিক বিভ্রান্ত হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য বোধ হয় আরবজাতি অত্যন্ত অতিথিবৎসল। পথহারা পথিকের আশ্রয় অত্যন্ত প্রয়োজন; তাই প্রত্যেক আরব বেদুইন অন্যকে আশ্রয় দিতে উন্মুখ। কারণ, মরুভূমির যাত্রীদের পক্ষে পথ হারান অতি সহজ ব্যাপার। একে অন্যকে আতিথ্য না দিলে নিজেও বিপদের সময় আতিথ্যের সুযোগ পাবে না। আরবদের হিংস্র চরিত্রের অন্যতম কারণ বোধহয় পারিপার্শ্বিক মরুভূমির হিংস্র, উগ্র, নৃশংসরূপ। আরব বেদুইনের দুইটী বিরুদ্ধ প্রকৃতি—একদিকে ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে অতিথি-পরায়ণ। মরুভূমির বালুকাই এর প্রচ্ছদপট। আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে এই আতঙ্কজনক হিংস্র রূপ উপভোগ ক'রলাম।

আমরা জেরুজালেমের অপর পার্শ্বে লীডা নামক এয়ারপোর্টে

ইজিপ্ট

নামলাম প্রায় সাড়ে চারটার সময়। একজন ইহুদী গর্ব্বের সঙ্গে জেরুজালেমের কথা ভাঙ্গা আরবী ও ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব'লে গেল। জেরুজালেমের অতীত ঐশ্বর্য্যের বিবরণ দিয়ে গেল এবং ব'ল্লে—জেরুজালেম না দেখলে আমার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ ব্যর্থ হবে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, তোমাদের আতিথ্য একবার গ্রহণ ক'রব। এখান থেকে লোহিত-সাগর ৪০ মাইলেরও কম। আমাদের সহযাত্রী কাপ্টেন সিং সস্মিতমুখে বিদায় নিয়ে হাইফার উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন।

আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষার পর আবার যাত্রা সুরু হবে। লীডা থেকে ১৫ জন যাত্রী আমাদের সঙ্গে কায়রো চ'ল্ল। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা এশিয়া ত্যাগ ক'রে লোহিত সাগর অতিক্রম ক'রলাম। এখানেও মরুভূমি র'য়েছে, বালুকারাশি অপেক্ষাকৃত ভদ্র আকৃতির, রুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নয়। মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া প'ড়ে কোথাও কোথাও নীলাভ হ'য়ে উঠেছে। কোন কোন স্থানে ঘন বসতির সাক্ষাৎ পেলাম—মাঝে মাঝে পয়ঃপ্রণালী, পাশে পাশে সৈন্যশিবির—যুদ্ধক্ষেত্রের নৈকট্যের আভাস পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় আমরা

মিশরের রাজধানী কায়রোর প্রান্তদেশে একটী এয়ার পোর্টে নামলাম। এটী সহর থেকে দশমাইল দূরে। কাষ্টম্‌স্‌, পাস্‌পোর্ট, ডাক্তারি সার্টিফিকেট তন্ন তন্ন ক'রে দেখা হ'লো। আমাদের সঙ্গের লণ্ডনযাত্রী সস্ত্রীক ইউরোপীয় ভদ্রলোক এইবার প্রথম পাসপোর্ট দেখিয়েই নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর সুটকেশ যখন খোলা হ'ল, তিনি মুখ অত্যন্ত বিকৃত ক'রে অস্বচ্ছন্দমনে এই নিয়মের কাছে মাথা নত ক'রলেন। আমাকে পাসপোর্ট অফিসার ব'ল্লেন,—আপনার মিশরে স্থিতির অনুমতি মাত্র একমাস। আপনি তাড়াতাড়ি এই অনুমতি পত্র পরিবর্ত্তন ক'রে

ইজিপ্ট

নেবেন। বি-ও-এ-সির মোটর আমাদিগকে নিয়ে এলো তাদের কায়রোর অফিসে। সেখান থেকে বিভিন্ন হোটেলে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে। আমি ও মিঃ সিলভরাজ হোটেলে না থেকে ওয়াই-এম-সি-এর আশ্রয় নিতে চ'ল্লাম। আমার সঙ্গে সেক্রেটারী মিঃ আলেকজাণ্ডারের নামে কানেডিয়ান মিঃ ডাণ্ডাডেলের একখানি পরিচয়পত্র ছিল। আমি সিলভরাজের পরিচয় ও মিঃ ডাণ্ডাডেলের চিঠির উপর নির্ভর করলাম।

কায়রো

ওয়াই-এম্‌-সি-এ গৃহ কায়রোর বি-ও-এ-সির অফিস থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। মিঃ আলেকজাণ্ডার সাইপ্রাসে গিয়েছেন। তাঁর সহকারী মিঃ মালবিয়া আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেলেন। তিনি আপ্যায়ন করে আমাদের স্নানের ও জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। 'রাত্রি নয়টার সময় আমরা অফিসার মেসে ডিনারে বসেছি। আমিই একমাত্র অসামরিক পোষাক ধারী অপরিচিত। অন্যান্য সকলেই আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন; এই যুদ্ধের দুর্য্যোগে হঠাৎ কোন অসামরিক ভারতবাসীর কায়রো আগমন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মিঃ মালবিয়া আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন—একজন ভারতীয় অধ্যাপক, ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চার জন্য এসেছেন এবং এই মধ্যপ্রাচ্যে এক বৎসর অবস্থান করবেন। আমার পাশের টেবিলে বসেছিলেন একজন অফিসার—নিবাস সীমান্ত

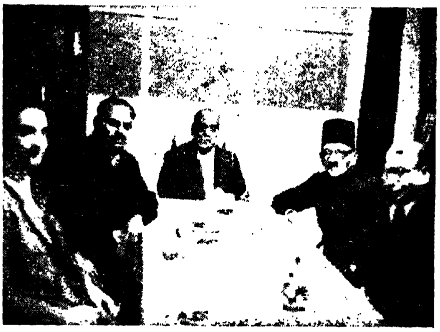

ইজিপ্ট

প্রদেশের মর্দ্দান জেলায়, জাতিতে পাঠান। আমার সঙ্গে পনের মিনিট আলাপ করে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। হিন্দু অধ্যাপক ইসলাম সংস্কৃতির চর্চ্চা করতে এসেছেন ব'লে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করলেন এবং আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার পর তিনি আমাকে তাঁর আবাসে নিয়ে গেলেন। এই আবাসটি একটি পেন্‌সনপ্রাপ্ত একজন মিশরীয় মহিলা পরিচালিত। এত রাত্রেও আমাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। পরের দিন আমাকে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবেন এবং কয়েকজন আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এইপাঠান ভদ্রলোকের সহৃদয়তা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। তাঁর নাম—কাপ্টেন ফজল করিম খাঁন।

কঙ্কাল হাসে না কভু

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

অতলান্ত গুহা হ'তে শুধু ব্যর্থ কাতর প্রার্থনা,—
জীবনের দিনগুলি গোণা।
আলোকের আশা আজো নাই—
চাওয়া-পাওয়া হিসাবের ঠিকানা মিলাই!
ভিক্ষা-বীজ-মন্ত্রে শুধু বাঁধিয়াছি বাসা,
কঙ্কাল মনের কোণে তবু ধরি আশা—
স্বপ্ন তবু আজো এসে করে করাঘাত,
জীবনে কী আসিবে প্রভাত?
অন্তর শুকায়ে গেছে—সাহারায় বৃথা পরিক্রমা—
আলোক নিভেছে কবে
আঁধার হ'য়েছে শুধু জমা!
কঙ্কাল হাসে না কভু—
শুষ্ক মুখে ভাষা নেই কবি,
মরণ নেমেছে ভাখো, পথে পথে তারি সব ছবি।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১১)

অমল খোকাকে পড়াইতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু রমলা আজ আসে নাই। খোলা দরজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল বৃথাই প্রতীক্ষা করিয়াছে—এখন সে বুঝিয়াছে যে আজ আর সে আসিবে না। তাহার মিথ্যা পরিচয়, সভাগৃহে তাহার ব্যবহার, সমগ্র একত্রিত করিয়া অমল যুক্তি দ্বারা বিচার করিতেছিল—রমলা যদি আজ তাহার পরিচয় অস্বীকার করে তবে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তারই ভৃত্য হইয়া সে যে অপমান তাহাকে করিয়াছে, তাহা হয়ত সে ভুলিতে পারে নাই—

অমলের চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া খোকা কহিল—পড়া হয়ে গেছে মাষ্টার মশায়, উঠি ?

—এ্যাঁ, অঙ্ক হ'য়েছে ?

—হ্যাঁ। আপনি একটু বসুন, দিদি ব'লেছে।

—ও আচ্ছা।

অমল অপেক্ষা করিতেছিল।

রমলা সহাস্য মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—নমস্কার, কবি অমলবাবু।

অমল প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল,—বলুন,—কোন রকম ব্যঙ্গ বা তিরস্কারেরই আমি প্রত্যুত্তর দেব না প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, অতএব আপনি যথেচ্ছ ব্যঙ্গ ক'রতে পারেন।

রমলা খোকার চেয়ারটায় বসিয়া বলিল—আজ অকস্মাৎ একেবারে যুধিষ্ঠির হ'লেন কেন ?

—যে কারণে আপনি আমাকে কটুক্তি ক'রবেনই প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।

রমলা তেমনি হাসিয়া বলিল,—এ রকম প্রতিজ্ঞা ক'রেছি তা বুঝলেন কি ক'রে ?

অমল বলিল—প্রথম বচনেই বুঝেছি—ওটা মানুষ স্বভাবতঃই বোঝে। যাক্, আপনার প্রশ্ন, ব্যঙ্গ এবং তিরস্কার আরম্ভ করুন। হাড়িকাঠের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না !

—আপনার মাঝে এত দৈন্য, এত বিনয়; একে যে অভিনয় বলে ভ্রম হয়।

—আমার মাঝে ঔদ্ধত্য আছে,একথা অন্ততঃ আপনি বল্‌তে পারেন না।

রমলা পুনরায় হাসিয়া বলিল—না, তা বলা যায় না কিন্তু এতগুলো মিথ্যে কথা আমার কাছে কেন বলেছিলেন ?

—মিথ্যে কথা ! এতগুলো ?

—হ্যাঁ, আপনি অঙ্কশাস্ত্রে এম্‌-এ, পড়েন, কাপালিক, কবিতা বোঝেন না—এ সমস্ত কেন ব'ল্‌লেন ?

—কেন বলেছিলুম মনে নেই, তবে বলে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম মনে আছে—আর সে দিন নতুন পরিচয় পেয়ে কেমন মজা হ'ল বলুন ত ?

—মজা ! আপনার মাঝে আর একটু লজ্জা আশা করেছিলাম।

—আজ আমার অবস্থা মিথ্যাবাদী রাখালের চেয়েও শোচনীয়। তারপর ?

—সমিতির সভায় আপনি যে আমাকে চিন্‌তে পারলেন না ?

—আপনিও ত আমাকে চেনেন নি। ভাবলুম, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে একথা স্বীকার ক'রতে আপনি হয়ত অনিচ্ছুক, তাই আমিও তেমনি ভাবেই চলেছি।

—ও এই মাত্র। যাহোক্,—আপনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই বেশ ভেবে চিন্তে এসেছেন দেখছি। আপনি মিথ্যা কথা বলে যে অভিনয় ক'রেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আমার ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধাকে আপনি বেশ শিক্ষা দিয়েছেন—এটা আমার প্রাপ্য, কাজেই আমার কোন রাগ নেই আপনার উপর। তবে মানুষের অসম্পূর্ণতার প্রতি আপনার সহানুভূতি থাক্‌লে 'সেটাই কি বেশী মহানুভবতার পরিচয় হ'ত না !···আপনার কাছে আমার লজ্জা নেই, আপনি ত জান্‌বেন আমি নতুন সভ্য হ'য়েছি—

—না, আমাদের সমিতির কথা জান্‌তুম না।

—ইচ্ছা করলে ওই অসম্মানের হাত থেকে আপনি রক্ষা ক'রতে পারতেন। অপর্ণার খাতা'ত আপনি দেখেছেন।

—না, আমি সভায় যাবো তা ঠিক ছিল না, শেষ মুহূর্ত্তে গিয়েছি।

রমলা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া যাইয়া চাকরকে চা'র তাগাদা করিয়া পুনরায় বসিয়া বলিল,—অপর্ণা কে ?

অমল অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

—আপনি তাঁকে যে 'তুমি' বলেন ?

—ব'লতে ব'লতে হ'য়ে গেছে—অমনি অনেক সহপাঠীকেও ত বলি।

—আপনাদের মাঝে খুব···একটু থতমত খাইয়া সে বাক্যটি সম্পূর্ণ করিল,—ঘনিষ্ঠতা, না ?

—সম্ভব, নইলে আর তুমি ব'লবো কেন। তবে সে ঘনিষ্ঠতার অর্থ আপনি কি ক'রবেন জানি না।

রমলা বলিল,—ভয় নেই, আমি কিছু মনে ক'রবো না। তবে সে যে আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আপনার মনে করে এ-তে বোধ হয় সন্দেহ নেই—

অমল বলিল—আমার মত দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সে যদি আপনার মনে করে তবে সে তার মহানুভবতা এবং আমার পক্ষে আপনার পরিচয়ের মত তার পরিচয়ও যথেষ্ট গৌরবের।

চা খাইতে খাইতে অমল বলিল,—মিস্ মিত্র, একটা জিনিষ কখনও ভুলবেন না। আমি কি এবং আমার কতটুকু এ জগতে প্রাপ্য তা আমি কখনও ভুলি না। সেদিনও আমি ভুলিনি যে আমি আপনাদের ভৃত্য মাত্র এবং আজও ভুলিনি যে আমি তাই। এই চা, খাবার, আপনার পরিচয়, এ সমস্তকেই আমি যথেষ্ট মূল্যবান এবং আপনাদের স্নেহের দান বলে মনে করি—

রমলা বলিল—মানুষ—মেয়েরা কি কেবল অর্থ দিয়েই লোককে বিচার করে। মানুষ হিসাবে তার গুণ, শক্তি, শিক্ষা এগুলো কি বিচার করে না—

—জানি না, তবে এমন সুচারু অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়নি।

—আপনি বেছে নিতে পারেন নি। নইলে আপনি দেখতে পেতেন মানুষের আভিজাত্যের খোলসের অন্তরালেও তার প্রাণ আছে।

—অবসর ও সুযোগ পেলে দেখ্‌বো।

—সত্যি ক'রে বলুন,—আপনি কেন এতগুলো মিথ্যা পরিচয় আমাকে দিয়েছিলেন?

—জানি না।

—জানি, আমাকে লাঞ্ছনা দেওয়াই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আর কেন? এতেও কি আপনার হয় নি?

—আমাকে বৃথা দোষ দিবেন না, মিস্ মিত্র। যা কেবল খেলার ছলে—অমল লজ্জিত হইয়া মাটির দিকেই চাহিয়া ছিল।

—হ্যাঁ, কেবল খেলার ছলেই বটে—তবে তা আজ প্রায় প্রাণঘাতী হ'য়ে উঠেছে, তা বুঝ্‌তে পারেন।

অমল রমলার মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমার জন্যে জীবনে কেউ কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট পায় তা আমি চাই না। আমার জন্যে যদি কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমি দুঃখিত এবং মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। আমি দুঃখিত ত হইনি, আপনাকে প্রথমে যতখানি অবহেলা হয় ত করেছিলাম আজ যে ততখানি শ্রদ্ধা করি একথা কি আপনি বুঝতে পারেন?

—আমার ভাগ্য।

রমলা টেবিলের উপর বাম হাতের তর্জ্জনীটা কয়েকবার অকারণে বুলাইয়া অমলের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—অপর্ণা ও আপনার মাঝে ঘনিষ্ঠতা, তথা ভালবাসা গড়ে উঠেছে এ সংবাদ পেয়ে এবং স্বচোক্ষে দেখে আমার যথেষ্ট উপকার হ'য়েছে। আমাদের মাঝে ভালবাসার মত কিছু হয়ত নেই, কিন্তু আমাদের অন্তরেরও একটা মূল্য আছে তা অস্বীকার আপনি ক'রবেন না।

—কোনদিন করিনি।

—কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধার কি কোন প্রীতিদানই নেই?

অমল চমকাইয়া ফিরিয়া রমলার মুখের পানে চাহিল। রমলা কি চাহে? কি সে নানা কথার জালে জড়াইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে! অমল প্রশ্ন করিল,—আমি কি প্রতিদান দিতে পারি? আমি যে অত্যন্ত অক্ষম, সে কথা আপনি ভুললেন কেমন ক'রে?

—অক্ষমতাটা আপনার ত অভিনয়।

—না,—আমি গরীব একথা আপনি জানেন।

—জানি, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী যে সেদিন জেনে এসেছি। আপনি হয়ত জানেন না যে আপনি ও আপনার কবিতাই সমিতির সকলের আলোচ্য বিষয়।

—কেমন ক'রে জানি না। সেও হয়ত ব্যঙ্গই—

—না, সেটা appreciation,

অমল সহসা সংশয় অতিক্রম করিতে যাইয়া প্রশ্ন করিল—আপনিও appreciate করেন?

—হ্যাঁ, এক কথায় গুণমুগ্ধ—রমলা একটু হাসিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিল।

—বটে?

—হ্যাঁ, স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমাকে—

অমল বলিল—আমার মনিব।

—কেবলমাত্র তাই?

অমল লক্ষ্য করিল, শিক্ষাভিমানী উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত রমলার দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল, ছন্দ-পতনের দৈন্য লইয়া টলটল করিতেছে। রমলা হয়ত তাহাই গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিল। অমল অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

প্রয়োজন ছিল না এবং মনে মনে অমল সমস্ত প্রয়োজনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল তাই অপর্ণার সহিত দেখা হওয়া সত্ত্বেও সে কিছু বলে নাই। অত্যন্ত ভাল ছেলের মত ক্লাসের কোনে একাকী বসিয়াছিল। ঝড়ের পরে শান্ত প্রকৃতির মত তার মন আজ কেবল ভিজা ঘাসের গন্ধে রহিয়া রহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিতেছে মাত্র। তাহার দারিদ্র্য অপর্ণাকে না হইলেও তাহার মাতা পিতাকে বিমুখ করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমলা এত জানিয়াও কেন অশ্রু গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই প্রস্থান করিল?

সারাটা দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া গেল—অনেক ইংরাজ কবি, নাট্যকারের প্রসঙ্গ ক্লাসে আলোচিত হইল। অনেক লিরিক কবিতার ব্যাখ্যা হইল, অমল স্বপ্নহীন শূন্য অন্তর লইয়া সবই শুনিয়াছে। অপর্ণা কলেজে আসিয়াছে—যে নীল সিল্কের শাড়ীখানা পরিয়া সে একদিন তাহাকে খুশী করিয়াছিল, আজ সে সেইখানাই পুনরায় পরিয়াছে—ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, আর নেহাত পর্য্যায়ক্রমেই হোক। নানারূপ কাজ করা ব্লাউসটা আজ শাড়ীর অন্তরাল হইতেও তাহার ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করিতেছে।

শেষ ঘণ্টার শেষে, সকলের প্রস্থানের পর অমল ধীরপদক্ষেপে ক্লাস হইতে বাহির হইতেছিল। ভাবিয়াছিল সম্মুখের পথ নিশ্চয়ই জনশূন্য, কিন্তু অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল, অপর্ণা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে অমলের সঙ্গে দেখা হইতেই বলিল—তোমার কি হ'য়েছে বল ত?

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল—কি আবার হবে!

—তুমি বড্ডো সেণ্টিমেণ্টাল। তোমাকে ত আজ বাড়ীতেও নিয়ে যেতে সাহস হ'চ্ছে না।

—কেন?

—কি জানি, যেয়ে হয়ত মার কাছে সবিস্তারে এবং অতিরঞ্জিত ক'রে তোমার দারিদ্র্যের বর্ণনা ক'রবে। তোমার ত আর জ্ঞান কাণ্ড কিছু থাক্‌বে না।

অমল হাসিল। অপর্ণা বলিল,—হাসির কথা নয়,—সেদিন সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাই নি, তুমি হয়ত খুব অপমানিত হ'য়ে, অভিমান ক'রে এসেছ?

অমল বিস্মিত আঁখি মেলিয়া শুধু কহিল,—অভিমান?

অপর্ণা বলিল,—হ্যাঁ, নিজের মনের অন্তরালে ত কিছু নেই। অভিমান ক'রেছ—ভয় নেই অতটুকু দাবী তোমার আছে আমার উপর। চল, কোথায় যাবে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমাদের বাড়ীতে ত আর যাওয়া হবে না।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—আর নয় আজ। খোঁচা তুমি যতই দাও,—আজ আর কিছু ব'লবো না।

অমল অপর্ণার মুখের দিকে ঋজু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। প্রগল্‌ভ অপর্ণার মুখে আজ ভয় ও সহানুভূতির প্রলেপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কহিল—চল, কোথায় যাবে?

—চা খেয়েছ?

—না।

—তবে চল, চা খেয়েই বেরুই। যেখানে হয় নামলেই হবে।

কোনরূপ সিভলরি না দেখাইয়া অপর্ণার পয়সায়ই সে চা খাইয়া আসিল এবং তাহারই পয়সায় গড়ের মাঠে আসিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল,—সেদিন তুমি খুব দুঃখিত হ'য়েছিল?

—না। আমি জানি, আমার দারিদ্র্যকে তুমি তোমার মা'র কাছে গোপন ক'রতে চাও, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। ধর, যদি তুমি আমাকে বিবাহ ক'রতেও প্রস্তুত থাকো তা হ'লেও মা বাপের অমতে এ দারিদ্র্যকে তুমি ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ ক'রতে পারবে না—সে কথাও আমি জানি; তবে তোমার এই পরিচয়, এই ঘনিষ্টতা সম্ভবতঃ ভালবাসা—আমার চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে। তোমাদের মত শিক্ষিতা যারা তাদের সঙ্গে মিশবার যথেষ্ট সুযোগ আমার জীবনে হয় নি,—তুমি আমার প্রথম পরিচয়। জানি না কেন যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম সেই দিন থেকেই ভাল লেগেছে,—লাইব্রেরীতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেবল তোমাকেই দেখতাম। আজ এ দৈন্য প্রকাশ ক'রতে বাধা নেই, যখন সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আজ নিঃশেষে নির্মূল হ'য়ে গেছে—

আর-বলা-যায়-না এমনি ভাবে যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠেই অমল থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল—সুদূরপ্রসারী তার দৃষ্টি ও এই স্বীকারোক্তিতে তাহার অন্তর করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বার বার তাহার কাছে পরাজিত হইয়া সে আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু আজ অমলের এমনি পরাজয় তাহাকে ব্যথিত করিল। জীবনের একটা পরাজয় কি একটা ব্যর্থতাই মানুষকেই ব্যথিত করিতে পারে না, যখন গগনবিহারী সগর্ব্ব অন্তর বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়ে তখনই তাহা করুণা জাগায়; গিরিচূড়ার পতনের মত বিপুল তাহার এই পরাজয়, বিরাট তাহার পতন। অপর্ণার বিলোল আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে অমলের হাতখানাকে সস্নেহে আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিল,—অমল, তুমি দুঃখ ক'রো না। তোমার দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি, আমি ঘৃণা করি এ ভেবে আমাকে অসম্মান ক'রো না। আমার অন্তরও আজ উচ্চকণ্ঠে তোমার মতই ব'লতে পারে, তোমার পরিচয় আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে; কিন্তু বাপ মা তারা মনের কোন মূল্যই দেয় না,তারা দেখে সম্পদ—যা দেহের স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও মনের শান্তি আনে না—আমরা নিরুপায়ের মত বাপমায়ের ইচ্ছায়ই চলি—

অপর্ণাও থামিয়া গেল,—যাহা অন্তরের মাঝে আজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, কণ্ঠ নাই। দুইজনে মুখোমুখি নির্ব্বাক—দুইটি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বিরাট তরঙ্গ যেন অকস্মাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত থামিয়া গিয়াছে।

অদূরে ঘর্ঘর শব্দে অজ্ঞাত কত যাত্রী বহন করিয়া ট্রাম চলিয়া গেল—দুইটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের মাঝে কোনও পরিবর্ত্তন আসিল না, একটা শুক্‌নো পাতা উড়িয়া আসিয়া অপর্ণার কোলের কাছে পড়ল!

অমল হাসিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—হাস্‌লে কেন?

—ছিন্নপত্রের মত আমরা যদি আজ অতীতকে ফেলে দিতে পারতাম।

ক্ষণিক দুইজনেই আবার চুপ করিয়া রহিল।

অমল অকস্মাৎ অত্যন্ত নগ্ন প্রশ্ন করিল,—তুমি কি আমাকে বিয়ে ক'রতে পারো?

অপর্ণা কোনরকম আশ্চর্য্য না হইয়া, ম্লান একটু হাসিয়া বলিল,—তুমিই বল, হিন্দুর মেয়ে আমার পক্ষে কি একথা স্বীকার করা উচিত?

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল,—থাক্‌, শুনেওলাভ নেই।

অপর্ণা অমলের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিল, অনেক ভাবিয়া বলিল,—তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল।

—বল—

—বন্ধ ত হ'য়ে এল, বাড়ী যাবে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

—যাবার আগে আমাদের বাড়ীতে একবার যেও—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে মা'র কাছে এ সব ব'লবে না।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু অপর্ণা, বিদায়কে দীর্ঘ ক'রে লাভ নেই। জানি আমাকে রিক্তহস্তে কেবলমাত্র বেদনা নিয়েই ফিরে আসতে হবে; তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা।

অপর্ণা বলিল,—তাই হোক্‌—জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত নেই, এটা না হয় আর একটা বাড়লো—

—বেশ তাই হোক্‌।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সে আজ অনেক দিনের কথা। ৩৫ বৎসর পূর্বে চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এক বিরাট্ অধিবেশন হইয়াছিল। আমরা কলিকাতা হইতে বিপুল দল বাঁধিয়া অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলাম—তাহার মধ্যে অনেক গণ্যমান্য লোক ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্ভবতঃ অধ্যাপক যদুনাথ সরকারও ছিলেন। সেই অধিবেশনে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার কদমতলার বাসভবনে তিনি আমাদিগকে যে প্রচুর উদারতা-সমন্বিত সৌজন্যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে অনেক দিনের মত একটি ছাপ রাখিয়া দিয়াছিল। তখন অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বলিয়া বন্দিত হইতেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর মূর্তি, গভীর সাধনাপূত নিষ্ঠা এবং পুরাতন আদর্শ-প্রদীপ্ত জ্ঞান গরিমা। সেই পরিণত বয়সে তিনি যেন সৌম্য শান্ত মহাদেবের ন্যায় স্থির ধীর অটল ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন।

আজ সেই মহাপুরুষের জন্মতিথির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কল্পে এই যে অনুষ্ঠান হইতেছে আমি ইহাতে যোগদান করিতে পাইয়া ধন্য হইলাম। অল্প কয়েকটি কথায় আমি তাঁহার মহনীয় চরিত্রের কোনও অংশও প্রকাশ করিতে পারিব এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে অক্ষমের দুর্গোৎসবের মত আমার এই স্মৃতিবন্দনা উপচারের অভাব সত্ত্বেও আন্তরিকতার দৈন্য প্রকাশ করিবে না।

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে হইলে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রীয় যুগে যাইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ যে বিস্ময়কর উন্নতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তথাপি মানবের স্মৃতিশক্তি সীমাবদ্ধ, এবং কালের অমোঘ চক্রাবর্ত্তে অতীত যতই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে, ততই তাহার আলেখ্য অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসে। বঙ্কিমের অভ্যুদয়ে যে মধ্যাহ্ন দিনালোকে বাংলা সাহিত্য উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, আজ কত জনে তাহার সে দুর্নিরীক্ষ্য তেজ কল্পনায় আনিতে পারে? অক্ষয়চন্দ্রের অবদানের প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য বুঝিতে হইলে, মানসপটে আঁকিতে হইবে বঙ্কিম-মণ্ডলের সেই সুষমাশ্রেণীমণ্ডিত চিত্র। বাংলা সাহিত্যের অদৃষ্টে তেমন অপূর্ব যোগাযোগ বহু ঘটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, চন্দ্রনাথ বসু, ভূদেব, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে লইয়াই সেই মহিমোজ্জ্বল মণ্ডল গঠিত হইয়াছিল।

হিন্দু জানে যে, কোনও দেবতাকে পূজা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার আবরণ দেবতাগণকেও পূজা করিতে হয়। আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিম যুগ যাঁহাদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া আজিও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, আমরা তাঁহাদের পূজা করিতে বিরত হইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপার্থিব প্রতিভার কথা মনে হইলেই 'বঙ্গদর্শনে'র কথা মনে পড়ে। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' যাঁহাদিগকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করিলেই, বঙ্গভাষার জয়যাত্রা আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি একদিন আমাদের বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশ ভাস্বর করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একতম ছিলেন মনীষী অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্রের সহযোগিতার কথা আমরা বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠান পত্রেই প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় গদ্যলেখক বঙ্গদেশে খুব অল্পই জন্মিয়াছেন। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' এক অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। এমন লেখা আর জন্মে নাই। সেই কমলাকান্তের দপ্তরের একটি প্রবন্ধ 'চন্দ্রালোকে' অক্ষয়চন্দ্রের রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তে যে অপূর্ব গদ্য কবিতার সৃষ্টি করিলেন, তাহার সঙ্গে সুর মিলাইবার স্পর্দ্ধা আর কাহারও ছিল না।

চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে তাহার মধুরতা আছে, কিন্তু গভীরতা নাই। সেই বঙ্কিমমার্কা মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের একত্র সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই অক্ষয়চন্দ্রে। আমার মনে হয়, বঙ্কিম-মণ্ডলের মধ্যে একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই বঙ্কিমের নিকটে পৌঁছিবার শ্লাঘা অর্জন করিয়াছিলেন। উভয়েই সাহিত্য-স্রষ্টা, উভয়েই সমালোচক। নদী যেমন কূল ভাঙ্গিয়া আপনার পথ করিয়া লয় এবং পরে উভয় কূলের বহুদূর পর্যন্ত শস্যশালী করিয়া দেয়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই সেইরূপ সমালোচনের‘প্রহরণ’ হস্তে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সাহিত্যের গতিভঙ্গী নির্দেশ করিয়া সৃষ্টি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। উভয়ের গদ্য অনবদ্য এবং উভয়ের প্রদর্শিত আদর্শ অদ্যাপি চলিতেছে। এক দিকে সাধুভাষা, অপরদিকে চলিত ভাষা—এইগঙ্গা যমুনার ধারা সংযোগে ইঁহাদের রচনা বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় যুগ প্রবর্ত্তন করিল। ইহার ছন্দ, লীলায়িত গতিভঙ্গী এবং সরস শব্দ-নির্বাচনী শক্তির জন্য এই যুগের বাংলা আমাদের ভাষার ইতিহাসের গতি দ্রুত করিয়া দিল। আর একটি বিষয়েও ইঁহাদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর যে ঐতিহ্য আছে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে কোনও জাতির সংস্কৃতি হইতে হীন নহে, বাঙ্গালী যে হেয় নহে, ইহাই তাঁহারা লেখনীমুখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর জড়ত্ব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ আমরা হয়ত এইরূপ চেষ্টার সম্যক্ মর্যাদা দিতে পারিব না ; কিন্তু সেদিনে যখন বৈদেশিক সংস্কৃতির আক্রমণে আমাদের গণচেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল তখন ইহার প্রতিক্রিয়া সমাজ শরীরে অত্যন্ত শুভপ্রদ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করিলেন, অক্ষয়চন্দ্র ‘মহাপূজায়’ তাহার দক্ষিণান্ত করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ২৫ বৎসর ধরিয়া সাধারণীতে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার পুত্র বন্ধুবর অজয়চন্দ্র কতকগুলি প্রবন্ধ ছাপিয়াছেন। তাহাই আমরা ‘মহাপূজা’ নামে পাইতেছি। বঙ্কিম ও অক্ষয় প্রথম প্রথম অগস্ত-কোমতের মতের পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই বিশ্বমানবতাবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকপ্রবরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটা এই দার্শনিক মতের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় যুগপৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (Hindu culture) এর মর্মস্থল উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে মহামানবতার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেই জন্য তাঁহারা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিলেন। বস্তুতঃ কোনও জাতির আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে শুধু বিদেশীয় ভাবের মোহে ঘুরিয়া কোনও লাভ হয় না। রাজনারায়ণ বসুও এইরূপে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে দেশে বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকদের অভিমান চূর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই দুই মহাপুরুষ—বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র—যে সংস্কৃতির উৎস-সন্ধান পাইয়া ধন্য হইলেন, তাহা প্রচার করিবার জন্য উভয়ে একই পন্থা অনুসরণ করিলেন। গণজাগরণের পক্ষে সংবাদপত্রই একমাত্র প্রশস্ত পন্থা। বঙ্কিম তাঁহার সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘বঙ্গদর্শন’ বাহির করিলেন ১২৭৯ সালে ; আর অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সাধারণী’ প্রকাশ করিলেন তাহার পর বৎসর। এই দুই বন্ধু জন-শিক্ষার জন্য যে আয়োজন করিলেন, তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। ‘সাধারণী’র বৈশিষ্ট্য হইল, শুধু যে উহা সাপ্তাহিক পত্র তাহা নহে, উহাতে রাজনীতিও আলোচিত হইত। এই বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নিকট বাঙ্গালী অধিকতর ঋণী ইহা বলিতেই হয়। আজ পর্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে। পরাধীন দেশে লোকশিক্ষার একমাত্র উপায়—সংবাদপত্র। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকে সাধারণীর প্রসাদে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ঋণের কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে সাহিত্য-গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অক্ষয়চন্দ্র পরে ‘নবজীবন’ প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্মের সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই পত্রিকা সাধারণীর পর ১১ বৎসর প্রকাশিত হয়। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুজনমতের উপর

যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এই ব্যাখ্যার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারায় 'নবজীবনে'র আবির্ভাব হইয়াছিল।

এতক্ষণ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই দুই সাহিত্য-মহারথী সাহিত্য-সেবায় একই পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন। এইবারে তাঁহাদের বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় মন দিয়াছিলেন এবং তারই জন্য তাঁর নাম. প্রসিদ্ধ হইল। উপন্যাস আমাদের দেশে সুপ্ত রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্কিমের ভাগ্যে লেখা ছিল সেই সোনার কাঠি স্পর্শ করিবার কৃতিত্ব। প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা পুরুষেরা ধূলিমুষ্টি স্পর্শ করিলে তাহাই সোনা হইয়া যায়। প্রবন্ধে, কৌতুকে, রস-রচনায়, গল্প ও উপন্যাসে সব দিকে বঙ্কিমের প্রতিভা সোনা ফলাইল। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহার ললাটে যে সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাহা তাঁহার উপন্যাসের জৌলুযে ভাস্বর হইয়া উঠিল। বঙ্গবাসী বিস্ফারিত নয়নে দেখিল এক নূতন আশার নূতন আলোক! সেই আলোকে তাঁহার প্রবন্ধ, কবিতা, রস-রচনা যেমন কিছু স্তিমিত হইয়া পড়িল, অক্ষয়চন্দ্রেরও সাহিত্য-প্রতিভা সেই একই কারণে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। প্রবন্ধ যতই উৎকৃষ্ট হউক, উপন্যাসের আবেদন তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। মন মাতাইতে উপন্যাসের সমকক্ষ অন্য কিছুই ভাষার ভাণ্ডারে নাই। এই কারণেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক পরে আসরে নামিলেও উপন্যাসের প্রতিভায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ইহাই সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পরে আর এই অসাধারণ সাহিত্যিক যুগলের মধ্যে তুলনার অবকাশ বেশী রহিল না।

তাহা না হইলে, অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সর্বত্র সর্বকালে অনস্বীকার্য। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনা যুগপৎ চালাইয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে তিনি যে সম্পদ্ দিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদিন বঙ্গভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন সমাদৃত হইবার যোগ্য। শুধু সমালোচনা নহে, রসের পুর দিয়া তিনি যে সকল অপ্রিয় সত্য প্রচার করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই জাতীয় পূর্ণ-জাগরণের দিনে স্মরণ করিবার যোগ্য। অনেক স্থলে এই ব্যঙ্গ রচনায় তিনি ঈশ্বরগুপ্তের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারেন। তাঁহার 'নববাণিজ্য' 'চণকচূর্ণ' প্রভৃতি যে সে সময়ে সার্থক রচনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাঞ্চন বদলে কাচ পাইনু
পৈঁছার বদলে চুড়ি।
মুকুতা বদলে শুকতি পেলাম
হীরার বদলে নুড়ি॥

একথা সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি আছে।

অক্ষয়চন্দ্রের হাস্যরস ছিল নির্মল ও নিষ্কলুষ। সাধারণীর চানাচুরে তিনি অমৃতবাজার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সকলকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নাই! এখন সমালোচনা বলিতে যেমন গালাগালি বা দলাদলি ব্যতীত আর কিছুই বড় বুঝায় না, বঙ্গদর্শন সাধারণীর দিনে তেমনটি ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। ইঁহাদের সমালোচনায় থাকিত পাণ্ডিত্যের পরিচয়—যাহার নিকট মস্তক আপনা হইতেই সম্ভ্রমে অবনত হইয়া পড়ে। নবজীবনে অক্ষয়চন্দ্র যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজকালকার সাহিত্যে তেমনটি বড় দেখিতে পাই না। নবজীবনের দ্বিতীয় বর্ষে 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম' প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

অক্ষয়চন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি প্রথম হইতেই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে বিগ্রহের পূজা হইত বলিয়া বোধ হয়। বিজয়া দশমীর পর দিন হইতে একমাস কাল বাড়ীতে নিয়মসংকীর্ত্তন হইত এ সংবাদ তাঁহার লেখা হইতেই পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের পিতা সে সময়কার ভাল কীর্ত্তনগায়কদের বৈঠকখানায় বসাইয়া তাহাদের কীর্ত্তন শুনিতেন। অক্ষয়চন্দ্র নিজেও 'গোষ্ঠ গান' শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। পরে তাঁহার পিতার নিকট যশোহর থাকা কালে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। জগবন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাপতির

পদ সংগ্রহে যে অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার তুলনা বিরল। জগবন্ধুবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া নিজ নাম না দিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের একখানি ভদ্র মহাশয় অক্ষয়চন্দ্রের পিতাকে উপহার দেন। "সেই পুস্তক নিয়ত নাড়িয়া চাড়িয়া দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতে লাগিলাম।" (পিতা ও পুত্র) অক্ষয়চন্দ্রের এই অনুরাগ পরে অত্যন্ত আনন্দের হেতু হইয়াছিল। ইহারই ফলে তিনি জস্টিস্ সারদাচরণ মিত্রের সহযোগে প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম খণ্ডে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাস, কবিকঙ্কন প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি চুঁচড়ায় থাকা কালে স্বনামধন্য উকীল দীননাথ ধর মহাশয়ের সৌজন্যে এই গ্রন্থগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের পদসংগ্রহ দেখিয়াই মহাজন পদাবলীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কবিগুরু যে অক্ষয়চন্দ্রকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তাহাও তাঁহার চিঠিপত্র হইতে জানা যায়।

অক্ষয়চন্দ্রের নিষ্ঠা কাব্যসংগ্রহ প্রকাশেই পর্যবসিত হয় নাই। তিনি যে আদর্শ লইয়া দেশ সেবা, সমাজ সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সব দিকে বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই সেবাব্রত সাহিত্য সাধনায় সমাপ্তি লাভ করে নাই। তিনি তাঁহার পল্লীবালকদের শিক্ষার জন্য 'সাধারণী স্কুল' স্থাপন করিয়া নিজে শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন আদর্শ সমাজের মধ্যে যাহাতে অনুসৃত হয় তাহার জন্য তিনি একটি টোল স্থাপন করিয়া পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তাহা সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে, সমগ্র দৃষ্টি দিয়া ইহা দেখিতে হইবে এবং তাহা দেখিলে আজ তাঁহার জন্মশতকোৎসবে বাঙ্গালীর অশ্রুবর্ষিত পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইবে।

যে গেছে, সে চ'লে যাক্

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অস্ফুট নক্ষত্রালোকে তোমার লিখিয়া যাওয়া নাম,—
আজিকে প্রথম হেরিলাম।

ফাল্গুনের ফুলবনে বসন্তের শেষ বেলা মোর,—
পাণ্ডুর চাঁদেরে চাহি নিঃশব্দে ফেলিছে আঁখি লোর
আলো ও আঁধারে ঢাকা নিঃসঙ্গ স্বপন বুকে রাখি,—
তন্দ্রাহীন দীর্ঘ রাতি জাগি
বিগত বন্ধুরে স্মরি,
শুষ্ক শীর্ণ পল্লবে মর্ম্মরি ;
সহসা শিহরি উঠা আমার আকাশ,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস॥

খণ্ডহীন মোর অবসর।
আমার মুহূর্ত্তগুলি অলস মন্থর
পদে একে একে চলে ধীরে ধীরে—
অন্তহীন তমসার তীরে
চির বিস্মৃতির দূর দেশে,
আপনারে ডুবাতে নিঃশেষে।
নবাগত বন্ধু মোর! তবু আজ তোমারে জানাই,
যদি তুমি এসে দেখো, আমার দুয়ার খোলা, শুধু আমি নাই,
নিভে গেছে আমার দীপালী,
বুকের সৌরভ ঢালি
হেমন্ত-রাত্রির শেষে প্রভাতের নভ-নীলিমায়,
যদি শোনো তোমার বীণায়
বাজিছে আমারই নাম নয়নের জলে,
তারে মোর শূন্য গৃহতলে
হে বন্ধু, ফেলিয়া যেও। ব'লে যেও, আর যারা সব
এপথে আসিছে ঐ আশা করি—আনন্দ উৎসব:
বলিও তাদের ডাকি,—ক'রোনাক' ভুল,—
যেথা শুধু মরীচিকা বরষায় ফোটে না বকুল,
সেথা হ'তে ফিরে যাও ;—আর আসিও না,
যে গেছে সে চ'লে যাক ;—ক'রো তারে নীরবে মার্জ্জনা।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

৭

জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

"সকালে এমন গুলিয়ে গেল সব। ভাল করে' ভেবে দেখবারই সময় পেলাম না"—পাপিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন পুরন্দরবাবু—"এবার কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সত্যি।" তলিয়ে দেখবার আগ্রহাতিশয্যে একবার ভাবলেন যুগলের বাসাতেই যাওয়া যাক, কিন্তু তখনই আবার মনে হল—"না আমার বাসাতেই ও আসুক। ইতিমধ্যে আমি আমার মকোর্দ্দমার কাজ খানিকটা সেরে ফেলি।"

কাজ সারবার জন্য কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করলেন, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন যে কাজ এগোচ্ছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পাঁচটার সময় চা খাবার জন্যে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল যে সত্যিই বোধহয় তিনি নিজেই সব করতে গিয়ে আরও জটিল করে' তুলেছেন তাঁর মকোর্দ্দমাকে, তাঁর উকীল তাঁকে দেখলেই যে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে—ঠিকই করে বোধ হয়। কেন হাঁপিয়ে মরছি আমি। কথাটা ভেবেই হাসি পেল তাঁর—"একথাটা কাল মনে হলে কিন্তু কষ্ট হ'ত!" তখনই কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আবার। অধীরতা আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা জাগতে লাগল মনে—বিশৃঙ্খল পরস্পর-সম্বন্ধ-হীন চিন্তা সব—যার কোন মাথামুণ্ড নেই। ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

"নাঃ, ওই লোকটাকে চাই"—শেষ পর্য্যন্ত ভাবলেন—"ওর রহস্য সমাধান না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না।"

সাতটার সময় বাড়ি ফিরে যুগল পালিতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি, তারপর রাগ হল, তারও খানিক পরে কেমন যেন দমে' গেলেন। শেষটা ভয় হতে লাগল।

"শেষ পর্য্যন্ত কি যে হবে ভগবানই জানেন" বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন, বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। অবশেষে, নটার সময় যুগল পালিত এল। পুরন্দরবাবুর মনে হল "লোকটার যদি আমাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবে না। কিছু মাথার ঠিক নেই, একদম নেই"—কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আত্মস্থ হলেন তিনি, মনের জোর আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠেই তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুগল পালিতও একটু বাঁকা হাসি হেসে স্বচ্ছন্দভাবে বসে পড়ল সোফাটায়। তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অবাক হলেন পুরন্দরবাবু, আগের রাত্রের মতো মোটেই নয়। এ যেন অন্য লোক।

অতিশয় শান্তভাবে পুরন্দরবাবু সব বলে গেলেন। পাপিয়া কি ভাবে গেল, কত ভদ্রভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাকে, পাপিয়াকে ওখানে নিয়ে যাওয়াতে কতটা ভাল হল। ক্রমশঃ পাপিয়ার বদলে কথাটা ভবেশবাবুদের সম্বন্ধে হতে লাগল। কি চমৎকার লোক ওঁরা, তাঁর সঙ্গে কতদিনের আলাপ, ভবেশবাবু নিজে কত সহৃদয়, অথচ প্রভাবশালী লোক—ইত্যাদি। যুগল শুনে যাচ্ছিল—খুব যে মন দিয়ে তা নয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখছিল—একটা তীব্র ক্রুর হাসিও যেন উঁকি দিচ্ছিল চোখের কোণ থেকে।

"বড্ড খামখেয়ালী লোক আপনি"—বলেই অতিশয় বিশ্রী রকমের একটা হাসি হাসলে সে।

"আপনার মেজাজটা আজ যেন খারাপ বলে' মনে হচ্ছে"—পুরন্দরবাবু বললেন।

"হবেই না বা কেন! আর পাঁচজনের যখন হয়, আমারই বা হবে না কেন"—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল যুগল, মনে হল যেন ওৎ পেতে ছিল।

"তা'তো বটেই"—হেসে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু—"না, আমি ভাবছিলাম কিছু হয়েছে বুঝি"

"হয়েছে বই কি!"—যুগল এমনভাবে উত্তর দিলে যেন কোন কিছু হওয়াটাই একটা কৃতিত্ব।

"কি হয়েছে"

যুগল চুপ করে' রইল কিছুক্ষণ।

"পূর্ণবাবু শেষকালে ঠকালেন আমায়—পূর্ণ গাঙ্গুলী কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ একজন..."

"দেখা করলেন না আপনার সঙ্গে? দারোয়ান বুঝি বললে বাড়ীতে নেই"

"এবার বাড়িতেই ছিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতিও পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল—কিন্তু তিনি মারা গেছেন! কাল মহাসমারোহসহকারে তাঁর শবযাত্রা বেরুবে শুনলাম"

"সে কি! পূর্ণবাবু মারা গেছেন?"

পুরন্দরবাবু অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন, যদিও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না কিছু। "হ্যাঁ। ছ' বছর যিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাল দুপুরবেলা তিনি মারা গেছেন, অথচ আমি খবর পাই নি কিছু। কাল দুপুরবেলাই ভাবছিলাম ভদ্রলোকের খবরটা নিয়ে আসি একবার। আহা, মেনিন্‌জাইটিস হয়েছিল! দেখা করবার সুযোগ যখন ঘটল, গিয়ে মড়া দেখলুম। একেই বলে কপাল! তাদের বলে এলাম, বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের। কিন্তু ছ' বছর ধরে আমার সঙ্গে উনি যে

ব্যবহারটা করেছেন—দীর্ঘকালের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত বলুন তো। ওঁর জন্যেই আমার এখানে আসা…"

"তা আর কি হবে বলুন"—পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"উনি তো আর ইচ্ছে করে' মারা যান নি"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুগল বলে উঠল—"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছি যে!" একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি খেলে গেল তার চোখে। পুরন্দরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বিষ ক্ষরিত হচ্ছে যেন। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ থাকল না। পরক্ষণেই তাঁর অধরেও ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা ধীরে ধীরে।

"ও কথার মানে কি"—যেন কিছু বোঝেন নি এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"স্বামীর ভূমিকা মানে স্বামীর ভূমিকা—ভূমিকা"—টেবিল চাপড়ে উত্তর দিল যুগল।

"আপনি অভিনয় করছেন?"

"নিশ্চয়! শুধু অভিনয় করছি না—মহত্ত্ব-সহকারে করছি"—সমস্ত দন্ত নীরবে বিকশিত করে' একটা অতি কুৎসিৎ হাসি হাসলে যুগল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

"আপনার বুকের পাটা আছে, একথা মানতেই হবে"—পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে।

"কেন, একথা বললাম বলে? তাহলে আনান কিছু—বেশী নয় এক বোতল"

"বেশ তো, কি খাবেন আপনি"

"শুধু আমি কেন, আপনিও খাবেন আজ। খাবেন না?" একটা আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল যুগলের কণ্ঠস্বরে—চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন।

"বেশ তো। কি আনাব? শ্যামপেন?"

"হ্যাঁ শ্যামপেনই ভাল। হুইস্কি এখন চলবে না"

পুরন্দর উঠে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন।

"দীর্ঘ ন'বৎসর পরে পুনর্মিলন উৎসবটা বেশ করে' জমানো যাক—"

একটা বেখাপ্পা বেসুরো হাসি হেসে যুগল বাগিয়ে বসল।

"পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এক আপনিই রইলেন শুধু। পূর্ণবাবু গেলেন।"

কবি গেয়েছেন—

"মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বারবার—
সে তো রে ফেরে না আর যে গেছে চলে'"

ভঙ্গীভরে হাত দুটি উলটে হাসিমুখে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে রইল। "যা বলবি বলে' ফেল না ব্যাটা—ইঙ্গিত ফিঙ্গিত ভাল লাগে না আর" পুরন্দরবাবু মনে মনে বলছিলেন। রাগ ক্রমশই বাড়ছিল তাঁর, আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো" বিরক্তি চেপে পুরন্দরবাবু বললেন, "পূর্ণ গাঙুলী যদি আপনার প্রতি অন্যায়ই করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তো আপনার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আপনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন"

"আনন্দিত? আনন্দিত হতে যাব কেন"

"আমার তো মনে হয় আনন্দিত হওয়াই উচিত"

"হি—হি! আমার মনোভাব ঠিক ধরতে পারেন নি আপনি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—শত্রু মরে যাওয়া ভাল, কিন্তু বেঁচে থাকা আরও ভাল। হি—হি!"

"কিন্তু আপনি তো তাকে একটানা পাঁচ বচ্ছর দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্লান্তি আসা উচিত ছিল"—একটু অভদ্ররকম খোঁচা দিয়ে পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন।

"আপনি কি মনে করেন আমি তখন জানতাম…আমি কি জানতাম তখন?" যুগল পালিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে হঠাৎ আলোতে বেরিয়ে এল যেন সে। বেরিয়ে এসে বাঁচল যেন। এতদিন ধরে' যে জটিল প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে চাইছিল সে কিন্তু পারছিল না—হঠাৎ আড়াল আবডালে সরে' যাওয়াতে চক্ষুলজ্জার দায় থেকে সে বাঁচল যেন।

"আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো"

অপ্রত্যাশিত রকম নতুন একটা দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চেহারাই বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখভাবে কুৎসিৎ কদর্য্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পুরন্দরবাবু ঘাবড়ে গেলেন একটু।

"আপনি কিছুই জানতেন না এ কি সম্ভব?"

"আমি জানতাম সেইটেই কি সম্ভব? সেইটেই কি সম্ভব? আশ্চর্য্য লোক এই শহরের ভদ্রলোকরা! আপনাদের বিচারে মানুষে আর কুকুরে কোন তফাত নেই, আর আপনারা সবাইকে বিচার করেন নিজেদের হীন মানদণ্ড দিয়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই একথা বলছি আপনার মুখের উপর!"

প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে টেবিলের উপর। মেরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কারণ শব্দটা খুব জোরে হ'ল।

পুরন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

"শুনুন যুগলবাবু, আপনি জানতেন কি জানতেন না তা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন ভালই, যদিও…আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব কথা আমাকেই বা বলছেন কেন"

"আপনাকেই ঠিক বলছি না আমি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলি নি কিছু"—চক্ষু আনত করলে যুগল।

শ্যামপেন নিয়ে চাকর প্রবেশ করল।

"এই যে"—সোল্লাসে যুগল বলে উঠল। চাকরটা আসাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যেন।

"গ্লাস আন দিকি বাবা এইবার। বাঃ, আর কিছু চাই না। খুলেই এনেছ, বেশ বেশ। হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড—আসুন। যাও—তুমি যাও—"

চাকরটা চলে গেল। যুগলের উৎসাহ সঞ্জীবিত হল, পুরন্দরবাবুর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে চাইলে আবার।

"স্বীকার করুন"—হঠাৎ সে বলে উঠল—"স্বীকার করুন যে এসব মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় আপনার কাছে—রীতিমত প্রাসঙ্গিক, ভীষণ কৌতূহলজনক। এত বেশী যে এই মুহূর্ত্তে যদি আমি সবটা না বলে' চলে' যাই রাত্রে ঘুম হবে না আপনার"

"কি যে বলছেন"

"ঠিকই বলছি"

একটা অদ্ভুত হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আসুন সুরু করা যাক"

গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। একগ্লাস পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

"আসুন, প্রথমেই প্রিয় পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্যে পূর্ণ গ্লাস শেষ করা যাক—" বলেই গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে শেষ করে' ফেললে।

"আমি পূর্ণবাবুকে আর টানব না"

"কেন! অমন একটা পুণ্য-স্মৃতি!"

"আপনি এখানে আসবার আগেই খেয়ে এসেছিলেন একটু, নয়?"

"হ্যাঁ, একটু। কেন?"

"না, এমনি। কাল রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, আজ সকালে আরও বেশী করে' মনে হয়েছিল যে অপর্ণার মৃত্যুটা বড্ড মর্ম্মান্তিক হয়েছে, আপনার পক্ষে।"

"মর্ম্মান্তিক হয় নি তা-ই বা কে বললে আপনাকে এখন"

ঠিক যেন স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল যুগল।

"আহা, আমি সে ভাবে বলছি না কথাটা। পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে—এতবড় গুরুতর ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে থাকলে—"

যুগলের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল একটা। বাঁ চোখটা ছোট করে' কুঞ্চিত করলে সে একবার।

"পূর্ণ গাঙ্গুলীর ব্যাপার কি করে' আবিষ্কার করলাম তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয়"

পুরন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন তিনি।

"না আমার আগ্রহ হবে কেন"

"বোতল-ফোতল সুদ্ধ ব্যাটাকে এই মুহূর্ত্তে দূর করে' দিলে কেমন হয়" পুরন্দরবাবু মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। হঠাৎ সমস্ত মুখটা আরও লাল হয়ে গেল তাঁর।

"সব বলছি, ব্যস্ত হবেন না। আপনার কৌতূহল হয়েছে তা বুঝতে পারছি, হওয়াটাই তো জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ, আপনি যে একটা প্রাণবন্ত লোক তাতে আর সন্দেহ কি। হি—হি। দিন একটা সিগারেট দিন··· গত ফাল্গুনের পর থেকে আর···"

"এই যে নিন"

"গত ফাল্গুনের পর থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তার পর থেকেই উচ্ছন্ন গেছি বুঝলেন। কেমন করে' কি হল সব বলছি—শুনুন। যক্ষ্মা ব্যাধিটা, আপনি তো জানেন, ভারী এক অদ্ভুত ব্যায়রাম। যক্ষ্মা রোগী কখনও বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আসন্ন—অথচ ফট করে' যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে সে। মৃত্যুর ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আগে অপর্ণা প্ল্যান করছিল যে পনর দিন পরে সে তার পিসির কাছে বেড়াতে যাবে—পিসি থাকে ত্রিশ মাইল দূরে। অনেক মেয়ের একটা বদ অভ্যেস আছে আপনি জানেন বোধহয়—শুধু মেয়েদের কেন তাদের প্রণয়ীদেরও আছে—প্রেমপত্রগুলি তারা পুড়িয়ে না ফেলে সযত্নে রেখে দেয়। কাগজের টুকরোটি পর্য্যন্ত তুলে রাখে। অনেক সময় আবার সন তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রাখে থাক করে'। এতে যে কি সুখ পায় তারা—তা তারাই জানে। হয় তো স্মৃতিসুখ, বলতে পারি না। অপর্ণা পিসির বাড়ি বেড়াতে যাবার আয়োজন করছিল যখন মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে—তখন বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার আশা ছিল যে ভাল হয়ে যাবে। ফলে হল কি—সে যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার ড্রয়ারে রৌপ্য এবং মুক্তাখচিত একটি আবলুস কাঠের বাক্স থেকে গেল। চমৎকার বাক্সটি। চাবিও সেই ড্রয়ারেই ছিল। সেই বাক্সেই সব ছিল—সমস্ত। বিগত কুড়ি বছরের সমস্ত চিঠিপত্র সন তারিখ মিলিয়ে চমৎকার করে' গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল সে। পূর্ণবাবু একটু কবি-প্রকৃতির লোক ছিলেন (একবার একটা মাসিক পত্রে প্রেমের গল্পও লিখেছিলেন বুঝি একটা)—তাঁর চিঠি প্রায় শতাধিক ছিল—সবই তো পাঁচ বছর ধরে লিখেছেন। কতকগুলো চিঠিতে অপর্ণা আবার নিজের হাতে নোটও লিখেছে কিছু কিছু। স্বামীর দিক দিয়ে জিনিসটা বেশ উপভোগ্য—কি বলেন।"

পুরন্দরবাবু বিদ্যুৎগতিতে ভেবে দেখলেন—না, তিনি কোন চিঠি অপর্ণাকে লেখেন নি। না কিচ্ছু না। দুখানা চিঠি অবশ্য লিখেছিলেন—কিন্তু দুটোতেই অপর্ণার নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিকানা ছিল যুগলের নামে। অর্থাৎ দুটোই নিরামিষ চিঠি। অপর্ণার শেষ চিঠির উত্তরই দেন নি, দেবার প্রবৃত্তি হয় নি।

গল্প শেষ করে' যুগল মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইল। চেয়েই রইল পুরো এক মিনিট ধরে'।

"আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না যে"

"কোন কথার"

"জিনিসটা সাক্ষীর পক্ষে বেশ উপভোগ্য, কি না"

"আমি আর কি বলব"—পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং ঘরের চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"আপনি ঠিক ভাবছেন—এ লোকটা কি, ঘরের কথা বাইরে বলে' বলে' বেড়াচ্ছে! হি—হি। ঠিক ভাবছেন আপনি—আপনাকে চিনি তো—ভীষণ রুচি-বাগীশ লোক আপনি—"

"আমি কিছুই ভাবছি না। আপনার আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জীবিত কেন চাইছিলেন তা-ও বুঝতে পারছি, আপনার এ দাবীকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছে করছে—"

"আচ্ছা, পূর্ণবাবুকে পেলে কি করতুম আপনি মনে করেন—"

"তা কি ক'রে' বলব"

"আপনি বোধহয় ভাবছেন ডুয়েল লড়তুম—অ্যাঁ নয় ?"

"আঃ কি বিপদ"—একটু অধীরভাবে বলে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারিলেন না—"আমার তো মনে হয় এ অবস্থায় লোকে বাজে বকবক করে না, অতীত নিয়ে হা-হুতাশ করে না, নালিশও করে না কারও উপর, কোন রকম বাজে ভাবভঙ্গীর ধার দিয়েই যায় না—এ অবস্থায় যারা ভদ্রলোক তারা যা করবার সোজা করে' ফেলে"

"হি—হি—হি। আমি বোধ হয় ভদ্রলোক নই"

"সে আপনি বুঝুন। যদি ভদ্রলোক নন তাহলে জীবিত পূর্ণ গাঙ্গুলীকে চাইছিলেন কেন…"

"পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা অন্যায় কি ! ঠিক এমনি ভাবে এক বোতল মদ আনিয়ে খেতাম দু'জনে—"

"তিনি মদ খেতেনই না আপনার সঙ্গে"

"কেন ? আপনি খাচ্ছেন তো ! আপনার চেয়ে কি হিসেবে বড় তিনি—"

"আমিও আপনার সঙ্গে বসে' মদ খাচ্ছি না ঠিক"

একটু অপ্রতিভ ও মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন পুরন্দরবাবু।

"ও ! হঠাৎ আভিজাত্য উথলে উঠল যে আপনারও দেখছি"

"মহা জুলুমবাজ লোক দেখছি আপনি। নিরীহ স্বামী ছাড়া আপনি আর যে কিছু হতে পারেন তা ধারণা ছিল না আমার !"

"নিরীহ স্বামী ? মানে ?"—যুগল কান খাড়া করে' উঠে বসল।

"মানে খুব সরল। স্বামী বহুপ্রকার হয়—নিরীহ স্বামী একটা টাইপ।"

"আর জুলুমবাজ ? জুলুমবাজ বললেন যে এখনি—"

"ঠাট্টাও বোঝেন না। উঠুন, বাড়ি যান এবার—"

"জুলুমবাজ কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করলেন বলুন না খুলে—দোহাই আপনার !—জুলুমবাজ—অ্যাঁ—? জুলুমবাজ !"

"যথেষ্ট হয়েছে বাড়ি যান এবার। উঠুন, অনেক রাত হয়েছে।"

পুরন্দরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল।

"যথেষ্ট হয় নি মোটেই" ফোঁস করে' উঠল যুগল, "আপনার হয় তো আর ভাল লাগছে না কিন্তু যথেষ্ট হয় নি মোটেই। আমার সঙ্গে বসে মদ খেতেই হবে আপনাকে। না খেলে ছাড়ছি না। আসুন—গ্লাস নিন"

"আপনি যাবেন কি না"

"যাব। কিন্তু তার আগে মদ খাব। আর আপনাকে আমার সঙ্গে, মদ খেতে হবে। খেতেই হবে"

তার কণ্ঠস্বরে কোন রসিকতা বা ভাঁড়ামির সুর ছিল না। হঠাৎ সে অন্য লোক হয়ে গেল যেন। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"আসুন, খান এক গ্লাস আমার সঙ্গে, ক্ষতিটা কি"

পুরন্দরবাবুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল যুগল। স্পষ্ট বোঝা গেল এক সঙ্গে মদ খাওয়ার গুরুতর মানে আছে অন্য কিছু।

"কিছু ক্ষতি নেই—আসুন। কিন্তু বোতলে আর আছে কি কিছু"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'টি গ্লাস আছে। রীতিমত সভ্য রীতিতে গ্লাস 'ড্রিংক্' করতে হবে কিন্তু"

সভ্য রীতি অনুযায়ীই গ্লাস ড্রিংক করা হ'ল। শেষ করে পুরন্দরবাবু বললেন—"আচ্ছা লোক আপনি।"

যুগল নিজের রগ দু'টো টিপে চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে'। পুরন্দরবাবু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করতে লাগলেন এইবার যুগল তার শেষ এবং আসল কথাটি বলবে। কিন্তু যুগল কিছুই বললে না, চেয়ে রইল কেবল এবং একটু পরে' তাঁর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দরবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "কি বিপদ, কি চান আপনি আমার কাছে ! মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না"

"চেঁচাবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন, চেঁচাবার কি আছে। আমি মাতলামি করছি না। আপনি আমার চক্ষে এখন কি জানেন—প্রমাণ চান ?"

হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করলে। ঘাবড়ে গেলেন পুরন্দরবাবু।

"এই, এই তার প্রমাণ। আর কিছু বলবার নেই এবার আমি চললাম"

"যাবেন না, থামুন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি"

যুগল পালিত দুয়ারের কাছে ফিরে দাঁড়াল।

পুরন্দরবাবু বললেন (তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের চোখের দিকে না চাইতে)—"কাল আপনাকে ভবেশবাবুদের ওখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে, তাঁদের ধন্যবাদও দিয়ে আসবেন। ভুলবেন না, যেতেই হবে"

"নিশ্চয়। যাব বই কি। নিশ্চয়—হ্যাঁ,"—যুগল মাথা এবং হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে পুরন্দরবাবুর মনে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

"পাপিয়াও অনেক করে' বলে দিয়েছে। আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যে আপনাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব"

"পাপিয়া !"—যুগল পালিত ঘুরে দাঁড়াল ভাল করে'—"পাপিয়া ? পাপিয়া আমার কাছে এখন কি এবং কতটা তা জানেন ? কোনও ধারণা আছে আপনার" হঠাৎ পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে।

"আচ্ছা থাক—সে কথা পরে হবে, পরে হবে। আর একটা কথা শুনুন আগে—একসঙ্গে বসে' মদ খাওয়াতেই সন্তুষ্ট নই আমি," হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল এবং নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

"আবার কি চাই"

"আমাকে চুমুও খেতে হবে"

"পাগল না কি! কি বলছেন যা তা"

"হতে পারে, কিন্তু চুমু খেতেই হবে আপনাকে। থান, আসুন। এখুনি তো আমি আপনার কর চুম্বন করলাম"

পুরন্দরবাবু বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে—যুগল পালিতের মাথাটা তার বুকের কাছে পড়েছিল প্রায়—চুম্বন করলেন তাকে। মুখে ভীষণ মদের গন্ধ!

"বাস্ বাস্ বাস্ বাস্"—চীৎকার করে উঠল যুগল, চোখ দুটো জ্বলে' উঠল যেন উন্মত্ত হিংস্রতায়—"বাস্। এইবার সব খুলে বলি শুনুন—আপনাকেও সন্দেহ হয়েছিল আমার। এর পর আর কারও ওপর কি বিশ্বাস হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেললে সে। ঝর ঝর করে' চোখের জল ঝরে' পড়তে লাগল।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনিই এখন আমার একমাত্র বন্ধু"

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাতলামি করে' গেল লোকটা"—হাত নেড়ে খানিকক্ষণ পরে বললেন "নাঃ—মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয়। স্রেফ মাতলামি"। (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ব্রেটন উডস পরিকল্পনা ও ভারতবর্ষ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সকল দেশের, বিশেষ করিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাতহবিল গঠনের পরিকল্পনা রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধ দেশ। এই পরিকল্পনাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করে এবং এই সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার ব্রেটন উডস সহরে একটি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলে। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সম্মেলনে এই বিরাট দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও ব্রিটেনের নিকট পাওনা ষ্টার্লিং যথাসত্বর ফিরিয়া পাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটেনের এবং ব্রিটেনের মিত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ঔদাসীন্যে সেই আলোচনা প্রত্যক্ষ কোন ফলপ্রসব করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, ব্রেটন উডস সম্মেলনে শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয় যে, যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন দেশের শিল্পবাণিজ্যের সম্ভাবনা কার্য্যকরী করিতে একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাতহবিল ও ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক তহবিলটি গঠিত হইবে ৮৮০ কোটি ডলার মূলধন লইয়া এবং মূলধন সংগৃহীত হইবে বিভিন্ন দেশের দেয় চাঁদায়। প্রস্তাবিত তহবিল ও ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার ১২টি দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর উপরে ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, যে পাঁচটি দেশ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাঁদা দিবে তাহারা হইবে স্থায়ী সদস্য এবং বাকী চাঁদা প্রদানকারী দেশগুলির মধ্যে আর সাতটি সদস্য গ্রহণ করা হইবে। ভারতবর্ষের পরিধি, জনসংখ্যা ও বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতবর্ষকে একটি স্থায়ী সদস্য পদ দেওয়া হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে উন্নতিশীল ভারতবর্ষ এই স্থায়ী সদস্য পদলাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সম্মেলনে নির্দ্ধারিত হয় যে, ৮৮০ কোটি ডলারের মধ্যে আমেরিকা ২৭৫ কোটি ডলার, ব্রিটেন ১৩০ কোটি ডলার, রাশিয়া ১২০ ডলার, চীন ৫৫ কোটি ডলার ও ফ্রান্স ৪৫ কোটি ডলার চাঁদা দিয়া স্থায়ী পাঁচটি সদস্য পদ দখল করিবে এবং ভারতবর্ষ চাঁদা দিবে ৪০ কোটি ডলার। ফ্রান্স অপেক্ষা ৫ কোটি ডলার এবং চীন অপেক্ষা ১৫ কোটি ডলার কম চাঁদা নির্দ্ধারিত করিয়া ভারতবর্ষকে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখিলেন, অধিকাংশ ভারতবাসীর মনে এই ধারণ বদ্ধমূল হইয়াছিল।

১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর উপরিউক্ত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য হইবার শেষ তারিখ ছিল। ভারত সরকার যথাসময়ে এই সদস্য পদ গ্রহণ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের মতামত গ্রহণ করেন নাই; সময়ের অল্পতার অজুহাতে গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট হঠাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ভারতের সদস্য পদ গ্রহণের অধিকার নিজহাতে তুলিয়া লন এবং তাহার নির্দ্দেশানুসারে আমেরিকাস্থ ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারতের পক্ষে গত ২৭শে ডিসেম্বর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য পদগ্রহণে বাধ্য করেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, বিরাট আর্থিক দায়িত্বের প্রশ্নজড়িত থাকিলেও এই ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মতগ্রহণ করা হইল না, অথচ যখন পরিষদের অধিবেশন চলিতেছিল এবং যখন সত্য সত্যই মতামত বিবেচনা করিবার সময় ছিল তখন ভারত সরকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি চাপিয়া গেলেন। তৎকালীন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান তখন পরিষদের সদস্যবৃন্দকে জানাইতেছিলেন যে, সদস্যদের এ ব্যাপারে ভয় পাইবার কিছু নাই, আন্তর্জ্জাতিক তহবিল ও ব্যাঙ্কে যোগদানের শেষ সিদ্ধান্ত যাহাতে ব্যবস্থা পরিষদ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। বলা বাহুল্য, অর্থসচিব আশ্বাস দিয়াছিলেন বলিয়াই

ভারতীয় সদস্যগণ পরিষদের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে জোর করেন নাই; এখন স্যার জেরেমীর সেই কথার কোন মূল্য না দিয়া ভারত সরকার এই যে সময়ল্পতার অজুহাতে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বসিলেন, তাহাতে ভারতীয় জনমত ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মর্য্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

অবশ্য আমাদের এই অভিযোগের অর্থ ইহাই নয় যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ব্যাঙ্কে যোগ দিয়া নিঃসন্দেহে ভুল করিয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতের আর্থিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। বরং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলে চাঁদা না দিলে ভবিষ্যতে দেশবিশেষের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অধিকার সঙ্কুচিত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তজ্জন্য ভারতবর্ষের সদস্য হইবার ফল বোধ হয় ভালই হইবে। তাছাড়া ভারতবর্ষ চাঁদা দিবে ৪০ কোটি ডলার, হিসাবে অধিক চাঁদা প্রদানকারীদের মধ্যে তাহার নাম ষষ্ঠ, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম পাঁচটি আসন সংরক্ষিত হইলেও বাকী সাতটি আসনের একটি লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নাও হইতে পারে। ইহার উপর ভবিষ্যতে যে কোন সময় সদস্য পদে ইস্তাফা দিবার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভারতের ভবিষ্যতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যদি পছন্দ না করেন তাহা হইলে সামান্য আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াই ভারতের পক্ষে তহবিল বা ব্যাঙ্কের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করা চলিবে।

তবে এই আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ব্যাঙ্কের গঠন প্রণালী বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক প্রভাব পুরোপুরী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ভারতবর্ষ সদস্য পদ গ্রহণ করিয়া অবশ্যই ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের জালে জড়াইয়া পড়িল। ১৯৪৪ সালে যখন আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন ইহার ফলাফলের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া দিল্লীর বিখ্যাত সাপ্তাহিক ইষ্টার্ন ইকনমিষ্ট বলিয়াছিলেন :—**From the view point of India the monetary conference is a dismal failure if not a costly farce.** হয় তো শেষ পর্য্যন্ত এই তহবিলে বা ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য নিষ্ফল নাও হইতে পারে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ না হয় তাহা হইলে শেষ অবধি ইহা অবশ্যই প্রহসনে দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষ যোগ দেওয়ায় অনেক মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হইবে—কারণ ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে শিল্পবাণিজ্যের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ধার পাইবে। বলা বাহুল্য, এই ঋণ-লাভ ভারতের পক্ষে বড় কথা নয়, ভারতের পক্ষে বড় কথা ব্রিটেনের নিকট পাওনা দেড় হাজার কোটি টাকা আদায়। এই প্রাপ্য টাকা আদায় হইলে ভারতকে শিল্পবাণিজ্যের জন্য পরের নিকট হাত নাও পাতিতে হইতে পারে।

ভালমন্দের কথা নয়, আসল অভিযোগ হইতেছে যে, ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি না লইয়া ভারত সরকার তাড়াহুড়া করিয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক চুক্তিতে অনেক জটিল বিষয় আছে এবং সেই বিষয়গুলি ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিচারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়া কাজ গুছান ভারত সরকারের ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যেরই পরিচায়ক। ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক ষড়যন্ত্রের মূল সম্ভবতঃ রাশিয়ার চোখে ধরা পড়িয়াছে, তাই রাশিয়া এখনও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করে নাই। রাশিয়া যে সময় লইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভালভাবে আলোচনা করাইয়া লইতে চায়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এদিকে একে-তো ইঙ্গ-মার্কিন মতিগতি বিশ্বের পক্ষে ত্রাসের বস্তু, তাহার উপর একমাত্র বিরুদ্ধ শক্তি রাশিয়া যদি শেষ অবধি সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই তহবিল ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বিশ্ব নিরাপত্তার দিক হইতে নিছক প্রহসন হইয়া দাঁড়াইবে।

মোটের উপর যে ব্যাপারে রাশিয়ার মত শক্তিমান রাষ্ট্র সকল দিক হইতে চিন্তাভাবনার জন্য দীর্ঘকালের পর আবার সময় গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ন্যায় দুর্ব্বল ও দরিদ্র দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের কি আলোচনার জন্য বিষয়টি পরিষদে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল না? স্বায়ত্ত-শাসনের পথে ভারতবর্ষকে অনেকখানি আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ তথা ভারত সরকারের দিক হইতে জোর গলায় প্রচারকার্য্য চালান হয়, ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ন্যায্য অধিকার এইভাবে ইচ্ছা করিয়া সঙ্কুচিত করাই কি শাসক সম্প্রদায়ের সেই ঔদার্য্যের নমুনা?

নবগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন শুরু হইতেছে তাহাতে জাতীয়তাবাদীগণ ব্রেটন উডস চুক্তি সম্পর্কে ভারতসরকারের স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে ভারতের স্বার্থের সহিত ব্রেটন উডস চুক্তির সত্যকার সম্পর্ক বিবেচনা করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাবও আনা হইবে। আমরা আশা করি পরিষদে উভয় প্রস্তাবই গৃহীত হইবে এবং এই প্রস্তাবগুলির ফলে ভারতসরকার যদি ভারতের স্বার্থহানি করিয়াই থাকেন, তাহারা অদূর ভবিষ্যতে সেই ত্রুটি সংশোধন করিতে বাধ্য হইবেন।

নোট অর্ডিন্যান্স

যুদ্ধের সময় ভারতে যে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, উচ্চহারে আয়কর স্থাপিত না হইলে তাহা অবশ্যই আরও মারাত্মক হইত। ভারত সরকারের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় সুযোগ সম্ভাবনামত ভারতে যদি শিল্পপ্রসার হইত, তাহা হইলে যুদ্ধের পূর্ব্বের ১৭৮ কোটি টাকার নোটের পরিবর্ত্তে ১২শত কোটি টাকার নোটের প্রচলন দেশে সত্যই কতখানি আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত বলা যায় না। তবে সরকারী ঔদাসীন্যে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের সেই দুর্লভ সুযোগ যখন বাস্তবিকই ব্যর্থ হইয়াছে, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। যাহা হউক, ভারত সরকার কিন্তু মনে করেন যে ভারতে সত্যকার চালু নোটের তুলনায় বাজারে চালু নোটের পরিমাণ কম এবং যুদ্ধকালীন চোরা বাজারের কারবারীরা আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা-কর ফাঁকী দিবার জন্য অনেক

উচ্চ মূল্যের নোট ঘরে আটক করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের মতে এই সকল লুকানো নোটের পরিমাণ দুইশত কোটি হইতে তিনশত কোটি টাকা। এই সঞ্চিত নোট যাহাতে ব্যবসায়ীবৃন্দ বাহির করিতে বাধ্য হয়, তজ্জন্য গত ১২ই জানুয়ারী শনিবার ভারত সরকার পর পর দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটগুলি গণনা করিবার নির্দ্দেশ দেন এবং ৫শত, হাজার, ও ১০ হাজার টাকার নোটগুলির সহজে হস্তান্তরিত হইবার সুযোগ বাতিল করিয়া দেন।

১শত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটসমূহের লীগাল টেণ্ডার হইবার ক্ষমতা বাতিল হওয়ায় ভারতের আর্থিক বাজারে সম্প্রতি দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। যাহারা বাস্তবিক আয়কর ফাঁকী দিবার জন্য বেশী মূল্যের নোট সিন্দুকজাত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা অতঃপর নোটগুলি ভাঙ্গাইবার জন্য বাহির করিতে বাধ্য হইতেছে এবং নোট ভাঙ্গাইবার ফরম সহি করিবার সময় নোট প্রাপ্তির সূত্র পরিষ্কারভাবে লিখিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। এই সব গণ্ডগোল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেকে সঞ্চিত নোট শতকরা ৪০।৫০ টাকা ব্যজে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিতেছে, ভারতের নানা স্থান হইতে এই ধরণের বহু সংবাদ আসিয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে একই সময়ে অর্ডিন্যান্স চালু হইতে থাকায় দেশীয় রাজ্যে নোট চালান দিয়াও নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ নাই। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, হয় তো ছোট ছোট ব্যাঙ্ক এই সকল উচ্চমূল্যের নোট কিনিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী ভারত সরকার এক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোন সময় তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার অনুমতি দেওয়ায় সেই সুযোগ অনেকটা নষ্ট হইয়াছে বলা চলে। ১২ই জানুয়ারী শনিবার দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স যখন প্রকাশ হইবে বলিয়া গুজব শোনা যায়, তখন অনাগত বিভ্রাটের আশঙ্কায় উচ্চ মূল্যের নোট মালিকগণ যে কোন দামে সোনা কিনিতে ভিড় করিতে থাকে। শনিবার এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ের মধ্যে চাহিদার চাপে বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ৭৫ টাকা হইতে ১ শত টাকায় উঠিয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট মুদ্রা সঙ্কোচের জন্য এইভাবে প্রত্যক্ষ প্রয়াস দেখাইতেছেন মনে করিয়া জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হইতে কয়েকদিন শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের ধুম পড়িয়া যায় এবং অনেক নাম করা শেয়ারের লক্ষণীয় মূল্যাবনতি ঘটে। বাস্তবিক যুদ্ধের পরে ভারতে শিল্প প্রসার না হওয়া সত্ত্বেও এখনও যে শেয়ার বাজারে তেজীভাব বজায় আছে তাহার কারণ অর্থবান ব্যক্তিরা যে কোন ভাবে টাকা খাটানো অপেক্ষা শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নী করা লাভজনক মনে করিতেছেন; কিন্তু অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে ফাঁপাই টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে (কমিয়া যাইবেই, কারণ গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পিত উচ্চ মূল্যের নোটের উপর আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফাকর তো বসান হইবেই, অধিকন্তু নূতন অর্ডিন্যান্সের দ্বারা নূতন উচ্চহারে কর বসানও বিচিত্র নয়) সামান্য সুদ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের দাবী অস্বীকার করিয়া অনিশ্চিত শেয়ার বাজারে টাকা খাটাইতে লোকের ভরসা না হওয়া স্বাভাবিক।

নোট অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে টাকার বাজারেও প্রভূত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী ভারত সরকার কর্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ঐ দিন ভারত সরকারের ১৯৬০ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ২৮০ আনা সুদের ২৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রয়ের কথা ছিল, আগে এই ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় ছিল যথেষ্ট, এবার কিন্তু পুরো একদিন সময় দিয়াও ৬।৭ কোটি টাকার বেশী ঋণপত্র বিক্রীত হয় নাই।

চোরাকারবারীদের নিকট হইতে আটক টাকা বাহির করিয়া আনিলে সাধারণ বাজারের অবস্থা যে ভাল হইবে সে বিষয়ে আমরাও কোন সন্দেহ পোষণ করি না। তবে মুস্কিল হইতেছে এই যে, ভারত সরকারের আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের ফলে শুধু চোরাকারবারীরা নয়, অনেক ভদ্র ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং বিশেষ করিয়া মহিলারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছিল যে, ১০ দিনের মধ্যে ফরম সহি করিয়া নোট ভাঙ্গাইতে হইবে। যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ফরম অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই বলিয়াও জনসাধারণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছিলেন যে, ছাপার ফরম পাওয়া না গেলে টাইপ করিয়া অথবা হাতে লিখিয়া ফরম তৈয়ার করা চলিবে, কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি ভাল ভাবে প্রচারিত না হওয়ায় লোকের বিশেষ উপকার হয় নাই। ফরমে অনেক গুলি তথ্য পরিষ্কার ভাবে লিখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে, নোট কোথা হইতে কেমন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কড়াকড়িভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিথ্যা কথা বলিয়া ফরম ভর্ত্তি করিলে অপরাধীর তিন বৎসর জেল ও জরিমানা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোক ও ভদ্র নোটমালিকদের সমস্ত সংবাদ মনে রাখা নানা কারণে সম্ভব নয়, এ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ কঠোর ভাবে না করিয়া সহজ বিচার বোধ কাজে লাগান কর্তৃপক্ষের উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে নোটের ন্যায্য মালিকদের অনেকে আইনের কঠোরতাজনিত অহেতুক আশঙ্কায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করাচীর জনৈক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি জল হইয়া যাইবার ভয়ে হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে। অনেকে সময়াভাব, ফরমের অভাব, অদৃষ্ট দোষে কারাবরণের সম্ভাবনা প্রভৃতির চিন্তায় হাতের নোট যে কোন দামে বেচিয়া দিয়াছে এবং দুষ্টবুদ্ধি লোক যে জনসাধারণের অসহায়তার সুযোগে এইরূপ নোটের ব্যবসা চালাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নোট ভাঙ্গাইবার জন্য দশ দিন সময় অত্যন্ত কম বলিয়া সারা দেশব্যাপী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে এবং গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ২২শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নোট ভাঙ্গাইবার দিন বাড়াইয়া

দেন। তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগামী ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত নোট ভাঙ্গাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে ভারত সরকার বাস্তবিক কত টাকার লুকানো নোটের সন্ধান পাইলেন তাহা এখনো জানা যায় নাই। শুনা যাইতেছে ইহা নাকি মোট ১ শত টাকা উর্দ্ধ মূল্যের চলতি নোটের শতকরা ৫৫।৬০ ভাগের বেশী হইবে না। বাজারের উপর হইতে চোরাকারবার ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কমাইবার জন্য এইরূপ অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজন অবশ্যই অস্বীকার করা চলে না। তবে এখনো অনেক লোক মনে করিতেছেন যে, নোট যে কোন সময় ভাঙ্গাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গভর্ণমেণ্ট যখন একবার নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন তখন সেই নোট ভাঙ্গাইবার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করিবার অধিকার ভারত সরকারের নাই। ভারত সরকারের এই নোট অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে নোটমালিকদের পক্ষ হইতে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি ও কলিকাতা হাইকোর্টে দুইটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের মামলাটি অবশ্য বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের মামলার ফলাফল এখনো জানা যায় নাই।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের গরুর গাড়ী

ভারতবর্ষে বিপুল সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধু কর্ত্তৃপক্ষীয় ঔদাসীন্যে এতকাল কৃষিজীবনের দুঃসহ দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে। ভারতে শিল্প সমৃদ্ধি হয় নাই বলিয়াই ভারতবাসী বাধ্য হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ জীবন যাপন করে এবং পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশের অধিবাসীদের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগ বিদ্যুতের যুগ, বিমান ও মোটর গাড়ীর যুগ। এই যুগের হিসাবে ভারতের অবস্থা বিচার করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ আজও গরুর গাড়ীর যুগে পড়িয়া আছে।

অবশ্য ভারতবর্ষ যে এখনও কার্য্যতঃ গরুর গাড়ীর উপর সর্ব্বাধিক নির্ভরশীল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে বিমান পথের কথা উঠে না, রেলপথ আছে প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, মোটর পথের অবস্থা রেল পথের তুলনায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতে এখনও গ্রামাঞ্চল হইতে সহরে ও রেল ষ্টেশনে মালপত্র আনা নেওয়া করিতে গরুর গাড়ীই একমাত্র সম্বল। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশই কাঁচা রাস্তা, ভারী গরুর গাড়ী চলিয়া এই সব রাস্তায় গর্ত্ত হইয়া যায়, বর্ষাকালে জল কাদায় সেই রাস্তা অগম্য হইয়া উঠে বলিয়া গরুর গাড়ীর পক্ষেও চলাচল বিপজ্জনক হইয়া উঠে। রাস্তার এবং যান বাহনের এই অসুবিধা ভারতের আভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা হিসাবে ভারত সরকার ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লক্ষ মাইল নূতন পথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পথসমূহ লইয়া এই প্রায় ৭ লক্ষ মাইল পথ রক্ষা করা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অবশ্যই কঠিন হইবে—যদি না যানবাহন চলাচলের সুব্যবস্থার দ্বারা পথগুলিকে অক্ষত রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। গরুর গাড়ীই যে আমাদের দেশের পথের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজে কাজেই এদেশে যদি এমন গরুর গাড়ী চলে, যাহা লঘুতার জন্য পথ ঘাটের ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহা হইলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

আমেরিকায় খুব হালকা ধরণের গরুর গাড়ী চলে। ভারতে এতদিন এইরূপ গাড়ী আমদানী হয় নাই। প্রকাশ, নিউইয়র্কের ক্যাথলিক আর্কবিশপ ডেসিগনেট ফ্রান্সিস স্পেলমন হালকা ধরণের গরুর গাড়ী কিনিবার জন্য ভারতকেএক হাজার ডলার উপহার দিয়াছেন। বলা বাহুল্য উপহারের এই অর্থের পরিমাণ নগণ্য, তবে এই অর্থ দ্বারা নমুনা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় গাড়ী ভারতে আমদানী হইলে ভারতবাসী হালকা ধরণের গরুর গাড়ী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং ফলে ভারতের রাস্তাঘাট বহুলাংশে সংরক্ষিত হইয়া এদেশের অনেক আর্থিক স্বার্থ রক্ষিত করিতে পারে। শুনা যাইতেছে, বোম্বাইয়ের জনৈক ক্যাথলিক শিল্পপতি উপরি উক্ত আর্কবিশপের টাকায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে হাল্কা গরুর গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারত সরকার যদি এই গাড়ী আনয়নের ব্যাপারে উৎসাহী হন এবং ভাল হইলে নিজেদের খরচে গাড়ী আনাইয়া সেই গাড়ী সমবায়ের ভিত্তিতে চাষীদের নিকট ভাড়া দেন বা বিক্রয় করেন তাহা হইলে এই ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তর রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনার অনেক সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়।

(২৭-১-৪৬)

পরাজয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

দিকে দিকে জাগে যন্ত্রের কোলাহল ;
শ্রান্তি ভুলেছে ধরণীর নরনারী।
যন্ত্র জগত—গতি তার চঞ্চল ;
ছুটে চলে—সবে ছোটে পশ্চাতে তারই !
নিতি নব নব ধ্বংসের সম্ভার,
যন্ত্র যুগের কত বিচিত্র দান ;
গড়িতে পারে না করে শুধু সংহার,
সাজানো পৃথিবী ভেঙে করে খান খান।
যন্ত্র দানব মানুষেরই হাতে গড়া,
মানুষেরে আজ করেছে সে ক্রীতদাস—
দানবের দাপে মরণোন্মুখী ধরা
নীরবে কাতরে ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের মনে জাগে ঘোর বিস্ময়,
সৃষ্টির কাছে কী দারুণ পরাজয় !

সাময়িকী

কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে কলিকাতার সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীরা বাঙ্গালার প্রবীণতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। করুণানিধানকে সভায় হাজার টাকার একটি তোড়া এবং এক জোড়া মটকার ধুতি ও চাদর উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবি করুণানিধানকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও কবি মোহিতলাল মজুমদার অভিনন্দন পাঠ করেন। বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হইয়া কবি করুণানিধানকে বক্তৃতা ও কবিতা দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শেষে করুণানিধান এক বক্তৃতা করিয়া সকলের সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত সাহিত্যিকগণ

কবি বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙ্গালী—

বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসে এবার কয়েকজন বাঙ্গালী বিভিন্ন শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন—(১) ডক্টর বি-সি গুহ রসায়ন বিভাগে সভাপতিত্ব করিয়াছেন—ইনি ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ-ডি ও ডি-এসসি হন। বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, এখন তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের প্রধান টেকনিকাল পরামর্শদাতা (২) মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন ডাক্তার ইন্দ্র সেন। তিনি চিকিৎসা ও দর্শন উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মানাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগ তাহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। (৩) ডাক্তার কে-এন বাগচী চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে নদীয়া জেলায় তাহার জন্ম হয় ও ১৯১৫ সালে তিনি এম-বি পাশ করেন। তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষক—ঐ বিষয়ে তাঁহার মত পারদর্শিতা অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। (৪) অধ্যাপক প্রেমাঙ্কুর দে এবার শরীর-বিদ্যা বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে নদীয়া জেলার জগন্নাথপুরে তাঁহার জন্ম হয়—১৯১৭ সালে তিনি এম-বি পাশ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকরূপে সুপরিচিত।

কুমুদরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান কাটোয়ার সূর্য্যনারায়ণ টাউন হলে কাটোয়া মহকুমার কোগ্রাম নিবাসী কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে

মহকুমার অধিবাসীরা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। দীপালি সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কবিকে অভিনন্দন পত্র দান করেন। উত্তরে কবিবর কুমুদরঞ্জন বলেন—"কবিতা লেখা আমার সখ বা জীবিকা নহে, উহা আমার জীবন। উহাদের মধ্যেই আমার জীবনধারা প্রবাহিত। * * আমার পরিহাস-প্রিয় বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিসের আশায়, অজয় কূলে, বন্যা-বিধ্বস্ত কুটীরে বাস করি। আমি হাসিয়া বলি—আমি বড় দুরাকাঙ্ক্ষ। এই অজয়ের তীরে এক কবির গৃহে এক ছত্র কবিতা লিখিয়া দিতে ভগবান আসিয়াছিলেন—আমিও অজয় তীরে বাস করি, কবিতাও লিখি—তার উপর আবার আমি দীন—আমার কুটীরে দীনবন্ধুর আসার সম্ভাবনা কম নহে? এই লোভেই ত অজয়কে ছাড়িতে পারি না।"

কাটোয়ায় কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বর্দ্ধনায় সুধীবৃন্দ

প্রয়োজনীয় প্রস্তাব—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মীরাট অধিবেশনে এবার যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব বিশেষ প্রয়োজনীয়। (১) বাঙ্গালার বাহিরে যে সব বাঙ্গালী বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদের অসুবিধা, অভাব ও অভিযোগ ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। তাহার প্রতিকারকল্পে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উদ্যোগ প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের চেষ্টায় তাঁহাদের অসুবিধা দূর হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার যে সকল অংশকে রাজনীতিক কারণে আজকাল অন্য প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানের বাসিন্দাদের অসুবিধা তীব্র ও বিভিন্নমুখী—এই সকলের আলোচনা ও প্রতিবাদকল্পে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে সচেতন ও অভিজ্ঞ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এই অধিবেশন স্থির করিতেছেন যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনার জন্য কলিকাতায় এই সম্মিলনের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হউক ও নিম্ন-লিখিত কয়জনের উপর তাহার জন্য ভার অর্পণ করা হউক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত (আহ্বায়ক), শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—আবশ্যক হইলে ইঁহারা আরও অধিকসংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন (২) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় এবং তাহার অভাব ও অসুবিধা ক্রমবর্দ্ধমানহওয়ায় আমাদের এই অধিবেশন সম্মিলনকে নিম্নলিখিত তিনটি কেন্দ্র হইতে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেছেন (ক) এলাহাবাদ—মূল কেন্দ্র (খ) কলিকাতা—পত্রিকা পরিচালনা, প্রচার ও বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশ। (গ) দিল্লী—অবাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচারকল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রচেষ্টা ও তাঁহাদের প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে বিলাত ও জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত বাঙ্গালা ভাষা ইচ্ছামূলক বিষয়ের মত পড়াইবার যাহাতে ব্যবস্থা করা হয়, তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রচার। এই তিনটি কেন্দ্রেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভাব অভিযোগের ও অসুবিধার একটি রেজিষ্টার খোলা হইবে এবং সেই সকল অভিযোগের অনুসন্ধান ও প্রতিকার করার সুব্যবস্থা করা হইবে।

নেতাজীর জীবনী—

ক্যাপ্টেন সা নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করিতেছেন। ঐ পুস্তকের বিক্রয় লব্ধ অর্থ সমস্তই আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদত্ত করা হইবে। ক্যাপ্টেন সা নওয়াজের পুস্তক অবশ্যই আদৃত হইবে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শা নওয়াজ কর্ত্তৃক শহীদদের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দান ফটো—পান্না সেন

স্কটীশচার্চ কলেজে ছাত্রছাত্রীদের এক সভায় মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজের বক্তৃতা ফটো—পান্না সেন

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ২রা জানুয়ারী বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন হইয়াছে। এবার মূল সভাপতি হইয়াছেন অধ্যাপক আফজল হোসেন। অধ্যাপক হোসেন পাঞ্জাবের অধিবাসী, বয়স বর্ত্তমানে ৫৭ বৎসর, তিনি সার ফজলী হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বহুকাল পাঞ্জাবের লায়ালপুর কৃষি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ৩ মাস তিনি আমেরিকা, ক্যানাড়া ও বৃটেনের বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের খাদ্য সমস্যা ও তাহার সমাধানের কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। উহাই এখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এ সময়ে অধ্যাপক হোসেনকে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

কলিকাতায় ট্রাম সমস্যা—

গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—কর্পোরেশনের সহিত ট্রাম কোম্পানীর যে চুক্তি ছিল তদনুসারে ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কর্পোরেশনের ট্রাম কিনিয়া লওয়ার কথা ছিল—কিন্তু কর্পোরেশন ট্রাম ক্রয় না করায় ঐ চুক্তি বাতিল হইয়াছে। কাজেই ট্রাম ক্রয় সম্পর্কে যে মধ্যস্থতার ব্যবস্থা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সে বিষয়ে এখন আর কিছু করার প্রয়োজন নাই। কাজেই এখন এই বিষয় লইয়া মামলা করা ছাড়া কর্পোরেশনের গত্যন্তর রহিল না।

কাশীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠা—

গত ২রা ডিসেম্বর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়বের একটি তৈল চিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে। চিত্রখানি কলিকাতা আর্ট সোসাইটী দান করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কুমারী রমা ঘোষ কাশীতে যাইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী লইয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়াছিল। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রখানি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়কে কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর পক্ষে প্রদান করেন। স্যর মীর্জ্জা ইসমাইল চিত্র উন্মোচন করিবার সময় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর বংশের লেখক লেখিকাদের রচিত ২২৫খানি গ্রন্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে "ঠাকুর ফ্যামিলী কলেকসন" নামে পুস্তকসংগ্রহ দাতাদের পক্ষে প্রদান করেন।

পণ্ডিত মালব্যের চিত্র প্রতিষ্ঠা—

কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর ৮৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর দিলীপ দাশগুপ্ত মালব্যজীর একখানি পূর্ণাবয়বের তৈল চিত্র হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। গত ৩রা ডিসেম্বর তাহার প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট মণ্ডপে সহস্রাধিক নরনারীর ও মালব্যজীর উপস্থিতিতে চিত্র উন্মোচন হয়। চিত্রের সম্মুখে ডাল, চাল, কালজিরা, ধান দিয়া অতি বিচিত্র আলিপনা শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ ও নমিতা চাটার্জ্জি সজ্জিত করেন। এই নূতন পরিকল্পনা

সোদপুরে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক অধিবেশনে মহাত্মাজীর ভাষণ ফটো—পান্না সেন

সকল দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর সম্পাদক চিত্র প্রদান করেন এবং কলিকাতার মেয়র চিত্র উন্মোচন করিয়া মালব্যজীর গুণকীর্ত্তন করেন।

গান্ধীজীর খাদি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ　　ফটো—পান্না সেন

শিক্ষা সম্মিলন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ও ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সার সি-পি রামস্বামী আয়ার ঐ সম্মিলনে সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"কোন গভর্ণমেণ্ট বা শাসন যন্ত্র যদি শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত অন্যায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতের গভর্ণমেণ্ট তাহা করে নাই।" মাদ্রাজের গভর্ণর সার আর্থার হোপ ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া শিক্ষকদের বেতনের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর?

মহিলা সম্মিলনের প্রস্তাব—

বড়দিনের ছুটিতে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্তা হংসা মেটার সভানেত্রীত্বে যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহার মূল প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—ভা... বিলম্বিত করা কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না... গণপরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর ভবিষ্যৎ ...এর ভার দিন—ইহা সকলেই চায়। গণপরিষদ গঠনের জন্য সকল প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সারা ভারতে প্রত্যেক মানুষ আজ স্বাধীনতার দাবী জানাইতেছে। সে দাবী সত্বর পূর্ণ করা না হইলে যে ভারতের অবস্থা ভীষণতর হইবে, তাহা মনে করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হইতেছেন।

কলিকাতায় পার্লামেণ্ট-প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ফটো—পান্না সেন

সাপ্রু কমিটীর রিপোর্ট—

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সার তেজবাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহার প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। পাকিস্থান সম্পর্কে কমিটী বলেন—উহা দ্বারা ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ভারতবর্ষ অনন্তকালের জন্য পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হইবে। ভারতবর্ষকে এ ভাবে বিভক্ত

...তে গেলে ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকার যুগে ফিরিয়া যাইবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটী বলেন—উহা পরিত্যক্ত না হইলে স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বপ্নের মতই থাকিয়া যাইবে। রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া গেলে অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতা রক্ষা করা অসম্ভব না হইলেও কষ্টকর হইবে। কমিটী এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সম্রাট-প্রতিনিধির দপ্তর তুলিয়া দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে তিনি যে সার্ব্বভৌম অধিকার পাইতেছেন, উহা প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নের মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে দিতে হইবে। সাপ্রু কমিটীর সদস্যগণ একমত হইয়া যে শাসনতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলে বহু সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কথায় কেহ কি কর্ণপাত করিবে? যাহারা আমাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকার দোহাই দিয়া নানা কথা বলেন, এই রিপোর্ট তাহাদের মুখবন্ধ করিবে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে ভীষণ কাণ্ড—

চট্টগ্রাম সহর হইতে মাত্র ৫ মাইল দূরে একটি বড় রাস্তার ধারে কাহারপাড়া গ্রামে উহার নিকটে অবস্থিত সিভিল পাইওনিয়ার

চট্টগ্রামের গৃহহারা গ্রামবাসীদের উন্মুক্ত মাঠে বসবাস

ফটো—পান্না সেন

ফোর্সের সৈন্যগণ ভীষণ অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছে। ৫৬টি বাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে ৬২ পরিবারের মোট ২৭২ জন লোক গৃহহীন হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন; গ্রামের প্রায় ৫০টি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে, কংগ্রেস, মুসলমানলীগ ও কম্যুনিষ্ট সকল সম্প্রদায়ের নেতারা একযোগে দুস্থদের সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছেন। সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগ হইতেই তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অত্যাচার প্রপীড়িত গ্রাম দর্শনের পরে চট্টগ্রাম সহরের এক সাধারণ সভায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা ও শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন

কংগ্রেসের নূতন কার্য্যালয়—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় ১১৫ই ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের (সার্কুলার রোডের মোড়) বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সে দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক সভাও তথায় হইয়া গিয়াছে। বাড়ীটি বেশ বড়, কাজেই তথায় কাজের সকল প্রকার সুবিধা হইবে।

স্বাধীনতা দিবসে দেশবন্ধু পার্কে শা নওয়াজ কর্তৃক স্বাধীনতা-পতাকা উত্তোলন

ফটো—পান্না সেন

অধিক মূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার জন্য
ব্যাঙ্কের দরজায় জন সমাবেশ
ফটো—ডি-রতন

দেশবন্ধু পার্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু সম্বর্দ্ধনা
ফটো—ডি-রতন

ডায়মণ্ডহারবার জেটি ভাঙ্গিয়া
সাগর-যাত্রীদের
শোচনীয় অবস্থা
ফটো—ডি-রতন

গোয়েন্দাবাহিনীর সদস্যদের মুক্তি—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের গোয়েন্দা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান রণাঙ্গনে লাফ নদীর নিকট ধৃত হইয়া নৈনি জেলে আটক ছিলেন। তন্মধ্যে গত ২রা জানুয়ারী শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরীকে কুমিল্লায় মুক্তি দিয়া তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, হরিকান্ত দক্ষ, সুরেশ বড়ুয়া ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি দিয়া নিজ জেলা চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। খুলনার তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহট্টের অতুল চক্রবর্ত্তীও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সোদপুর ষ্টেশনে ট্রেন-কামরায় গান্ধীজী ফটো—পান্না সেন

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বালকবৃন্দ—

১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৪৫ জন ভারতীয় সদস্যকে ১লা জানুয়ারী মাদ্রাজে আনা হইয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাপান আত্মসমর্পণ করে ও মার্কিণ উড়োজাহাজে করিয়া তাহাদের মানিলায় লইয়া যাওয়া হয়। পরে যুদ্ধবন্দীরূপে তাহারা বৃটীশের হেফাজতে আসিয়াছিল।

শরৎ বসু সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার শরৎবাবুকে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১ শত ১ টাকা পূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছিলেন। সভায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্ত সদস্যগণের বসিবার জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিলাতী প্রতিনিধিদের পরিচয়—

বিলাতের পার্লামেন্টের নিম্নলিখিত ৮জন প্রতিনিধিকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া যাইবার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐদলে এক জন মহিলা আছেন তাঁহার নাম মিসেস এস-ওয়ান হেড নিকল—তিনি শ্রমিক দলভুক্ত। শ্রমিক দলের আরও ৪জন সদস্য আছেন—(১) মিঃ আর-রিচার্ডস্ (২) মিঃ আর-ডবলিউ সোরেনসেন (৩) মেজর ডবলিউ-ওয়াট ও (৪) মিঃ এ-জি-বটমলী। রক্ষণশীল দলে ২ জন—মিঃ গডসেনিকলসন ও ব্রিগেডিয়ার এ-আর-ডবলিউ লো এবং উদারনীতিক দলের মিঃ হাকিন মরিস ঐ দলে আছেন। প্রথম শ্রমিক মন্ত্রিসভায় মিঃ রিচার্ডস্ সহকারী ভারতসচিব ছিলেন ও ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—তিনি ঐ দলের নেতা হইবেন। মিঃ সোরেনসেন বহুকাল ধরিয়া ভারতের অবস্থার কথা আলোচনা করেন ও ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক আছে ও তিনি ১৯৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ পার্লামেণ্টরী কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। মিসেস নিকল শ্রমিকদলের প্রচার কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। মেজর ওয়াটের বয়স ২৭ বৎসর, তিনি ব্যারিষ্টার। মিঃ বটমলী শ্রমিক নেতা ও ব্রিগেডিয়ার লো একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি গত ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে যাইয়া বলিয়াছেন—বাঙ্গালা অতি দরিদ্র দেশ। তথায় শিক্ষা নাই, খাদ্য নাই ও বাসগৃহ নাই, সে জন্য লোকের দুর্দ্দশারও অন্ত নাই। সেজন্য গভর্ণর বাঙ্গালার সেচ ও নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে একটিমাত্র ফসল হয়, কোথাওবা তাহা ভাল হয় না। সর্ব্বত্র যাহাতে বৎসরে ২বার ফসল উৎপাদন করা যায়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্ণরের ইহা শুধু মৌখিক আশ্বাসের কথা কি না জানি না।

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের বিপদ—

গত ১৩ই জানুয়ারী শনিবার ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের জাহাজে উঠিবার ঘাটে দুর্ঘটনার ফলে ১৭০ জন যাত্রী নিহত ও ৩০০ জন আহত হইয়াছে। একবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় ও আবার বেলা সাড়ে ৫ টার সময় তীর হইতে জেটীতে যাইবার পথ মানুষের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার জন্য কাহারা দায়ী, সে সম্বন্ধে তদন্ত হইতেছে। যাহারা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেই অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গফরগাঁওয়ে পুলিসের গুলীবর্ষণ—

মৈমনসিংহ জেলার গফরগাঁও নামক স্থানে জেলা লীগ সম্মিলন উপলক্ষে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ সুরাওয়ার্দ্দী প্রভৃতি যাইলে স্থানীয় লীগ-বিরোধী মুসলমানগণ মিছিল করিয়া লীগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। উভয় দলের লোকদের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি হইলে পুলিস লীগ-বিরোধীদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে ও পুলিস পাহারা দ্বারা স্কুলগৃহে লীগের সভা করাইয়াছে। এই সংবাদ কতটা সত্য, সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত।

মহিলা সদস্যের বর্ণনা—

শ্রীমতী নিকল, বৃটীশ পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য। তিনি প্রতিনিধি দলের সহিত ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নয়া দিল্লীতে বলিয়াছেন—এই প্রতিনিধি দল বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারত সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া বৃটীশ জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিবে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে দিল্লীর এই বিরাট লাটপ্রাসাদ কলেজ বা হাসপাতালে পরিণত করার প্রয়োজন হইবে। বৃটীশ জাতি গত ১৫০ বৎসর ভারত শাসন করিতেছে—তাহার পরেও ভারতের দুর্দ্দশার শেষ নাই। ছেলেরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না—লোক রোগে ঔষধ পায় না। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক অশিক্ষিত। বিলাতের লোক শ্রীমতী নিকলের কথা শুনিবে ত?

স্বরাজ লাভের উপায়—

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ যাইবার পথে গত ২০শে জানুয়ারী ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউটে এক সভায় বলেন—ভারতবাসীকে স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রথমেই কাজ করিতে হইবে—(১) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন (২) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও (৩) আদিবাসীদের (পার্ব্বত্য জাতি) উন্নতির ব্যবস্থা। তিনি সকলকে অহিংসা ও সত্যের পথ গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে বলেন এবং ভারতের জাতীয় ভাষারূপে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। লোক দলে দলে গান্ধীজির দর্শন লাভের জন্য পথে যাইয়া ভিড় করে—তাহারা কি এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবে?

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ খ্যাতনামা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নেতা। তিনি বর্ত্তমানে আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে রহিয়াছেন। বৃটীশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেন ভারতে আসিয়া গত ১৯শে জানুয়ারী আগ্রা জেলে যাইয়া ২ ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশের সহিত কথা বলিয়া আসিয়াছেন। বিলাত হইতেও খবর আসিয়াছে যে খ্যাতনামা নেতা মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়ার মুক্তির জন্য বিলাতে আন্দোলন আরম্ভ করিতেছেন। কিন্তু ইহার কোন ফল হইবে কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মানিত—

দিল্লীতে নূতন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্যগণ গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে দলের নেতা ও মিঃ আসফ আলিকে ডেপুটী নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে কোন ভোটাভুটি হয় নাই। শেঠ গোবিন্দ দাস দলের কোষাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এন-জি-রঙ্গ, মিঃ এন-ভি-গাডগিল ও মিঃ মোহনলাল সাকসেনা দলের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও মিঃ এস-টি আদিত্যান দলের সাধারণ হুইপ এবং শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিং প্রধান হুইপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ৬২জন।

বৃটেনের আর্থিক দুরবস্থা—

বৃটেনকে এখন বার বার আমেরিকার নিকট টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। এখন এমন অবস্থা আসিয়াছে যে আমেরিকা আর কোন মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত না রাখিয়া স্বর্ণ দান করিতে সম্মত হইতেছে না। সে জন্য নাকি বৃটীশ সম্রাটের মুকুটে যে সকল মূল্যবান হীরা ও রত্ন আছে, সেগুলি আমেরিকার নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে। যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এখন দেউলিয়া অবস্থা লাভ করিয়াছে। বৃটেনকে বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া শুধু উপনিবেশ গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হয় নাই—নিজেও দারুণ দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে!

কৃষ্ণনগর কলেজে শতবার্ষিক—

গত ১৪ই জানুয়ারী নদীয়া কৃষ্ণনগরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার গভর্ণর তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রগণের মতভেদে

ফলে সেদিন কোন ছাত্র বা ভূতপূর্ব্ব ছাত্র উৎসবে যোগদান করেন নাই। সহরে সম্পূর্ণ হরতাল রক্ষিত হইয়াছিল, দোকান পাট বন্ধ ছিল, এমন কি সাইকেল রিক্সা পর্য্যন্ত চলে নাই। ছেলেরা দলে দলে মিছিল করিয়া পথে পথে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছিল। উৎসবে মাত্র কয়েকজন বৃদ্ধ ও জো-হুকুম উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ালিয়রে পুলিসের গুলী—

গোয়ালিয়র রাজ্যে বিরলা মিলে ধর্ম্মঘট হওয়ায় গত ১৫ই জানুয়ারী পুলিস শান্ত ধর্ম্মঘটীদের উপর তিন ঘণ্টা ধরিয়া গুলী চালাইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ফলে নাকি বহু লোক মারা গিয়াছে ও শত শত লোক আহত হইয়াছে। এদেশে শ্রমিক-মালিক বিরোধ হইলেই তৃতীয় পক্ষ পুলিস যাইয়া শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে এই ভাবে অশান্তি বৃদ্ধি আর কত দিন করিবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বার্ষিক কনভোকেসন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল—তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মত লোককে এই কার্য্যে আহ্বান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন। দেশসেবায় ত্যাগ ছাড়াও পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ।

গান্ধী-গভর্ণর সাক্ষাৎ—

বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজি গত ১৮ই জানুয়ারী সপ্তম বার বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ১৩৫ মিনিট কাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়াই গান্ধীজি মিঃ কেসির সহিত দেখা করেন ও কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্ব দিন শেষ বার দেখা করেন। এই সাক্ষাতের ফলে বাঙ্গালা কি সত্যই উপকৃত হইবে?

চট্টগ্রামের গ্রামে পাইকারী জরিমানা

চট্টগ্রাম কক্সবাজারে ঝিলঝাঝা গ্রামে মিলিটারী টেলিফোনের তার কাটার অভিযোগে গ্রামবাসীদের উপর ১০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদপত্র পাঞ্চজন্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। একজনের অপরাধে সকল গ্রামবাসীর দণ্ড—ইহাই বৃটীশ বিধান।

আবার যুদ্ধের কথা—

গা: ফ্রান্সের খ্যাতনামা জ্যোতিষী মঃ ডম নেরোমান বলিয়াছেন—১৯৪৬ সালের মে জুন মাসে আবার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময় যেরূপ গ্রহসমাবেশ দেখা দিয়াছিল, এবৎসরেও সেইরূপ গ্রহ সমাবেশ দেখা যায়। মঃ নেরোমান একটি জ্যোতিষ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার এই উক্তি সমগ্র পৃথিবীর লোককে আতঙ্কিত করিবে সন্দেহ নাই। নূতন যুদ্ধ বাধুক, আর নাই বাধুক, আমাদের অবস্থার যে কোন উন্নতি হইতেছে না, তাহা সকল দিক দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মনেতার আত্মসমর্পণ—

ডক্টর বা ম ব্রহ্মের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি হইয়া ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ১২ মাস কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলে তিনি ব্রহ্মের মুখপাত্ররূপে ১৯৪৩ সালে জাপানের সহিত সন্ধি করেন। তিনি এত দিন লুকাইয়াছিলেন—গত ১৭ই জানুয়ারী তিনি টোকিওতে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। জাপান আত্মসমর্পণ করার পর তিনি উত্তর জাপানের হোকাইডো দ্বীপে বাস করিতেছিলেন। টোকিওতে বৃটিশ অফিসে খ্যাতনামা ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীযুত অমর লাহিড়ী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

গান্ধীজির জেল পরিদর্শন—

মহাত্মা গান্ধী ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে যাইয়া দুই ঘণ্টাকাল রাজবন্দীদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তখন ঐ জেলে ৪৯ জন রাজবন্দী ছিলেন। ১৭ই জানুয়ারী তিনি দমদম সেণ্ট্রাল জেলে যাইয়াও ২৫ মিনিট তথায় অতিবাহিত করেন। দমদম জেলে সেদিন ২০১ জন রাজবন্দী ছিলেন। রাজবন্দীদের সহিত তিনি বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানিতে গিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ নেতা ও এম-পি—

বৃটীশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি দলের সদস্য মিঃ সোরেনসেন গত ১৭ই জানুয়ারী দিল্লীতে আজাদ হিন্দ-ফৌজের মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা কর্ণেল সাহ নওয়াজ ও মিঃ সেহগলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩৫ মিনিট কাল কথা বলিয়াছেন। মিঃ সোরেনসেন যে সকল প্রকার লোকের অভিমত জানিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যায়।

কংগ্রেসের তারিখ পরিবর্ত্তন—

আগামী এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের যে কথা ছিল তাহা হইবে না, মে মাসে কংগ্রেস হইবে—তবে কোথায় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ—

কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ গত ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পার্কসার্কাসস্থ বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রীক ও ল্যাটিনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্র তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯০৬ সালে তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন।

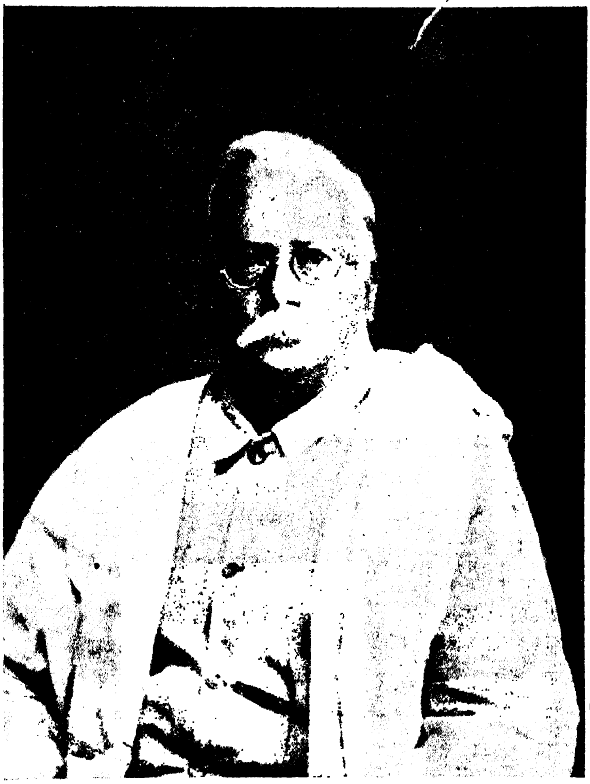

রজনীকান্ত গুহ

বোম্বায়ে কৃতী বাঙ্গালীর মৃত্যু—

বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালী জুয়েলার্স শিল্পী এবং বোম্বাই দুর্গাবাড়ী সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নীলমণি শীকদার মহাশয় "ব্রেণটিউমার" রোগে অস্ত্রোপচারের পর গত শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক, পরহিতৈষী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ডাক্তার সুরেন্দ্রকুমার বসু—

কলিকাতার বেলিয়াঘাটানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার সুরেন্দ্রকুমার বসু বিগত ৩রা পৌষ মঙ্গলবার ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি ১২৮০ সালে বসিরহাট ধলতিথার বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, ইঁহার দেশপ্রীতি, সামাজিকতা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ বসু—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ২৪শে জানুয়ারী সকালে তাঁহার কলিকাতা বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত জননায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। এম এ, বি-এল্ পাশ করিয়া তিনি এটর্ণী হন ও সারাজীবন নিজেকে জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও ১৯১৭ সালে নূতন

উদারনীতিক দলে যোগদান করেন ও বহু দিন উহার সভাপতি ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। সহরের সকল সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন না কোন সময়ে নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও

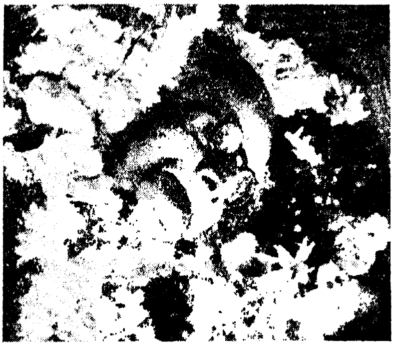

যতীন্দ্রনাথ বসু চিরনিদ্রায় অভিভূত ফটো—পান্না সেন

সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত কাঁথি তদন্ত কমিটির সভাপতিরূপে পুলিশের অনাচারের নিন্দা করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দেন। তাঁহার নেতৃত্বে উদারনীতিক দল পর্য্যন্ত সাইমন কমিশন বয়কট করিয়াছিল। তাঁহার সহৃদয় ও সুমধুর ব্যবহার সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।

ন্যাশনাল থিয়েটার—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে কলিকাতা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক ভোজ সভায় ন্যাশনাল থিয়েটার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় এক নূতন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও চলচ্চিত্রে নেতাজীর জীবন কথা প্রস্তুতের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। থিয়েটার জগতে সুপরিচিত শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র গুহ উক্ত নূতন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন। নূতন কার্য্যের জন্য কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী উহাতে যোগদান করিয়া অর্থ সরবরাহ করিতেছেন। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ইউ-স'র মুক্তিলাভ—

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ ইউ-স ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বন্দী ছিলেন—গত ২৫শে জানুয়ারী তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষ ভাগে ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসন [illegible] পরিষদ আলোচনা করিবার জন্ম তিনি ইংলণ্ডে যান—লণ্ডন হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইউগাণ্ডায় আটক রাখা হইয়াছিল। এখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় মেজর জেনারেল সা-নওয়াজ—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসবে যোগদানের জন্য আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্যতম নায়ক মেজর জেনারেল সা নওয়াজ গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বাবুর ১নং উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে বাস করেন। ঐ দিনই তিনি ৩৮।২ এলগিন রোডে যাইয়া সুভাষচন্দ্রের শয়ন কক্ষখানি দর্শন করেন—তথায় যাইয়া তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যায়। ঐ স্থানে সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা বেলা মিত্র নিজের হাতের আঙ্গুল কাটিয়া সাহ নওয়াজের ললাটে রক্ত তিলক দান করেন। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট তিনি বলেন—কংগ্রেসই আমার অস্থি মজ্জা। পরদিন বুধবার নেতাজীর জন্মদিবসে মেজর জেনারেল সাহ নওয়াজকে লইয়া কলিকাতা সহরে এক তিন মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ঐ শোভাযাত্রা দেশপ্রিয় পার্ক হইতে রাসবিহারী এভেনিউ, রসা রোড, সার আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া দেশবন্ধু পার্কে গমন করিয়াছিলেন। এরূপ সুবৃহৎ ও সুনিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রা কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। দুই ধারের পথে ও বাড়ীগুলিতে এরূপ জনসমাগমও কখনও দেখা যায় নাই। বেলা ২টায় শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রাত্রি ৮টার দেশবন্ধু পার্কে গিয়া পৌছিয়াছিল। ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, তিন শত স্বেচ্ছাসেবিকা, এক হাজার শিখ ও খালসা, দুইশত অহ্রর ও আজাদ মসলেম, ২৩০ খাকসার, ৩০ জন অশ্বারোহী, ৫০ জন সাইকেল আরোহী, ৫ জন মোটর সাইকেল আরোহী ঐ দলে ছিলেন। ৩টি লরীতে ৮০ জন আজাদ হিন্দ সদস্য ও একখানি মোটরে সাহ নওয়াজ ছিলেন। একটি শিখ ও একটি বাঙ্গালী কিশোর বাহিনীও শোভাযাত্রার মধ্যে ছিল।

বুধবার শোভাযাত্রার পূর্ব্বে সাহ নওয়াজ নেতাজীর বাসগৃহে যাইয়া বলেন—"আমি চিরদিন আমার নেতাজীর অনুগত ও বিশ্বস্ত সৈনিক থাকিব এবং আমার ৪০ কোটি দেশবাসীর পূর্ণ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইব। আমি আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিব এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের

জন্য নেতাজীর নেতৃত্বে আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। নেতাজী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বৃহস্পতিবার বিকালে দেশপ্রিয় পার্কে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে সাহ নওয়াজকে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তথায় কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন; তথায় সাহ নওয়াজ বলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান ও তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইবে। ইংরাজেরা যতদিন থাকিবে ততদিনই এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে।"

সন্ধ্যায় কলিকাতার সেণ্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিসে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সাহ নওয়াজকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্টের ডাক-টিকিট ফটো—পান্না সেন

করা হয়। ঐ দিন স্কটীশ চার্চ্চ কলেজেও এক ছাত্রসভায় সাহ নওয়াজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তথায় তিনি বলেন—যে কেহই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করিবে, সে নিজের ভ্রাতা হইলেও তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে হইবে। শুক্রবার অপরাহ্নে হাওড়া ময়দানে ডালমিয়া পার্কে সাহ নওয়াজকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তথায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মানপত্র দেন। সাহ নওয়াজ তথাও বলেন—"হিন্দু, মুসলমান, শিখ—ভারতের সকল সন্তান—সবাই একত্রে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও—আমাদের সকলকে আজ এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে।" ঐ দিন দ্বিপ্রহরে দেশবন্ধু পার্কের এক ছাত্রসভাতে সাহ নওয়াজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শনিবার সাহ নওয়াজ বাঙ্গালা ত্যাগ করেন। যাইবার সময় তিনি বলেন—"ভগবানের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে—তিনি যেন আমাদের নেতাজীকে সশরীরে ও নিরাপদে তাঁহার স্বদেশে আনিয়া দেন।"

ঐ দিন তিনি সকালে দেশবন্ধু পার্কে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও নেতাজীর পরিকল্পিত মহাজাতি সদন পরিদর্শন করেন।

কয়দিন সাহ নওয়াজের কলিকাতা বাস উপলক্ষে সারা সহরে এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি—

সাড়ে ৩ বৎসর কাল গোপনে থাকার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ আসফ আলির পত্নী শ্রীযুক্তা অরুণা গত ৩০শে জানুয়ারী প্রথম কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল, গভর্ণমেণ্ট সেগুলি প্রত্যাহার করিয়া

৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কের সভায় শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি ফটো—পান্না সে

লইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে—বাঙ্গালা ত্যাগের পূর্ব্বে তি বাঙ্গালীকে আবার ১৯০৫ সালের মত বিদেশী পণ্য বয়কট গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা দেশ পার্কেও তিনি ১৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তি ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা সত্যই অসাধা ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তি আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

পানিহাটীতে মহাত্মা গান্ধী—

প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ২৪পরগণা পানিহাটী গ্রামে আগমন করিয়া রাঘব পণ্ডিত নামক এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে পানিহাটীতে তাঁহার স্মরণ মহোৎসব হইয়া থাকে। মহাপ্রভু গঙ্গার যে ঘাটে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া যে বটবৃক্ষতলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ৫ শত বৎসরের পুরাতন সে ঘাট ও বটবৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান। রাঘবের গৃহে এখনও নিত্যসেবার

পানিহাটী বটতলায় মহাত্মাজীর মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ব্যবহৃত পুঁথী, ছিন্ন কন্থা, খড়ম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিদর্শন

ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়

হা আছে, ঐ গৃহের বহু প্রাচীন মাধবীকুঞ্জ ভক্তমাত্রকেই তথায় র্ষণ করে। ব্যারিষ্টার-কবি পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র াস মহাশয় এবার মহাত্মা গান্ধীকে ঐ স্থান দর্শন করিবার জন্য রোধ করিয়া এক কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি মহাত্মাজীকে ১৫ই জানুয়ারী পড়িয়া শুনান হইলে তিনি পানিহাটী দর্শনের াহ প্রকাশ করেন। পানিহাটীর কথা যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থে আছে, সেই গ্রন্থগুলিও মহাত্মাজীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে দেখান হয়। গান্ধীজি পানিহাটীর তীর্থ দর্শন করিবেন জানিয়া পানিহাটীতে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। সোদপুর খাদিপ্রতিষ্ঠান হইতে পানিহাটীর গঙ্গার ঘাট পদব্রজে মাত্র ২০ মিনিটের পথ। পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ দুই দিন অহোরাত্র লোকজন খাটাইয়া গান্ধীজির গমন-পথ সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। পানিহাটী নিবাসী সুপণ্ডিত প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা, লাঠি, জপের মালা, মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর প্রভৃতি গান্ধীজিকে দেখাইবার জন্য যথাসময়ে বটতলায়

পানিহাটীর বটতলায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর প্রশ্ন

ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়

এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। গত ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টায় সময় মহাত্মাজী সঙ্গীগণের সহিত পদব্রজে পানিহাটী বটতলায় আগমন করেন। রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত অমূল্যধন রায় ভট্ট, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বটতলায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি বটবৃক্ষ পরিক্রমা করিবার পর ২০ মিনিট দণ্ডায়মান থাকিয়া

প্রদর্শনীর জিনিষগুলি দর্শন করেন ও সে সম্বন্ধে সকল তথ্য শ্রবণ করেন। সেদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে পানিহাটীবাসী ছাত্রগণ গান্ধীজির গমনাগমনের সমস্ত পথটি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এই দেড় মাইল পথ বহু তোরণ দ্বারা সাজান হইয়াছিল এবং পথপার্শ্বের প্রত্যেক গৃহের অধিবাসী নিজ নিজ গৃহ পুষ্প পতাকায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে নরনারী নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গান্ধীজিকে দর্শন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গান্ধীজি তীর্থক্ষেত্রে উপবেশন পর্য্যন্ত করেন নাই—তিনি পুনরায় পদব্রজেই সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

সুদীর্ঘকাল পথ চেয়ে আছে সে কি গো আসিবে ফিরে,
অতীতের স্মৃতি মনে করি ভাসে, পানিহাটী আখিনীরে।
সে মোহন তনু, আলু থালু বেশ, নয়নে আবেশ আঁকা
মাধবীকুঞ্জ প্রহর গুণিছে, কবে সে উদিবে রাকা ?
মনের পরশে ভোলে না মাধবী, চায় সে পাগল চাঁদে,
নিত্য নিতুই আসে আর যায়, প্রাণ তাই আরো কাঁদে,
গোটা সে মানুষ, সুঠাম সুতনু, দেবে না আলিঙ্গন ?
ঘন সুনিবিড় পাতাগুলি কাঁপে, রহি রহি অনুখন।
অদূরে পতিতপাবনী গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
এই বাঁধা ঘাট, এই সেই বট, দাঁড়ায়ে নদীর তীরে।

পানিহাটীর বটবৃক্ষতলে মহাত্মাজী ফটো—তারক দাস

দাশগুপ্ত মহাশয় গান্ধীজির সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া তাঁহার তীর্থ দর্শনের সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের যে কবিতা গান্ধীজিকে পানিহাটীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সোদপুরে এসে একদিনও তুমি এলে নাকো পানিহাটী
আমার প্রভুর পায়ের পরশে সোনা হল যার মাটী।
হেথায় রাঘব ভবনে নিত্য প্রভুর আবির্ভাব
এত কাছে এসে সেথা কি যাবে না ? এ বড় মনস্তাপ।

এই ঘাটে প্রভু নেমেছিল আসি, নিতাই-এ সঙ্গে করি,
চরণ পরশে ধন্য এ ঘাট, হেথা বেঁধেছিল তরী।
রাজার কুমারে বাঁধিতে নারিল, রমণী রাজ্যসুখ
দড়ির বাঁধনে বাঁধিতে চাহিল, স্নেহাতুর মার বুক।
ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম জায়া
এ সব ফেলিয়া রঘুনাথ শুধু চাহিল—চরণ ছায়া।
বাপুজী, বাপুজী, আমাদের এই একান্ত নিবেদন,
ক্ষণতরে তুমি পানিহাটী যেয়ো জুড়াইতে তনু মন।

দেখিও কাঙাল দরিদ্র এক ভক্ত নিভৃত কোণে
প্রভুর পাদুকা বুকে করি নাম জপিতেছে মনে মনে।
কুড়ায়ে রেখেছে পরম যতনে ছিন্ন কন্থাখানি,
সন্ন্যাসী বেশে শ্রীঅঙ্গে যাহা গোরা নিয়েছিল টানি,
এর পথ ঘাট, প্রতি ধূলি কণা, মুক্তার চেয়ে দামী
এই ধূলিতেই আমার প্রাণের দেবতা এলেন নামি।

সোদপুর হতে বেশী দূরে নয়—এই পথ গেছে গাঁয়ে
একদিন তুমি অতি প্রত্যুষে দাঁড়াইয়া বটছায়ে,
বাঙ্গালীর এই পরমতীর্থে ভরা গঙ্গার কূলে
বাঙ্গালীর-প্রাণ-শতদলটিরে যতনে লইও তুলে।
তুমি ভারতের মহান আত্মা, শক্তির মূলাধার,
অকপটে তাই করিনু জ্ঞাপন যাহা ছিল বলিবার।
তোমারে স্মরণ করানু বলিয়া আমারে করিও ক্ষমা,
করিও পরশ মাধবীকুঞ্জ, বটেরে পরিক্রমা।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি—

গত ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত জি ভি মাবলঙ্কার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ৬৬ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ৬৩ ভোট পাইয়াছেন। লেঃ কর্ণেল জি-সি চট্টোপাধ্যায় ঐ দিন পরিষদে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মাবলঙ্কার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

বোম্বায়ে পুলিশের গুলী—

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র দিবস উপলক্ষে বোম্বায়ে শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ নানাস্থানে গুলী চালাইয়াছে। ৪।৫ দিন ধরিয়া সহরের যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিল ও প্রত্যেক দিনই জনতার উপর নানাস্থানে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। এখন যে আর লোক মরিতে ভয় করে না, তাহা সর্ব্বত্রই প্রমাণিত হইতেছে।

সিঙ্গাপুরে বন্দী আটক—

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ৬০৫ জন লোককে গত ১১ই জানুয়ারী ব্যাঙ্কক হইতে ভারতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যপথে সিঙ্গাপুরে জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া হইয়াছে ও তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করা হইয়াছে। ভারতে আনিয়া তাহাদের বিচার করা হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, এখন নাকি তাহাদের সিঙ্গাপুরেই বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ দলে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর সিং, মিঃ করিম গণি ও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আছেন।

স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠান—

এ বৎসর ২৬শে জানুয়ারী যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। ভারতের প্রায় প্রতি গৃহে সেদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে এবং প্রতি ভারতবাসী সেদিন কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতার বাণী পাঠ করিয়াছেন। সমগ্র ভারত যে আজ একযোগে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর, তাহা স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষ—

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ইংরাজ বর্ষে আবার ভীষণতর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া চারিদিক হইতে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাশ এবার বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে যে তাহার ফলে ভারতের ১০ কোটী লোককে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ বি-আর সেনও আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় ঘুরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন যে মেদিনীপুরে এখনই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাঁকুড়ায় পূর্ব্বেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান সাহায্য দান কার্য্যে ব্রতী আছেন। মেদিনীপুরেও অবিলম্বে সাহায্যদান কার্য্য আরম্ভ করার প্রয়োজন হইয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশের অবস্থা—

সিন্ধুপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। তথায় বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ—কংগ্রেস—২২, মুসলেম লীগ—২৭, জাতীয়তাবাদী মুসলমান—৪, সৈয়দ দল—৪ ও শ্বেতাঙ্গ—৩। মোট সদস্য সংখ্যা—৬০। সৈয়দ দল কংগ্রেস বা মুসলেম লীগে যোগদান করিবেন না—তাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের মিলিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সমস্যা সমাধানের জন্য সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল তথায় গমন করিয়াছেন।

কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক অভিনব প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সিপাই যুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাতীয় জাগরণ আন্দোলনের ইতিহাস তথায় চিত্র দ্বারা দেখান

দেশবন্ধু পার্কে ছাত্রসভায় মেজর জেনারেল শা নওয়াজের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন

GOVERNMENT LIBRARY Behar

[illegible] গো-শকটের বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—পান্না সেন

হইয়াছে। ৬৮ জন শিল্পী ১৭৫ খানি চিত্রে ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী কলিকাতায় স্থায়ীভাবে দেখাইবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাহাতে এইরূপ প্রদর্শনী দেখান হয়, সে বিষয়েও জনগণের চেষ্টা করা উচিত। এই প্রদর্শনীর জন্য আমরা উদ্যোক্তাদিগকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

এক বৎসরেরও অধিককাল আমেরিকা-বাসের পর শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত ১৯শে জানুয়ারী এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এরোড্রোমে উপস্থিত ছিলেন। নামিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন—আমেরিকার লোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুধু মিথ্যা কথা জানানো হয়, তাহারা ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমেরিকাকে ভারত সম্বন্ধে সত্য কথা জানানো প্রয়োজন।

শিরোহীর শাসকের মৃত্যু—

শিরোহী রাজ্যের শাসক অসুস্থ হইয়া কিছুকাল দিল্লী ২০ নং আলিপুর রোডে স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। গত ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মুসলমান সেক্রেটারী তাঁহাকে মুসলমান প্রথানুসারে কবর দেন। ইতিমধ্যে রাজ্যের ২জন মন্ত্রী আসিয়া মৃতদেহ রাজ্যে লইয়া গিয়া হিন্দু প্রথানুসারে দাহ করিবার দাবী করেন। তাহাদের মৃতদেহ দেওয়া হয় নাই। উক্ত শাসক রাজপুত বংশীয় ছিলেন।

ঝিকরগাছায় আই-এন-এ—

গত ২৯শে জানুয়ারী সিঙ্গাপুর ও শ্যাম হইতে ১৪শত আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ বন্দীকে যশোহর-ঝিকরগাছা বন্দীনিবাসে রাখা হইয়াছে। তথায় যে ৫শত বন্দী ছিল, তাহাদের অন্য কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এখনও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কত লোক বন্দী হইয়া আছেন, কে জানে?

নেতাজীর জন্মদিবস—

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র দিনটি পালিত হইয়াছে। ভারতের সকল অধিবাসীর গৃহ সেদিন উৎসব উপলক্ষে সাজান হয় ও সকল গৃহে সন্ধ্যায় আলোকমালা দেওয়া হয়। সর্ব্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া নেতাজীর জীবন-কথা আলোচিত হয়। বেলা দেড়টার সময় নেতাজীর জন্মসময় বলিয়া সকল গৃহ হইতে একযোগে শঙ্খধ্বনি করা হইয়াছিল। এরূপ জন্মোৎসবও ভারতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই!

দেবানন্দপুরে স্মৃতিমন্দির—

গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি হুগলী দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকট এক স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় উৎসবে পৌরহিত্য করেন ও খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান প্রতিনিধিরূপে উৎসবে বক্তৃতা করেন। ঐ উপলক্ষে বহু খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবী সেদিন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি দল—

বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দল জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কয়েকজন নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কয়েকটি গ্রাম দেখিয়া ও কয়েকজন প্রতিনিধির নিকট নিবেদনের পালা শুনিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যে বিবরণ পেশ করিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষকে নূতন শাসনব্যবস্থা দানের কথা স্থির হইবে।

নেতাজীর পায়ে লুটায় এ শির শ্রদ্ধায় অবনত !

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

রাজপথে কাল ডঙ্কা বাজায়ে যাহারা চলিয়া গেল—
বক্ষ তাদের নহেক বর্ম্মে ঢাকা ;
মাথার উপরে জাতীয় পতাকা শুধু গৌরব দোলে,
চক্ষে তাদের নবীন-আলোক মাখা !
নাই হাতিয়ার, নাইক কামান, গ্যাস, বিষ কিছু নাই,
তবুও তাহারা সকল তুচ্ছ করি ;
শঙ্কা-বিহীন সৈনিকদল যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটে—
নবীন আহবে জয় করিবারে অরি।
সিংহল-জয়ী বিজয়সিংহ, শিবাজীর আশা নিয়ে,

চলিল তাহারা লক্ষ্যের পানে ধেয়ে—
কল্‌কাতা থেকে চলিল কি তারা দূর দিল্লীর পানে ?
কদম্ কদম্ সদর্পে গান গেয়ে ?
নাই তাহাদের নেতাজী, তবুও ঘটে আর পটে পূজো,
ফুলের বদলে তাজা প্রাণ নিয়ে ছোটে,
জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী, সমবেত রোল তোলে,
বাংলার বুকে নতুন আলোক ফোটে !
বিস্ময়ে হেরি নবীন-যুগের এমনি সূচনা যত ;
নেতাজীর পায়ে লুটায় এ শির শ্রদ্ধায় অবনত !

I have failed

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শা নওয়াজ খানের কথা আমাকে আগে বা পরে অনেক বলিতে হইবে। এই মানুষটিকে জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজার প্রতি আনুগত্য, তাহার নিয়োগকর্ত্তাদের প্রতি আনুগত্য, সহকর্ম্মিগণের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করিয়া, সমর-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ঠ্য শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া এই লোকটি রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল; সাম্রাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অস্ত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; সেই রণরঙ্গে তাহার সহসৈনিকদের হত ও আহত করিয়াছিল। দিল্লীর লালকেল্লায় শা নওয়াজ খান, ধীলন ও সায়গলের বিচার হয়। বিচারফল যাহাই হৌক, সর্ব্বাধিনায়ক (কমাণ্ডার-ইন্‌চীফ) তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ২২এ জানুয়ারী শা নওয়াজ খান কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ২৩এ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব হইতে ২৬এ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরী, সুভাষের ভারতীয় বাহিনীর মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শা নওয়াজ খানকে কেন্দ্র করিয়া উল্লাসে, উৎসাহে, আনন্দে উদ্বেল, উৎফুল্ল ও মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। শা নওয়াজ খান উডবার্ণ পার্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

জেনারেল শা নওয়াজের কপালে রক্ত তিলক দান ফটো—পান্না সেন

তিনি বিমানে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দম দম বিমান কেন্দ্র হইতে বন্ধু পরিজনগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উডবার্ণ পার্কে আনয়ন করেন।

শ্রীমতী অমিতা মিত্র নেতাজীর সহচর বীরকে বরণ করেন। বরণ প্রথা আমাদের প্রথা—ভারতবর্ষে—বাঙ্গলাদেশে বর বরণ, কন্যা বরণ, গুরু পুরোহিত বরণ হইতে বীর বরণ—রাজ বরণ প্রথা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গল্প কথায় শুনিয়াছি, এই মহানগরীতে, ইংলণ্ডের রাজা ও রাজকুমারকে কোনও সময়ে কেহ কেহ বরণ করিয়াছিল। বীর-বরণের ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। জানা নাই এই কারণে যে, বীর আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারেন এমন বীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘকালের কলঙ্ককালিমাচ্ছন্ন ঘৃণিত ইতিবৃত্তের অবসানে বাঙ্গালী বীরত্বের সন্ধান পাইয়াছে; শৌর্য্যের গৌরব দীপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বীর্য্যের সুষমা বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া বঙ্গদেশকে মাতাইয়া দিয়াছে। তাই আজ বঙ্গ রমণী তাহার বরণডালা করে বীর বরণে অগ্রসর হইয়াছে। অমিতা আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। শোণিত লিখায় শা নওয়াজ খানের ললাটে রাজটীকা—বীর লিখা আঁকিয়া দিয়াছেন।

বীর-জায়া বীরের মর্য্যাদা বুঝে। তাই চন্দন-লিখায় তাহার মন উঠে নাই; সিন্দুর বিন্দু অমিতার মনঃপুত হয় নাই। নিজ চম্পক-অঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তের তিলক লিখিয়া দিয়াছে। এই অমিতার স্বামী বৃটীশের আদালতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গান্ধীজী বৃটিশের নিকট তাহার হইয়া অনুকম্পা যাঞ্চা করিয়াছিলেন; বৃটিশ গান্ধীজীর আকুতি অবহেলা করে নাই, মুক্তি ভিক্ষা দিয়াছে! হরিদাস মিত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হরিদাসের অপরাধ, সে নাকি বৃটিশের শত্রুর সহিত সংযোগ

স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল। অপরাধ গুরুতর—সন্দেহ নাই; কিন্তু উদ্দেশ্য,' আত্মস্বার্থ নহে, আত্মহিত নহে, ভারতের উদ্ধার সাধন; স্বদেশের মুক্তি কামনা।

কে বলিতে পারে, সুন্দরী বঙ্গরমণীর করধৃত বরণডালাখানা যখন বীর বরণ করিতেছিল তখন কারান্তরালবাসী আর একজন বীরের কথা শীতের কুজ্ঝটিকার মত তাহার অন্তরতলে অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছিল কি না! উদাস দুটি নয়নের নীচে বিচ্ছেদ সাগর তরঙ্গায়িত হইতেছিল কি না—তাই কে বলিতে পারে! কম্পিত দুখানি অধর-ওষ্ঠের তলে রোদনসমুদ্র আছাড় বিছাড় করিতেছিল কি না কেই বা তাহা বলিতে পারে? কেহ না! তাহার ব্যথা সেই জানে! কিন্তু বাঙ্গলার মেয়ে বাঙ্গালীর বধূ, আপনাকে বিলোপ করিতে তাহার বিলম্ব হয় না।

দেশপ্রিয় পার্কে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ কর্ত্তৃক শা নওয়াজকে শ্রদ্ধানিবেদন   ফটো—পান্না সেন

বরণ-অন্তে শা নওয়াজ খান বলিলেন, নেতাজীর বাড়ী?

ঐ—কাছেই।

কেহ আনিল গাড়ী, কেহ বলিল, একটু বিশ্রাম—

"দেবতার মন্দিরে কি গাড়ীতে যাইতে আছে! বিশ্রামের অনেক সময় পাওয়া যাইবে। নেতাজীর বাড়ী সর্ব্বাগ্রে!"

বন্ধুবৃন্দ সঙ্গে চলিলেন। তত ক্ষণে পথ জনারণ্যে পরিণত। মহানগরীর একাংশ যেন এইখানে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সেই কক্ষ! কতদিন, কত কাজে, কত হর্ষ বিষাদে, কত বার গিয়াছি! উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, মিত্র বৈরী, দেশী বিদেশী কত লোক কত ছলে কত বার গিয়াছে—সেই কক্ষ! এই সেদিন গান্ধীজী এই কক্ষে আসিয়া কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। সেই ঘর তেমনই সজ্জিত—শোভিত, মনে হইবে, সুভাষচন্দ্র বুঝি বাহিরে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন। সেদিনও জনতা জমিত; আজও জনতা অপেক্ষমান। কেদারার উপরে সুভাষের সেই ছবিখানি—কেশবিরল গৌরসুন্দর আনন, খদ্দরের অঙ্গ-বাস; আজ একটি মালা পরিয়াছে।

শা নওয়াজ খান ভাল ও ভদ্র মানুষটির মত সিঁড়ি উঠিলেন, তোমাতে আমাতে তাঁহাতে কোনও তারতম্য নাই, হঠাৎ ঘরের সম্মুখে আসিয়া সেই ভীষণ মোটা জুতা ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল—শা নওয়াজ খান আর শা নওয়াজ খান নহেন, মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ! ফল্ ইন! জয় হিন্দ! এক, দুই, তিন মুহূর্ত্ত! তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি—তাহার নেতাজীর সেই ছবিখানি সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, সে কি বালকের কান্না, সে কি নারীর ক্রন্দন! হায় বীর! ক্রন্দন কি তোমায় শোভা পায়? কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আর একদিন, আর একদিন নেতাজি, তোমাকে আমি এমনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। যেদিন ভারতভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিবার জন্য সুভাষ ব্রিগেডের নেতৃত্ব, নেতাজি, নেতাজি, তুমি এই অক্ষম অধম অনুচরকে দিয়াছিলে! সেদিন তুমি ছিলে মানুষ, আমি তোমার দাস; আজও আমি সেই দাসই আছি; কিন্তু দেবতা আমার, তুমি কোথায়?" ছবি ছাড়িয়া জানালা, জানালা হইতে আলনা, আলনা ছাড়িয়া দরজায়, দুটি চক্ষুতে শতধারা বহিয়া যাইতেছে; সম্বন্ধোষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ভোগবতী বসুধা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতে চাহে, বসুমতী অতি কষ্টে দমিত রাখিয়াছেন।

সুভাষের সেই শয্যা! শা নওয়াজ খান খাটের নীচে জানু পাতিয়া শয্যায় মুখ লুকাইলেন; চোখের জলে চাদর ভিজিল; উপাধান সিক্ত হইল। চাহিয়া দেখি, ঘরের চারিদিকে যত চোখ—সব চোখে জল ছল ছল টল টল! কক্ষ নিস্তব্ধ, কেবল মৃদু করুণ ক্রন্দন শব্দ! মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ তখনও চাদরে মুখ ঘসিতেছেন আর অতি মৃদু, অতি ধীর, অপরাধীর কণ্ঠে বলিতেছেন, নেতাজি আমি পারি নাই; নেতাজি আমি পারি নাই (I have failed! I have failed)! নেতাজি আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারি নাই!

নেতাজী কোথায় জানি না! যেখানে থাকুন, বীরঅনুচরকে তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা জানি! আর শা নওয়াজ খানকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেও পারি, হে বীর! তোমার ব্যর্থতাও বিজয়মণ্ডিত হইয়াছে। তোমার নেতাজীর পুণ্যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পথ এক নিমিষে অতিক্রম করিয়াছে। তোমার নেতাজী ধন্য, নেতাজীর অনুচর তোমরা, তোমরাও ধন্য!

বাহিরে কে রব তুলিল, শা নওয়াজ জিন্দাবাদ!

মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শা নওয়াজ বাহিরে আসিয়া সিংহনাদ করিলেন—নেতাজী···

জনতা বলিল, নেতাজী জিন্দাবাদ!

জয় হিন্দ!

খেলা ধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস এসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে গ্রেল ক্লাবের জি ক্যারাপিট ২৮ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান সীপ পেয়েছেন। তিনি ছ'টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে পাঁচটিতে প্রথম হন এবং একটিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। মহিলাদের অনুষ্ঠানে ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের মিস্ ভুলসি বিক ১০ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হ'য়েছেন। দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে গ্রেলক্লাব ৪১ পয়েণ্ট পেয়ে। ১২ বছরের কম বয়সের বালিকাদের অনুষ্ঠানে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কুমারী নীলিমা ঘোষ ১৫ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

ব্র্যাডম্যান এবং ও'রেলী ঃ

যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান এবং ওরেলী যেমন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট এভারেজ ক'রেছিলেন তেমনি বর্ত্তমানেও তাঁরা ক'রেছেন। তিন ইনিংসে ব্র্যাডম্যান ২৩২ রান ক'রেছেন তার মধ্যে একবার নট আউট। ১১৬ রানের এভারেজ ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলসের বার্ণেস প্রায় তাঁকে ধরে ফেলেছিলেন আর কি? বার্ণেসের ছ ইনিংসের মোট রান ৬৭৪ ছিল। তাঁর এভারেজ ১১২ রান। ওরেলী ১৯টা উইকেট পেয়ে ১২ এভারেজ করেন।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপের ২৩শ বার্ষিক প্রতিযোগিতায় একটি বিষয়ে নতুন বেঙ্গল রেকর্ড হয়েছে এবং কয়েকটি বিষয়ে সমান হয়েছে। ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবের পি গুডক্রে হপ, ষ্টেপ এবং জাম্পে ৪৪ ফিট ৪½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে নতুন বেঙ্গল রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন। রেঞ্জার্সের এম লেমিং জ্যাভেলিন নিক্ষেপে তাঁর পূর্ব্ব রেকর্ড উন্নত ক'রেছেন। এ ছাড়া ৪×১০০ মিটার রীলে, মেয়েদের ৫০ মিটার দৌড়ে এবং ব্রড জাম্পে বেঙ্গল রেকর্ডের সমান হয়েছে। ৫০০ মিটার ভ্রমণে এ কে দত্ত তাঁর পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড উন্নত করেছেন।

ফলাফল ঃ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ—জি ক্যারাপিট (গ্রেলক্লাব) ১৫—পয়েণ্ট। দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব—৪০ পয়েণ্ট। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ানসীপ—মার্গারেট নিকলস্ (রেঞ্জার্স)—১৮ পয়েণ্ট। ঐ দলগত চ্যাম্পিয়ান সীপ—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব ৩৬ পয়েণ্ট।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

ইংলণ্ড ৮৫০০০ হাজার দর্শকের সামনে ২—০ গোলে বেলজিয়ামকে হারিয়েছে। এই ফুটবল খেলায় দর্শক হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লিমেণ্ট এটিলি উপস্থিত ছিলেন।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বাঙ্গালা দল ঃ ১১৯ ও ২৬৬

হোলকার দল ঃ ২৮৮ ও ১০২ (৫ উইকেট)

হোলকার দল ৫ উইকেটে বাঙ্গলা প্রদেশকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে পরাজিত করেছে। হোলকার দল বাঙ্গলা দেশে খেলে বাঙ্গলা দলকে এই প্রথম হারাবার গৌরব লাভ করলো।

বাঙ্গলা টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করে এবং মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে সব উইকেট পড়ে যায়। দলের সব থেকে বেশী ৫২ রান করলেন এস মুস্তাফী। উইকেট পড়লো এইভাবে ১২ রানে ১ম, ১২ রানে ২য়, ১৮ রানে ৩য়, ২৪ রানে ৪র্থ, ৩৬ রানে ৫ম, ৩৮ রানে ৬ষ্ঠ, ৪০ রানে ৭ম, ৪০ রানে ৮ম, ৭২ রানে ৯ম এবং ১১৯ রানে শেষ উইকেট। এম জগদল ৩৬ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। হোলকার দলের ৪ উইকেটে ১৭০ রান উঠলে পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় হোলকার দলের ৯ উইকেটে ২৭৬

রান উঠল। লাঞ্চের পর আর মাত্র ১২ রান যোগ হ'লে পর ২৮৮ রানে তাদের প্রথম ইনিংস্ শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ ৪৩ রান করলেন বি বি নিম্বলকার। সারভাতের ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। এস ব্যানার্জি ২৯ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৮৮ রান দিয়ে ৪টা উইকেট পেলেন। এন চৌধুরী ৭৫ রানে পেলেন ৩টে উইকেট। বেলা ২-৩০ মিনিটে বাঙ্গলা দল ১৬৯ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের ২২২ রান উঠলো ৬ উইকেটে। এন চ্যাটার্জি ৬৮ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ হ'ল। এন চ্যাটার্জি ১৩৫ মিঃ খেলে ৯৯ রান করলেন। এর পর উল্লেখযোগ্য ধ্রুবদাসের ৫৭ রান।

বেলা ১২-৩৫ মিনিটে হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ৯৮ রান প্রয়োজন। বেলা ২-৫৩ মিনিটে প্রয়োজনীয় রান উঠে গেল। হোলকার দল বিজয়ী হ'ল ৫ উইকেটে। সি এস নাইডু ৪০ রান করে নট আউট রইলেন। এস ব্যানার্জি ৬১ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার:

হিন্দুদল: ৩৬৮ ও ২১৩ (উইকেট ডিক্লে)

পার্শী দল: ১৭৭ ও ৯৪

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হিন্দুদল ৩১০ রানে জয়লাভ করেছে।

হিন্দুদলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান—ডি মানকদ ৭৪, সোহোনী ৫৭, সিন্ধে ৪৯, কিষেণচাঁদ ৪৫। দ্বিতীয় ইনিংসে কিষেণচাঁদ রান আউট ৭২ এবং কে রঙ্গনেকার নট আউট ৫১ রান। পালিয়া ৯৩ রানে ৪টে উইকেট পান।

পার্শীদলের প্রথম ইনিংসের দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৫ রান করলেন জে বি খোট। ফাদকার ৭২ রানে ৩ এবং সিন্ধে ৫৩ রানে ৩ উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ে সাফল্য দেখালেন সিন্ধে ৩১ রানে ৪ এবং ফাদকার ৪৫ রানে ৩টে উইকেট পেয়ে।

টম্ লটন ঃ

ইংলণ্ড এবং চেলসার ফুটবল সেণ্টার ফরওয়ার্ড টম লটন মিডলসেক্স দলে ক্রিকেট খেলা চর্চ্চা করবেন বলে স্থির করেছেন। খ্যাতনামা ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় হেণ্ডারসন, হিউস এবং ডেনিস কম্পটনের পদাঙ্কই তিনি অনুসরণ করেছেন।

প্রদর্শনী হকি খেলা

স্মরণ থাকতে পারে ১৯৩৫ সালে অল্ ইণ্ডিয়া হকি টীম নিউজিল্যাণ্ডে হকি খেলে এসেছিল। এর পর ১৯৩৮ সালে মানাভাদার হকি দল নিউজিল্যাণ্ডে খেলতে যায়। হকি খেলায় ভারতীয় দলের প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল উপর্য্যুপরি তিনবার বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান সীপ পেয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে সময়ে সময়ে ভারতীয় হকি দল বাইরে হকি খেলতে গেছে কিন্তু বিদেশী হকি দলের এ দেশে আগমন কদাচিৎ ঘটে থাকে। আফগান থেকে হকি দল ভারতবর্ষে খেলতে আসতো, সে অনেক বছর আগের কথা। নিউজিল্যাণ্ড থেকে একটি সার্ভিস হকি দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হকি খেলেছে। এই দলটিকেই প্রকৃত প্রথম বৈদেশিক হকি দল বলা

বোলিং গ্রিপস: লেগ্ ব্রেক   অফ্ ব্রেক

যায়। এই সার্ভিস হকি দল বেশীর ভাগই মিলিটারী দলে সঙ্গে খেলেছে। তারা এ পর্য্যন্ত ১০টি খেলায় ৬টি খেলায় হেরেছে এবং ৪টি খেলায় জিতেছে। ক'লকাতায় বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন দলের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় সার্ভিস দল ৭—২ গোলে পরাজিত হয়েছে। সব থেকে বেশী গোলের ব্যবধানে তারা হেরেছি পিণ্ডি সিভিলিয়ান দলের কাছে ২—১১ গোলে। ক'লকাতা মোট ৬০ মিনিট খেলা হয়েছিল। সার্ভিস দলের খেলোয়াড় বেশ পায়ের জোরে খেলছিল। স্থানীয় দলের খেলোয়াড়

তাদের অভ্যস্ত গতি এবং কৌশল অবলম্বন করে বিপক্ষদলকে পরাস্ত করে। বাঙ্গলা দেশে সে সময় হকি মরসুম আরম্ভ হয়নি, ফলে স্থানীয় দলের খেলোয়াড়দের খেলায় বিশেষ অনুশীলন ছিল না। তাছাড়া বি এন আর দলের নামকরা খেলোয়াড়রা এ দলে যোগদান করতে পারে নি। এ সব সত্ত্বেও স্থানীয় দল হকি খেলায় ভারতীয়দলের সম্মান রক্ষা করেছে।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা ঃ

সিন্ধু ঃ ২৩৪ ও ৩০৬

বোম্বাই ঃ ৫৬০ (৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের সেমি ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস এবং ২০ রানে সিন্ধুদলকে পরাজিত করেছে।

সিন্ধুদল প্রথম ব্যাট করে। তাদের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান জে ইরাণী ৪১। ডি ফাদাকার ৬১ রানে ৪টা উইকেট পান। বোম্বাই দল ৫ উইকেটে ৫৬০ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ভি এম মার্চ্চেণ্ট নট আউট ২৩৪ রান করেন। কে রঙ্গনেকার করেন ১৭৫ রান। সিন্ধুদলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০৬ রানে শেষ হয়। এনায়েৎ খাঁ ৮৭, জি কিষেণচাঁদ ৭৫ এবং দামুদ খাঁ ৫৮ রান করেন। এই খেলায় ভি এম মার্চ্চেণ্ট এবং রঙ্গনেকার পঞ্চম উইকেটের জুটিতে মোট ৩২৫ রান তুলে রেকর্ড করেছেন।

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলা ঃ

মহীশূর ঃ ১৮৮ ও ৩০৭

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৭৬ ও ২২০

মহীশূর ১০১ রানে হায়দ্রাবাদকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় পরাজিত করেছে।

মহীশূরের প্রথম ইনিংসের দলের সর্ব্বোচ্চ রান গুরুদাচারের ৫৪। ভরতচাঁদ ৩০ রানে ৪ এবং দুর্গাপ্রসাদ ৩৬ রানে ৩ উইকেট পান। হায়দ্রাবাদের প্রথম ইনিংসে ভরতচাঁদ দলের সর্ব্বোচ্চ ৫১ রান করলেন। মহীশূর দলের ২য় ইনিংসে রামদেব নট আউট ৮০ রান করলেন। হায়দ্রাবাদ দলের ২য় ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ ৪৭ রান করলেন আইবারা ৮০ মিনিট খেলে। রামরাও ১ম ইনিংসে ৩৬ রানে হায়দ্রাবাদ দলের ৭টে উইকেট পান এবারও পেলেন ৪টে ৪৯ রানে।

বেঙ্গল টেবল টেনিস ঃ

পুরুষদের জুনিয়ার সিঙ্গলসের লীগে কুমার ঘোষ কোন খেলায় না হেরে ব্রাবোর্ণ কাপ বিজয়ী হয়েছেন।

উইণ্টার হকি লীগ ঃ

ক'লকাতায় হকি মরসুম আরম্ভ হয়ে গেছে। লীগের 'এ' গ্রুপে পোর্টকমিশনার ৭টা খেলে ১৪ পয়েণ্ট করেছে। তার পরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, ৫টায় ৮ পয়েণ্ট। এ দুটি ক্লাব এখনও কোন খেলায় হারেনি। 'বি' গ্রুপে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম যাচ্ছে, ৭টা খেলায় ১টা হেরে ১২ পয়েণ্ট পেয়েছে।

নবাব পতৌদী ঃ

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলতে যাচ্ছে তার অধিনায়ক হয়েছেন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদী। নবাব পতৌদী ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড দলের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া গিয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে সিডনীর প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ১০২ রান করেন। তিনি এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের পক্ষে ইংলণ্ড দলের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলেন নি। নবাব পতৌদী হকি এবং বিলিয়ার্ডে অক্সফোর্ড ব্লু পেয়েছেন তাছাড়া কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে তাঁর নট আউট ২৩৮ সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়ে আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "ইতালীর সেরা গল্প"—২॥০

শ্রীবনবিহারী ঘোষ প্রণীত "জার্ম্মাণীর সেরা গল্প"—৩৲

শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সোনার দেশ"—।৵০, "সোনার কুঞ্জ"—।৵০

দেবী লক্ষ্মীমণি ও বিশ্বাস যোগীন্দ্রমোহিনী প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি"—।॥০

শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "জন্মভূমি"—১॥০

শামসুদ্দীন প্রণীত "মুকুলের স্বপ্ন"—৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

LIBRARY COOCH

যুগ-সন্ধির শেষ বৈরাগী—আচার্য্য বলদেব

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় জীবন-ভাষ্যে প্রেম-রস-সীমা স্বরূপ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর প্রণয় মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যতীত ব্রজ-বধূগণের স্বার্থসম্পর্করহিত প্রেম-রত্নের মাহাত্ম্য প্রচার যে আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নূতন পথ জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের, পূজা-মন্দিরের এক অভিনব সামগ্রী। কিন্তু মহাপ্রভু এই পথ-নির্দ্দেশের জন্য অপরাপর আচার্য্য-পাদের মতো সূত্র-ভাষ্য বা গ্রন্থাদি রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যে কথা তাঁহার বিরহ-মথিত, হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চির-লিখিত তাহা তাঁহার জীবন-ধারার সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব শ্রী, অপূর্ব্ব কারুণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া জগজনকে বিমোহিত, একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছে। তবু একথা বলিতে হয়, পুষ্প শুষ্ক হইয়া গেলে, সৌরভও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া থাকে। কাজেই সেই সৌরভ-সুধার দিব্য-কাহিনী বিশ্বের কর্ণে কর্ণে পরিবেশন করিয়া জগ-জনকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিতে আবার প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

প্রেরণা যেরূপ প্রবল, লেখকও তেমন যোগ্য হওয়া চাই। অপূর্ব্ব প্রেরণার রস-রহস্য চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য বুঝি শ্রীভগবানই সে কর্ম্মভার আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। তাই রূপ-সনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ, বলদেব প্রভৃতির ন্যায় অভূতপূর্ব্ব ভক্ত-সুধীজনের আবির্ভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের শ্রীলেখনীতে নদীয়া-নাথের মর্ম্মকথা, কর্ম্মপ্রথা রূপগ্রহণ করিয়া যুগ-যুগের অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিল, যুগ-যুগান্তের নর-নারী-হৃদয়ে আনন্দ-রস নির্ঝরিণীর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়া দিল।

এই আচার্য্য-বৃন্দের মধ্যে শ্রীপাদ বলদেবের জীবন-কথা সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রয়াস পাইব। তবে

ভক্ত-চিত্তের চরিত্রাঙ্কনে কতদূর সাফল্য লাভ করিব, তাহাই পদে পদে চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। কোনো মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যাঁহার অনুরূপ-চরিত্রে আসক্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় অভাজনের সে যোগ্যতা কোথায়? তবে অনুপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা 'মধুর' মিষ্টতাকে বুঝাইতে হইলে যেমন 'চিনির মতো', 'গুড়ের মতো' ইত্যাদি বলিয়া দৃষ্টান্ত-সম্ভারে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয়, তদ্রূপ আমিও আজ, "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকা সমক্ষে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সার্থক বৈরাগী, আচার্য্য বলদেবের অমর আলেখ্যখানি তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বলদেবের গৃহস্থাশ্রমের বিবৃতি-সম্বন্ধে আজও সুধীবৃন্দ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গলার অধিবাসীরূপে সজ্জিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে উড়িষ্যার বালেশ্বর মহকুমার অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্ত্তী এক পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যাহা হোক তিনি খণ্ডায়েত বৈশ্য-বংশের এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বলদেব-হৃদয়ে ভক্তি-বীজ নিহিত ছিল। জীবনের ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-পথের পথিক হইবার ইচ্ছা তদীয় হৃদয়ে বলবতী রূপ ধারণ করে এবং ন্যায়-শাস্ত্র ও অপরাপর দর্শন অধ্যয়নান্তর তিনি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, বলদেবের ভাগ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। পীতাম্বর দাস নামক এক ভক্ত-প্রাণের সন্ধান করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট ভক্তি-দর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তি-শাস্ত্রের আস্বাদনে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-মধুর-রসোৎস উৎসারিত হইয়া পড়িল, ভক্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য সততই তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, 'বেদান্ত-স্যমন্তকে'র বহুখ্যাত গ্রন্থকার ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রাধাদামোদর দাসের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভক্তপ্রবর রাধাদামোদর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পরিবারের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আচার্য্য বলদেব ইঁহাকেই তাঁহার ইষ্ট-গুরুরূপে গ্রহণ করেন,—

নিত্যানন্দ
|
গৌরীদাস পণ্ডিত (ঐ শিষ্য)
|
হৃদয় চৈতন্য (ঐ শিষ্য)
|
শ্যামানন্দ (ঐ শিষ্য এবং পরে শ্রীপাদ্ জীব গোস্বামীর
| আশীর্ব্বাদ লাভ করেন)
রসিকানন্দ মুরারি (ঐ শিষ্য)
|
রাধানন্দ (ঐ পুত্র এবং শিষ্য)
|
নয়নানন্দ (ঐ পুত্র এবং রসিক মুরারির শিষ্য)
|
রাধাদামোদর (ঐ শিষ্য)
|
বলদেব বিদ্যাভূষণ (ঐ শিষ্য এবং পরে শ্রীপাদ্
| বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃপালাভ করেন)

বলদেবের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নন্দ মিশ্র এবং উদ্ধব দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলদেব জয়পুর-রাজ জয়সিংহের (২য়) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবৎ-কাল।

বলদেব আকুল অন্তকরণে যখন শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হ'ন, তখন তথায় ভারত-বিশ্রুত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান ছিলেন। বলদেব তাঁহারই শ্রীচরণসরোরুহে নিজেকে সমর্পণ করিয়া শ্রীধামের লুপ্ত-শ্রী পুনরুদ্ধার তথা গোস্বামী-শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা করিয়া জগতে অনন্য সাধারণ প্রেম-সুধা বিতরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।* অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুবিধা-মানসে আবার তাঁহাকে কতিপয় গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিতে হইল,—

১। সাহিত্য-কৌমুদী
২। কৃষ্ণানন্দিনী (ঐ টীকা)
৩। গোবিন্দ-ভাষ্য
৪। সূক্ষ্মা (ঐ টীকা)
৫। সিদ্ধান্ত-রত্ন
৬। ঐ টীকা
৭। কাব্য-কৌস্তুভ
৮। গীতা-ভূষণ (গীতার-টীকা)
৯। রাধাদামোদর-কৃত ছন্দ-কৌস্তুভ গ্রন্থের টীকা
১০। প্রমেয়-রত্নাবলী
১১। কান্তিমালা (ঐ টীকা)
১২। রূপ গোস্বামি-বিরচিত স্তব-মালার টীকা
১৩। রূপ গোস্বামী কৃত লঘু-ভাগবতামৃতের টীকা
১৪। নামার্থ-শুদ্ধি (সহস্রনামের টীকা)
১৫। জয়দেব গোস্বামি-বিরচিত "চন্দ্রালোকে"র টীকা
১৬। সিদ্ধান্ত-দর্পণ
১৭। তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকা
১৮। রূপ গোস্বামীর "নাটক-চন্দ্রিকার" টীকা

ইহা ব্যতীত উপনিষদের উপরও তিনি কিছু কিছু টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

আচার্য্য বলদেবের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব যদি না হইত, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবনকে যে আজ আমরা কি ভাবে দেখিতে পাইতাম, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। ভারতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য চিরদিন সুরক্ষিত। যমুনা-পুলিনে যে মোহন-বংশী ধ্বনিত হইল, সে সুর-লহরী বিশ্ব-কর্ণে গলিয়া গলিয়া জগজ্জনকে একেবারে প্রেমময় করিয়া তুলিল। শ্রীপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্য আবার 'প্রেমের সেই রাজ-রাজেশ্বরের মধুকর ডিঙ্গার জন্য খাত কাটিতে লাগিলেন', আর গৌরাঙ্গ-লীলায়, তাহার পূর্ণাহুতি হইয়া দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-জীবনে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল,

* মৎ-রচিত "আচার্য্য বলদেব ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫২।

রূপ-সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি ষড়-গোস্বামিগণের শিক্ষাদর্শ ও জীবনাদর্শে তাহা পরিপূরিত হইয়া উঠিল, দস্যু-তস্কর-অধ্যুষিত বন-বিষ্ণুপুর সাধু হইল, খেতরীর মহা-মহোৎসবে সে প্লাবনের ঢেউ লাগিয়া সমস্ত দেশকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল, শ্রীপাদ্ শ্যামানন্দ গোস্বামীর প্রেরণায় উড়িষ্যা-বাসীর জীবন-ধারায় বৈষ্ণবীয়-ভাব স্থিরত্ব লাভ করিল। তাই বলিতেছি, ভারতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য অবহেলার জিনিষ নহে। বাহুবল নয়, জিগীষা নয়, রাষ্ট্র-গৌরব নয়,—মধুর-রসালপদ প্রেম-ধর্ম্মকেই শ্রীবৃন্দাবন নয়ন-বারিতে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সু-মহৎ বীর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই জন্যই বুঝি সম্রাট্ আকবর ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন,—"ফকিরাবাদ"। কিন্তু কালের কুটিলা গতি—আওরঙ্গজেব ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নাম রাখিলেন "মুমিনাবাদ", অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের বাসস্থান। তিনি বৃন্দাবনকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। শ্রীধামের 'শ্রী' লুপ্ত হইল—বৃন্দাবন দেবশূন্য, জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব ইহলোক হইতে অপসারিত হইলে বাহাদুর সাহ, জাহাঙ্গীর সাহ, ফারুক সায়র প্রভৃতি উত্তরাধিকারীত্রয় গৃহ-বিবাদে লিপ্ত থাকিয়াই তাঁহাদের ভব-লীলা সাঙ্গ করিলেন। তারপর আসিল মোহাম্মদ সাহ। তিনি ২৯ বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন। ইঁহারই সময় জয়সিংহ (২য়) মথুরামণ্ডলের শাসন-কর্ত্তা হইয়া শ্রীধাম-সংস্কারে ব্রতী হইলেন। শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই * তখন শ্রীধামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের একমাত্র বিশিষ্ট নিদর্শন। কিন্তু একা তিনি কি করিবেন? তাঁহার কাতর-ক্রন্দনে বুঝি শ্রীভগবান ব্যথিত হইলেন। অমনি তাঁহার যোগ্য-সহচরের আবির্ভাব হইল, কোথা হইতে বলদেব বিদ্যাভূষণ আসিয়া আবার তাঁহারই শ্রীচরণকমলে শরণ লইল। বিশ্বনাথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলদেবের সাহচর্য্যে গোস্বামি-শাস্ত্রের পুনরায় পঠন-পাঠনের সু-ব্যবস্থা করিয়া জয়পুর হইতে মোহাম্মদ সাহের সম্মতিক্রমে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী প্রভৃতির প্রতিনিধি দেব-মূর্ত্তিগুলি শ্রীধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে অনন্য-সাধারণ প্রেম-বিতরণের পথ পরিষ্কার করিলেন।

এই সেই বলদেব বিদ্যাভূষণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বহুখ্যাত শেষ-নিদর্শন, শান্ত এবং সুন্দর—সেকাল ও একালের যুগ-সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়া খনির মধ্যে মণির সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

* মৎ-রচিত "বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫১।

ব্ল্যাক আউট

শ্রীঅনিলকুমার বক্সী

ব্ল্যাক-আউটের যুগ। কৃষ্ণপক্ষের রাত। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারারা নিরুদ্দিষ্ট। বিরাট জংশন ষ্টেশনে মেল ট্রেনের অপেক্ষার্থী জনতাদের মধ্যে নীরেন। ট্রেন আসবার কোন লক্ষণই নেই দেখে ও একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারী সুরু ক'রে দিলে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। চোখ ধাধান আলোর পরিবর্তে চোখ টাটান অন্ধকার! শুধু দূর অন্ধকারে সিন্ধুগর্ভে রক্তবিন্দুর মত এক একটা আলো জল্ জল্ ক'রে জ্বলচে।

ট্রেনের অপেক্ষায় সকলের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত ঠিক সে সময় স্থির লাইনদুটোতে শব্দের তুফান ছুটিয়ে একটা বিরাট অন্ধকারের স্তূপের মত ট্রেনটা এসে থেমে গেল।

সদ্য-আগত প্রাণীদের এবং উপস্থিত যাত্রীদের সম্মিলিত কোলাহল সঙ্গে সঙ্গেই নৈশ ঊর্দ্ধলোক পর্য্যন্ত চমকিত ক'রে তুলিল।

গাড়ীটা থেমেচে কি নীরেন অমনি ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। নারী, শিশু, বোঁচকা-বুঁচকি সামনের যা' কিছু সব পদদলিত ক'রে দুই সবল বাহুতে সম্মুখের পথ মুক্ত ক'রে ও একটা থার্ডক্লাশ কামরার সামনে এসে উপস্থিত হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুষ্টিবদ্ধ হাত নো এড্‌মিশন্ মূর্ত্তিতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

নীরেন দেখলে তাকে পুরোভাগে ক'রে তার পেছনে বহুলোক জড়ো হ'য়ে গেছে।

প্রতিপক্ষের অসংখ্য কিলচড়কে উপেক্ষা ক'রে গাড়ীর হাতলটার নাগাল পেতেই ও জবরদস্ত সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে গেল।

যিনি দরজার সম্মুখভাগ আগলে ছিলেন তাঁর নাকে একটা ঘুসি প'ড়তেই তিনি নাকিসুরে চীৎকার শুরু ক'রে দিলেন।—আজকালকার লোকের কী মিলিটারী মেজাজ! মিলিটারী যুগ কিনা!··· সামান্য একটু জায়গার জন্যে—এ্যাঃ, একেবারে রক্ত বের ক'রে দিয়েচে!

নীরেনও ছাড়বার পাত্র নয়। বল্লে—আপনারাও কম নন্ মশায়, সামান্য একজনকে একটু জায়গা দিতে হবে ব'লে তার মাথাটা আর একটুও আস্ত রাখেন নি!···

কিন্তু অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক হ'লো। টর্চ ফেলতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

নীরেনের বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন—য়্যাঁ, নীরু নাকি!

সঙ্গে সঙ্গেই কলের মত উত্তর হ'লো—বাবা আপনি!

সৈনিক

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

ইতস্ততঃ মৃতদেহ চারিধারে পড়ে রয়েছে—বিকৃত, কুৎসিত, দুর্গন্ধময় আর ভয়াবহ। সভ্য মানুষের জিঘাংসা পশু-পক্ষীদলকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

ব্রহ্মদেশের সীমান্ত। অসমতল ভূমি। পাহাড়ের শিকড় যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গম, দুস্তর, বিপদসংকুল পাহাড়ী বন। বাঘ ভালুক, সিংহ ও বিষাক্ত সর্পকুল যে সভ্যমানুষের হিংস্রতায় কোথায় আত্মগোপন করেছে তার স্থিরতা নেই। গলিত শবের দুর্গন্ধে বন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

৩২ নং সেনাবাহিনী নিঃসাড়ে আত্মগোপন করে চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে—সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ। উঁচু হয়ে রয়েছে রাইফেলের সঙ্গিন। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। জাপানী-বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছে। অবিলম্বে তা' দখল করতে হবে এবং সেই ঘাঁটিটিকে ভিত্তি করে অগ্রগামী নূতন আক্রমণ সুরু হবে।

এই বাহিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলেছে অফিসারদের ছোট একটি দল। আরও পশ্চাতে রয়েছে আরও একটি সেনাবাহিনী।

অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রায় ব্যতীত সকলেই শ্বেতাঙ্গ—ইংরেজ, আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান।

ক্যাপ্টেন রায় প্রাণীহত্যা, শত্রুকে নির্মূল করবার ছল কৌশল ও শঠতার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গত দেড় বছরের মধ্যে সার্জেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়েছে।

যারা মৃত্যুকে বরণ করে কিংবা মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে জয়রথের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যায় তারা এগিয়ে গেছে। হয়ত কেন্দ্রস্থলে পৌছে গেছে। সে দলের কতজন যে পথপ্রান্তে ধূলোয় মিশে গেছে তার হিসেব কেউ রাখেনি—রাখবার অবসর নেই এবং রাখতে গেলে অগ্রসর হওয়া যায় না। শান্তির দিনে পাইকারী ভাবে তাদের জন্য স্মৃতি স্তম্ভ রচিত হবে, বাধ্যতামূলক ভাবে দেশবাসী সমষ্টিগতভাবে অভিশপ্ত আত্মাগুলির জন্য নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, ধর্ম্মমন্দিরে গিয়ে গান গাইবে এবং ভবিষ্যৎ দেশবাসীকে প্রস্তুত হবার জন্য জয়ধ্বনি করবে।

রঞ্জিত নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ঘাঁটির দিকে দুর্গম

পাহাড়ী পথ্ ধরে। সৈনিক দল পথ করে গেছে, শত্রুর আক্রমণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। তবু ভয় থেকে যায়; কারণ সভ্য মানুষ আইনগত ভাবে নরহত্যা করবার সর্বদিক উন্মুক্ত করে রেখেছে।

পথে ও বিপথে কত পরিচিত কত অপরিচিত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী ও নানা পরিচ্ছদধারী। খানিক দাঁড়াবার অবসর নেই। ফিরে তাকাবার সময় নেই। ভয়, দুর্বলতা, দয়ামায়া ভাবপ্রবণতা কোন কিছুরই স্থান নেই। এমন কি পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রী, সমাজ সংসার ও কোন প্রকার বন্ধনও নেই। অথচ এরাই সমাজ-জীবনে অপরের দুঃখে-শোকে কাতর হয়, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আঁৎকে উঠে। যাদের একটি মৃতদেহ দর্শনে অন্তর কেঁদে উঠত, তারাই এখন দিনের পর দিন কত সহস্র মৃতদেহ দলিত মথিত করে জিঘাংসার উন্মত্ততায় তাণ্ডব নৃত্য করে চলেছে। আজ সাম্যবাদ নেই, আন্তর্জাতিকতা নেই, অহিংসা নেই, মানবতা নেই—শুধু নীচতা, বর্বরতা, শঠতা আর হিংস্র ও কুৎসিততম হত্যা।

একদা যে ছিল শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সে হয়ত রাষ্ট্রীয় বিরোধে চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। যে হয়ত ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় গুরু, জীবনের যোগে রচনা করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা, যার ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না তাকেই রাষ্ট্রের দাবীতে করতে হবে হত্যা। ইহাই সভ্যতার দান —গোঁড়া দেশভক্তির অভিশাপ। রাষ্ট্রের দাবীতে ব্যক্তিত্ব নেই, পৃথক সহানুভূতি নেই।

এই দেশভক্তিকে ভিত্তি করে কত সর্বজন-বন্দিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই হিংস্র পাশবিক বীরত্বের কত জয়গাথা রচনা হয়েছে যুগে যুগে। কত লোক দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কত কিশোর মন পররাজ্য-গ্রাস করবার বীরত্বের মোহে কিংবা দেশরক্ষার অজুহাতে সযতনে হত্যার বীজ অন্তরে রোপন করেছে।

রঞ্জিত নিঃশব্দেই চলেছে। সঙ্গীরা তাকে হাস্য-কৌতুকপরিহাসে টানবার জন্য চেষ্টা করেছে কয়েকবার, কিন্তু পারেনি। রঞ্জিত পারে না ওদের মত জীবনযাত্রাকে এত সহজ করে নিতে। হয়ত এর কারণ পরাধীনতা। স্বাধীনজাতি জীবন ও মৃত্যুকে যত সহজে খেলোয়াড়ী মনে গ্রহণ করতে পারে, পরাধীন জাতি তত সহজে পারে না। কারণ এদের পশ্চাতে নেই কোন নৈতিক চেতনাবোধ, নেই ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল আলোক রেখা। তার রক্তে রয়েছে শুধু হিংস্র বীরত্বের মোহ, আর আর্থিক প্রেরণা।

একদল লোক চলছে মৃত সৈনিকদের সনাক্ত করে। একটি শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহ খানাতল্লাসীর পর পাইকারী কবরে ফেলে দেবার আয়োজন চলেছে। এমন সময় রঞ্জিত সেখানে এসে পৌঁছাল।

বাঙ্গালীর মৃতদেহ দেখে রঞ্জিত প্রথমটা একটু থমকে গেল কিন্তু দাঁড়াল না, এগিয়ে চলল।

কিন্তু এ মৃতদেহটি যেন মনে হয় পরিচিত। পরিচিত না হলেও যেন পরিচিত লোকের সঙ্গে ভারি সাদৃশ্য রয়েছে। রঞ্জিত চলে যেতে পারল না—নিজের অজ্ঞাতেই মৃতদেহটির পাশে ফিরে এল। আশ্চর্য! মৃতদেহটির আকর্ষণ! কিন্তু কেন? এই কি স্বজাতির প্রতি অবচেতন মমতা? হয়ত হবে।

সঙ্গীরা অগ্রসর হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মৃতদেহ যেন শৃগাল কুকুরের মৃতদেহের মত পথের বুকে পড়ে থাকে।

রঞ্জিতের মনে হয় লোকটি যেন বহু পরিচিত। কিন্তু কিছুই স্মরণ হয় না। অথচ মনে হয়—কী যেন মধুর স্মৃতি রয়েছে বিস্ময়ে আবৃত হয়ে। অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠে—অন্ধকারে আলোক সম্পাত হয় না।

রঞ্জিত ডাইরী বহিটি চেয়ে নিল। সনাক্ত করবার কিছুই পাওয়া যায়নি—একটি শুধু আংটি পাওয়া গেছে। তাতে নামের আদি অক্ষরগুলি শুধু লেখা রয়েছে—বি-কে-সি।

রঞ্জিত পুনরায় চলতে লাগল। বি-কে-সি! কত নাম হতে পারে। বিমান, বিভূতি, বিবেকানন্দ, বীরেন্দ্র, ভূপেন, ভারত, বাণী, বিমল, বিনয়—উঃ, আরও কত নাম রয়েছে। চৌধুরী, চ্যাটার্জি, চক্রবর্তী, চাকলাদার, চাকী, চন্দ—কত উপাধি!

রঞ্জিত আর ভাবতে পারল না। একটি গাড়ির শব্দে চমকে উঠল। রঞ্জিতকে আত্মগোপন করতে হল না।

মিত্র পক্ষীয় একটি জিপ। তাকে তুলে নেবার জন্যই জিপটি এসেছে।

ঘাঁটিতে পৌঁছে রঞ্জিত রীতিমত অবাক হয়ে গেল। ঘাঁটিটি মাত্র বার ঘণ্টা পূর্বে দখল হয়েছে। জাপানীরা ছেড়ে যাবার সময় ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গিয়েছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই মিত্রপক্ষীয় লোকজন সেটিকে ক্ষুদে সহরে পরিণত করে ফেলেছে। অফিসারদের জন্য সারিসারি তাঁবু পড়েছে। খাট, টেবিল, চেয়ার, গালিচা, প্রভৃতিতে তাঁবুগুলি সুসজ্জিত হয়েছে। খাবার ঘর, পৃথক পৃথক বাথরুম সুসজ্জিত হয়েছে।

রঞ্জিত ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ক্যাম্পখাটে এসে লম্বা হল। মৃতদেহটির কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঘুরে ফিরে কেবল অতীতের কথাই মনে পড়ে। কোথায় কতদূরে যেন সে কি ফেলে এসেছে। তা যেন কত প্রিয়। প্রিয় স্মৃতিই রয়েছে জড়িয়ে, নতুবা গতানুগতিক এই সামান্য ঘটনা কেন বারবার বিস্মৃত স্মৃতির সমুদ্র মথিত করে তুলবে!

মন বিভ্রান্ত ও পর্যুদস্ত এবং শরীর অতিশয় অবসন্ন। বন্ধুদের এড়াবার জন্য রঞ্জিত চোখ বুজে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারল না, সৈনিকদের হাসি-হুল্লোড়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চারধারে চলেছে নাচ গান, খেলাধূলা। এদের দেখে মনে হয় না যে, এরাই বহু লোককে হত্যা করেছিল এবং এদেরই বহু সঙ্গী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। এদের দেখে মনে হয় না যে, এরাই যে কোন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে—যে কোন মুহূর্তে শত্রু দ্বারা নিহত হতে পারে।

রঞ্জিতের মনে হল, এই ত' সৈনিকের জীবন। কোন ক্লেদ জড়তা নেই, কোন ভয় শংকা নেই, কোন শোক তাপ নেই, কোন দুঃখ বেদনা নেই—ইহারা মনে প্রাণে যেন মৃত্যুঞ্জয়।

হাউয়ার্ড সানফ্রান্সিকো অধিবাসী। রঞ্জিতের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব। হাউয়ার্ড কোন এক ফিল্ম গানের একটি কলি গাইতে গাইতে ভিতরে প্রবেশ করল। রঞ্জিতকে বলল, হ্যালো ক্যাপ্টেন র‍্যা, তোমার হল কি? সবাইকে এড়িয়ে চুপি চুপি ঘুমাচ্ছ, আর জেগে বিরস বদনে কি ভাবছ? দু'বার এসে ঘুরে গেছি।

রঞ্জিত সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আজ মনটা ভাল নয়।

তোমার ত' কোন বান্ধবী নেই, কোন চিঠিও পাওনি—আশ্চর্য!

মরা দেখে দেখে মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হাউয়ার্ড হেসে উঠে বলল, পুরুষের মানায় না—এ দুর্বলতা নারীদের জন্য। তুমি পুরুষ, তুমি সৈনিক—জীবনটা ত' খেলা।

নরহত্যা খেলা!

শত শত মানুষ হত্যা করে বুঝতে পারছ না?

তুমি আমায় হত্যা করতে পার?

না পারি না, কারণ আমি আর তুমি মানুষ। মানুষ মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুন করতে পারে না। এই যে হত্যা লীলা চলছে তা' কি মানুষ মানুষকে হত্যা করছে? নিশ্চয় নয়। দেশ দেশকে হত্যা করে। আমরা শুধু অস্ত্র। আমাদের শান দেয় দেশপ্রীতি। চল দু' পেগ টানা যাক্—তোমার সাময়িক ক্লৈব্য কেটে যাবে।

এমন সময় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করল!

একজন বলল, হাউয়ার্ড, তুমি হেরে গেলে। তুমি বলেছিলে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তিনটির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আরও পাওয়া যেতে পারে। গাইড অপেক্ষা করছে, চল!

হাউয়ার্ড বলল, রক্ত পরীক্ষা হয়নি, জাপানীরা ছিল অনেকদিন ধরে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তুমি বড্ড ভীতু। ভ্রাম্যমান দল কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই—টু হাংরী, ভয় নেই, ওরা প্রফেসানাল নয়।

হাউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, র‍্যা, তুমি নিশ্চয় যাবে?

রঞ্জিত বলল, না।

হাউয়ার্ড বলল, তোমার মনটা ভাল নয়। সৈনিকদের এত গোঁড়া হলে চলে না। যতক্ষণ বাঁচবে ততক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় আনন্দ উপভোগ করে নেবে। আনন্দের মাঝেই আমরা দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করব।

রায় বলল, আমায় ক্ষমা কর। আমি নীতি মেনে চলি।

গভীর রাত্রি।

সৈনিকগণ পালা করে নিঃশব্দে টহল দিচ্ছে।

রঞ্জিত ঘুমাচ্ছিল। কমেণ্ডারের আদেশে একজন এসে তাকে জাগিয়ে দিল। আশ্চর্য এক স্বপ্ন সে দেখছিল। ছাত্র জীবন শেষ করে সে গিয়েছিল ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। সে আজ প্রায় দশ বছরের পুরাতন কাহিনী। রেঙ্গুন থেকে সামান্য বেতনের কাজ নিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল মেমিওতে।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরতে লাগল। তাকে এখনি একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করতে হবে। একদল গরিলা বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়েছে। সেতুটি তাকে রক্ষা করতে হবে।

স্বপ্নের আবেশ তার কাটেনি। অসমাপ্ত স্বপ্নের কাহিনী মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মেমিওতে সে এক প্রবাসী বাঙ্গালীর বাড়িতে বাস করত। গৃহস্বামী ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও সরল প্রকৃতির। ছোট্ট সংসার—স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। এক পুত্র বিমল চ্যাটার্জি ছিল তার সহকর্মী এবং বিশেষ বন্ধু। দেশ স্বাধীন করবার রঙীণ স্বপ্ন তাদের বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম করেছিল। তাদের দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্নে বিমলের বোন সুলেখাও যোগদান করত। সুলেখার বয়স তখন ষোল কি সতের ছিল। কী সুন্দর ছিল তার গভীর কালো চোখ দুটি।

দ্বিতীয়বার আদেশ আসতেই রায় গিয়ে কমাণ্ডারের টেবিলের সুমুখে স্যালুট করে দাঁড়াল।

আদেশপত্র আর ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে রঞ্জিত বেরিয়ে পড়ল। ভয়ংকর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে। ঘন ঘন বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানীতে চোখে ধাঁধা লাগছে। জমাট বাঁধা ঝোপ ঝাড়, কাঁটা বনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। প্রয়োজনে তৈরি পথ, নদীর ধারে, জলাশয়ে এবং ঘন বনের মাঝে বার বার হারিয়ে যায়। পথ প্রদর্শককে কেন্দ্র করে সেনাদল সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

কী ভয়ংকর জঙ্গল, কী দুর্গম ও কষ্টসাধ্য পথ। মেঘাড়ম্বরে গভীর স্তব্ধ নিশা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কে জানে কোথায় কোন ঝোপে হিংস্র পশু শিকারের সন্ধানে ওৎপেতে বসে রয়েছে। গরিলা দল অভ্যর্থনার জন্য পথের মধ্যে প্রতীক্ষা করছে কি না তাই বা কে জানে।

এই কী জীবন! মৃত্যু নিয়ে খেলাই কী মানুষের জীবন! স্বপ্নটা কি শুধু মিথ্যা? এই মিথ্যা স্বপ্নও কি সত্য হতে পারত না। কিন্তু হল না। বর্ণ ভেদ রচনা করল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর—দু'টি জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল।

দেশ স্বাধীনতার পবিত্র আবেষ্টনীর মাঝেই দুটি প্রাণ মিলিত হয়েছিল। সে মিলন কেন পূর্ণ হল না, কেন সার্থক হল না?

সৈন্য দল এগিয়ে চলেছে। এরা বীর—নেই কোন ভয়, নেই কোন শংকা, নেই কোন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান। যেন দম দেওয়া কলের পুতুল।

এরাই ত' সৈনিক। সঙ্গী শত্রুর গুলিতে ধরাশায়ী হয় মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে। হয়ত দেহের এক অংশ উড়ে যায়, ফিনিক্ দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। 'জল' 'জল' বলে কী ভয়াবহ, কী মর্মন্তুদ চীৎকার ধ্বনিত হয় চতুর্দ্দিকে। কে দেবে জল! মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর্তনাদ যায় বর্বরতার ঘর্ঘর শব্দে তলিয়ে।

এরাই ত সৈনিক। বন্ধুর মুখ ও হাত পা হয়ত বোমাতে উড়ে যায়, সারা অঙ্গ ঢেকে যায় জমাট বাধা রক্তে —মানুষ বলে চেনা যায় না। বন্ধুকে মুহূর্তে কাঁধে তুলে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে—তারপর হয়ত খানিক পরেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জিত ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে যন্ত্র-চালিতের মত। কী দুর্গম ও বিশ্রী পথ। প্রতি পদক্ষেপে স্বপ্নের মায়া কেটে যায়।

সুলেখা এখন কোথায়? হয়ত তার বিয়ে হয়ে গেছে। হয়ত সে স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সোনার সংসার রচনা করেছে। আর সে সহায়সম্পদহীন স্রোতের মুখে বছরের পর বছর ধরে কোথায় ভেসে চলেছে।

সুলেখার কি কখনও কোন বিশেষ অবস্থায়ও তার কথা মনে পড়ে না? হয়ত পড়ে না। কত দিনের কত পুরাতন স্মৃতি। যেমনি শোকে দুঃখে, দারিদ্র্য আর জীবনের পরাজয়ে তার অতীত ডুবে গেছে ব্যর্থতার বিষাদে, তেমনি করেই হয়ত সুলেখারও প্রথমরাগ নূতন দাম্পত্য-প্রেমের আনন্দে ও জীবনের জয়ছন্দে তলিয়ে গেছে।

বিমলই বা এখন কোথায়? বি-কে-সি কি বিমল নয়? না, না—এ ত' শুধু স্বপ্ন, মিথ্যা স্বপ্ন। বিমল নয়, বিমল মরতে পারে না, সুলেখার বিয়ে হতে পারে না। এ মিথ্যা।

আধ ঘণ্টার রাস্তা তারা প্রায় দু' ঘণ্টায় অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌছল। সেতুটির সন্নিকটে তারা নদীর তীরে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে নদীর গর্জন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। বর্ষার জলে নদীটি কূল ছাপিয়ে উঠবার প্রতীক্ষা করছে। যে কোন সময় প্লাবিত হতে পারে। পিচ্ছল পথ, একবার অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষিপ্ত নদীবক্ষে পিছলিয়ে পড়লে বাঁচবার উপায় নেই।

অবসাদক্লান্ত নিদ্রালু শয্যা ত্যাগ করে যারা ভয়ংকর ও দুস্তর পথ অতিক্রম করে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তারা সৈনিক।

আর যারা নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে বরণ করে সেতুটিতে ডিনামাইট বসাতে এগিয়ে এসেছে তারাও সৈনিক।

এ কি আত্মদান না আত্মনিগ্রহ? এরা কেন এমনিভাবে আত্মনিগ্রহ করে? রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ—জনসাধারণ কেন প্রাণ দেয়—প্রাণ গ্রহণ করে। বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দশায় ত' জনসাধারণকেই পড়তে হয়। এ কথা জেনেও এরা কি করে পাপ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে? এই আত্মনিগ্রহের মূল্য ত পররাষ্ট্রগ্রাস কিংবা পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক শঠতা ও বর্বরতায় অর্জিত স্বৈরাচারপূর্ণ জমিদারী সংরক্ষণ! মানুষকে মানুষ খুন করে বর্বর ক্ষমতা লাভের জন্য,সভ্য রাষ্ট্র কি করে মৃত্যু নিয়ে এমনিভাবে ইতরমি করতে পারে।

এরাই সৈনিক। কেন জীবন দেয় এবং সংহার করে পশুর মত জীবন—তা' এরা জানে না। ভ্রান্ত দেশপ্রেম ও ব্যক্তিত্বহীনতা, বিবেকবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যহীন পশুর মত ধ্বংসযজ্ঞে বলিদান করে। ইহাই রাষ্ট্রনীতি—ইহাই সভ্যতা। যে যত ব্যাপকভাবে—মনুষ্যসমাজ, ধনসম্পত্তি, ঐতিহ্য, শিল্প ধ্বংস করে অপরকে পদানত করতে পারে—সেই তত বড় ও সভ্য এবং বিশ্ব-আইনকানুনের নিয়ন্তা।

এমন নিকষ কালো দুর্যোগভরা রাত্রে ক্ষিপ্ত নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভাসিয়ে কোন লোক যে বিরাট একটি সেতু উড়িয়ে দেবার জন্য আসতে পারে তা' রঞ্জিতের ধারণাতীত ছিল। কোন লোক সজ্ঞানে এমন নির্বোধ দুঃসাহস প্রকাশ করতে পারে না। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ একটি ডিঙ্গী প্রবল স্রোতে ভেসে এসে পুলের থামে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তলিয়ে গেলএবং একটি বোমার বিস্ফুরণ হল। বিস্ফুরণের শব্দে রঞ্জিত সচকিত হয়ে সেতুর নীচে সার্চ লাইট ফেলতেই বিস্মিত হয়ে গেল। এক দল লোক সেতুর থামে থামে বোমা, ডিনামাইট প্রভৃতি স্থাপন করে যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্র দলের যে নেতৃত্ব করছে সে একজন মহিলা। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রঞ্জিত শিহরে উঠল। স্বপ্নের নায়িকা কি করে বাস্তবরূপ ধরে চোখের সুমুখে শত্রুরূপে দেখা দিল। তবে কি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি!

মুহূর্ত বিলম্ব চলে না, শত্রুরা সংখ্যায় মাত্র পাঁচ জন। পাঁচ জনকেই হঠাৎ একসঙ্গে হত্যা করতে হবে, যাতে ডিনামাইট বিস্ফুরণ করবার অবকাশ না পায়।

অতি সতর্কতার সঙ্গে গুলি বর্ষিত হল এবং ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করে লোকগুলি নদীবক্ষে ছিটকে পড়ল। মৃতদেহগুলির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেতুটি রক্ষা পেল। রঞ্জিতও সেতুর উপর উঠে এল এবং ডিনামাইট ও বোমাগুলি সরিয়ে ফেলবার জন্য আদেশ দিল।

হঠাৎ দেখা গেল একজন মহিলা-সৈনিক দ্রুত অপর তীর অভিমুখে চলে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট কতকগুলি বোমা সেতুর উপর রেখে যাচ্ছে। রঞ্জিত আর বিলম্ব করল না, রাইফেল তুলে গুলি ছুড়ল। মহিলাটি কোনরূপ কাতর শব্দ না করে ওপারে ছিটকে পড়ল এবং পরমুহূর্তে অদূরে স্থাপিত বোমা লক্ষ্য করে কম্পিত হস্তে রিভলবার তুলে গুলি চালাতে লাগল।

বোমা ও ডিনামাইটগুলি বিকট শব্দে বিস্ফুরিত হতে লাগল এবং সেতুটি টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দ্দিকে ছিট্‌কে পড়তে লাগল।

সব যখন শান্ত হল তখন ওপারে একটি নারীদেহ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন সেতুর নীচে পাওয়া গেল। একটি পা দেহচ্যুত হয়ে কোথায় যে উড়ে গেছে খুঁজে পাওয়া গেল না। মাথাটা থেঁত্‌লে গেছে, একটি বাহু চর্মের বন্ধন ছিন্ন করবার

অবকাশ না পেয়ে ঝুলে আছে। জমাট রক্তে বিকলাঙ্গ মৃতদেহটাকে বীভৎস ও ভয়াবহ করে তুলেছে।

দেহ তল্লাসীতে একটি পরিচয়জ্ঞাপক ভগ্ন কার্ড পাওয়া গেল। তাতে লেখা রয়েছে শ্রীমতী সুলেখা চ্যাটা··· ············ঝান্সী·········

বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে রঞ্জিত সরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সুলেখার নাম শুনে সে আঁত্‌কে উঠল, সর্বাঙ্গ তার হিমশীতল পরশে যেন শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

এও কি শুধু মাত্র স্বপ্ন, শুধু মাত্র জাগরণে মিথ্যা দুঃস্বপ্নের কুহেলিকা! নিদ্রা শেষে এ দুঃস্বপ্ন কি মিথ্যা হয়ে যাবে না?

সৈনিক জীবন চরম বাস্তব, এর কোথায়ও কোন মিথ্যা লুকিয়ে থাকে না।

শ্রবণ বেলগোলা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহীশূর রাজ্যে প্রাচীন শিল্পের যে সব নিদর্শন আছে, তাদের মধ্যে জিন শ্রমণ গোমত রায়ের প্রস্তর মূর্ত্তি অন্যতম। প্রায় পাঁচশত ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের শিরে মন্দির। তার প্রাঙ্গণে ৫৭ ফুট উচ্চ নিগ্রর্ন্থ মুমুক্ষুর প্রস্তর মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখা যায় বহু দূর হ'তে। মনে হয় যেন শৈলেরই একটা শিখর।

রোড্‌সের কলোসাস বিদ্যমান নাই। সুতরাং তার বৃহত্ত্বের পরিমাপ কতটুকু ইতিহাসমূলক, আর কতটুকু কল্পিত সে কথা বলা কঠিন। ভারতবর্ষের বাহিরে মাত্র দুটি অতি বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। উভয় মূর্ত্তিই মিশরের। দ্বিতীয় রমেসিস্‌ ভূপালের সমাধি মন্দিরের উপর এক মূর্ত্তি আছে ৫৭ ফুট উচ্চ। মূর্ত্তি আন্দাজ খৃষ্টের সাড়ে বারো শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। আমাদের গোমত রায় এই অপূর্ব্ব দ্বিতীয় রমেসিস মূর্ত্তির সমান উচ্চ।

থীব্‌সের নিকট নীল নদীর তীরে মিশরের দ্বিতীয় অতিকায় মূর্ত্তি ৬· ফুট উচ্চ। কিন্তু যে পুস্তক এই মাপ লিপিবদ্ধ করেছে, তার মতে গোমত রায়ের উচ্চতা ৭০ ফুট। এ হিসাবে ভারতের বিরাট মূর্ত্তিই প্রথম স্থানের যোগ্য। এ মূর্ত্তি সৃষ্টি হ'য়েছিল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতকে। মিশরের

দক্ষিণে আবু সিম্বেল মন্দিরে দ্বিতীয় রমেসিসের ৬৫ ফুট উচ্চ যুগ্ম মূর্ত্তির প্রত্যেকটি ঐ পুস্তকের বর্ণনায় ৬৫ ফুট। আফ্‌গানিস্থানে বুদ্ধদেবের একটি উৎকীর্ণ মূর্ত্তির উচ্চতা শত ফুট।

গোমত রায়ের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য, শিল্প-নিপুণতা এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভাস্কর-বিদ্যার এক অসাধারণ সাফল্য। আমি যখনই কোনো পাথরের মূর্ত্তি বা কমনীয় পুতুল দেখি, তখনই মনে হয় প্রস্তরশীলাকে কঠোর বা নীরস বলা সত্যের অপলাপ। মানুষ শিল্পী শীলা-খণ্ডে নিজের মনের আদর্শ সুন্দরকে প্রকৃষ্টভাবে রূপ দিতে পারে। আলেখ্য কথা কয়। কিন্তু পাষাণ দেবতাও কথা কয় আপামর সাধারণের সঙ্গে। চিত্র হ'তে সম্যক আনন্দ লাভ করতে দর্শকের চক্ষুকে শিক্ষা দিতে হয়। বৃহদায়তন গোমত রায়ের

তোরণ

মুখের প্রসন্ন, সরল, নিষ্পাপ ভাব মানুষের উপর মানুষের শ্রদ্ধা বাড়ায়। পুঁথি-পড়া পণ্ডিতকে স্বীকার করতে হয় শিল্পীর কাব্য, কলমে লেখা নয়, হাতুড়ী, ছেনী এবং বাটালীতে প্রকটিত অন্তস্তলের উদ্বুদ্ধ কবিতা।

জৈন তীর্থঙ্কর পুরুদেবের পুত্র ছিলেন গোমত রায়। তাঁর আজানুলম্বিত বাহুর জন্য তাঁর নাম ছিল ভুজবলী বা বাহুবলী। পিতার সিংহাসনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে অধিষ্ঠিত হ'তে না দিয়ে বাহুবলী রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম হ'তে তাঁর মনে অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল দেবত্ব। তিনি জ্যেষ্ঠের হাতে জিত রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রে, নিজে সিদ্ধিলাভের জন্য বনে গমন করেছিলেন। তার পর তিনি শ্রমণ হন।

এ ঘটনা কবে ঘটেছিল তা নির্দ্দিষ্ট রূপে বলবার ধৃষ্টতা আমার নাই। প্রত্ন-তত্ত্ববিদের বিচারও সকল ক্ষেত্রে আমাকে অভিভূত করে না। সন, মাস, তারিখের উপর অনন্ত-চাওয়া হিন্দু কোনো দিন নির্ভর করে নি—তাদের সাহিত্যে, দর্শনে, পুরাণে বা ইতিবৃত্তে। যেখানে ভারতবর্ষের জীবনের পথে বাহিরের কোনো প্রাচীন জাতি দেখা দিয়েছে, সেই বিদেশী জাতির বর্ণনা হ'তে কতকগুলা ঐতিহাসিক কালের সময় নির্দ্দেশ করতে পারা যায়। বেদে, মহাভারতে এবং পুরাণে উল্লিখিত নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণনা হ'তে কোনো কোনো মনীষী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতির সময় নির্দ্ধারণ করেছেন। মনীষা এবং অঙ্কের দেবতা প্রণম্য।

শ্রবণ বেলগোলায় কবে শ্রমণ গোমত রায়ের অতিকায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার হিসাব মহীশূরের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির করেছেন। শিলা-লিপিতে ব্যক্ত যে গোমত রায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গাঙ্গেয় রাজবংশের

গোতম রায়-মূর্ত্তির উর্দ্ধাংশ

রাজমল্ল সত্যবাক্য ভূপতির মন্ত্রী চামুণ্ড রাজার আদেশে। ঐ ভূপতির রাজত্বকাল গণনা ক'রে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে খৃষ্টীয় ৯৮৩ সালে এই বিশাল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'য়েছিল।

শ্রবণ বেলগোলা তীর্থ-ভূমি দর্শন এবার মহীশূর যাওয়ার আমাদের অন্যতম কারণ ছিল। দশেরার উৎসবঘোরে মগ্ন থাকে মহীশূর। সহরের আনন্দ যখন একটু কম হ'ল, হোটেল মেট্রোপোলের শিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ লোবো সাহেব পরামর্শ দিলেন অচিরে শ্রবণ বেলগোলা যাবার। কানাড়ী ভাষায় বেলগোলা মানে শ্বেত-সরোবর। স্থানটি মহীশূর সহর হতে ৬২ মাইল দূরে।

প্রত্যেক হোটেলের আশ্রিত এক একজন সর্ব্ব-কর্ম্মের মুরুব্বী থাকে। সে যাত্রীকে যত্ন ক'রে সুবুদ্ধি দিয়ে তার সহায়তা করে, আর নিজের যৎকিঞ্চিত লাভের সুবিধা করে। মহীশূরের রাজ-হোটেল মেট্রোপোল। তার যাত্রীর সহায় পাঠান।

পাঠানের নাম কেহ জানে না। সে মালাবারের লোক। কবে তার বংশের কে টিপুসুলতানের ফৌজে কাজ করত। সেই ঐতিহ্য পাঠানের গৌরব।

তার দু'খানা মোটর গাড়ি আছে, আর দু'খানা টাঙ্গা। প্রত্যেকটি তক্তকে ঝক্ঝকে। সদাই হোটেলের বাগানে পাঠান মিঞা দাঁড়িয়ে, যাত্রীদের মেজাজ এবং আবশ্যক বুঝে যানবাহনের বন্দোবস্ত করে। তার বক্তৃতা মেয়েমহলেই বেশী।

আমার স্ত্রীর কাছে বক্তৃতা দিয়ে পাঠান আমাদের বহু তীর্থ করালে। সে উর্দ্দু বলে। আমার স্ত্রীকে বোঝালে—মায়িজী শ্রবণ বেলগোলামে পীরকা মুরত একশো ফুট উঁচা। উঃ! কেয়া খোদাকা মেহের বাণী আওর হামারা মুলুককা খোদাইবালাকা বাহাদুরী।

কিন্তু বাহাদুরী দেখাতে সে কম গাড়ি ভাড়া নেবে? মাত্র তেলের দাম, টায়ারের লোকসান ইত্যাদি হিসাব করে মাসুল ধার্য্য করলে দেড়শত টাকা। শেষে রফা হ'ল ১২৫৲ টাকায়—৬২ মাইল পথ যাওয়া আসা।

দিনটা ছিল মেঘলা আর ঠাণ্ডা। আমাদের নাতনী শমিতাকে ভুলিয়ে দাসী চাকরের জিম্মায় রাখবার ব্যবস্থা হ'ল। তখন মহীশূরে শিল্প-প্রদর্শনী হ'চ্ছিল। খুকু সেখানে পুতুল কেনবার আশায় বিশেষ উপদ্রব করলে না। হোটেলের ম্যানেজার খাবার দিল সঙ্গে। পাঠান তার ড্রাইভারকে কানাড়ী ভাষায় যা' বলবার বোলে, শেষে উর্দ্দুতে বল্লে—খবরদার মায়িজী-লোককা কুছ্ তক্‌লিফ্ নেহি হোয়। সেরিঙ্গাপটাম ভি দেখ্‌লায় দেঙ্গা।

তার ভাষা ব্যাকরণশুদ্ধ নয়।

ভোরের আলোয় মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে, সুন্দর রাজপথে যেতে যেতে বুঝলাম, দেশের রাজা যদি মঙ্গলকামী হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়িয়ে দেবার স্বার্থান্ধ লোক যদি দেশে না থাকে, ভারতবাসী অল্পে তুষ্ট হ'য়ে স্বর্গসুখে নিজের জন্মভূমিতে বাস করতে পারে। কাবেরী নদীকে বেঁধে, রাজ্যময় খাল কেটে, মহীশূর ধনধান্য পুষ্পভরা। হরিতক্ষেত্র কাঁচা ধানের উপহার মাথায় নিয়ে আনন্দে দোল খাচ্চে। দেশের কৃষক-পত্নী, কুলি-রমণী, গোয়ালিনী এবং উকীল-ঘরণী সবাই রঙীণ সাড়ি ভূষিতা। সকলেরই মাথায় বেণীমূলে ফুল গোঁজা। প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসালয়, প্রসূতি বিরামাগার, এমন কি দুচার গ্রাম অন্তর পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা। মা চামুণ্ডা যেন শান্তি বর্ষণ করছেন রাজ্যে। মানুষ সবাই প্রাসাদবাসী নয়। কিন্তু ঝক্ঝকে তক্তকে কুটীরগুলি শান্তির আগার। অন্ততঃ আমাদের সবার মনে সেই ধারণা জন্মেছে এবং বাহিরের সকল লোক ঐ কথাই কয়—ইংরাজ অবধি।

আমার পুত্র এবং পুত্রবধূ দুবছর পূর্ব্বে শ্রবণ বেলগোলা গিয়েছিল উটী হ'তে। তখন থেকে তাদের সখ আমাদের সেই গৌরবস্থল না দেখিয়ে পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে দেবে না। কুড়ি মাইল যাবার পরই পুত্র একটা দূরের পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—বাবা ঐ ইন্দ্র পাহাড়। বধূমাতা একটু সন্দিগ্ধ নয়নে তার দিকে তাকাল।

দূরে পাহাড়ের মাথার উপর যেন একটা শৃঙ্গ। তার পাশে আর একটা পাহাড়। ছবি দেখে আমার যা জ্ঞান হয়েছিল সে অভিজ্ঞতা আমায় নিঃসন্দেহ করলে ইন্দ্রগিরি সম্বন্ধে। অতঃপর গাড়ি হ'তে এক

সোপান পথে ডুলি

মাঠে নেমে সারথীর সাক্ষ্যগ্রহণ ক'রে স্থির করা গেল যে পাহাড়ের মূর্ত্তি আপাততঃ গিরিশৃঙ্গ রূপে প্রতীয়মান।

তারপর মাঝে মাঝে সে দৃষ্টির বাইরে যায়, আবার অবসর মত নয়নপথে পড়ে। ইতিমধ্যে মাঠের শোভা দেখি, বনের দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হই, এবং গ্রামের সুখদুঃখের কল্পনা করি।

অথণ্ড হিন্দুস্থানের একটা অসুবিধা মাদ্রাজী নাম, বিশেষ স্থানের। মাদ্রাজ হতে বাঙ্গালোরের পথেই আছে বিল্লীভক্কম। যাক্ সে কথা। শ্রবণ বেলগোলার সন্নিকটে ছন্নরায়পাটন। বেশ পরিষ্কার ছোটো সহর। তারপর আবার মাঠ, খাল, বিল, অবশেষে শ্রবণ বেলগোলা। যত কাছে অগ্রসর হলাম, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলে ক্ষপণকের মূর্ত্তি।

বিশাল পাথুরে শৈল, মাটি নাই, গাছপালা নাই। গায়ে কাটা প্রায়

পাঁচশত সোপান। ওঠবার মুখে ফটক। দুখানা পাথরের থামের মাথায় একখানা এড়ো পাথর।

বলেছি, জগদম্বা মা চামুণ্ডার কৃপায় দিনটা ছিল মেঘলা। তবু সিঁড়ি ভাঙ্গতে হ'বে। স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দুর্ব্বলের মনের বল চিরকাল প্রবল। নিশ্চয় পারব, বল্লেন তিনি।

পথের কষ্টকে হ্রাস করলে। ফাঁসিকাঠের আকারের প্রবেশ পথ পার হয়ে প্রায় দুশো ফুট উচ্চে একটি ছোট মন্দির আছে। দর্শনের অজুহাতে সেখানে একটু বিশ্রাম করলাম। কিন্তু যখন শৈলশিরে উঠে গোমতেশ্বরের পূর্ণ দর্শন পেলাম, সকল কথা ভুলে গেলাম বিস্ময়ে। কারণ—

মূর্ত্তির উচ্চতা	৫৭ ফুট
শ্রীচরণ	৯ ফুট
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ	২ ফুট ৯ ইঞ্চি
অর্দ্ধেক জঙ্ঘা	১০ ফুট
কোমর	১০ ফুট
মধ্যম অঙ্গুলী	৫ ফুট ৩ ইঞ্চি

অথচ এই বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তির মুখ প্রসন্ন, অন্তরের জ্ঞানে দীপ্ত, শিশুর মত সরল, দেবতার মত সুখ-দর্শন। সিদ্ধির শান্তি এবং সংযত-চিত্ত মানুষকে কত সুন্দর করতে পারে, সেই পরিকল্পনা মূর্ত্ত হয়েছে এই পাষাণ-মূর্ত্তির গঠনে।

মাঝে প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বারান্দা। তার পিছনে তিনদিকে ছোট ছোট মন্দির-প্রকোষ্ঠ। যেমন এদেশের চক-মিলানো অট্টালিকা হয়। প্রত্যেক মন্দির-গৃহে এক একজন জিন-অর্হতের মূর্ত্তি—ধ্যানী মূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের এবং জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি-রচনার আকার এবং প্রকারে প্রভেদ আছে। এ তীর্থ-দিগম্বর সম্প্রদায়ের, তাই প্রত্যেক মূর্ত্তি নিগ্রন্থ। মূর্ত্তিগুলি কন্নাদ হৈশাল শিল্পের সুনৈপুণ্যের মনোরম নিদর্শন। ঋষিদের নাম লেখা আছে প্রত্যেক মন্দির-কক্ষে। প্রাঙ্গণে বিরাট মূর্ত্তি বিদ্যমান না থাকলে শিল্প-প্রিয়ের এই চব্বিশটি মূর্ত্তিই আনন্দের কারণ হ'ত। আমি ভক্তদের কথা বলছি না।

চামুণ্ডা পাহাড়ের নন্দী

চব্বিশটি তীর্থঙ্কর—আদিশূর, অজিত-নাথ, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি-নাথ, শ্রেয়াংশ, বাসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্ম্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্তুনাথ, অরনাথ, মল্লীনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, বর্দ্ধমান।

অতঃপর সমবেত ভদ্র-মণ্ডলী অবোধ্য ভাষায় যে সব কথা বল্লে দ্বিভাষী ড্রাইভারের সাহায্যে বুঝলাম যে তাদের অর্থ ডুলি আসছে। কিন্তু যখন ডুলী এলো, তার সঙ্গে এলো হাসি, পাগলের হাসি, অশিষ্টের হাসি। একটা ছোট রেলিঙ-ঘেরা চারপাইকে বাঁশে দোলানো। সেই বাঁশে কাঁধ দেবে ডুলী-বাহক। কিন্তু যাঁর জন্য এ ব্যবস্থা তিনি বিদ্রোহিণী। শেষে আমাদের সম্মিলিত অনুরোধে শ্রীমতী ডুলীতে বসলেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদেরও

পরে একথা নিয়ে আমার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয়কে পরিহাস করেছিলাম। জীবন্ত এবং গতায়ু মানুষের পূজার নিয়ম এক। ধন, মান, যশের আয়তনে জীবিত মানুষ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অবশ্য দেবতা পরি-

কল্পনায় মনকে শিখিয়ে, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির আশারূপ ঘুষ দিয়ে ঋষিরা আমাদের অন্তঃকরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণপতির প্রণাম এবং পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মন্দির গৃহে যে চতুর্দ্দশ ঋষির মূর্ত্তি আছে, তাঁরা সাধনবলে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাই এঁরা জিন-ভগবান। কিন্তু প্রাঙ্গণের অতিকায় মূর্ত্তি প্রথমেই আমাদের শ্রদ্ধার দাবী করলেন, আয়তনের বিশালতায়। মহিলারা গোমতরায়ের বিরাট পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন— পরিবারের শান্তি, স্বাস্থ্য এবং শ্রীবৃদ্ধির বিরাট আশীর্ব্বাদ লাভের প্রত্যাশায়!

গোমতেশ্বরের সিদ্ধিলাভের ঐতিহ্যকে রূপ দেবার জন্য তাঁর মূর্ত্তির প্রকাণ্ড পায়ের দুপাশে পাহাড়ের চিত্র। তার গহ্বর হ'তে সর্পভুক গোধা উপাদান হিংসা। হিন্দুশাস্ত্রই কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে ষড়রিপুও বলেছে এবং মেনে নিয়েছে যে এরা মানুষের স্বধর্ম্ম।

গোমতরায়ের মূর্ত্তির পা বয়ে গাছের ডালপাতা উঠেছে। তাঁর পার্শ্বের চামরধারিণী নারী-মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য পরিবেশকে সমীচীন না করলে, শিল্প ফোটে না। বারান্দার ছাদের পাথরের টালির খোদাই মূর্ত্তিও মধুর। একখানি চিত্রের নিদর্শন দিলাম এই প্রবন্ধে। মন্দির প্রান্তরে প্রবেশের তোরণ একখানা বড় পাথর কেটে নির্ম্মিত।

ইন্দ্রগিরি পাহাড়ে দেখবার আরও অনেক গৌরবময় দৃশ্য আছে। শিখরে ওঠবার পূর্ব্বে তয়াগদ (তথাগত?) ব্রহ্মদেব স্তম্ভের কারুকার্য্য

পদপূজা

মুখ বার করেছে, মুগ্ধ হয়ে অর্হতের শান্তির ছায়ায় হিংসার সংস্কার বিস্মৃত। কে জানে ভারতবর্ষের এ উচ্চ আদর্শ কোনোদিন মানুষের সমাজ গ্রহণ করবে কিনা? আমার পুত্র জয়দেব বল্লেন—আপাততঃ কেন? কোনো দিন যে জগৎ হিংসা ভুলবে তার কোনো লক্ষণ ইতিহাসে কোথাও প্রকটিত হয়নি।

তার জননী বল্লেন—যুদ্ধে যত অর্থ ব্যয় হয়েছে, তাতে সারা বিশ্বে নূতন কৃষি, শিল্পের যুগ আনতে পারত মানুষ।

পবিত্র স্থলে আর ওসব কথার আলোচনা করলাম না। কারণ অনিত্য মায়াময় ভুবন আনে অসমান বুদ্ধি, বৃত্তি এবং সংস্কার, যাদের একটা মনোহর। পাদপীঠে স্তম্ভ বসানো। দুখানি পাথরের মধ্য দিয়ে একখানি রুমাল চালিয়ে দিয়ে অন্যদিকে বার করে নেওয়া যায়। এর শিলা-লিপি হ'তে অবগত হওয়া যায় যে চামুণ্ডরায় এই কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন দিনে এস্থলে অন্নবস্ত্র বিতরিত হ'ত।

বেলগোলা গ্রামের সরোবর স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। গ্রামে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এ গ্রাম সাগর পৃষ্ঠতল হ'তে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চে।

ইন্দ্রগিরির সম্মুখে অপর একটি শৈল আছে। তার নাম চন্দ্রগিরি। এ পাহাড়ের উপরেও মন্দির বিদ্যমান। এ অঞ্চল এক সময় জৈনদিগের বাসস্থান ছিল। অবশ্য ধর্ম্মমত এদেশে বহুবার বদলেছে। তাই শৈব,

বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ উপাসক পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ ক'রে জাতীয় জীবন-শক্তি অপচয় করেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য্য যে য়ুরোপে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধের অনুরূপ হিংসা ও রক্ত-লোলুপতা দৃষ্ট হয়নি ভারতের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে।

বলেছি মহীশূর হ'তে বেলগোলার রাজপথ মনোরম। ফেরবার সময় একটা মাঠে আমরা একপাল হরিণ দেখেছিলাম। বোধ হয় সাধারণের পক্ষে মৃগয়া নিষিদ্ধ। তাই কৃষকের লগুড়ের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে তারা মায়া-মৃগের মত বিচরণ করছিল প্রান্তরে।

মহীশূর রাজত্বে বাকী প্রাচীন কীর্ত্তি যা দেখেছি আর যা দেখব, সে কথা আলোচনা করা ভিন্ন এখন আর অন্য কাজ রহিল না। মহীশূরের পরিখার মত চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ নন্দী ষাঁড়ের কথা মনে হল। এ অতিকায় কালো পাথরের অপূর্ব্ব সুশ্রী নন্দী কত বড়, আনুপাতিক চিত্রে বোঝা যাবে। অন্যত্র বলেছিলাম তাঞ্জোরের ষাঁড় অতি বড়। তখন চামুণ্ডা পাহাড়ে তার রাজ-সংস্করণ দেখিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হয় এসব অতিকায় ভাস্কর্য্য নির্ম্মিত হ'ল কোথা? অন্যত্র গঠন করে পাহাড়ের উপর তুলতে আধুনিক বলবিদ্যা এবং অতি শক্তিশালী মার্কিনী ক্রেন হিমসিম খাবে। আমার বিশ্বাস ঐ সব স্থলে বৃহদাকারের আগ্নেয় শীলা ছিল পাহাড়ের অংশ। তাদেরই কেটে রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কার্য্যও শ্রম, শিল্প এবং প্রভুত বিচার-বুদ্ধি সাপেক্ষ। গঠন ক'রে রূপ সৃষ্টি করার একটা সুবিধা হচ্চে যে ভুল হ'লে, আবার ভেঙ্গে নূতন করে গড়া যায়। কিন্তু ভাস্কর্য্যে একটু ভ্রম হ'লে, পাথরটা বাতিল হয়। কাজেই প্রকাণ্ড পাষাণ কেটে অতিকায় ঋষির মূর্ত্তি রচনা সূক্ষ্ম শিল্প।

শ্রবণ বেলগোলায় ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে দেশ-বিদেশ হ'তে জৈন তীর্থযাত্রী আসে। আমরা যোধপুরের এক পরিবার দেখলাম। সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার, কারণ মহিলার অনেক হীরক-খচিত আভরণ। একবার চিদম্বরমে এক নায়ার মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি ইংরাজি বলেন কিন্তু পায়ে সোনার মল। শিক্ষার সঙ্গে নিজের দেশাচার বজায় রেখেছেন দেখে আমার স্ত্রী তাঁকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আমাদের প্রণামী দিতে চাইলেন, আমার স্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন যে দক্ষিণে ব্রাহ্মণেতর জাতি মন্দিরে তেমন শ্রদ্ধা পায় না, তাই আমার যজ্ঞোপবীত অত ঘটা ক'রে দেখানো হ'চ্চে। আসলে আমি ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন লোক।

ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব'লে আমরা বেলগোলার ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করলাম না। মাইল দুই এসে ইন্দ্রপাহাড়ের পিছনে এক গিরিনদীর কূলে শিলাখণ্ডে বসে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম। গোমতেশ্বরের প্রশস্ত পৃষ্ঠ দেশ ছিল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

স্ত্রী বল্লেন—তীর্থস্থান থেকে এসে যা' তা' ভোজন, এই হ'ল এ যুগের ভণ্ডামী।

আমার মনে যে ভাব বহুক্ষণ উদয় হচ্ছিল সেই কথা বল্লাম। খৃষ্টের নামে যুদ্ধ শেষ করবার যুদ্ধ করে খৃষ্টান, আনবিক বোমা সমেত। আর জয়ের জন্য পাদ্‌রীরা গীর্জ্জায় প্রার্থনা করে। সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের পুণ্য-স্মৃতি অমর করবার বাসনায় মানুষ আঙ্কুরভট বরোবুদর, অনুরাধাপুর ও বুদ্ধগয়ায় রাজ-রাজেশ্বরের উপযোগী মন্দির নির্ম্মাণ করেছে। জৈন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী নির্গ্রন্থ দিগম্বর অর্হৎদেব নামে শিল্পী ও তার পৃষ্ঠ-পোষক কুবের-ভক্ত গড়েছে দিলবারা মন্দির আবু পাহাড়ে। আর বনবাসী নির্ব্বাসিত শ্রীরামচন্দ্রের শিব-পূজার ঐতিহ্য জাগিয়ে রাখবার জন্য দক্ষিণ ভারতের ভক্তরাজার অমর কীর্ত্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বরের ভুবন বিখ্যাত শ্রীমন্দির।

পুত্রবধূ শ্রীমতী চিত্রিতা বল্লেন—আধুনিক লড়াই ছাড়া বাকীগুলা তো ভক্তির প্রমাণ।

আমি বল্লাম—ভোজনটাও। তাঁরি দেওয়া দেহকে পুষ্ট ও সুস্থ রাখলে কাল পরশুর মধ্যে প্রাচীন সোমনাথ মন্দির দেখতে পাব। আত্মার সার্ব্বজনীন মুক্তি স্রষ্টা, চাননা। তাহলে তাঁকে সৃষ্টির লীলা বন্ধ রাখতে হবে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ই চিরানন্দের আনন্দ-লীলা।

অসমতল

শ্রীনীরেন গুপ্ত

দুর্য্যোগভরা এক রাত্রিশেষের প্রভাত। সারারাত ঝড়বাদলের অবিশ্রান্ত মত্ততার পর প্রকৃতির রূপ এখন রণক্লান্ত যোদ্ধার মত অবসন্ন।

রাজপথের ধারে প্রকাণ্ড আসবাবের দোকানটার বন্ধ দরজা খুলে গেল। দোকানের কর্ম্মচারী ম্যানেজারবাবু ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে ওধারের একটা জানালা কেমন করে খুলে গেছে—তারই মধ্য দিয়ে জলের ঝাপটা এসে সামনের টেবিলটাকে স্পর্শ করেছে,—এখানে ওখানে তারই অস্পষ্ট চিহ্ন। সামনের দরজার কবাটগুলো এক এক করে খুলে দিতেই আসবাব-পত্রের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আধুনিকতম ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, আলমারী, সোফা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দামের লেবেল গায়ে ঝুলিয়ে। কোনের জানালাটা খুলে দিতেই একঝলক আলো এসে গদিআঁটা ডবল্ কাউচটার উপরে পড়ল। ম্যানেজার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন কাউচের নরম গদির বুকে

গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছে একটা শীর্ণদেহ বালক। পোষাক ও চেহারা থেকেই বোঝা যায় সে নিরাশ্রয় পথের ভিক্ষুক।

মূল্যবান কাউচের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হল ভেবে ম্যানেজার আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাঁ হাতে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরে একটানেই সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন তাকে। অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে হতভাগ্য কাঁপতে লাগল।

ম্যানেজারের চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল, কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠল —কী মতলবে এখানে সেঁধিয়েছিলি শয়তান?

কাঁপা গলায় মৃদুস্বরে সে বললে—ঝড়বাদলে কোথাও আশ্রয় পাইনি বাবু।

—সেজন্যে দরজা ভেঙ্গে এখানে সেঁধিয়েছিলি?—প্রবল উত্তেজনায় ম্যানেজার অপরাধীর দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন—নিশ্চয় চুরির মতলব করেছিলি, বেটা ঘুঘু কোথাকার!

—না, বাবু না, শুধু ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

ম্যানেজার ধমকে বললেন—ইস্, ঝড়বৃষ্টি যেন ওকে গিলে ফেলত। তা না হয় ভেতরেই ঢুকেছিলি, কিন্তু কাউচের গদির ওপর গিয়ে বাদশাহী ঘুম ঘুমিয়েছিলি কেন রে কুকুর?

করুণ আবেদনের সুরে অপরাধী বললে—ঘুম—বড় ঘুম পেয়েছিল—তিনরাত ঘুমাই নি।

ম্যানেজার অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফস্ করে তার একখানা কান ধরে বললেন—তা গদি ছাড়া নবাবের ঘুম হয় না—না? রাস্তার ফুটপাতগুলো আছে কী করতে?

ছলছল চোখে সে বললে—এবারটা ছেড়ে দিন বাবু, আর কখনো—

—কিন্তু দামী কাউচটাকে দাগ লাগিয়ে নোংরা করেছিস্ তার কি শুনি?—কান ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন কাউচের কাছে—দে ব্যাটা, ক্ষতিপূরণ বের কর এখনি।

অপরাধী এবার কেঁদে ফেললে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিশীর্ণ নোংরা মুখের ওপর দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঝাড়নটা এনে ম্যানেজার ওর হাতে গুঁজে দিলেন, বললেন—কাঁদলে চলছে না। এই নে ঝাড়ন। ওটা পরিষ্কার করে দিলে তবে ছাড়া পাবি।

কাউচের এখানে ওখানে কিছু কিছু ধুলো লেগেছিল। ভাল করে ঝাড়তেই উঠে গেল। তারপর ম্যানেজারের আদেশে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হল, দয়া করে আর কোনো শাস্তি দেওয়া হল না।

রাস্তার ধারে মোটর থামিয়ে সাহেবী পোষাকপরা এক বাবু ভারিক্কী চালে এসে আসবাবের দোকানে ঢুকলেন। ম্যানেজার সসম্ভ্রমে উঠে বিনীতভাবে সামনের চেয়ারটা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্যে।

—আমি কিছু আসবাব কিনতে চাই। আগন্তুক বললেন।

ম্যানেজার বললেন—দয়া করে এই আসবাবগুলো দেখুন, যদি কিছু পছন্দ হয়, অথবা order পেলে আমরা আপনার মনের মত তৈরী করিয়ে দিতে পারি।

—অত সময় নেই। প্রথমেই একটা ছোট ড্রেসিং টেবিল চাই।

—এই যে একটা আছে with double glass।

—এটা বড্ড বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা এইটে দেখুন। এতে চলবে কি?

—হ্যাঁ, এটা চলতে পারে। তারপর একটা ডবল্ কাউচ চাই।

ম্যানেজার একখানা সুন্দর কাউচের কাছে ক্রেতাকে নিয়ে গেলেন, বললেন—আশা করি এতেই আপনার কাজ হবে।

ক্রেতা বললেন—ওই কোণের কাউচখানা একবার দেখতে চাই। ওর ডিজাইনটা ভাল লাগছে।

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ওর ওপরেই হতভাগা ছোঁড়া রাত কাটিয়েছিল, কোনো মলিনতা ক্রেতার চোখে ধরা না পড়ে।

—হ্যাঁ, এই কাউচখানাই নিতে চাই, আর চাই একটা মাঝারী গোছ চায়ের টেবিল। এই যে, এটাতেই হবে। আপনি বিল করুন। আমি দাম দিয়ে যাচ্ছি আর ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। আজকেই এগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

পকেট থেকে ক্রেতা একতাড়া নোট্ বের করলেন, আর বের করলেন নাম ঠিকানা ছাপানো একখানা কার্ড।

মিষ্টার অরুণ মিত্র, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট…

তার নীচে ঠিকানা।

আট মাস পরে। অরুণ মিত্রের স্ত্রী মিসেস্ রাগিণী মিত্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন—আমাদের furnitureগুলো বড্ড old-fashioned হয়ে গেছে।

মিঃ মিত্র বললেন—কথাটা আমিও ভাবছিলুম। চল না আজই New designএর খোঁজে বেরিয়ে পড়া যাক।

মিসেস্ মিত্র মাথা নেড়ে বললেন—Readymade জিনিষ বড্ড তাড়াতাড়ি পুরোণো হয়ে যায়। এবারে সব জিনিষ আমি order দিয়ে তৈরী করাব। তার design হবে এমন নূতন, যা সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

মিঃ মিত্র সংশয়ের সুরে বললেন—কিন্তু এরকম design—

বিজয়িনীর মত হেসে মিসেস্ মিত্র বললেন—আমার কাছে

Modern American furnitureএর একটা Catalogue আছে। তারই অনুসরণে এবারে আমাদের সব জিনিষ হবে। তুমি তোমার সেই fashion-houseএর ম্যানেজারকে একবার খবর দিও। Catalogue দেখিয়ে আমি নিজে তাকে সব বুঝিয়ে দেব।

—এ তো খুবই ভাল কথা। অনেক বিবেচনা করে মিঃ মিত্র বললেন।

মিসেস মিত্রের উপদেশ মতই আসবাব তৈরীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে বলে ম্যানেজার তাকে ভরসা দিলেন। মিসেস্ মিত্র মনে মনে ভাবলেন—ব্যতিক্রম যদি কিছু হয় সেটাও নূতনত্বই হবে এই যা সান্ত্বনা।

ফিরে আসবার পথে মিঃ মিত্রের বাড়ীর বাইরের দিকে একটা ঘরে ম্যানেজারের দৃষ্টি পড়ল। ঘরটা ব্যবহার করা হয় না বলেই মনে হল। তার মধ্যে পড়ে আছে অন্যান্য কতকগুলো আসবাবের সঙ্গে সেই ডাবল কাউচটা।

—এরই মধ্যে কাউচটা অব্যবহার্য্য হয়ে গেল? ম্যানেজার বললেন।

—না। মিঃ মিত্র বললেন—কাউচটা মোটে ব্যবহারই করি নি। কিনে আনবার পরই সকলে বলতে লাগলেন যে ওটা ভারী old-fashioned, তাই নূতন কয়েকটা তৈরী করিয়ে নিলুম। ওটা অতিরিক্ত আসবাব হিসাবে পড়ে আছে ওখানে।

কি জানি কেন ম্যানেজারের মনের মধ্যে একটা নাড়া লাগল! কাউচখানা দোকানে সাজানো ছিল চারমাস আর এখানে পড়ে আছে আটমাস। এই এক বছরের ভেতরে একটীবার শুধু এটা মানুষের প্রয়োজনে লেগেছিল—এক দুর্য্যোগের রাতে। ম্যানেজার স্পষ্ট দেখতে পেলেন পৃথিবীতে এমনি অনেক বস্তুই মানুষের প্রয়োজনে লাগছে না—যাদের কিছু নেই তাদেরও নয়, যাদের আছে অতিরিক্ত তাদেরও নয়। অসমতল এই পৃথিবীর প্রান্তর—কোথাও বা অভাব তার, কোথাও আতিশয্য।

পৃথিবীর একটা নীতিহীন সত্য আজ সামান্য একটা কাউচের মধ্য দিয়ে ম্যানেজারের কাছে আত্মপ্রকাশ করলে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

অকস্মাৎ কয়েকজন পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাতে এই শ্রীগ্রন্থের বর্ত্তমানে এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সঙ্কটমোচনের প্রার্থনায় সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি—পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় রামাশ্রম নামে কোন সাধু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনে "দুর্জ্জন মুখ-চপেটিকা" প্রণয়ন করেন। কাশীনাথ-ভট্ট তাহার প্রত্যুত্তরে উক্ত শ্রীগ্রন্থের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন হেতু "দুর্জ্জন মুখ মহাচপেটিকা" রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে "দুর্জ্জন-মুখ-পদ্ম-পাদুকা" রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম জানি না। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত যে ঋষিপ্রণীত, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থখানি এবং মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্টের পুরাণ শব্দের ব্যাখ্যা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনার জন্য কোন দক্ষিণী আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ ভারতের আলবারগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পল্লভ রাজগণের সময়েই আবির্ভূত হন এবং ধর্ম্মপ্রচার করেন, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আলবারগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, অথবা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করিতেন, এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের অথবা গোপীভাবের পরকীয়া রসের উপাসক ছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের প্রথমাচার্য্য নাথমুনি উত্তর ভারত হইতেই পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচার করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই উত্তর ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলন ছিল। শঙ্করের "বিষ্ণু সহস্র নামভাষ্যে" শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখমুনি রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন টীকার বা ভাষ্যের কথা বলিয়াছেন। আলবারগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই নাট্যকার ভাস বালচরিত রচনা করিয়াছিলেন এবং অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় নরপতি হাল গাথা-সপ্তশতীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই এই রাধাকৃষ্ণলীলার মূল গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যেই ভাগবতধর্ম্ম উদয়ের ক্রম পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ২য় স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীভগবান চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ দিয়াছিলেন। ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানের তৃতীয়াবতার দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক "সাত্বত তন্ত্র" প্রণয়নের উল্লেখ আছে। ইহা চতুঃশ্লোকী ভাগবতেরই ভাষ্য বিবৃতি। এই সাত্বত তন্ত্রই সুবিখ্যাত "নারদ পঞ্চরাত্র"। ইহাই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের আদি গ্রন্থ, বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ দুর্লভ। যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থের যথাযথ রূপ রক্ষিত নাই। মঙ্গলকাব্যের অষ্ট মঙ্গলার মত ইহা পাঁচ রাত্রির উপদেশ নহে। ইহা পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভৌতিক কাণ্ডও নহে। নারদপঞ্চরাত্রে ৩৪ শ্লোকে ইহাকে পঞ্চসংবাদও বলা হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—(১ম রাত্র) "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

"রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞানবচন। এই জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তাই মনীষীগণ ইহাকে পঞ্চরাত্র বলেন। জন্ম-মৃত্যু জরানাশক যে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে শম্ভু সংপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই প্রথম জ্ঞান। (নারদ শম্ভুর নিকট হইতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সাত্বত তন্ত্র প্রণয়ন করেন।) যদ্দারা হরিচরণে লীন হওয়া যায়, সেই মুমুক্ষু বাঞ্ছিত শুদ্ধমুক্তিপ্রদ জ্ঞানই দ্বিতীয়। সুবিশুদ্ধ মঙ্গলজনক কৃষ্ণভক্তি-প্রদ জ্ঞান তৃতীয়, যদ্দারা হরিপদে দাস্য লাভ এবং অভীষ্টপ্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান যোগীগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধগণের সুখপ্রদ। ইহার দ্বারা অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দূরশ্রবণ, পরকায় প্রবেশন, কায়ব্যূহ, জীবদান, পরজীবহরণ, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, শিল্পিত্ব ও সর্গসংহার কারকত, এই ষোড়শসিদ্ধি জ্ঞানীগণের আয়ত্ত হয়। আর যে জ্ঞানে বিষয়ে বদ্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়সেবী, আত্ম ও কুটুম্বভরণে রত বিষয়ীগণকে ইষ্টদেবী মায়া সম্মোহিত করেন, তাহাই পঞ্চম জ্ঞান। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান সাত্বিক, কিন্তু নির্গুণ তৃতীয় জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চতুর্থ জ্ঞান রাজসিক, ভক্তগণ তাহা বাঞ্ছা করেন না। পঞ্চম জ্ঞান তামসিক, ইহা বিদ্বানগণের অবাঞ্ছনীয়। পঞ্চপ্রকারে কথিত এই জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র বলিয়া জানেন। এই পঞ্চরাত্র সপ্ত প্রকারও কথিত হয়, যথা—ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় এবং নারদীয়। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, সিদ্ধি-শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র.—"ইহা ষট্‌ পঞ্চরাত্র নামেও বিখ্যাত"। (৪৫-৫৮ শ্লোক—প্রথম রাত্র) আশা করি ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে ইহা পাঁচ রাত্রির উপদেশ অথবা পঞ্চভৌতিক কাণ্ড নহে। শাস্ত্রের উপর কল্পনা প্রয়োগের অন্ত নাম "বাহাদুরী" বিদ্যা।

নারদ পঞ্চরাত্র মাত্র অনুষ্ঠান-গ্রন্থই নহে। ইহার মধ্যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত-রহস্যও নিহিত আছে। নারদের নিকট হইতে ব্যাসদেব এই ভাগবতধর্ম্মই প্রাপ্ত হন। বেদ-বিভাগ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন ইত্যাদির পরও চিত্তে শান্তিলাভ না হওয়ায় ব্যাস বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই দেবর্ষি তাহাকে (সাত্বত তন্ত্রের রহস্য বিস্তার) গোবিন্দগুণময়ী শ্রীমদ্‌ভাগবত উপদেশ করেন। নারদের উপদেশে মহর্ষি ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সরস্বতী-নদীতটে শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে সমাধিযোগে শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শুকদেব ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় সেই গ্রন্থই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুরাণবক্তা সূত তাহা শুনিয়াছিলেন, তিনি নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত ঋষিগণের যজ্ঞক্ষেত্রে শৌনকাদির প্রশ্নে তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের প্রকাশ পারম্পর্য্যের ইতিহাস। ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অথবা আলবার-গণের কথা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রাবিড়ের কোন কোন পুণ্যসলিলা নদীতটে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন এই কথা আছে। শ্লোকের প্রকৃত পাঠ এইরূপ—

"ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজো দ্রাবিড়েষু চ ভূমিষু", ভূরিষ বা ভূরীশ পাঠ ভ্রমাত্মক। এই শ্লোকের অর্থ "দ্রাবিড় ভূমিতেও কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবেন।" এ কথা যে আলবারগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? দাক্ষিণাত্যের অন্যতম আলবার রাজা কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী ইহার আবির্ভাব কাল স্থির করিয়াছেন। কুলশেখরের জীবনেতিহাসে শ্রীবৈষ্ণবগণের উল্লেখ আছে! কেহ কেহ ইহাকে রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। ইনি মুকুন্দমালা স্তোত্রে শ্রীমদ্ভাগতের শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কোন কোন আলবার যে শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আলবারগণের সৃষ্ট আবহাওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয় নাই, বরং ভাগবতধর্ম্মের প্রভাবেই আলবারগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তই ইতিহাসসম্মত।

আচার্য্য রামানুজ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীভাষ্যের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ নাই একথা হয়তো সত্য; আমি শ্রীভাষ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু একথা আচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি যে রামানুজ শ্রীভাষ্য ছাড়াও বেদান্ত-দীপ, বেদান্ত-সার, গীতাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মাত্র শ্রীভাষ্যেরই বাঙ্গালায় অনুবাদ

হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের অপর কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনূদিত হয় নাই। সুতরাং রামানুজ শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এ কথা বলা দুঃসাহসের কাজ। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা, যখন শ্রীরামানুজের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীগৌড়পাদের, হনুমন্তের ও চিৎসুখাচার্য্যের গ্রন্থে শ্রীভাগবতের উল্লেখ আছে, তখন পরবর্ত্তী রামানুজকে লইয়া বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন নাই।

আরো একটী কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বঙ্গেশ্বর বর্মনরাজগণ যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাই।

সোঽপীহ গোপীশত কেলি কারে কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধার।
অর্থ্য পুমানংশ কৈতাবতার, প্রাদুর্ভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষিণ ভারত হইতে আসে নাই।

শ্রীপাদ রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী যামুন মুনির নাম সর্ব্বজন পরিচিত। তিনি বিষ্ণুপুরাণ রচয়িতা পরাশরের নামে কোন শিষ্যের নামকরণের বাসনা পোষণ করিতেন। রামানুজ যামুনের অপর দুইটী বাসনার ন্যায় এ বাসনাও পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কচিৎ কচিৎ" শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, তখনো দ্রাবিড়ে অধিক ভক্ত ছিলেন না। এই কয়েকজন মাত্র ভক্তের প্রেম ভক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত ঐরূপ একটী জটিল দার্শনিক তথ্যপূর্ণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়-মূলক, সার্ব্বজনীন্ ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যরসাত্মক নানা আখ্যান উপাখ্যান সংযুক্ত মহাগ্রন্থের প্রেরণা আনিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিলে দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পরমহংসপ্রবর শুকদেবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে হয়। আচার্য্য যামুনের সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার "শ্রীবৈষ্ণব" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, এইস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি "একায়ন শাখা" ও অপরাপর বিষয়ে তিনি বহু পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

"ইঁহার (যমুনাচার্য্যের) অন্যখানি গ্রন্থের নাম "আগম প্রামাণ্য"। ভাগবত সম্প্রদায় এবং পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত পোষণের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ বিরচিত। এই গ্রন্থের উপসংহারে আর একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম "কাশ্মীর আগম প্রামাণ্য"। কিন্তু এখন আর কোন কিছু ইহার সম্বন্ধে জানা যায় না, তবে এইটুকু জানা যায় যে উহাতে ইনি একায়ন শাখার প্রামাণ্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উহা বেদের শাখা বিশেষ এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সম্বলিত ছিল। আগম প্রামাণ্য গ্রন্থখানি পদ্যে এবং অনুষ্টুপছন্দে রচিত। একায়ন শাখা শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের দ্বারা এই গ্রন্থখানি অতি সমাদৃত। তাঁহারা এই গ্রন্থ লিখিত বিধি ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাদের নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ইঁহারা আরাধনার জন্য দিবাভাগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ অভিগমন, অর্থাৎ ভগবানের নিকট গমন করার উপায়। স্নান ও জপের পরেই এই ভাগে লিখিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে ৮টা বাজিয়া যায়। ইহার পরে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ভাগের নাম উপাদান। জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যাদির জন্য এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরে ইজ্যা, অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞের সময়, ভোগ আরাধনা ইত্যাদি। আহারান্তে শাস্ত্রপাঠ; ইহার নাম স্বাধ্যায়। যোগ সাধনার জন্য সূর্য্যাস্তের পর হইতে শয়ন পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোনও সময়ে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ভারতবর্ষে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য, পাশুপত, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহুল গ্রন্থ এখনও দৃষ্ট হয়। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। ভাগবত, সাত্বত, পৌষ্কর, জয়াক্ষ সম্প্রদায়সমূহ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষ। বেদান্তদেশিকের কৃত "পাঞ্চরাত্র রক্ষা" নামে গ্রন্থ আছে। ইহাতে শ্রীবৈষ্ণবগণের নিত্য নৈমিত্তিক সাধনের পদ্ধতি লিখিত আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শ্রীপাদ যমুনাচার্য্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভাষ্য আলোচনার সময় আমরা অন্য গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিব। (শ্রীবৈষ্ণব, ২০৫—২০৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীমদ্ভাগবত নারদ প্রণীত সাত্বত তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের গ্রন্থ যে বহু প্রাচীন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্প্রদায় হইতেই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের অভ্যুদয়, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ হইতে মহর্ষি বেদব্যাসের ভাগবতপ্রাপ্তি এই কথাই প্রমাণিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যেমন ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তেমনই এই মহতী বিনষ্টির মহাশ্মশানে দুইটী মহারত্ন সমুদ্ভূত হইয়াছে। একটী শ্রীমহাভারত, অপরটী শ্রীমদ্‌ভাগবত। মহাভারতের মধ্য মণি যেমন শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বস্ব তেমনই শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদিতে গীতার অভ্যুদয়, অন্তে শ্রীমদ্‌ভাগবত অভ্যুদিত হন। গীতাপ্রোক্ত ধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই ধর্ম্মের চরম ও পরম পরিণতিরূপে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ভাগবতধর্ম্মের উদয় হয়। গীতার ধর্ম্ম কালে নষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট তাহা পুনঃপ্রকাশ করেন। ভাগবতধর্ম্মও কালে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, নারদ

কর্ত্তৃক বেদব্যাসের নিকট তাহা প্রকাশিত হন। গীতা যে ধর্ম্মের বাঙ্‌ময় রূপ,ব্রজগোপীগণ সেই ধর্ম্মের আনন্দ-চিন্ময়ী জঙ্গম-প্রতিমা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবের অবশ্য-গ্রহণীয় ও আচরণীয় ধর্ম্ম এই ভাগবতধর্ম্ম। ইহাকে কাম-দিগ্ধ বলা অথবা হাজার বার শত বৎসর পূর্ব্বের আধুনিক মানব প্রণীত বলা বাতুলতা। ভারতের অতীত এক দুর্দ্দিনে মানবহিতে এই ধর্ম্মের অভ্যুদয়; ইহার পটভূমিকায় রহিয়াছে এক মহাশ্মশানের পরিবেশ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ইহার ইঙ্গিত আছে।

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জ্জন্মকর্ম্ম বিলাপনম্।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণ কথোদয়ম্॥
যদামৃধে কৌরব সৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথো বীর গতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষ
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে॥ (১৩১৪)

লোকবাহ্য ভক্তি-তন্ময় নৃত্যগীত নয়, মানবের দুর্দ্দিনে মানবের আত্যন্তিক দুঃখই এই ধর্ম্মের প্রেরণা আনিয়াছিল। একদিন প্রতিহিংসা-পরায়ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতকে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীভগবান চক্রহস্তে উত্তরাগর্ভে উদিত হইয়াছিলেন। সেদিন তিনি আপন স্বরূপে মর্ত্তধামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রক্ষিত বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত যেদিন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন, সেদিনও তিনি পরীক্ষিতকে রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিন্ময়দেহে নয়, বাঙ্‌ময় দেহে শব্দব্রহ্ম স্বরূপে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তরিত অন্যতম আবির্ভাব এই শ্রীমদ্‌ভাগবত।*

* গুণরাজ খান প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, আমি 'দেশ' পত্রিকায় তাহার আলোচনা করি। চিরাচরিত প্রথানুসারে 'দেশ' পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ না করিয়া রায় বাহাদুর 'ভারতবর্ষে' একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাদটীকায় আমার সন্দেহ নিরসনে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রণিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রবন্ধ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভূমিকার পিষ্টপেষণ মাত্র। আমার প্রবন্ধের কোন উত্তরই তাহার মধ্যে নাই। ছাপার ভুল লইয়া রসিকতা—'মদ্‌ভাগবত নহে' (?)! এ রসিকতার উত্তর দিতে বিরত রহিলাম।

জয় হিন্দ্

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক, হোক্ তব জয়,
প্রিয় মোর, হে মোর স্বদেশ!
তোমার সমুদ্র-তীরে, অভ্রভেদী হিমাদ্রির শিরে,
নূতন প্রভাত সূর্য্য প্রণাম করিছে ধরণীরে;
সে সূর্য্য গর্জ্জিয়া ওঠে; ভয় নাই, নাই কোন ভয়,
আর আমি হব না নিঃশেষ।'

শতাব্দীর প্রান্তে বসে এতকাল কেঁদেছে যাহারা,
আজ তারা জয়ধ্বনি করে;
পঙ্গু, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, সদ্যফোটা তরুণের দল
রক্তের আল্পনা এঁকে বিচিত্র করিছে ধরাতল,
তাদের মাথার পরে অনির্ব্বাণ জাগে শুকতারা,
লক্ষ্মী জাগে তাহাদের ঘরে।

প্রলয় শঙ্খের রোল পুবের পাহাড় পার হ'তে,
ভেসে এসে ঘুম ভেঙ্গে দেয়;
রক্তরাঙা দিনগুলি ফুল হয়ে গড়ে ইতিহাস,
মাটিতে আবার বুঝি দেখা যায় সোনালী আভাষ,
নীলপদ্ম ফোটে যেন শ্রীরামের অশ্রুজল স্রোতে
লবণাক্ত সাগর বেলায়।

বেদনা-বন্ধুর পথে নামিতেছে মুক্তির আলোক,
জয় হবে, জয় ভারতের;
উদার আকাশ বুকে ফুটিল যে রক্তরাগ শিখা,
সন্তান ললাটে মাগো বেঁধে দাও বিজয় লিপিকা;
মরণের গ্রন্থি থেকে জীবনের আবির্ভাব হোক,
শেষ হোক তামসী রাতের।

শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

বছর পাঁচেক পরে কলকাতায় এসে নাকালের একশেষ ! চারদিনেই রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছি। আগে বছরে তিনবার ছুটি নিতাম, আর ছুটি মানেই কোলকাতা। সে একদিনই হোক, আর একমাসই হোক। একশো মাইলও নয় কোলকাতা থেকে, যাতায়াতের হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু চালডালের মাপের সঙ্গে গাড়ী চাপাও যেদিন থেকে মাপ করবার আদেশ হয়েছে সেদিন থেকেই একরকম ট্রেণে ওঠা হয় নি। হঠাৎ কাজের তাগিদেই আবার অনেকদিন পরে বাধ্য হয়ে কোলকাতায় এসে পড়েছি। এসে অবধি ফ্যাসাদের আর শেষ নেই।

এই চারদিনের মধ্যেই অন্তত: গড়ে চার-চারে ষোলবার হারিয়ে গেছি এবং কমপক্ষে পাঁচ-ষোলং 'আশী'বার গঞ্জনা খেয়েছি। নিজেও যেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছি রক্তাল্পতায়, সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতাও দেখছি পুরো প্যাভাশে মেরে গেছে কাঁকির আওতায়। সারা গড়ের মাঠটাই হলদে হয়ে গেছে তাঁবুতে আর মেটে ঘরে। শুনেছি, স্থাবার চোখে সবই হলদে। কিন্তু সকলেরই ত একসঙ্গে স্থাবা হতে পারে না। অন্তত: 'ঠগ্‌ বাছতে গাঁ উজোড়ের' মত স্থাবার প্রতিপত্তি কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তাই হারিয়ে যাওয়ার জন্তে আমি নিজেকে একা দায়ী মনে করি না, কারণ কোলকাতার রূপ সত্যিই পাল্টেছে !

গলি-ঘুঁজি যথাসম্ভব বাদ দিয়েই চলি, একমিনিটের জায়গায় দশ মিনিট লাগলেও। তবু দেখছি হারিয়ে যাওয়াটা একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। ব্যাধি বই কি। নেশাও নয়, পেশাও নয়, মুদ্রাদোষও নয়, অথচ থেকে থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। বড় ছোট সকলেই উপদেশ দিলে—অত অন্যমনস্ক ভাল নয়। বেঙ্গল টাইম্‌, ষ্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম্‌, ক্যালকাটা-টাইম্‌—কত টাইম এলো গেলো, ঘড়ির-কাঁটা কতবার এগুল-পেছুল, কিন্তু কই তবুতো বড়-কাঁটা ছোট-কাঁটা ঠিক একদিকেই ঘুরছে, একটু ওলট্‌-পালট্‌ হয় নি। তবে কেন আমি সচল মানুষ হয়ে হঠাৎ একটু-আধটু অদল-বদলের বিপাকে পড়ে বেচাল হচ্ছি ? এই সব হাজারো রকমের টিপ্পনী আর ব্যাখ্যা !

সেদিন পথে বেরিয়ে কি দুর্ব্বুদ্ধি চাপলো মাথায়, ট্রামের কপালে 'গ্যালিফ্‌ষ্ট্রীটের বিরাট তিলক দেখে চেপে বসলাম নতুনের উদ্দেশে। ও হরি, পৌঁছে দেখি এ যে খাল-ধার ! নিজের বোকামীতে লজ্জায় মাথা কাটা গেল। অত বড় জাঁদরেল নামের পেছনে যে এই রকম একটা মারাত্মক উপহাস লুকিয়ে থাকবে আগে ভাবিনি। এ যেন সেই আমাদের "জর্জ্জ গ্যাব্রিয়েল ফ্রান্সিস্‌ এ্যারাটুনের" বাড়ীর ঠিকানা 'ছাতাওয়ালাগলি'র মতই ঠেকুলো ! এ্যারাটুনের

আসল নাম হয়ত কোন-কালে 'হারাধন' ছিল দু'তিন পুরুষ আগে, এখন ফিরিঙ্গি-পাড়ায় রঙ পাল্টে ওই রকম দাঁড়িয়েছে—লোকটি আসলে বাঙ্গালী ক্রীশ্চান্। 'হারাধন' বলে ডাকলে লোকটি চটে যায়, কিন্তু ঠিকানা বলতে তার লজ্জা নেই, বলে—'স্যাটালা ঘালি'। সামনেই পাঞ্জাবীর দোকানে ঢুকে রুটি মাংসর সঙ্গে 'সপিশল্ ভাজি'র দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। সপিশলের সবিশেষ দক্ষিণা দিয়ে যখন টের পেলাম 'কুমড়ো-উচ্ছে-পটল' আদির নিকৃষ্ট অংশ অর্থাৎ খোলা ভেজেই এই 'সপিশল্' বা 'স্পেশ্যাল' এর সৃষ্টি, তখন আবার নতুন করে মনে হল কৃষ্ণের অপর নামই কালী! আমার এ অধ্যাত্মবাদ আমাকে মোক্ষের পথে বেশীদূর ঠেলে নিয়ে যেতে না পারলেও, সেদিন বাড়ীর সকলেই সেই রকম বড় গোছেরই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিল। চা কিনতে বেরিয়ে রাত্রি দশটা হয়ে গেল দেখে কেউই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি।

পাড়া, হাসপাতাল তোলপাড় করে সকলেই যখন ক্লান্ত, তখন একজন বল্লেন থানায় ডায়েরী করো। বলা যায় না উট্‌কো লোক, হয়ত এতক্ষণ থানায় জমা হয়েও থাকতে পারে। টালিগঞ্জ থানায় যেতেই বল্লে—আছে একজন জমা, দেখুন যদি আপনাদের হয়। ভোজপুরী সেপাই তার আদুল-ভুঁড়ির ওপর চাবি বাঁধা পৈতে গাছটা একবার টান করে ঘষে নিয়ে ত্বরিতপদে চলে গেল, সঙ্গে নিয়ে এল উদোম্ ল্যাংটো একটি তিন বছরের ছেলেকে এবং গম্ভীর ভাবে বল্লে—কভি এয়্‌সা লেড়্‌কা-লোককো মৎ ছোড়্‌না। সত্যচরণ নাকি বলেছিল—না আমাদের লোক হারালেও এত ছোট নয় আর উলঙ্গ নয়, ওতে চলবে না। বালীগঞ্জেও তাই, কোঁকড়ানো সাদা লোমওয়ালা ছোট্ট একটা পুড্‌ল্ নিয়ে এলো এবং জানালে, ভাগ্যিস্ সময়মত এসেছেন, নইলে কালই অক্‌সনে চড়িয়ে দেওয়া হত, আমাদের বড়বাবুই এটা কিনে নিতেন। এর পরে সত্যচরণের আর কোথাও যাওয়া অসম্ভব না হলেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই হিতৈষীটি নাকি বলেছিলেন, বেরিয়ে যখন পড়া গেছে যতটা পারা যায় ঘুরেই যাওয়া যাক। ভবানীপুর থানায় পাওয়া গেল একটি একতারা বাজানো ভিখিরীর ছেলেকে, অন্ধ, দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে একটি বছর বাইশের তরুণীকে। সত্যচরণের মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে, রাগে গর্ গর্ করতে করতে সে যখন বাড়ী ঢুকল, তখন সবে মাত্র এক হাঁড়ী দই নিয়ে আমি সদর দরজা পেরিয়ে এসেছি। হঠাৎ দই-টা দেখে তার রাগটা জল হয়ে গেল তাই রক্ষে, নইলে কি হত বলা মুস্কিল! দই জিনিষটা সতুর বড্ড প্রিয়, সব ভুলে জিজ্ঞেস করলে—'জলযোগে'র নাকি? অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বল্লাম, আর বলিস কেন—ট্রামের ভেতর ভিড়ে কার দ'য়ের হাঁড়ি ভেঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেল, কোন রকমে ট্রাম থেকে নেমে যখন নিজের অসহায় অবস্থাটা অনুভব করবার চেষ্টা করছি, ভাঙ্গা-ভাঁড় হাতে এক হিন্দুস্থানী ছোকরা পায়ে কেঁদে পড়ল—বাবুজী, হামকো সব লোকসান হো গিয়া আপ্‌কো বাস্তে। ওর ধারণা যেন আমিই ভেঙ্গেছি ওর দ'য়ের ভাঁড়, দোষ ও তাকে বিশেষ দিতে পারি না, কারণ সব দইটাই আমার গায়ে তখনও লেপ্টে আছে। তাকে আবার কিনে দিই, নিজেও তাই খানিকটা কিনে নিলাম। ছোক্‌রার মারোয়াড়ী মনিব বালীগঞ্জে বাড়ী করেছেন বটে, কিন্তু বড়বাজারের দই না হলে চলে না, কাজেই তাকে রোজই বড়বাজার ছুটতে হয় দই আনতে।

সতু হাঁড়ীটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল, বকুতে বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু কথায় আছে 'অঙ্গার শত ধৌতেন'—। খেতে বসে পাতের দই নিশ্চিহ্ন করে শেষ ফোঁটাটি চাট্‌তে চাট্‌তে বল্লে—দিনের আলো থাকতে বাড়ী ফিরবে, নইলে রোজ রোজ এরকম থানা-পুলিশ করতে পারব না।

কিন্তু আশ্চর্য্য! কেউ রোগের আসল কারণ খুঁজবে না! আমার এই সামান্য ভুলগুলোই কি যত কিছু লক্ষ্যের বিষয়! যত নষ্টের গোড়া যে সেদিন 'গ্যালিফ্ ষ্ট্রীট্' তা আর কজন বোঝে! তাই যদি বুঝ্‌ত, তাহলে লোকে বলবে কেন, 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে'—ইত্যাদি।

হেদোর জলে ইলিশ মাছ এখনও ওঠেনি, নইলে বাকি আর আছে কি? নন্তদের নোনা ধরা বৈঠকখানায় আগে লোকে খালি-পায়ে ঢুকত না এত স্যাঁতসেঁতে, বেশীক্ষণ থাকলে সর্দ্দি হয়ে যেত। সেইখানে এখন মস্ত দোকান ঘর—পঞ্চাশ-টাকা ভাড়া। রাতারাতি সাইনবোর্ড পড়ে গেল, সকালে গিয়ে দেখি 'ছাপা-শাড়ী'র বাণ্ডিল কড়িকাঠে ঠেকেছে, 'আল্পনা', কি 'কল্পনা' এই রকম গোছের একটা নামও বাইরে লট্‌কে দেওয়া হয়েছে। নন্তদের মস্ত দালান আগে পায়রায় নোংরা করত, কার্নিসে ছোট ছোট খুপরীতে ত'দের ছিল বাসা। এখন সেই দালান খুপ্‌রী-কেটে ঘর হয়ে গেছে, ও পেছনের গোয়াল আর ছাগলের ঘর চুণকাম করে তাতে দরজা বসিয়ে 'ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে' লট্‌কে দিয়েছে। লোকেরা চিঁড়ে চেপ্টা ট্রামে বাসে চেপে এবং চাপা গিয়ে। তা ছাড়া গাড়ী চড়ার যুগ কেটে গিয়ে এখন গাড়ী চাপার যুগ এসেছে। চাপার বহর দুদিকেই সমান—তলায় এবং ওপরে।

এত সব যুক্তি দিয়েও নাকি হারিয়ে যাওয়া সমর্থন কোনমতেই করা যায় না। না যাক্ তাতে কিছু এসেও যায় না। যেটা ঘটছে তাকে অস্বীকার করায় তো আর কোন বাহাদুরী নেই।

ফ্যাসাদের চূড়ান্ত হলো যেদিন ঠিক ঠিকানায় পৌঁছেও সঠিক লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। শুনলাম কেউ কেষ্টনগরে, কেউ

কদমতলায় গিয়ে বাস করছে কষ্টে-সৃষ্টে একঘরে পাঁচজনে গুঁতো-গুঁতি করে, আর তাদের জায়গায় জেঁকে বসেছে নতুন আমদানী করা লোকেরা। এক্ষেত্রে নিজে না হারালেও, যাদের দরকার তারা গেল হারিয়ে! বিপদ যখন আসে এইভাবেই আসে। তার ওপর আবার চেনা রাস্তাগুলো হয় হঠাৎ বেড়ে গিয়ে, নয় বন্ধ হয়ে নতুন রাস্তার চেয়েও নতুন ঠেকছে। অনেকটা যেমন রোজ দাড়ি কামানো ফিট্‌ফাট্ ফোকড়ের ফকিরী দাড়ি গজালে যে দশা হয়।

সবশুদ্ধ হারানো তবু সহ্য হয়, কিন্তু খানিকটা হারিয়ে যাওয়া আরো বিপদের। পথ চলতে গিয়ে পকেট-মারের অবস্থা স্মরণ করলেই বোঝা যায় কি সে অবস্থা! ভীড়ে পকেট কাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু চাপা কপাল হলে আবার ভীড়েরও দরকার হয় না। বছর ষোল আগে একবার ফাঁকা ট্রেণ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল অন্য লোকে দারোয়ানের নাকের তলা দিয়ে। দারোয়ানজীর জিম্মায় ছিল মালপত্র তারই কামরায়, গাঁজায় বুঁদ হয়ে নিজের মাল নিজেই অস্বীকার করলে, নিয়ে গেল অন্য লোকে তার অনুমতিক্রমেই। ভোরবেলায় হাওড়ায় পৌছে যখন হুঁস্ হল, জিনিষপত্র তখন তিনশ মাইল দূরে। খোঁজ করে জানা গেল, অশ্লেষা-তিথিতে যাত্রা করা হয়েছিল।

ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে দুটি জিনিষ থেকে আমি নিজেকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি—পকেট মার আর জুতো-হারানো। নেমন্তন্ন বাড়ীতে জুতো হারানো কম উত্তেজক নয়। জুতো পরতে এসে যখন মালিক দেখেন তাঁর এক জোড়া নিউ কাটের পরিবর্ত্তে পড়ে আছে এক পাট ছেঁড়া বিদ্যাসাগরি চটি—আর এক পাটি স্যাণ্ডাল্, তখন পরিপাটি আহারের পরও বত্রিশ পাটি দাঁত আর একবার নিশ্‌পিশিয়ে ওঠে অপরিচিত জুতো চোরের উদ্দেশে।

বাকি ছিল বাসে চড়া, সেটাও হয়ে গেল। বস্তার মধ্যে চালের মত সরতে সরতে একেবারে কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে আছি। বস্তা থেকে বোমা চালিয়ে চাল বার করার মত যদি কেউ উল্টো দিক থেকে টেনে উদ্ধার করে তাহলে একটু সুবিধে হয়, কিম্বা ঊর্দ্ধবাহু হয়ে একপায়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, এ ছাড়া আর অন্য গতি নেই। ঝোলানো কোঁচাটিকে মালকোঁচা আকারে আনবার সুবিধে তাড়াতাড়িতে করে উঠতে পারিনি, এখন আর ঠিক করবার উপায়ও নেই। হাত সরানো বা কোমর বেঁকানো দুইটি তখন সামর্থ্যের বাইরে। পুষ্পকরথের কথা শুনেছি, মনে হল মস্তিষ্কে পুষ্পকের ক্রিয়া সুরু হয়েছে। এমন সময় শুনলাম—কোঁচাটা ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে। শুনে আরো মুস্কিল হলো। কোঁচা বাগে আনবার চেষ্টা করলে অন্য লোকে পকেট সামলায়, নয়ত গোটা চারেক সজুতো ভারী পা আমার নিরীহ পায়ের ওপর চেপে ধরে। ভাবলাম—যাক্ যা হবার হবে।

কণ্ডাক্টার মিস্‌কণ্ডাক্ট বরদাস্ত করতে পারে না এতটুকু। চুলচেরা তার বিচার, গলা-চেরা তার স্বর এস্‌প্ল্যানেডের কাছে তার কণ্ঠচানো বুলির পুনরাবৃত্তি করলে—চার পয়সা টিকিট খতম। নাবতে আমায় এখানে হবেই, কিন্তু বেরোবার সাধ্য কি! মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ সবকটাই যেন হঠাৎ বিজ্ঞানের পাতা ছেড়ে বাসে বাসা করেছে মনে হল। পিছুটান, হ্যাঁচ্‌কানি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, রক্তনেত্র-বাপান্ত, আর্ত্তনাদ-কাতরোক্তি সবই আছে, নেই কেবল একটা জিনিষ—আমার কোঁচা!

তাজ্জব ব্যাপার। কোঁচা তো আর এতটুকু সল্‌তে নয় যে বলা নেই—কওয়া নেই ফুড়ুক্ করে হাতছাড়া হয়ে যাবে। ঘাড় নীচু করে চোখ ঠিক্‌রে যে খুঁজব সে উপায় নেই। আশ্চর্য্য! কোঁচা ধরার যখন একান্ত প্রয়োজন তখনই তার পাত্তা নেই। কোঁচা-হারানো বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম। হিন্দুস্থানীদের কথা স্বতন্ত্র, কোঁচাও নয়, কোমর-বাঁধাও নয় এমনি ধরেই ওদের কাপড় পরার কায়দা। যেমন কাঁসিও নয়, গামলাও নয়—তার মাঝামাঝি সংস্করণ ওদের থালা। ভাবনার সময় এটা নয়, দরজার কাছে এগিয়ে গেছি। শীতকালে শিশির ভেতর নারকোলতেলের মত দরজার মুখে সকলেই জমাট্ বেঁধে আছি, কারু নামবার ক্ষমতা নেই! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত একজন আবার ঢোকবার চেষ্টা করছেন আমাদের ঠেলে। ডান হাতে তাঁর একফালি শসা। সকলে মিলে তাঁকে ঠেলে বার করবার উদ্যোগ করতেই তিনি করুণ স্বরে বল্লেন—আমায় ফেলে দেন ক্ষতি নেই, কিন্তু মুখের শসাটা আর ফেলে দেবেন না, নগদ তিনটি পয়সা দিয়ে কেনা!

ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে রেহাই পেতেই হবে। বল্লাম—আপনারা নাবুন না। যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। অত ব্যস্ত হলে আজকাল চলে মশাই? অত যদি হয় ট্যাক্সিতে যান না কেন? ইত্যাদি গণ্ডা-গণ্ডা উচিত আর অনুচিত হুল্ ফোটাতে লাগলো ঝাঁকে ঝাঁকে।

কোনরকমে এক-কাৎ হয়ে পা-দানিতে পা ছুঁইয়েছি, হুড়মুড় করে বিশাল বপু নিয়ে পেছন থেকে এক ভদ্রলোক জাপ্‌টে ধরলেন আমাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে আর একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করি। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান'—ভদ্রলোক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে চেপে ধরেন। আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল, বল্লাম—আপনিও পড়বেন আমিও পড়ব, আমি নামলে আপনি নামবেন। 'আমি কি ইচ্ছে করে আপনার ঘাড়ে চাপছি মশাই?'—ভদ্রলোক একটু চটেছেন মনে হলো।

সংশোধনের আশা নেই জেনে দুর্গা বলে লাফিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দুজন সজোরে আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পড়লেন। আমার পেছনের লোকটি সব পেছনের লোকটিকে বল্লেন—ছি ছি, আমার কোঁচাটা কোন আক্কেলে আপনি গুঁজেছেন। 'সরি'—সব শেষের লোকটি অপ্রস্তুতে ভেঙ্গে পড়েন—'ভিড়ের মধ্যে গুলিয়ে গেছে।'

তাঁর কথা শুনে আমার টনক নড়ল। নিজের কোঁচার অবস্থা দেখে হতবাক হই। বিস্ময়ে তাকাই মাঝের লোকটির দিকে—'একি আপনিও যে আমার কোঁচা টেনে নিজে হস্তগত করেছেন, তাই বলি আমার কোঁচা গেল কোথায়, কি আশ্চর্য্য।'

তিনি বল্লেন, কি করি মশাই, ভিড়ের মধ্যে শুনলাম কোঁচায় ধুলো লাগছে, তাই একটু সাবধানে কোঁচাটাকে গুছিয়ে নিলাম, দেখতে তো পাইনি, তাহলে কি আর আপনার কোঁচাটা আমি নিই আমার নিজেরটা ফেলে ?

বল্লাম, আপনারটাও তো বেহাত হয়ে গেছে কিনা। শেষের ভদ্রলোকের তখন শোচনীয় অবস্থা, কারণ ভুলটা তাঁরই মারাত্মক। তিনি কাপড়ই পরেন নি, ফুল প্যান্ট তাঁর পরণে। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনি কৈফিয়ৎ দেন—আমার খেয়ালই ছিল না যে প্যান্ট পরে আছি, এক্সকিউজ মি প্লিজ্।

কোঁচা ফিরে পেয়েছি এই যথেষ্ট। বল্লাম, তাতে কি হয়েছে, আপনি তো আর ইচ্ছে করে ভুল করেন নি।

এবার থেকে ঠিক করেছি, কোঁচা-মালকোঁচার পাট একেবারে তুলে দেব। বাড়ীতে পরব লুঙ্গি, বাইরে প্যান্ট।

বলা বাহুল্য, এর পর সত্যচরণ আর আমায় কোনদিন একলা ছাড়েনি যতদিন কলকাতায় ছিলাম। সর্ব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখতো পাছে কোন অঘটন ঘটে। কিছু বললে বলত, তোমার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, হয়ত কোনদিন বলবে 'কান নিয়ে গেল কাগে,' সারাদিন তুমি তোমার কানের পেছনে ঘুরবে আর আমরা ভেবে ভেবে মরব।

—

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

জসীমউদ্দীন

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। বিছানার তল হইতেই চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পুব আকাশের কিনারায় শুকতারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। আকাশের তলদেশে বর্ণের ইন্দ্রপুরী রঙীণ হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের প্রত্যেক ছাত্রাবাস হইতে বালক-কণ্ঠের আজানধ্বনি আকাশে ভাসিয়া উঠিল। এ যেন গানের পাখীগুলি আকাশে ডানা মেলিয়া দিল। কতবার কতস্থানে কত মধুর আজানধ্বনি শুনিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর মোহন আজানের সুর ত কোনদিন শুনি নাই। আজানের সুর শুনিলে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে—মুসলীম আজাদের সেই মৃতদিনগুলির কথা মনে পড়ে। যাহারা চলিয়া গিয়াছে সেই দূর দুরান্তের যুগযুগান্তের পথগুলির কণ্ঠস্বর আমি যেন শুনিতে পাই এই আজানধ্বনির মধ্যে। আজানের সুর শুনিলে আমার মৃত পিতার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। একবার আমি মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম আজানধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া ; কিন্তু আজানের আজান-ধ্বনি অন্যরকমের। চারি পাঁচটি ছাত্রাবাস হইতে চারি-পাঁচ রকমের আজানধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে—লহরে লহরে সুর আগমে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তারি তরঙ্গে তরঙ্গে পুব আকাশের মেঘগুলিতে রঙের ইন্দ্রপুরী গড়িয়া উঠিতেছে। যেন কোন অজ্ঞাত শিল্পী তার লুকান স্থান হইতে কিন্নর কণ্ঠের আজানধ্বনির তুলীতে পুব আকাশের কিনারা ভরিয়া এক যুগের রঙীণ ছবি আকিয়া লইতেছে। বালক কণ্ঠের মধুর আজান-ধ্বনি ভরিয়া যেন কোন রঙীণ আকাশ কুসুম ফুটিয়া উঠিতেছে।

আজানধ্বনি ধীরে ধীরে সুদূর আকাশে মিলাইয়া গেল। আসমানে ফজরের আলো আরো রঙীণ হইতে লাগিল। গাছের ডালে ডালে শত শত বিহগ-কণ্ঠ জাগিয়া উঠিল। তাহারি তলে তলে শত শত বালক বিহগ-কণ্ঠ কলকাকলী করিয়া ফিরিতে লাগিল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার নূতন প্রভাত এইভাবে আরম্ভ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া মুখহাত ধুইলাম। আমার দরজার সামনে আবার সমবেত বালক কণ্ঠের তারানা গান শুনিতে পাইলাম। জামিয়া মিলিয়ার সমস্ত ছাত্রেরা একস্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। প্রতিদিনই তাহারা নামাজ শেষ করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া এইভাবে সমবেত হইয়া তারানা গান করে। গানটি দীর্ঘকালের সেই, মুসলীম 'হার হাম সারে জাঁদা হামারা'। সমবেত বালক কণ্ঠে এই গান শুনিয়া আজ এই গান হইতে যেন আরো অনেক নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। গানের শেষে একটি সাত আট বৎসরের বালক দাঁড়াইয়া দৈনিক খবর পড়িয়া শুনাইল। বালকটির পড়ার ভঙ্গীতে অতি সহজ সাবলীল ভাব। একজন শিক্ষক উঠিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ ময়লা কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, কেহ কেহ হাত পা ও নাক কান পরিষ্কার করেন নাই।

তাহাদিগকে খুঁজিয়া আলাদা করিতে হইবে। পাঁচ ছয়জন ছাত্র অমনি ময়না (তদন্ত) কার্য্যে লাগিয়া গেল। অপরাধকারীদিগকে আলাদা লাইনে আনিয়া দাঁড় করান হইল।

ক্লাশের ঘণ্টা বাজিল। ছেলেরা যার যার ক্লাশে চলিয়া গেল। যাইবার সময় অপরাধী ছেলেদের দিকে একবার তাকাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া গেল, "তোম গান্ধা।" ইহাতে অপরাধী ছেলেরা যেন মরমে মরিয়া গেল। কেহ কেহ লজ্জায় মুখ অন্যদিকে ফিরাল। বুঝিলাম শাস্তির পরিমাণটি একটু বেশী হইয়া পড়িল। কিন্তু জীবনে ইহারা আর যে এরূপ অপরাধ করিবে এরূপ মনে হইল না। এবার অপরাধী-দিগকে শিক্ষকমহাশয় খুব কোমলভাবে বলিলেন, জনাব, আপনারা এরূপ অপরিষ্কারভাবে কখনো স্কুলে আসিবেন না। আপনারা এখনই যার যার ঘরে যাইয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ক্লাশে আসুন। অপরাধীর দল তাড়াতাড়ি যার যার ঘরে ছুটিল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া দিল্লী

গত খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরলোকগত মউলানা মহম্মদ-আলী, হাকিম আজমল খাঁ ও ডাঃ আন্সারীর অনেকখানি স্বপ্ন এই প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯২০ সালে আলিগড়ে ইহার জন্ম। দেশের নেতাদের আহ্বানে একদল ছাত্র গোলামখানার শিক্ষালয় ছাড়িয়া আসিলেন। তাহারা নেতাদের কাছে আসিয়া দাবী করিলেন, আমাদিগকে দেশের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পড়িবার সুযোগ দিতে হইবে। তখনই বয়স্ক ছাত্রদের কলেজ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। গত ১৯২৬ সালে ইহা আলিগড় হইতে উঠাইয়া আনিয়া দিল্লীর করালবাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

প্রথমারম্ভের সময় জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠান গৃহ

গত ১৯৩৮ সনে দিল্লী হইতে ১৪ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে জামিয়া নগরে ইহা স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে ডাঃ জাকির হোসেন সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাহার মহান ত্যাগে উদ্বোধিত হইয়া কতকগুলি তরুণ যুবকও এই জামিয়া মিলিয়ার কাজের ভার লইয়াছেন। আমি সৈয়দ আন্সারী সাহেবের অতিথি হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি। তিনি এখানে শিক্ষক ট্রেণিংএর ভার লইয়াছেন। ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া নানা দেশের শিক্ষা প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া তিনি আমেরিকা হইতে শিক্ষাকার্য্যের ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখান হইতে মাসে মাত্র ৮০ টাকা বেতন লইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম অন্যান্য শিক্ষকদের বেতনও এমনই। ডাক্তার জাকির হোসেন সাহেবও প্রতিষ্ঠান হইতে মাসে ৮০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করেন নাই। বহু শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। এই অল্প বেতনের জন্য কাহারও মনে কোন ক্ষোভ নাই। আন্সারী সাহেবের ৩টি ছেলেমেয়ে। তিনি এখানে পরিবার লইয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি করিয়া এই অল্প বেতনে আপনি সংসার চালান?" উত্তরে তিনি মাত্র একটু হাসিলেন। তাহার অর্থ বোধ হয় এই, স্বেচ্ছায় যে দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহার পরিণাম হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু মনে বার বার প্রশ্ন করিয়াও আমি এই কথার উত্তর পাই নাই, ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় থাকিবে ইহাদের? নিজেদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু প্রাণাধিক ছেলেমেয়েদের পরিবার পরিজনদের কি অবস্থা হইবে, যদি হঠাৎ কাহারও মৃত্যু ঘটে। অদম্য সমাজ সেবার নেশা ইহাদের এমনই মশগুল করিয়া দিয়াছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত ভবিষ্যৎ সেই অনন্ত সমাজ পরিবারের মধ্যে ইহারা বিলীন করিয়া দিয়াছেন। সব শিক্ষকের কথা আমি বলিতে পারি না। তবে যে কয়জনের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে

তাহাদের মধ্যে আমি সমাজ-জীবনের ভবিষ্যৎ গড়ার স্পৃহার সেই জ্বলন্ত অনল দেখিতে পাইয়াছি।

স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমেরিকার শিক্ষা-জার্ণেলে কোন নূতন শিক্ষাবিধির কথা প্রচারিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা এই স্কুলে প্রবর্ত্তিত হয়। আমরা যেমন শিশুদিগকে প্রথমে বর্ণপরিচয় করাইয়া ফলা বানান শিখাইয়া তবে বিভিন্ন পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত করি ইহারা সে প্রণালীতে শিশুদিগকে শিক্ষা দেন না। ইহারা প্রথমেই শিশুদিগকে গল্প পড়িতে শেখান, শিশুদের ক্লাশ-ঘরগুলি বহুচিত্রসমন্বিত। চিত্রগুলির অধিকাংশই শিশুরা নিজেরাই আঁকিয়াছে। শিক্ষকদের নির্দ্দেশ অনুসারে চিত্রগুলির

চিত্র ও শিল্পের আদর্শ

বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর অনুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রগুলি শুধু মাত্র চিত্তবিনোদনই করে না, ছাত্রদের পড়িবার নিরস বিষয়গুলি সরস হইয়া উঠে। তাহারা শুধু পুস্তক পড়িয়াই শেখে না। চিত্রগুলির সাহায্যেও পাঠাভ্যাস করে। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর ছাপ তাহাদের মনে আরো গভীর ছাপ রাখিতে পারে।

এখানকার শিক্ষাপ্রণালীতে আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। শিক্ষাকার্য্য চালাইতে ইহারা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীর পক্ষপাতী নন। ক্লাশের ঘণ্টা শেষ হইতেই একটি ছাত্র তাহার হাতের বাঁশের বাঁশীটি বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শিক্ষক তখনও ক্লাশের বাহির হন নাই। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না। বরঞ্চ একটু খুসীই হইলেন। এক ক্লাশে যাইয়া দেখিলাম ছেলেরা বায়না ধরিয়াছে, প্রথম ঘণ্টায় তাহারা ক্লাশ করিবে না। আজ ক্লাশ হইয়াই তাহাদের শীতের সুদীর্ঘ অবসর। সুতরাং প্রথম ঘণ্টায় তাহারা যাহা খুসী করিবে। শিক্ষক বহুভাবে বুঝাইতে চাহিতেছেন—পড়ার সময় পড়িতে হয়, গল্প করার সময় গল্প করিবে ; কিন্তু কে শুনিবে সে কথা। ছেলেরা কিছুতেই শিক্ষকের কথা মানিবে না। গণ্ডগোল শুনিয়া হেড.মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। ভাবিলাম এবার বুঝি সব ছেলে ভয়ে ভয়ে চুপ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। হেড্‌মাষ্টার যেন তাহাদের বন্ধু। কেহ তাঁহার বাহু ধরিয়া, কেহ তাঁহার কাঁধে ঝুলিয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয়টি জানাইতে লাগিল। হেড্‌মাষ্টার সাহেবও তাহাদিগকে বহুভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা আজ পড়িবেই না। তখন হেড্‌মাষ্টার সাহেব কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, আপনারা যখন আমাদের কথা শুনিতেছেন না, তখন আমরা চলিয়া গেলাম—আসুন মাষ্টার সাহেব, আমরা চলিয়া যাই। এরা বড়ই অভদ্র। এদের ক্লাশে আজ কোন শিক্ষকই পড়াইতে আসিবে না।

এই বলিয়া হেড্‌মাষ্টার সাহেব ক্লাশের শিক্ষকটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ ক্লাশ নীরব হইয়া উঠিল। একদল ছাত্র শিক্ষকদের ক্লাশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিল। হেড্‌মাষ্টার সাহেব বলিলেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি কথা বলিতে পারি না। আপনাদের হইয়া বলিবার জন্য আপনাদের ক্যাপটেনকে পাঠাইয়া দিন। ছেলেরা ছুটিয়া যাইয়া তাহাদের দলপতিকে পাঠাইয়া দিল। হেড্‌মাষ্টার সাহেব তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

এখানকার ছোট ছোট বালকদিগকেও শিক্ষকেরা 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করেন। "দেখিয়ে জনাব, জেরা মেহেরবানি করকে শুনলিয়ে," এইভাবে তাঁহারা ক্লাশের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেন। শিক্ষকেরা বলেন,

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দোকান ও ব্যাঙ্ক

ছোট ছোট ছাত্রদের এইভাবে সম্বোধন করিয়া শিশু বয়স হইতেই তাহাদে মনে তাঁহারা একটি আত্মমর্য্যাদার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন।

জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রদিগকে শুধু মাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিখাইয়াই কর্তৃপক্ষেরা খুসী থাকেন না। শিশু বয়স হইতেই হাতে কলমে অনেক কিছু শিখাইয়া তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলেন।

এখানে চিত্রবিদ্যা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, বয়ন বিভাগ, পুস্তক বাঁধাই বিভাগ, মৃৎশিল্প বিভাগ প্রভৃতি খুলিয়া তাঁহারা ছাত্রদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির স্ফুরণে সাহায্য করেন। ছোট ছোট ছেলেদের একটি ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কে ছেলেরা নিজেদের হাত খরচের টাকা জমা দেয়। চেকের সাহায্যে দোকানগুলি হইতে বিভিন্ন দ্রব্য তাহারা ক্রয় করিতে পারে। ছেলেদের ব্যাঙ্কটি ছেলেদের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

এখানে ছোটদের পরিচালিত দুইটি দোকান আছে। এই দোকানে লজেঞ্জ, বিস্কুট, হালুয়া, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছেলেরা পালা করিয়া এই সব দোকানের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে হইল। যে বয়সে আমরা ইঁদুরের মাটি, ভাঁড়া-চাড়া এবং কচুর পাতা লইয়া দোকান দোকান খেলা করিতাম, সেই বয়সের ছেলেরা এখানে সত্যকার দোকান পাতিয়া তাহার পরিচালনার শিক্ষা করিতেছে।

জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রাবাসগুলির বারেন্দায় ছেলেদেরই আঁকা নানা রকমের ছবি টাঙান থাকে। এই সব ছবি মাঝে মাঝে এ-ঘরে ও-ঘরে বদল করিয়া দেওয়া হয়। এখানে ছেলেদের কোন কাজকেই অবহেলা করা হয় না। দুই তিনটি বালক কবির সঙ্গে আলাপ হইল। শিক্ষকদের কাছে ইহারা নানাভাবে উৎসাহিত হইয়া থাকে।

শয়নাগার

এখানে নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। সুদূর আফ্রিকার ছাত্রও এখানে দেখিলাম। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও পশ্চিমে সুদূর আফগানিস্থান হইতেও ছাত্র আসিয়া এখানে পড়াশুনা করিতেছে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ ডাক্তার জাকির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমস্ত মুসলীম জাতির তথা ভারতবর্ষের মুক্তি কামনার স্বপ্ন দেখেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া মনে হইল, যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

তিনি বড় দুঃখ করিলেন—মওলানা ওবায়দুল্ল সিন্ধির জন্য। তিনি বলিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় মৌলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধির মত একজন বিদ্বানকে পাইলে গৌরবান্বিত হইত। রিক্ত হস্তে এই মওলানা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। আরবী সাহিত্যের অত বড় পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। এ দেশের লোক তাহাকে গ্রহণ করিল না। অল্প আহার পাইয়া না খাইয়া তিনি মারা গেলেন। অথচ তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তাহার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানতপস্যায় আমরা অনেক কিছু লিখিতে পারিতাম। জামিয়া মিলিয়ার কথা শুনিয়া তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। হাতে পয়সা ছিল না। ছয় আনার পয়সার অভাবে বাসের টিকিট কিনিতে পারেন নাই। প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে তিনি পায়ে হাঁটিয়া দিল্লী হইতে জামিয়া মিলিয়ার এই দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, এই মওলানাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জড়াইয়া রাখিলেন না কেন?

তিনি উত্তর করিলেন, কবি সাহেব, আমার প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত ছিল না।

স্নানের আনন্দ

তার জন্য একটা আরবি বিভাগ খুলিয়া তাহাতে প্রয়োজন অনুসারে গ্রন্থাগার না দিলে ত তিনি কাজ করিতে পারিতেন না।

আমি বলিলাম, এই সুবিশাল ভারতবর্ষে এমন লোক কেহ ছিল না যে এই মওলানাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে?

তিনি উত্তর করিলেন, কেহ কিছু অর্থ সাহায্য করিলেও তিনি তাহার রাজনৈতিক স্বমতাবলম্বীদের দান করিয়া ফেলিতেন। আদর্শবাদের ইন্ধন এমনই করিয়া তিলে তিলে দাহন করে। এই মওলানার নামে একটি আরবি বিভাগ জামিয়া মিলিয়ায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

আমাদের ফরিদপুরের তরুণ কর্ম্মী সোদরপ্রতিম মোহন মিশ্রের কথা উল্লেখ করিলাম। বলিলাম, কিছুদিন আগে তিনি আপনার জামিয়া মিলিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ফরিদপুরে স্থাপন করিয়াছেন। রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

এ খবর শুনিয়া জাকির হোসেন সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রয়োজন হইলে জামিয়া মিলিয়া হইতে তিনি সেখানে শিক্ষক পাঠাইতেও পারেন এরূপ কথাও বলিলেন।

জাকির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আমাদের নিপীড়িতা সর্ব্বহারা মুসলীম সমাজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আরো অনেক আলাপ হইল। সমাজকে দেশকে তিনি কত ভালবাসেন। মুসলীম সমাজের অন্তস্তলে মিথ্যার বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, বক্তৃতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই বিপ্লবের ইন্ধন দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। জামিয়া মিলিয়ার ছাওনীতে তিনি মুসলীম ভারতের সকলকে সেইজন্য একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

জামিয়া মিলিয়া ছাড়িয়া আবার সুদূর দেশে ফিরিয়া চলিয়াছি। এখানকার শিশুবন্ধুদের ফুলের মত সুন্দর মুখগুলির স্মৃতি আমাকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিতেছে। কোথায় সেই বঙ্গদেশের মক্তবগুলিতে বেত্রহস্তে মৌলবী সাহেবের আস্ফালন। বাঙ্গলা, আরবী, উর্দ্দু, ইংরাজী ভাষার বর্ণমালার কারাগারে শিক্ষার ফেরেস্তা সেখানে সহস্র অন্যায়ের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত।

কাঠের বাক্স

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়

ঠাকুরমার কাঠের বাক্সটার প্রতি লোভ অনেকেরই ছিল। তার প্রধান কারণ বোধ হয় ঠাকুরমা এক মিনিটের জন্যও বাক্সটাকে হাতছাড়া করতেন না। স্বল্প-পরিসর, আলো বাতাসহীন শোবার ঘরের বিছানার ঠিক শিয়রের পাশে একখানা শতছিন্ন চাদর দিয়ে বাক্সটা জড়িয়ে রাখতেন, আর রুদ্রাক্ষের মালা জপ করতে করতে শীর্ণ শরীরের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিয়ে বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখতেন।

উঠতি বড় পরিবার; নাতি-নাতনি বৌ-ঝির অভাব নেই। তিন তিনটে ছেলেই কৃতী, বৌদের দুঃখ নেই। নাতিরাও বড় হয়েছে। কেউ কলেজে পড়ে, কেউ বা সদাগরি অফিসে কাজে লিপ্ত হয়েচে। ঠাকুরমার জন্য তারা নামাবলী, কলির মাহাত্ম্য, সময় সময় ক্ষীরের মোহন সন্দেশ প্রভৃতি খাবারও সযত্নে নিয়ে আসে, আর এই স্নেহ-সিক্তা বৃদ্ধা পরম সন্তোষ সহকারে সেগুলি টেনে নিয়ে কাঠের বাক্সটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন।

সকলেই ভাবে কাঠের এই জীর্ণ পদার্থটার মধ্যে কি অপরূপ সামগ্রী আছে যার জন্য ঠাকুরমার এত ব্যস্ততা!

বাড়ীর কর্ত্তা পুরানো জমিদার ছিলেন—যাবার সময় সমস্ত জিনিষই চুলচেরা ভাগ করে ছেলেদের দিয়ে গেছেন। নিজের স্ত্রীকে পৃথকরূপে কিছু না দিয়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেলেদের ওপরই দিয়ে গেছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ছেলেরাও মাকে যথাসম্ভব সুখেই রেখেছে। স্নেহবৎসলা বৃদ্ধা নিজের অলঙ্কারাদি সমস্তই হাসিমুখে পুত্রবধূদের উপহার দিয়েছেন, শুধু এই কাঠের বাক্সটার বেলাতেই তিনি রূঢ়। কেউ ওটার কাছে গেলেই তিনি অসম্ভব বিরক্ত হতেন।

ছেলেরা বৌদের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করে—কর্ত্তা পাকা লোক ছিলেন, সার ও সেরা জিনিষটুকু বোধহয় মায়ের হেফাজতেই রেখে গেছেন। বৌয়েদের মধ্যে কাঠের বাক্সটা পাবার প্রচেষ্টায় ঠাকুরমার প্রিয় ভাজন হবার কত প্রতিযোগিতাই না চলে। কিন্তু সবই বৃথা! সবাই ভাবে, কবে বা তিনি যাবেন, কবে সোনার তাল হাতে আসবে।

কিন্তু ঠাকুরমা তো ময়দানবের পরমায়ু নিয়ে আসেন নি, তাই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহলের নিবৃত্তি করে তিনি সত্যিই একদিন সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাসের সময় পর্য্যন্ত কাঠের বাক্সটা ঠিক তাঁর নির্ব্বাক্ নিস্পন্দন বুকের মত একান্ত পাশেই ছিল। ঠাকুরমাকে নিয়ে যাবার আগে ছেলেরা সকলেই ঠিক করলেন—বাক্সটা সকলের সামনে খুলতে হবে ও ভাগ বাঁটারার ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।

তাই হলো। আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে বড় ছেলে খেলাবার ভার নিলেন—বহুদিনের উদ্বিগ্নদৃষ্টি ও অধীর আগ্রহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো তাঁর কম্পিতচঞ্চল বুকে। চাদর খুলে বিবর্ণ বাক্সটার চাবিটা ঘোরাতে যেয়ে বড়র হাত একটু যেন কেঁপে উঠলো। বাক্সর ডালা খুলে গেল। একখানা অর্দ্ধভগ্ন ধূলিমলিন চিরুণী, কয়েকটা পুরোনো চারআনি, দুটো ডবল পয়সা, একটা আধুলি, কয়েকটা বড় বড় কড়ি।

সাগ্রহে মেজ বল্লে—ঐ এককোণে দেখচি কাগজে জড়ানো কি; হ্যাঁ ঐ তো রয়েচে—বড় ক্ষিপ্রহস্তে তাড়াতাড়ি কাগজের ছোট প্যাকেটটা টেনে আনলো ও তাড়াতাড়ি খুলতেই বেরুলো—একরাশ সিঁদুর ও একখানা ভাঙা শাঁখা।

ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ছেলেরা বলে উঠলো, হুঁ—সংস্কার বটে!

বেঙ্গল ইম্পোর্ট কোং লিঃ

শ্রীসন্তোষকুমার দে

"এত বড় যুদ্ধটা গেল, একটা কিছু করে ওঠা গেল না," "জীবনে মহাযুদ্ধ দুইটা আসে না" ইত্যাকার আফশোস অবিনাশের মনেও ছিল। টাকা কে না চায়, বিশেষত সে দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে পরিবারবর্গকে দু'টি ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র যোগাতে তাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। সকালে টিউসানি ও দ্বিপ্রহরে কেরাণীগিরি করেও যখন কুলিয়ে উঠতে পারছিল না সেই সময় সে একটি পার্ট-টাইম চাকুরি জুটিয়ে নিলে। সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত দশটা, একজন ব্যবসায়ীর গদিতে লেখা পড়ার কাজ, পারিশ্রমিক ত্রিশ টাকা। মন্দ কি! মন্দ তো নয়ই, বরং ভালোই। সব মিলিয়ে অবিনাশ যা আয় করে, তাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হ'তে লাগল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ভাবে কাটল। ইতিমধ্যে তার সকালের টিউসানিটি হাত ছাড়া হয়ে গেল। ছাত্রের পিতা মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর, তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ী কিনে উত্তর কলকাতার অন্ধগলি হ'তে উঠে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের টিউসানিটাও গেল। দশটা টাকা মাসিক আয় কম, মাসের শেষে ট্রামের পয়সা ঘাটতি পড়ে, সিগারেট ছেড়ে বিড়িতে নামতে হয়। তবু মন্বন্তর পার হয়ে অবিনাশ ও তার পরিবারবর্গ জীবিত অবস্থায় এপারে এসে পড়েছে। এখন সেই ঝাঁত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গে মৃত্যুর হাতছানি অতটা যেন প্রকট নয়। এখনও রোজই কাগজে দুঃস্থদের মৃত্যু সংখ্যা মুদ্রিত হয়, কিন্তু লোকের সেটা গা সওয়া হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার চাকুরিটি আছে। শুধু আছে নয়, পাঁচ টাকা বেতনও বেড়েছে—এখন পাচ্ছে পঁয়ত্রিশ। ব্যবসায়ের মালিক বনমালীবাবু সজ্জন ব্যক্তি। আর দশ রকম কারবারের সাথে সুতোর কারবারও তাঁর ছিল। যুদ্ধের সুযোগে এবং প্রকৃতপক্ষে অবিনাশের পরামর্শেই তিনি সহরোপকণ্ঠে একটি গ্রামে কয়েকখানি তাঁত বসিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় বুনিয়ে বড় বড় কোম্পানিতে গোটা থান সরবরাহ করে দুপয়সা পাচ্ছিলেন। দু'পয়সা হতেই দশ পয়সা হ'ল এবং বনমালীবাবুও দু'খানা বাড়ী কিনলেন। প্রতি রবিবারে অবিনাশ যেত তাঁতশালায়, বস্তুত সেটা কোনও কারখানা নয়, তাঁতিপাড়া। তারা সুতোর যোগান পাচ্ছে বনমালীবাবুর কাছে; আর গামছার মত ফাঁকবুনানীর কাপড় বুনে দিচ্ছে গজকে গজ। দিন রাত কাজ হচ্ছে। ছেলে বুড়ো সবার মুখে হাসি। পঞ্চাশের মন্বন্তর তাদের প্রাণে মারে নি। দেখে অবিনাশের ভালোই লাগত। সে অবাক হয়ে বসে বসে তাদের কাজ দেখত—মেয়েরাও কেমন ঘরের কাজ সেরে পুরুষের সহায়তা করছে! তাঁতিপাড়ার মাতামাতি কিছু দূর হতেই স্পষ্ট শোনা যেত। ঠক্ ঠক্ করে তাঁত বুনে চলেছে তজিমুদ্দি—মাটির মেঝে খুঁড়ে তার মধ্যে পা ডুবিয়ে

বসেছে। স্বল্প সরঞ্জাম, বলতে গেলে আরও সামান্যই। কিন্তু তাদের আনন্দের পরিমাণ অপরিমেয়। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। তারা জানে না, জানতে চায়ও না তাদের তৈরী কাপড়ে কি হবে। যুদ্ধ তাদের কাজ জুটিয়েছে—জুটিয়েছে মুখের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, তাতেই তারা খুশী। কোথায় কারা প্রাণ দিচ্ছে, কাদের শেষ শয্যায় সহায়তা করতে এই গজ লিণ্ট ব্যবহৃত হবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তাদের নেই।

বনমালীবাবুর বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপেই এসেছে। মানুষ মরবার জন্যই জন্মায়। মরণ তাদের অবধার্য। তবু দশ জনের মৃত্যু যদি এক জনের পকেটে দু'টি পয়সা জুগিয়ে দিতে পারে সে এমন মন্দই বা কি! ব্যবসায়ে পয়সা পেতে লাগলে ব্যবসায়ীর লোভ বেড়ে চলে, প্রার্থনা হয়—ভগবান, যুদ্ধ যেন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যুদ্ধ চলতে থাকলেও সুতোর বাজারে বোমা পড়ে গেল। সরকারি ঘোষণায় সুতো নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল। চিঠি পত্র দিয়ে, ঘোরাঘুরি করে কোন রকমেই সুতোর বন্দোবস্ত করা গেল না। বনমালীবাবুর সরবরাহ যে সব বড় বড় কোম্পানীতে সেখানেই তার আবেদন নিবেদনের শেষ সীমানা নয় জেনে অবিনাশকে নিয়ে দিল্লিতক্ দৌড়াদৌড়ি করিয়ে দেখলেন। ছুটাছুটিতে পায়ের সুতো ছিঁড়বার যোগাড় হল, তবু তাঁতের সুতোর যোগাড় হ'ল না। অতএব তাঁতিপাড়ার তাঁত গেল বন্ধ হয়ে। তাঁত বন্ধ হ'লে একবার অবিনাশ গিয়েছিল সেই গাঁয়ে। দেখে এসেছিল, তাঁতিদের মুখে নেই হাসি, তাঁতগুলি সব স্তব্ধ হয়ে আছে। সারা পাড়ার সেই বিষণ্ণ কাতর মূর্তি তার অন্তরে পীড়া দিতে লাগল।

কিছু দিন পরে ইউরোপে যুদ্ধাবসানের সংবাদ পাওয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যায় বনমালীবাবু অবিনাশকে খবরের কাগজখানি দেখিয়ে খুব উৎফুল্ল চিত্তে বল্লেন—ওদিকের যুদ্ধ তো মিটল। এবার আমদানি রপ্তানির কারবার বড় করে হ'বে। বাজারে কাপড়ের যা চাহিদা, যদি দু এক চালান বিলাতী কাপড় এনে ফেলতে পারেন তবে এক কিস্তিতেই বাজিমাৎ হবে। আপনি লেখা পড়া করে এ বিষয়ে তত্ত্ব তল্লাস নিন। কাপড় হোক, ওষুধ হোক, বিদেশ হতে যা আনা যাবে তাতেই এখন পয়সা।

আমদানী কারবার বড় করে করবার উদ্দেশ্যে বনমালীবাবু একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রেজেষ্টারি করলেন, নাম হ'ল 'বেঙ্গল ইম্পোর্ট কোম্পানি লিমিটেড'। সুতোপটির পয়সায় তার মোটা মূলধন দাঁড়িয়ে গেল।

আমদানী ব্যবসায়ের ফন্দি ফিকির অবিনাশের সব জানা। সওদাগরি অফিসের কাজে সে পাকা, কাষ্টমস্ হাউসে তার বন্ধুবান্ধব রয়েছে, সুতরাং নূতন কোম্পানীর তরফে আমদানির অনুমোদনপত্র তার হাতে আসতে বিলম্ব হ'ল না। লাভের আশায় বনমালীবাবু অবিনাশকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তার বেতন দিলেন বাড়িয়ে। এমনও আশা দিলেন, তার দিনের বেলার অফিসের বেতনের দুগুণ দিয়ে তাকে সব সময়ের জন্য নিজের দপ্তরের ভার দেবেন। কাজের একটা নেশা আছে, ক্ষমতার আছে উন্মাদনা। অবিনাশ কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে গেল তার সুতোপটির ছোট খুবরি পেরিয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। লিফ্‌টে উঠে গেলে তিনতলায়—গোটা ফ্লাটটা তাদের অফিস। দরজায় পিতলের ফলকে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'বেঙ্গল ইম্পোর্ট কোম্পানী লিমিটেড্'। অফিসে লাইন বেঁধে কেরাণীদের টেব্‌ল্, টাইপিষ্টদের খট্‌খটানি। এক দিকে সারি সারি অফিসারদের চেম্বার। পুস্‌ডোরের মাথায় ক্রোমিয়াম প্লেটে অফিসারের নাম লেখা। তারই মধ্যে সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ভালো চেম্বারের সম্মুখে লেখা 'জেনারেল ম্যানেজার'। সামনে টুলে বসে উর্দ্দি পরা বেয়ারা। এটা অবিনাশের ঘর। নিজের নামটা দরজার উপরে লিখতে সে অপমান বোধ করে। টেলিফোন অপারেটার ইহুদি মেয়েটি দেখতে বেশ। কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বল্লে, স্যার, রোটারি ক্লাব হ'তে ফিরবার পথে স্যার ড্যানিয়েল রিচার্ডসনের সাথে আপনার—

বনমালীবাবুর কথায় অবিনাশের কল্পনা বাধা পায়। বনমালীবাবু বল্লেন—এক্‌স্‌পোর্ট ইম্পোর্টের কাজই এখন চলবে শুধু, কি, বলেন অবিনাশবাবু? ফ্যালাও কারবার হবে। মশাই এই আশাতেই বেঁচে আছি। জাহাজ ভরে মাল আসবে, গুদাম ঠেসে মাল তুলব, লরি ভরে মাল ডেলিভারি দেব, দশটা সরকার জেটিতে ঘুরবে, বিশটা দালাল গদিতে বসে থাকবে, দিনরাত বাজার সরগরম, তবেই না ব্যবসা! এই ব্যবসা মশাই আমার পৈতৃক জিনিষ, এর ঘাঁত ঘোঁত সব জানি। না হ'লে দেশী জিনিষের কারবারে মশাই হাঙ্গাম হুজ্জতই সার। লাভের বেলায় লবডঙ্কা। দিশি কোম্পানীর আজ এটা আছে তো কাল ওটা নেই, জিনিষের কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই, খরিদ্দারের খাঁকতি নেই। বকতে বকতে মুখ খারাপ। যুদ্ধের দরুণ আর কিছু পায় না তাই নিচ্ছে, বিলিতি জিনিষ এলে ও আর কেউ পুঁছবে না। আপনি এই কারবারে একবার ঢুকে দেখুন, আদি অন্ত পাবেন না। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচির মত যেখানকার যে জিনিষটি ভালো গুদামে এনে তুলুন, আর বেচে ঘরে পয়সা তুলুন।

বনমালীবাবুর উৎসাহ অবিনাশের কল্পনাকেও যেন ছাপিয়ে গেল। তার চোখে মুখে কিসের দীপ্তি অবিনাশ ঠিক বুঝতে পারে না। সে কি কেবল ভবিষ্যৎ লাভের আশা, না তার চেয়েও বেশী কিছু?

রাত্রিবেলা ছাদে শুয়ে অবিনাশ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশে মেঘ নেই। তারাগুলি ইতস্তত ছড়ানো। বাঁকা চাঁদের ম্লান আলোকে চতুর্দিকে ঈষৎ উজ্জ্বল কজ্জল বর্ণের মধ্যে যেন কেমন বিষাদ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ইউরোপের যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, জাপানও সম্প্রতি পরাজিত হয়েছে, পৃথিবীর অশান্তি দূরীভূত হ'তে চল্ল। কেউ কোথাও আর অসুখী থাকবে না, কারো কিছু অভাব থাকবে না—সেদিন বুঝি আসছে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় পৃথিবীর একপ্রান্তের সামগ্রী অপর প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে বণ্টন করবে সম্পদ। বনমালীবাবুরা আরো বড়লোক হবেন, অবিনাশদের মত যারা চাকুরীজীবী তাদেরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। কপালে থাকলে কলকাতায় বাড়ী গাড়ী হওয়াও বিচিত্র নয়, সুতরাং

অবিনাশের বিষণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। এ সব বিবেচনা করেও কিন্তু অবিনাশ মনে শান্তি পেল না। বাতাসে যেন বেদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, চাঁদের ম্লান আলোকে কাদের ম্লান মুখের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ছাদের পাশের একটা গাছের ছায়ায় ছাদের খানিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ছায়াটা অবিনাশ যেন কিছুটা শীতল অনুভব করলে। তার মনে পড়ে গেল, বারাসত ষ্টেশনে নেমে খানিকটা পথ চলে গেলে ছোট একটি বিল পড়ে। তার কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। সেই রৌদ্রতপ্ত বিলপথ অতিক্রম করলে পাওয়া যেত ছোট তাঁতিপাড়া। সেখানকার আমগাছের শীতল ছায়ায় সে যেয়ে বসত—তখন তাঁতিপাড়া কর্মোদ্যমে মুখর। তাঁতিদের সে মুখের হাসি আজ মিলিয়ে গেছে। সুতার উপর কণ্ট্রোল একদিন উঠে যাবে, কিন্তু তখন জাহাজভরে আসবে ম্যাঞ্চেষ্টারের মিহি ধুতি, শাড়ী, সার্টিং, টার্কিশ তোয়ালে। খসখসে শাড়ী আর চড়চড়ে গামছা তখন কেউ পছন্দ করবে না।

বনমালীবাবু বলেছিলেন, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি আমদানির কথা। কাঞ্চননগরের কামারদের কথা অবিনাশের মনে পড়ে। অবিনাশের মামাবাড়ী কাঞ্চননগরে। মামাবাড়ীর পাশে এক কামার বাড়ী। রাস্তার পাশে একটা বড় বাদাম গাছ, তারই তলায় কামারশালা। সেই কামারশালার ছবি অবিনাশের মনে পড়ে যায়। শেফিল্ডের শাণিত শলাকা সেই বৃদ্ধ কর্মকারের বুক ভেদ করে গিয়েছিল। হয়ত তার পুত্রপ্রপৌত্রেরা এই যুদ্ধের বাজারে ঘরের খড়ের চাল ফেলে মাটির টালি দিয়েছে। কিন্তু এই সাময়িক সমৃদ্ধি ক'দিনের? আবার শেফিল্ড আসচে তার শাণিত ছুরি উঁচিয়ে। একদিন তাঁতিরা বুড়ো আঙুল উপহার দিয়ে বরণ করেনিয়েছিল, ম্যাঞ্চেষ্টারকে বসিয়েছিল তাকে মসলিনের মসনদে। আজ শেফিল্ড আর নিউইয়র্ককে অভ্যর্থনা জানাতে হবে শির উপহার দিয়ে। আর সেই শিরশ্ছেদের রক্ত লেহন করতে সাগ্রহে জিহ্বা বাড়িয়ে দেবেন বনমালীবাবুর দল। তাদের ব্যবসায় বিস্তৃত হ'বে, ফ্যান ফোন সাজানো সাত মহলা অফিস দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার এই ভয়াবহ রূপ আশঙ্কা করে অবিনাশ উঠে বসল। "পোষ্ট ওয়ার রিকনষ্ট্রাকসান" কথাটা যাদের মাতৃভাষা, কথাটাও তাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। নতুবা "পোষ্ট-ওয়ার রি-ডেষ্ট্রাকসান" বললেই বা ক্ষতি কি? দেশীয় শিল্পের শবাসনে এই যে বাণিজ্য লক্ষ্মীর আবাহন, এই পরতন্ত্র সাধনায় পুঁজিপতিদের যত সুবিধাই হোক তাও সাময়িক। শ্রমিকের অন্ন মরলে তাদের অন্নেও কি একদিন টান পড়বে না?

মনে হয়, মানুষের বুদ্ধি দ্বিবিধ, একটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত। নিজের প্রয়োজন নিয়েই সে তৃপ্ত। সেই বুদ্ধি প্রবল হ'য়েই বনমালীবাবুরা আমদানি কারবারের লাভের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করলেও বিচার করবার অবকাশ তাঁরা পান না। আর একটা বুদ্ধি ব্যাপ্ত, সকলের কল্যাণ-দর্শনই তার স্বভাব। ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা জাতি-স্বার্থ, সমাজ-স্বার্থ, দেশ-স্বার্থ চিন্তা করাই তার স্বভাব। সেই চিন্তা অল্প-বিস্তর সবার মধ্যেই থাকে। অভাবে অনটনে, নিত্যকর্মকঠোরতায় সেটা সহজে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু সে চেতনাকে জাগিয়ে দিলেই সাড়া পাওয়া যায়। আমদানি বাণিজ্যের মোহে যখন ব্যবসায়ী মহল উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, সেই মোহবন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে দিতে অবিনাশের চিত্তে সেই সর্বমুখী চেতনা সাড়া দিয়ে গেল।

পরদিন কাগজে অবিনাশ বিজ্ঞাপন দেখতে পেল—কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ম স্বদেশী পণ্য রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন, আর তারই পাশে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন—আমেরিকা হতে ভালো হ্যারিকেন ল্যাণ্টার্ণ এসে পড়েছে আমাদের অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে যেতে'—এই সুসংবাদ! দুলে উঠল তার মন, ফুলে উঠল তার বুক—শবদেহে প্রাণ সঞ্চারের আনন্দ। স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের ধারা ক্ষীণতর হয়ে দেশবাসীর মন হতে মিলিয়ে গেছে। নেতৃবৃন্দ বন্দীশালায় অবরুদ্ধ, বৈজ্ঞানিকেরা বিদেশ ঘুরে এসে বক্তৃতা দিয়েই খালাস—কেউ শুনল, কেউ শুনল না। শিল্পপতিরা বিদেশ ঘুরে কি নিয়ে এলেন? আমাদের ত্যাগ, শ্রম ও সহনশীলতা দিয়ে গড়ে তোলা শিল্প আমাদের বাঁচাতেই হ'বে, বৃদ্ধি করতে হবে, যোগ্য করে তুলতে হবে বিদেশীর সাথে প্রতিযোগিতার জন্য। সব কিছুর মূলে তাই চাই স্বদেশী পণ্য গ্রহণের সঙ্কল্প। যত ছোট হ'ক, স্বল্প হ'ক, তাকে আশ্রয় করেই আমাদের শিল্প-বাণিজ্য গড়ে না তুললে দেশ কখনই স্বাবলম্বী হতে পারবে না।

অবিনাশ পথে বেরিয়ে এলো। পথ দিয়ে মিছিল চলেছে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করবার সংকল্প বাক্য প্রচার করতে করতে। আকাশে একখানা এরোপ্লেন উড়ে গেল, দু'একটা চিল তারই পথে ভেসে চলেছে।

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

বিভিন্ন ক্ষুদ্রক চিত্রে বায়জাদের নাম যেরূপ বিভিন্নভাবে লিখিত আছে তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উহা একই ব্যক্তির হস্তাক্ষর নয়। চিত্রাঙ্কনের বিশেষ কোন ভঙ্গী দেখিয়া বা অপর কোনও কারণে যে চিত্র যে শিল্পীর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাঁহারই নাম পুঁথির চিত্রসংলগ্ন কিনারায়, কিম্বা চিত্রের কোনও অংশে সূক্ষ্মাক্ষরে লেখা হইয়াছে মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে যে লেখক সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের বোদ্ধা বলিয়া পরিচিত কোনও ব্যক্তি বা গ্রন্থস্বামীরই কোনও বেতনভোগী কর্মচারী; হয়তো গ্রন্থস্বামীর জ্ঞাতসারেই এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই, পুঁথির মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়িবে বলিয়া এইরূপ ভাবে নাম বসাইয়া দিয়াছে। আবার কোনও প্রতারক লিপিকার

কর্তৃক এরূপ কৃত্রিম স্বাক্ষর সন্নিবিষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। এ অনুমানও বিশেষজ্ঞ সমাজে উপস্থাপিত হইয়াছে যে চিত্রশিল্পীর নাম লিপিকার কর্তৃক বে-আন্দাজী লেখা নয়, পরন্তু পরবর্ত্তী পারসীক ও ভারতীয় পটুয়ারা মূল-চিত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় বায়জাদের নামটি শুদ্ধ নকল করিয়া দিয়াছে—আসল পুঁথি ও তাহার চিত্রগুলি এখন কালবশে বিলুপ্ত। ক্ষেত্র-বিশেষে এরূপ যুক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমান 'খামসা' পুঁথিখানি বায়জাদের জীবিতকালেই লিখিত, তাই বিভিন্ন চিত্রকরের সহযোগিতার কথা এ স্থলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মিরাকের (মিরেকের) চিত্রগুলি তখনকার বাঁধা রীতির খোল আনা বজায় রাখিয়া চিত্রিত, কোথাও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ নাই, তাই এই পুঁথি সন্নিবিষ্ট মিরাকের নামাঙ্কিত চিত্রগুলি লইয়া কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। এই পুঁথিতে স্নানাগারের যে একখানি চিত্র আছে তাহা বায়জাদের নিজ রচনা বলিয়া ধারণা জন্মে। বায়জাদ যে নীল-রঙের পক্ষপাতী ছিলেন এ মতবাদ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ চিত্রে স্নানার্থীদিগের পরিহিত সব কয়খানি কটি-বস্ত্রই (তহবন্দ্‌) নীলরঙের। অন্যদিকে নানান্ নক্সার রং বেরঙের গামছাগুলি তেমনি আবার বর্ণবিষয়ে শিল্পীকে যথেষ্ট বৈচিত্র্য অবতারণার সুযোগ দিয়াছে। গামছাগুলি স্নান-ঘরের দরজার অনেকটা উপরে দড়ি হইতে ঝুলান। একজন লোক, মনে হয় স্নানাগারেরই কোন পরিচারক, আঁকশির মত কিছু একটা দিয়া, একখানি গামছা টানিয়া লইতেছে। চিত্রে সর্ব্বত্রই যেন প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি দেদীপ্যমান। কেহ জনৈক স্নানার্থীর মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতেছে, স্নানার্থী হাত বাড়াইয়া গায়ে মাখিবার জন্য তৈল লইতেছেন। অপর দুইজন, দেখিতে মুষ্টি যোদ্ধার দস্তানার মত মোটা একপ্রকার খসখসে দস্তানা শুধু ডান্ হাতে লাগাইয়া, বোধহয় কাহারও গাত্রমার্জ্জনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কেহ বা কাপড় নিংড়াইতেছে। স্থির নিশ্চল ভাব এ চিত্রে কোথাও নাই। চিত্রস্থ ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গী শিল্পরসিকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে।

স্নানাগারের দেওয়ালের গায়ের নক্সাগুলি আধুনিক স্নানঘরের মিনা-করা টালির নক্সার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশদ্বারের উপরকার প্রসাধক নক্সা এবং তৎসংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের নিম্নভাগের লতামণ্ডল, সারাসেনদিগের শিল্পের স্মৃতি বহন করিয়া আনে।

এ চিত্র বায়জাদের পরিণত বয়সে অঙ্কিত, তাঁহার সৃজনশক্তি তখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

লোকবিশ্রুত বায়জাদ যে স্থৈর্য্যবিহীন বায়জাদ (Bihzad-i-muztar) নামে অভিহিত হইতেন; জনপ্রবাদ এ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার চিত্রের চলঞ্চল গতিবেগ বুঝিবা তাঁহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য হইতে তদনুষ্ঠিত শিল্পে বিসর্পিত হইয়াছিল, অথবা তাঁহার এই নামকরণের মূলে তাঁহার চিত্র নিহিত গতিশীলতাই যে অবস্থিত ছিল না তাহাই বা কে বলিবে? নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াও তুলিকা সাহায্যে আয়ত্ত করায় তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। প্রকৃতিগত শক্তি-বশে অত্যল্প কালস্থায়ী ঘটনা বা কর্ম্মোদ্যমও তিনি সুচারুরূপে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইতেন। গতিজনিত প্রবল উদ্যম এবং তজ্জন্য পেশীসমূহের অতিরিক্ত বিততি বা সঙ্কোচ তিনি চিত্রপটে অপূর্ব্ব সাফল্য ও শক্তিমত্তার সহিত অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানব বা ইতর জীবের শারীরিক প্রয়াস ফলে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের যে উদ্যম, তাহা তাঁহার চিত্রার্পিত মূর্ত্তিগুলিতে অতিসহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই সংক্রামিত হইয়াছে। তিনি এক সাদী সৈন্যদলের বক্ষু (Oxus) নদী অতিক্রম করার যে চিত্রখানি অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়েই সমভাবে স্ব স্ব শক্তিপ্রয়োগে সচেষ্ট; চিত্রখানি দেখিলেই বুঝা যায় যে আত্মরক্ষার্থ পরপারে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসে শুধু তাহাদের পেশীনিচয় নয়, তাহাদের প্রত্যেক স্নায়ু তন্ত্রীও যেন ওজস্বিতায় পূর্ণ ও প্রস্ফুরিত।

সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলে বায়জাদের শিল্পকলাসম্পর্কে নিম্নলিখিত গুণ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ অপরিহার্য্য। তাঁহার চিত্রে দেখিতে পাই (১) দৃশ্য কাব্যোচিত হৃদয়গ্রাহী দ্যোতনা (dramatic expressiveness) (২) সুসমঞ্জস পরিকল্পনা ও কলাকৌশল (৩) লালিত্য ও শক্তিমত্তার একত্র বিকাশ (৪) অবর্ণনীয় তুলিকাস্পর্শ (ineffable touch) যাহা প্রাণস্পর্শেরই অনুরূপ। কয়জন চিত্রশিল্পীর চিত্রে এই কয়টিগুণ একত্র সমাবিষ্ট দেখা যায়?

বায়জাদের চিত্রকর্ম্ম রণক্ষেত্রের ভীষণ সংঘর্ষ, রাজসভার বিপুল সমারোহ, এবং আরোহীদিগের সুসজ্জিত শোভাযাত্রার আলেখ্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই। শিকার সন্ধানেরও মরুচারী বন্যপশুর চিত্রে, উড্ডীয়-মান বলাকায়, এবং তরুপুষ্পাদিসমন্বিত শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যে, তিনি লীলাময়ের বিশ্বলীলার নানা বৈচিত্র্য নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শিল্পীর লাবণ্য যোজনায় ও প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতিকৃতি অঙ্কনের নৈপুণ্যে, ভাবরূপানুবিদ্ধ অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি কিরূপ বিস্ময়করভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এগুলি যেন তাহারই দৃষ্টান্ত। প্রণয়মুগ্ধ তরুণ তরুণীর ললিতচিত্রও তাঁহার তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। বায়জাদের ভাবাভিনিবেশের বা ভাবব্যঞ্জনার কৃতিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক রূপ-নিষ্পাদন দক্ষতা দেখা যায় তাঁহার চিত্রপটের নরনারীর মূর্ত্তিগুলিতে। তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি স্ফূর্ত্ত হইয়াছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। পূর্ব্বোক্ত বক্ষুনদী অতিক্রমণের চিত্রে প্রত্যেক সৈনিক ও সন্তরণশীল অশ্ব নদী পার হওয়ার যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, জীবন-প্রয়াসের সেই অসাধারণ ভাব সন্নিবেশের মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্নতা অতি সহজ ও স্পষ্ট রূপেই প্রকাশমান হইয়াছে।

বায়জাদ ও বায়জাদের সমধর্ম্মী কয়েকজনকে বাদ দিলে দেখিতে পাই যে পারসীক চিত্র শিল্পে স্থিত্যাত্মক (static) ভাবই যেন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিদেশী শিল্পসমালোচকের চক্ষে ইহা প্রায়শঃ দোষরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমঝ্‌দার গতিবেগ না থাকিলে প্রাণ স্পন্দনের উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমাদের নিকট যাহা স্থৈর্য্যরূপে প্রকাশমান, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা যে গতিশীলতারই রূপান্তর হইতে

পারে, ইহা আমাদের সহসা বোধগম্য হয় না। শিল্পী যদি সম্মুখস্থ দৃশ্য এক লহমার চকিত চাহনিতে দেখিয়া লইয়া যেমনটি দেখিয়াছেন তাহাই চিত্রপটে সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই যেন স্থৈর্য্যের ভাব আসিয়া পড়ে। এ যেন তামসী নিশীথে ক্ষণপ্রভার আলোকে দৃশ্যটি নিমেষমাত্র দেখিয়া লওয়া! সম্মুখের পথে অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, ক্ষণেকের তরে এ দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল তাহার পরই আবার তমিস্রার ঘোর আবরণ! দ্রুতগ অশ্বের গতিও এরূপস্থলে স্তম্ভিতবৎ প্রতীয়মান হয় (১) সে কালের ভাবপ্রবণ শিল্পী আমাদের যুগের বাস্তবতার ঢোলে চিত্রে ভাববিন্যাসের তারতম্য নির্ণয় করিতে জানিতেন না। চিত্রনিহিত যাহা কিছু, সবই ছিল তাঁহার নিকট ভাবপ্রকাশের সহায়কমাত্র; তাহার উপর ছিল আলঙ্কারিক (Ornamental) প্রসাধনের দিকে প্রবল ঝোঁক—বৃক্ষলতা পশুপক্ষী এমন কি নরনারীর মূর্ত্তিগুলিও প্রসাধক অলঙ্কারের ছন্দেই পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হইত। প্রাচ্যের চিত্র ভাবপ্রধান, তাই চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গী না বুঝিতে পারিলে উহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ কথা মনে না রাখিলে অনেক স্থলেই রসবোধের বাধা ঘটে।

চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মানির (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের ধর্ম-সংস্কারক Mani'র) যে জনপ্রবাদ মূলক খ্যাতি ছিল বায়জাদই তাহা অপসারিত করিয়া শিল্পাদর্শকে কল্পনালোক হইতে বাস্তবতার ভিত্তিভূমে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খোয়ান্দামির (২) যথার্থই বলিয়াছেন যে বায়জাদ মানির নাম উপকথায় পরিণত করিয়াছেন (Has turned the name of Mani to a Myth')। যে আদর্শ সম্মুখে রাখিলে মানুষিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়, বায়জাদ সেই আদর্শই বুঝিতেন। দৈবী বা কাল্পনিক কোন কিছুর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

বায়জাদের চিত্রে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি জন্তু স্থান তো পাইয়াছেই, আর প্রবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে মাত্র দুইটি কাল্পনিক জীব—একটি ড্রাগন ও অপরটি সিমুর্ঘ অথবা সিমুরী পক্ষী। ড্রাগনের পরিকল্পনা চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল বটে তবে পারসীক শিল্পীর হাতে উহার মূল আদর্শ কতকটা বদলাইয়া গিয়াছে। ড্রাগনের চারিটি পা, দেহ শল্কে আবৃত, আকৃতি দৃষ্টে কুম্ভীরের সহিত সাদৃশ্যের কথাই সহজে মনে পড়ে। বায়জাদ তৎপরিকল্পিত ড্রাগনের চিত্রে শল্কগুলি রূপালী বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে চীনদেশের নদীগুলি নক্রসঙ্কুল ছিল। এখনও ইয়াংসী নদীতে মধ্যে মধ্যে কুম্ভীর দেখা গিয়া থাকে। যখন বর্ষাগমে জলধারায় নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক সিক্ত ও প্লাবিত হয়, তখন কুম্ভীর দল শীতের জড়তা বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দে জলমধ্যে সন্তরণ করে। নক্রদলের ক্রীড়াচঞ্চল আকৃতির সহিত ধূমজ্যোতিসলিল মরুৎ সন্নিপাতে সৃষ্ট ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল পুঞ্জীভূত মেঘপটলের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সম্ভবতঃ এই ড্রাগন মূর্ত্তির উদ্ভব ঘটিয়া থাকিবে। মতান্তরে নক্রদলের এই হর্ষোৎফুল্ল বর্ষাকালীন আবির্ভাব অজ্ঞ জনসাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে ড্রাগনই পর্জ্জন্যের অধিপতি—ড্রাগন হইতেই ধরণীতল বর্ষার বারিপাতে উর্ব্বরতা লাভ করে। চীনাদের ন্যায় কৃষি-প্রধান জাতিকে মৌসুমী মেঘের বারিবর্ষণের উপর কি পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় দেবমাতৃক বঙ্গদেশে তাহা সহজেই বুঝিবার কথা। বর্ষণ সহায়ক ড্রাগন ক্রমে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত এবং অবশেষে সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতার প্রতীকরূপে যে গণ্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চীনাশিল্পে এই জন্যই ড্রাগনের বহুল ব্যবহার (১)। পারসীক শিল্পে কিন্তু ইহার এই বিশেষ দ্যোতনা যে কখনও প্রকট হইয়াছিল তাহার নিদর্শন দেখা যায় না। পারসীক বীর, ঠিক সেন্ট-জর্জ্জের ভঙ্গীতে না হউক, ড্রাগনের সহিত যে যুদ্ধে নিরত রহিয়াছেন এইরূপ চিত্রই দেখা গিয়া থাকে।

ইউরোপীয় শিল্পে পরিকল্পিত ফিনিক্স (Phoenix) পক্ষীর সহিত কতকাংশে তুলনীয়, সিমুরী অথবা সিমুর্ঘ পক্ষী পারস্যের পুরাণ কথায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সিমুরীর কথায় হিন্দুপুরাণের এক গরুড় পক্ষীর বর্ণনাই স্মরণ পথে উদিত হয়। সিমুরী কোনও দেবতার বাহন নয় বটে কিন্তু উহা দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং কথা কহিতে সক্ষম! ইহার অস্তিত্ব কালমধ্যেই প্রলয়জনিত সৃষ্টিনাশ নাকি অন্ততঃ তিনবার সংঘটিত হইয়াছে। পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রে অনেক স্থলেই এই মহাবিহঙ্গম চিত্রিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সাহনামায় উল্লিখিত কিয়ানীয় যুগের ঘটনাদির প্রসঙ্গে। প্রাচীন ইরাণের প্রসিদ্ধ বীর শাম তাঁহার সদ্যজাত পুত্র জালকে এলবর্জ্জ পর্ব্বতের উপর পরিত্যাগ করেন, জন্মকালে তাহার মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ ছিল বলিয়া। জাতকের কেশের এই অস্বাভাবিক বর্ণ বড়ই অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সিমুরী, পরিত্যক্ত শিশুকে পর্ব্বতশীর্ষে নিজ নীড়ে লইয়া গিয়া সযত্নে লালন পালন করে এবং বীরশ্রেষ্ঠ জাল পরে জনসমাজে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হ'ন। কৃষ্ণকুমার শাম্ব গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 'সপুত্রদার' মগাখ্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন পৌরাণিক আখ্যায়িকার এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া জর্ম্মান পণ্ডিত ডাঃ ব্লক (Block) শামের সহিত শাম্বের একতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন (২)। তাঁহার প্রতিপাদ্য প্রস্তাবের সহিত শিল্পের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাঁহার মতবাদ সিমুরী ও গরুড়ের অভিন্নতা সমর্থন করে।

---

(১) A. U. Pope, Introduction to Persian Art, p. 109.

(২) ইনি হবিব—উস্—সিয়ার—নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

---

(১) E. Chavounes, De l'expression des voeux dans l'art populaire Chinois. pp. 3, 4, অধ্যাপক শাবান জর্ম্মান লেখক Hirth এর মতবাদ সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া নিজগ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এ দেশেও কার্য্য কারণ সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণায় উপনীত হওয়ার দৃষ্টান্ত কতই না দেখা যায়।

(২) Z. D. M. G., vol. 64. p. 733 ff.

শিল্পী-পরিচয়

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

'ভারতবর্ষের' চিত্রামোদী পাঠকবর্গের নিকট শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিদিত নহে। ইঁহার বহু রঙ্গীণ ছবি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। সুশীলকুমার মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একজন প্রিয় শিষ্য। অধুনা মাদ্রাজেই 'বিদ্যোদয়' মহিলা প্রতিষ্ঠানে শিল্প-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে কাজ

শিল্পীর শিল্প—১নং

করিতেছেন। গুরু শিষ্য উভয়ে মিলিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীর মনে যে শিল্প-বোধ গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং তুলিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। সুশীলকুমার, মাদ্রাজ অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের সহায়তায় দাক্ষিণাত্যে বাংলার গান,.বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে যে সুদূর প্রসারণ প্রচার কার্য্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালীই হয়ত কিছুমাত্র অবগত নহেন।

মাদ্রাজের গভর্ণরপত্নী লেডী হোপ, ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌সন্ ডক্টর বিমানবিহারী দে, মহারাজা অব্ পিথাপুরম, টাটার স্কুল অব্ সোশ্যাল সায়েন্সএর অধ্যক্ষ ডক্টর জে, এম্ কুমারাপ্পা প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং হিন্দু, মাদ্রাজ মেল, ইণ্ডিয়ান্ এক্‌স্‌প্রেস্ প্রভৃতি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাগুলি এই তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীর শিক্ষকতা কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় রাঁচি নিবাসী, সুসাহিত্যিক ৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। রাঁচিতেই

শিল্পীর শিল্প—২নং

আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিল্প শিক্ষার অদম্য অনুপ্রেরণা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ইনি দেবীপ্রসাদের নিকট শিল্পদীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য মাদ্রাজ চলিয়া যান।...গুরু সম্বন্ধে সুশীলকুমার বলেন যে—দেবীপ্রসাদের ন্যায় শিল্পশিক্ষক আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। যে কোন ছাত্রের স্বতস্ফূর্ত্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীকে অগ্রসর করিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন দেবীপ্রসাদ—তাঁহার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য। শিল্পী সুশীলকুমারের অঙ্কন পদ্ধতিতে আমরা দেবীপ্রসাদের ছবির পুনরাবৃত্তি দেখি না—দেখিতে পাই আসল

মানুষটিকে, শিল্পীর অন্তরাত্মাকে। এখানেই হইল গুরুর কৃতিত্ব। নিজের সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ টেক্‌নিকে টানিয়া আনিয়া চিত্রাঙ্কন সেখানো সহজ, কিন্তু তাহাতে শিল্পী তৈয়ারী হয় না। গুরুর শিক্ষা পদ্ধতির সহিত সুশীলকুমারের শিক্ষা পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে।

এই সঙ্গে আমরা সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত দুইখানি কালো সাদা স্কেচ্ প্রকাশ করিলাম। সত্যকার শিল্পরসিকদের এই কাজগুলি যে আনন্দ দানে সমর্থ হইবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। সুশীলকুমার যে আর্টের পুরাতন এবং সহজ চলতি পথের পথিক নহেন তাহা ইঁহার স্কেচ্‌গুলি হইতেই বেশ বোঝা যাইবে। বলিষ্ঠ রচনাশক্তি এবং টেক্‌নিকে ইনি গুরুর মান বজায় রাখিয়াছেন। নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গী দিয়া ইনি দেশের উচ্চস্থান অধিকারী তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীর এই গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই উৎসাহী কৃতী বাঙ্গালী শিল্পীকে সুদূর প্রবাসে থাকিতে হইয়াছে অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। শিশু শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই তরুণ শিল্পীকে যদি তাহাদের একটিও দেশে আনিয়া শিল্প শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করে তাহা হইলে আমাদের দেশের ও দশের যে যথেষ্ট লাভ হইবে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নবাবী

আমিনুর রহমান

বাদশাহী আমলের নবাবী আর ইংরেজ আমলের নবাবীতে অনেক তফাত আছে বৈকি। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম সেকালের নবাবরা যে পান খেতেন তা একজন বাঙ্গালী ত দূরের কথা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলিতি সাহেবও খেয়ে সামাল দিতে পারে নি। খানা পিনা, আদব কায়দা, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, চালচলন দেখে লোকে বলত, হ্যাঁ নবাব বটে। আর হালের নবাবরা তেমন নবাবী করতে গেলে হালে পানি পাবে না। এদের নবাবীর পরিচয় বড় জোর নাম করা সাহেবী হোটেলে ডেরা-বাঁধা, তিন চারটে রেসের ঘোড়ার মালিক হওয়া, গোটাকতক বাইজী অথবা চিত্রতারকা পোষানি রাখা এবং সরকারি অথবা মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরী করে নবাবীর পয়সা রোজগার করা। এরা বাংলার নবাব অথচ ভুলেও মুখে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করবে না, ভাবখানা যেন সদ্য আরব থেকে এসেছেন। অথচ বাঙ্গালীর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর ব্যবস্থা পরিষদে ঢোকা চাই, যেন সেটা তাঁর অবসর বিনোদনের একটা আড্ডাখানা। এরই মধ্যে যিনি একটু পয়সাওয়ালা নবাব, তিনি নবাবী করেন সুনাভা থেকে সুটের কাপড় কিনে, লণ্ডনে সুট তৈরি করিয়ে এবং প্যারিস থেকে সেই সুট পরিষ্কার করিয়ে। ব্যস্ তারপর তিন দিনে ফতুর, তারপর লম্বাচওড়া বুলিতেই যা কিছু নবাবীর পরিচয়। আগেকার নবাবরা তবু দেশের পয়সা দেশেই রাখতেন, দেশের শিল্পকলা গড়ে তুলবার সহায়ক ছিলেন, নবাবীর নাম করে বিস্তর গরীব দুঃস্থদের সাহায্য করতেন এবং এখনও করেন। আর হালের নবাবরা যা করেন তাত চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। কোনদিন একটা দুস্থকে সাহায্য করতে দেখেছেন? চুলোয় যাক্‌গে একালের খেতাবী নবাবদের কথা, মিছামিছি কথায় কথা বেড়ে যাবে!

শরিফাবাদের নবাবদের নাম শুনেছেন? শোনেন নি? সাড়ে তিনশো বছরের বনেদী নবাব। সাবেকী জৌলুষটা তেমন না থাকলেও ঠাট বোল আনাই বজায় আছে। নবাব মিরজা কামালউদ্দিন শরিফাবাদী এখন গদিতে। বয়সে তরুণ, কলেজে পড়েছেন, খানদানী ঘরে বিয়ে হয়েছে। তাঁর প্রপিতামহের আমলের দেওয়ানজী মুন্সি ফয়েজউদ্দিন আখন্দ এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় অবসর গ্রহণের বাসনা জানিয়েছেন। তাই নবাব বাহাদুর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ঐ পদের উপযুক্ত একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত আইনজ্ঞ যুবকের জন্য। আবু তালেব নামে এক এম-এ, বি-এল পাশ যুবক নবাবের চোখে ধরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহাল হয়ে গেল।

আবু তালেব কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করল যে নবাববাড়ীতে অত্যন্ত বাজে খরচ হচ্ছে, যা একটু চেষ্টা করলেই বন্ধ করা যায়। কেবলমাত্র নবাব বাহাদুর আর বেগম সাহেবার খেদমতের জন্য মোতায়েন রয়েছে চারটা বড় বাবুর্চ্চি, সাতটা ছোট বাবুর্চ্চি, দশটা চাকর, তেরটা চাকরাণী, আঠারোটা মালি, আর পাঁচটা দারওয়ান। তা ছাড়া একপাল মোসাহেব ত চব্বিশঘণ্টাই ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। এদবের মধ্যে বিশেষ করে আঠারটা মালির ওপর আবু তালেবের নজর পড়ল। মালিগুলোর কাজের মধ্যে নমাসে ছমাসে এক আধটা ফুলের চারা লাগালো, এ ছাড়া ধরতে গেলে সারাদিনই বসে কাটায়। হয়ত কোথাও একটা শুকনো পাতা পড়ল অমনি একটা

মালি ছুটে গিয়ে পাতাটা কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। কিম্বা সেলুনে যেমন দেড়ঘণ্টা ধরে দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটাই হয় তেমনি করে কোন মালি হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা ঝাড়ের ওপর কাঁচি চালিয়ে হরেক রকম নক্সা তৈরি করছে। আবু তালেবের রিট্রেঞ্চমেণ্ট প্রথম মালি বেচারাদের ওপর দিয়েই সুরু হল। একদিনে ষোলজন মালি বরখাস্ত হয়ে গেল। তারা কিছুতেই এই বিনা কসুরে চাকুরি যাওয়া বরদাস্ত করল না। দলবেঁধে হুজুরের দরবারে আরজি পেশ করল। নবাব সাহেব তখন বাগিচায় সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। একদল মালিকে করজোড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি চাও?" সর্দ্দার মালি এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে সেলাম করে বললে "হুজুর মা বাপ, গোস্তাকি মাপ করবেন—দেওয়ানজী আমাদের সবাইকে ছুটি দিয়েছেন।" নবাব সাহেব অবাক হয়ে বললেন "কেন? তোমরা করেছ কি?" সর্দ্দার মালি ইতস্ততঃ করে বললে "হুজুর মা বাপ, তাত জানি না।" নবাব সাহেবের মুখে বিস্ময়, বিরক্তি, ক্রোধ একসঙ্গে ফুটে উঠল। তিনি তখুনি তাঁর আরদালিকে হুকুম দিলেন "দেওয়ানজীকো আব্ ভি সালাম দেও।" আবু তালেব এসে উপস্থিত হলে নবাব সাহেব এতগুলি মালির একসঙ্গে চাকুরি যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আবু তালেব বলল "হুজুর আমি ওদের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং আমার বিশ্বাস যে দুটি মাত্র মালিই আপনার সমস্ত বাগিচা তদারকের পক্ষে যথেষ্ট; এতগুলি মালি রাখার কোন দরকার নেই।" নবাব সাহেব ত রেগেই আগুন, চীৎকার করে বললেন "দরকার নেই মানে? আলবত দরকার আছে, একশবার দরকার আছে। আরে কম্বখ্‌ত এটাও বোঝ না যে ঐখানেই আমার নবাবী।" তারপর একটু সুর নামিয়ে বললেন "নাঃ তোমার দ্বারা হবে না, আজ পর্য্যন্ত এটা মাথায় ঢুকলো না যে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য আমার নবাবী কিসে বজায় থাকে সেই দিকে নজর রাখা? তা না করে সেই নবাবীর মর্য্যাদা তুমি ক্ষুণ্ণ করতে বসেছ?"

আবু তালেবের চাকুরি যায় নি, কারণ এও নবাব বাহাদুরের একটা নবাবী।

নন্দদুলাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট্-ল

নন্দ দুলাল, কিশোর গোপাল, তুমি কি ডাকিছ মোরে?
আমি যে তোমার করুণা ভিখারী, দৃষ্টি প্রসাদ মাগি—
আমি যে তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই সকল জনম ভোরে।
ডাকো ডাকো মোরে কাছে টেনে লও, কর মোরে অনুরাগী।
আজো বঙ্গের নর নারী যায় বল্লভপুর গাঁয়ে,
সেথা হ'তে ফিরে খড়দহে এসে পুনঃ যায় শাঁইবনা।
রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, নন্দদুলাল পায়ে—
একে একে তারা প্রণমিয়া আঁকে অশ্রুর আলিপনা।
একই পাথরের তিন বিগ্রহ তিনঠাঁই রহিয়াছে,
বীরভদ্রের আরাধ্য ধন বিলাইছে হরিনাম।
মৃদু মৃদঙ্গ করতালরোলে ঐ গান গেয়ে নাচে,
'হরে কৃষ্ণ হরে রাম—নিতাই গৌর রাধা শ্যাম।
পল্লীবাসীরে ভালবেসে তুমি দূরপল্লীতে এলে,
গরীবের সাথে সুখে দুখে প্রভু রহিয়াছ এক হয়ে।
বিদুরের ক্ষুদ্ ভুলিতে পারো না, তাই সম্পদ ফেলে
কাঙালের বেশে, কাঙালের দেশে রয়েছ দুঃখ সয়ে।
তোমার পূজার ছলেতে আমরা নিজেরে প্রচার করি,
তাই আসিয়াছি শাঁইবনা-গাঁয়ে করি এত আয়োজন।
তোমার পূজার অর্ঘ্য হৃদয়ে লইতে পারিলে বরি,
নিজেরে প্রচার করিতে এমন হত না কাঙাল মন।
ঢাকো ঢাকো মোর মলিন মনের সকল অহঙ্কার,
তোমার চরণে মতি থাকে যেন, আর সব কেড়ে লও।
ধনের নামের যশের তৃষ্ণা জেনেছি জীবনে সার,
তবু তুমি মোরে ডাকিছ ঠাকুর, কথা কও, কথা কও!
বাঁশরীতে নয় নন্দদুলাল, কণ্ঠের বাণী চাই,
নয়নের হাসি ভুলায়েছে মোরে, চাই না ভুলিতে আর
পিতার কণ্ঠে নাম ধরে ডাকো, শ্রবণে শুনিব তাই,
প্রিয়ার বেদনে মোরে বুকে বাঁধো ঝরুক নয়নধার।
কোন দিন কিছু লুকাইনি প্রভু, তুমি তো সকলি জানো,
কোথায় মিথ্যা কোথায় ছলনা কতটুকু ভালবাসা।
ব্যথা দেবে দাও তীব্র দাহনে তীক্ষ্ণ শায়ক হানো,
শুধু নিভায়ো না তোমারে দেখার ক্ষীণতম এই আশা।
হে বংশীধর বাজাও বাজাও—হেথা মনোরম ছায়া,
হায় এ বধির কর্ণে পশে না বাঁশরীর ক্ষীণ তান।
মোর অনুরাগ নিশার স্বপন—দিবসে মিলায় মায়া,
মোর ভালবাসা বালুচর ঘর, ঝটিকায় অবসান।
কি কহিতে হবে জানিনা ঠাকুর, কি যে প্রার্থনা মোর,
মানুষেরে যেন সদা ভালবাসি, ঘৃণা নাহি করি কভু,
ব্যথিতের ব্যথা বুকে যেন পাই, ঝরুক নয়নে লোর,
জীবন মরণ ধরম করম সকলি তোমার প্রভু।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—এগারো—

কিছুক্ষণ বলরাম কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন কী একটা যাদুমন্ত্রে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সুরু করিয়া জিহ্বা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেছে। একি কথনো সম্ভব, এমন কি হইতে পারে কোনোদিন? ডি-সিলভার ঘর হইতে সেই উগ্র মদের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও কি মাতাল এবং বিহ্বল করিয়া দিয়াছে?

বলরাম দাঁড়াইয়া রহিলেন। পা কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে—বুকের দুদিক হইতে দুইটা প্রাণপিণ্ড ছুটিয়া আসিয়া যেন একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। কিন্তু বিহ্বল নির্বোধ হইয়াও বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি। পায়ের নিচে সেই রক্তাক্ত দেহটা নড়িতেছে—ঢেউয়ের মতো নিশ্বাস পড়িতেছে। বলরামের মনে পড়িল এমনিভাবে আর একবার তিনি টর্চের আলো ফেলিয়া দেখিয়াছিলেন: সিঁড়ির নিচে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি নারীমূর্তি, গলগল করিয়া তাজা রক্তের ধারা নামিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছে। সে দশ বৎসর আগেকার কথা, আর আজ—

পায়ের তলায় পড়িয়া গোঙাইতেছে মুক্তো। মুক্তো—দশবছর আগে একদিন যে বলরামের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—যাহার বুকের মধ্যে অসহায় মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া তিনি শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িতেন—তাহার সেই মুক্তো! মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের চমকে বলরামের সর্বাঙ্গ নড়িয়া উঠিল।

—রাধানাথ, জল আন্, জল—

*　　*　　*　　*

মণিমোহনের বোট যখন চর-ইসমাইলে বাংলোর ঘাটে আসিল, তখন রাত্রির শেষ প্রহর। ঝিমঝিম ঝিরঝির করিয়া সেতারের একটানা সুরের মতো যে বৃষ্টিধারাটা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেটা থামিয়া গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল হইয়া অস্তপথিক নক্ষত্র-চক্র আসন্ন-প্রভাত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে শান্ত আর কোমল দৃষ্টিতে। ব্যাঙের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-গান উঠিতেছে, ঝোপের মধ্যে পোকা ডাকিতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে। কোথা হইতে বাসা-ভাঙা একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেমন আর্ত, তেমনই করুণ তাহার অসহায় স্বর।

মণিমোহনের সমস্ত চৈতন্যটা আগুনের মতো জ্বলিতেছে। দৃষ্টির সামনে অগ্নিশিখার মতো প্রখর ও ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে একখানা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তির চোখে দুইখানি নীলা বসানো। তাহা উপনিবেশের কোনো কালবৈশাখীতে ঝড়ের পিঙ্গল আলোয় দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে কামনার শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র একখানা ছোরা ঝলক লাগাইয়া যায়।

নৌকার মাঝি ঝপ করিয়া লগিটাকে ফেলিল। জল-কাদার মধ্য হইতে আকস্মিক শব্দ উঠিল একটা, যেন শেষ-রাত্রির রহস্যময়ী নদীটা সেই বর্মী মেয়ে মা-ফুনের মতো একটা কৌতুকের আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, হুজুর, উঠবেন না?

মণিমোহন জবাব দিল, নাঃ থাক। এত রাত্রে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘণ্টা তিনেক রাত আছে, নৌকোতেই ঘুম দিয়ে নেব এখন।

—সে কি হুজুর, কষ্ট হবে যে। ভালো বিছানা নেই, কিছু নেই—

—তা হোক, তা হোক।

মাঝিরা আর কথা কহিল না। হাকিমের মর্জির উপরে বলিবার কথা কিছুই তাহাদের নাই। মাল্‌সা হইতে আগুন লইয়া তাহারা হুঁকা ধরাইয়া আরাম করিয়া বসিল, দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া তামাক টানিল, মণিমোহনের দুর্বোধ্য চট্টগ্রামের ভাষায় খানিকক্ষণ কী গল্প করিল, তারপর এক একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া যে যেখানে পারিল গুটিশুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। আর শোয়া মানেই ঘুমাইয়া পড়িতে যা দেরী।

নদীর বুক হইতে শেষ রাত্রির হাওয়া নৌকার এখান ওখান দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। সকলের মধ্যেও অল্প অল্প শীতের শিহরণ লাগিতেছে মণিমোহনের। তবে এ ঠাণ্ডাটা পীড়াদায়ক নয়—শরীরের ভিতর কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে মাত্র।

ইচ্ছা করিয়াই রাতটা সে বোটে কাটাইয়া দিতে চায়। আজ দশবৎসর পরে বর্মী মেয়েকে দেখিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা-চেতনাই যেন বিচিত্রভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। ঠিক সেই সব দিন যেন রক্তের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে—যে-সব দিনে তাহার রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল উপনিবেশের নির্মম রুদ্র-বসন্ত, উন্মত্ত বর্বর যৌবন। বাহিরের গর্জন-মুখর অকাল-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দুইটি দেহের অণুতে অণুতে মশাল জ্বলিতেছিল, রাণীর মুখখানা ছায়াছবি হইয়া মিলাইয়া গিয়াছিল দৃষ্টির বাহিরে।

গায়ের মধ্যে জ্বালা করিতেছে, মাথাটা যেমন ভারী, তেমনি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহন উঠিয়া বসিল। তাহার আবার নেশা ধরিতেছে নাকি? কাল দারোগা মেয়েটাকে লইয়া আসিবেন নিশ্চয়। সে কী বলিবে কে জানে!

কী বলিবে!

হঠাৎ যেন মণিমোহনের চমক ভাঙিয়া গেল।

এ সে করিতেছে কী! সে কি পাগল হইয়া গেল? ওই অসচ্চরিত্র

একটা মগের মেয়ে, নিজের স্বামীকে যে ইচ্ছা হইলেই খুন করিতে পারে, কামনার তাগিদে যে-কোনো লোককে আত্মসমর্পণ করিতে যাহার বাধা নাই এবং যে একসময় মণিমোহনকে নির্বোধের মতো নাকে দড়ি দিয়া নাচাইয়া ছিল, তাহার সঙ্গে সে আবার কথা কহিতে চায় কোন্ সাহসে এবং কোন্ লজ্জায় !

বর্মী মেয়েকে তো বিশ্বাস নাই। সেদিন যে ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই বিস্ময়কর ভয়ানক মুহূর্তটির মূল্য যাহাই থাক, এ মেয়েটার কাছে তাহার দাম কতটুকু ! ইহার এইই তো পেশা—যখন যাকে পায় কাছে টানিয়া লয়, দুদিনের জন্য তাহাকে মদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তারপর একটা ভাঙা-পুতুলের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। মণিমোহন ও একদিন তাহার পুতুল খেলার সঙ্গী হইয়াছিল—তাহার বেশি কিছুই নয়।

মনে করো—কাল মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, একদিন মণিমোহনের সঙ্গে তাহার একটা অশোভন সম্পর্ক ছিল, একদিন মণিমোহন—

কথাটা ভাবিতেই অন্তরাত্মা তাহার চমক খাইয়া উঠিল। কী সর্বনাশ ! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে কতখানি নামিয়া যাইবে সে ! দারোগা জানিবেন, চর-ইসমাইলের সবাই জানিবে, রাণী জানিবে, কে জানিবে এবং কে জানিবে না ! আর ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হইবে না, শ্রাদ্ধ আদালত পর্যন্তও হয়তো গড়াইবে এবং ওই নির্লজ্জ—ওই ভয়ঙ্কর নীলার মতো জ্বলন্ত দুইটি শাণিত-নয়না মেয়েটি আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিবে—

তাহা হইলে ? মণিমোহনের আচ্ছন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর তীব্র রূঢ় আলো আসিয়া পড়িল। দশ বছর আগে যাহা ঘটিয়াছিল আজ আর তাহা সত্য নাই—আজ আর তাহা সত্য হইতে পারে না। সেদিন দায়িত্ব ছিল না—জীবনের কোনো পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ ছিল না, শুধু রোমান্স্ ছিল, শুধু উদগ্র খানিকটা মাদকতা ছিল। কিন্তু আজ ? আজ সে গেজেটেড্ অফিসার হইয়াছে, সরকারী চাকরীর ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সম্ভাবনার দিকে। রাণীকে সে ভালোবাসে, পিণ্টুর মধ্য দিয়া তাহার নিজের মৃত্যুহীন প্রাণ-প্রবাহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্যাতি, অর্থ ও আরাম। অফিসে আদালতে দশ বছর আগেকার এই কেলেঙ্কারীটা জানাজানি হইলে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না, রাণীর কানে গেলে যেমন দুর্বহ, তেমনিই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিবে সমস্ত পারিবারিক জীবনটা। তাহার চাইতে—

কাল দারোগা আসিবার আগেই সে পালাইবে। পালাইবে এই চর-ইসমাইল হইতে। আগষ্ট আন্দোলনের ফেরারী ধরা তাহার দায়িত্ব নয়, ওসম্বন্ধে মামুদপুরের দারোগা যাহা ভালো বোঝেন করিবেন। যে কাজে সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা একরকম শেষ হইয়াছে, যাহা হয় নাই, তাহা সদর অফিসে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র মারফৎ সারিয়া দিলেই চলিবে।

সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর-ইসমাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে। আজ তাহার মনের মধ্যে একদিকে দেখা দিতেছে লাল-কাঁকর ফেলা সেই ছোট প্ল্যাটফর্ম, বাতাসে ভাঁটফুল আর আমের মুকুলের গন্ধ, পারুল-বনের মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে খোল করতাল আর কীর্তনের সেই ঐকতান। আর একদিকে রাত্রির অপ্সরী কলিকাতা—ফ্লাওয়ার মার্কেট, মেট্রো সিনেমা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ ; আর অফিসারদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে ষ্টিকের শব্দ, তক্‌মা-আঁটা বেয়ারার হাতে রূপার ট্রেতে বিলাতী মদের পাত্র। ঘরে রেডিয়ো খুলিয়া বসিয়া আছে রাণী, পিণ্টু তাহার খেলার মোটর লইয়া পিয়ারীর সঙ্গে অকারণ কলহাসিতে সমস্ত বারান্দাটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নাঃ—সে পালাইবে। কাল সকালেই এবং যেমন করিয়া হোক। যৌবনের আত্মবিস্মৃত একটি বিহ্বল তরুণের সঙ্গে আজকের হাকিম মণিমোহনের কোনো মিল নাই, কোনো মিল থাকা অসম্ভব।

* * * *

ওদিকে কালুপাড়ার দিক হইতে জনতার উত্তাল তরঙ্গ চর-ইসমাইলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মজাঃফর মিঞার গোলা পোড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্তেও আগুন ধরিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে ভয় এবং দ্বিধার ভার তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেছে। এখন তাহাদের ভয় নাই, সংশয় নাই ; যুদ্ধ এবং মহাজনের পীড়নে যে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল—তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে উপনিবেশের অমার্জিত উদ্বেল শক্তি। মরিতে যদি হয় তো সোজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু করিয়া তবে ছাড়িবে।

সারা রাত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি—বাদলের দমকা বাতাস বহিতেছে। তাহারই মধ্যে, সেই জল বাতাস মাথায় করিয়া তাহারা মসজিদের মাঠে সভা করিল। মহাজনদের সকলকে দেখিয়া লইতে হইবে। চাল না পাওয়া যায়, তাহারা যেমন করিয়া হোক আদায় করিয়া লইবে। দিনের পর দিন এই যে একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, গায়ে রক্ত থাকিতে, হাতে লাঠি থাকিতে তাহারা কিছুতেই সেটা মানিয়া লইবে না।

সভায় জোর গলায় বক্তৃতা দিল জমির।

—ভাই সব, নিজের বরাত নিজের হাতে। কুকুরের মতো না খেয়ে মরব কেন আমরা ? চলে এসো, যে ব্যবস্থা পারি আমরাই করব। আমরা জোয়ান—মরি তো লড়াই করে মরব—মেয়ে মানুষের মতো কেঁদে মরব না।

—আল্লা হ আকবর—

ভোরের অন্ধকার ফিকে হইবার আগেই পাঁচশো লাঠিয়াল অগ্রসর হইল চর ইসমাইলের দিকে। মামুদপুরের বনোয়ারী দারোগা তখন সুখ-শয্যায় পড়িয়া অচির-ভবিষ্যতে ইন্‌সপেক্টার হইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন।

মণিমোহন বলিয়াছিল, রাণী, আজই সদরে ফিরতে হবে—এখনি। খুব জরুরি দরকার, খবর পেলাম।

ঘাটে বোট তৈরী হইতেছে। জিনিসপত্র সব তোলা হইয়া গেল। রাণীর শরীরটা এখনো দুর্বল···বোটের মধ্যে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। পিণ্টু মায়ের কাছে বসিয়া একমনে চকোলেট চুষিতেছে,পিয়ারী মাঝিদের ধমক দিয়া নিজের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মণিমোহন পালাইতেছে। দারোগা আসিয়া কী ভাবিবেন কে জানে। কিন্তু সে কথা ভাবিলে মণিমোহনের চলিবে না। যাহা নিশ্চয় আর নির্ধারিত হইয়া গেছে—সেখানে নতুন করিয়া ঝড় আনিতে আর সে চায় না। জীবন্ত-বুদ্ধমূর্তির নীলার মতো চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে আজ আর তাহার সাহস নাই।

ঠিক এম্‌নি সময় আর একখানা নৌকা আসিয়া পাশে লাগিল। মণিমোহন চাহিয়া দেখিল, সামনে গলুইয়ে কবিরাজ বসিয়া।

—এ কি, কবিরাজ মশাই যে।

কবিরাজ ম্লানভাবে হাসিলেন।

—কোথায় চললেন ?

—শহরে।

—নৌকোর ভেতরে কে ?

কবিরাজ মুহূর্তে কেমন হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মুখ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত গলায় বলরাম জবাব দিলেন : আমার স্ত্রী।

দশবছর আগেকার কথা ভুলিয়া গেছে মণিমোহন। শুধু বলিল, আপনার স্ত্রী ? ওঃ !

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর—বদর। সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয়—রাক্ষসী ভৈরবীমূর্তিও নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিক্‌চক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধূ ধূ আভাস দেখা যাইতেছে—মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিকের ঝাঁক।

মণিমোহন বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ মশাই, নমস্কার।

—নমস্কার।

ভাঁটার প্রখরটানে সরকারী বোটখানা ভাসিয়া গেল।

বলরামের নৌকাও এখনি ছাড়িবে। মাঝিরা বেশ করিয়া তামাক টানিয়া লইতেছে—অনেকখানি পথ পাড়ি জমাইতে হইবে। বলরাম অন্যমনস্কের মতো বিড়ি ধরাইলেন।

মুক্তোর সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। বেশ বোঝা যায়, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়া তাহাকে কোপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার জ্ঞান এখনো ফেরে নাই, শহরে গিয়া ফিরিবে কি না কে জানে। বোধ হয় সম্পত্তির গোলমালেই নুরুল গাজীর সুযোগ্য পুত্রেরা তাহার এই অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কিন্তু ওসব ভাবিবার দরকার তাঁহার নাই। আজ মুক্তো তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চর ইসমাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরল-রেখাতেই বহিয়া যায় না—সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই, সংশয়ও নাই। তাই বোরখা খুলিয়া তিনি তাহাকে শাড়ী পরাইয়া দিয়াছেন,—দশবছর আগেকার তুলিয়া রাখা অতি-যত্নের ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীখানা। শহরে গিয়া মুক্তো যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই শাড়ী পরাইয়া মুক্তোকে তিনি নতুন করিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন করিয়াই তাঁহার মিলন-বাসর রচনা হইবে।

মুক্তো ঘুমাইয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নাই, পরম নিশ্চিন্ত, পরম আশ্বস্ত। যেন সারা রাত ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ক্লান্ত ভীত একটা পাখী নীড়ে আসিয়া তাহার আপনার জনের বুকের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বলরাম নাড়ী দেখিলেন। দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত আশঙ্কার কারণ নাই।

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে পাগলের মতো রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—বাবু, বাবু, সর্বনাশ।

—কী হয়েছে ?

—পাঁচশো লোক এসে চড়াও হয়েছে—ধান লুঠ করে নিয়ে গেল। এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে—সব যে গেল !

—যাক।

—সে কি ! আমি কী করব বাবু ?

—যা খুশি। মাঝি, নৌকো খোলো।

চর-ইসমাইলে বলরামের আর আকর্ষণ নাই। যদি কখনো ইচ্ছা হয় ফিরিবেন, নতুবা নয়। যাক—সব যাক। আজ মুক্তোকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন, সব পূর্ণ হইয়া গেছে। চর ইসমাইলে না হোক—এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট, এর কোথাও কি তাঁহারা স্থান করিয়া নিতে পারিবেন না ? সারা জীবন ঘর বাঁধিবার যে ব্যর্থ বাসনা লইয়া তিনি শুধু বিষয়-সম্পত্তির মূল্যহীন বোঝাটাকেই টানিয়া চলিয়াছেন—আজ সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া একটি প্রেমকেই তিনি স্বীকার করিতে চান।

রাধানাথ কথা কহিল না। সে শুধু বালির উপরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

*   *   *   *

চর-ইসমাইলের দুরন্ত যৌবন জাগিয়াছে। নতুন কালে, নতুন রূপে। ইহার কাছ হইতে মণিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামেরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে কতটুকু ক্ষতি। মৃত্যুঞ্জয়ী অমার্জিত মানবসত্তা এখানে নিঃশব্দ ও নিভৃত আয়োজনে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে নিজেকে। এই বিশাল-ব্যাপ্ত জলরাশি হইতে—এই ঝড়ের আকাশ হইতে—বিলুপ্ত পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভাঙা পঞ্জর হইতে—এখানকার অসংযত আরণ্য-কামনা হইতে। সে দিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে বাংলার গণ-শক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি।

সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই, উপসংহারও নাই। আজ উপনিবেশ হইতে চারশো মাইল দূরে বসিয়া সে অনাগত বিপুল কাহিনীর আমি ভূমিকা মাত্র রচনা করিয়া গেলাম, নতুন যুগের নতুন মানুষ আসিয়া তাহাকে সমাপ্ত করিবে॥

—তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত—

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হিন্দুর পরিণয়প্রথা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বঙ্কিমযুগ বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল প্রতিভাশালী লেখককে লইয়া এই নবযুগের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্থান অতি উচ্চে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগান্তরকারী মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রবর্ত্তিত করিবার সংকল্প করেন তখন নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তির রচনাদি উহাতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখেন নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে চারি বৎসরকাল বঙ্গদর্শন সম্পাদিত করিয়াছিলেন সেই চারি বৎসরে অন্যান্য নূতন লেখকের রচনাও প্রকাশিত হয়। চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত ভাবে লেখকগণের নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তালাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন,—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ-দুঃখের ভাগী,—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারি জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন তাহা কেহ বুঝে না। আমার সে দুঃখ কে তাহার ভাগ লইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন আরও কয়েকজন লেখকের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ঋণী ছিলেন তাঁহাদের নাম পাদটীকায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।"

১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমসংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণকালে আমি অসাবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য।"

কিছুকাল পূর্ব্বে পত্রান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান নয়জন লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'বঙ্কিমসভার নবরত্ন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য-সাম্রাজ্যের বিক্রমাদিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের নবরত্নের নাম আমি একটি শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছিলাম :—

বঙ্কিম বিক্রমাদিত্য নবরত্নধর
বঙ্গ সাহিত্যের রাজা খ্যাত ধরাপর ;
দীনবন্ধু ছিল তাঁর মুকুটের মণি,
কণ্ঠহারে রাজকৃষ্ণ আলোকের খনি ;
শোভিত দুইটী করে রতন বলয়ে,
রামদাস, লালমোহন হীরাখণ্ড হয়ে ;
পঞ্চ চন্দ্র চন্দ্রহারে ছিল জ্যোতির্ম্ময়,
যোগেন্দ্র, নবীন, হেম, প্রফুল্ল, অক্ষয়।

পরে একে একে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত—'বঙ্গদর্শনের' চল্লিশজন লেখকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন বঙ্গদর্শনের লেখকগণের নাম প্রথম যখন বিজ্ঞাপিত হয়, তখন "আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নাম-হীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল।" শুধু নাম ছাপা হয় নাই, বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই তাহার লেখা 'উদ্দীপনা' পত্রস্থ হইয়াছিল, কারণ সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তরুণবয়স্ক অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি স্ফুরিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে বন্ধু জগদীশনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন—

"I have got a lot of contributors who have promised to write and can write, in Dinabandhu, Hem Chandra, Krishna Kamal Bhattacharjya, Tara Prasad Chatterjee

and a young man, whom you don't know, but whose intellectual life I think I have greatly influenced, for good or for evil and whose inherent gifts presage something great for him in the future. His name is Akkhay Sarkar."

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনের' চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, 'সাধারণীর' নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদক, জাতির 'নবজীবনের' স্রষ্টা অক্ষয়চন্দ্রের কৃতকার্য্য বিস্মৃত হইবার নহে।

তবুও আমরা বিস্মৃত হইতেছি। নবীনযুগের তরুণগণ তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানেন না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত রচনাবলী, রসসমুজ্জ্বল বক্তৃতাসমূহ সহজপ্রাপ্য নহে।

১২৫৩ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। এই একবৎসর মধ্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগিগণের সমবেত চেষ্টায় যদি তাঁহার একটি সুলিখিত জীবনচরিত এবং বক্তৃতা ও রচনাবলী সঙ্কলিত হয় তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হয় এবং বঙ্গীয় পাঠকসমাজও উপকৃত হয়। ভবিষ্যতে এইরূপ কোন গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবে এই আশায় আমরা নিম্নে অক্ষয়চন্দ্রের একটি দুষ্প্রাপ্য বক্তৃতা উদ্ধার করিতেছি। বক্তৃতাটির বিষয় 'হিন্দু পরিণয়প্রথা'।

বক্তৃতাটি উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন।

বোম্বাই প্রদেশে সামাজিক প্রথানুসারে শিশুকালে রুক্মাবাইয়ের সহিত দাদাজী ভিখার বিবাহ হয়। পরে য়ুরোপীয় মিশনারীদের সাহায্যে রুক্মাবাই উচ্চশিক্ষালাভ করে কিন্তু তাহার স্বামী অশিক্ষিতই থাকিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর রুক্মাবাই স্বামীর সহিত বাস করিতে অসম্মত হয় এবং দাদাজী বোম্বাই হাইকোর্টে তাহার স্বামিত্বের অধিকার লাভের জন্য মোকদ্দমা করে। দাদাজী মোকদ্দমায় জয়লাভ করে এবং রুক্মাবাইকে স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণের ও তাঁহাকে ২০০০৲ ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় ছয়মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ইহা লইয়া য়ুরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং অন্যান্য শিক্ষিত য়ুরোপীয় ও দেশীয়গণ মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। অবশেষে চাঁদা তুলিয়া অর্থপ্রদান করত দাদাজীকে তুষ্ট করা হয় এবং রুক্মাবাইয়ের মোকদ্দমা আপোষে মিটমাট হয়, রুক্মাবাই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে ক্ষমতালাভ করে। এই আন্দোলনের ফলে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবাহের অনিষ্টকর প্রথা সম্বন্ধে একটি তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করেন এবং ভারত গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহাদের মতে গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ও আইনের সংস্কার করা উচিত কিনা। সামাজিক ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় অনেকে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে [illegible] মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতা (পরে রাজা বাহাদুর) বিনয়কৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাটীতে একটী অসাম্প্রদায়িক সভা আহ্বান করত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে স্বীয় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে বলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই সভায় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। "হিন্দু খৃষ্টান" সুপণ্ডিত জয়গোবিন্দ সোম প্রধান বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাঁহাদের নাম ডাক্তার (পরে স্যর) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক প্রবর চন্দ্রনাথ বসু, 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ('বঙ্গবাসী' সম্পাদক বলিয়া বর্ণিত) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মনোমোহন বসু, (পরে মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা হিন্দুপরিণয়প্রথা সংস্কারে গবর্ণমেন্টের ও মিশনারীদের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই সভার কার্য্যবিবরণী লিখিত আছে—

"নবজীবন" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি-এল, বলেন—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

"আজি কালি আমাদের দুর্দ্দশার দিকে, আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ; দুর্দ্দশা যে হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধানে আমরা সকলেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কোন একটি বিষয়ের প্রকৃত কারণ স্থির করিতে হইলে, যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন, সেরূপ বিচারশক্তি এবং তজ্জন্য যেরূপ ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহার কিছুই আমাদের নাই। অথচ দুর্দ্দশা যখন হইয়াছে, তখন তাহার

একটা কারণ স্থির করা চাই। অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতাই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

আমাদের সমস্ত আচারব্যবহার, রীতিনীতিই আবার এই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। আমাদের অশন, বসন, শয়নোপবেশন—সকল প্রকার রীতিনীতিই আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। আমাদের অশন পুষ্টিকর নহে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের বসন শরীরের তাপ-রক্ষণকর নহে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের উপবেশনভঙ্গী শয়নপ্রথায় আমাদের অলস করিয়া তুলে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের অন্য সকল রীতিনীতি আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের হেতুভূত বলিয়া যেরূপ আক্রান্ত হইয়াছে, আমাদের বিবাহ পদ্ধতিও সেইজন্য সেইরূপ আক্রান্ত হইয়াছে।

আমাদের সকল আচারব্যবহারই যখন আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ, তখন আমাদের বাল্যবিবাহ প্রথা অবশ্যই দুর্ব্বলতার কারণ। অর্থাৎ বাল্যবিবাহে দুর্ব্বলবংশ সৃষ্টি হয়। এইরূপ যুক্তিবাদে এইরূপ ধারণা অনেকেরই হইয়াছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে আমার মনে যে খট্‌কা আছে, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

পশ্চিম পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বাল্যবিবাহ আছে, অথচ ঐ সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে এবং পূর্ব্বকালে বাল্যবিবাহ ছিল, অথচ তখন লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এ সকল কথার আভাস পূর্ব্বে আপনারা পাইয়াছেন; আমি এই সময়ের এই বঙ্গদেশের দুইটা কথা বলিতে চাহি।

বাঙ্গালার ছাগগবাদি পশুসকল বেহার প্রভৃতি প্রদেশের ছাগ-গবাদি অপেক্ষা দুর্ব্বল। কাজেই আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—যে ভাল, আমরা যেন বাল্যবিবাহ দোষে গোল্লায় যাইতেছি—উহারাও কি, সেই বাল্যবিবাহনিবন্ধন উৎসন্ন যাইতেছে?

দ্বিতীয় কথা—গোপ বাগ্‌দি প্রভৃতি বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে পাঁচ সাত বৎসরের বালিকা পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া ঘরে আনিতে হয়। অথচ দেখা যায় যে নদে শান্তিপুরের গড়ো গোয়ালা, এবং হুগলি বর্দ্ধমানের বাগ্‌দি ডোম—বাঙ্গালার ডাকাতের ডাকাত, সর্দ্দারের সর্দ্দার এবং লাঠিয়ালের লাঠিয়াল। বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জন্তুতে দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে বাল্য সহবাস অসম্ভব হইলেও তাহারা দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতিতে দেখা গেল, যে তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাকিলেও তাহারা সবল। তবে কোন্ মুখে আর বলিতে পারি,—যে বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার একটি নিশ্চিত কারণ?

এখন যেন মনে করাই যাউক, যে ঐ সকল খট্‌কার মীমাংসা হইয়া স্থিরই হইয়াছে যে, বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের অন্যতম কারণ। বলি, তাহা হইলেই কি স্থির হইবে, যে বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অনেকেই মনে করেন, আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আবার অনেক বিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই আমাদের দুরবস্থার মুখ্য কারণ। যাহা হউক, দুর্দ্দশার কারণ বিচারে, চরিত্রের দুর্ব্বলতা যে উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে, তাহা বলিতেই হইবে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, বাল্যবিবাহে কিয়ৎপরিমাণে চরিত্র রক্ষা হয়। তাহা হইলে একটি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে বাল্যবিবাহে ক্রমে শারীরিক বলক্ষয় হয়—বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে, বাল্যবিবাহে চরিত্রবল পোষণ বা রক্ষণ হয়। তবে এখন করিব কি? বাল্যবিবাহে চরিত্রবলের দিকে লাভের অঙ্ক এবং শারীরিক বলের দিকে ক্ষতির অঙ্ক ইহার কোনটি বেশী—তাহা কেমন করিয়া গণনা করিব? চরিত্রবলের সহিত শারীরিক বলের তুলনা করিবার জন্য বাটখারা কোথায় পাইব? আমি এই সমস্যা মীমাংসা করিতে অপারগ? আমি বলি,—এই সকল কথা ভাবিবার বিষয়—কেবল বক্তৃতার বা হাততালির বিষয় নহে।

কন্যা নির্ব্বাচনের কথা। আমার বন্ধুবর বাবু চন্দ্রনাথ বসু বিশদ ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ—বা কুলে-কন্যা-আনয়ন কেবল বরের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য নহে। একটি সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দাদির জন্য। আমি অধিকন্তু আরও বলি যে, হিন্দুর বিবাহে একটি পরিবার কেন, একটি সমাজের সুখ-দুঃখ, অল্প হোক, বিস্তর হোক, নির্ভর করে। একটি কন্যার উপর যখন কতকগুলি লোকের বা একটি সমাজের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তখন সেই কন্যা নির্ব্বাচনের ভার, কোন্ যুক্তিতে কোন্ বুদ্ধিতে একজনের খেয়ালের উপর দিব? কেমন করিয়া সেই গুরুতর কার্য্যের ভার একজন রূপ-লোলুপ যুবকের উপর ন্যস্ত করিব? এই জন্য হিন্দুর বিবাহে পাত্রী নির্ব্বাচন, কতকগুলি সামাজিক নিয়ম অনুসারে কুলপতি কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। কুলপতিও আপনার খেয়াল মত পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একটি সামাজিক কার্য্য।

আমি হিন্দু-বিবাহ প্রথার সমর্থন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমি এখনকার কালে এই বঙ্গদেশে হিন্দুর বিবাহ প্রথা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহা ভাল বলিতেছি। পবিত্র বিবাহ প্রথার আমরা বঙ্গদেশে অতি লজ্জাকর পরিণতি করিয়াছি। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিব না—আমি আপনার অস্থি মজ্জার কথা বলিব।

আমি মৌলিক কায়স্থ—আমার তিনটি কন্যাসন্তান আছে। সুতরাং কায়স্থের বিবাহ প্রথা—আমার কাছে কেবল বক্তৃতার কথা নহে; আমার অস্থিমজ্জার কথা। বলিতে ঘোরতর লজ্জা হয়, আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা হেঁট করিতে হয়—বঙ্গের কায়স্থ জাতি বিবাহ প্রথাকে নিদারুণ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন। বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, বিবাহ ধর্ম্ম সংস্কার, বিবাহ কৌলিক অনুষ্ঠান—এ সকল আমাদের কাছে উপহাসের উপকথা হইয়াছে। কায়স্থ বরকর্ত্তা মহাশয় সুলক্ষণা পাত্রীর অনুসন্ধান করেন না। বৈবাহিকের বংশ ব্যবহার দেখেন না—কেবল

খুঁজিয়া বেড়ান যে কোন্ পাত্রীর পিতা পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিবে। তাহাতেই বলিতেছি—যে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে তখন কি ছিল তাহা মনে করিয়া উচ্চদিকেই দৃষ্টি করিব? না আমরা কি করিতেছি—সেই নিম্নদিকেই দৃষ্টি করিব? বলিতে কি, আমি মৌলিক কায়স্থ, আমার পক্ষে হিন্দু বিবাহের পূর্ব্বতন গৌরবের কথা ভাবনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই কায়স্থজাতি, সর্ব্বদাই আপনার জাতি গৌরব করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য—যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া সকলের অবশ্য নমস্য হইবার জন্য কখন কখন বড় ব্যগ্র হন। কিন্তু পবিত্র বিবাহ কার্য্যকে জঘন্য পণ্যব্যবসায়ে পরিণত করিয়া যে তাঁহারা দিন দিন নীচাদপি নীচ হইতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না। আবার বলি, আমাদের কায়স্থ কুলাঙ্গারদের কৃতকার্য্যের জন্য লজ্জায় আমাদের হেটমুণ্ড হইতে হয়, ঘৃণায় মাটীতে মিশাইতে ইচ্ছা করে। আমি কায়স্থ, এ সকল আমার মর্ম্মকথা—আমি কন্যাত্রয়ের পিতা, এ সকল আমার অতি মর্ম্মের কথা। মর্ম্মের কথা বলিয়াই আমি—এই কায়স্থ গোষ্ঠীপতিগণের ভবনে দণ্ডায়মান হইয়া কুলীন কায়স্থ-কুলোজ্জ্বলকারী সভাপতি মহাশয়ের সমক্ষে বলিতেছি—যে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা কায়স্থ আছেন তাঁহারা পাস করা পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ সময়ে যেন স্মরণ করেন যে—হিন্দুর বিবাহ অতি গৌরবের প্রথা, —ইহার অতি পবিত্র উদ্দেশ্য—হিন্দুর বিবাহ একটি কৌলিক অনুষ্ঠান—একটি ধর্ম্মসংস্কার। বিবাহকে অর্থাগমের উপায় বলিয়া মনে করিলে, বিবাহ বৈদেশিক চুক্তির অপেক্ষাও শত গুণে অপবিত্র হয় এবং বিবাহ সময়ে বরকর্ত্তা প্রকারান্তরে কন্যাকর্ত্তার সময়ে ব্যবস্থা করিলে, আপনারই কুলগৌরব কমিয়া যায়। পণ্যপ্রার্থী বরকর্ত্তারা এই সকল কথা স্মরণে রাখিবেন—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

আমাদের ছাত্র-জীবনে এবং তার পরেও নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধের কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন! প্রসিদ্ধ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়ীতে যখন তাঁহাকে দেখি, তখন তিনি ছিলেন যশের তুঙ্গমণিমন্দিরে, আর আমরা সেই মন্দির দুয়ারে দর্শনলোলুপ যাত্রীর দল। পলাশীর যুদ্ধ বোধ হয় আধুনিক ধরণে লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য। 'মেঘনাদবধের' পরে এই ঐতিহাসিক কাব্য বাংলাসাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। একটি কারণে বাঙালীর মন অভাবনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেছে স্বদেশ প্রেমের আহ্বান। এই সময়ে বাঙালীর অবসন্ন মনে যে আত্মপ্রতীতি ধীরে ধীরে জন্মিতেছিল, তাহারই প্রতিচ্ছবি সে দেখিতে পাইল—পলাশীর যুদ্ধে। পলাশীর যুদ্ধের কবি যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনার সূত্রে গাঁথিয়া কাব্যমালিকা গ্রথিত করিলেন, তাহা কাব্যহিসাবেও যেমন বিস্ময়কর হইল, তেমনি বিস্ময়কর হইল ইহার কঠোর সত্যপূর্ণ আবেদন। স্বাধীনতা-লোপের যে মর্মভেদী আর্তনাদ মোহনলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, তাহারই তরঙ্গ শুধু বঙ্গদেশ নয় সারা ভারত তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমার মনে হয় এই হিসাবে 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলাসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি বলিয়া চিরদিন আদৃত হইবার যোগ্য। সেকালেও ইহার বিদ্রোহী সুর কাহারও কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' যখন পাঠ্যপুস্তক করিবার চেষ্টা হয়, তখন টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটির সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ মনোবৃত্তির আবির্ভাব হইলে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থির রাখা কঠিন হইবে! আমার মনে হয় বাঙালীর অবচেতনায় এই মনোভাবের অঙ্কুর সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত হইয়া সমালোচকের আশঙ্কা সার্থক করিয়াছে।

রাজকার্যের অবসরে নবীনচন্দ্র যে অক্লান্তভাবে ভগবতী বীণাপাণির সেবা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রের সাধনাও যে জয়যুক্ত হইয়াছিল, ইহাই বাঙালীর পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা আমাদের মনে পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে যে ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছিল, 'আমার জীবন' হইতে তাহার উপভোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ইঁহারা উভয়ে ইঁহাদের চিত্রফলকে উজ্জ্বলতম রূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরাধীনতা সকলপ্রকারেই গুণরাশিনাশী। আমরা যে হেয়, আমাদের আচার ব্যবহার অশ্রদ্ধেয়, আমাদের সাহিত্যদর্শন যে অপাংক্তেয়, ইহাই ছিল বিজেতাদের ঘোষণা, এবং বাঙালীও ভাবিতে শিখিতেছিল যে, 'সত্যই বা হবে'! যে যুগে আমরা পোষাক পরিচ্ছদ, আহারবিহার এমন কি মাতৃভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই, যে যুগে বাঙালী বিদেশী সাজিতে, বিদেশী ভজিতে শ্লাঘা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই যুগে ভাগবদ্‌গীতার অমোঘ বাণী এই জাড্যপ্রাপ্ত জাতির কর্ণে ধ্বনিত হইল: ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ। ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, অলস, অসাড় হইও না। তোমাদের দুঃখ কি? একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখ, তোমাদের যাহা আছে, সে ঐশ্বর্য সে সম্পদ্ বিশ্বে কোন জাতির নাই। এই বাণী যাঁহাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিম নবীনের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। এই যুগকে বিশেষভাবে ভগবদ্‌গীতার যুগ বলিলে অন্যায় হয় না। যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছিল, বিদেশী সভ্যতার চাকচিক্যে যাহাদের চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া যায় নাই, তাহারা গীতার উপদেশ উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্ত হইল। এখানে

বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভগবদ্‌গীতার আদর্শ আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ, কর্মযোগের আদর্শ এবং সেই সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমেরও আদর্শ। সেই যে আমরা শুনিয়াছিলাম যে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ,—সে কথা আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বোমার উপাদানের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতাও অপরাধের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইত।

এই গীতার দীক্ষায় যেমন এই দুই উদগ্রপ্রতিভাশালী কবিমানবকে দীক্ষিত করিয়াছিল, সেইরূপ অগস্ত কোমতের মতও অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছিল। কোম্‌ৎ প্রচার করিলেন মনুষ্যত্বের পূজা—মানুষ সমষ্টি হিসাবে বিরাট্‌, মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠধর্ম। এই বিরাটের পরিকল্পনা গীতার বিশ্বরূপের সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মানুষ কোথায়? এ যে বিশ্বরূপে ভগবান্‌। ধর্ম কি? মানুষের সেবা। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—এই কবিবাক্য সার্থক হইল আদর্শ-রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বাধীনভাবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র হইতে নবীনচন্দ্রের আদর্শ আসিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ যে চিন্তাপ্রণালী লইয়া উভয়ে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, উভয়ে যেরূপ আদর্শের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে উভয়ক্ষেত্রে যে একই পরিণতি হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে আমরা যে আদর্শের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, তাহা বর্ত্তমান যুগোপযোগী এক মহিমময় আদর্শ। সে আদর্শে মানব সৃষ্টির শীর্ষবিন্দুতে স্থান লাভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্র কুরুক্ষেত্রে বলিয়াছেন :

এই মনুষ্যত্ব-গতি কি অনন্ত সিন্ধুমুখে !
সিন্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ !
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানব-সুখ,
মোক্ষ সেই সাগর সঙ্গম।—　　　　কুরুক্ষেত্র

এই মনুষ্যত্বই মানুষের চিরন্তন ধর্ম, ইহার উপর আর ধর্ম নাই।

যে অনন্ত নীতি-চক্র মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ বর্দ্ধন
তাহাই মানব ধর্ম ;—　　　　কুরুক্ষেত্র

আমরা জাতি হিসাবে যখন এই মনুষ্যত্বের মর্যাদা ভুলিতে বসিয়াছিলাম তখন বঙ্কিম ও নবীনচন্দ্র আমাদের মনে আনিলেন সাহস, বাহুতে দিলেন শক্তি এবং হৃদয়ে দিলেন আশা। আজ সেই আশাহত যুগের কথা স্মরণ করিয়া বলি, কবি তোমার শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই। বাঙালীর জাতীয়তা-গঠনকারী মনীষীদের মধ্যে তোমার স্থান বহু উচ্চে। একথা আজ তোমার জন্মশতবার্ষিক উৎসবে কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী স্মরণ করিবে।

মহাভারতের নবদ্বৈপায়ন রূপে নবীনচন্দ্র কল্পনার সুবর্ণদ্বীপের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রামায়ণকে রূপান্তরিত করিয়া মধুসূদন পূর্বেই পুরাণের নবকলেবর দানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত কবিদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কাজেই নবীনচন্দ্রের পক্ষে মহাভারতকে নবরসায়নের দ্বারা রূপায়িত করিবার চেষ্টা সমর্থনের অযোগ্য হইতে পারে না। 'মহাভারত'-নামই তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ঋষি এই অপূর্ব নামটি কিরূপে আবিষ্কার করিলেন তাহা ভাবিলে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। এখনকার মত সে সময়ে দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইবার ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়, তথাপি তিনি গান্ধার হইতে সিংহল, শ্বেতদ্বীপ হইতে কাম্বোজ পর্যন্ত কষি টানিয়া এক বিরাট মানচিত্র কি করিয়া নির্মাণ করিলেন, তাহা সত্যই আমাদের বুদ্ধির অগোচর। এই ভূভারতের নাম দিলেন ঋষি 'মহাভারত'। বর্ত্তমান যুগের মহাভারতকার যে চিত্র আঁকিলেন, তাহাও আধুনিক জগতে কম বিস্ময়ের বস্তু নহে। মহাভারত হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ; পুরাণ পাঠ ও ধর্ম-ব্যাখ্যা বা কথকতার পূর্বে মহাভারতকে সংক্ষেপে 'জয়' এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এখানে জয় অর্থে মহাভারত (এবং ধর্মশাস্ত্র)। এই মহাভারত হইবে এক বিরাট্‌ ধর্মক্ষেত্র—যেখানে আর্য্য অনার্য সকলে মিলিয়া সখ্যপ্রীতির সঙ্গে মনুষ্যত্বের পবিত্র মন্দির গঠন করিবে। এই বিশ্ব-প্রেমের মহিমা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশাল পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মাহাত্ম্যে অতুলনীয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবীনচন্দ্র তাঁহার কবি-মনের ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মহালক্ষ্মী প্রতিমা উদ্ধার করিয়াছিলেন :

মহাভারতের মূর্ত্তি,—
ত্রিভুবন আলো করি
মাতা রাজ রাজেশ্বরী।
নব ধর্ম বেদীমূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য অনার্যের ধ্যানে, বেদীবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি—তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।

এই নবীনচন্দ্রের নব মহাভারত। পুরাতনের সঙ্গে ইহার বিরোধ নাই। ইহার মধ্যে যে নূতনত্ব আছে, তাহা ঋষির পরিকল্পিত মহাভারতেরই ভাষ্য। বাঙালী কবির এই কল্পনা কোনও দিন সার্থক হইবে কি না জানি না। তবে মাঝে মাঝে এই দুর্ভিক্ষ-দগ্ধ, হিংসা-বিষাক্ত যুগে মনে হয় যে, যদি কোনও দিন কেহ বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য কামনা করে, তবে এই মহাভারতই হইবে তাহার শিক্ষক, শাস্তা ও শান্তি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নারী-সঙ্ঘ

পঞ্চনদীর সংযোগ-স্থল পাঞ্জাবকে যোদ্ধার দেশ ও 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' যে মানুষ বসতি করে তাহাকে যোদ্ধার জাতি বলা হয়। এই আখ্যা আদৌ অসঙ্গত নহে; বরং বর্ণে বর্ণে ও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষের শরীর ও শরীরের গঠন, দীর্ঘোন্নত দেহ, সুপুষ্ট ও সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাহস, শৌর্য্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা সমস্তই তাহার আখ্যার অনুকূল। শুধু পুরুষেরই নহে, পঞ্চনদের তীরবাসিনী প্রকৃতি সুন্দরী তাঁহার দুহিতৃগণকেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সাহসে কিম্বা রসিক ব্যক্তি নারীর বিশেষ্য-বিশেষণে কোমলাঙ্গী শব্দটির বিধান দিয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি পঞ্চনদের তটভূমি দর্শন করেন নাই। কোমলাঙ্গীর ছড়াছড়ি, হুড়াহুড়ি, হুলাহুলি আমাদের বঙ্গদেশে।

"কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলে
দল্‌তে হয় রে দুর্ব্বা কোমল ?"

—উত্তর, বঙ্গদেশ। তেমনই যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কোন দেশের কোমল শব্দের অর্থ, ভঙ্গুর, 'বোধ করি' উত্তরে বঙ্গদেশের নামই শুনিতে হইবে। 'বোধ করি' কথাটা বিনয়বশতঃ ব্যবহার করিলাম। বিনয়

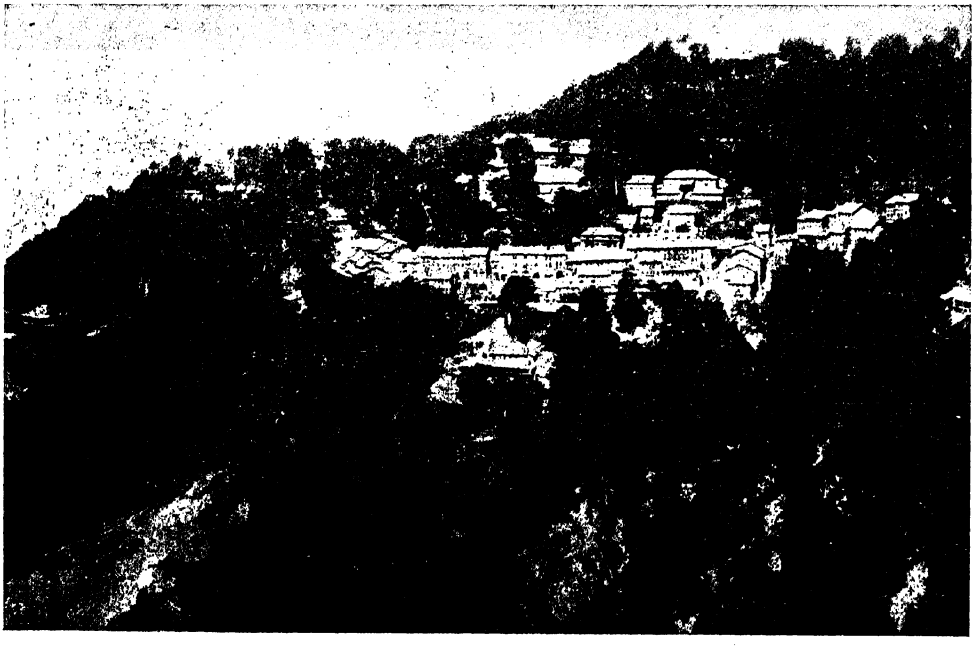

স্মরণীয় ডালহাউসী পাহাড়

ও সুগঠিত দেহে সুসমৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেও সিংহের যোগ্য সিংহিনী করিয়াছেন। সেদিন সকালে, আমরা যখন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, এক দল পাঞ্জাবী কোমলাঙ্গীর একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমরা পথের ধারে দাঁড়াইয়া, পথ ছাড়িয়া দিলাম। শোভাযাত্রা বাজারের দিকে গেল, সুভাষচন্দ্র ও আমি বাসার দিকে ফিরিলাম। মনে হইল, পাঞ্জাবী তরুণীরা গার্ল-গাইড অথবা ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল মহাজন, কবি বড় সদগুণ; একটু বিনয় থাকা ভাল। আশা করি পাঠিকা-সমাজ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমি শুদ্ধমাত্র দর্পণ ধারণ করিয়াছি। পাঞ্জাবের কোমলাঙ্গী-শোভাযাত্রা যখন চলিয়া গেল, মনে হইল (অন্ততঃ আমার মনে হইল), এক দল 'ম্যানোয়ারি' গোরা বিপক্ষের কেল্লা অভিযানে গেল।

সুভাষচন্দ্র প্রসন্ন নয়নে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকারা তৈরী হয়েছে বটে, কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ

(free) ও সাবলীল এখনও হতে পারে নি। আমার কংগ্রেস হাউসের নারী-বাহিনীকে আমি চেষ্টা করবো ঠিক এই রকম ক'রে গড়তে! এক মুহূর্ত্ত থামিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আবার বলিলেন, বছর পাঁচেক আগেও দেখা যেতো, মেয়েরা যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়তো; বেশ মাথা উঁচু সোজা চোখ ক'রে চল্‌ছে, হঠাৎ একজনের মনে একটু লজ্জা এসে পড়লো, হয়ত কোনও চেনা লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে কিম্বা ঐ ধরণের একটা কিছু হলো,অমনি সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিরভূষণ লজ্জা এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তাল ভাঙ্গলো, বেখাপ্পা পা পড়ে গেলো, আর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেলো, সামঞ্জস্য (harmony) নষ্ট। এখন এতখানি খারাপ যদিও হয় না, তবু, মনে হয় নিখুঁত হতে আরও কিছু সময় লাগবে। ক্ষিতীশ চাটুয্যেকে বলেছি, কর্পোরেশনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে (Rally) ছাত্রীদের দিকে যেন বেশী মনোযোগ দেয়। জানেন দাদা, আমাকে সবাই নারীদের দিকে বেশী পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী করে?

আমি হাসিলাম: এ কথার উত্তর অন্য সময়ে দিতে হইয়াছে; সে কথা সেই সময়ে বলিব।

এখন কথা বলিয়া তাঁহার পরিকল্পনার প্রকাশের গতি ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আমার হইল না; নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম। সুভাষ কহিতে লাগিলেন, আমার কংগ্রেস হাউসের এক লক্ষ জাতীয় সৈন্যের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার নারী সৈন্য করতে হবে। অবশ্য মুস্কিলও আছে। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা অত্যন্ত রক্ষণশীল (conservative), বিষম গোঁড়া; ভারি ভয়—মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে; বয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমশঃ, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্ তাঁদের হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, ফল ভাল না হয়ে খারাপ হয়। তাঁরা জোর করতে গেলে এরা বেশী অবাধ্য হয়ে ওঠে। কলকাতা কংগ্রেস একজিবিসনে দেখেছিলেন ত, ঢের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছিল; সে প্রায় দশ বছর আগের কথা; এখন সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দিক থেকে (from our point of view) অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, দশ হাজার নারী সৈন্য অনায়াসেই পেয়ে যাবো।

রঙ্গ ভরেই কহিলাম, মোটে দশ হাজার?

সুভাষ কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, রহস্য হচ্ছে বুঝি?

রহস্য ব'লে মনে হবার কি কারণ ঘটলো বলুন তো।

ভুলবেন না দাদা, সেটা বাঙ্গলা দেশ। কোন্ বাপ-মা না তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইবেন? আপনি পারবেন—আপনার মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে—ওহ্,- আপনার ত ও পাটই নেই—দায় নেই (no liability) আপনার সমস্তই লাভ (all assets) তিনটিই ছেলে—ভাগ্যবান লোক।

আমি কহিলাম—সন্ন্যাসী উদাসী লোক, সংসারীর ভাগ্য অভাগ্য বিচার করতে পারে কি?

সুভাষ ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে কহিলেন, পারে বৈ কি! সে যাক্, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নারী শাখা ভাল ভাবেই গড়বো এতে সন্দেহমাত্র নেই।

সে সন্দেহ আমারও ছিল না। কলিকাতা সহরে, পরিকল্পিত কংগ্রেস-ভবনটি গঠিত হইবার সুযোগ হয় নাই; নানা বিপাকে ও দুর্ব্বিপাকে অস্থিপঞ্জরের উপরে মেদ ও মাংসের সঞ্চার আজও হইল না সত্য; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁহার কল্পনার চিত্রখানিতে, মানসের প্রতিমাখানিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের কাহিনী আজ কাহার অজ্ঞাত আছে? কে না জানে, কে না শুনিয়াছে যে সুদূর বিস্তৃত দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে বহুধা-বিক্ষিপ্ত শতধা-বিচ্ছিন্ন ভারতীয় নারী অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত চর্ম্মে বর্ম্মে অলঙ্কৃত শৌর্য্যে বীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া পুরুষের সঙ্গে, পৌরুষ সহকারে দুর্ম্মদ দুরন্ত রণরঙ্গে মাতিয়াছিল? পুরুষের সহিত সমান দুঃখ, সমান কাঠিন্য, সমান ক্লেশ, সমান কৃচ্ছ্র-কঠোরতা, সমান লাঞ্ছনা—সমান হাসিমুখে বরণ করিয়া ভারত-নারী সম্পর্কে

পার্ব্বত্যপথ—ডালহাউসী

সদাপ্রযোজ্য 'আহা অবলা' অভিধানের বিলোপ সাধন করিয়াছিল, এ কথা আজ কি কাহারও অবিদিত আছে? এ দেশের নারী 'দশ হাত (হ্যাঁগা, বারো হাত বলিব কি?) কাপড়ে উলঙ্গ', 'এ দেশের রমণী ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যাইতে অভ্যস্ত', 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা', 'এ দেশের মেয়ে সজীব পুলিন্দা' (লিভিং লগেজ)—কত কথাই ত কত কাল ধরিয়া শুনা গিয়াছে। কিন্তু সুভাষ যখন পরাধীন ভারতের পরাধীনতার পাশ বিমোচনজন্য এসিয়া খণ্ডের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নবীন গীতা রচনায় উদ্যোগী হইলেন, তখন ভারতের এই যুগ-যুগনিন্দিত নারী স্ফীত উন্নত বক্ষে, সাহসপ্রোজ্জ্বল নয়নে নেতাজী-সকাশে উপনীত হইয়া তির্য্যক কণ্ঠে কহিল, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি? ভারতবর্ষ কি আমাদের মাতৃভূমি নহে? আমরা কি দুঃখিনী জননীর কন্যা নহি? হে বিপ্লবী, হে বীর, আমাদের হাতে অস্ত্র দিন, আমাদের উপরে কার্য্যের ভার দিন; বিপ্লব সুসম্পূর্ণ করুন।

বীর বীরের মর্য্যাদা বুঝে। বীরহৃদয় সুভাষচন্দ্র বীরাঙ্গনা-হৃদয়

নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন। তদ্দণ্ডে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ঝান্সীর রাণী বাহিনী গঠিত হইতে বিলম্ব হইল না। সারা জীবন, সুভাষচন্দ্র বিপ্লব সাধনা করিয়াছেন। মাত্র রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয়াই তুষ্ট থাকিবার লোক তিনি নহেন; সামাজিক বিপ্লব না আনিতে পারিলে, স্বাধীনতাও পঙ্ক ভিত্তির উপরে গঠিত প্রাসাদের মত ভঙ্গুর হইতে বাধ্য। এই সত্য সুভাষচন্দ্র না জানিবেন ত কে জানিবে? সারাজীবন সাধনা করিয়া যিনি বিপ্লবসিদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, এই শাশ্বত সত্য অস্বীকার তিনি কেমন করিয়া করিবেন? সংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে, সনাতনী নীতির বিরুদ্ধে, লোকাচারের বিরুদ্ধে প্রতি পদবিক্ষেপে বিদ্রোহ করিয়া যিনি বিপ্লবের সেরা বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যত, তিনি জনসমাজের অর্দ্ধাংশকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা করিলে,

হাটবাজার—ডালহাউসী

তাঁহার বিপ্লব-দর্শনই ভুয়া হইয়া যাইত! সুভাষ কখনই সে ভুল করিতে পারেন না।

ডালহাউসী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে করি না। আমার স্নেহশালিনী পাঠিকাকে আরও দূরে লইয়া যাইতে আমার অভিলাষ। পাঠক তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইবে; স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আমি জানি, পাঠককেও অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্কানুসারী। বঙ্কিমপদ্ধতিতে লেখক দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য স্থানেও গমনক্ষম। তাই আমি এক্ষণে ভারতবর্ষের বাহিরে, দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় যাত্রা করিতেছি। বৃটিশ—যে বৃটিশ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, যাহার সাম্রাজ্য মধ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উপরেও যে ব্রিটানিয়ার শাসন অপ্রতিহত ও অব্যাহত, সেই বৃটিশ লজ্জা ঘৃণার মাথা খাইয়া, নবারুণরাগরঞ্জিত জাপানের ভয়ে ত্যক্ত পেণ্টুলুনে, শ্বেতপ্রাণগুলিকে করতলপুটে আবদ্ধ করিয়া কোথায়, কোন্ চুলায় পলায়ন করিয়াছে—কোথায় রাজ্য, কোথায় সাম্রাজ্য, কোথায় দম্ভ, কোথায় দর্প, শার্দ্দূলাশঙ্কায় শৃগালের মত পশ্চাদপদদ্বয়ে নিবদ্ধলাঙ্গুল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বর্ব্বর জাপান লালসাসম্প্রসারিত করে বৃটিশ পরিত্যক্ত রাজ্য, ধন, সম্পৎ, প্রাণ লুণ্ঠনোদ্যত, যখন এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে শাসনের চেয়ে অশাসনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব নর্ত্তন, জীবনের আশা সন্ধ্যারবির মত দিগন্তরালে অস্তমিত, আতঙ্কে, আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায় বেতসপত্রের মত কম্পান্বিত, যখন সর্ব্বস্বের বিনিময়েও প্রাণটুকু রক্ষা পাইলে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেই সময়ে সেই ভূখণ্ডের নারী নেতাজীর নিকট নিবেদন করিতেছে, তীর্থযাত্রায় আমাদের সহযাত্রী করো! যিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি মেয়েদেরও অবহেলা করেন নাই, তিনি—সেই বীর সাধক বীর নারীর আকুল আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। সে ধাতুতে তাঁহার গঠন হয় নাই।

তীর্থযাত্রা? তাই বটে! তীর্থযাত্রাই বটে। মৃত্যুর চেয়ে বড় তীর্থ, পবিত্র তীর্থ আর আছে না কি? বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ঢুকিলে ক্ষণেকের তরে জ্বালার উপশম, অশান্তির শান্তি হয়, জানি; পুরুষোত্তমের সম্মুখে দাঁড়াইলে শোক তাপ দুঃখ গ্লানি তখনকার মত নিবারিত হয়, তাহাও মানি; প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় জুড়ায়, তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু কয় দণ্ড? কয় মুহূর্ত্ত? সংসার, রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব, দৈন্য, হিংসাদ্বেষ, কলহবিবাদ মন্দির পথের ভিখারীর মত, রাজপথে পুলিশ প্রহরীর মত, কারাগারের শান্ত্রীর মত সারি দিয়া, কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? ছার সংসারী মানবের কি সাধ্য যে অতিক্রম করিয়া যায়? আর মৃত্যু? জ্বালার চির অবসান; সন্তাপের চির বিলোপ; অশান্তির নিঃশেষ শেষ! 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যামের সমান।' আর সেই মৃত্যু যদি দেশের দশ্য, জন্মভূমির জন্য, মাতৃভূমির জন্য, দেশের আহ্বানে, জন্মভূমির আমন্ত্রণে, মাতৃভূমির আহ্বানে যায়, সে কি মহাতীর্থযাত্রা নহে? সেই মহাতীর্থযাত্রায় পুরুষ চলিয়াছে, নারীর সে মহাতীর্থযাত্রায় অধিকার নাই? স্বতঃ অভিমানিনী নারী এই অনাদর—এই হতাদর সহ্য করিবে? তীর্থযাত্রায় নারী সকলের আগে পুঁটলী বাঁধে! চিরদিন বাঁধিয়াছে, আজও বাঁধিবে! কাহার সাধ্য বাধা দেয়?

সুভাষচন্দ্র অকৃতদার। আকুমার ব্রহ্মচারী বলিয়া একটা সাধু ভাষা চলিত আছে। সুভাষচন্দ্র সেই আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারেন কি না তাহা লইয়া শিরোবেদনা ঘটাইবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে একটি ক্ষুদ্র

আবেষ্টনীর মধ্যে, দারাসুত লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার উপকরণের নিদারুণ অভাবই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ কামনার বস্তু সন্দেহ নাই জানি, আমি আপনারা তাহার প্রশান্ত, সুশান্ত বসন্ত লইয়া আমরণ সুখবিব্রত থাকিতেই চাই তাহাও ঠিক, কিন্তু যে উদ্দাম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজনীন প্রবৃত্তির সহিত সত্তা সংস্থাপিত করিতে জন্ম লভিয়াছে, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র গণ্ডীর কল্পনাও সহনাতীত। দুই যুগাধিক কালপূর্ব্বে, পূর্ণ থিয়েটারে "বঙ্গবালা" চিত্র-উদ্বোধনে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, যে কথা শুনিয়াছিলাম (ভারতবর্ষ, পৌষ) নারী-জাতির প্রতি যে মমত্ব, দৃপ্ত মর্য্যাদাবোধের পরিচয় প্রদীপ্ত হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়াখণ্ডে ভারতীয় অবলার কোমল করকমলে খর্পর প্রদান তাহারই পূর্ণাহুতি !

সুভাষচন্দ্র যে অক্ষম করে তরবারি অর্পণ করেন নাই এবং যে দানবদলনী বীর নারীর নামে তাঁহার প্রমীলা সৈন্যবাহিনীর নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই নারীরা সেই মহিয়সী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভারতীয় নারীর গৌরব বৃদ্ধি করতঃ ইতিহাসের পৃষ্ঠা সুবর্ণপ্রভায় প্রভাসিত করিয়াছেন, বহুদূর সুদূরে থাকিয়াও আমরা তাহা জানিতে পারিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সদ্যঃমুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বাহিনীর সৈনিকপ্রদত্ত বিবরণ বারান্তরে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। সুভাষ-গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে ধর্ম্মবর্ণসম্প্রদায়গত বিভেদবিমুক্ত ও পঙ্কিলতাবর্জ্জিত করিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র যে অশ্রুতপূর্ব্ব অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, যে কীর্ত্তিস্তম্ভের পানে বিস্ময় বিমোহিত ভারতবাসী স্তব্ধহৃদয়ে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে ইহাও যেমন প্রত্যক্ষীভূত সত্য, অবলা ভারতবালাকে বীরনারীর ভূষণে বিভূষিত করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদার মহোচ্চশিরে যশোমুকুটবিশোভিত করিয়া যে অপরিসীম দুঃসাহসিকতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বীরহৃদয়ের পরিপূর্ণ আলেখ্যতলে তলে নারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য যুগযুগান্ত-কাল পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইতে থাকিবে, ইহাও তেমনই অবিসম্বাদিত সত্য ! আমার এই উক্তি সমস্ত নারীর অন্তরেই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিবে, ইহাই আমার অন্তরের অনুভূতি।

আমার উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি, ২৩এ জানুয়ারী ১৯৪৬, সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসবে। বৃটিশের মহাসাম্রাজ্যের মধ্যমণি কলিকাতা মহানগরীতে বৃটিশের লাট, বৃটিশের কেল্লা, বৃটিশের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি বারুদ, বৃটিশের ট্যাঙ্ক, বোমারু, বম্বার, বিমান, লাল কাল শ্বেত নীল সৈন্যসামন্ত অপ্রতিহতপ্রতাপ পুলিশ সুরক্ষিত কলিকাতায় এমন একখানি গৃহ ছিল না, যে গৃহশিরে না ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ! এমন গৃহ ছিল না সন্ধ্যায় যাহার অলিন্দ আলোকমালায় বিভূষিত না হইয়াছে ! ভূমিকম্পে পৃথিবী ধ্বংসকবলিত হইতে চাহিলেও এত শঙ্খনিনাদ হয় কি না বলা কঠিন, যত শঙ্খ সেইদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে নারীর মুখে মুখে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। পুরুষ তখন কোথায় ?—অফিসে গিয়াছে, আদালতে গিয়াছে, খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছে। পুরনারী—পুরবালা পতাকা উড্ডীন করিয়াছে ; শঙ্খধ্বনি করিয়া পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বেকার একটি শুভক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছে ; মঙ্গলকরে প্রদীপ সজ্জিত করিয়াছে। বাল্যকালে, জন্মাষ্টমী নিশীথে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'জন্মাষ্টমী' নাটকাভিনয় দেখিয়া যে পুলকপ্রবাহে স্নান করিতাম, আজ এ জীবন অপরাহ্নে, ২৩এ জানুয়ারী সুভাষ-ষষ্ঠিতে সেই পুলকের প্লাবনপ্রবাহিত হইতে দেখিলাম। মনে হইল—আহা ! কি দেখিলাম ! আর কি এমন দেখিব !

বিলাসে ব্যসনে, বিদেশীর অনুকরণে, বিজাতির আচরণের প্রভাবে ভারতীয় নারী যেন আপনার সত্তা, আপনার মর্য্যাদা, আপন অধিকার ভুলিতে বসিয়াছিলেন, আজ অনেককাল পরে, মহাভাগ্যবান মহামানবের জন্মলগনে বিস্মৃতির অতল তল হইতে লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়াছে। নারী আপনার হাতে পূজার ডালা সাজাইয়াছে, চন্দনপিঁড়িতে চন্দন ঘসিয়াছে,

পসারিণী—ডালহাউসী

তুলসীমূলে প্রদীপের মালা গাঁথিয়াছে। মাঘের এই বিগতশীত মলিনধূসর অলস শান্ত দিবস ও সন্ধ্যা সুভাষের আজাদ হিন্দের সুরভিতবসন্তমলয়া-নিলান্দোলনে নিখিল ভারতবর্ষের অঙ্গে যে শিহরণ, ভাষার নিক্তিতে তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র।

২৩এ জানুয়ারীর এই অভিনব দৃশ্য বৃটিশ দেখিয়াছে, পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যবৃন্দও দেখিয়াছে, আমেরিকাও চাক্ষুষ করিয়াছে, হয় ত বা বিজয়ী মিত্রপক্ষীয় অন্য দেশের লোকও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভারতের তমসাচ্ছন্ন আকাশের পূর্ব্বদিকচক্রবালে ঊষার আলোকচ্ছটায় যে জ্যোতিরুৎসবের

সূচনা করিতেছে, তাহাকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিবার মত উদারতা কি তাহাদের আছে? অস্ত্র নাই—নিরস্ত্র, হিংসাদ্বেষঅসূয়াবিবর্জ্জিত আনন্দ-পরিপ্লুত জয় হিন্দ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কি সাম্রাজ্যবাদীর কর্ণে কামানের গর্জ্জন বলিয়া অনুভূত হইতেছে না? জানি না, জানিতে চাহি না। আমার সাড়ে তিন বৎসর বয়সের নাতনী রত্না মজুমদার অলিন্দে অলিন্দে প্রদীপের পলিতা উস্কাইয়া দিতেছে, আর আপনার মনে আপনি বলিতেছে, জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! একটি প্রদীপও সে নিবিতে দিবে না; নির্ব্বাণ-প্রায় দীপে স্বহস্তে তৈল দান করিতেছে; আর বলিতেছে, জয় হিন্দ!

সুভাষ জন্মতিথি পালন করিয়া জাতি ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বড় আশা ছিল, ঐ পুণ্য দিবসে সুভাষ-পরিকল্পিত মহাজাতি-সদনের অসম্পূর্ণতা বিলোপের সঙ্কল্পও গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষে—কলিকাতায় সুভাষের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় তাঁহার শেষ আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, যে দেশে সুভাষচন্দ্রের জন্ম, যে জাতির মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয়, আমরা সেই দেশের সেই জাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। আইনের বাধা থাকে, থাক্; অর্থাভাব থাকে, থাক্! যে দেশের, যে জাতির অন্তরের অন্তরে সুভাষচন্দ্র দাবাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির সম্মিলিত বাসনার বাষ্পমাত্রেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঝ্যাত্যা বিতাড়িত তৃণ খণ্ডের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অর্থাভাব? পথিক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরিয়া পথ চলিবার সময় মহাজাতি সদনের কঙ্কাল দেখিয়া কি তোমার মনে লজ্জার উদয় হয় না? চল্লিশ লক্ষ নর নারীর কলিকাতা মহাজাতি সদন-দ্বারে একটি বার, একটি করিয়া টাকা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যাইতে সত্যই ক্লেশ বোধ করিবে? সুভাষচন্দ্রের শেষ-শবদানের মর্য্যাদার প্রতি আমাদের মমত্ব কি এতই অসার, এতই ভঙ্গুর? ইচ্ছা করে অন্তরের সমস্ত আকুলতা, হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ-প্রেম আমার এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কণ্ঠ-নিম্নে একত্রিত করিয়া বলি—

দাঁড়াও পথিকবর
জন্ম যদি তব বঙ্গে

মহাজাতি সদনের সম্মুখে মুহূর্ত্তের তরে দাঁড়াও; পলকের জন্য চিন্তা করো, স্বদেশে, সুভাষচন্দ্রের এই ছিল শেষ বাসনা! শেষ অভিলাষ।

বন্দেমাতরম্
জয় হিন্দ

অসীমের তৃষ্ণা

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

গোধূলির স্বর্ণ রেণু বিলাইয়া শ্যাম শষ্প শিরে
ধীরে, অতি ধীরে,
দিনান্তের ক্লান্ত রবি বাজাইয়া বিদায় বিষাণ
দিগন্তে মিলায়ে যায়—দিবসের হ'ল অবসান।
মৌন মূক স্তব্ধতায় পরিপ্লুত বনানী-বীথিকা
নীলিমা নভের বুকে আঁকে যেন কিসের লিপিকা!—
তরু শ্রেণী দোলাইয়া বেণী
আঁখির পল্লবে মাখি বিস্ময়ের রেখা,
বাসর শয়ানে জাগে একা।
ধ্যানমগ্ন মহোর্ম্মির টুটিল স্বপন;
গাহে অনুক্ষণ,
ফেনিল কিরীটি পরি' জলোচ্ছ্বাস মরণের গান।
সৃষ্টির জড়িমা নাশি' প্রতিধ্বনি বাজে অফুরাণ।
ওগো ভয়ঙ্কর!
মুরতি তোমার? সে যে, ভয়াল সুন্দর!
মনের অঙ্গনে মোর আঁকিয়াছে মধু আলিপনা
তাই ত উন্মনা!
তাই ত বসিয়া তব বাত্যাক্ষুব্ধ বালুকা-বেলায়
নিজেরে হারায়ে ফেলি,—অন্তহীন তোমার খেলায়।
সহসা চমক ভাঙ্গে চিত্ত মোর হয় সুচঞ্চল
ব্যাকুল ব্যথার ভারে অবিরাম বহে অশ্রুজল।
অবজ্ঞায় ব্যর্থতায় দিবা বিভাবরী
কণ্ঠে দোলায়েছে মোর কণ্টকের শত সাতনরী।
তোমার চাঞ্চল্য মাঝে আছে তৃপ্তি, শান্তি ম্লানহীন,
অহর্নিশ বাজে যেন পরিপূর্ণ আনন্দের বীণ
সৃষ্টিরে সরস করি যুগ যুগ ধরি'।
আমারে কে দিবে সমাধান?
বিশ্বের কর্ম্মের স্রোতে মোর শেষ গান
ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিয়া পলে অনুপলে
সমাপ্ত করিব শুধু। হৃদয়ের রক্ত শতদলে
দু'হাতে অঞ্জলি দিয়া বিশ্ব দেবতায়
চলি যাব অসীম যাত্রায়।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

ডাক্তার। মায়ের কৃপায় সব মধুরেণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে মাণিক। আমাকে পেয়ে সাহেবের Thanks আর থামে না। যেন কি দয়াই করতে গিয়েছি, আমার প্রাণ কিন্তু তখন ষ্টেথিস্কোপের ফোঁকরে পড়ে আছে! বললুম—"আগে আপনার বুকটা দেখব সার।"

শুনে ভারী খুশি। আবার সেই 'সাইড্রুম্' আর একজামিনের ধুম! ষ্টেথিসকোপটাও যেন মুকিয়ে ছিল। যেখানে ঠ্যাকাই, হাতুড়ির আওয়াজ! তখন আর আমাকে পায় কে! বলে' ফেললুম—Pardon me sir, yours is a Torpedo-Proof chest কোনো রোগই ওখানে প্রবেশ পথ পেতে পারে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। 'সেরিডন' আনিয়েছেন দেখছি—ফেলে দিন। ও সব ইণ্ডিয়ানদের জন্যে। আপনার কেনো যে ও সন্দেহ হয়েছিল বুঝতে পারি না।

সাহেব। ইণ্ডিয়ায় এসেছি কিনা, তাই সাবধান হতে হয় ডাক্তার।

বললুম—সেটা খুব ভালো কথা।

সাহেব। কেনো বল দেখি এখানে এই রোগ?

বললুম—সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। যারা দু'বেলা খেতে পরতে পায়, তাদের রোগ থাকবে কেনো? আপনাদের সে দুর্ভাবনা নেই। থাক সার্।

কি বুঝলেন জানি না। একটু নীরব থেকে বললেন—চলো অনেক কথা আছে।

ঘর বদলে বসা গেল। ওঁদের ঘেঁষে বেশীক্ষণ থাকা অস্বস্তিকর। আবার অনেক কথা কি রে বাবা!

"Infected area (ছোঁয়াচে-পল্লীর) খবর কি?"

তাঁকে সব ঠিক কথাই বললুম—"রোগ কমে এসেছে। নূতন্ আক্রমণ আর দেখছি না। কয়েকটি পুরাতন রোগী—এক ডজন হবে—তারাও সেরে উঠছে। সব কয়টিই বাঁচবে বলে' আশা করি সার।"

বললেন—"Good news সুখবর। তাদের perfect recovery—সেরে ওঠা, দেখা চাই।"

"আমাকে অল্পদিনের জন্য—দু'মাসের কড়ারে, পাঠানো হয়েছে সার। সেটা শেষ হতে যে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি।"

Nonsense, it is question of life, not time—you can't go having your patients to dogs—এটা জীবন মরণের কথা—সময়ের কথা নয়। তাদের না সারিয়ে যেতে পার না।

"কিন্তু কর্ত্তারা যদি"—আমাকে আর এগুতে হল না, তাঁর মুখ চোখ লাল হতে দেখেই থেমেছিলুম।

কড়া কণ্ঠেই বললেন—"কর্ত্তাটা কে? Could they dare order, while I am here with my regiments?"

আমাদের চাকরির প্রাণ নাড়ী যে কতো পল্কা, সে কথা সাহেব তো জানেন না, স্বরাজের তাড়ায় একটু নাড়াতেই সে ছাড়া পায়! মা বাপ মলে, মুখ-অগ্নিটা রবিবারে করলেই কর্ত্তাদের ধর্ম্মসম্মত হয়। না মানলে চাকরির মুখ-অগ্নি হয়েও যেতে পারে!

তাঁর পরিবর্ত্তন দেখে ধীর হয়ে বললুম—"আপনার ইচ্ছা জানলেই তাঁরা দিন বাড়িয়ে দেবেন, তার ওপর তাঁরা কি আর কথা কইতে পারেন? আপনি এক লাইন লিখে দিলেই যথেষ্ট হবে সার্।"

শুনতে শুনতেই তাঁর সে লালিমাটা লোপ পেলে। "Oh! alright, ক'দিন লিখি বলো দিকি? আমার তো ইচ্ছা—যে কয়দিন আমি এখানে আছি"—বলে' হাসলেন, বললেন—"তুমি থাকলে আমি ভালো থাকি?"

"কথার মধ্যেই সব হে—rather তার accountএর মধ্যেই সব—গিরিশ ঘোষের সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়েও চির-সবুজ হয়ে রইল। মধু ও বিষ পাশাপাশি থাকে। কথাকে শক্তি দেয় তারাই। কর্ত্তাদের একটি ভাল কথা শুনলে দাসেরা দুনিয়া ভুলে যায়, তাও তাদের

ভাগ্যে জোটে না। কেবল—"হুকুম, চড়া কথা আর জল্‌দি!" মাথা, মন, প্রাণ ওই ঢাকের বাদ্দির কাছেই বাঁধা। সামান্য একটি 'কিন্তু' আরম্ভ না করতেই shut-up, do what I order—চুপ্, যা বলছি—কর' গে। শুনতে হয়। যাক্—

সাহেবের কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছিল। বললুম—"দাসের প্রতি আপনার অসীম দয়া। আপনার কাছে থেকে কাজ করবার ভাগ্য আমি আর কি করে পাব। আমাকে এই চাকরি করেই খেতে হবে হুজুর, আপাতক আপনি না হয় সপ্তাহ দুয়ের জন্যে লিখে দিন।"

তিনি বোধ করি আমার কণ্ঠস্বরে আর্দ্র হয়েছিলেন, বললেন—Cheer up Doctor, don't be afraid, I may remain in India for sometime—writing for 3 weeks—ভয় কি, আমি এখন কিছুদিন এই দেশেই থাকবো।—আমি তিন সপ্তাহ লিখছি।

কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, উচিতও হ'ত না। বললুম—"সেই ভালো সার, খুব ঠিক হয়েছে।"

তখন মন কিন্তু বলছে—"আপিস কর্ত্তারা ঠিক ভাববেন—আমিই সাহেবকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা মত লিখিয়েছি। উপায় কি, আমার কথা কে বিশ্বাস করবে।"

মাণিক। তবে ভাবছেন কেনো? ও তো আছেই।

ডাক্তার। ওটা চাকরদের আপনিই আসে—ভাবতে হয় না মাণিক। ওটা দাস-মনোবৃত্তি, সে অন্তরেই কাজ করে। যাক্—মা আছেন।—হ্যাঁ, বিনোদী সাহেবের কাছে গিয়েছিল। দেখে খুশি হয়েছেন। এক সপ্তাহ পরে কাজে join করতে বলেছেন।—তার কাছে নাকি শুনেছেন আমি নিজের পকেট থেকে রোগীদের পথ্যাদির জন্যে সাহায্য করি, তাতেই অনেকে বাঁচে।

বললুম—"আমার কতটুকু সামর্থ্য সার, আপনার টাকাতেই কাজ করেছি।"

"না, আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি—তুমিও সাহায্য করেছ। সে তো ভালই করেছ।"

"থাক্ Sir, I feel ashamed—তাদের ভাল হওয়ার সঙ্গে যে আমার স্বার্থ জড়ানো রয়েছে—তাতে আপিসে যদি একটু ভালো record থাকে—ভালো remark চাই"—

"ভেবনা, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

এই সময় একটি গোঁফ কামানো লম্বা—অফিসারই হবেন—এলেন। আমি ঝুঁকে উভয়কে সেলাম ঠুকে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। অন্যায় করেছি কি মাণিক?

মাণিক। আগন্তুক চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছেন কি?

ডাক্তার। হ্যাঁ, আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা করেছেন, সাহেবের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করেন নি।

মাণিক। তবে ঠিক হয়েছে।

ডাক্তার। ছাখো মাণিক, কর্ত্তাদের হুকুমের মধ্যে থাকাই ভালো। তাতে চাকরির বাঁধন বজায় থাকে। নরম গরমেই আমরা অভ্যস্ত, তাই একটুতেই ভয় হয়।—নাঃ চাকরি আর করতে পারব না, দেখছি—কেবল ভয় আর মিথ্যা কথা—

মাণিক। কই একটাও তো মিথ্যা কথা পেলুম না, সবই তো ঠিক বলেছেন।

"কথার মধ্যে যে উদ্দেশ্য গা ঢেকে থাকে! নিরাকার চৈতন্য হে।"

মাণিক। যতক্ষণ পাঁচজনকে নিয়ে থাকা—সংসারে থাকা, ততক্ষণ সে থাকবেই। সে কাকেও বলে দিতে হয় না, চেষ্টা করেও বলতে হয় না হুজুর। ভুলে যাচ্ছেন কেনো—আপনার কাছেই তো শুনেছি—Self preservation (আত্মরক্ষা) জিনিসটির ওটি ধর্ম্ম।

"কে জানে, কখন কি বলি, মনে থাকে না। তা বটে সে বেচারা অতশত ভাববার সময়ও পায় না। কিন্তু—"

মাণিক। মাপ করবেন, ওর মধ্যে আর "কিন্তু" আনবেন না। তা হলে গেরুয়া নিতে হয়। সংসারে ওটা রোকে না, রাজ্যে তো নয়ই। রাজকার্য্যে বরং deplomacy বলে খ্যাতি পায়।

ডাক্তার। তা দেখছি, কোর্ট আর কাটগড়াই ও সত্যের মর্য্যাদার মহাপীঠ। থাক্ মাণিক। একটু চা খেলে হোতো—

"নিন না, এখনি।" "আসছি" বলে মাণিক চলে গেল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই চা এসে গেল।

ডাক্তার। এগুলো কি ওরা সাধে রেখেছে—হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার উপায়—মুস্কিলাসান।—দেখনা কেবলি মনে হচ্ছে—"বলে' এলেই ভালো ছিল।"—কি পাপ বল দিকি!

এ তো শুধু দাসত্ব নয়—আত্মবিক্রয়। এই সব করতে হবে কিনা তাই বুড়ো ভীষ্ম মুড়ো মেরে নজির রেখে গেছেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সভায় টু শব্দটিও তাঁর মুখ থেকে বেরয়নি। শেষে বল্লেন কি না—"আমি যে দুর্য্যোধনের অন্ন খেয়েছি—অন্নদাস!" তাই বোধ হয় মহাভারত কথাটার সু-প্রয়োগ মাঝে মাঝে শুনতে পাই —যার বাংলা মানে—"আরে ছি"! ওতে বড়দের দোষ হয় না, বড়বাবু সাহেবের ঘরে 'hopeless' প্রভৃতি মিষ্ট কথা শুনে—বাইরে এসে বলেন—"আজ খুব জমেছিল হে—অনেক (রিলিজাস্ টক্) religious talk হোলো তাই দেরী হয়ে গেল, ইত্যাদি।"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে—"আপনি এ বিষয়টা কিন্তু মিছে ভাবছেন। না চলে এলে ওরা ভাবতো—ওদের এটিকেট্ আপনি জানেন না। ঠিক করেছেন, আর কি দাঁড়াতে আছে?"

তাই না কি? আমাদের উপ-কর্ত্তারা কিন্তু আলাপি এলে অবান্তর কথায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে তারপর ঠিক্ ডাকতেন। দেখতে না পেলে—কৈফিয়ৎ তলব হতই। ভাবি কি মিছে! তাঁদের কর্ত্তামির দাবী যে দরাজ! আমরা কি কেবল কাজ করবার জন্যে আছি, ওঁদের কর্ত্তামী দেখাবার উপায় হয়ে থাকাই যে আমাদের প্রধান কাজ হে।—যাক্, আর ভাববো না। রোগের যেমন উপসর্গ থাকে, এ সবও চাকরির উপসর্গ।—

"দেখ না আজ খুব ভালো মন নিয়েই সাহেবের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কোথা থেকে ওই একটা খট্‌কা এসে সব বিগড়ে দিয়েছিল। এখানকার দিন ফুরিয়ে এলো দেখে, আর c/oর মেজাজটাও ভালো দেখে, অনেক কথাই কয়ে' ফেলেছি। তোমার কথা, যুধিষ্ঠিরের কথা, বিনোদীর কথা, সবই হয়ে গেছে। কিছু ফল হবে বলেই আশা করি।"

মাণিক। আমাদের কথা আবার কি বললেন?

ডাক্তার। ওই যে সাহেব তখন বলেছিলেন—"আমি ভালো লোকের কাছে শুনেছি"। সে ভালো লোকটি আর কেউ নয়—তোমার ওই যুধিষ্ঠির। লোকটা সত্যিই পাকা লোক। বোধ হয় কামিজবাবুকেও হাত করে রেখেছে।

মাণিক। এটা ঠিক্ ঠাউরেছেন। তার কাজ (supply) শেষ হয়ে আসছে, সে ছটফট্ করছে। শুধুই তো তার ওই কই-মাছের করবার নয়, আর কেবল এখানেই নয়, ওর সঙ্গে অনেক কিছু আছে। 'কই' বাদ দিলে, সবই যে বাদ পড়ে, লেখাপড়া নাকচ হয়ে যায়। তা না তো কি এক কইয়ে অত টাকা ছাড়ে? আপনার বংশের কথা শুনে, সব কথা ভাঙেনি।

"আমিও ভাবতুম হে—একমাত্র 'কই' নিয়ে থই পায় কি করে! আমরা চার পায়ে সামলাতে পারছি না, খোল্‌গুলো যে ঢোল হয়ে উঠলো।"

মাণিক। আরো কত কি জড়িয়েছে জানি না।

ডাক্তার। জেনে কাজ নেই। ও রাজা হোক্, তাতে দুক্ষু নেই। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না

মাণিক। আবার ওর একটু কাজের (কন্‌ট্রাক্টের) জন্যেও সাহেবকে আভাস দিয়েও এলুম হে!

মাণিক বললে—"ভালই করেছেন"।

ডাক্তার। যাক্ ওর কথা—ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে। এখন তুমি বড় ছেলেটিকে কম্পাউণ্ডারীটা শিখিয়ে পড়িয়ে নাও না। সহজেই তার কাজ হয়ে যাবে।

মাণিক। আপনার দয়া কোনোদিনই বুঝতে পারব না। ওইটুকু থাকলেই সব হয়ে যাবে হুজুর। কিন্তু, মাপ করবেন—চাকরিতে আর…

ডাক্তার। বস্ বস্, বুঝেছি। লাখ টাকার কথা কয়েছ—ভারী খুশি হলুম। সে যদি মাথায় করে পাট ব্যাচে, তাকে আমি লাট ভাববো। ওটা দেশের মেয়েরা বুঝলেই আমাদের সুদিন আসবে। তাঁরা বুঝতে আরম্ভও করেছেন। যাক্, তোমার একটু উন্নতির উপায় হতে দেখলেই, আমি নিজের কথা ভাববো—যা হয় করব।

মাণিকের কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছিল। সে হাতজোড় করে' বললে—ও-কথা এখন নয় হুজুর, কুমারের মঙ্গল কামনাই এখন প্রধান—

ডাক্তার। কুমার আবার কে হে?

মাণিক। যিনি আসছেন—ভুলে যান কেনো?

ডাক্তার। ওঃ that ফ্যাসাদি fellow, যিনি ঋণ পরিশোধের তাগাদায় আসছেন! ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।—সাহেব সব কথা বার করে' নিয়েছে।

মাণিক। বলেন—"আমার সঙ্গে চলো ডাক্তার, তোমার ভালো হয়ে যাবে। আপাতক Three times fifty and allowance, পরে আমি দেখব কতটা কি করতে পারি।" কী বিপদেই পড়েছিলুম—তাঁকে সবই বলতে হ'ল—আগন্তুক ইমিনেণ্ট—আসন্ন সার। শুনে একটু থমকে গেলেন, খুশি হলেন। বললেন—"আচ্ছা,—বাচ্ছা হবার পর, আমাকে জানিও, ইত্যাদি। সেই ফাঁকে তিন দিনের ছুটির কথাও বলেছি I mean—সাধের হাঙ্গাম সারা চাই তো।"

মাণিক মাথা চুলকে বললে—"ছুটির কথাটা কেবল ওঁকে বললেই হবে না কিন্তু।"

ডাক্তার। না—আপিসে জানাব বই কি—ঘরের দেবতা আগে। মনটা কিন্তু বড় বিচলিত করে' দিয়েছেন o/c—লোভে নয়, ওঁর অহেতুক ভালবাসায়।

মাণিক। পূর্ব্বেই বলেছি সার—যিনি আসেন তিনি ভাগ্য নিয়েও আসেন। এ সব কুমারের ভাগ্যের পরিচয়—

ডাক্তার হাসি মুখে—"কিন্তু"—

"দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"।

মাণিক। ওটি জ্ঞানের কথা, ওর 'ফুট্ নোট' থাকা দরকার—অর্থাৎ পঞ্চান্নর পর। আপনি তো বলেন—"জ্ঞান আর চাকরি—বিরুদ্ধ বাক্য। অজ্ঞান আর চাকরি এক ঘরে থাকে।"

ডাক্তার। ওঁদের ভালবাসার মোহ মাঝে মাঝে বড় ঘুলিয়ে দেয় হে—বড় ভয়ের জিনিস। যাক্ সে পরের কথা। তুমিও ভেবো—বুঝতে পেরেছ?"

মাণিক। আজ্ঞে তা তো বুঝেছি, কিন্তু খুড়োকে যে মনে পড়ে! তাঁদের যে 'পথপ্রান্তে'র দুর্ভাবনা নেই।

ডাক্তার। যাক্, এখন কোথায় কি?

(ক্রমশঃ)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

গূঢ়পুরুষোৎপত্তি—সপ্তম প্রকরণ

একাদশ অধ্যায়

মূল :—উপধা-সমূহ-দ্বারা পরিশুদ্ধ অমাত্যবর্গসহায়ে (রাজা) গূঢ়পুরুষগণকে উৎপাদিত করিবেন।

সঙ্কেত :—উপধা-সমূহ—(১) ধর্ম্মোপধা, (২) অর্থোপধা, (৩) কামোপধা, (৪) ভয়োপধা। উপধা—ছল। গূঢ়পুরুষ—চর। উৎপাদিত করিবেন—নিযুক্ত করিবেন—চর-কার্য্যের শিক্ষা দিবেন।

মূল :—কাপটিক-উদাস্থিত-গৃহপতি-বৈদেহ-কতাপস-চিহ্নধারী সত্রি-তীক্ষ্ণ-রসদ-ভিক্ষুকী প্রভৃতিকে (উৎপাদিত করিবেন)।

সঙ্কেত :—কাপটিক প্রভৃতির লক্ষণ মূলেই পাওয়া যাইবে। মূলে আছে—'চ'—গঃ শাঃ উহার অর্থ করিয়াছেন—অনুক্ত-সমুচ্চয়—কুব্জ-বামন-কিরাত-মূক-বধির-জড়-অন্ধ-নট-নর্ত্তক-গায়ন-বাদন-বাগ্‌জীবন-কুশীলব ইত্যাদিও চরমধ্যে গণ্য।

মূল :—পরমর্ম্মজ্ঞ প্রগল্‌ভ ছাত্র কাপটিক। তাঁহাকে অর্থ ও মান দ্বারা উৎসাহিত করিয়া মন্ত্রী বলিবেন—'রাজা ও আমাকে প্রমাণ (-রূপে স্থির) করিয়া যাহার যাহা অকুশল দেখিবেন তাহা তখনই বিজ্ঞাপিত করিবেন'।

সঙ্কেত :—মর্ম্ম—অন্তর, আন্তরিক ভাব। গঃ শাঃ—পরচ্ছিদ্রবেদী। কিন্তু পরমর্ম্মজ্ঞ কেবল পরচ্ছিদ্রবিৎ নহেন; পরের মনের কথা যিনি বুঝিতে পারেন—তিনিই পরমর্ম্মজ্ঞ—capable of guessing the mind of others (SH)। প্রগল্‌ভ—সাহসী, মুখচোরা নয়; শ্যামশাস্ত্রী—skillful বলিয়াছেন—forward বলা ভাল। কাপটিক—কপটাচারী; বাহিরে ছাত্রের বৃত্তি অবলম্বনে বাস করেন—অথচ ভিতরে ভিতরে গুপ্তচর; fraudulent disciple (SH); student informer বলা যায়। রাজা ও আমাকে প্রমাণরূপে স্থির করিয়া—কাপটিক একমাত্র রাজা ও আমাকে (মন্ত্রীকে) মানিবে—অপর কাহাকেও মানিবে না; একমাত্র রাজা ও মন্ত্রীর কথামত সে কাজ করিবে—তাহার আনীত গোপনীয় সংবাদ সে কেবল রাজা ও মন্ত্রীকেই জানাইবে; sworn to the king and myself (SH); knowing the king and myself

to be the (sole) authority—এইরূপ বলা উচিত। অকুশল—নিন্দনীয় ব্যাপার, দোষ, ছিদ্র—wickedness (SH); fault, vice—বলা ভাল। তদানীমেব (মূল)—শ্যামশাস্ত্রী এই অংশের অনুবাদ করেন নাই।

মূল :—প্রব্রজ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত প্রজ্ঞা-শৌচ-যুক্ত উদাস্থিত। সে বার্ত্তাকর্ম্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে প্রভূত হিরণ্য ও শিষ্যসহ কর্ম্ম করাইবে। আর কর্ম্মফল হইতে সকল প্রব্রজিতের গ্রাসাচ্ছাদন-বাসাদির সংবিধান করিবে। বৃত্তিকামগণকে মন্ত্রণা দিয়া বশীভূত করিবে—'এই বেশেই রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে, আর খাদ্য ও বেতন (গ্রহণ-) কালে (এস্থলে) আসিতে হইবে'।

সঙ্কেত :—প্রব্রজ্যাপ্রত্যবসিত: (মূল)—গঃ শাঃর পাঠান্তর—প্রব্রজ্যা-প্রত্যপসৃত: ; শ্যামশাস্ত্রীর পাঠান্তর—প্রবৃজ্য প্রত্যবগ্রতঃ। গঃ শাঃ অর্থ করিয়াছেন—প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবার পর উক্ত চতুর্থাশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) হইতে প্রতিনিবৃত্ত—সন্ন্যাসভ্রষ্ট—ইহাই তাৎপর্য্য। এ সন্ন্যাস হিন্দু সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসও হইতে পারে, আবার বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ভিক্ষুগণের গৃহীত সন্ন্যাসও হইতে পারে। শ্যামশাস্ত্রী উল্টা অর্থ করিয়াছেন —initiated in asceticism. কিন্তু মনে হয় গঃ শাঃর অর্থই ঠিক ; কারণ সন্ন্যাসভ্রষ্ট না হইলে তাহার প্রভূত হিরণ্য, শিষ্য ও ভূসম্পত্তি কিরূপে থাকিতে পারে? প্রজ্ঞা—তীক্ষ্ণধী, দূরদৃষ্টি ; foresight (SH); keen intelligence বলা উচিত। শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচিতা। বাহ্য শৌচ—জলাদি দ্বারা দেহের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন ; আভ্যন্তর শৌচ—ভাবশুদ্ধি। উদাস্থিত—recluse (SH)—সন্ন্যাসীর বেশধারী। বার্ত্তা-কর্ম্মপ্রদিষ্ট ভূমিতে—বার্ত্তা-কর্ম্মের নিমিত্ত উপকল্পিত ভূমিতে। বার্ত্তাকর্ম্ম-কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালন। কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে 'উদাস্থিত' বহু স্বর্ণ ও বহু শিষ্যযুক্ত হইয়া স্বীয়শিষ্যগণের দ্বারা বার্ত্তা-কর্ম্ম করাইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। প্রভূত স্বর্ণ—বার্ত্তাকর্ম্মের উপযোগী মূলধন। প্রভূত শিষ্য—বার্ত্তাকর্ম্মের উপযোগী কর্ম্মকরগণ। শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—'May we not trace the origin of modern Bairagis to this institution of spies'? হওয়া সম্ভব। কর্ম্মফল—বার্ত্তাকর্ম্মকরণের ফল—শস্য, পশু ও অর্থ ; কৃষির ফল—শস্য, পশুপালনের ফল—পশুবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ফল—অর্থলাভ। এই ত্রিবিধ ফল হইতে সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসস্থানের ব্যবস্থা উদাস্থিত করিবে। সর্ব্বপ্রব্রজিতানাং (মূল)—পাঠান্তর সর্ব্ব-বেষধারিণাং ; এই সকল সন্ন্যাসী উদাস্থিতের কর্ম্মকর শিষ্যবর্গ হইতে পৃথক্ (গঃ শাঃ)। আবসথ—বাসস্থান, lodging. প্রতিবিদধ্যাৎ—ব্যবস্থা উদাস্থিত কেন করিবে? ইহার উত্তরে গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—উদাস্থিত সন্ন্যাসিমাত্রকেই গ্রাসাচ্ছাদন-বাস দেয়—ইহা দেখিলে নিত্য নূতন নূতন সন্ন্যাসীর তথায় আগমন হইবে ; তাহাদিগের মধ্য হইতে দুই চারিজন উদাস্থিতের শিষ্যত্ব স্বীকারও করিতে পারে—এইরূপে উদাস্থিতের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, আর তাহাদিগের দ্বারা চরের কার্য্য উদাস্থিত করাইতে পারিবে। বৃত্তিকাম—জীবিকাপ্রার্থী—দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মপ্রার্থী। উপজপেৎ—কানে মন্ত্রণা দিয়া নিজের বশে আনিবে (উদাস্থিত)। এই স্থলে মূলের পাঠভেদ আছে—"এতেনৈব দোষেণ রাজার্থশ্চরিতব্য:"—send on espionage such among those under his protection as are desirous to earn a livelihood, ordering each of them to detect a particular crime committed in connection with the king's wealth (SH)। ইহা মূলানুগ নহে—শ্যামশাস্ত্রীর নিজের কল্পিত বহু কথা ইহাতে আছে। 'দোষেণ' পাঠ থাকিলে অর্থ হইবে—'এইরূপ দোষ (নির্ণয়) দ্বারাই রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে'। দোষেণ—দোষদর্শনেন ; রাজার্থ : —রাজার প্রয়োজন ; চরিতব্য:—সাধনীয়। কিন্তু পাঠান্তর আছে—বেষেণ। উহার অর্থ ভাল—এই বেশেই রাজপ্রয়োজন সাধনীয়। অর্থাৎ উদাস্থিত জীবিকার্থী শিষ্যচরবর্গের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিক্ষুর বেশ প্রদান করিবে—যথা, কাহাকেও বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ, কাহাকেও পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশ ইত্যাদি। বেশদানের পর উদাস্থিত প্রত্যেক বেশধারীকে বলিবে—'যে বেশ তোমাকে দিলাম, এই বেশ ধারণ করিয়াই তোমাকে রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে। পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রে কোথায় কি হইতেছে তাহার সন্ধান রাখিবে। কোন নূতন সংবাদ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইতে চলিয়া আসিবে না—কারণ তাহা হইলে তোমার উপর সন্দেহ জন্মিতে পারে। তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য বা বেতন ত লইতে আস—সেই সময়ে জ্ঞাত বৃত্তান্ত জানাইয়া যাইবে'। ভক্তবেতনকালে চোপস্থাতব্যম্ (মূল)—and to report of it when they come to receive their subsistence and wages (SH)—ইহা তাৎপর্য্য হইলেও মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই। Report শব্দটির অনুরূপ শব্দ মূলে নাই। ভক্ত—ভাত, অন্ন, খাদ্য—ধান্য, তণ্ডুল, যব ইত্যাদি। বেতন—জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ। 'খাদ্য ও অর্থ গ্রহণকালে আমার নিকট আসিবে ও সেই অবকাশে তোমার জ্ঞাত বৃত্তান্ত আমাকে জানাইয়া যাইবে, আর অন্য সময় দূরে থাকিবে'—ইহাই তাৎপর্য্য।

মূল :—আর সকল প্রব্রজিত নিজ নিজ বর্গকে উপজাপিত করিবে।

সঙ্কেত :—উদাস্থিত সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসের ব্যবস্থা করিবেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কেহ বা শৈব ইত্যাদি। তাহারা প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ বর্গ অর্থাৎ স্বশ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসিবর্গকে পরামর্শ দিয়া বশীভূত করিবে ও চরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য। বর্গ-শব্দের অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী বলিয়াছেন—followers. বর্গ অর্থে—অনুচর নাও হইতে পারে—বর্গ—সম্প্রদায়, শ্রেণী—নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসী। উপজপেয়ু: —shall send on espionage (SH)—এ অনুবাদও বিশুদ্ধ নহে। উপজাপ করা অর্থে কান-ভাঙানি দেওয়া—চুপি চুপি পরামর্শ দিয়া নিজের বশে আনা।

মূলঃ—বৃত্তিক্ষীণ কর্ষক—প্রজ্ঞা-শৌচযুক্ত গৃহপতিক-ব্যঞ্জন। সে কৃষিকর্ম্মের উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে ইত্যাদি—পূর্ব্বের সহিত সমান।

সঙ্কেত :—বৃত্তিক্ষীণ—কৃষি-বৃত্তি-দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত—গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—fallen from his profession. 'বৃত্তি' অর্থে জীবিকা ; বৃত্তিক্ষীণ—জীবিকা যাহার ক্ষীণ হইয়াছে—অর্থাৎ কৃষি-কার্য্যরূপ জীবিকা-দ্বারা যাহার চলে না—কৃষি-জীবিকা যাহার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—'কৃষি-ব্যবসায়ে ফেল' বলা চলে। কর্ষক—চলিত বাঙ্গালায় কৃষক, কৃষিজীবী। গৃহপতিক ব্যঞ্জন—গৃহপতি অর্থাৎ গৃহস্থের চিহ্নধারী চর—householder spy (SH)। ব্যঞ্জন—অভিব্যক্তি-চিহ্ন, লক্ষণ। পূর্ব্বের সহিত সমান—উদাস্থিত-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এস্থলেও সেই সকল কথাই উহনীয়। কেবল তথায় উদাস্থিত যেমন সন্ন্যাসি-বেশধারীদিগকে অন্ন-বস্ত্র-বাস যোগাইবে, এক্ষেত্রে গৃহপতিক-ব্যঞ্জনও তেমনই—সকল গৃহপতি-চিহ্নধারীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসের ব্যবস্থা করিবে ও স্বজাতীয়বর্গকে ভাঙ্গাইয়া নিজের বশে আনিবে—ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মূল :—বণিক্—বৃত্তিক্ষীণ—প্রজ্ঞা-শৌচ-যুক্ত—বৈদেহক-ব্যঞ্জন। সে বণিক্কর্ম্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে ইত্যাদি—পূর্ব্বের সহিত সমান।

সঙ্কেত :—বাণিজকঃ (মূল)—বণিক্, trader (SH), merchant; বৃত্তিক্ষীণ—ধনাভাববশতঃ বাণিজ্যবৃত্তিচ্যুত (গঃ শাঃ) ; বাণিজ্য করিতে করিতে ক্ষয়প্রাপ্ত—বাণিজ্যে বহু লোকসান দিয়া 'ব্যবসায়ে ফেল'। বৈদেহক—পাঠান্তর বৈদেহিক—বণিক্। বৈদেহকব্যঞ্জন—বণিকের বেশধারী চর—merchant spy (SH) ; বস্তুতঃ—a spy with the characteristics of a merchant—বলা উচিত। পূর্ব্বের সহিত সমান—বণিগ্‌বেশী চর—অন্যান্য বণিগ্‌বেশীর গ্রাসাচ্ছাদন বাসের ব্যবস্থা করিবে ও স্ববর্গকে ভাঙ্গাইবে—এইটুকু বৈশিষ্ট্য।

মূল :—মুণ্ড বা জটিল বৃত্তিকামী তাপস-ব্যঞ্জন। সে নগর-সন্নিকটে প্রভূত মুণ্ড-জটিল-শিষ্যযুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে এক মাস অথবা দুই মাস অন্তর অন্তর শাক অথবা যবসমুষ্টি ভোজন করিবে—(আর) গোপনে যথেচ্ছ আহার (করিবে)।

সঙ্কেত :—মুণ্ড—মুণ্ডিতমস্তক। জটিল—জটাযুক্ত। বৃত্তিকামী—জীবিকার্থী। তাপসব্যঞ্জন—তাপস-বেশী চর। উদাস্থিত—ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর বেশধারী। তাপস—তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত। উদাস্থিত কোন তপস্যার আচরণ করার ভাণ দেখাইবে না—কেবল বেশ ধরিবে সন্ন্যাসীর। পক্ষান্তরে, তাপসকে কৃচ্ছ্র সাধনের ভাণ দেখাইতে হইবে। গণপতি শাস্ত্রী 'মুণ্ড' বলিতে বুঝিয়াছেন—শাক্যভিক্ষু-জৈনক্ষপণকাদি—যাঁহারা মাথা কামান ; আর 'জটিল' অর্থে—শৈব-পাশুপতাদি—যাঁহারা জটা ধারণ করেন। শাক—নিরামিষ ব্যঞ্জনের উপাদান—উহা দশবিধ—

১। মূল (মূলা, ওল, কচু, আলু ইত্যাদি) ;
২। পত্র বা পাতা (ন'টে, পুঁই, প্রভৃতির পাতা) ;
৩। করীর বা কোঁড় (কচি বাঁশের কোঁড়) ;
৪। অগ্র বা আগা (বেতের আগা, খেজুর গাছের আগা বা 'মাথি') ;
৫। ফল (বেগুন, লাউ, কুমড়া, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা আম, লঙ্কা ইত্যাদি) ;
৬। কাণ্ড বা ডাঁটা বা গুঁড়ি (ন'টে, ডেঙ্গো প্রভৃতির ডাঁটা)
৭। অধিরূঢ়ক বা প্ররূঢ় বা অঙ্কুর (ছোট ছোট শাকের চারা, বাঁশের কোঁক ইত্যাদি ;
৮। ত্বক্ বা ছাল (সজিনার ছাল, আলু, পটল, কুমড়ার খোসা ইত্যাদি) ;
৯। পুষ্প বা ফুল (কুমড়ার ফুল, সজিনার ফুল, মোচা ইত্যাদি) ;
১০। কণ্টক বা কাঁটা (কাঁটা ন'টে ইত্যাদি) ;

অথবা কবক (পাঠান্তর)—যথা পাতালফোঁড়—এ্যাস্‌প্যারাগাস্ ইত্যাদি)।

এই দশ প্রকার শাক—vegetables যবসমুষ্টি—তৃণমুষ্টি—a handful of meadowgrass (SH)।

মাসদ্বিমাসান্তরং (মূল)—এক মাস বা দুই মাস অন্তর অন্তর একমুষ্টি শাক বা একমুষ্টি তৃণ ভোজন করার উদ্দেশ্য—'তপস্বী আহারজয়ী'—ইহাই প্রচার করা। গূঢ়ম্ (মূল)—গোপনে—নিজ বিশ্বস্ত শিষ্য ব্যতীত অন্যের অজ্ঞাতে—সর্ব্বসাধারণের অগোচরে। ইষ্ট আহার (মূল)—যে সকল খাদ্য তাহার ভাল লাগে।

স্মৃতি

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনাদি কালের এই বাধাহীন গতি দুর্ব্বার
জন্মমৃত্যু সৃষ্টি-লয় সাধে অনিবার।
যে-জন চলিয়া যায়, স্তব্ধ হয় জীবনের গীতি,
মাটীর-জননী-বুকে কেঁদে ফিরে তা'রি দীন স্মৃতি।

মানুষের বুক হ'তে মুছে যায় মানুষের নাম ;
বিগতের স্মৃতি ধরি মৃত্তিকাই কাঁদে অবিরাম।
পথহারা পথিকের বেদনার অশ্রুকণা নিয়া,
বিনিময় দানে প্রেম ধরণীর ধূলিময় হিয়া।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

পরদিন সকালে পুরন্দরবাবু যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে নিয়ে ভবেশবাবুর ওখানে যেতে হবে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। সিগারেট ধরালেন একটা। একটা কথা কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না—মনে হচ্ছিল কাল রাত্রে তাঁর গালে কে যেন চড় মেরে গেছে একটা।

"হুঁ···সব জানে, বুঝতে পেরেছে সমস্ত। পাপিয়ার ওপর দিয়ে শোধটা তুলবে" কথাটা ভেবেই ভয় হল তাঁর। পাপিয়ার সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠল মনের উপর—বিষাদ-মাখানো মুখখানি। একটু পরেই আবার তাকে দেখতে পাবেন মনে হবামাত্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাপিয়া তাঁরই যে।

"না, তর্কের কোন অবসর নেই এতে। পাপিয়া আমারই। ওই এখন আমার জীবন এবং জীবনের লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি নিয়ে কি হবে, গালে চড় মারলেই বা কি এসে যায়। জীবনে কি করলাম এতদিন? জঞ্জাল আর জ্বালা ছাড়া কি বা পেয়েছি! কিন্তু এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বদলে গেছে এর মধ্যেই"

একটু পুলকিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত। "বেশ বুঝতে পারছি পাপিয়াকে দিয়েই ও জব্দ করতে চায় আমাকে। পাপিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে সেই জন্যে। এই ভাবেই প্রতিশোধ নেবে। হুঁ···। না, কাল যা করেছে তা আর করতে দিচ্ছি না অবশ্য"—মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তাঁর—"বারোটা বাজে···এখনও পর্য্যন্ত পাত্তা নেই তার—ব্যাপার কি"

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা বাজল। অধীর হয়ে উঠলেন শেষে। এল না। হঠাৎ একটা কথা মনে হল—অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল—যুগল হয়তো ইচ্ছে করে' আসছে না। পরে এসে কাল রাত্রের মতো আবার একটা নাটক করবে হয় তো। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল তার। "সে ভাল করেই জানে যে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি—এও জানে পাপিয়া তার আশা পথ চেয়ে আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবই বা কি করে' আমি···আঃ"

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, একটা বাজতেই যুগলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যুগল কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সকালে ন'টার সময় এসেছিল, পনর মিনিট থেকেই আবার বেরিয়ে গেছে। পুরন্দরবাবু বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের কথাগুলো শুনলেন, তার পর তালাটা ধরে' অকারণে টানলেন দু' একবার অন্যমনস্কভাবে। তার পর সহসা সচেতন হয়ে লজ্জিত হলেন একটু। বাড়ির মালিক তে-তলায় থাকেন। চাকরটাকে বললেন তাঁকে একবার ডেকে দিতে।

বাড়ির মালিক লোকটি ভালই। ভদ্রলোক। পাপিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর সব শুনে বললেন, "পাপিয়ার জন্যেই আমি এতদিন কিছু বলিনি মশাই। তানাহলে এতদিন ওরকম লোককে দূর করে' দিতাম। উনি প্রথমে একটা হোটেলে এসে উঠেছিলেন—ওঁর রকম সকম দেখে হোটেলওলা দূর করে' দিলে। কি বলব মশাই—অত বড় মেয়ে সঙ্গে রয়েছে—একদিন এক মাগী এনে হাজির! চীৎকার করে বলছে আবার—"আমি যদি ইচ্ছে করি—এই তোর মা হতে পারে" —আর সে মাগী কি বললে শুনবেন? বললে—'ঝাঁটা মারি আমি অমন মেয়ের মুখে। মেয়ের বাপের মুখেও'···সে যে কি কাণ্ড মশাই—"

"সত্যি?" পুরন্দরবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আমি স্বকর্ণে শুনেছি। লোকটা মাতাল অবশ্য খুবই হয়েছিল—জ্ঞানগম্যি কিছুই ছিল না, কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে ও রকম বেলেল্লাপনা করাটা উচিত কি, মেয়েটা ভাববে কি, নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়। মেয়েটা খালি কাঁদত, কি আর করবে। আর ও ইচ্ছে করে' কাঁদাত মেয়েটাকে। সেদিন আবার এক কাণ্ড হয়েছিল সামনের বাড়িতে। এক কেরাণী গলায় দড়ি দিয়েছিল। দলে দলে লোক দেখতে গেল। চারদিকে ভীড়। যুগলবাবু বাড়ি ছিলেন না, মেয়েটা ভীড়ে মিশে চলে গেছে সেখানে, দেখলাম মড়াটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি দৃষ্টি চোখের। আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম। ভয়ে ঠক ঠক করে' কাঁপছিল, শাদা মূর্ত্তি—এসেই শুয়ে পড়ল —দেখি মূর্চ্ছা গেছে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হল। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যুগলবাবু বাড়ি এলেন—এসে মেয়েটাকে থামচাতে লাগলেন। ও মারে না কখনও—কেবল থামচায়। তার পর থেকে মদ খেয়ে যখনই বাড়ি ফেরে মেয়েটাকে ভয় দেখায় কেবল—আমিও গলায় দড়ি দেব। তোর জ্বালাতেই গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এই দেখ দড়ি এনেছি। সত্যি সত্যি একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দেখায়—আর মেয়েটা ভয়ে চেঁচাতে থাকে—দুহাত দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে 'কিছু করব না, তুমি যা বলবে শুনব, গলায় দড়ি দিও না বাবা।' অত্যন্ত করুণ দৃশ্য মশাই। যাচ্ছেতাই—"

যদিও পুরন্দরবাবু এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যা শুনলেন তা এতই বীভৎস যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

বাড়ি-ওলা আরও অনেক কিছু বললেন। বললেন—পাপিয়া দোতলার জানলা থেকে ঠিক লাফিয়ে পড়ত একদিন তিনি যদি না থাকতেন সে সময়।

পুরন্দরবাবু দোতলা থেকে নেবে গেলেন—পা টলছিল তাঁর।

"ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরে' চাবকাব আমি"···এই কথাটাই মনে হচ্ছিল কেবল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই একটা কথাই বারম্বার আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি মনে মনে।

তাঁকে একলাই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত ভবেশবাবুর ওখানে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা একটা চৌমাথায় দাঁড়াল, সারিসারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়েছে, শোভাযাত্রা চলেছে একটা। প্রচুর ভীড়। হঠাৎ পুরন্দরবাবুর চোখে পড়ল একটা গাড়িতে যুগল রয়েছে! গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসলে একটু। বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে মনে হ'ল—তাঁকে ইসারা করে' ডাকতেও লাগল। পুরন্দরবাবুর গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে, পুলিশ ঠেলে, প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং চীৎকার করে বললেন "কি ব্যাপার কি? আপনি এলেন না যে! এখানে কি করছেন"

"ঋণ শোধ করছি। চেঁচাবেন না অত, ঋণ শোধ করছি মশাই" চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বলল—"বন্ধুবর পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করছি—ঋণ—ঋণ শোধ"

ভয়ানক রাগ হল পুরন্দরবাবুর।

"আঃ—কি যা তা বলছেন। আবার মদ খেয়েছেন না কি। আসুন, নাবুন গাড়ি থেকে, আসুন আমার সঙ্গে,"

"ক্ষমা করবেন, পারব না। মহৎ কর্ত্তব্য এটা—"

"জোর করে টেনে নাবিয়ে নেব"

"আমি চেঁচাব তাহলে, ঠিক চেঁচাব"—গাড়ির ওদিককার কোনে সরে' গেল। যেন ভারি একটা মজার রসিকতা হচ্ছে। পুরন্দরবাবু মনে মনে গাল দিতে দিতে নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন।

"যাক্‌গে। ওরকম লোককে নিয়ে যাওয়াও যায় না ভদ্র পরিবারে" এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মনটা বিরক্তই হয়ে রইল।

নীলিমাকে গিয়ে সব বললেন। বাড়ী-ওলার কাছ থেকে যা যা শুনেছিলেন সব, তাছাড়া শবানুগমনের কথাও। শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না"

"ও কি করবে আমার। একটা হতভাগা মাতাল বই তো নয়"—পুরন্দরবাবু যেন চটেই গেলেন কথাটা শুনে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠলেন—"আমি কি ভয় পেয়েছি ভাবলে না কি। তাছাড়া সম্পর্ক তো রাখতেই হবে এখন পাপিয়ার জন্যে, পাপিয়ার কথাটা ভেবে দেখ!"

পাপিয়ার এদিকে অসুখ করেছিল। কাল থেকেই জ্বর হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি এসে পড়তে পারেন।

ষোল-কলা পূর্ণ হ'ল যেন। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন।

[illegible] পাপিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

"কাল সমস্তক্ষণ ওর কাছেই ছিলাম"—ঘরের বাইরে একটু থেমে নীলিমা বললেন—"মেয়েটি খুব চাপা স্বভাবের, আত্মসম্মানও খুব। এখানে আছে সেজন্যে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ওর বাবা যে ওকে এমন ভাবে ত্যাগ করেছে এইটে ওর প্রাণে বড্ড লেগেছে। আমার মনে হয় এই ওর অসুখের আসল কারণ"

"ত্যাগ করেছে মানে? ত্যাগ করেছে বলছ কেন"

"সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তো—বিশেষত এমন লোকের সঙ্গে যে···যে লোকটাও সম্পূর্ণ অচেনা"

"কি বিপদ, আমি তো ওকে জোর করে' নিয়ে এসেছি—আমি তো এতে কোন—কিন্তু পাপিয়া কি তাই মনে করেছে—ওইটুকু মেয়ে এতটা বোঝে?—এতটা বোঝবার ক্ষমতা আছে ওর! যুগল আসবে না এখানে কি করব বল"

পুরন্দরবাবুকে একা দেখে পাপিয়া বিস্মিত হ'ল না, একটু ম্লান হাসি হেসে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল সে। পুরন্দরবাবু অপটুভাবে একটু আদর করবার চেষ্টা করলেন, ভয়ে ভয়ে গায়ে মাথায় হাত দিলেন—পাপিয়া নিস্পন্দ হয়ে রইল। একবার ফিরে চাইলে না পর্য্যন্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে পুরন্দরবাবু কেঁদে ফেললেন হঠাৎ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এলেন এবং সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন আমাকে আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। মাত্র কাল থেকে জ্বর হয়েছে একথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না তিনি প্রথমে।

"আজ রাতটা কি ভাবে কাটে তারই উপর নির্ভর করছে সব"—অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে অনেক রকম 'ইন্‌স্ট্রাক্‌শনস্‌' (ব্যবস্থা) দিয়ে বলে গেলেন যে কাল আবার আসবেন সকালেই। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না তাঁর।

পুরন্দরবাবু রাতটা থাকতেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন, "ওর বাপকে আর একবার আনবার চেষ্টা করুন। একথা শুনেও আসবেন না এমন পাষণ্ড কি হতে পারে মানুষ"

"চেষ্টা!"—পুরন্দরবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন যেন—"হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব তাকে, যদি না আসতে চায় এবার!" যুগল পালিতকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠল তাঁর মনে—হঠাৎ রোখ চড়ে গেল। হাত-পা বেঁধেই আনতে হবে, যা থাকে কপালে।

"কাল আমার দুঃখ হচ্ছিল—ভাবছিলাম অন্যায় করেছি লোকটার প্রতি। এখন কিছু দুঃখ হচ্ছে না—ও মানুষ নয়, একটা পশু—!"

ফেরবার ঠিক আগে নীলিমাকে এই কথাগুলি বলে' পাপিয়ার ঘরে আবার ঢুকলেন তিনি।

পাপিয়া চোখ বুজে চুপ করে' শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে। মনে হল একটু ভাল আছে। পুরন্দরবাবু একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত রাখলেন, চুমু খাবার চেষ্টা করলেন একবার—পাপিয়া ফিরে তাকাল হঠাৎ, যেন সে তাঁরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে"

অতিশয় করুণ সুরে সে বললে কথা ক'টি, শান্ত মৃদু মিনতিভরা সুরে। পুরন্দরবাবু যে তার অনুরোধ রাখবেন না এও যেন সে বুঝতে পেরেছিল—তার বলবার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। পুরন্দরবাবু অনেক করে' বোঝাতে লাগলেন তাকে।

নীরবে চোখ দু'টি বুজে সে পাশ ফিরে শুল, একটি কথাও আর বললে না। পুরন্দরবাবুর কোন কথা সে যে শুনতে পাচ্ছে তা মনে হল না।

কোলকাতায় পৌঁছে পুরন্দরবাবু সোজা যুগলের বাসায় গেলেন। তখন রাত্রি দশটা, যুগল তখনও বাড়ি ফেরে নি। পুরন্দরবাবু পুরো আধঘণ্টা তার জন্যে অপেক্ষা করলেন, অধীর চিত্তে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন তার বাসার বারান্দায়। বাড়ি-ওলা বললেন, ভোরের আগে সে ফিরবে না কেন বৃথা অপেক্ষা করছেন।

"বেশ ভোরেই আসব তাহলে"—পুরন্দরবাবু আর বেশী কিছু না বলে' বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত টগবগ করে' ফুটছিল যেন।

বাড়ি ফিরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর বললে "কাল যে বাবু এসেছিলেন তিনি আজও এসেছেন আবার। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে চা করে' দিলাম। আজও মদ আনবার জন্যে টাকা দিলেন। এনে দিয়েছি এক বোতল"

(ক্রমশঃ)

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

১লা অক্টোবর—১৯৪৪

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল, মিশরের আর ভারতবর্ষের সময়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান। তখনও ওয়াই-এম-সি-এর কেউ ঘুম থেকে উঠে নি। আমি দিনের আলোয় সমস্ত বাড়ীখানা দেখে নিলাম; বাড়ীর দেয়ালে বিভিন্ন দেশীয় এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে। এটা পূর্ব্বে একটি ইতালীয় চিত্র-বিদ্যালয় ছিল এবং দেশ বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী এসে এখানে শিক্ষালাভ ক'রত। যুদ্ধের সময় এই অট্টালিকা শত্রু সম্পত্তি ব'লে ইংরেজদের অধীনে আসে এবং ভারতীয় সৈন্যদের অবকাশ-বিনোদনের জন্য ওয়াই-এম-সি-এ পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান সোলর্জাস ক্লাব" নামে পরিচিত হয়। প্রতি প্রকোষ্ঠের সম্মুখে লম্বিত পরিচয়-ফলক পাঠ ক'রে "ইণ্ডিয়ান সোলর্জাস ক্লাবের" কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল; যথা—কান্‌টিন, মিউজিক হল, অফিসার্স রেষ্ট রুম, ষ্টোর্স, বেড্ রুম, অফিসার্স বাথ, অফিসার্স ডাইনিং রুম, মেস্স ডাইনিং রুম, সেক্রেটারির রুম ইত্যাদি। আমি সাতটার মধ্যে স্নান শেষ ক'রে এসে দেখি বেড্-টি দিয়ে গেছে। সাড়ে আটটায় মিঃ মালবিয়া ও মিঃ সিল্‌ভরাজ শুভ প্রাতঃ-সম্ভাষণ জানিয়ে ব্রেক-ফাষ্টের আহ্বান ক'রলেন—চা, মাখন, রুটি, পোরিজ, ডিম আর কিছু ফল পরিতৃপ্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছি এমন সময় গত রাত্রির সহৃদয় বন্ধু কাপ্টেন করিম সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের দিকে চল্লাম। কাপ্টেন করিম ব্যাঙ্কে পৌঁছে আমাকে মানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার কাজে চ'লে যাবেন। তার আফিস সহর থেকে দশ মাইল দূরে। তিনি বল্লেন যে, পথে দুমিনিট দাঁড়ালেই মিলিটারী ট্রাক তাঁকে তু'লে নেবে। মিলিটারীদের ভারী একটা সুন্দর নিয়ম এই যে, কোন অফিসার অথবা সৈন্য হাত তু'লে ইঙ্গিত করলেই চল্‌তি ট্রাক থামে এবং তাকে তু'লে নেয়। পথে যে স্থানে ইচ্ছামত সে নেমে যেতে পারে। যাত্রী আর মোটর-ড্রাইভারের সঙ্গে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই। তাদের সামরিক চিহ্নই পরিচয়ের সূত্র। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক অফিসারের মোটর রাখবার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে সামরিক কর্ম্মচারিদের ভিতরে একটা "কমরেড্‌সিপের" ভাব গ'ড়ে উঠে। কাপ্টেন করিম রাস্তায় দাঁড়াবা মাত্রই একটি চলমান "ট্রাককে" ইঙ্গিত ক'রে থামালেন এবং তা'তে উঠে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন—রাত্রে আবার ওয়াই-এম-সি-এতে দেখা ক'রবেন।

আমেরিকান এক্সপ্রেসের এজেণ্টের সঙ্গে দেখা ক'রে পাসপোর্ট দেখিয়ে কলিকাতা আফিসের এক্সচেঞ্জ ড্রাফট-

খানি দিলাম। তিনি আমার কাগজ পরীক্ষা ক'রে আমার পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্লেন—কলিকাতা থেকে এয়ার মেলে টাকা পাঠান সত্ত্বেও টাকা আসে নি। আমাকে প্রয়োজন অনুসারে দশ পাউণ্ড অগ্রিম দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—কোন ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কিনা। পাশেই মিঃ জেট্‌মল নামক একজন ভারতীয় মুক্তা-ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যাঙ্কের একজন বেয়ারা সঙ্গে দিয়ে তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিরাট রাজপথের উপরেই মেসার্স জেট্‌মল এণ্ড সন্স। আমাকে দেখেই একজন কর্ম্মচারী ইংরেজী ভাষায় ব'ল্লেন,—কাকে চাই? আমি উত্তর না দিতেই একজন গৌরবর্ণ,

ভারতীয় সম্মিলন—কায়রো

দীর্ঘদেহ, অতি পরিচ্ছন্ন পোষাকপরিহিত ভদ্রলোক এসে অভিবাদন জানিয়ে বল্লেন—আপনি বোধ হয় প্রফেসার চৌধুরী। আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে টেলিফোন পেলাম—আপনি আসবেন। আমেরিকান এক্সপ্রেসের এই ভদ্রতাটুকু অতি মনোরম। তিনিই মিঃ জেট্‌মল ব'লে পরিচয় দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি আমার পরিচয় এবং মিশরে আগমনের উদ্দেশ্য জেনে একটু বিস্মিত হলেন এবং আমি হিন্দু, অথচ মুসলমান সংস্কৃতির অধ্যাপক,—আল্-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জেনে অনেকটা অপ্রতিভ হলেন। কারণ কোন হিন্দুর আজ পর্য্যন্ত আল্-আজহরে আসার কথা শোনেন নি। মিঃ জেট্‌মলকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মিশরে ভারতীয় কোন সমিতি আছে কিনা এবং তাদের সাহায্যে আমার বাসস্থানের কোন সুবিধা হ'তে পারে কিনা।

তিনি বললেন—"ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান" ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার সেক্রেটারী মিঃ দয়াল দাস এবং মিঃ ফারোকিকে টেলিফোন ক'রলেন যে, একজন ভারতীয় অধ্যাপক এসেছেন, তিনি মিশরে কিছুকাল থাকবেন। এই সময় তিনি আরও পাঁচ ছয়জন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভারতীয়কে আমার আগমনবার্ত্তা সগর্ব্বে ও সানন্দে জানিয়ে দিলেন। মিঃ গণেশী লাল এবং মিঃ শোভরাজ নামক দু'জন বিখ্যাত মণিকারকে বল্লেন যে, একজন "ইণ্টারেস্‌টিং ইণ্ডিয়ান" (Interesting Indian) এসেছেন। মিঃ জেট্‌মল অত্যন্ত ভদ্র এবং সরল। প্রথম পরিচয়ে বুঝলাম যে, এঁরা ভারতবর্ষের বাহিরে এসে ভারতে প্রত্যেক নবাগতকে অতি প্রিয়জ্ঞানে আপ্যায়িত করেন। আমাকে তিনি বাঙ্গালী জেনে বল্লেন—মহিউদ্দীন নামে আর একজন বাঙ্গালী আছেন—আল্-আজহরে পড়াশুনা শেষ ক'রে মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁর খোঁজ মিঃ দয়াল দাস দিতে পারবেন। তারপর আমাকে একটু কফি খাইয়ে তাঁর একজন কর্ম্মচারী সঙ্গে দিয়ে ওয়াই-এম-সি-এতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম যে, মিশরে একেবারে নির্বান্ধব হ'ব না। প্রায় বারটার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে ফিরেএসে একখানা চিঠি লিখলাম।

দুপুরে মিঃ মালবিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—প্রফেসর, আপনি কি বিবাহিত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কি সন্দেহ আছে? তিনি বল্লেন—নিশ্চয়ই। মিঃ সিল্‌ভরাজ অবিবাহিত হয়েও ভারতে আজকে ভোরেই তিনখানি টেলিগ্রাম করেছেন। আর আপনি একখানাও করেন নি—সুতরাং আপনি নির্বান্ধব। তারপর একটু রহস্যালাপের ভিতর দিয়ে স্থির করা গেল যে, মিঃ মালবিয়া কালকে মারকণি ওয়ারলেস সাহায্যে ভারতবর্ষে আমার

পক্ষ থেকে একখানি "কোড" টেলিগ্রাম ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রতি সপ্তাহে সুদীর্ঘ পত্র লিখে তাঁর প্রবাসের বহু সময় আনন্দ মুখরিত ক'রে তোলেন। তাঁর অহেতুকী সহৃদয়তা উপভোগ করলাম।

'বিকাল চারটার সময় আমি মিঃ শোভরাজের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি মেসার্স পোহোমলের আফ্রিকাস্থিত সমস্ত মণিমুক্তা ব্যবসায়ের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তিনি ৪২ বৎসর পূর্ব্বে সাত বৎসর বয়সে মিশরে আসেন এবং কর্ম্মক্ষমতায় পোহোমল কোম্পানীর উচ্চতম কর্ম্মচারী ও অংশীদার হন। তিনি অতি বিশুদ্ধ হিন্দু, আমার ইসলাম-সংস্কৃতি-প্রীতির সংবাদ শুনে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তিনি ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি। তিনি মিঃ দয়াল দাসের নিকট ফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, প্রফেসর চৌধুরী তাঁর কাছে যাচ্ছেন, তাঁর একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে মিঃ দয়াল দাসের নবপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া নামক দোকান গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। ইণ্ডিয়া নাম শুনেই বুঝলাম যে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতের নাম প্রচারের জন্য যে কোন সামান্য উপায় গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত। আমি প্রায় পনের মিনিটের মধ্যেই মিঃ দয়াল দাসের দোকানে উপস্থিত হলাম। দূর থেকেই দেওয়ালের উপরে বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখে আভাস পেলাম যে ভারতের স্থপতি কি প্রকারে পরিচিত হ'য়েছে।

মিঃ দয়াল দাস নাতিদীর্ঘ, অত্যন্ত গৌর বর্ণ, পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক, সদাহাস্যময়। তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি অত্যন্ত পরিচিতের মত হাত ধ'রে বল্লেন—আপনাকেই আমরা চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকটি কথার ব্যবসায়ী এবং কথাকেই বোধ হয় মণিমুক্তা ক'রে ব্যবসা করেন। আমার সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতেই তিনটি গ্রাহকের সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে আমাকে পরিচিত ক'রে দিয়ে তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত দোকানের বিজ্ঞাপন রূপে আমাকে ব্যবহার ক'রলেন। লোকটি বুদ্ধিমান বটে! তিনি সহর থেকে ১৫ মাইল দূরে হালুয়ান উপকণ্ঠে মিঃ ছোটেলালকে ফোনে বল্লেন—মিঃ মহিউদ্দীনকে যেন তিনি একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেখা ক'রতে অনুরোধ করেন। তার সেখানে কফি সদ্ব্যবহার ক'রে ভারতের অন্যান্য বিষয়ে—বিশেষ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও অনাচার সম্বন্ধে কথা ব'লে বিদায় নিলাম। তিনি একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে ওয়াই-এম-সি-এতে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই কাপ্টেন করিম ডিনারের বহু পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর ইচ্ছা—তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে তাঁর বাড়ী ঘুরে আসি। আমি পরিশ্রান্ত হ'লেও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রতে পা'রলাম না। কাপ্টেন করিমের বাড়ী গিয়ে দেখি, তিনটি আরবদেশীয় ছাত্র উপস্থিত। তিনি হেসে বল্লেন—এরা আল্-আজ্হরের ছাত্র—একটির বাড়ী মক্কা, আর দুইটি ইয়ামননিবাসী—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ফোন ক'রে এনেছি। আপনি এদের কাছ থেকে আল্-আজ্হরের সমস্ত খবর পাবেন। কাপ্টেন করিমের সহৃদয়তা অসীম। তাদের সঙ্গে আল্-আজ্হরের বিষয় আলোচনা ক'রে জানলাম, আল্-আজ্হরের ছুটি এখনও শেষ হয় নি। আমার ভালই হ'ল। নিজের স্থান ও স্থিতির ব্যবস্থা করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

তার পর সাড়ে আট্টার সময় ক্যাপ্টেন করিম আমাকে নিয়ে এলেন "ইণ্ডিয়ান মুসলীম এসোসিয়েশনের" অফিস ঘরে। কয়েকজন ভারতীয় ও মিশরীয় ভদ্রলোক সেখানে বসেছিলেন। তার মধ্যে দীর্ঘতম দেহ, কৃষ্ণতম বর্ণ, শ্বেত-কৃষ্ণ-শ্মশ্রু-বিভূষিত মুখমণ্ডল, ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত একজনকে দেখে বুঝলাম, ইনি সভার মধ্যমণি। কাপ্টেন করিম সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ফারোকী সাহেব হেসে বল্লেন যে, মিঃ দয়াল দাস, মিঃ জেঠমল, মিঃ শোভরাজ প্রত্যেকেই তাঁর কাছে ফোন ক'রে আমার আগমন বার্ত্তা জানিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন। ফারোকী সাহেবের চেহারা দেখে তার ভিতরটা বুঝা যায় না। তিনি স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় কথাও বলতে পারেন না, অথচ প্রত্যেকটি কথা খুব সরল ও আন্তরিকতা পূর্ণ। ফারোকী সাহেবের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত দেখা—সেটা খুব ভাল লা'গল। তিনি এক পেয়ালা চা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বড় সুন্দর চা—এলাচির গন্ধে ভরপূর। আমি চা না খেয়ে ঘ্রাণই নিচ্ছিলাম, ফারোকী সাহেব আলমারী থেকে এক কৌটা

জাফ্রাণ বের ক'রে আমার নাকের কাছে ধ'রলেন। এলাচি আর জাফ্রাণের গন্ধ মিশিয়ে ভারি সুন্দর আমেজ। তিনি বল্লেন—এ আমার তৈরী চা, চা-বাগানে ব্লেণ্ড করা নয়, আমি আমার টেবিলে ব্লেণ্ড করি। অতি সহজ নিয়ম; একটু কাপড়ে এলাচি আর জাফ্রাণের গুঁড়া বেঁধে কৌটার ভেতরে রাখুন। দেখবেন "এলাচ-চা" হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর ব্লেণ্ড বলুন ত!

সরল ফারোকী সাহেব নিজের কৃতিত্বে নিজে মুগ্ধ। এমন সময় একটি যুবক—বয়স তার ২৪।২৫, ক্ষীণকায়, শ্যামবর্ণ অৰ্দ্ধগোঁফসমন্বিত—কারো দিকে না দেখে ফারোকী সাহেবকে বল্লেন—ভারতবর্ষ থেকে একজন প্রফেসর এসেছেন, মিঃ ছোটেলাল আমাকে এই খবর দিয়েছেন। মিঃ দয়াল দাস তাঁকে ফোন ক'রে জানিয়ে ছিলেন, তাঁর খবর পাওয়া যায় কি? কাপ্টেন করিম বল্লেন—হাঁ প্রফেসরের খবর আমি দিতে পারি, যদি আমাকে ডিনার খাওয়ান হয়। ফারোকী সাহেব বল্লেন,—আমি দিতে পারি খবর, যদি আমার এখানে তুমি ডিনার খাও। এই বলেই তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর বল্লেন—এবার বাঙ্গালী-বাঙ্গালী মিলে যাবে। সেই যুবক আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন—আপনি প্রফেসর চৌধুরী, বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছেন? অনেক দিন বাঙ্গলায় কথা কই নি। আপনার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কইব। আর একজন বাঙ্গালী আছেন বটে আল্-আজ্হর-এ, তিনি বাঙ্গলায় কথা ক'ন না। মুর্শিদাবাদে বাড়ী; উর্দ্দুতেই কথা ক'ন। এই যুবকটির নাম মহীউদ্দিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বাড়ী? তিনি বল্লেন—নোয়াখালী; গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম—ঠিক আমারই পাশের গ্রাম। মহীউদ্দিন এবার নোয়াখালীর ভাষায় আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রলেন। অন্যান্য ভদ্রলোক ছিলেন—তাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই কথা ব'লছিলেন। আমারও খুব ভাল লেগেছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ—তার পর আমার পাশের গ্রামের, বিশেষতঃ তার বাঙ্গলায় কথা বলার আগ্রহ দেখে খুবই আনন্দ লেগেছিল। আমরা প্রায় সাড়ে নটার সময় সভা ভঙ্গ ক'রে চ'লে এলাম। ফারোকী সাহেব ব'লে দিলেন যে, কালকেই আমার পাশপোর্ট ব্রিটিশ কন্সলটে নিয়ে রেজেষ্ট্রী করে নিতে হ'বে; তিনি আমাকে কাল এগারটার সময় নিয়ে যাবেন। মহীউদ্দিন বল্লেন যে, তিনি কাল পাঁচটার সময় এসে মিঃ দয়াল দাসের "ইণ্ডিয়া"তে নিয়ে যাবেন; আমার কাগজপত্র দেখে তিনি অধ্যয়নের এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন।

আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছিল, এই অপরিচিত, নির্বান্ধব দেশে কয়েকজন সহৃদয় ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। এরা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—ভারতবাসী। ক্রমশঃ

আহ্বান

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শোন শোন ঐ পূর্ব্ব গগনে প্রভাতের আহ্বান—
"জাগ্রত হও কৃষ্ণ রাতের মুদিত-কমল প্রাণ।"
নিশার বক্ষ বিদারি প্রভাত
করেছে জ্যোতির খর শরাঘাত,
আকাশে বাতাসে বাজিয়া উঠেছে আলোকের জয়গান
"জাগ্রত হও হে ভীরু হৃদয়", প্রভাতের আহ্বান।
জাগ জাগ তুমি পূর্ব্বের মত রূপ রস শোভা লয়ে
চপল ভ্রমর রহুক তোমার কপোল সঙ্গী হয়ে,
ভুবন ভরুক তোমার গন্ধে
নাচুক নিখিল হরষ ছন্দে,
বিধির আশীষ শিশির ধারায় কর তুমি পূত স্নান
জাগ্রত হও অতীত গর্ব্ব, প্রভাতের আহ্বান।

ভাঙা হৃদয়ের কানে কানে আজ প্রভাত কহে কি বাণী।
"যুগে যুগে আমি নবীন জীবন ভীরু বুকে দিই আনি।
আমি সত্যের দীপ্ত আলোক
আমার পরশে মুছে দুখ শোক,
বন্দিল ঋষি যোগী মোরে কত রচি' বন্দনা গান
সত্যম্ শিব সুন্দর আমি রূপময় কল্যাণ"।
"মোর জয়গান ধরণী প্লাবিয়া বহে বায় নব নৃত্যে
পরাধীন যারা লভুক তাহারা স্বাধীনতা-সুখ চিত্তে।
জাগ জাগ তুমি ভারত কমল
আমি যে আশার প্রভাত উজল
আসিয়াছি আজি মুক্তি অমৃত তোমারে করিতে দান
জাগ্রত হও হে চির সত্য", প্রভাতের আহ্বান।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১২)

কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু অমলের যাওয়া হয় নাই। রমলা ও তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি পশ্চিমে চলিয়া গেলে তবে অমলের ছুটি। রমলার পিতা সন্ধ্যার সময়ে নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকিতেন কাজেই রমলা পরোক্ষ ভাবে খোকার অভিভাবক হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন পড়াইবার সময়ে রমলা আসিয়া বলিল—আমাদের পুরী যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। পরশু রওনা দেব সকলে।

এই নিষ্কর্ম্মা দিনগুলি ও টিউসনি অমলের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—বেশ ত, সকলেই যাচ্ছেন ত ?

রমলা বলিল—হ্যাঁ,—কিন্তু আপনার কথার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমরা গেলেই যেন আপনি বাঁচেন।

অমল হাসিয়া বলিল—কথাটার কদর্থ ক'রলে ও রকম বলা যায়, কিন্তু ছুটি পেয়ে বাড়ীতে মার কাছে যাবো এটাও ত আনন্দের। সেটা আপনার কেন মনে হ'ল না ?

—ও, সেটা মনের বিকার, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই। কিন্তু বাবা বলেছেন, আপনিও আপনার পুঁথি-পত্র ও কবিতার খাতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। পঠন-পাঠন চ'লবে, আর অবসর সময়ে সমুদ্র তীরে আমরা ঘুরে ঘুরে কাব্য চর্চ্চা ক'রবো—

অমল বলিল—ব্যাপারটা লোভনীয়—অত্যন্ত লোভনীয় কিন্তু মা যে আমারই পথ চেয়ে চেয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত ক'রছে, সেটার কি করা যায় ? আমরা ত কেবল আমাদের জন্যেই নয়, অন্যকে সুখী করাও আমাদের জীবনের একটা অনিবার্য্য অঙ্গ।

রমলা কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিলোল নারীসুলভ আঁখি ভঙ্গির সঙ্গে বলিল,—আপনার মুখে এমন রাম নাম! পরের জন্যে ভাবনা, তার সুখ দুঃখের সঙ্গে এমন অনিবার্য্য আঙ্গিক ভাব এটা কি আপনার মত লোকের যোগ্য স্বীকারোক্তি হ'য়েছে—

অমল একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল—অপরাধ নেবেন না। আপনার তিরস্কারের প্রবৃত্তিকে আমি প্রশংসা ক'রতে পারছি না। আমার দ্বারা যা সম্ভব তা ক'রতে আমি কার্পণ্য কোন দিন করি না। পুরী গেলে কে কতটা সুখী হবে জানি না, তবে বাড়ী গেলে মা যে খুব সুখী হ'বে এটা জানি—এবং—

রমলা বাধা দিয়া বলিল—পুরী গেলেও ত দু'একজন নগণ্য ব্যক্তি খুসী হ'তে পারে। তারাও হয়ত আপনার মায়ের মত দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা ক'রে আছে—

অমল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আপনি জানেন না, কেমন ক'রে আমসত্ব, আচার, আমসি শাক কলা মূলো খুঁটে খুঁটে সঞ্চিত ক'রে রেখে মা প্রবাসী ছেলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে—সে আগ্রহ, সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার কোন তুলনা নেই। যত বড় প্রলোভনই থাক্, এই দুঃস্থ মায়ের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও স্নেহের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রার মত হৃদয়হীন আমি হ'তে পারি নি। তার যে কোন কদর্থের জন্য আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু—

রমলা কহিল—আপনার এই মাতৃভক্তি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আন্তরিক প্রশংসা করি, কিন্তু তারপরে কি আর কারও দাবী নেই—বন্ধনটাকে ভাগ ক'রে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখাবার মত ?

—এখনও তেমন কোন দাবী উপস্থিত হয় নি—আর সেটা মায়ের পরেই—

রমলা কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল—আজ অপর্ণা যদি এমনি নিমন্ত্রণ ক'রতো তবে কি এই উত্তরই দিতেন ?

অমল অত্যন্ত কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল—অপর্ণা কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও যদি আজ এমনি ব'লতো, কি গ্রেটা গার্ব্বোও যদি সম্পদ ও রূপের ভার নিয়ে আস্তো তবে তাকেও এই জবাবই দিতাম—অত্যন্ত নির্ভীক ভাবেই।

রমলা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তবে শুনে সুখী হ'লাম। আপনার মা এ দিক থেকে ভাগ্যবতী—

অমল কহিল—আমার মত দুর্ভাগ্য-সন্তানের মাতা বলে?

—দুর্ভাগ্য নয়, মাতৃভক্ত সন্তানের মা বলে।

রমলারা পুরী যাইবার পরে কয়েকদিন শূন্য রাজপথে ও অর্দ্ধশূন্য লাইব্রেরী কক্ষে অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল বাড়ী যাইবার দিনস্থির করিয়া ফেলিল। কাল সে যাইবে, অতএব অপর্ণার অনুরোধ মত যদি তাহাকে দেখা করিতে হয়, তবে আজই সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। অপর্ণাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য আগে যেমন সে একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করিত আজ সে ঠিক তেমনি একটা শূন্যতা অনুভব করে, বার বার মনের মাঝে কাতরকণ্ঠে কে যেন আর্ত্তনাদ করে—লাভ নাই, কোন লাভ নাই, সবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

তবুও যাইতেই হইবে, দুঃখ হোক্ তবুও তাহাই আজ দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে ডাকিয়া যায়। অমল ট্রামে উঠিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। এই অপর্ণা দু'টি দিনের জন্যে তাহার অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া চির অন্ধকারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—সে যদি তাহাকে ভুলিতে না পারে তবে জীবনের প্রতিক্ষণে সে কেবল আহত স্বরবিদ্ধ বিহঙ্গের মত একান্ত নিরালায়, অপরিসীম বেদনায় ছট্‌ফট্ করিবে—উল্কা দহনের আলোকে অকস্মাৎ অন্তরাকাশ আলোকিত হইয়া চিরতরে চির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অন্ধের মত সে কেবল পথ হাতড়াইয়া ফিরিবে!

অপর্ণাদের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নেই নতুন একখানা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল,—গেটটিকে প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া। অমল সেটাকে লক্ষ্য না করিয়াই পাশ কাটাইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। বাহিরের ঘরের কলকণ্ঠ অনেক লোকের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অমল কোন কিছুকেই মনে না করিয়া সোজা ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহে অপর্ণার মাতা, অপর্ণা, তার বোন এবং আর একটি ভদ্রলোক—অপরিচিত।

অপর্ণার মাতাই ডাকিল—এসো বাবা অমল, অনেক দিন আসো নি।

অপর্ণা একটু স্মিতহাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—ব'সো, অমন ঝড়ো কাকের মত চেহারা হ'য়েছে কেন? অসুখ ক'রেছে?

অমল সংক্ষেপে 'না' বলিয়া একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মাতা পরিচয় করিয়া দিলেন, এই অপরিচিত ভদ্রলোক অজিত বাবু। অমল নমস্কার করিল। অজিত-বাবু একটু পিঠ চাপড়াইবার ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিলেন—ও অমলবাবু, নমস্কার। মিস্ রয়এর মুখে শুনেছি—আপনি কবি এবং ফার্ষ্ট হবার চান্স আপনারই—না!

অমল হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—এ সব মিস্ 'রয়ে'র অনুমান—তাই আপনাকে হয়ত জানিয়েছেন। আপনি বিশ্বাস ক'রলে ঠক্‌তে হবে।

অজিতবাবু অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া বলিলেন—আমারই মত, এক্‌জামিনে ভাল রেজাল্ট ক'রতে পারলুম না কক্ষণও। তাই বিলেত থেকে কেবল ব্যারিষ্টারী ডিগ্রিই নিয়ে এলাম।

অমল একটু হাসিয়া কহিল—কম কি? এইত প্রচুর বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেছেন।

কথাটার মধ্যে যে একটু ব্যঙ্গ ছিল তাহা অপর্ণা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু অজিতবাবু প্রশংসাবাদ মনে করিয়া হয় ত খুসী হইয়াছিলেন তাই হাসিলেন মাত্র।

অনেকক্ষণ অবান্তর আলাপের পর অজিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—মিস্ রয়, তা হ'লে গাড়ীটা নিয়ে কি আজ ফিরেই যাবো। ভেবেছিলুম আপনাকে নিয়েই একটু চালিয়ে আসবো।

অপর্ণা যেন একটু বিব্রত হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মাতা বলিলেন—আচ্ছা আজ থাক্, অমল বহুদিন পরে এসেছে—হয়ত দেশে চলে যাবে। তখন ত—

—হ্যাঁ, সেই ভাল। আচ্ছা আসি, নমস্কার, মিস্ রয় নমস্কার।

অজিতবাবু বাহির হইয়া গেলেন, ক্ষণকাল পরেই তীব্র ইলেকট্রীক হর্ণের আওয়াজ তাহার প্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অপর্ণা যেন একটা চাপা নিশ্বাসে অস্বস্তিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—দেশে যাবে কবে?

অমল বিমনা ভাবেই উত্তর দিল,—কাল।

—ও তাই বুঝি, দেখা ক'রতে এলে ? এতদিন এসো নি কেন ? আর শরীর খারাপ হ'য়েছে কেন ?

অমল শেষ প্রশ্নের জবাব দিল আগে,—শরীর কিছু খারাপ হয় নি—অসুখ ত নয়ই, তবে ঘুমিয়ে উঠে এসেছি তাই একটু উস্কখুস্ক দেখাতে পারে বটে। এতদিন আসি নি তার কারণ কিছু নেই, আসা হয় নি।

মাতা বলিলেন—অপর্ণা একটু চা নিয়ে এসো ; অপর্ণা জানিত তাহার মাতা তাহার অনুপস্থিতিই চাহিতেছেন তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। মাতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কালই যাবে বাবা!

—হ্যাঁ, কালই। মা বার বার লিখেছেন।

—যে ছেলেটি এসেছিল তার সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হ'লে কেমন হয় বল ত ? ছেলেটি তোমার পছন্দ হয় ?

অমল একটু হাসিয়া বলিল—এ সম্পর্কে আমার মতামত, পছন্দ অপছন্দের কি মূল্য আছে ? অপর্ণাই এ সম্বন্ধে সব চেয়ে ভাল জানাতে পারবে—

—তোমরা দু'টিতে যেমন মেলামেশা ক'রেছ, তাতে ত তুমি অনেকটা বুঝ্‌তে পারো। আর তোমারও হয়ত এ সম্বন্ধে ব'লবার কিছু থাক্‌তে পারে—

অমল অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ঋজু দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—অপর্ণা এম-এ পড়ছে, বড় হ'য়েছে ; শুধু তাই নয় নিজের ভাল মন্দ সে ভালই বোঝে, এ ক্ষেত্রে আমার যদি ব'লবার কিছু থাকেই তবে তার পরিণতি একমাত্র তার উপরই নির্ভর করে। তাকে প্রশ্ন ক'রলেই সে খাঁটি জবাব দিতে পারবে—

অপর্ণা চা লইয়া ফিরিল এবং প্রসঙ্গটা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। অপর্ণা কি যেন একটা অনুমান করিয়া বলিল—এমন চুপচাপ কেন ? তোমার মত লোক চুপ ক'রে থাক্‌লেই ভয় হয়—কি ব'লছিলে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমার একটা ভাল বিয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

—সেও ভাল। পড়াশুনো ছেড়ে ঘটক-গিরি আরম্ভ ক'রেছ তা জানি না তাই—ক্ষমা ক'রো। তবে—

অমল চা'য়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিল—উঃ চা'এর তেষ্টায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল আর কি। যা হোক্—

অপর্ণা বলিল—ও তেষ্টাটা ত দিনরাতই সমানভাবে থাকে, তার জন্যে আর কি ? তবে ও তেষ্টাটা বেশী ভাল নয়।

—না হোক তবে, তোমার কি রকম ঘটকালিটা ক'রছি তা বলা দরকার।

অপর্ণা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—সে কথা তোমার কাছে শুন্‌তে চাই না। ছ্যাবলামি ছেড়ে অন্য কথা বল—

উভয়ের হাস্যপরিহাসে মাতা হাসিতেছিলেন, হয়ত মনে করিয়াছিলেন এই দু'টিতে যদি এমনি ক'রিয়া চিরদিন লঘুভাবে সংসারের উপর দিয়া চলিতে পারিত, তবে হয়ত বড়ই সুখের হইত। একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—তোমাদের দুটিতে মিলেছে বেশ,—কথায় কেউ কম নয়।

অপর্ণা কহিল—ওই কথা পর্য্যন্তই, তার বেশী নয়। এ কদিন ত ক'লকাতায়ই ছিল, একবার ত খোঁজ নিতেও এল না। এমন কি কাজ ছিল—

—মোটর গাড়ীতে গেট যে অবরুদ্ধ থাকে, আসি কেমন ক'রে—

কথাটার মাঝে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা মাতা না বুঝিলেও কন্যা ভাল করিয়াই বুঝিল এবং কহিল—যারা কাপুরুষ তাদের অজুহাতের অভাব হয় না। যারা সাহসী, তারা জয় করে, পালিয়ে যায় না—

(ক্রমশঃ)

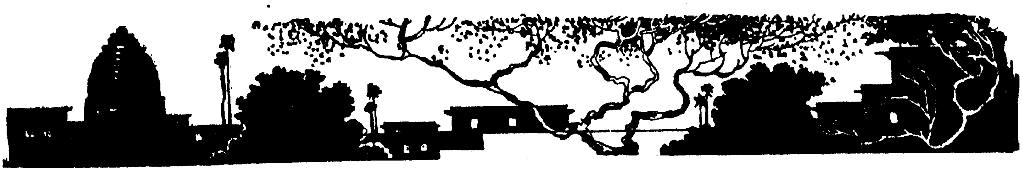

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

রেজা। পুলিশরা কেন এসেছে? সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে কি?

প্রতুল। বোধ হয় আছে।

রেজা। আমারও সব সময়েই মনে হ'ত কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে!

প্রতুল। তবে জেনে শুনে এর মধ্যে এলে কেন? এখন এখানে আসাটা খুবই বিপজ্জনক বুঝতে পারছ তো?

রেজা। তা পারছি। কিন্তু যদি স্যর, ওরা আপনাদের ধরে নিয়ে যায় তখন আমার টাকাটা—

প্রতুল। বটেই তো! নিশ্চয়ই!

রেজা। ভাবলাম যদি সেটা এখন দেন—তা ছাড়া পুলিশের খবরটাও দেবার ছিল।

প্রতুল পা টেনে টেনে দেরাজযুক্ত টেবিলের কাছে গেল

গিরীন। বাইরে পুলিশ থাকলে আমরা কি করে পালাব?

প্রতুল। রেজা, গলির দিকে কেউ আছে?

রেজা। না স্যর, ওদিকে তো কাউকে দেখিনি।

গিরীন। তা হলে ওদিক দিয়ে পালানো যেতে পারে।

নিরঞ্জন। প্রতুল—এখন কি রকম ফীল করছ?

প্রতুল। এই একরকম! পুলিশ বাড়ীর ওপর নজর রেখেছে শুনে একটু রী-অ্যাকশান হয়েছিল। (দেরাজ খুললে)

নিরঞ্জন। এখন কি করবে?

প্রতুল। প্রথমে গিরীনবাবুর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

নিরঞ্জন। ওঁকে আর আটকে রাখার প্রয়োজন নেই?

প্রতুল। না, আর কোন প্রয়োজন নেই। কাল থেকে পুলিশ বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। (দেরাজ থেকে একগাদা নোট বার করলে)

গিরীন। এরকম জানলে আমি কখনও এ কাজে হাত দিতুম না।

প্রতুল। স্থির হয়ে থাকুন। আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে পার করিয়ে দেব। রেজা, তুমিও এবার যাও। আর দেরী করা উচিত হবে না।

রেজা। আমার যাবার পথ ঠিক আছে। কেউ দেখতে পাবে না।

গিরীন। আমাকেও সঙ্গে নাও না।

রেজা। বাড়ীর ছাদ টপকে পালানো অনেক দিনের অভ্যাসের কাজ।

প্রতুল। আপনি বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে যাবেন। এই নিন্ যৎসামান্য কিছু—(নোটের তাড়া গিরীনের হাতে গুঁজে দিয়ে) আটশ' টাকা আছে।

গিরীন। আমি তো টাকা আনতে পারিনি—

প্রতুল। সে আপনার দোষ নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। আমার হাতে আর নেই। থাকলে যা কিছু থাকত' সবই দিতুম।

গিরীন। (ধরা গলায়) ধন্যবাদ! (রেজা জানলার কাছে গেল)

প্রতুল। খুব দূর দেশে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। পারেন তো সেখানে একটা দোকান করবেন, তা হলে আর পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটতে হবে না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রেজা। (জানলা দিয়ে বাহিরে দেখে) আরও একটা জুটেছে স্যর—

প্রতুল। আসছে?

রেজা। পানওয়ালার দোকানের কাছে যে বেটা ছিল তার সঙ্গে কথা কইছে।

প্রতুল। আচ্ছা। যান, আর দেরী করবেন না।

গিরীন। কিন্তু আপনার?

প্রতুল। আমার কথা ভাবতে হবে না। সে সময় এখন নেই। আপনার নতুন নাম নতুন পরিচয় যেন ভুলবেন না।

গিরীন। আজ্ঞে না। সব মুখস্থ আছে।

রেজা। (জানলা থেকে সরে এসে) একজন বাড়ীর পিছন দিকে যাচ্ছে—

গিরীন। তা হলে উপায়?

রেজা। পট্টি ঝাড়বেন।

গিরীন। সে আবার কি?

রেজা। গুল। বলবেন আপনি একজনদের বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তায় এসে পড়েছেন।

গিরীন। (চশমা পরে, টুপি লাঠি হাতে নিয়ে) আচ্ছা, তা হলে চলি। নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার। গুড লাক!

গিরীন চলে গেল। সকলে গলির জানলা দিয়ে দেখতে লাগল

নিরঞ্জন। এইবার রেজার বন্দোবস্ত করে ফেল।

প্রতুল। হ্যাঁ। রেজা, এই নাও তোমার টাকা।

রেজাকে একগাদা নোট দিল

রেজা। ধন্যবাদ স্যর। (নোট গুণে) এ কি স্যর! এত কেন? এতো আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশী।

প্রতুল। তা হোক। নাও।

রেজা। ধন্যবাদ স্যর। আপনার কি আর গ্যাঙের প্রয়োজন নেই?

প্রতুল। প্রয়োজন আছে রেজা, কিন্তু সময় নেই।

নিরঞ্জন। (জানলা দিয়ে বাইরে দেখে) ঐ গিরীন যাচ্ছে।

প্রতুল ও রেজা বাইরে দেখতে লাগল

রেজা। পুলিশটাও এসে পড়েছে।

নিরঞ্জন। ওকে কি জিজ্ঞেস করছে?

রেজা। গিরীনবাবু খুব রেগেছেন। ঠিক মনে হচ্ছে সত্যকারের রাগ। পুলিশ সরে গেল—

নিরঞ্জন। এগিয়ে চলেছে।

রেজা। পুলিশটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোজা চলে যাচ্ছেন, গটমট করে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

নিরঞ্জন। আর ভয়ের কিছু নেই।

রেজা। ঐ তো মোড় বেঁকে চলে গেলেন।

প্রতুল। গেছে! চলে গেছে! গুড লাক! গুড লাক!!

জানলা থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এল। কোমর বেঁকে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন। তোমার কি করবে?

প্রতুল। কি করতে পারি?

নিরঞ্জন। তোমার এখানে থাকা চলতে পারে না।

প্রতুল। আমি এখন যাব না—

নিরঞ্জন। কিন্তু প্রতুল, ওরা যে তোমার জন্যই আসছে!

রেজা। (বড় রাস্তার দিকের জানলা থেকে দেখে) স্যর, একটা পুলিশ ভ্যান এসেছে। (প্রতুল জানলার কাছে গেল) ঐ দেখুন—দেখেছেন? আমি চললুম।

প্রতুল। যাও। কিন্তু কি করে যাবে?

রেজা। ঐ জানলাটার ধারে জলের পাইপ আছে। তাই বেয়ে ছাদে উঠে পাশের বাড়ী দিয়ে নেমে যাব। বড় ফ্ল্যাট সিষ্টেমের বাড়ী। কেউ সন্দেহ করবে না।

প্রতুল। তা হলে যাও, আর দেরী কোরো না।

রেজা। (জানলার ওপর পা রেখে) এদিককার পুলিশটা গলির মোড়ে গেছে। এই ঠিক সময়—কিন্তু আপনার স্যর?

প্রতুল। আমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

রেজা। বিলক্ষণ কারণ রয়েছে।—(বাইরে দেখে) এই যাঃ—

প্রতুল। কি হ'ল? (জানালার কাছে গেল)

রেজা। এদিকেও একটা পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা ঘেরাও করেছে।

প্রতুল। গিরীনবাবু খুব সময়ে পালিয়েছেন। জানালা থেকে নেমে এস, ওরা দেখতে পাবে।

রেজা। এদিক দিয়ে আর যাওয়া চলবে না। (জানলা থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে) আপনিও আমার সঙ্গে আসুন না স্যর।

প্রতুল। তা হয় না রেজা।

রেজা। কিন্তু এখন না গেলে ওদের হাতে পড়তে হবে যে?

প্রতুল। তা জানি। রেজা তুমি যাও। যাবার সময় সামনের আর পিছনের দরজায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে যেতে পারবে?

রেজা। পারব স্যর। তাতে কি কোন লাভ হবে?

প্রতুল। হবে।

রেজা। আচ্ছা স্যর চলি। পিছনের দরজায় চাবী দিয়েই এসেছিলুম। এই নিন চাবী। ধন্যবাদ। নমস্কার। (রেজার প্রস্থান)

নিরঞ্জন গলির দিকের জানালায় গেল

নিরঞ্জন। পুলিশরা গাড়ী থেকে নামছে।

প্রতুল। নামুক। ওপরে আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

নিরঞ্জন। কিন্তু তুমি পালাবে কি করে?

প্রতুল। পালাব না। পালিয়ে কি হবে? হাতে একটা কাণাকড়িও নেই। কিন্তু নিরঞ্জন আমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

নিরঞ্জন। মানে? তুমি কি করবে?

প্রতুল। আমি ওদের ফাঁকী দেব।

নিরঞ্জন। কি করে? (হঠাৎ ওষুধ মেশানো গেলাসের ওপর নজর পড়তে) ওর সাহায্যে? (গেলাস দেখালে)

প্রতুল। না বন্ধু। তারা আসবে, আমায় ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পারবে না। ভুলে যেওনা আমার বয়স পঁচাশীর ওপর হওয়া উচিত ছিল। হয়ত' আমার নাষ্য পরমায়ু আমি ছাড়িয়ে গেছি। তাই যে মুহূর্ত্তে আমি দুর্ব্বল হয়ে যাব, জরামৃত্যু ছুটে আসবে তাদের পুরোণো দাবী আদায় করতে—কড়ায় গণ্ডায়, কিছু ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তুমি যাও নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। আমি যাব না। শেষ পর্য্যন্ত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

প্রতুল। তুমি আমার সাহায্য করেছ বলে বিপদে পড়বে।

নিরঞ্জন। সে আমি সামলে নিতে পারব।—তুমি বম্বে যাবে কি করে?

প্রতুল। আমি বম্বের চেয়েও আরও অনেক দূরে যাব।

নিরঞ্জন। কবে?

প্রতুল। শীগ্‌গিরই।

দেরাজ থেকে পাণ্ডুলিপি, নোট-বই ইত্যাদি বার করল

নিরঞ্জন। এগুলো কি করবে? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?

প্রতুল। না। কিছু কি সঙ্গে যায়! (হেসে) এগুলো বেশ ভারী লাগছে। (একটা আলমারি খুলল)

নিরঞ্জন। তুমি ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ প্রতুল।

প্রতুল। বুঝতে পারছি নিরঞ্জন। (কোমরের পিছন দিক চেপে ধরে) এই খানটায়—গ্ল্যাণ্ডগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি শক্তিহীন হয়ে পড়ছে—দেখছ, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

নিরঞ্জন। যদি একটা ইঞ্জেকশন নাও—

প্রতুল। না, দরকার নেই। হারাণো বছরগুলি ফিরে আসছে—আসুক— (আলমারি থেকে বই বার করতে করতে) আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমি যে মানুষের সৃষ্টি করেছি তারা খায় দায়, কথা কয়, বেঁচে থাকে, কিন্তু তবু তারা মৃত। যন্ত্রচালিত পুতুল—মানুষ নয়। এই সব (খাতা বই ইত্যাদি দেখিয়ে) এই সব আমার জীবনব্যাপী গবেষণার ফল—ফাঁকা, অর্থহীন, নিষ্ফল।

নিরঞ্জন। তুমি কি তোমার সাধনা অসম্পূর্ণ রেখে যাবে?

প্রতুল। তার চিহ্নমাত্রও রাখব না। সব ধ্বংস করে দেব।

নিরঞ্জন। ভবিষ্যতের জন্য কিছু রাখবে না?

প্রতুল। না! এমন কোন জিনিষই রাখব না, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই পথে আসতে পারে!

নিরঞ্জন। তাই হোক বন্ধু, কিন্তু এ জ্ঞানভাণ্ডার—

প্রতুল। বিস্মৃতির সমুদ্রে লুপ্ত হবে। ডাক্তার—এই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! (বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি)

নিরঞ্জন। ঐ—ওরা এসে পড়েছে।

প্রতুল আরও বই খাতা বার করতে লাগল

প্রতুল। আসুক।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ওগুলো এ ভাবে নষ্ট কোরো না। তোমার এ এক্সপেরিমেণ্ট জগতে অতুলনীয়, অদ্বিতীয়।

প্রতুল। (মল্লিকার ছবির দিকে দেখিয়ে) মিলি বলেছিল আমি যা করছি সব নিষ্ফল। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধৃষ্টতা মাত্র। মেয়েরা অতি সহজেই বুঝতে পারে—

নিরঞ্জন। তা পারে—

প্রতুল। অথচ এই সহজ কথা বুঝতে আমার এতদিন লেগেছে। (বই খাতা সব তুলে নিয়ে) আমি যাচ্ছি ল্যাবরেটরীতে। যে বাথটাবে গিরীনের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত তাতে আমার জীবনব্যাপী গ্লানিপূর্ণ নিষ্ফল সাধনার মূক সাক্ষীরা লুপ্ত হবে।

প্রতুল ল্যাবরেটরীর মধ্যে চলে গেল। নিরঞ্জন মল্লিকা বসুর ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে জোরে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ। হঠাৎ একটা জানলার কাঁচ ভেঙ্গে একজন কনষ্টেবল ঘরে ঢুকল। নিরঞ্জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কনষ্টেবল। আপনি আমাদের দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পান নি?

নিরঞ্জন। পেয়েছিলুম।

কনষ্টেবল। খোলেন নি কেন? যাক্, আমি গিয়ে খুলে দিচ্ছি।

কনষ্টেবলের প্রস্থান। নিরঞ্জন ল্যাবরেটরীর দরজার কাছে গেল।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ওরা এসে পড়ছে।

প্রতুল। (নেপথ্যে) আমিও আসছি—

খগেন দত্ত, লোকেন চাটুজ্যে ও দু'জন কনষ্টেবলের প্রবেশ

খগেন। মিষ্টার চৌধুরী কোথায়?

প্রতুল। (নেপথ্যে) এই যে, আসছি।

ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে প্রতুল ঢুকল। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ, পিঠ বেঁকে গেছে, চোখ বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে। দেখে চেনা যায় না

প্রতুল। আমায় খুঁজছিলেন?

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল

প্রতুল। আমায় খুঁজছিলেন?

লোকেন। আমরা মিষ্টার চৌধুরীকে খুঁজছি।

প্রতুল। আমিই প্রতুল চৌধুরী।

খগেন। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ—

প্রতুল। গ্ল্যাণ্ডের ডিজেনারেশন কত তাড়াতাড়ি হতে পারে দেখছ নিরঞ্জন!

খগেন। ওহে, তুমি ঐ ঘরটা দেখ।

একজন কনষ্টেবল ল্যাবরেটরীতে ঢুকল

লোকেন। আপনি স্বীকার করছেন যে আপনিই প্রতুল চৌধুরী?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

খগেন। আপনাকে অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে, অপরাধ—

প্রতুল। কষ্ট করে বলতে হবে না, আমি জানি।

পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি টেবিল ধরে নিজেকে সামলে নিল

লোকেন। (নিরঞ্জনের প্রতি) ওঁর কি শরীর খারাপ?

প্রতুল। না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

খগেন। গিরীন পাত্র নামে আর একজন লোককেও আমাদের অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে—

প্রতুল। তিনি এখানে নেই।

লোকেন সুটকেশের কাছে এগিয়ে গেল

খগেন। তিনি কোথায়?

ল্যাবরেটরী থেকে কনষ্টেবল বেরিয়ে এল

কনষ্টেবল। ওঘরে কেউ নেই হুজুর।

খগেন। ছাদে দেখ। আরও কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে যেও।

কনষ্টেবলের প্রস্থান। লোকেন সুটকেশ খুলল

লোকেন। খগেনবাবু, এই দেখুন বামাল মজুত রয়েছে।

খগেন। তা হলে আমাদের ভুল হয় নি!

প্রতুল। (নোটগুলো দেখিয়ে) এসব আপনাদের কাজ?

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রতুল। আপনারা জানতে পেরেছিলেন গিরীনবাবু এখানে আসেন—

লোকেন। হ্যাঁ।

প্রতুলকে আরও বুড়ো দেখাতে লাগল। প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি একটা সোফায় বসে পড়ল।

প্রতুল। কি করে জানলেন?

লোকেন। জনার্দ্দনকে চেনেন? আপনার চাকর। তাকে আমরা টাকা দিয়ে হাত করেছিলুম। সেই সব খবর দিয়েছে।

খগেন। তার চেয়েও বেশী কিছু আমরা জানতে পেরেছিলুম—আপনার কার্য্য প্রণালী!

লোকেন। ক্রিমিন্যাল মাত্রেরই একটা অভ্যাস আছে। আপনি দিল্লীতে, করাচীতে, লাহোরে অন্যান্য স্থানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন কলকাতায় ও ঠিক তাই করলেন। আমরা আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিলুম। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কাজটা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হ'ল। খগেন বাবু, আঙ্গুলের ছাপ কখনও ভুল হয় না।

খগেন। তবে মিষ্টার চৌধুরী বড্ড ভাবিয়েছেন—কিহে, গিরীনবাবুর সন্ধান পেলে? (কনষ্টেবলের প্রবেশ)

কনষ্টেবল। আজ্ঞে না।

খগেন। আমি নিজে একবার দেখি—

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় মিষ্টার বসুর প্রবেশ

দ্বিজেন। আপনাদের টেলিফোন পেয়ে—

লোকেন। (প্রতুলকে দেখিয়ে) আসামী আপনার সামনে বসে।

দ্বিজেন। (বিস্মিত হয়ে) এই প্রতুল—প্রতুল চৌধুরী!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিজেন। আশ্চর্য্য!

খগেন। ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকেও একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

নিরঞ্জন। কেন? অ্যাম আই আণ্ডার অ্যারেষ্ট?

খগেন। না, ঠিক তা নয়—

প্রতুল। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ডাক্তার

নিরঞ্জন। কি বলছ' প্রতুল? (প্রতুলের কাছে গেল)

প্রতুল। (হাঁফাতে হাঁফাতে) ওঁদের একবার কাছে ডাক।

(সকলে কাছে সরে গেল)

দ্বিজেন। কি বলছ বল।

প্রতুল। মিষ্টার বসু, আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে—জীবনের শেষ নিবেদন—

মল্লিকাকে আমার কথা কিছু বলবেন না। যে প্রতুল চৌধুরীকে সে চিনত আমি আর সে লোক নই। আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলবেন যে প্রতুল চৌধুরী মরে গেছে, আমার অপরাধ ও অপমানের কাহিনী তাকে শোনাবেন না।

দ্বিজেন। তাই হবে।

লোকেন। এইবার আপনাকে যেতে হবে মিষ্টার চৌধুরী।

প্রতুল। বেশ চলুন—

উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল, নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে সোফায় শুইয়ে দিলে।

নিরঞ্জন। প্রতুল, প্রতুল!

প্রতুল। নিরঞ্জন, বিদায়। আমি যাচ্ছি এদের ফাঁকী দিয়ে দূরে অনেক দূরে—মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। মরজগতে অমরত্বের সন্ধান দুরাশা বন্ধু, দুরাশা মাত্র!

প্রতুলের কথা থেমে গেল। তার প্রাণহীন দেহের দিকে চেয়ে সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

ক্রমশঃ

নতুন হোলি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়ে মানবরূপে বৃন্দাবনে
রং খেলেছি গোপীর সাথে সে যুগ ছিল স্বপ্নে ভরা,
সেই লীলাকে আজও সবাই সঙ্গী করে' সঙ্গোপনে
রং খেলা আর হিন্দোলাতে ভুলতে চাহে দুঃখ-জরা।
পিচকারীর এই রং মিছে আজ রং নাহি যে বক্ষে কারো'
হিন্দোলা সে দুলছে বটে তার দোলে যে ছন্দ নাই,
দোল লীলা আজ কারো প্রাণে দেয় না দোলা একটিবারও
পল্লিকারি পাতার মাঝে কাঁদছে সে আজ যন্ত্রণায়।
তাই আজি মোর মনের মাঝে হঠাৎ খেয়াল উঠলো জেগে
নতুন হোলি খেলবো আমি, নতুন হবে সে কুঙ্কুম,
রক্ত দিয়ে রং গুলে' আজ এমনি করেই ছাড়বো বেগে
পিচকারী আর কুঙ্কুমেতে আওয়াজ হবে—গুড়ুম গুম্।
সে পিচকারী কুঙ্কুমেরি আঘাত যারা সইবি ওরে
আয় তারা আজ আমার সাথে খেলবি হোলি ছন্দে ভাই,
এই হোলি যে খেলবে তারে বাঁধবো আমি বক্ষডোরে
ক্ষুধার লাগি' বিশ্বে তারা কাঁদবে না আর যন্ত্রণায়।
প্রতিজ্ঞা আর আগুন দিয়ে আজকেরি এই দোললীলাতে
জীবন দিবে আমায় যারা—খেলবে তারাই হোলির রণ।
জিত্‌বে যে বীর দখল তারই আমার কোলের হিন্দোলাতে
এ দোল শেষে আসবে যে দোল সে দোল হবে চিরন্তন।
সেই পুরাতন দোলের রাতের গান ছিল রে সুরবাহার
সঙ্গী ছিল গোপাঙ্গনা কোকিল এবং পূর্ণচাঁদ,
আজকেরি এই দোলের গীতি বীরসেনাদের হুহুঙ্কার
সঙ্গী হবে সত্যাগ্রহীর মৃত্যুপণের সিংহনাদ।
ঝঞ্ঝা ভূমিকম্প মড়ক এই দোলেরি সঙ্গী ওরে
অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই এই দোলেরি নৃত্য ভাই,
মৃত্যুহোলির রক্তে যারা বাঁধবে মোরে শক্ত-ডোরে
আজকেরি এই হোলির রণে তাদের কভু মৃত্যু নাই।
এই হোলিতে জিতবে যারা অজর তারাই বিশ্বেরে।
অমর হবে মর্ত্তে তারাই জীবন তাদের বৃন্দাবন,
ভবিষ্যতের বিশ্ব তারাই গড়বে স্বরগ দৃপ্তেরে
তাদের লাগি' থাকবে বাঁধা সকল ভোগের আলিঙ্গন।
আয় তবে আয় খেলবি কে আজ জীবন-মরণ নৃত্য-হোলি
ভক্তেরি হৃদ্‌রক্ত-আবীর মৃত্যুঞ্জয়ের এ কুঙ্কুম,
হাততালি যে দুঃখজয়ের জীবনজয়ের এ অঞ্জলি
নতুন হোলির বাজাই বাঁশী গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুম্।

স্বাধীনতার রূপান্তর—শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৬ সালের শুভ নববর্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্যামরাজ্যের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিষ্পন্ন করেন। এই চুক্তিতে বৃটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ এম-ই-ডেনিং, ভারতের পক্ষে মিঃ আনে ও শ্যামের তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন প্রিন্স বিবতানয় জয়ন্ত। এই চুক্তির প্রধান দুটী সর্ত্ত হচ্ছে : শ্যামকে অবিলম্বে সমস্ত উদ্বৃত্ত চাল (ঊর্দ্ধপক্ষে ১৫ লক্ষ টন) বৃটেনের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং আগামী ২১ মাসের যত উদ্বৃত্ত চাল বৃটেনের কাছেই বিক্রয় করতে হবে। এ বিষয়ে তদারক করবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট একটী বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করবেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্যাম উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মাঝখানে শ্যামের যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ আছে বৃটেনের অনুমতি না নিয়ে শ্যাম সেখানে খাল কেটে এই দুই জলরাশির মিলন ঘটাতে পারবেন না। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর থেকে শ্যাম বৃটেনের যে সকল ভূভাগ বা সম্পত্তি দখল করেছে তা ফিরে দিতে হবে এবং যে সকল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শ্যাম বাধ্য হয়ে এই সকল সর্ত্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে এবং প্রাণে প্রাণে ইংরাজদের কূটনীতির মর্ম্ম অনুভব করেছে। ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দোচীনের তুলনায় শ্যামের ঘটনাবলী স্বতন্ত্রধারায় চলেছিল। তাই খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার পর তাদের নতি-স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কিরূপ শুভবুদ্ধি নিয়ে ইংরাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘাঁটী পেতেছে, শ্যামের ব্যাপারে তার একটা সুন্দর চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যেখানেই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সেইখানেই বৃটীশ সৈন্য কেন? তার উত্তরও শ্যামের ঘটনাবলী থেকেই পাওয়া যাবে।

ইন্দোনেশিয়ায় বৃটীশবাহিনী জাপানী সৈন্যদের সহিত একযোগে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করে' শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। গ্রীসে ও তাদের প্রয়োজন ; মিঃ চার্চ্চিলের আমলে রাজতন্ত্রীদের পক্ষ নিয়ে গণতন্ত্রীদের দমনে বৃটীশ সৈন্যই অগ্রসর হয়ে এসেছে। তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট খাড়া করেও বৃটীশ সৈন্য গ্রীস ত্যাগে ভরসা পায় না। মিশরের ইচ্ছা না থাকলেও সেখানের শান্তিরক্ষার জন্য তাদের থাকা প্রয়োজন হয়। শ্যামেও এই কাজে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল এবং আজ তাই শ্যামকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করে'।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে শ্বেতজাতিগুলি কি ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের ইতিহাস পর্য্যালোচনাকালে তার বিবরণ এর আগেই দিয়েছি। শ্যামরাজ্যের প্রতিও ইঙ্গ-ফরাসীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল সেই যুগেই। ইন্দোচীনে ফরাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িককালে বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগের উপর। এই দুই দেশের মাঝখানে শ্যামরাজ্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাচীর রূপে পরিণত হয়। এর পর থেকে প্রায় শতাব্দীকাল শ্যামের রাজন্যবর্গ এই উভয় শক্তির উদ্যত দংশন থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে থাকেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছ থেকে তাঁদের আঁচড় খেতে হয়েছে বহুবার। ফ্রান্স শ্যামের অঙ্গ থেকে কাম্বোডিয়া ও লাওস রাজ্য বিচ্ছিন্ন করে ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বৃটেন টেনাসেরিম ও অন্যান্য ভূভাগ মালয়রাজ্যের এলাকাভুক্ত করে। এ সত্ত্বেও শ্যামরাজ্য নিজের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলতে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন দেশ বলে গর্ব্ববোধ করতে থাকে।

১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত শ্যামে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। শ্যামের রাজা আনন্দমহীদল তখনও নাবালক। রাজ্যের শাসনভার পরিচালনায় জন্য এক রিজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ১৯৩২ সালে এক রক্তপাতহীন আকস্মিক বিপ্লব ঘটে। এর ফলে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় তাতে জনগণের প্রতিনিধিমূলক এক পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের শতকরা ৫০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত ও শতকরা ৫০ জন সরকারের মনোনীত হয়ে থাকে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ১৯৪২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করা হবে। বিদ্রোহের পরবর্ত্তীকালে শ্যামে সামরিক রাজত্ব চলতে থাকে। রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরিষদের নির্ব্বাচনও সরকারের হুকুম মতই চলতে থাকে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। সামাজিক বিধিব্যবস্থারও কিছু কিছু সংস্কার করা হয় এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৯৩৬ সালে শ্যাম অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং নূতন করে চুক্তি নিষ্পন্ন করে। বৃটেনের সঙ্গে এই সময় এক বাণিজ্যচুক্তি ও মৈত্রীচুক্তিতে শ্যাম আবদ্ধ হয়। বৃটেন দীর্ঘকাল ধরে ব্যাঙ্ককের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এই সময় সেখানে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। শ্যামের বেশীর ভাগ বাণিজ্যই বৃটেন, জাপান, বৃটীশমালয় ও হংকংয়ের সঙ্গে চলে। শ্যামরাজ্যের সরকারী নাম "মোয়াং-থাই" অর্থাৎ স্বাধীন লোকেদের দেশ। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট শ্যাম নামটা সহ্য করতে পারেন না বলে তাঁরা নাম দিলেন "থাইল্যাণ্ড"।

বৃটেন যখন এইভাবে শ্যামরাজ্যের উপর প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করে বসেছে এমন সময় প্রশান্ত মহাসাগরে ১৯৪১ সালের জাপ অভিযান আরম্ভ হল। ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান ইন্দোচীন অধিকার করল। এর পর থেকেই শ্যামের ভাগ্যেও ওলটপালট দেখা দিল। জাপানের প্রভুত্ব তাদের মেনে নিতে হল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আয়োজন করে যেতে লাগল। আমেরিকা এই বিষয়ে শ্যামবাসীদের যথেষ্ট সহায়তা করে। জাপানের পরাজয়ের পর শ্যাম যখন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন বাঞ্ছা করল, বৃটেন তখন কি ভাবে শ্যামকে গ্রাস করবে তারই ফিকির খুঁজতে লাগল। সে শ্যামের নিকট যে একুশ দফা সর্ত্ত উত্থাপন করল তাকে শ্যামের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। শ্যাম কোনদিন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করে নাই। তথাপি ফ্রান্স এখন বিজয়ী রাষ্ট্ররূপে শ্যামের নিকট দাবী পেশ করল। চীনও দখলদার সৈন্য পাঠাতে চাইলে।

এই দুর্দ্দিনে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র শ্যামকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলতঃ আমেরিকার হস্তক্ষেপের ফলেই বৃটেন শ্যামকে কুক্ষীগতকরণে ব্যর্থকাম হয়।

জাপানের পরাজয়ের পরে শ্যামের রাজনীতিকগণ মিত্রপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন। যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী ও ডিক্টেটর মার্শাল বিপুলসংগ্রামকে তাঁরা গদীচ্যুত করেন। রিজেণ্ট লুয়াং প্রাদিৎ আগাগোড়াই জাপানের সহিত মৈত্রীর বিরোধী ছিলেন এবং তিনিই গোপনে গোপনে আমেরিকার সাহায্যে রাজ্যে জাপানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনিই এখন রাজ্যের ভার নিলেন। একজন নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হ'ল। গভর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন। শ্যামের যুদ্ধের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার করবার জন্য যুদ্ধাপরাধ-কমিশন গঠন করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিকট শান্তি আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করলেন।

শ্যামের রাজনীতিতে রাতারাতি এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনাদির ইতিহাসের পশ্চাতে আছে শ্যামের দুই রাজনীতিকের সংঘর্ষের কাহিনী। ১৯৩২ সালের রক্তপাতহীন বিদ্রোহের পর এই দুই নেতা শ্যামের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছেন। এই দুই নেতার জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দুইটী বিপরীতধারা দেশের প্রয়োজনে এক হয়ে আবার ভিন্নমুখী হয়েছে।

এই দুই নেতা হচ্ছেন—মার্শাল বিপুলসংগ্রাম ও লুয়াং প্রাদিৎ। প্রাদিৎ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে ডিগ্রী পান। দেশের শাসন সংস্কারকামী যুবকদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন এবং এই সময়েই তাঁর বিপুলসংগ্রামের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিপুলসংগ্রাম তখন ফরাসী সেনানীদের কাছ থেকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করেছেন। প্যারিসে প্রাদিৎ এসিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে জাভা, ইন্দোচীন, চীন, ব্রহ্ম ও ভারতের যাঁরা রাজনীতি পরিচালনা কচ্ছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি এই সময় পরিচয় করেছিলেন। ১৯৩২ সালে যে রক্তপাতহীন বিদ্রোহের ফলে শ্যামে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় প্রাদিৎই ছিলেন তার নেতা। ১৯৩৩ সালে যে পাল্টা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় মার্শাল বিপুল সংগ্রাম তা দমন করেন এবং প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদিৎ হলেন তাতে প্রধানমন্ত্রী। প্রাদিৎ ও বিপুল উভয়ে মিলে স্বাধীন শ্যামরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামের বাণিজ্যে বিদেশীদের একাধিপত্য দেখে তাঁরা এমন কতকগুলি আইন প্রবর্ত্তন করলেন যাতে করে' বাণিজ্যে বিদেশীদের প্রভাব লোপ করা হয়।

শ্যামের দেড়কোটী অধিবাসীর মধ্যে চীনা ছয়লক্ষ। তন্মধ্যে এক ব্যাঙ্ককেই প্রায় একলক্ষ চীনার বাস। প্রাদিৎ-বিপুলের শাসন সংস্কারের যুগে শ্যামের পেট্রল, টিন ও রবারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত, চীনা, ইংরাজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ ও জাপানীরা। তার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বাণিজ্যই ছিল চীনাদের হাতে। প্রাদিৎ ও বিপুল উভয়ের শিরা উপশিরাতে চীনা রক্ত প্রবাহিত হলেও তাঁরা শ্যামের বাণিজ্যে চীনা প্রভাব লোপের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হলেন না। লৌহ, কয়লা, টিন, মাংগানিজ প্রভৃতি খনিজ এবং চাল গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী শ্যাম আত্মস্থ হয়ে অচিরেই বিশেষ উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হ'ল। ১৯৩৭ সালে শ্যাম গভর্ণমেণ্ট বিদেশীদের প্রভাব লোপে সমর্থ হয় এবং পূর্ণ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদেশীয়দের শ্যামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

এই সময় প্রাদিৎ ও বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাদিৎ বিচক্ষণ রাজনীতিক হলেও সামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার থাকে মার্শাল বিপুল সংগ্রামের হাতে। শ্যামের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংগ্রাম প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। প্রধান সেনাপতি হবার পর থেকেই তিনি স্বীয় শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করলেন। এর ফলে ১৯৩৮ সালে বিপুলসংগ্রাম প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী হলেন। শাসন-ব্যবস্থার প্রগতির পথ রুদ্ধ হ'ল।

বিপুলসংগ্রামের সামরিক দক্ষতা থাকলেও রাজনীতির সূক্ষ্ম বিষয় সমূহে পারদর্শিতার অভাব ছিল। এ সমস্ত ব্যাপারে প্রাদিতের পরামর্শ ব্যতীত কোন কিছু করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। তাই তিনি মন্ত্রি-সভায় প্রাদিৎ যাতে স্থান পান তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রাদিৎ ব্যতীত মন্ত্রিসভায় তিনি অন্যান্য সংস্কারপন্থীদের বাদ দিয়ে স্বীয় অনুচরদের স্থান করে দেন। নিজ দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ফ্যাসিস্ত নীতি অবলম্বন করলেন। যাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল মাথা তুলতে না পারে তজ্জন্য তাঁর গোয়েন্দারা রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা করতে লাগল। শ্যামের সরল অধিবাসীরা এতে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

এমন সময় একটা ঘটনায় বিপুলের জনপ্রিয়তা আকস্মিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। ইন্দোচীন রাজ্যের থেকে তিনি কাম্বোডিয়া পুনরায় শ্যামের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হলেন। জার্ম্মানীর হাতে ফ্রান্সের পতনের পরও ইন্দোচীন ফ্রান্সের আনুগত্য স্বীকার করে চলতে থাকে। ভিসি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান ইন্দোচীনকে জাপঘাঁটিতে পরিণত করে। জাপসেনারা অবাধগতিতে ইন্দোচীনের ভিতর চলাচল করতে থাকে এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে চীনের সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। জাপান এই সময় ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' রব তুলে শ্যামের সহানুভূতি প্রার্থনা করে। বিপুল-সংগ্রাম এই সুযোগে ফ্রান্সের অধিকার থেকে পশ্চিম কাম্বোডিয়াকে মুক্ত করে শ্যামের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। ভিসি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তিনি এ সম্পর্কে এক চুক্তি করেন এবং সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাম্বোডিয়া ফিরিয়ে আনেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সাময়িকী

বাঙ্গালায় নির্ব্বাচন

বাঙ্গালা দেশে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। বিনাবাধায় কংগ্রেস পক্ষে যে ১৬ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও নির্ব্বাচন কেন্দ্রের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। হিন্দুমহাসভার প্রার্থী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রের ২৩ জন, মুসলীম লীগদলের ৫ জন এবং স্বতন্ত্র দলের একজনও বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস সদস্যদের নাম—(১) বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী—২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল (২) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল—মেদিনীপুর মধ্য সাধারণ পল্লী তপশীল (৩) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—প্রেসিডেন্সি বিভাগ জমীদার (৪) আনন্দীলাল পোদ্দার—শিল্প বাণিজ্য (৫) আশালতা সেন—ঢাকাসহর নারী (৬) কমলকৃষ্ণ রায়—বাঁকুড়া পূর্ব্ব সাধারণ পল্লী (৭) সুকুমার দত্ত—হুগলী দক্ষিণ-পশ্চিম সাধারণ পল্লী (৮) ভূপতি মজুমদার হুগলী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল (৯) প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী—রাজসাহী সাধারণ পল্লী (১০) সিতাংশুকান্ত আচার্য্য—ঢাকা বিভাগ জমীদার (১১) কিরণশঙ্কর রায়—পূর্ব্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল (১২) নরেন্দ্র সিং সিংঘী—রাজসাহী বিভাগ জমীদার (১৩) দেবীপ্রসাদ খৈতান—ভারতীয় বণিক সমিতি (১৪) অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল—বর্দ্ধমান উত্তর পল্লী (১৫) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর দক্ষিণপশ্চিম পল্লী (১৬) ঈশ্বর চন্দ্র মাল—মেদিনীপুর দক্ষিণ পূর্ব্ব পল্লী। বাঙ্গালার কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানপ্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসী সকল ভোটদাতাকে নিবেদন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিনাবাধায় নির্ব্বাচন ব্যাপারে যেমন মুসলমান লীগ অপেক্ষা কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর অধিকতর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ভোট যুদ্ধেও সেইরূপ হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

কুচবিহার কলেজ মামলার রায়—

১৯৪৫ সালের ২১শে আগষ্ট কুচবিহার কলেজের ছাত্রদের উপর সৈন্যদল আক্রমণ ও প্রহার করিয়াছিল। ঐ ঘটনার মামলায় ২ জন অফিসার ও ৪৬ জন সৈনিকের দণ্ড হইয়াছে। একজন আসামী এখনও পলাতক। কাপ্টেন কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণের ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। সুবেদার নবীন সিংএর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। মামলায় প্রমাণ হইয়াছে অপরাধীরা কুচবিহার ভিকটোরিয়া কলেজের, জেঙ্কিন্স স্কুল ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হোটেলের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে এবং নিকটস্থ অন্যান্য লোকজনকে মারপিট করিয়াছিল। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বালিকাও ছিল। আসামীরা সকলেই কুচ-বিহার রাজ্যের সৈন্য দলভুক্ত।

কলিকাতায় সর্বদলীয় পতাকার একত্র মিলন   ফটো—পান্না সেন

ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গাসাগর যাত্রী—

গত ১২ই জানুয়ারী ডায়মণ্ডহারবারে দুইবার জেটী ভাঙিয়া গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১৪২ জন নিহত ও হইয়াছে। তীর হইতে জাহাজে যাইবার জেটী নির্ম্মাণের অব্যবস্থার ফলে এইরূপ দুর্ঘটনা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, জিলাবোর্ড

ডায়মণ্ডহারবারে সাগরযাত্রীদের মৃত্যুলীলার একটি করুণ দৃশ্য

ফটো—ডি-রতন

ডায়মণ্ডহারবারে জেটী ভাঙ্গিয়া সাগরযাত্রীদের অবস্থা

ফটো—ডি-রতন

বহু লোক আহত হয়। খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে ঐ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইতেও তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই। এই সকল তদন্তের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষতিগ্রস্তদিগের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আর

যাহাতে ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার ব্যবস্থাও স্থির হওয়া প্রয়োজন।

সাগরযাত্রীদের মৃতদেহ
ফটো—ডি-রতন

বাঙ্গালায় রেশনের পরিমাণ কমিল—

২০শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে চাউল ও আটা প্রভৃতি মোট ৪ সেরের স্থানে অতঃপর ২ সের ১০ ছটাক করিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা দৈহিক পরিশ্রম করে শুধু তাহারাই সপ্তাহে ৪ সেরের স্থলে সাড়ে ৩ সের খাদ্য পাইবে। বর্ত্তমানে সপ্তাহে যে ৪ সের খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাই সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাহাও আবার এইভাবে কমাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর লোকজনকে পেটভরা না খাইতে পাইলে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় থাকিবে না।

সৈন্যবিভাগে দুর্নীতি—

মহাযুদ্ধের সময় সামরিক উইমেন্স (মহিলা) অকজিলিয়ারী কোরে বহু ভারতীয় মহিলাকে চাকরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একশত জন মহিলা সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পত্রের নকল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের ও বৃটীশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পত্রে জাতিগত বৈষম্য, অযোগ্যতা ও নির্লজ্জ দুর্নীতির অনেক বিবরণ আছে। বাসস্থান, আহার ও পরিচর্য্যার ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। গভর্ণমেণ্ট এখন ঐ নারী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবেন। চাকরী কালে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় সৈন্যদলের শতকরা ৫০ জনের পক্ষে এখন গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। এখন এই সকল নির্য্যাতীত মহিলাকে পরবর্ত্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও তাহাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য সকলের চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন।

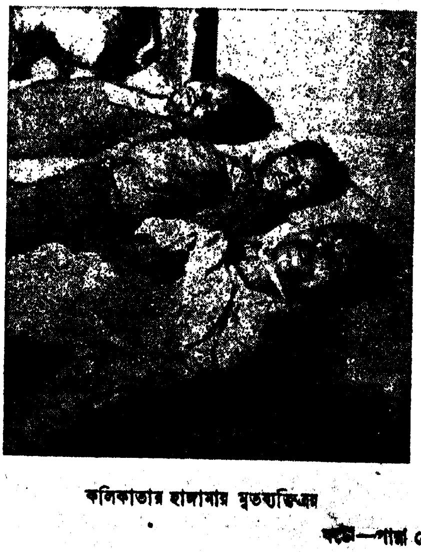

কলিকাতার হাঙ্গামায় মৃতব্যক্তিগণ
ফটো—পান্না সেন

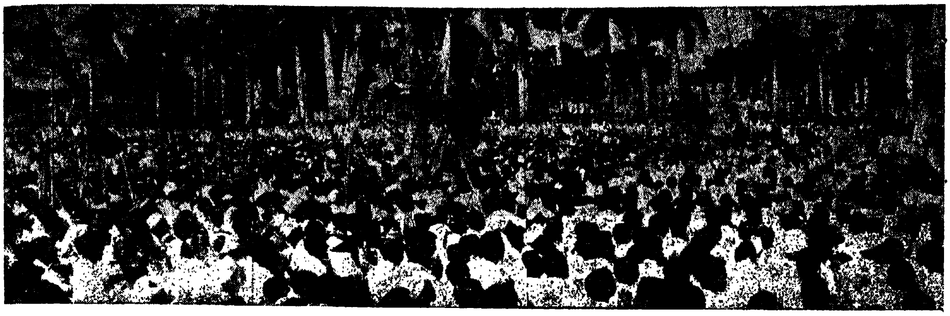

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সর্ব্বদলীয় জনগণের সমাবেশ ফটো—পান্না সেন

মিঃ জিন্নার সুবুদ্ধি—

এতদিন পরে মিঃ জিন্নার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে বড়লাটকে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে কাপ্টেন আবদার রসিদের দণ্ড মঞ্জুর করা হউক ও আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের বিচার বন্ধ করা হউক। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহা যে বুঝিয়াছেন তাহাও ভাল কথা।

প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে জন্য এখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য লইয়া ঐ পুস্তিকার কথা কতটা সত্য সে সম্বন্ধে তদন্তের দাবী করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ তদন্তে অসম্মত হইয়াছেন। ঐ পুস্তিকায় যে মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক সংগৃহীত আগষ্ট হাঙ্গামার বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে জনগণ কর্ত্তৃক ট্রেণ অবরোধ ফটো—তারক দাস

বেসরকারী তদন্তে অসম্মতি—

১৯২৫ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট আগষ্ট হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব শীর্ষক এক পুস্তিকা

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নেতার দণ্ড—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্যতম নেতা ক্যাপ্টেন বারহান-উদ্দীন সামরিক আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন প্রাণদণ্ডের

আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; জঙ্গীলাট তাহা কমাইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তাঁহার প্রাপ্য সকল টাকা বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়াছেন। সুবেদার সিঙ্গারা সিং ও জমাদার ফতে সিংএর বিচারও শেষ হইয়াছে—তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যখন প্রথম তিনজন আজাদ-হিন্দ নেতা বিচারের পর মুক্তিলাভ করেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল যে বিচারে অপর সকলেও মুক্তিলাভ করিবেন—কিন্তু সে আশা বিফল হইল, দেখা যাইতেছে।

চাউল রপ্তানীর হিসাব—

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব মিঃ বি-আর সেন এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাসে সিংহলে প্রেরিত ৪২৩০২ টন সহ মোট ৪২৮৬০ টন চাউল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। উহার উত্তরে কলিকাতা মাড়োয়ারী বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত এম-এন-খেমকা জানাইয়াছেন যে ১৯৪৫ সালের মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে শুধু কলিকাতা বন্দর হইতে ৬১৭৯৭ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে

হাঙ্গামার সময় এস্প্লানেডে একটি লরীর প্রজ্বলিত অবস্থা ফটো—তারক দাস

—তাহার মূল্য ২৪৬৯৮৪৬৭ টাকা। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে কলম্বোতে ১১ টন চাল রপ্তানী হইয়াছে। এই উভয় হিসাবে এত পার্থক্যের কারণ বুঝা যায় না। কাহার হিসাব সত্য, ভারত গভর্ণমেণ্টের তাহা প্রকাশ করা উচিত।

লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে—

গত জানুয়ারী মাসে বৃটীশ পার্লামেণ্ট ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সরজমীনে তদন্ত করিবার জন্য ভারতে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন অধ্যাপক রিচার্ডস্ সেই দলের নেতা ছিলেন। তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছেন—"আমাদের এখনই ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত। আমরা যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমাদের লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং—

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি পাঞ্জাবের খ্যাতনামা নেতা সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশেরকে গত ১৯৪২ সালের ৯ই মার্চ্চ গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা

হইয়াছিল। তিনি গত ২২শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের সহকর্ম্মী বলিয়া জেলে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করার ভয় পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছিল।

বড়লাট ও খাদ্য-সমস্যা—

ভারতের আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বড়লাট দেশনেতাদের সহিতও আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী পুনায় যাইয়া মহাত্মা গান্ধীকে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রস্তাব জানাইয়া আসিয়াছেন। খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা মিঃ আফল আলি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আবুলকালাম আজাদও বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বড়লাট বা বৃটীশ সরকার তাহাতে সম্মত হইলে দেশ হয়ত রক্ষা পাইবে। গান্ধীজি বড়লাটের শাসন পরিষদ নূতন করিয়া গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ঐ ভাবে দেশবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন করা না হইলে সরকার পক্ষের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে বলিয়া মনে হয় না।

হাঙ্গামার সময় বড়বাজারের উপর দিয়া একদল ফৌজের মার্চ্চ করিয়া গমন ফটো—তারক দাস

পাঞ্জাবে নির্ব্বাচনের ফল—

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ—মুসলীম লীগ—৭৫, কংগ্রেস—৫১, আকালী শিখ—২২, ইউনিয়নিষ্ট—২০ মোট ১৭৫ জন। এখন কংগ্রেস আকালী ইউনিয়নিষ্ট দল মিলিত হইয়া সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছেন ও মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেস—২ ইউনিয়ানিষ্ট—৩ ও আকালী—১—৬ জন মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন।

ভারতীয় সমস্যার আপোষ চেষ্টা—

ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও দেশীয় রাজ্য সমস্যার সমাধানের উপায় স্থির করিবার জন্য মহামান্য আগা খাঁ ও ভারতের নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব গত ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুনায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রতিদিন গান্ধীজি ২ ঘণ্টা করিয়া এ বিষয়ে কথা বলিয়াছেন। মহামান্য আগা খাঁ ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। তাঁহার চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক, সকলেই ইহা কামনা করিবে।

গান্ধীজি ও রাজাজী—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত সি-রাজা গোপালাচারী মহাত্মা গান্ধীর বৈবাহিক। মাদ্রাজে বর্ত্তমান

ব্যবস্থাপরিষদ সদস্য নির্ব্বাচনে একদল কংগ্রেসকর্ম্মী রাজাজীর নির্ব্বাচন পছন্দ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল। গান্ধীজি মাদ্রাজে যাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করায় অবস্থা আরও জটিল হয়। এখন সে জন্য রাজাজীকে মাদ্রাজের নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে সরিয়া যাইতে হইয়াছে ও গান্ধীজি শেষ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হাঙ্গামার সময় চিত্তরঞ্জন এভেনিউ—গিরীশ পার্কের নিকট ডাষ্টবিন ও অবর্জ্জনার দ্বারা রাস্তা আটক ফটো—তারক দাস

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা—

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের সম্বন্ধে সে দেশের গভর্ণমেণ্ট অন্যায় আইনের ব্যবস্থা করায় তাহার প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয় হাই-কমিশনারকে ফিরাইয়া আনিয়া অর্থনীতির দিক দিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে—ভারত গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের সদস্য ডক্টর এন-বি-খারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত বিদেশে ভারতীয়গণকে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে—আমরা তাহার প্রতিকারের কোন কঠোর ব্যবস্থাই করিতে পারিব না। ডক্টর খারে এক সময়ে কংগ্রেস নেতা ছিলেন—দেখা যাউক ভারতগভর্ণমেণ্টের উপর জোর দিয়া এ বিষয়ে কি করিতে পারেন।

ডাক ও তার বিভাগে ধর্ম্মঘট—

নিখিল ভারত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মীসংঘ সমিতি কর্ত্তৃপক্ষকে নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের দাবী পূর্ণ করা না হইলে আগামী ২৪শে মার্চ্চ হইতে তাঁহারা সকলে একযোগে ধর্ম্মঘট করিবেন। যে সকল সংঘ পূর্ব্বেই ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া নোটীশ দিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে যদি কর্ত্তৃপক্ষ দাবী পূরণের ব্যবস্থা না করেন, তবে দেশের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াই আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

কলিকাতার এক সভায় ক্যাপ্টেন শা নওয়াজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও শা নওয়াজ কর্ত্তৃক প্রত্যভিনন্দন ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ—

মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রে একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। আমরা দেশবাসীর চিন্তার জন্য একথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—"আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মোহনী শক্তি আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। নেতাজীর নাম যাদুমন্ত্রবৎ কার্য্য করে। তাঁহার দেশ-প্রেমের তুলনা নাই। তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে বীরত্ব উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্য অতি উচ্চ ছিল। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। আমি জানি যে তাঁহার কার্য্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। নেতাজী ও তাঁহার সেনাবাহিনী আমাদিগকে আত্মত্যাগ, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ঐক্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সদগুণত্রয় নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ করিব—কিন্তু ঐরূপ নিষ্ঠার সহিতই আমাদিগকে হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে। বিদ্বেষে সকলের মন ভরপুর। ধৈর্য্যহীন স্বদেশ-প্রেমিকরা সুবিধা পাইলেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে সাদরে হিংস

উপায়ের সুযোগ গ্রহণ করিবে। আমার মনে হয়, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এই পথ ভ্রান্ত। কিন্তু যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধৃবৃন্দ সত্য ও অহিংসাকে তাহাদের নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর ভ্রান্তিজনক ও অশোভন।"

মিসেস্ নিকোল্ দেড়শত বৎসরব্যাপী বৃটীশ শাসনের পরও ভারতের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া শাসকগণের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ব্রহ্ম ও মালয়ে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা—

ভারতগভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম ও মালয়ে ভারতবাসীদের অবস্থার

কলিকাতার ব্লাডব্যাঙ্কে পণ্ডিত জহরলালের রক্তদান
ফটো—পান্না সেন

পার্লামেণ্ট প্রতিনিধিদের অভিমত—

বৃটীশ পার্লামেণ্ট যে প্রতিনিধি দলকে ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। মিঃ নিকোলসন বলিয়াছেন—ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা সঙ্গত হইবে না। মেজর ওয়াট বলেন—ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের কোন অর্থ হয় না—কারণ জাতিগত সাম্য না থাকিলে উপনিবেশ করা চলে না। মিঃ সোরেনসেন বলেন—ভারতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করা চলিবে না—কারণ এখানে খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শী, মুসলমান ও হিন্দু সকল জাতিই বাস করে। মিঃ রিচার্ডস্ বলেন—আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না—আমরা বিলাতে যে বিবরণ দাখিল করিব, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভা তাহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিবে।

কথা জানিবার জন্য যে বেসরকারী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীযুত পি-কোদণ্ড রাও তাহাদের একজন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—মালয়ে ভারতবাসীদের ভাত, কাপড় বা চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই নাই। ব্রহ্ম-শ্যাম রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া যে সকল ভারতীয় শ্রমিক শ্যামদেশে মারা গিয়াছে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদির দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত।—ইহার পরও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে ঐ দেশে যাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হয় না—ইহাই আশ্চর্য্য।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা অধিক হওয়ায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলুইকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া আসামে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ছাড়া নিম্নলিখিত ৬ জন মন্ত্রীনিযুক্ত হইয়াছেন—(১) বসন্তকুমার দাস (২) বিষ্ণুরাম মেধী (৩)

বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) রেভারেণ্ড নিকলাস রায় (৫) রামনাথ দাস ও (৬) মিয়াদলব মতলিব মজুমদার। একজন আদিবাসী ও এক জন মুসলমানকে শীঘ্রই পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইবে।

গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আহ্বান করিব। গভর্ণমেণ্ট যেন সে জন্য এখন হইতে সাবধান থাকেন।"—মানুষ কিরূপ নিরুপায় হইলে এরূপ কথা বলিতে পারে, তাহা বুঝিবার শক্তি কি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আছে?

চট্টগ্রামবাসীদের মর্ম্মন্তুদ অবস্থা
ফটো—পান্না সেন

চট্টগ্রামের একটি গৃহের ভস্মাবশিষ্ট তৈজসপত্র
ফটো—পান্না সেন

জনগণকে বিদ্রোহে আহ্বান—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন "যদি ভারতের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা খারাপ হয় ও তাহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। জনগণ সরকারী অব্যবস্থা সহ্য করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিবে না। আমিই জনগণকে

বালেশ্বর জেলায় আগষ্ট হাঙ্গামা—

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের ফলে ৪২ জন লোক নিহত ও ২৪৫ জন আহত হইয়াছিল। দুইটি ছোট থানায় মোট ৩ শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উহার ঠিক পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলায় জাপানী আক্রমণের ভয়ে সাইকেল, ফেরীবোট ও অন্যান্য

যানবাহন হস্তগত করা হয়, ছোট পুলগুলি ধ্বংস করা হয় ও সমুদ্রোপকূলের ২০ মাইলের মধ্যে যে চাল ছিল তাহা সরাইয়া লওয়া হয়। ঐ সময়ে বালেশ্বরে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ; তিনি এক রাত্রিতে বিবাহ বাড়ীর বাজীর শব্দকে বোমা-পতনের শব্দ মনে করিয়া ধুতি পরিয়া গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষের এরূপ অবস্থাই আগষ্ট আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা—

ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন অনুসারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ পৈতৃক বাসভবন শীঘ্রই নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির হাতে দেওয়া হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ কেসী স্মৃতি রক্ষা সমিতিকে আবশ্যক মত সাহায্য করিয়াছেন। সমিতি এপর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

চট্টগ্রামবাসীদের গৃহের শোচনীয় অবস্থা
ফটো—পান্না সেন

ভারতে তিন জন মন্ত্রী প্রেরণ—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে ঘোষণা করা হইয়াছে, ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য বৃটীশ মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ৩ জন মন্ত্রীকে শীঘ্রই ভারতে প্রেরণ করিবেন—(১) ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স (২) বাণিজ্য পরিষদের সভাপতি সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (৩) নৌসচিব মিঃ আগষ্ট আলেকজাণ্ডার। মার্চ্চমাসের শেষ ভাগে মন্ত্রীরা ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে এ বিষয়ে বড়লাট ও ভারত সচিব যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মন্ত্রীত্রয় তাহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা বড়লাটের শাসন-পরিষদ নূতন করিয়া গঠন করিবেন ও নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠন করিবেন। দেখা যাউক, কতদূর কি হয়।

সিন্ধুপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিন্ধুপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা—৬০—তন্মধ্যে ৩৫ মুসলমান। মুসলেমলীগ দলের নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা—২৭ জন। বাকী ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন জাতীয়তাবাদী ও ৪ জন মিঃ সৈয়দের দলভুক্ত। ৩ জন শ্বেতাঙ্গ, বাকী ২১ জন হিন্দু ও ১ জন শ্রমিক। গভর্ণর বে-আইনি ভাবে শ্বেতাঙ্গদিগকে লীগ দলের সহিত মিলিত করিয়া লীগনেতা দ্বারাই মন্ত্রিসভা গঠন করাইয়াছেন—নিম্নলিখিত ৪ জন মন্ত্রী হইয়াছেন—(১) সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা—প্রধান মন্ত্রী (২) খাঁ বাহাদুর এম-এ-খুরো (৩) মীর গোলাম আলি খাঁ তালপুর ও (৪) পীর এলাহি বকস্। কংগ্রেস ৮

জন মুসলমান ও ১ জন শ্রমিককে লইয়া ৩০ জনে সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছিল—গভর্ণর শ্বেতাঙ্গদিগকে সে দলে যোগদান করিতে বলিলে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারিত। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী করা সম্ভব হইবে না। ঐ দলের একজন সভাপতি হইলেই ঐ দলের সদস্যসংখ্যা ২০ ও বিরুদ্ধ দলের সদস্যসংখ্যা ৩০ হইবে। সভাপতির নিরপেক্ষ থাকা উচিত—কিন্তু এখন সর্ব্বদা তাঁহাকে নিজের ১টি ভোট ও সভাপতির অতিরিক্ত ভোট প্রদান করিয়া মন্ত্রিসভাকে বাঁচাইতে হইবে। গভর্ণর এইভাবে সিন্ধুদেশে বেআইনি কার্য্য করিয়া যে লীগ-প্রীতি দেখাইলেন, তাহাই এদেশে ভারত শাসন ব্যাপারে—বিবাদ বাধাইবার নীতি কি না কে জানে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—

শ্রীমান উষানাথ চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর-অফ-সায়েন্স উপাধি লাভ

শ্রীমান উষানাথ চট্টোপাধ্যায়

করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর-অফ-ফিলজফি ডিগ্রিও পাইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একমাত্র তিনি এই দুইটি ডিগ্রিই পাইলেন। উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। তাঁহার গবেষণা এ দেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তিনি এক্ষণে নিউ দিল্লীস্থিত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির অন্যতম সম্পাদক। শ্রীমান উষানাথ এলাহাবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

প্রধান মন্ত্রী ইউ-স—

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইউ-স রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করায় জাতীয়তাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পার্ল হারবারের পতনের সময় ইউ-স ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে জাপানীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া উগাণ্ডায় আটক করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে একটি কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিবার নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দিতে পারে, তবে বৃটেনই বা ব্রহ্ম সম্পর্কে তাহা করিয়া দিবে না কেন ?

পরলোকে অনাথগোপাল সেন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কাসিমবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী অনাথগোপাল সেন মহাশয় গত ১লা পৌষ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ অষ্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন ও প্রথম জীবনে মৈমনসিংহে ওকালতী করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ

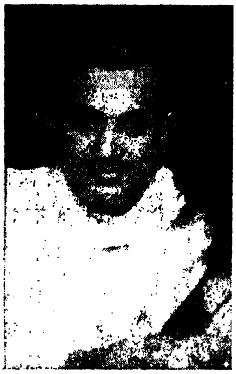

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

ও পুস্তক লিখিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন ও তাঁহার 'টাকার কথা' 'যুদ্ধের দক্ষিণা' 'গান্ধীজির অর্থনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিল।

শিশুশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ দিন শিশু সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতা কর্পোরেশন কমার্সিয়াল

মিউজিয়াম হলে একটি শিশুশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ও পরিষদ-সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চেষ্টায় উহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। মফঃস্বলে সর্ব্বত্র এইরূপ শিক্ষা-প্রচারক প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে তারিণীচরণ লাহা—

কলিকাতার সুবিখ্যাত লাহা পরিবারের তারিণীচরণ লাহা গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৩৭নং

তারিণীচরণ লাহা

বাদুড় বাগান রোস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার কাদবা গ্রামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা বিভাগে ২৫ হাজার টাকা দান করেন। তিনি তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্য পল্লীতে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

ঢাকুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম—

বেলুড় মঠের স্বামী নির্লেপানন্দজীর চেষ্টায় কলিকাতার উপকণ্ঠে ঢাকুরিয়া গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয়, দরিদ্রভাণ্ডার ও সাধারণ পাঠাগার আছে। ঐ সঙ্গে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কুটীর শিল্প শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে। সে জন্য পরিচালকগণ সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

হুগলী জেলার উত্তরপাড়া হরিভবনে হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে সম্প্রতি উক্ত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছে। নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় সভায় পৌরহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুমথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীযুক্ত বিমল দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীধন চট্টোপাধ্যা প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বিচারকের কার্য্য করেন। সভারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যা সুস্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিচারকগণে বিচারে কুমারী উমা মুখার্জ্জি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগ বিবেচিত হন এবং রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেন প্রদ স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বিভি বিভাগে প্রথম হইতে তৃতীয় স্থানাধিকারীকে রৌপ্য সম্পূ পদক, মানপত্র এবং পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হয়।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দান—

খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা মহাশয় (১৭নং হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাত যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁহার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী স্মৃতিরক্ষাকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সতী দেবী চিত্তরঞ্জ সেবাসদনে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদে দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

পরলোকে অমরেন্দ্রনাথ—

সুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি এল সম্প্রতি ৪৩ বৎসর বয়সে টাইফয়েডে প্রাণত্যা করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের এম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন এবং বি-এল প করিয়া সরকারী হিসাব বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাসিক পত্রে তিনি গল্প লিখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুলী গ্রহচক্র, শোণিতাঞ্জলি, পারুল ইত্যাদি কয়েকখা উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুখচরে রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা সুখচরে স্থানীয় বিভিন্ন সংঘের উদ্যোগে এক বৃহৎ জনসভায় সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী অধ্যাপক শ্রীযুত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়কে

শুকচরে রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা

ম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল য়ারম্যান শ্রীযুত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথম্—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ঝান্সীর রাণী সৈন্যদলের অধ্যক্ষা নারী লক্ষ্মী স্বামীনাথম্‌কে বিমানযোগে রেঙ্গুন হইতে লিকাতায় আনিয়া গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার বিকালে মুক্তি ওয়া হইয়াছে। তিনি দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে সংবাদ য়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাটীতে একরাত্রি বাস রেন ও পরদিন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাতের দ্বিপ্রহরে বিমানযোগে দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন। সাধারণ বা সংবাদপত্রগুলিকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় ই—কাজেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার কোন ব্যবস্থাও হয় নাই।

কলিকাতায় হাঙ্গামা—

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা হইতে ১৫ই শুক্রবার পর্য্যন্ত এবং পুনরায় গত ২১, ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের শোভাযাত্রা প্রভৃতি লইয়া কলিকাতায় হাঙ্গামা ও পুলিসের গুলীবর্ষণ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন ট্রাম বাস প্রভৃতি এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল। বহু নিরীহ লোক গুলীতে হতাহত হইয়াছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বি-এ রেলের কর্ম্মীরা হরতাল করায় উক্ত রেলের ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল।

শ্রীযুত মাণিক ভট্টাচার্য্য সম্বর্দ্ধনা—

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে শ্রীযুত সুধাংশু কুমার রায় চৌধুরীর আহ্বানে ৩৩।১ মদন মিত্র লেনে এক সভায় খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুত মাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। মাণিক বাবু গয়া জেলার ঔরঙ্গাবাদে প্রধান

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনায় সমবেত সুধীবৃন্দ

ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

শিক্ষকের কার্য্য করেন—কয় দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কবি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুত সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মাণিক বাবুর রচিত গ্রন্থ সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরে ভারতমাতার পূজা—

গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে তিনদিন শান্তিপুরে (নদীয়া) যুবকগণের উদ্যোগে ভারতমাতার পূজা হইয়াছিল। পূজার

শান্তিপুরে ভারতমাতার পূজা ফটো—কামাক্ষ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পর চতুর্থ দিনে প্রতিমা লইয়া বিরাট মিছিল বাহির হয়। ভারতের স্বাধীনতা কামনা করিয়া দেবীর অর্চ্চনা এই নূতন। শান্তিপুর দত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য এ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

ইনষ্টিটিউট অফ আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী—

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যসংক্রান্ত পণ্যসম্ভারকে চারুশিল্পের সাহায্যে জনসাধারণের সহিত পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত এই বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক অধিবেশন বাঙ্গালার গবর্ণর-পত্নী মিসেস কেসীর নেতৃত্বে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত থাকিলে চলিবে না—এমনভাবে সেগুলিকে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে সুকৌশলে সততার ভিত্তিতে মনোজ্ঞ চিত্রকলাদির সাহায্যে প্রতি দ্রব্যটির বিশিষ্ট গুণ প্রকাশ করিয়া তোলা। এ সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদেরই গঠনমূলক উন্নত পরিকল্পনায় ব্যবহারিক বাণিজ্যশিল্পের সহিত প্রচারমূলক চারুশিল্পের এক মধুর সমন্বয় হইয়াছে।

গত হাঙ্গামায় বালিগঞ্জ ষ্টেশনে একখানি অগ্নিদগ্ধ ট্রেনের অবস্থা
ফটো—পান্না সেন

দক্ষিণ শ্রীপুর সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৮ই ও ৯ই পৌষ খুলনা জেলার উক্ত সম্মেলন কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের পৌরহিত্যে সমারোহে অনুষ্ঠি[ত] হইয়াছে। উভয় দিনই কলিকাতা ও জেলার বহু স্থা[ন] হইতে সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, শিক্ষাব্রতী ও কৃষি শিল্পানুরাগীদের সমাগম হইয়াছিল। সঙ্গীতসুধাকর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম্' এব[ং] 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গান দুইটি উভয় দিন গী[ত] হইবার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। বিশাল সভামণ্ডপে[র] চারিপার্শ্বে সুসজ্জিত হলের মধ্যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। কৃষিজাত কতকগুলি ফসল এবং শিল্পসংক্রান্ত নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বস্তু দর্শকগণের কৌতূহল ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। বিভিন্ন পল্লীর গৃহস্থ মহিলাদের শিল্প প্রতিযোগিতায় যোগদান এবং অনেকগুলি অনুন্নত শ্রেণী[র] মহিলার এ ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ বিশেষভা[বে] উল্লেখযোগ্য। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যা[য়] মহাশয় পল্লী মহিলাদের শিল্পপ্রীতি ও তাহাতে কৃতিত্বে[র] ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাহিত্য সম্মেলনেও 'রচ[না]

প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনা সর্বাধিক প্রশংসা পায়। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে সরস প্রবন্ধ পাঠ ও উদ্বোধনী বক্তৃতার পর স্থানীয় শিক্ষাব্রতী নির্মলচন্দ্র বসু, দেবনাথ চক্রবর্ত্তী, অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিভাষিণী দেবী, সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অভিভাষণ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

জলন্ধরে বাঙ্গালীদের বাণীবন্দনা—

বিগত ২৩শে মাঘ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত ও শ্রীযুক্ত ধনগোপাল গাঙ্গুলীর পরিচালনায় পাঞ্জাব জলন্ধর প্রবাসী বাঙ্গালীদের বসন্তোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বাদল [illegible]র।

সন্ধ্যায় আরতি ও জলসার আয়োজন করা হইয়াছিল। নৃত্যশিল্পী [illegible]লিতকুমারের নৃত্য, প্রভাত [illegible]য়ের কমিক, সবিতা [illegible]গুপ্তা, বীণা দেবী ও অনন্ত [illegible]ড়ালের সঙ্গীত এবং মাখন [illegible]সের তার-সানাই অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল।

জলন্ধর প্রবাসী বাঙ্গালীদের বাণীবন্দনা

কিরণশশী সেবায়তন—

গত ১৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটের দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের পরিচালিত কিরণশশী সেবায়তনের নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন উৎসব ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পৌরহিত্যে সম্পাদিত হইয়াছে। বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পড়িবে তন্মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কাগজব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত এখন বাকী টাকা দিয়া বাড়ীটি করিয়া দিবেন—পরে ঋণ শোধ করা হইবে। যক্ষ্মারোগ নিবারণ ও তাহার চিকিৎসার জন্য এই সেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ঘোষণা করা হয় যে, কাঁকুড়গাছিতে আর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল তাঁহার পত্নীর নামে ১ বিঘা ১৬ কাঠা জমী ও নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন ও মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য করিবেন।

পরলোকে সুশীলচন্দ্র সেন—

কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই অপূর্ব্ব মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মজীবনেও তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে ও ভারত সরকারের সলিসিটাররূপে তাঁহার কার্য্য দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন এবং সহরের সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সুশীলচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে পরোপ-

কারী, সহৃদয় ও আচারনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মত কৃতী, উদীয়মান ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে দেশ প্রকৃতই লাভবান

সুশীল সেন

হইত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা জানি না। শ্রীভগবান তাঁহাদের মনে শান্তি দান করুন।

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতবর্ষের লেখক ও বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। সাংবাদিক মহলেও তিনি সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অধুনা সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদৃত হইয়া থাকে।

দিল্লীর বাণী বন্দনা—

নব-দিল্লীর মিণ্টো রোডস্থ ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ শ্রীযুক্ত অমিয়লাল দত্তের সুপরিচালনায় বাণী বন্দনার সহিত

নূতন দিল্লীর মিণ্টো রোড ব্যায়াম সমিতির বাণীপূজা

ব্যায়াম প্রদর্শনী ও খেলাধুলা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, খগেন মিত্র, নান্দু মিত্র, সত্য দাস, মণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ই মার্চ্চ হইতে নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে বঙ্গীয়

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রীরূপে কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গত পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা। তিনি শিক্ষাব্রতী—কাজেই তাঁহার নিয়োগে দেশবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ—

রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ বৎসরের জন্য ১লা মার্চ্চ হইতে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকুমার বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। খগেন্দ্রবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সম্মানিতঅধ্যাপক' পদ দান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট রাখারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়দারঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা তিনজনই লেখকরূপে 'ভারতবর্ষে'র সহিত সংশ্লিষ্ট।

ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়

কবি নবীনচন্দ্র শতবার্ষিক—

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে কয়দিন ধরিয়া বিপুল উৎসব হইয়া গিয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা যোগদান করেন। কলিকাতা সিনেট হলেও সার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠান হয়। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ এক বৎসর ধরিয়া সহরে ও সহরতলীতে নবীনচন্দ্র স্মৃতি-উৎসব করিবেন—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধী সোসাইটী হলে তাঁহাদের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে ঐ সভায় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র জাতীয়তার কবি—ভক্ত কবি—তাঁহার কাব্য যত অধিক আলোচিত হইবে, দেশ ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

রবীন্দ্র ভাণ্ডারে সাহায্য—

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে জব্বলপুরে রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রায় বাহাদুর পি-সি-বসুর সভাপতিত্বে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক নানাবিধ নৃত্য ও গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা হেনা হালদার ও শ্রীদুর্গাদাস বকসীর পরিচালনায় 'শাপমোচন', "পল্লীর মায়া ও যন্ত্রের ডাক" নৃত্যাভিনয় ও তৎসহ নানাবিধ প্রাচ্যনৃত্য ও

রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

জব্বলপুর রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি

'অর্কেষ্ট্রা' ও কুমারী সর্ব্বানী সিংহের ও কুমারী ছায়া দাশ-গুপ্তার রবীন্দ্র সঙ্গীত অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে ৭২৫৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

পরলোকে দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী—

পাবনার খ্যাতনামা উকীল দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে

দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী

এম-এ পাশ করিয়া তিনি মৈমনসিংহ সিটি কলিজিয়েট স্কুলে কিছুকাল প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে উকীল হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পাবনা জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর মধ্য দিয়া তিনি বহু বৎসর জনসেবা করিয়াছিলেন।

কুমারী চিত্রা সেনগুপ্ত—

কলিকাতা বৌবাজারের শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান গত ১০ বৎসর ধরিয়া পাড়ার মেয়েদের অন্যান্য খেলার সহিত

কুমারী চিত্রা সেনগুপ্ত

সাইকেল-চড়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কন্যা কুমারী চিত্রা ঐ প্রতিষ্ঠানের সাইকেল প্রতিযোগিতায় কয়েকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। টালা পার্কে সাইকেল প্রতিযোগিতায়ও চিত্রা চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

বাঁকুড়া কেন্দুয়াডিহি আশ্রম—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা বাঁকুড়া জেলার কেন্দুয়াডিহি গ্রামে সম্প্রতি এক নূতন হিন্দু-মিলন-মন্দির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে ধর্ম্মপ্রচার, জনসেবা, পার্ব্বত্যজাতিদের উন্নতি বিধান, উপজাতিগুলির সহিত হিন্দু সমাজের মিলন সাধন প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলিতে ঔষধ, পথ্য, দুগ্ধ ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইতেছে। চাউল বিতরণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু বাঁকুড়া জেলায় ৪০টি মিলন মন্দির ও ৪৫টি রক্ষীদলের মারফত কাজ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয়

'ইণ্ডিয়ান কেমিকেল ম্যানুফ্যাক্চারার্স' দলের প্রতিনিধিরূপে সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইয়া সে সকল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের

শ্রীযুক্ত এস-পি-সেন

বিশ্বাস, তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়—

সাহিত্যিক ও সঙ্গীত কুশলী শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়ের ৫০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৫শে মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা কালীঘাট 'কালিকা থিয়েটারে' শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া-গিয়াছে। দিলীপকুমারের পিতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার' সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হইয়াছিল। দিলীপকুমার নিজে উহা গান করেন। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র দিলীপের মুখে ঐ গান শুনিতে ভালবাসিতেন। দেশ-বাসীর পক্ষ হইতে দিলীপকুমারকে ২৩ হাজার টাকার একটি তোড়া দেওয়া হয়। শ্রীযুত নির্মলেন্দু লাহিড়ী কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতা ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক দিলীপকুমারের 'পরম প্রার্থনা' কবিতা আবৃত্তি হইয়াছিল। দিলীপকুমার সভায় ঘোষণা করেন যে তাঁহার বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন। অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা করার সময়ও দিলীপকুমার বার বার সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার ভাষণে বলেন—শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ যে দিলীপকুমারের উপর পড়িয়াছে তাহা দিলীপকুমারের বর্ত্তমান চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গালা বাঁচিয়া আছে। দিলীপকুমারের বাঙ্গালাও বাঁচিয়া থাকিবে। ঐ উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে লালগোলার রাজারাও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় যে ভাষণ দেন, তাহাতে বলেন—"কাব্যে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে দিলীপ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্বমানবতার দুয়ারে তার উদার উজ্জ্বল রূপ চির ভাস্বর হয়ে থাকবে—এ আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের কথা। মনোময় চিৎস্বরূপের সন্ধানী উদাসী দিলীপকে—শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণ তলে সমাসীন ধ্যান-গম্ভীর পূজারী দিলীপকে আমরা ভালবাসি। আপন সাধনায় তুমি যে অনন্ত আলোকের ইঙ্গিত পেয়েছ, তোমার স্নেহবন্দী, অনুরাগীজনকে তুমি সেই আলোর সন্ধান দাও।"

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

১৯৪৬-৪৭ সালের কেন্দ্রীয়-বাজেট

যুদ্ধের মধ্যে ভারতের অর্থব্যবস্থাকে সকল দিক হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতসরকার যুদ্ধের খরচ চালাইয়াছিলেন। এই সময় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিলেও ভারত-সরকারের কিন্তু এদিকে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। ভারতের স্থায় দরিদ্র দেশে যুদ্ধের দরুণ দৈনিক দেড় কোটি টাকা সংগ্রহের প্রশ্নই যে এই নিশ্চেষ্টতার মূল তাহা বলা বাহুল্য। তবে ভারতের আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কে ভারতসরকারের চিরাচরিত ঔদাসীন্যও ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেট বক্তৃতায় অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যান স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে,—'Post-war development must mean and continue to mean Post-war development and by no magic or optimism can be made to mean wartime development' এবং এইরূপ নিরুৎসাহজনক বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজেটে তিনি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপনের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যয়বরাদ্দ করেন নাই।

স্যার জেরেমীর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কাজেই স্যার আর্চিবল্ড এই বৎসরের বাজেটে যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থার সন্ধান না পাইলেও তাঁহাকে ১৯৪৫-৪৬ সালের আর্থিক বৎসরের ৭ মাস যুদ্ধোত্তর সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গত ছয় মাস যা হোক করিয়া জোড়াতালি দিয়া চলিয়াছে; এবার নূতন বাজেট প্রস্তুত করিতে বসিয়া স্যার আর্চিবল্ডকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি যুদ্ধোত্তর সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে হইয়াছে।

অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক বাজেট পেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটও পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রাথমিক বাজেট পেশ করিবার সময় আয় ধরা হইয়াছিল ৩৫৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৫১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, সুতরাং ১৬৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিবে অনুমান করা হইয়াছিল। বাজেট বৎসর সুরু হইবার মাত্র ৫মাস পরেই যুদ্ধ শেষ হয়, সুতরাং এই বৎসর অনুমিত খরচ অপেক্ষা অনেক কম খরচ হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে দেখা যায়, প্রাথমিক বাজেটে অনুমিত ৩৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার স্থানে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৭৬ কোটি টাকার মত সামরিক বিভাগের জন্য খরচ অনুমান করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাত মাস যুদ্ধ চালাইতে না হওয়া সত্ত্বেও এই শতকরা মাত্র ৫ভাগ ব্যয় হ্রাস কর্তৃপক্ষের দিক হইতে খুব কৃতিত্বের কথা নয়। সংশোধিত বাজেটে এবৎসরের ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। অর্থসদস্য ১৯৪৬-৪৭ সালের যে প্রাথমিক বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩০৭ কোটি টাকা ও ৩৫৫ কোটি টাকা অনুমান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর ৪৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এবারের ব্যয়ের মধ্যে ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সামরিক বিভাগের ব্যয় ধরা হইয়াছে। আমরা যতদুর জানি, ভারতসরকার চলতি-আর্থিক বৎসরের মধ্যেই অস্থায়ী লোকজনদের অধিকাংশকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ব্যয়ভার হ্রাস করিতে দৃঢ়সংকল্প, এ অবস্থায় সামরিক খাতে ব্যয়ভার এত বেশী করিয়া ধরা হইল কেন? যুদ্ধের আগে ভারতের সামরিক বিভাগের ব্যয় ছিল গড়ে ৪৬ কোটি টাকা, এই ব্যয়কেই অনেকে বাহুল্য মনে করিতেন; এবার যুদ্ধ থামিবার এক বৎসর পরে যুদ্ধের আগের তুলনায় ৬গুণ টাকা সামরিক বিভাগের জন্য বরাদ্দ করার সঙ্গত কারণ কি? ভারতের দুরবস্থা সর্ব্বজনবিদিত, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে ভারতবর্ষ নিঃস্ব এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভারতের স্কন্ধ হইতে সামরিক ব্যয়ের এই পর্ব্বত অন্ততঃ আরও কতকটা অপসারণ করা ভারতসরকারের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। তাছাড়া আমাদের মনে হয় সামরিক বিভাগের প্রতি এই অবাঞ্ছিত সরকারী অতি-দৃষ্টি ভারতের অসামরিক স্বার্থ বহলাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যুদ্ধাবসানে জাতীয় পুনর্গঠনের বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে এদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে সরকার মোটেই নজর দেন নাই, এই সকল বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ এখন অত্যাবশ্যক। এ অবস্থায় ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয়বরাদ্দ করিয়া মাত্র ১১১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অসামরিক ব্যয়বরাদ্দ করা সঙ্গত হইয়াছে কি?

পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যানের স্যায় স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্‌ও ঋণসংগ্রহ করিয়াই বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতের সাধারণ বাজারের উপর হইতে ফাঁপাই টাকার জুলুম বন্ধ করিতে মুদ্রাসঙ্কোচের বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং সে হিসাবে অর্থসদস্যের এই ঋণপত্র বিক্রয়নীতি কতকটা ফলপ্রদ হইবে বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহার আর একটি দিক আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া হইতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারত-সরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন ১১৭৮ কোটি টাকার। এই ঋণের উপর সুদ হিসাবে কয়েক কোটি টাকা প্রতি বৎসর অবশ্যই দিতে হইবে। ইহার উপর নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিলে সরকারকে নূতন আর্থিক

দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে পুনর্গঠনের পক্ষে এই দায়িত্ব অবশ্যই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। সেদিক হইতে ভারতে সরকারী ঋণবৃদ্ধির পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট অস্বস্তিকর বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস বর্ত্তমানে এম্পায়ার ডলার পুলে ভারতের অংশ গ্রহণের নীতি চালু রাখিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, এই পুলের কল্যাণে সাম্রাজ্যিক দেশগুলির উদ্বৃত্ত ডলার সম্পদ স্বদেশের কাজে লাগাইয়া ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে মার্কিন পণ্যে বঞ্চিত হইয়া ভারতাদি দেশ যুদ্ধের মধ্যে বহু দুঃখভোগ করিয়াছে। এই ডলার পুল অন্ততঃ ভারতের দিক হইতে কল্যাণকর নহে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অর্থসদস্য বলিয়াছেন, এবার ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যন্ত্রপাতি ষ্টার্লিং এলাকার বাহির হইতে কিনিবার জন্য ২ কোটি ডলার বা ৬ কোটির কিছু বেশী টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের পুনর্গঠনের পক্ষে মার্কিন যন্ত্রাদির প্রয়োজন এখন অসামান্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী ক্ষমতাও প্রচুর, সুতরাং এখন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্র আমদানীর জন্য মাত্র ৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ ডলার বরাদ্দ আমরা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।

অর্থসদস্য তাঁহার এবারের বাজেট বক্তৃতায় ১৯৪৬-৪৭ সালের যুদ্ধকালীন কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার কথা বলিয়াছেন। ভারতের সরকারী বিভাগে দুর্নীতির অন্ত নাই, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদিও কল্যাণকর হয় তথাপি তদ্দ্বারা দেশবাসী আশানুরূপ উপকৃত হয় নাই। বিশেষ করিয়া শিল্পসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণাদি ভারতের যুদ্ধকালীন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার উপর জোর দেওয়া অর্থসদস্যের খুব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অর্থসদস্য বলিয়াছেন, পুনর্গঠন কার্য্যে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসর প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবেন এবং কেন্দ্রীয়-সরকার-স্বয়ং রেল উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য তিনি একটি ন্যাশনাল ইনভেষ্টমেণ্ট বোর্ড বা জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সকল পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং মূল্য অসাধারণ। কিন্তু ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে ভারতসরকারের মনোভাব আমাদের অজ্ঞাত নহে বলিয়াই এসব আশ্বাসবাণীর উপর আস্থা স্থাপন করা আমাদের পক্ষে সত্যই কঠিন। কথা অনুসারে লোকদেখানোভাবে কাজ আরম্ভ হইলেও কর্তৃপক্ষীয় চক্রান্তে তদ্দ্বারা শেষ অবধি ভারতবাসীর সত্যকার মঙ্গল কতটা হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

এবারের বাজেটে অর্থসদস্য অতিরিক্ত মুনাফাকর বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং আয়করের নিম্নস্তরের করের হার সামান্য হ্রাস করিয়াছেন। এই কর হ্রাসের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালের স্থলে ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত-সরকারের ৭০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় কম হইবে। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত আয়কর একান্তভাবে যুদ্ধকালীন কর এবং এখন ইহা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত আয়কর তলার দিকে কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় মধ্যবিত্ত দেশবাসীর উপর চাপ কতকটা কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতসরকার শিল্প সম্পর্কিত উদারনীতি গ্রহণ করিলে অতিরিক্ত মুনাফা কর বাতিলের ফলে ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের আরও সুযোগ আসিত, কিন্তু এদিক হইতে তাঁহারা আগ্রহশীল না হওয়ায় অতিরিক্ত মুনাফাকর বাতিল হওয়ার জন্য উদ্বৃত্ত টাকা শিল্পপতিগণ সামান্য সুদে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে বা সরকারী ঋণপত্রে খাটাইতে বাধ্য হইবেন। যুদ্ধ শেষ হইলেও আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থা এখনও যুদ্ধের সময়ের মতই চলিতেছে, এখনও এদেশে শিল্প সংগঠনের সুযোগ আছে যথেষ্ট; আমাদের মনে হয় ভারতসরকার এ বিষয়ে অবহিত হইলে আসন্ন বেকার সমস্যার মুখে তাঁহারা ভারতের বহু কল্যাণ করিতে পারিতেন।

অর্থসদস্য এ বৎসর সাধারণের ব্যবহার্য্য কয়েকটি জিনিষের উপর নির্দ্ধারিত করের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। পেট্রোলের উপর গ্যালন পিছু ১৫ আনা হইতে ১২ আনা ডিউটি বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রতি গ্যালন কেরোসিনের উপর সাড়ে চারি আনার স্থলে এ বৎসর ৩ আনা ৯ পাই হিসাবে ডিউটি বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। এই দুইখাতে গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ভারতসরকারের ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাইতে পারে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এ বৎসর আমদানী সুপারীর উপর ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া পাউণ্ড পিছু সাড়ে পাঁচ আনা করা হইবে। মোট কথা বাজেটে নানাবিধ কর হ্রাস বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যতঃ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সম্প্রদায় উপকৃত হইবেন, কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর তজ্জন্য বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। শিল্পাদি সম্প্রসারণের ব্যাপারে অর্থসদস্যের লক্ষণীয় ঔদাসীন্য আসন্ন বেকার সমস্যার চিন্তায় আকুল ভারতবর্ষের আশা ভঙ্গ করিয়াছে বলা চলে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে কলকারখানার জন্য আমদানী নূতন ও পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর এ বৎসর অপেক্ষাকৃত কম কর নির্দ্ধারিত হইবার কথা ঘোষণা কর হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বিবেচনায় এই নীতি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস জানাইয়াছেন যে, ভারতের করনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদির জন্য শীঘ্রই একটি কর-তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইবেন। বাজেটে যুদ্ধকালীন করহারের বিশেষ পরিবর্ত্তন না দেখিয়া যাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন, এই ঘোষণায় তাঁহাদের কতকটা আশ্বস্ত হওয়া স্বাভাবিক। তবে এ কথা ঠিক যে, ভারতের সরকারী কমিটি কমিশনের ইতিহাস যাহারা জানেন, তাঁহারা এই কমিটির পরামর্শ কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু কমিটি নিয়োগের প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ভারতের সমস্ত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনই ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ১৮ শত কোটি টাকার উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থসদস্য এই পাওনা আদায় সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় আমরা দুঃখিত

হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কথাবার্ত্তা চালাইবার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতেরই থাকিবে। এই স্বাধীনতার বাস্তবমূল্য বর্ত্তমান সময়ে সত্যই কতখানি সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। ভারতের সর্ব্বস্বত্যাগের বিনিময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত ১৮ শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনার একাংশ বাতিলের জন্য আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নানা জঘন্য চক্রান্ত চলিতেছে। এ সময়ে ভারতসরকারের অর্থসদস্য হিসাবে স্যার আর্চিবল্ড যদি সম্পূর্ণ পাওনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা সত্যই সুখী হইতাম।

মোটের উপর, যুদ্ধোত্তর বাজেট হিসাবে যতটা আশা করা হইয়াছিল ততটা অগ্রসর না হইলেও স্যার আর্চিবল্ডের ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক বাজেট আমাদের খুব বেশী হতাশ করে নাই। ভারতের আর্থিক স্বার্থ ভারতসরকার চিরকাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সে হিসাবে এবারের বাজেটে যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্পর্কে যে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিরতির পর প্রথম বৎসরের বাজেট রচনার অসুবিধা অনেক, কাজে কাজেই ১৯৩৮-৩৯ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটকে বিচার করিয়া লাভ নাই। স্যার আর্চিবল্ড নিজেই অনুমান করিয়াছেন যে, এই বাজেটই তাহার শেষ বাজেট; আমরাও আশা করি আগামী বৎসরের বাজেট ভারতের জাতীয় গভর্ণমেন্টের অর্থসদস্য রচনা করিবেন। সে হিসাবে এ বৎসরের বাজেটে বিদেশী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তজ্জন্য ভারতবাসীর আশাবাদী হইবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। (১. ৩. ৪৬)

ভারতসরকারের রেল বিভাগের বাজেট

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের যানবাহন সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ প্রাথমিক রেল বাজেট পেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ সালের চূড়ান্ত বাজেট এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটও উপস্থিত করা হইয়াছে। চিরাচরিত প্রথানুসারে স্যার এডওয়ার্ড এবারও বাজেট সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সরকারী কার্য্যে পরিষদ সদস্যদের সমর্থন আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের শুইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা হইতে ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী পর্য্যন্ত বহু আশার কথা শুনাইতে কসুর করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত রেলসদস্যের আশা পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার ফাঁকা বুলি শুনিয়া সদস্যগণ বিশেষ খুসি হন নাই। এবারের বাজেটের ত্রুটি বিচ্যুতি লইয়া জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবেই যথেষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্যার এডওয়ার্ড বেন্থলের এবারের বাজেট যুদ্ধোত্তর প্রথম বাজেট। যুদ্ধের মধ্যে যে সকল অভাব-অসুবিধা ঘটিয়াছিল, যুদ্ধবিরতির পর সেগুলি দূরীভূত হইবে, ভারতবাসীর দিক হইতে এরূপ আশা করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনের দোহাই দিয়া ভারতসরকার অসামরিক দেশবাসীকে যেরূপ চূড়ান্ত দুর্ভোগ সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন, এবারও তেমনি বিপুল আয় হ্রাসের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের সুখ-সুবিধা বিধানের প্রশ্নটি রেলসদস্য সযত্নে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্যার এডওয়ার্ড তাহার বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এদেশের রেলভাড়া অত্যন্ত সুলভ এবং তাহার পরই তিনি ভারতসরকারের অধীনস্থ সমস্ত রেলপথের ভাড়ার সমতা সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। ১৯৪০ সালের রেলভাড়া বৃদ্ধির পর হইতে এদেশের যাত্রীসাধারণের কিরূপ কষ্ট হইতেছে সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই, তবু শ্বেতাঙ্গ রেলসদস্য পরম ঔদাসীন্যের সহিত রেলভাড়া সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে এ বৎসর রেলভাড়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না।

রেলবিভাগের বাজেটে দেখা যায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট আয় হয় ২১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনার জন্য মোট ব্যয় হয় ১৪৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। মূলধন খাতের সুদের দরুণ ২৭ কোটি ৪৫ টাকা বাদে রেলবিভাগের যে ৪৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতে রেলওয়ে মজুত তহবিলে ১৭ কোটি ৮৯ টাকা এবং ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে ৩২ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর পরিষদে বাজেট উপস্থিত করিবার সময় রেলসদস্য অনুমান করেন, ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের আয় হইবে ২২০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাজেট পেশ হইবার ৫ মাসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সমরকালীন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটা স্বাভাবিক এবং সে হিসাবে রেলবিভাগের আয় কমিয়া যাওয়াও কতকটা স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃত পক্ষে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল দেশ যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে শান্তিকালীন অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে বলিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলবিভাগের ৪৮ কোটি আয় কমিবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ১৯৪৬-৪৭ সালে যাহাই হউক, যুদ্ধবিরতির জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতী রেলবিভাগের আয় কিছুই কমে নাই, বরং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাথমিক বাজেটে অনুমিত ২২০ কোটি টাকার স্থলে সংশোধিত বাজেটে এই বৎসর ২২৫ কোটি টাকা আয় ধরা হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রাথমিক বাজেটে এই বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে ১৭৭ কোটি টাকা ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে রেলবিভাগের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৬৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং সুদের দরুণ ২৭ কো ৩৬ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে ৩২ কোটি ৭ লা টাকা। রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের অধিকাংশই রেলযাত্রী ও রেলকর্ম্মীদে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত, কিন্তু ভারতসরকার রেলবিভাগে উদ্বৃত্তের একটি বৃহৎ অংশ নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করিয়া যাত্রী ও কর্ম্মীদে ন্যায্য-প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৯ কোটি ৮৯ ল টাকা উদ্বৃত্তের মধ্যে তবু ৩২ কোটি টাকা ভারতসরকারের তহবি গ্রহণ করার কতকটা যুক্তি ছিল, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে উদ্বৃত্ত ৩২ কে ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারতসরকারের ৩২ কোটি গ্রাস করিবার কি-

থাকিতে পারে? ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে রেলসদস্য ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে সাহায্য প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তন সাধনের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সরকারী বিভিন্ন রেলপথের হেফাজতে নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ১ ভাগ এবং রেলবিভাগের নিট লাভের অর্দ্ধেক ভারতসরকার পাইবেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থাও দেশবাসীর স্বার্থে সরকারের তহবিল বাড়াইবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে মাত্র ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে যাইবে। আশা করা হইয়াছে, এই বৎসর রেলবিভাগের মজুত তহবিলে দেওয়া যাইবে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। রেলবিভাগে যাহারা কাজ করেন তাঁহাদের সুখসুবিধা বিধানের জন্য রেলসদস্য এবার একটি বেটারমেণ্ট ফাণ্ড খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বাস্তবিক ঠিক কি ভাবে খরচ হইবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা না বলিয়াও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই ফাণ্ডে ১৯৪৬-৪৭ সালের উদ্বৃত্ত হইতে ৩ কোটি টাকা দেওয়া হইবে।

কর্ম্মচারীদের ও রেলপথের উন্নতির জন্য বেটারমেণ্ট ফাণ্ড খুলিবার কথা ছাড়াও যাত্রীদের সুখের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে, স্যার এডওয়ার্ড বাসে সম্বন্ধে এক ফিরিস্তি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী-গাড়ীতে প্রচুর জলের ব্যবস্থা ও এই দুই শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার, এমন কি ঘুমাইবার ব্যবস্থা করা। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অধিকতর সংখ্যক 'এয়ার কনডিশনড' গাড়ীর ব্যবস্থা করিবার কথাও রেলসদস্য বলিয়াছেন। ভারতে রেলইঞ্জিন ও ওয়াগন তৈয়ারী সম্বন্ধে পরিষদের জাতীয়তাবাদী সদস্যবৃন্দকে আশ্বাস দিতেও স্যার এডওয়ার্ড ভুলেন নাই।

অবশ্য আশ্বাসানুসারে কবে যে এই সব কল্যাণমূলক কার্য্যসূচী ফলবতী হইবে সে সম্বন্ধে রেলসদস্য তাঁহার উর্দ্ধতন মনিব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতই মৌনীভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তবে এ সব যে শীঘ্র হইবে না তাহা একরূপ স্পষ্ট, কারণ, স্যার এডওয়ার্ড তাঁহার বক্তৃতায় পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, এই সব ব্যবস্থা রাতারাতি করা যায় না। ভারতে ইঞ্জিন ও ওয়াগন নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান আমাদের বধির হইয়া গেল; এবারও রেলসদস্যের বক্তৃতায় এই সম্বন্ধে আশ্বাসবাণী শুনিয়াছি। অবশ্য অনেক কাঠ খড় পুড়িবার পর এখন হয়তো ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী হইতে পারে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিদেশে এত বেশী ইঞ্জিন ও ওয়াগনের অর্ডার দিয়া বসিয়া আছেন যে, অর্ডার মত মাল আসিলে সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত ভারতে তৈয়ারী ইঞ্জিনাদির প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকারই করা হইবে না। শ্বেতস্বার্থ পোষণের জন্য ভারতীয় স্বার্থহানির দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। ১৯৩৭ সালে রেলপথ সম্পর্কে তদন্ত করিতে বসিয়া ওয়েজউড কমিশন বলিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত রেলইঞ্জিন আছে। ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিবার ঠিক আগে রেলবিভাগের হাতে মোট ইঞ্জিন ও ওয়াগন ছিল যথাক্রমে ৯ হাজার ২৮৯খানি ও ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮০৫খানি। বর্ত্তমানে ব্রিটেন, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের অর্ডারী মাল আসিয়া পড়িলে ইঞ্জিন ও ওয়াগনের সংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৮ হাজার ৫৪১ ও ২ লক্ষ ৩৯ হাজার। এ অবস্থায় ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা চালু হইলেও ওয়াগন নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারিত হইলে তখন ওয়েজউড কমিশনের সুরে সুর মিলাইয়া কর্তৃপক্ষের দিক হইতে ভারতে ইঞ্জিন ও ওয়াগনের প্রাচুর্য্যের কথা বলা অস্বাভাবিক কি?

গত বৎসরের ভারতীয় রেলবাজেটে ভারতের জনস্বার্থ মোটেই রক্ষিত হয় নাই, তবু শ্বেতাঙ্গ রেলসদস্য এই বাজেটকে জোর করিয়া 'unorthodox' আখ্যা দিয়াছিলেন। এবারের বাজেটকেও যুদ্ধোত্তর বাজেট হিসাবে ভারতীয় স্বার্থসংরক্ষক বলা চলে না এবং ফাঁকা বুলিতে ভরিয়া এই বাজেটকে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ এবারের রেলবাজেটে খুসী হন নাই এবং নানাদিক হইতে জনস্বার্থ উপেক্ষাকারী এই বাজেটের কঠোর সমালোচনা করিয়া কিছু কিছু বরাদ্দ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদেও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রেলবিভাগের চীফ কমিশনার স্যার আর্থার গ্রিফিন রেলবাজেট পেশ করেন। বাজেটের প্রশংসাসূত্রে একজায়গায় স্যার আর্থার বিশেষ গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত সমর প্রচেষ্টায় ভারতীয় রেলবিভাগ নিজেদের সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে। কথাটির সার্থকতা আমরাও অস্বীকার করিতেছি না, তবে এই সর্ব্বস্ব নিয়োগের পশ্চাতে ভারতীয় জনস্বার্থ নিষ্করুণভাবে পদদলিত করিবার যে লজ্জাকর করুণ ইতিহাস আছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বাস্তবিক ভাবিয়া পাই না যে, এইজন্য মানুষ হিসাবে স্যার আর্থার গ্রিফিন কি করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন? ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরে বাংলার যে ৩৫ লক্ষ অসহায় হতভাগ্য নরনারী অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, ভারতীয় রেলবিভাগ কর্ত্তব্যপালনে অক্ষমতা না দেখাইলে ইহাদের কত লক্ষ বাঁচিতে পারিত তাহা কি স্যার আর্থার গ্রিফিন একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

ভারতীয় রেলপথে যাহারা পয়সা দিয়া কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার পায়, তাহাদের স্বার্থে নির্দ্দিষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে রেলসদস্য এবারের বাজেটে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এ ছাড়া যাহাদের কুশলতা ও নিষ্ঠার উপর রেলবিভাগের কার্য্যকারিতা নির্ভর করিতেছে, সেই রেলকর্ম্মচারীদের সম্বন্ধেও স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল এবারের বাজেট বক্তৃতায় লক্ষণীয় উদাসীন্য দেখাইয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন রেলবিভাগের ছাঁটাই বন্ধ না হইলে এবং কর্ম্মচারীদের বেতনের হার সংশোধিত না হইলে ধর্ম্মঘট করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশে রেল ধর্ম্মঘটের ফলে অনিবার্য্য বিপর্য্যয় অনুমান করা রেলসদস্যের পক্ষে কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না। রেলবিভাগের বিপুল বাজেট উদ্বৃত্তের হিসাবে ছাঁটাই বন্ধ বা বেতনের হার সংশোধন—কিছুই রেলসদস্যের পক্ষে কঠিন নহে। তবু স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বিষয়ের জটিলতার মামুলী দোহাই দিয়া বহু নিষ্ঠাবান রেলকর্ম্মীর জীবিকা ও সমগ্র দেশবাসীর চূড়ান্ত অসুবিধা সংক্রান্ত এই দাবীগুলি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে হয় যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলসদস্যের অনুমানের তুলনায় রেলবিভাগের আয় উল্লেখযোগ্যভাবেই বৃদ্ধি পাইবে। এ অবস্থায় সকল দিক বিচার করিয়া রেলসদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল যদি রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের দাবী সম্বন্ধে আশানুরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন তাহা হইলে শুধু দেশবাসীর উদ্বেগই কমিত না, কর্ম্মীদের কর্ম্মোৎসাহের ভিতর দিয়া এ বৎসরের রেলবিভাগের শ্রীবৃদ্ধিরও নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত। ১।৩।৪৬

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

সাউথ জোন ঃ ৩৬৯ ও ১৬৭

ওয়েষ্ট জোন ঃ ৩৩৪ ও ৯২

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের সাউথ জোন বনাম ওয়েষ্ট জোনের তিন দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল কিন্তু সাউথ জোন একাদশ প্রথম ইংনিসে অগ্রগামী থাকায় তারা ফাইনালে নর্থ জোনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার লাভ করেছে।

সাউথ জোনের প্রথম ইনিংসে বেশী রান করলেন এ-জি রামসিং নট আউট ১২৫, প্রফেসর ডি-বি দেওধর ৮৯, এস সোহোনী ৫১। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৫৮ রান করলেন প্রফেসর দেওধর।

ওয়েষ্ট জোনের প্রথম ইনিংসে বিনু মানকদ দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৬৮ রান করলেন। এ ছাড়া ইব্রাহিমের ৫৬, ডি ফাদকারের ৪৬ এবং ভি-এস-হাজারীর ৪৫ রান। উল্লেখযোগ্য।

অলইণ্ডিয়া অলিম্পিক গেম্‌স ঃ

১১শ অলইণ্ডিয়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বাঙ্গালোরে সুসম্পন্ন হয়েছে। এবারের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় পাতিয়ালার দল ৮৭ পয়েণ্ট ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে এবং স্যর দোরাবজি টাটা ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই দল ৪৬ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং পাঞ্জাব ৩২ পয়েণ্ট ক'রে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। বাঙ্গলা প্রদেশ পঞ্চম স্থান পেয়েছে মাত্র ১৬ পয়েণ্ট ক'রে। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় মহীশূর ৩৭ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থান পেয়েছে। বোম্বাই ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং বাঙ্গলা প্রদেশ ১৩ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী ২০,০০০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে মহীশূরের মহারাজা ১১শ ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাঙ্গালোরের সাম্পাঙ্গি ট্যাঙ্ক বেড়ে নতুন অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৮০০ শত এ্যাথলেট অনুষ্ঠানে যোগদান করে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাতিয়ালাদল পুরোভাগে অবস্থান করে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ৪টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। হামার থ্রো—সোমনাথ (পাতিয়ালা) ১৫৩ ফিট ৮ ইঞ্চি দূরত্বে বল নিক্ষেপ ক'রে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের ১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চির ভারতীয় রেকর্ড করেছিলেন পাতিয়ালার কিষেণ সিং।

৫০ মিটার দৌড় (মহিলাদের)—বোম্বাইয়ের বাম্রো গজদার ৬·৫ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে ১৯৩৬ সালে বাঙ্গলার মিস স্মিথের ৬·৬৬ সেকেণ্ডের রেকর্ডের তুলনায় বেশী সাফল্যলাভ করেছেন।

১১০ মিটার হার্ডলস—জে ভিকার্স (বোম্বাই) সময় ১৫·২—নতুন ভারতীয় রেকর্ড।

৫,০০০ মিটার ভ্রমণ—সাধু সিং (পাতিয়ালা); সময় ২৬ মিঃ ১৩ সেকেণ্ড।

বোম্বাইয়ের বলদেব সিং, ব্রড জাম্প, জাভেলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, ২০০ মিটার দৌড়, এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন; এ ছাড়া পেণ্টাথলোনে ২৬৪৮ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থান পান।

বোম্বাইয়ের ৬৭ বছর বয়সের অম্বুনগর ম্যারাথোন রেসে যোগদান ক'রে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর ৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময় লাগে।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের স্থান ঃ

পুরুষদের বিভাগে—১ম পাতিয়ালা ৮৭ পয়েণ্ট, ২য় বোম্বাই ৪৬, ৩য় পাঞ্জাব ৩২, ৪র্থ মহীশূর ১৮, ৫ম বাঙ্গলা ১৬, ৬ষ্ঠ যুক্তপ্রদেশ ১৫, ৭ম মাদ্রাজ ৯, ৮ম দিল্লী ৭ ; ৯ম কোলহাপুর ৫, রাজপুতানা ৪, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ৩, বেলুচিস্থান ১, বরোদা, বিহার এবং উড়িষ্যা—০ পয়েণ্ট।

মহিলাদের বিভাগে—১ম মহীশূর ৩৭ পয়েণ্ট, ২য় বোম্বাই ২৩, ৩য় বাঙ্গলা ১৩, ৪র্থ যুক্তপ্রদেশ ৪, ৫ম মাদ্রাজ ৩, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ১ পয়েণ্ট।

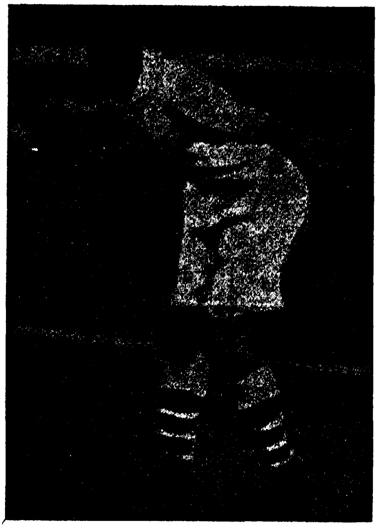

বুক এবং পেট দিয়ে বল আয়ত্বের কৌশল

ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

দীর্ঘ সাত বছর পর পুনরায় ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপের খেলার ব্যবস্থা এ বছর হয়েছে। তেরটি প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। ইতিপূর্ব্বে এত বেশী দলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেখা যায় নি। বাঙ্গলা প্রথম রাউণ্ডে সি পি এবং বেরার প্রদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

ডেভিস কাপ ঃ

আন্তর্জাতিক টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা যুদ্ধের দরুণ ১৯৩৯ সাল থেকে বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পরে পুনরায় ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়েছে। খেলা হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ায়। গত ২৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার খেলা হ'ল। মোট ২০টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। তালিকা প্রস্তুতের সময় প্রথম নাম উঠেছিল স্পেনের। স্পেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে।

খেলার তালিকা :

ইউরোপীয়ান জোন—স্পেন বনাম সুইজারল্যাণ্ড; গ্রেটবৃটেন বনাম ফ্রান্স; চেকোশ্লোভাকিয়া বনাম টার্কি; যুগোশ্লোভিয়া বনাম ঈজিপ্ট; ডেনমার্ক বনাম চীন;

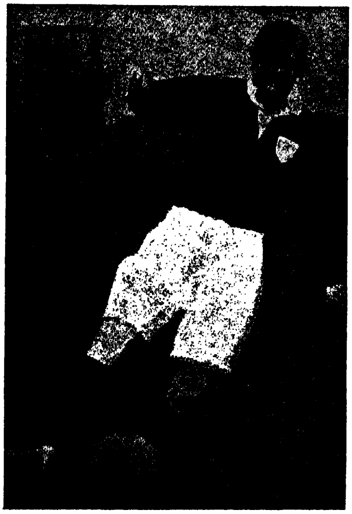

পায়ের ইন্‌সাইড দিয়ে বল ড্রিবলিংয়ের কৌশল

বেলজিয়াম বনাম মোনাকো; সুইডেন বনাম দি নেদারল্যাণ্ড; বাই বনাম আয়ার। আমেরিকান জোন : মেক্সিকো বনাম ক্যানাডা; ফিলিপাইন বনাম ইউনাইটেড ষ্টেট।

অলইণ্ডিয়া ওয়েট লিফ্‌টিং ঃ

অলইণ্ডিয়া ওয়েট লিফ্‌টিংয়ের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা এবং বোম্বাই একযোগে ১৬ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মহীশূর ৭ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং মাদ্রাজ ৫ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। মাদ্রাজের ডি পি মাণি কেদার ওয়েটের তিনটি অনুষ্ঠানে, প্রেস, স্ন্যাচ এবং ক্লিন এবং জার্কে মোট ৫৫৮½ পাউণ্ড

ভার তুলে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের ৫৩০ পাউণ্ডের রেকর্ড করেছিলেন বাঙ্গলার শঙ্করকুমার খাঁ।

রোসার মেমোরিয়াল লীগ ঃ

রোসার মেমোরিয়াল হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পোর্ট কমিশনার ('এ' গ্রুপ বিজয়ী) ৪—১ গোলে মোহনবাগানকে ('বি' গ্রুপ বিজয়ী) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক ঃ

বাঙ্গালোরে ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১০১ পয়েন্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। সিলোন এই প্রতিযোগিতায় ৬১ পয়েন্ট পেয়েছে। এই দ্বিতীয় ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় একাধিক নতুন রেকর্ড হয়েছে। মোট ১৬টি অনুষ্ঠানে ১১টিতে নতুন রেকর্ড হয়েছে; তার মধ্যে সিলোন একাই ৭টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। এই স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় সিলোনের আর ই কিট্রো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্প্রিণ্টার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিট্রো ১০০ মিটার দৌড়ে ১০·৫ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করেন। অল্‌ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে পাঞ্জাবের জে হার্ট যে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন তার থেকে ১ সেকেণ্ড কম সময়ে কিট্রো ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে।

১০০ মিটার হার্ডলস—জে ভিকার (ভারতবর্ষ) সময় ১৫·২ সেকেণ্ড। ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় এই সময়ই নতুন রেকর্ড বলে গণ্য হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের এস আমেদের ১৬·১ সেকেণ্ডের। ২০০ মিটার দৌড়—আর ই কিট্রো (সিলোন); সময় ২২·২ সেকেণ্ড। এই প্রতিযোগিতায় এই সময় নতুন রেকর্ড বলে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ২২·৯ সেকেণ্ড, সিলোনের ষ্টানলি লিভিয়ারা করেছিলেন। সর্টপুট—এম-জি-বেগ (ভারতবর্ষ); দূরত্ব ৪৪ ফিট ৫ ইঞ্চি। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ৪৪ ফিট ২ ইঞ্চি (১৯৪০) ভারতবর্ষের জাহুর আমেদ করেছিলেন।

১০০ মিটার দৌড়—আর ই কিট্রো (সিলোন) সময় ১০·৫ সেকেণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ১১·৬ সেকেণ্ড করেছিলেন সিলোনের ষ্টানলি লিভিয়ারি। ভারতীয় রেকর্ড ১০·৬ সেকেণ্ড। জাভেলিন থ্রো—বলদেব সিং (ভারতবর্ষ) পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ১৫৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, সিলোনের ডি সি ডেসিলভা করেন।

পোলভল্ট—এ সি দীপ (সিলোন); ১১ ফিট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা; ৪ × ৪০০ মিটার রিলে—ভারতবর্ষ; সময় ৩ মিঃ ২৩·৪ সেকেণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ৩ মিঃ ২৭·২ সেকেণ্ড, সিলোন করে।

পায়ের আউট সাইড দিয়ে বল ড্রিবলিংয়ের কৌশল

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বোম্বাই ঃ ৬৪৫
বরোদা ঃ ৪৬৫

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে বরোদা বনাম বোম্বাই দলের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। টসে বরোদা দল জয়লাভ ক'রে। বরোদা মুল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। টস করে খেলার ফলাফল নির্ণয় রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম।

বরোদা দলের পক্ষে বেশী রান করেন আর বি নিম্বল-

কার ১৩২, এইচ অধিকারী ১২৬, ভি-এস-হাজারী ৮৫, এম-এম-নাইডু ৪০।

অল-ইণ্ডিয়া ক্রিকেট দল ঃ

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলতে যাবে তার খেলোয়াড় মনোনয়ন শেষ হয়েছে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেক্‌সন কমিটি নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করেছেন (১) পাতৌদীর নবাব (দক্ষিণপাঞ্জাব) ক্যাপটেন (২) ভি-এম-মার্চ্চেণ্ট (বোম্বাই) ভাইস-ক্যাপটেন (৩) এল-অমরনাথ (দক্ষিণ পাঞ্জাব) (৪) এস মুস্তাক আলী (হোলকার) (৫) সি এস নাইডু (হোলকার) (৬) ডি ডি হিন্দেলকার (৭) এস এন ব্যানার্জি (বিহার) (৮) ভি এস হাজারী (বরোদা) (৯) আর এস মোদী (বোম্বাই) (১০) আব্দুল হাফিজ (উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোঃ) (১১) ভিনু মানকার (গুজরাট) (১২) সিটি সারভাতে (হোলকার) (১৩) এস সোহানী (মহারাষ্ট্র) কিম্বা ডি ফাদকার (বোম্বাই) (১৪) আর নিম্বলকার (বরোদা) কিম্বা ই ইরানী (সিন্ধু) (১৫) সি সিন্ধে (মহারাষ্ট্র) (১৬) গুল মহম্মদ (বরোদা)।

এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভি এম মার্চ্চেণ্ট, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি এস নাইডু, ডি ডি হিন্দেলকার এবং এস ব্যানার্জি ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দলের পক্ষে ইংলণ্ডে খেলেছিলেন। ভি এস হাজারী ১৯৩৮সালে রাজপুতানা দলের হয়ে ইংলণ্ডে খেলে এসেছিলেন।

জাহাজে স্থান না পাওয়ার দরুণ এই দলটি এপ্রিল মাসের শেষ দিকে করাচী থেকে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হবে। ইংলণ্ডে ৪ঠা মে তারিখে ওরসেষ্টার দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের ম্যাচ খেলার কথা আছে। এই দলের সমস্ত ব্যয়ভার প্রায় ছ' লক্ষ টাকার মত হবে। এ'রকম প্রকাশ যে, বোর্ডের অনুমান ৪০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। এক্ষেত্রে ধার এবং দান সংগ্রহ ক'রে ব্যয় বহন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হোলকার ঃ ৯১২

মহীশূর ঃ ১৯০ ও ৪০৬ (৬ উইকেট)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে মহীশূর দলকে এক ইনিংস ও ২১৩ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

হোলকার দল প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৯১২ রান তুলে। এই রান ১৯৪১-৪২ সালে মহারাষ্ট্র দলের ৭৯৮ রানের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এ ছাড়া হোলকার দলের এক ইনিংসে মোট ৭টা সেঞ্চুরী হওয়ায় তারা আর এক নতুন রেকর্ড করেছে। পূর্ব্বে বোম্বাই দলের এক ইনিংসে চার সেঞ্চুরী রেকর্ড ছিল। সেঞ্চুরী করেছেন ভাণ্ডারকার ১৪২, সারভাতে ১০১, জগদল ১৬৪, বি-নিম্বলকার ১০১, সি-এস নাইডু ১৭২, আর-সিং ১০০।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—১৷০

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মৃত ও অমৃত"—২৷০

শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত "শরৎ সমালোচনা—শেষ প্রশ্ন"—৷০

শ্রীশান্তশীল দাশ প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটিকা "সভ্যতার অভিশাপ"—৷০

শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "জন্মভূমি" (দীপঙ্করী, ১৩৫২ সংখ্যা)—১৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত